মিথিলায় রামলক্ষ্মণ।

আপনি আপনার আত্মীয় স্বজনের মূর্ত্তি তৈল চিত্রে রঞ্জিত করিতে চান কি ?

তাহা হইলে আপনি স্বচ্ছন্দে আমাদের নিকট ফটো পাঠাইতে পারেন। আমরা আপনাকে ব্রোমাইড্ এনলার্জমেণ্টের উপর সুন্দর ভাবে ও বিশেষ যত্নের সহিত তাহা তৈলচিত্রে রঞ্জিত করিয়া দিব। আমাদের মূল্য কত সুলভ তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতেই বুঝিতে পারিবেন। সে সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের কিছু বলা অনাবশ্যক। ডাক মাশুলের ব্যয় আমরা নিজেরাই বহন করিয়া থাকি। অর্ডারের সঙ্গে সিকি মূল্য অগ্রিম দেয়। (আমাদের খোসে প্রিয় জনকে উপহার দিবার নিমিত্ত রুমালের উপর এবং লকেটের জন্যও সুন্দররূপে ফটো তুলিবার ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।)

সাইজ্	...	...	মূল্য
৮″ × ১০″	...	...	১৲
১০″ × ১২″	...	...	১৫৲
১৫″ × ১২″	...	...	২০৲
১৭″ × ২০″	...	...	৩৫৲
২৫″ × ৩০″	...	...	৫০৲
৩০″ × ৪০″	...	...	৯০৲

ফটো না থাকিলে কলিকাতার মধ্যে হইলে আমাদের লোক পাঠাইয়া ফটো তুলিয়া আনা হয়। নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন :—

গাঙ্গুলি এণ্ড কোং

আর্টিষ্টস্ এণ্ড ফটোগ্রাফার্স্

২নং অভয়চরণ সরকার লেন, এলগিন রোড, পোঃ আঃ ভবানীপুর, কলিকাতা।

10, Old China Bazar Street, Calcutta.

Wholesale and retail dealers of High class Toys and fancy goods.

আমাদের দোকানে কলিকাতা পটারীর সকল প্রকার কাচের দেবদেবীর মূর্ত্তি পাইকারী দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। আমাদের ফুটবল এত মজবুত যে একটী কিনিলে বহুদিন অবধি খেলা চলে। নিম্নে মূল্য তালিকা দেখুন।

ফুটবল—১নং ৸০ হইতে ২৲; ২নং ১৷৷০ হইতে ২৷৷০; ৩নং ২৲ হইতে ৩৸০; ৪নং ২৸০ হইতে ৫৷৷০; ৫নং ৩।০ হইতে ১০৷৷০।

ব্লাডার—১নং ৸৵০; ২নং ১৲; ৩নং ১।০; ৪নং ১৸৵০; ৫নং ১৷৷০ ও ২৷৷০।

ফুটবল সিরিঞ্জ—৬ ইঞ্চ ১৸৵০; ৮ ইঞ্চ ১৷৷০; পিতলের রড ৬ ইঞ্চ ১৸৵০; পিতলের ৮ ১৷৷০; নিকেল ৯ ইঞ্চ পিতলের রড ১৸০; নিকেল ১০ ইঞ্চ পিতলের রড ২।০।

উহা অপেক্ষাও বেশী মূল্যের সিরিঞ্জ আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

একোর্ডিয়ন (বা হাতে টানা হারমোনিয়ম) ৬ চাবি ৮৷৷০

ঐ ঐ ভাল ৯৷৷০

ঐ ঐ ৮ চাবি ১০৲

ঐ ঐ ভাল ১২৲

ঐ ঐ ১০ চাবি ১৮৲ হইতে ৪০৲

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল পোষাক পরাণো পুতুল ও প্রীংএর চাবিওয়ালা খেলানা, লুডো, স্নেক ল্যাডার, হেশ গেম, ক্যারমবোর্ড, হকি, ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন, টেনিশ ও উহার সাজ সরঞ্জাম ছেলেদের তিন চাকার গাড়ী ও ঠেলাগাড়ী, বায়স্কোপ, ম্যাজিক লণ্ঠন, ষ্টেরিস্কোপ প্রভৃতি সর্ব্বদা আমাদের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডারের সহিত সিকি মূল্য পাঠাইলে ভি, পিতে মাল পাঠান হয়।

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্র।

মৌচাক।

এই বৈশাখে মৌচাক তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল।

মৌচাকের ন্যায় সুনিয়মিত ও সুপরিচালিত মাসিকপত্র বাংলায় আর নাই। পড়ার চাপ না দিয়া যদি আপনার ছেলেমেয়েদের নানাবিষয়ে সুশিক্ষিত করিতে চান তবে আজই তাহাদের নাম গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া দিন। প্রতিমাসে গল্প, উপন্যাস, বৈজ্ঞানিক কাহিনী, জীবনচরিত কবিতা, নানাদেশের কথা, নূতন আবিষ্কারের কথা, পৃথিবীর কথা, জীবজন্তুর কথা, পৌরাণিক কাহিনী, মহাভারত ও রামায়ণের কথা, ধাঁধা ইত্যাদি নানা প্রকারের লেখা মৌচাকে প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া প্রতি মাসে সুচিত্রিত নানা প্রকার ছবি থাকে।

দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনা মৌচাকে প্রকাশিত হয়। গ্রাহক গ্রাহকাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য নানা প্রকার রচনার 'প্রাইজ' দেওয়া হয়। এবারে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে, সেই জন্য এই মাসের মধ্যেই গ্রাহক হইয়া পড়ুন। **বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ দুই টাকা ৷৷৵০ দশ আনা।**

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ৯০।২এ হারিসন রোড, কলিকাতা।

সংখ্যা - ১ - ১২

বর্ষসূচী

অভিমান (কবিতা) শ্রীলীলা দেবী
অভিনেতা (কবিতা)
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ
অদ্ভুত কালো (কবিতা)
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি. এ
অন্তরের ক্ষুধা (গল্প)
শ্রীঅনীলকুমার সেন বি. এ
অন্নপ্রশ্ন (গল্প) শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ বি. এ
অধ্যাসের ইঙ্গিত (অধ্যাপক)
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৬২৫
আমাদের কথা ... ৫৪
আমি কি হয়েছি সই ? (কবিতা)
শ্রীলীলা দেবী
ইতিহাসের সংজ্ঞা ও ধারা
অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৬১
ইন্দিরা দেবী—শ্রীকুমুদিনীমোহন নিয়োগী ৪১২
উপেক্ষিতা (গল্প) শ্রীমতী খুরসিদজাঁহা বেগম ১৪৫
একটী কথা কও (কবিতা) শ্রীলীলা দেবী ৩৮০
ওস্তাদের বাড়ি (চাঙ্গরস) ৫
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি.এ ২৯০
ওস্তাদ (চিত্র) শ্রীমনোলেখা দাসী ৩৬৭
কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য প্রতিভা—
৺কালিদাস মিত্র এম, এ, ও
শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম, এ বি, এল
১, ১০০, ২৪১, ৩৫৭, ৪৪৭, ৫১১, ৫৫৯ ৫৯৫
কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ (কবিতা)
শ্রীহরীন্দ্রমোহন বাগচী ১৬৯
কৃপণের দুর্গাপূজা (গল্প) শ্রীঅনয়কুমার সেন ২৭৫
কথাসাহিত্যের বর্ণন-ভঙ্গী—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম, এ
বি এল ৩১৭
কল্পসৃষ্টি (কবিতা) শ্রীকালীদাস রায় বি এ ৪৪০
কবির প্রেমসাধনা—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন ৫৫২
কান্তকবি রজনীকান্ত (সমালোচনা)
শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি এল ৮০
চোর (গল্প) শ্রীমনোলেখা দাসী ১২০
চোর (কবিতা) শ্রীযামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত ৭০৬
ছোট গল্প—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল ৪১৮
ছিন্ন বন্ধন (গল্প) শ্রীঅনয়কুমার সেন ১২৮
ছায়া (গল্প) শ্রীসুকুমার বরাটসেন ৩০০
ছায়া (কবিতা) শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি. এ ৩১৪
জাভায় বিবাহ প্রথা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৯৮
জাপানে সাতদিন (ভ্রমণ)
শ্রীমতী খুরসিদ জাঁহা বেগম
জাপানের বর্ত্তমান অবস্থা
স্যার আশুতোষ চৌধুরী
টলষ্টয়ের আনা কারেনিনা
৺কালীদাস মিত্র এম, এ
তীর্থ সলিল ও স্বর্গ (কবিতা) শ্রীলীলা দেবী
দিদিমার কাশীবাস (গল্প)
শ্রীআশুতোষ সান্যাল
দীক্ষা (গল্প) শ্রীলীলা দেবী
দীক্ষা (কবিতা) মহারাজকুমার
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় ২০৯
দেবতত্ত্ব-অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ১৭৭,৫৬৪
দিক মোহন (কবিতা)
শ্রীকালীপদ রায় বি, এ ৩১৯
নারীর মান (গল্প) শ্রীমতী সরসীবালা বসু ৩৩০
নাট্য-স্মরণ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ১৯৭
নির্য্যাতিতা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ২৪৭
নিরুদ্দেশ (চিত্র) শ্রীমনোলেখা দাসী ৩১৪
নিষ্ফল বাণী (কবিতা) শ্রীহরীন্দ্রমোহন বাগচী ৩০৫
নেপালীদের বিবাহ প্রথা
শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার বি, এ
না (কবিতা) শ্রীলীলা দেবী
নারী (কবিতা) শ্রীরেন্দ্রকুমার রায়
পরিবর্ত্তন (কবিতা)
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি. এ ১৩৪
প্রেম (গল্প) শ্রীলীলা দেবী ১১
প্রেমেরঞ্জন (কবিতা) শ্রীহরীন্দ্রমোহন বাগচী ৩৬
প্রেমের জয় (গল্প) শ্রীমতী খুরসিদজাহ বেগম ১০৪
পুনর্দ্দর্শন (কবিতা) শ্রীকালিদাস রায় বি. এ ১৪৯
পুষ্পবিকাশ (কবিতা) শ্রীকালিদাস রায় বি. এ ১৮০
প্রেমোন্মাদ (কবিতা) শ্রীলীলা দেবী ২২৫
প্রেমের গুণে (কবিতা)
শ্রীকালিদাস রায় বি. এ
পাগল (চিত্র) শ্রীসুকুমার বরাট সেন

পাখো (কবিতা) শ্রীলীলা দেবী ৩১৩
পথে (কবিতা) শ্রীমতী সরজ দেবী ৪২৪
পাশ বই (গল্প) শ্রীসুধাংশু বরাট সেন ৫২৬
পূজার ভাঁড়েরী (গল্প) শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায় ৫৮৭
পুরাতন চিঠী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৫১
প্রতীক্ষা (চিত্র) শ্রীমতী মনোলেখা দাসী ৫৪৭
পাতিব্রত (গল্প) শ্রীঅজয়কুমার সেন ৫২৩
প্রায়শ্চিত্ত (গল্প) শ্রীঅসিতকুমার সেন বি. এ. ৫৬৮
প্রেম ও মুক্তি (গল্প) শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
ফাঁড়া (কবিতা) শ্রীসুধীরঞ্জন মল্লিক বি. এ ২৯
বঙ্গসাহিত্যে বিবেকানন্দ
শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম. এ বি. এল ৫২১
বাংলার কলঙ্ক (উপন্যাস) শ্রীসজনীকান্ত দাস ১১,১৫,
১২১,১৭৩,২১২,৩০১,৩৮৪,৪৩৮,৪৮৯,৫০৬,৫৮৫
ব্যাধাতুর (গল্প) শ্রীবাণী দেবী ৯৪
বিবেকানন্দ ও ধর্মজগৎ
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদায় (কবিতা) শ্রীযোগেন্দ্রকুমার
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় ১২৭
বেদনা (গল্প) শ্রীনলিনী বসু ১৬৫
বিভীষণ (গল্প) শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ১৮৬
বিনিময় (চিত্র) শ্রীমনোলেখা দাসী ২০৮
বনমল্লী (কবিতা) শ্রীকালিদাস রায় বি. এ ২৩৪
বাঙ্গালীর নিজস্ব সাধনা
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু এম, এ ২৭৩
ডুবারু (গল্প) শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ ২৭৮
শ্রম গৌরব (গল্প) শ্রীআশুতোষ সান্যাল ২৯৬
বাঁশীর সুর (গল্প) শ্রীনিশিকান্ত সেন ৩১৩
ধরিত্রে যাওয়া (কবিতা) শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ৩৯৪
বদ নজির (গল্প) শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায় ৪১৫
বাঁশীর বিষ (কবিতা) শ্রীকালিদাস রায় বি. এ ৫৪৬
ভিখারিণী (চিত্র) শ্রীমনোলেখা দাসী ৪৬০
ভাবনা (কবিতা) শ্রীলীলা দেবী ১৪৩
ভালবাসার স্মৃতি (কবিতা) শ্রীলীলা দেবী ৪৭
ভাই (চিত্র) শ্রীঅজয়কুমার সেন ৪০
ভাইফোঁটা (কবিতা) শ্রীলীলা দেবী ৩২৯
ভুলভাঙ্গা (গল্প) শ্রীমতী সুরসিকজাঁহা বেগম ৪৩৩
ভুলে যাওয়া (গল্প) শ্রীঅমূল্যরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ৬২২
ভাগের পূজা (উপন্যাস)
" " শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া ৪৮
" " শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ৮৭
" " শ্রীসরলীবালা বসু ১০৮
ভাগের পূজা (উপন্যাস) শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম, এ ২১১
" " শ্রীচারুবালা বসু ২৬৪
" " শ্রীঅজয়কুমার সেন ৩৬৯
" " শ্রীলীলা দেবী ৪০৪
" " শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৪২৬
" " শ্রীপ্রভাবতী দেবী ৫০৫
" " শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায় ৫৬১
মোহমুদ্গর পাঠান্তে (কবিতা)
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি. এ ৫৫৭
যাযাবরী (কবিতা) শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি. এ ৩১৬
যাদাবদল (গল্প) শ্রীলীলা দেবী ৩৪৮
যমুনা (কবিতা) শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী ৩৪৭
যাযার ভোর (গল্প) শ্রীঅজয়কুমার সেন ১৮০
যজ্ঞন-বাগান (গল্প) শ্রীআশুতোষ সান্যাল ২৫৮
যাদ্বিদ্যেকির কথা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ১০২
যাতাল (চিত্র) শ্রীমনোলেখা দাসী ২৩৮
মুক্তি (কবিতা) মহারাজকুমার
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় ২৯১
যা-হারা (কবিতা) শ্রীলীলা দেবী ৪৯৮
যীরাবাই (কবিতা) শ্রীঅমরেশচন্দ্র বসু ৬১
যুবক সম্মিলনীতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা
২৭১, ৩৭৪, ৪০২
রক্ত তেজ (চিত্র)
অধ্যাপক শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি. এ ১০৫
রবীন্দ্রনাথের বাণী—শ্রীঅনিলকুমার সেন বি. এ ৪৩৩
শোক সংবাদ ৩৭৬, ৪৭২
শেষ আহ্বান (কবিতা)
শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ ৫৩৪
শেষ বোঝা (গাঁথা) শ্রীআশুতোষ সান্যাল ৪৮৩
স্বপন (কবিতা) মহারাজকুমার
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় ৪৬
সংকলন ১০৭, ১৫১, ২১৭
সন্ধ্যারাণী (কবিতা) শ্রীকালিদাস রায় বি. এ ৭১
স্নেহের সুধা (গল্প) শ্রীঅজয়কুমার সেন ৭২
স্বামীত্যাগ (গল্প) শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু বি. এ ১৯৯
সৈরণ (গল্প) শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ৩১৪
স্বরূপ (কবিতা) শ্রীলীলা দেবী ৪০২
সন্ন্যাসী (গল্প) শ্রীঅজয়কুমার সেন ৪৮১
সংস্কার ও বহিষ্কার (গল্প)
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার ৫৪৪
হাতের পাঁচ (গল্প) শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ২০, ৫৮
হায়-মানা-হায় (কবিতা) কাজীনজরুল ইসলাম ২০৯

P 3055

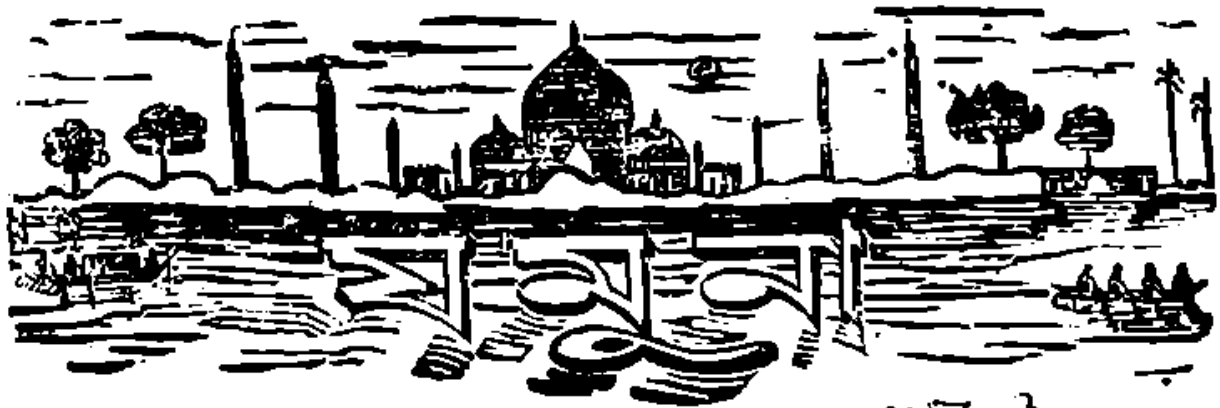

M5C.3
·012

(১২শ বর্ষ) | বৈশাখ, ১৩২৯ | ১ম সংখ্যা

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য-প্রতিভা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(কালিদাস মিত্র এম, এ)

২০। গীতিনাট্য।

সঙ্গীবতা গিরিশচন্দ্রের গীতাবলীর একটী সম্পূর্ণ বিশেষত্ব। তাঁহার প্রত্যেক সঙ্গীতে প্রায় একটা ভাবের সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। অনেক বৈষ্ণব ভিখারী গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাত্মক নাটক ও গীতি-নাট্যাবলীর গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে। সুদূর নিভৃত বিজন পল্লীগ্রামেরও হাটে মাঠে, পল্লীবালিকা ও রাখাল বালকগণের মুখে গিরিশ-চন্দ্রের গান শ্রুত হয়। তাঁহার নাটকাবলীতে যে সকল গীত সন্নিবিষ্ট আছে তদ্ব্যতীত তিনি যাত্রা, হাফ্ আখড়াই, পাঁচালী, দুর্গোৎসব, রামকৃষ্ণোৎসব ও অন্যান্য বহুবিধ সাময়িক বিষয়ে বহু গীত রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সকলের অধিকাংশই রক্ষিত না হওয়ায় অধুনা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

গীতি-নাট্যের জীবনীশক্তি সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই উপলব্ধি হয়। গিরিশচন্দ্রের গীতি-নাট্যাবলীর অনেক গুলিই তাঁহার সঙ্গীতের সজীবতাগুণে সজীব; তাহারা পুরাতন হইতে জানে না, কারণ যখনই এ গুলির অভিনয় হয়, তখনই দর্শকগণ প্রাণের ভিতর একটা সাড়া পান—বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর ঘরের সুখ

ছবির চিত্র দেখিতে পান। আরবা বা পারস্য-দেশের উপাখ্যান হইতে যেখানে তিনি উপাদান সংগ্রহ করিয়া গীতি রচনা করিয়াছেন,সেখানেও তিনি নিজ অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে সেগুলিকে নিজস্ব করিয়া যে চিত্র আমাদিগের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা আমাদের মর্ম্মের তন্ত্রীতে আঘাত করে

তাঁহার গীতি-নাট্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ করিলে দেখা যায়, উহার কতিপয় ধর্ম্ম ও পৌরাণিক উপাখ্যান-মূলক, যথা, 'আগমনী', 'অকালবোধন', 'দোললীলা', 'ব্রহ্মবিদায়', 'অশিহরণ', 'নন্দদুলাল', 'হরগৌরী' ইত্যাদি। ইহাদের গানগুলি সর্ব্বজন-প্রিয়। অপর এক শ্রেণীর গীতিনাট্যের বিষয় প্রণয়; উহার বিকাশ ও মিলন। এগুলির মধ্যে অবিশুদ্ধ প্রেমের কলঙ্কিত চিত্র পরিলক্ষিত হয় না, সকল গুলিরই আদর্শ অতীব উচ্চ। ইহার মধ্যে 'হীরার ফুল', 'মায়াতরু', 'মলিনমালা', 'মোহিনীপ্রতিমা','মলিনা বিকাশ','স্বপ্নের ফুল','ফণীর-মণি', 'সেলদার' প্রভৃতি কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য। তৃতীয়তঃ প্রচলিত উপাখ্যানাবলী হইতে গৃহীত গীতি-নাট্য। প্রায়ই এগুলি আরব্য ও পারস্য উপন্যাসের গল্প হইতে বিরচিত। যথা,—'আলাদিন', 'আবু হোসেন', 'পারস্যপ্রসূন'। এ তিনখানি আরব্য উপন্যাস হইতে গৃহীত। 'মনের মতন' পারস্য উপন্যাস হইতে ও 'বাসর' ভারতীয় উপাখ্যান হইতে গৃহীত। চতুর্থতঃ গিরিশচন্দ্র সাময়িক ঘটনাবলীর উপর কয়েক খানি গীতিনাট্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। যথা, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরকজুবিলী উপলক্ষে 'হীরক-জুবিলী', কংগ্রেস উপলক্ষে 'মহাপূজা' বুয়ার যুদ্ধ অবসানে 'শান্তি', মহারাণীর মৃত্যুতে 'অশ্রুধারা' প্রভৃতি।

আমরা সংক্ষেপে এই চারিশ্রেণীর গীতিনাট্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া গীতিনাট্য রচনায় গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার কিরূপ স্ফুরণ হইয়াছিল তাহা দেখাইতে প্রয়াস পাইব।

২১। ধর্ম্ম ও পুরাণমূলক গীতি-নাট্য।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়াটারের অধ্যক্ষতাকালে গিরিশচন্দ্র, 'আগমনী', 'অকালবোধন' ও 'দোললীলা' নামক তিনখানি গীতি-নাট্য প্রণয়ন করেন। 'আগমনী'র বিষয় বাঙ্গালাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা জানেন। ইহার গানগুলি বাঙ্গালীর বড় আদরের। ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের লোকেরাই এগুলি শুনিয়া ও গাহিয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকে। জানি না বর্ত্তমান যুগের কবিতা ও সঙ্গীত রচয়িতাদিগের মধ্যে আর কাহারও গান, অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকদিগের হৃদয় তন্ত্রীতে এরূপভাবে আঘাত করিতে পারিয়াছে কি না? সর্ব্ব সাধারণের নিকট কাহার গান এতদূর প্রতিষ্ঠা ও প্রচার লাভ করিয়াছে? এই পৌরাণিক গীতিনাট্যগুলির অমরতা-লাভের প্রধান কারণ ইহাদের গানগুলি, সর্ব্বসাধারণের বোধ্য—সাধারণের সুখ দুঃখের চিত্রে পরিস্ফুট,—সহমর্ম্মিতায় অভিষিক্ত। বাঙ্গালীর চিরন্তন ভাবধারা ইহাদের ভিতর প্রবাহিত। 'কুস্বপনে দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী' শীর্ষক গানটী কন্যাগতপ্রাণা, তদ্বিয়োগবিধুরা জননীর প্রাণের ঐকান্তিক কামনার অভিব্যক্তি। স্বামীগৃহ হইতে পিত্রালয়ে আনিবার জন্য স্বামীর নিকট আকুল প্রার্থনা। এই গানটী ও 'আমার উমা এলোরে, দেখগে রাণী নয়ন-ভরে' গানটী সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। উমাকে দেখিয়া মেনকারাণী যখন বলিলেন :—

"ওমা কেমন করে পরের ঘরে ছিলে
উমা বল্ মা তাই।
কত লোকে কত বলে শুনে ভেবে মরে যাই।
মার প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে,
জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
এবার নিতে এলে ব'লব হরে,
উমা আমার ঘরে নাই॥"

তখন স্বামীর প্রচ্ছন্নদরিদ্রা শুনিয়া স্বামীসোহা-

গিন্নী হর-রমা, জননীর উপর রোষ চাপাইয়া বলিলেন, সম্বৎসরের মধ্যে তুমি ত মা সংবাদ লও নাই—

"তুমি ত মা ছিলে ভুলে,
আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই
ভোলা জানে না মা আমা বই॥"

এখানে স্বামীসোহাগিনী কন্যার পতি-প্রেমের যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বড়ই মধুর। উমাকে তাঁহার স্বামী যে কতটা ভাল বাসেন তাহা কুলাঙ্গনা কবি 'জানে না মা আমা বই' এই কয়টী শব্দে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই উপভোগ করিবার। এই অনন্যশরণতা—এই একনিষ্ঠা প্রেমকে অটুট রাখে। তার পর কবি গৌরীকে দিয়া বলাইলেন,—

'ভাং খেয়ে মা সদাই আছে,
থাকতে চায় না কাছে কাছে,
ভালমন্দ হয় গো পাছে,
সদাই মনে ভাবি ওই।
দিতে হয় মা মুখে তুলে,
নয় তো খেতে যায় গো ভুলে,
খেপার দশা ভাবতে গেলে,
ওমা ভেসে গেল নয়ন জলে,
একলা পাঁছে যায়গো চলে,
আপনহারা এমন কই।'

মা, 'আপনা-হারা,' 'আপনা-ভোলা' আমার জামাই স্বামীর সহিত আমাকে সর্ব্বদাই থাকিতে হয়, কারণ তিনি সংসারে নির্লিপ্ত। এমন কি মুখে তাঁহার তুলিয়া না দিলে তিনি খান না। চোখের আড়াল হইলে পথ ভুলিয়া যদি একা কোথাও চলিয়া যান, তাই মা আমি তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে পারি না। ভোলানাথের নির্ভরতা ও গৌরীর নিষ্ঠার মধুময় চিত্র—প্রেমের এই মাধুরী ছবি অন্যত্র দুর্লভ। তবে একটা কথা এখানে বলা যাইতে পারে, অন্যের ভাবে ভাবিত হইয়া গিরিশচন্দ্র এই গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন।

'একাল বোধন' রামচন্দ্রের শারদীয়া পূজা অবলম্বনে লিখিত ভক্তি-রসাত্মক গীতিনাট্য। 'যোগ-লীলা'র নামেই বিষয় সূচিত হয়। ইহার একখানি গান উদ্ধার করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি লাম না। সৌন্দর্য্য-পিপাসু ইহার রস ভোগ করুন।

'এস, সবে খেলি আজি হোরি,
কাগে কিবা শোভা হয় হেরিব সুন্দরী!
শ্রম রঞ্জিত বদনে, কুঙ্কুম রাগ রঞ্জনে,
সুখে হেরিব নয়নে, কে হারে কে জিনে,
পিপাসিত চিরদিন পিয়াস হরি।'

অতঃপর স্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষতাকালে, তিনি 'আনন্দ রহো' নামে আর একখানি গীতিনাট্য রচনা করেন। 'যমুনা'র ভক্তিগদগদ চিত্রখানির প্রতি সকলের হৃদয়ই আকৃষ্ট হয়। যমুনার মুখে, "পাষাণী পাষাণের মেয়ে বাদ সেধেছ আমার সনে," "সাধ পূর্ণ কর মা শ্যামা, মৃণ্ময়ী কর চন্দ্র," "নেচে নেচে চল মা শ্যামা দুজনে তোর সঙ্গে যাব" প্রভৃতি সংগীত ভক্ত রামপ্রসাদের সাধন-সঙ্গীতের সহিত এক পর্য্যায়ে স্থান পাইবার স্পর্দ্ধা দাবী রাখে। তবে এখানেও বলিয়া রাখা ভাল, সাধকপ্রবরদিগের সংগীতের ভাবে মগ্নগুল হইয়া গিরিশচন্দ্র যে এই গীতগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। রাঘবী বা রামপ্রসাদের গানের অনুকরণে এগুলি লিখিত নহে। তিনি পূর্ব্বসূরীদের ভাবকুসুম লইয়া মালা গাঁথিয়াছেন। আর এ ভাবগুলিও যে তাঁহাদের নিজস্ব তাহাও নহে—এগুলি ভারতের সনাতন ভাব। এই গীতিনাট্যে তারারূপ বর্ণনাত্মক 'উর্দ্ধকটাজুট গভীর নিনাদিনী' ইত্যাদি যে গানটী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে কবিবর নিপুণতা সহকারে ভীষণ রুদ্ররসের অবতারণা করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। গানটীর বিষয়ানুযায়ী ভাষার গাম্ভীর্য্যও প্রণিধানযোগ্য।

'ব্রজবিহার' গিরিশচন্দ্রের অপর একখানি মধুর গীতিনাট্য। ইহার একখানি গান, 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করিয়া প্রাণকে আকুল করিয়া তুলে। বাস্তবতা (Realism) ও অধ্যাত্মতার (Idealism) অপূর্ব্ব সম্মিলনে সর্ব্বাঙ্গ হইয়া নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। এইভাবে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা গীতরচয়িতাদিগের পক্ষে বড় সহজসাধ্য কার্য্য নয়। শ্রীরাধা জগজ্জননী করালবদনী মা কালীর আরাধনায় রতা; কিন্তু তাঁহার রাঙ্গাচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে শ্রীকৃষ্ণের রাঙ্গা চরণ, ত্রিভঙ্গ ঠাম, তাঁহার মনে পড়িতেছে নিরঞ্জনা অরূপা মূর্ত্তি ধ্যান করিতে তাঁহার হৃদয় মাঝে পীতধড়া পরিহিত বংশীধারী কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখা পান; এবং উন্মনা হইয়া খেদ করেন, "ধরম করম সকলি গেল লো শ্যামপূজা মম হ'ল না।" কি তন্ময়চিত্ততা, কি একনিষ্ঠ প্রেমের পরিস্ফুট চিত্র! আবার তাঁহারি মুখে "নীল যমুনা যমুনা ধাইছে" সঙ্গীতে কবি আশা ও নিরাশার কি অপরূপ দ্বন্দ্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গীতিনাট্যে শ্রীকৃষ্ণের মুখে উদ্গীরিত "আমার এ সাধের তরী প্রেমিক বিনা নেইনি কারে" একটী অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক প্রেম সঙ্গীত। বিশ্ব প্রেমের অবতার মুক্তির তরণী লইয়া ঘাটে ও আঘাটায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যে প্রকৃত প্রেমিক তাহাকে আহ্বান করিতেছেন, 'এস তরীতে উঠে এস।' প্রেমিকের নিকট মুক্তির পথ সদাই উন্মুক্ত। তাঁহার তরী অপ্রেমিকের ভার সহে না। প্রেম-তুফানে তাঁহার তরী নাচিয়া নাচিয়া যাইতেছে আর তিনি ডাকিতেছেন, উন্মাদচিত্ত, একনিষ্ঠ সাধক প্রেমিককে, যিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কুলমান গর্ব্ব বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারি অভিমুখে ছুটিতে ব্যগ্র, তাহাকে ডাকিতেছেন—ডাকিতেছেন তাহাকেই যে, লোকলজ্জা মানভয় ত্যাগ করিয়া পরাপ্রেমকেই সম্বল করিয়াছে, তাহারি জন্য প্রেমের কাণ্ডারী প্রেমতরী লইয়া, আহ্বান করিতেছেন :—

"আমার এ সাধের তরী
প্রেমিক বিনা নেইনি কারে,
যে প্রেম জানে না, চড়তে মানা;
ডোবে তরী একটু ভারে।
মনে মনে বুঝে দেখ, এস যদি প্রেমিক থাক,
যে ধর প্রেমপসরা, এস তরা নে যাই পারে।
প্রেম-তুফানে তরী ভাসে,
প্রেমিক দেখ্‌লে কূলে আসে,
ঢেউ দেখে যে ভয় পাবে না,
অকূল পারে নে যাই তারে॥

দ্বিতীয়বার যখন গিরিশচন্দ্র 'মিনার্ভার অধ্যক্ষ ও নাট্যাচার্য্য পদে বৃত হন, তখন তিনি চারিখানি পৌরাণিক গীতিনাট্য রচনা করেন। 'জন্মাষ্টমী', 'শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক' ও 'কৃষ্ণকালী' এই তিনখানি কৃষ্ণবিষয়ক গীতিনাট্য একত্রে 'নন্দদুলাল' নামে অভিহিত হইয়াছে। এ তিনটী বিষয়ই শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গৃহীত; হিন্দু নরনারীর অতীব আদরের সামগ্রী।

'মণিহরণ' এক নবেন্দ্র রাত্রিতে প্রথম অভিনীত হয়। সমন্তক হরণ ও উহার পুনঃপ্রাপ্তি ইহার বর্ণিত বিষয়। ইহা প্রেম, ভক্তি ও কৌতুকপূর্ণ অপূর্ব্ব গীতিনাট্য। শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্কমোচন ও জাম্ববতীর সহিত বিবাহে ইহার পরিসমাপ্তি। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের "আমি হাতে হাতে দিই ধরা। আমার কৈ সাজে হে ছল করা?" এবং "ভক্ত আমার হৃদয়নিধি, ভক্তের কিসে শুধ্‌বো ধার" এই দুইটী সঙ্গীত ভক্তমাত্রেরই প্রিয়।

'শিবচতুর্দ্দশী' শিবরাত্রি-বিষয়ক প্রেমভক্তিপূর্ণ গীতিনাট্য। 'হর-গৌরী' গীতিনাট্যও কোন এক শিবরাত্রি উপলক্ষে প্রথম অভিনীত হয়। প্রজাপতির প্রজা-সৃষ্টির পর মানবজাতির উন্নতি-সাধক কার্য্যাবলী এই নাটকে সুকৌশলে বর্ণিত হইয়াছে। কৃষিকার্য্যের জন্য ত্রিশূল ভগ্ন করিয়া বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক হলফলক গঠন, আবাসহীন যাযাবর বৃত্তিধারী আদি-

মাংসভোজী মানব কবিকার্য্যের সহিত আবাল্যগঠন করিয়া সভ্যতার স্তরে কেমন করিয়া উঠিতে পারে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। হর-গৌরীর কোন্দল, দেবাদিদেবের শাঁখারী সাজিয়া গৌরীকে শাঁখা পরান ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া গিরিশচন্দ্র হরগৌরী মিলনে এই নাটকের উপসংহার করেন। রামেশ্বরের 'শিবায়ন' বা 'শিব সংকীর্ত্তন' হইতে ইহার আখ্যান-ভাগ গৃহীত। গিরিপুরে গৌরীর আগমনে মেনকার মুখে "এসেছিস্ মা থাকনা উমা দিনকত" ও "জামাই নাকি শ্মশানবাসী শুনতে পাই" এই দুইটী গান বড়ই মধুর। মাতৃহৃদয়ের বেদনা ও এ গুলিতে আসঙ্কা কি সরল অথচ সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে! কিন্তু এই গীতিনাট্যে কুঁচনীবেশে গৌরীর ছলনায় ও যোগেশ্বর ইন্দ্রিয়জয়ী শিবকে কামুকরূপে চিত্রিত করিয়া গিরিশচন্দ্র দেবাদিদেব ও গৌরীর চরিত্রের খর্ব্বতা সাধন করিয়াছেন। বাস্তবিক কুঁচনী বেশী গৌরীর সহিত কামবিমোহিত শিবের কথোপকথন অত্যন্ত আপত্তিজনক। শাঁখারী বেশে মহাদেব কুঁচনী বেশী গৌরীর ছলনার প্রতিশোধ দেন। এই অংশেও আপত্তিকর, কুরুচিপূর্ণ রসিকতার ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। দেবদেবীর অবমাননা করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র যে ইচ্ছা করিয়া এই নাটকে হর-গৌরীর বিকৃত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি রামেশ্বরের অন্ধঅনুকরণের ফলে এইরূপ করিয়াছেন। জানিনা কেন তাঁহার প্রতিভা সুরুচি রক্ষা করিয়া এস্থলে চলে নাই এই নাটকে আর একটী বিশেষ দোষ পরিলক্ষিত হয়। কবিবর এখানে পূর্ব্বতন কবি, ছড়া ও তরজাওয়ালা-দিগের পথানুসরণ করিয়া মিত্রাক্ষর কবিতায় কথোপকথন করিয়াছেন। ইংরাজীতে যাহাকে Zingling verse বলে। আমাদের বোধ হয় গিরিশচন্দ্র এস্থলে সময়ের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

"অভিশাপ" নামে গিরিশচন্দ্রের আর একখানি গীতিনাট্য আছে। "রাম অবতারের সূচনাস্বরূপ পৌরাণিক কাব্যোদ্যানের একটী ঈষৎ-মুকুলিত কুসুমের সহিত মিলাইয়া গিরিশচন্দ্র স্বীয় নাট্য-প্রতিভাবলে ও কুতকিনী কল্পনার সাহায্যে নূতন চরিত্র সৃষ্টি, নূতন ভাব ও রসের সমাবেশে এক অপূর্ব্ব মালা গাঁথিয়াছেন। ইহাতে ভক্তি ও হাস্যরসের অপূর্ব্ব মণিকাঞ্চন সংযোগ আছে। পর্ব্বতমুনি ও নারদমুনির শিষ্যগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ও কথোপকথনে ভারতের তার্কিক ও নৈয়ায়িকগণের তর্কের ধারা বজায় রাখিয়াছে।

২২। বিশুদ্ধ প্রণয়-মূলক গীতিনাট্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দ্বিতীয় শ্রেণীর গীতি-নাট্যগুলি বিশুদ্ধ প্রণয়-বিষয়ক। ভাব সম্পদে, গীতি-মাধুর্য্যে এবং বিশুদ্ধ আদর্শে অতীব গৌরবপদ। এই শ্রেণীর ৮ খানি গীতি-নাট্যের মধ্যে 'হীরার ফুল' ও 'মলিনা বিকাশ' বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের প্রণয়-রসাত্মক গীতি-নাট্যগুলি প্রায় একই ধরণের। হয়ত পুরুষ নায়ক তাঁহার প্রেমাস্পদ রমণীর জন্য ব্যাকুল, রমণী কিন্তু তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহেন না; নয়ত উভয়েই উভয়ের জন্য ব্যাকুল, অথবা উভয়েই উভয়কে সেরূপ আন্তরিক ভাবে চাহেন না বা ভাণ করিয়া আন্তরিকতার অভাব দেখান। শেষে মধুর মিলনে নাটকের উপ-সংহার হইয়া থাকে।

'হীরার ফুলে' কবিবর প্রেমের নামে বড়াহন্ত। এমন নায়িকার প্রাণে প্রেমের যাদুকাটি-স্পর্শ সজাত কোমলতা ও প্রেমপাশে নায়কের নিকট ধরা দেওয়া নিপুণতা সহকারে বর্ণিত করিয়াছেন। এ খানি একাঙ্কের ক্ষুদ্র গীতি-নাট্য হইলেও বহুবার প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছে।

'মায়াতরু' নাটকের 'সাগরকূলে বসিয়া বিরলে হেরিব লহর-লীলা' গীত হতাশ-প্রেমিকের প্রাণের কথা। একদল রমণী-বিরোধী প্রেমবিমুখ যুবক-দিগকে প্রেম ধর্ম্ম দীক্ষা দেওয়াই ইহার বর্ণিতব্য বিষয়। এই গীতি-নাট্যের 'ভুল হাসির'—

"আমি তারি সাথের প্রাণে
কোন প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি
আমি ত প্রাণ দেব না—প্রাণ নেবো না,
আপন প্রাণে ভালবাসি"—

প্রভৃতি গীত পাঠ করিয়া ম্যাথিউ আর্ণল্ড প্রণীত "Lucrotyn" কবিতা মনে পড়িয়া যায়। সেক্সপীয়রের "Love's Labour Lost" পাঠ করিয়া বোধ হয় গিরিশচন্দ্র 'মধুরাতক' লিখিয়াছিলেন। তাহাতেও প্রেমবিমুখ Biron ও তাঁহার অনুচরবর্গের প্রেমের আলোকে নবযৌবন লাভের ন্যায় এই গীতি-নাট্যে সুরতের সদনে প্রেমের মোহিনী মায়ায় অপরূপ পরিবর্ত্তন চিত্রিত হইয়াছে। 'হীরার ফুলে' হাস্যরসের যে অভাব ছিল 'মায়াতরু'তে "মার্কণ্ড" উহার কিয়দংশ পূরণ করিয়াছে। "মলিন মালাঞ্চ" লহর-কুমার, তরুণা ও বরুণা এই কয়টি চরিত্রই উল্লেখ-যোগ্য। একটী মাত্র গীতে একখানি সম্পূর্ণ চিত্র যে প্রকাশ করা যাইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই গীতিনাট্য হইতে গানখানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। (পোতারোহণে লহর)—

"অশান্ত সাগর, ঘোর রণ রঙ্গ।
উর্দ্ধে ফুটা-ফাটা, গরজে তরঙ্গ
বেলা বিচঞ্চল, সাগর টলমল
প্রবল পবন বহে ঝড়-দল সঙ্গ॥
মেঘ করাল, যামিনী-মাল
নিবিড় আঁধার, মহী কম্পিত অঙ্গ।
ধারা প্রচণ্ড, ধরাধর খণ্ড
ভূত ধ্বংস কত ভ্রূকুটী ভ্রূভঙ্গ॥"

ইহাতে প্রবল ঝটিকাহত বিচঞ্চল সমুদ্রের সহিত সঙ্গ নিনাদিত, বিদ্যুদ্দাম ঝলকিত আকাশের অপরূপ দৃশ্যের একখানি প্রকৃষ্ট সম্পূর্ণ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা যে নিপুণ চিত্রাঙ্কনী-প্রতিভার অভিব্যক্তি তাহা সকলেকেই স্বীকার করিতে হইবে।

"মেদিনী প্রতিমায়" সাধনা, কুসুম, মোহার, হেমন্ত ও হীরালাল এই কয়টি চরিত্রই অল্পের মধ্যে বেশ উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়াছে। অদ্ভুত চরিত্রে হাস্য-রস বজায় রাখিবার চেষ্টা দেখা যায়। হেমন্তের "প্রাণের মতন পেলে পরে, প্রাণ কি কারু মানে মানা।

• •

চাইনা হো ভালবাসা, দেব কেবল কড়ি আশা
পিয়াসা ভালবাসা, ভালবাসা যায় কি কেনা?"

এই একটি গানে চঞ্চল বিশুদ্ধ প্রেমের গতি কিরূপ তাহা দেখান হইয়াছে।

"মলিনা বিকাশ" গীতিনাট্যে বিকাশ নামক রাজ-পুত্র তদীয় সহচর বিলাস, এই দুই বন্ধুর সহিত রাজকন্যা মলিনা ও তাহার সখী তরলার পরস্পর সন্দর্শন-জাত প্রথম ও শেষে মধুর মিলন বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে মলিনার মুখে "দেখ্‌লে তারে আপনা হারা হই" ও "কেমনে মন নিবারি" প্রভৃতি সংগীত অনেক প্রেমিক-প্রেমিকাকে প্রেমের সরল পথ দেখাইয়া দিয়াছে।

"স্বপ্নের ফুল" আধ্যাত্মিক বা রূপক গীতি-নাট্য। এই জন্যই বোধ হয় ইহা রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সমাদরে গৃহীত হয় নাই। ইহা কতকটা প্রতীচ্য ভূখণ্ডের Morality Plays শ্রেণীর। এই গীতি-নাট্যের অন্তর্গত "দুটো কাঁটা ফেলে দে দেখ্ সেই সেই সেইখে" গানটি ভাবুকের নিকট অপূর্ব্ব; তাঁহার নিকট দুটো কাঁটা—বিদ্যা ও অবিদ্যা বা সদসৎ প্রবৃত্তি।

"ফকীর মণি" একটী ভারতীয় কাহিনী হইতে গৃহীত। মনীষী লাল বিহারী দে-প্রণীত "Folk Tales of Bengal" নামক মনোরম গল্প পুস্তকের "Fakir Chan" নামক গল্প হইতে এই গীতি নাট্যের উপাখ্যানাংশ পাওয়া যায়। ইহাতে রাজকুমারের প্রেম-বঞ্চিতা ধাত্রীর কন্যার শেষ গীতটি করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী।

"হেলদার" বিশুদ্ধ প্রেমের চিত্র। ইহাও আধ্যাত্মিক শ্রেণীর গীতি-নাট্য বলিয়া সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ইহার সেরূপ আদর হয় নাই। তবে, রবীন্দ্রনাথ "রাজা,"

"অভিশাপ" "ডাক ধন" প্রভৃতি কয়েকখানি এই শ্রেণীর নাটক রচনা করিয়াছেন। আশা করি শীঘ্রই এগুলির যথোচিত আদর হইবে; এবং সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক গীতি-নাট্যের প্রকৃত মর্য্যাদা দান করিতে বাঙ্গালী কৃপণতা করিবেন না। ইহার ধারা, রেখা, পিয়ারা ও দেলদার এই কয়টি চরিত্রই বেশ অনুশীলন যোগ্য।

২৩। উপাখ্যানমূলক গীতিনাট্য।

এই শ্রেণীর ৫ খানি গীতি-নাট্যের মধ্যে "বাসর" খানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরব্যদেশের কুসুম-উদ্যান হইতে নিপুণ মালাকর গিরিশচন্দ্র তিনটী অপরূপ ফুলের তোড়া সংগ্রহ করিয়া নাট্যামোদী সুধীবৃন্দকে উপহার দিয়াছেন। "আলাদিন" গীতি-নাট্য খানি "আশ্চর্য্যপ্রদীপ" গল্প হইতে আবুহোসেন "আবুহোসেন" বা "একরাত্রির বাদসাহী" হইতে গৃহীত। এই দুইখানি গীতিনাট্য এখনও পর্য্যন্ত সমভাবে দর্শকবৃন্দের তৃপ্তি-সাধন করিয়া আসিতেছে। 'আবুহোসেনে' গিরিশচন্দ্র 'মস্তর' ও 'ঘাই' নামক যে দুইটি নৃত্যগীত-কুশল নরনারীর অবতারণা করেন তাহারই অনুকরণে পরবর্ত্তী নাট্যকারগণ স্বস্বরচিত গীতনাট্যে একজোড়া ঐরূপ স্ত্রীপুরুষের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। 'আবু-হোসেনে' আবু ও তদীয় পত্নী রোসেনার বাদসাহ ও বেগমকে মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন বিশেষ হাস্যজনক। ইহাতে দরবেশগণের মুখে "রাম রহিম না জুদা করো, দিলকো সাচ্চা রাখো জী" গীতটী সার্ব্বজনিক ধর্ম্মভাবাত্মক। আমরা নিম্নে সম্পূর্ণ গানটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"রাম রহিম না জুদা করো,
দিলকো সাচ্চা রাখো জী;
হাঁজি হাঁজি কহতে রহো,
দুনিয়াদারী দেখো জী।
জব্ যেসা তব্ তেসা হোয়ে,
দেগা মগজমে রহেনা জী;
মাটিমে ইয়া বদন মিল যায়ে,
ইয়াদ-খুদাকো ভুলনা জী।
জবতক সকো করম্ করো ভাই,
জিস তিস কামমে মানা জী,
কেচ্ জানে কবরম্ ছুটে গা,
উস্ কো নেহি ঠিকানা জী।
দুসমন তেরা সাথ্ দিয়া,
দেখো ভাই সব-লোকো জী,
দুসমনসে বাঁচনা-ওয়াদে,
ইন্‌সিয়ার নেই কো জী।"

কবিবর বলিতেছেন, প্রাণকে সাচ্চা রাখিয়া রাম রহিমের প্রভেদ করিও না। ভেদবুদ্ধি কার্য্যনাশিকা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে এই দেহ মাটি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। দুসমনের হাত হইতে রক্ষা করিতে তিনি ভিন্ন আর অন্য গতি নাই। কি সুন্দর উপদেশ!

"পারিসনা" বা পারসাপ্রসূন, আরব্যোপন্যাস হইতে গৃহীত শেষ পুষ্পগুচ্ছ। ইহাতে রূপসী ক্রীতদাসী পারিসনার সহিত সুকন্দীনের প্রেম-প্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে। বাজারে বিক্রয়ার্থ আনীতা বালিকা পারিসনা যখন নিজের অবস্থা ও অদৃষ্টলিপি জানিয়া মনোদুঃখে গাহিতেছে যে তাহার প্রাণ নাই, যে তাহাকে মূল্য দিয়া খরিদ করিবে সে তাহারই হইবে। সে তাহাকে যত্ন করুক আর নাই করুক তাহার ত কিছু বলিবার নাই। কেহ গোলাপের গন্ধে মশগুল হইয়া তাহার কদর করে, আবার কেহ বা তাহাকে ভূমিতলে ফেলিয়া দেয়; গোলাপের মালিক তাহাকে যেরূপ অবস্থায় রাখে, সে ঠিক সেই অবস্থাতেই থাকে। সেইরূপ আমার মালিক আমাকে যে ভাবে রাখিবে, সেই ভাবেই আমাকে থাকিতে হইবে। যাহা হউক পারিসনার জীবন পরিশেষে সুখে কাটিয়াছিল।

"মনের মতন" মিলনান্ত নাটক। পারসা উপন্যাস হইতে গৃহীত। কাউলাদ্ ও বেলদারের মধুর প্রণয় কাহিনী ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। ক্লাসিক বিদ্যা-

টারে ইহার অভিনয় হইয়াছিল। বিরহের অগ্নি-পরীক্ষার পর প্রেমিক প্রেমিকার মধুর মিলনে এই নাটকের উপসংহার।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, এই শ্রেণীর নাটকাবলীর মধ্যে "বাসর" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা গিরিশ-চন্দ্রের অপেক্ষাকৃত আধুনিক রচনা। হারুণ অল-রসিদ যেমন মুসলমান আখ্যায়িকা রচয়িতৃগণ কর্ত্তৃক আদর্শ মুসলমান নরপতিরূপে চিত্রিত হইয়াছেন, ভারতের বিক্রমাদিত্যও তদ্রূপ হিন্দুদিগের আদর্শ নরপতি। এই আদর্শ প্রচারক বিক্রমাদিত্যের জীবনের একটী ঘটনা লইয়া এই নাটক লিখিত।

"লক্ষ্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ
দৈবোঽপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ
• • •
ললাটলেখা ন পুনঃ প্রযাতি।"

এই সমস্যার পূরণ 'মহারাজ বিক্রমাদিত্য যে ভাবে সম্পন্ন করেন, প্রবীণ নাটককার এই নাটকে সেই ব্যাপার বর্ণিত করিয়াছেন। এই গীতিনাট্যের প্রস্তাবনায়,

'জয় জয় ভারত জননী
বিহঙ্গ-কূজিত, তরুকুসুমোদ্ভিত
ধ্বনিত বেদগীত, ধরিত্রী মুকুট মণি' গীতও
"জয় জয় ভারতমাতা, জয় মা"শ্যামা, ভারতী।
• • •
বাল্মিকী যাঁর গায় মা তোমার পুরা কাহিনী;
সাম গানে তপোবনে নিত্য তোমার আরতি।
করমা নরত্ব প্রদান
দে মা শক্তি, মাতৃভক্তি, কর গুণ গান,
গগনে সমীরণে উঠুক ঐক্যতান
শুনি আর্য্যভেরি, কাঁপুক অরি পুণ্যবীর-প্রভৃতি।"

গান অমর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গীতের ন্যায় চিরদিন বাঙ্গালীর দেশানুরোধকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে। আবার "ভুবনপূজ্য, আর্য্যরাজ্য সৌর্য্যবীর্য্য ভূষণ" গানটী ভারতের সুখসমৃদ্ধির অবস্থার পরিচায়ক। গঙ্গাধরের নব কুমারের জন্মোৎসব, বিধিলিপি ফলে ঐ কুমারের বিবাহ-রাত্রিতে বাঘ কর্ত্তৃক নিধন, বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক সেই মৃতদেহে প্রাণদান এবং রাজকুমারী বিদ্যাবতীর সহিত পাগল-বেশী বিক্রমাদিত্যের বিবাহ; মূর্খ অধ্যাপক জগন্নাথের পাণ্ডিত্য-প্রচার প্রভৃতি সকল বিষয়ই বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে।

২৪। সাময়িক ঘটনাবলী-সম্বলিত গীতিনাট্য।

পূর্ব্বেই এই শ্রেণীর গীতিনাট্যাবলী প্রসঙ্গে কোন সময়ে কি ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া এগুলি রচিত হইয়াছে তাহা উল্লেখ করা গিয়াছে।

'মহাপূজা' নামক দেশভক্তি-মূলক গীতিনাট্যের অন্তর্গত একখানি গীত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য; আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"নবজলদে গেঁথে মালা পরাব দুঃখিনী মায়,
ভক্তি-কমল বলি দিব মায়ের রাঙ্গা পায়।
শির ছিঁড়ি-উচ্চশিখা, মাতৃমন্ত্রে লব দীক্ষা,
তার স্বার্থমাগি ভিক্ষা, রব জননী সেবায়।
যে নামে দুরিত হরে, রাখ যতনে হৃদে ধরে,
অবনী তারে আদরে, জননী প্রসন্না যায়।"

দেশ-মাতৃকার সেবা করিতে হইলে—মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা লইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। ভারতে ভ্রাতৃভাব স্থাপনই মাতৃপূজার প্রধান উদ্দেশ্য। গিরিশবাবুর নিজের ভাষায় বলি,—'তদ্বিষয়ে সমস্ত ভারতবাসী যাহাতে রাজনৈতিক বিষয়ে একজাতি হয়, ভ্রাতৃভাবে কার্য্য করে, পরস্পর একতাবন্ধনে বদ্ধ ও পরস্পর বিশ্বাসে চালিত হয়, ইহাই মাতৃপূজা। প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিকদিগের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাদের স্বার্থ সাধন নয়—'স্বার্থবিসর্জ্জন।'

সংক্ষেপে গিরিশচন্দ্রের গীতিনাট্যাবলীর পরিচয় দেওয়া হইল। নাটক রচনায় তিনি যেরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছেন, গীতিনাট্য প্রণয়নে সেরূপ পূর্ণ-

কাম না হইলেও তাঁহার গীতি-নাট্যাবলীতে কোন-রূপ অশ্লীলতা বা পঙ্কিলতা নাই এ কথা আমরা নিঃসংকোচে বলিতে পারি। পূর্ব্বে যে দু একস্থলে কুরুচির কথা বলিয়াছি তাহা অবশ্য আধুনিক সুমার্জ্জিত রুচির পরিপন্থী নয় বলিয়াই ঐরূপ আখ্যা দিয়াছি; কিন্তু একথা ও স্মরণ রাখিতে হইবে তৎ-কালিন রুচি আধুনিক রুচির ন্যায় সুমার্জ্জিত ছিল না; আর কবিও সময়োচিত রুচির গণ্ডী পার হইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাকে ততটা দোষীও করা যায় না; কারণ মনীষীরা ভাবের অগ্রদূত, নূতন ভাব ও চিন্তার ধারা আপন আপন সমাজে ও দেশে প্রবা-হিত করিয়া দেন। তথাপি সর্ব্বত্রই যে তাঁহারা সংকীর্ণ সমাজ-গণ্ডীর পর পারে গিয়া থাকেন তাহাও নয়। আবার বলি আধুনিক রুচির কষ্টি-পাথরে যাচাই করিয়াই তাঁহার পরিহাসগুলিকে আমরা কুরুচি-সঙ্গত বলিয়াছি। আর ও ঐ কথা বলিবার প্রধান কারণ আমাদের উপাস্য দেবদেবী হরগৌরীর মুখে ঐ সকল পরিহাস শুনিয়া আমরা মর্ম্মাহত হই-য়াছিলাম বলিয়া ঐরূপ বলিয়াছি।

২৪। পৌরাণিক নাটক সম্বন্ধে গিরিশ চন্দ্রের অভিমত।

এইবার আমরা গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য নাট্যাবলীর পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব; কিন্তু তৎপূর্ব্বে পৌরাণিক নাটক সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে দেখাইব তিনি এ সম্বন্ধে কত উচ্চমত পোষণ করি-তেন। গিরিশচন্দ্র অন্য শ্রেণীর নাটক অপেক্ষা পৌরাণিক নাটকই অধিক ভালবাসিতেন, তাই অধিক সংখ্যক পৌরাণিক ও ধর্ম্মমূলক নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। যখন এক শ্রেণীর সমালোচকেরা উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, পৌরাণিক গীত-সঙ্কলিত নাটক রচিত হইয়া নাটকের দফারফা হইতেছে, ও যখন প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে গিরিশবাবুর উদ্দেশেই এই সকল ভিত্তিহীন শ্লেষোক্তি বর্ষিত হইতে লাগিল, তখন গিরিশবাবু 'পৌরাণিক নাটক'সম্বন্ধে এক সুচি-ন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহা 'বসুমতী'-প্রচারিত 'গিরিশ গ্রন্থাবলী'র তৃতীয় ভাগের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র মধ্যে আছে। এই প্রবন্ধ আমরা নাট্যালোচনাকারী সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমরা ঐ প্রবন্ধের সার মর্ম্ম যতদূর সম্ভব গিরিশবাবুর ভাষাতেই উদ্ধার করিয়া দিলাম:—

"জাতীয় বৃত্তি পরিচালিত ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতীয় হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম্মে ধর্ম্ম। দেশ হিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম্মস্পর্শ করিবে না। ভারত ধার্ম্মিক। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হল সঞ্চালন করিতেছে, তাহারাও কৃষ্ণনাম জানে, তাহাদেরও মন কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট। যদি নাটক সার্ব্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণ নামেই হইবে। ইংরাজীভাণে, বিদেশীয়-ভাণে যাঁহারা ভাণ করেন (তাঁহারা ভারতের মর্ম্ম বোঝেন না) সেই ভাণে জাতীয় উন্নতি কখনও হইবে না। জাতীয় হৃদয়ের উপর উন্নতির ভিত্তি। • • হিন্দু ধর্ম্মের উপর বহু বিরূপ প্রবাহ বহিয়াছে। • • (তথাপি) হিন্দুধর্ম্মমূল হিন্দু-হৃদয়, হিন্দুধর্ম্ম এতই বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে; অবস্থাগত প্রভাবে রাজ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে; তথাচ হিন্দুহৃদয়ে হিন্দুধর্ম্মের সমান আরাধনা। যাঁহারা নাটক হয় না বলেন, তাঁহারা বলেন এই যে, কে কোথায় কাকে মারিল, কাটিল, নাটকে ইহার বর্ণনা হউক। কোথায় কি সভা স্থাপনা হইল, কোথায় কি বক্তৃতা হইল তাহা লইয়াই হউক।" গিরিশবাবুর সহিত একমত হইয়া আমরাও বলি তাহা হইলে প্রকৃত নাটক রচিত হইবে না। জাতীয় নাটক, জাতীয় বিশেষত্বের পরিপন্থী—জাতীয় জীবনের মুকুর। নাটক পাঠ করিলে জাতীয় জীবনের ইতিহাসের ধারা বুঝিতে পারা যায়। নাটক জাতীয় গুণাবলীর ও বিশেষত্বের

পরিচায়ক। গিরিশচন্দ্র ইতিহাস হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া কি. লিখিতেছেন শুনুন,—"সকলেই জানেন, ফরাসী বড় প্রচণ্ড জাতি, কিন্তু তাহাদের নাটক পাঠে দেখিবেন যে নিষ্ঠুরতা পূর্ণ বিপ্লবে গঠিত (Revolution) ফরাসী হৃদয় কঠোর নিষ্ঠুরতাপূর্ণ নাটক ভাল বাসে। অনুবাদে আমরা বুঝি যে নিষ্ঠুর স্পেনেও সেইরূপ। ষাঁড়ের নিষ্ঠুর যুদ্ধ (Bull Fight) স্পেনের আমোদ হাস্যোদ্দীপক, স্ফূর্ত্তিদায়ক মিলনান্ত নাটক স্পেনের বিশেষ প্রিয় হইবে না। "ডনকুইকসট", লোকে বলে যাহার তুল্য হাস্যোদ্দীপক রচনা আর নাই, তাহার হাস্যও মানব প্রাণে উদ্দীপিত হয়।"

জাতীয় প্রাণের তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া নাটক লিখিত না হইলে সে নাটক কখনই জাতিকে আনন্দ দিতে ও শিক্ষা দিতে পারিবে না। হিন্দুস্থানবাসীর বিশেষত্ব কোথায়, গিরিশচন্দ্র ভালরূপে বুঝিয়াছিলেন তাই তিনি লিখিয়াছেন,—"হিন্দুস্থানের মর্ম্মে ধর্ম্মে ধর্ম্ম। মর্ম্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিত হইলে ধর্ম্মাশ্রয় করিতে হইবে।" এই মর্ম্মাশ্রিত ধর্ম্মের উচ্ছেদ সম্ভবপর নয়। তাহার পর তিনি দুঃখ করিয়া লিখিতেছেন, "মাথা কাটা লইয়া এমন কি নাটক লিখিবেন, যাহা ব্যাস-রচিত ভারতে নাই এমন পাঁচ সাতটা সেক্সপীয়ারকে আসিয়া লিখিতে হইবে, ব্যাস-রচিত ভারতে কি কি ভাব আছে। ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, ওথেলো, লীয়ার প্রভৃতি সেক্সপীয়ার-রচিত উচ্চশ্রেণীর নাটক। এ সকল কঠোর নাটকেও পিতাপেক্ষে মাতার মস্তকচ্ছেদন নাই, গর্ভস্থ শিশুবধ নাই এবং কোন জাতীয় কোন নাটক বা কবিতায় শুধু শিশুহত্যা অশ্রুধারারও মার্জ্জনা নাই। এই বিশাল ভাবাপন্ন কাব্যক্ষেত্র হইতে উদ্ধৃত নাটকের যিনি ঘৃণা করেন, তাঁহার বিরুদ্ধে এই মাত্র বলা যায় যে, তিনি কি বলিতেছেন, তাহা তিনি জানেন না!"

"যত জাতির যত উচ্চ গ্রন্থ আছে, সকলই পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।" "পৌরাণিক বলিয়া (mythological) যাঁহারা ঘৃণা করেন, কেবল মাত্র তাঁহারা জানেন না যে, পুরাণে যাহা আছে, তাহা কোন জাতীয় কবি-কল্পনায় অদ্যাপিও সৃষ্টি হয় নাই। রাম কল্পনা দেখিয়া, যিনি নাটকের ঘৃণা করেন, তাঁহাকে সকলের জানা একটি গল্প বলিব। কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলিল, "যদি তোমার সীতার অভিলাষ ছিল, রাক্ষসী মায়াপ্রভাবে কেন রামরূপ ধরিলে না?" রাবণ উত্তর করিল,—"আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু রামরূপ ধরিতে গেলে রামরূপ ভাবিতে হয়, সে ভাবনায়—তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূ প্রসঙ্গঃ পুনঃ। আরে মূঢ়, রামভাবনায় কি পরবধূর সঙ্গ ইচ্ছা থাকে?"

পুরাণ সম্বন্ধে তাঁহার এই উচ্চ মত ছিল বলিয়া তিনি পৌরাণিক নাটক লিখিয়া দেশের নিকট উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক বলিতে কি পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্র তাঁহার অন্যান্য নাট্য রচনা অপেক্ষা সমধিক কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলি প্রায়ই সর্ব্বরসের আধার। এগুলির গুণের তুলনায় তাহার ভিতর যে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষিত হয় তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। পক্ষান্তরে তিনি সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকে অনেকস্থলে পক্ষপাতিত্ব, একদেশদর্শিত্ব, ও আত্মম্ভরিতা (egotism) হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। শেষোক্ত রচনাগুলিতে অনেক সময়ে অবান্তর প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর নাটকগুলি যেন প্রকৃত নাটকীয় সৌন্দর্য্যে-রূপ খাঁটি নির্জ্জলা দুগ্ধে কলিকাতার গোয়ালার জল-সংমিশ্রণ। এগুলিতে রসের তরলতাও দৃষ্ট হয়। হাস্যরসাবতারণায় ও অনেক সময় গিরিশচন্দ্র স্বয়ং-কথায় যে রস ভালরূপ জমে (Brevity is the soul of wit) এ কথাটা সম্পূর্ণ মানিয়া চলেন নাই। অপ্রাসঙ্গিক ভাঁড়ামি বা অস্থানে প্রযুক্ত অতিরিক্ত হাস্যরসের ছড়াছড়ি এগুলিতে অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাট্যাবলী এ বিষয়ে অধিকতর দোষমুক্ত। (ক্রমশঃ

বংশের কলঙ্ক

(উপন্যাস)

(শ্রীসন্তোষকুমার বসু

নবম পরিচ্ছেদ

সন্দেহ-ভঞ্জন

"সরোজ, তুমি কি এখন বেরুবে? যদি না বেরোও, একবার লাইব্রেরি ঘরে এসো. একটা কথা আছে।" রামসদয়বাবু এই কথা বলিয়া সরোজনাথের উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই লাইব্রেরি-ঘরে চলিয়া গেলেন। সরোজনাথও কথাটা কি ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

উভয়ে বসিলে একখানা মহাভারতের পাতা লইয়া নাড়া চাড়া করিতে করিতে রামসদয় বাবু বলিলেন, "অনেক দিন থেকে একটা কথা ব'লব ভাবছি। বড় হয়েছো, এখন তোমার বোঝবার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। কোন লাইন চুজ্ (পছন্দ) করবে, কিছু ঠিক করেছ?"

সরোজ বিস্ময়াবিষ্টভাবেই বলিল, "লাইন? কি লাইন?"

রামসদয়বাবু বলিলেন, "আজকালকার ছেলেদের যদি একটু কমন সেন্স (সহজ বুদ্ধি) থাকে! বলি, এম, এ, পাশ করে কি করবে ঠাওরেছ? সংসারে ঢুকতে হবে ত'।"

সরোজ হতবুদ্ধির মত জবাব দিল, "তা ত কিছু ঠিক করি নি। পড়াচ্ছেন তাই প'ড়ে যাচ্ছি। কি কোরব আপনিই বলে দিন।"

"বেশ! তোমার কোন প্রোফেসান (কাজকর্ম) পছন্দ, তা আমি কি ক'রে জানব? তবে এ সম্বন্ধে আমার ভিউজ্ (মতামত) তুমি অনেকবার শুনেছ। আমার মতে ছেলেপুলে লেখাপড়া শেষ করেই একটা কাজের মত কাজে ঢোকে। তা বলে আমি তাদের উকীল ডাক্তার হ'তে বলি না, আর কেরাণী ত' নয়ই।"

"কেন?"

"কেন? ডাক্তার উকীল ঝুড়ি ঝুড়ি হচ্ছে, আর যার কিছু জোটে না, সেই হয় কেরাণী, না হয় ভূঁইফোঁড় জর্ণালিষ্ট বা অথর।"

"না, আমার ওসব হবার ইচ্ছে নেই। আমার ইচ্ছে করে, গুয়ালেস সাহেবের মত অমনই ক'রে চেয়ারে বসে প্রোফেসারি করতে।"

রামসদয়বাবু একটু মুখ বিকৃত করিলেন। পরে বলিলেন, "তা, প্রোফেসারি এসব প্রোফেসনের চেয়ে ভাল বটে, কিন্তু তা বলে এখনকার কালে দেশে যা বড় আবশ্যক হয়ে পড়েছে, সে লাইনের মত না। যা'ক, তোমার যেদিকে টেষ্ট (রুচি), সেই দিকে যাওয়াই ভাল অবশ্য পয়সা রোজগারের তোমার বিশেষ আবশ্যক নেই, কেন না তুমি জান আমার যা কিছু তা তোমাদের তিনজনকেই দিয়ে যাব।"

"ওসব বলছেন কেন? আমি—"

"চুপ কর। আমি যা বলি শুনে যাও। সব তোমাদের দিয়ে যাব বটে, তোমারও খাবার পরবার ভাবনা থাকবে না বটে, কিন্তু তা ব'লে ছেলেপুলের পয়সার অভাব না থাকলেই কুঁড়ের মত ব'সে ব'সে খাবে, এটা আমি একবারে লাইক (পছন্দ) করি নি। আরও বিশেষ কারণে আমি

তোমার মানুষ হবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছি।"

"কি ?"

"আমি তোমার অনিলার উপযুক্ত স্বামী করতে চাই।"

যদি সেই মুহূর্ত্তে ভীষণ ভূমিকম্পে সমস্ত বাড়ীটা টলিয়া যাইত, তাহা হইলেও বোধ হয় সরোজনাথ এত চমকিত হইত না। তাহার বুকের ভিতরের স্পন্দন এত অসময় দ্রুত হইল যে তাহার মনে হইল বুঝি এই মুহূর্ত্তেই তাহার হৃৎপিণ্ডটা ফাটিয়া বাহির হয়। তাহার মুখচোখ লাল হইয়া উঠিল, সর্ব্বশরীরের ভিতর দিয়া একটা তড়িৎ প্রবাহ বহিয়া গেল। সে কি শুনিল ? ইহা কি সত্য ? না, না, সে নিশ্চয় ভুল শুনিয়াছে। পথের কাঙ্গাল সে, তাহার ভাগ্যে এই নন্দনের সুরভি-কুসুম বিধাতা মিলাইয়া দিবেন ? অসম্ভব। সে নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখিতেছে। কিছুদিন হইতে যাহার চিন্তা অহরহ তাহাকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে, যাহার চিন্তায় তাহার সুখ, শান্তি, আশা, উৎসাহ অন্তর্ধান যাইবে, সেই স্বর্গের সুষমা-মাখা ভুবনসুন্দরী অনিলা কি তাহার হইবে ? যাহার মূর্ত্তিটী সে নিভৃত হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া ভালবাসার ফুলে-ফলে ষোড়শোপচারে পূজা করিতেছে, সেই তাহার জীবনতোষিণীর মানস প্রতিমা কি সত্যই সাকার বিগ্রহ ধরিয়া তাহার অপার অপরিমেয় অনন্ত প্রেমের পূজা গ্রহণ করিবে ? সরোজনাথ যেন কি একটা অজানা অচেনা মদিরার নেশায় বিভোর হইয়া সন্দেহাকুল কণ্ঠে কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এ্যাঁ, কি বলছেন আপনি ?"

রামসদয়বাবু তাহার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "কেন, শুনতে পেলে না কি ? না, কথাটায় কিছু হেঁয়ালি ছিল ? আমি আমার অনিলাকে তোমার হাতে দিতে চাই। কেমন, এইবার বেশ বুঝতে পারলে ? না, আর কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে।"

অতিরিক্ত আনন্দে লোকের যাহা হয় সরোজেরও তাহাই হইল। তাহার কেমন মাথা টলিয়া গেল, সে কি জবাব দিল, তাহা সে নিজেই বলিতে পারে না। তবে রামসদয়বাবু তাহার আনন্দাতিশয্য দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। লোকে পৃথিবীর রাজত্ব পাইলে অথবা সংসার-ত্যাগী যোগী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে যে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হয়, সরোজের মুখে চোখে তিনি সেই আনন্দের বিকাশ দেখিলেন। সত্যসত্যই তিনি পরম সন্তোষলাভ করিলেন। বস্তুতঃই তিনি এই সুকুমার তীক্ষ্ণধী মেধাবী সুশীল বালককে বড়ই ভালবাসিতেন এবং কিছুকাল হইতে তাহাকেই অনিলার একমাত্র উপযুক্ত পতি বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহের পুত্তলী অনিলা এই উপযুক্ত পুরুষের হস্তে ন্যস্ত হইয়া তাঁহার অবর্ত্তমানে সুখী হইবে, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে দৃঢ়মূল হইয়াছিল। তাই তিনি স্বেচ্ছায় বন্ধু কালীশঙ্করের নিকট প্রতিশ্রুতির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, অন্ততঃ তিনি মনকে ভুলিয়া যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত করিতেছিলেন।

এখন অনিলার প্রতি সরোজের গভীর ভালবাসার পরিচয় পাইয়া ঐ বিষয়ে তিনি আরও দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। সস্নেহে সরোজের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "থাক, থাক, আর বলতে হবে না, আমি বুঝেছি। এখন ভরসা করি, নিলাও তোমার এই ভালবাসার উপযুক্ত হ'ক। নিলাকে তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব কবিন থেকে কথাটা বলব ব'লে কেবল মনে তোলাপাড়া—"

তাঁহার কথাটা আর শেষ হইল না। যাহাকে লইয়া এত কথা, সেই নিলা একজনের হাত ধরিয়া টানিয়া ঠিক সেই মুহূর্ত্তে লাইব্রেরি ঘরে প্রবেশ

করিল। লোকটী আর কেহ নহে, স্বয়ং কালীশঙ্কর বাবু। তিনি বলিতেছিলেন, "ওরে পাগলি, ছেড়ে দে। আমি বুড়ো মানুষ আমি কি তোদের সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ করতে পারি?"

অনিলা তাঁহার কথা সাঙ্গ হইতে না দিয়াই উচ্চহাসির রোল তুলিয়া বলিল, "দেখ বাবা, জেঠামণি কি দুষ্টু! তোমার সঙ্গে দেখা না করে আর আমার রান্না না খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তুমি এখানে একটা কি না কি ভারী দরকারি কাজে রয়েছ? কারুর সঙ্গে এখন দেখা করবে না বলে দিয়েছো? ওঃ সরোজদার সঙ্গে কাজ, ভারি মস্ত কাজ, হাঃ হাঃ হাঃ!"

তাহার সরল উদার হাস্যে সকলেরই গম্ভীরতা রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিল। সরোজের অবস্থা বর্ণনাতীত। তাহার মুখ নবীন আশায় উৎফুল্ল হইলেও বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। এইমাত্র সে যে আশারবাণী শুনিয়া সারা জগৎটাকে আনন্দময় ও হাস্যময় দেখিতেছে, সে জগতে বালিকার এই হাসি যেন কেমন বেখাপ লাগিল, যেন যে সুরে সেই আশার গোলাপী নেশায় বিভোর জগৎটা বাঁধা, সে সুরে অনিলার এই হাসি, এই 'সরোজদা' সম্বোধন বে-সুরা লাগিল। সে এখনও স্বর্গরাজ্য হইতে ফিরে নাই, তাই সে এখনও অনিলার দিকে চাহিতে পারিল না, দৃষ্টি অবনমিত করিয়া রাখিল।

রামসদয়, কালীশঙ্করবাবুকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কখন এলে? বাঃ সত্যি না দেখা করে চলে যাচ্ছিলে? বেশ ত? আমার আজ তোমার সঙ্গে দেখা করবার বিশেষ দরকার আছে, ভালই হয়েছে, এখানে এসেছো।"

কালীশঙ্করবাবু একখানি আসনে উপবেশন করিলেন, অনিলা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার ঘড়ির চেইনটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। রামসদয়ের প্রশ্নের উত্তরে কালীশঙ্কর হাসিয়া বলিলেন, "আর কি যাবার যো আছে, দেখছ না, কি ছিনে জোঁক লেগেছে—"

"হুঁ, আমি বুঝি জোঁক হলুম?"

"না, না, পাগলী, তুমি কেন জোঁক হ'তে যাবে, তুমি যে আমার মা লক্ষ্মী! এখন মা লক্ষ্মী কি কি রেঁধেছ বল দিকি?" কালীশঙ্করের চোখে মুখে অপূর্ব্ব বাৎসল্য স্নেহ ফুটিয়া উঠিল। অনিলা এইবার তাঁহার জামার বোতাম লইয়া খেলা করিতে করিতে মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "বোলবো কেন? না খেয়ে পালাচ্ছিলে কেন? বল, আজ আমাদের দক্ষিণেশ্বর দেখিয়ে নিয়ে আসবে? বল না, জেঠামণি!" অনিলা এই বলিয়া তাঁহার ঘড়ি ও চেইনটা খুলিয়া লইয়া নিজের বুকে পরাইবার ভাণ করিতে লাগিল। কালীশঙ্কর বাবু হাসিয়া উঠিলেন। সরোজের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিলেও সে মুখ অবনত করিয়া রহিল। সেই স্থানে থাকা তখন তাহার পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিজনক বোধ হইতেছিল। রামসদয়বাবুও হাসিলেন বটে, কিন্তু কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন,—"আঃ কি করিস নিলা! তোর ছেলে মানুষি গেল না! দেখ দেখি তোর জেঠামণি কত বিরক্ত হচ্ছেন!"

উত্তরে নিলা আস্তে আস্তে উঠিয়া তাঁহার নিকটে গেল, হঠাৎ তাঁহার চোখের চসমাটা খুলিয়া লইয়া নিজের নাকে পরাইল এবং একটা আঙ্গুল তুলিয়া শাসাইবার ভাণ করিয়া বলিল, "দুষ্টু ছেলে! আমার কথার উপর কথা! আজ খেতে দেবো না দেখো দিকি। আমার উপর বিরক্ত হয়েছে! কে সে? জেঠামণি? দেখি, কেমন রাগ করেছে?"

এই বলিয়া নিলা আবার ছুটিয়া কালীশঙ্কর বাবুর কাছে গেল এবং দুইটা আঙ্গুলে তাঁহার চিবুক উত্তোলন করিয়া এমন কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত তাঁহার চোখের দিকে চাহিল যে সকলে হো হো হাসিয়া উঠিলেন।

কালীশঙ্করবাবু সস্নেহে অনিলার ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কুন্তলের উপর হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে রামসদয়বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ, কি বল্‌তে এলুম সব ভুলে গেলুম। এ পাগলী ত কথা কইতে দেবে না।"

অনিলা কৃত্রিম কোপে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "কি বল্‌বে বল না, আমি না হয় চলে যাচ্ছি, হুঁ! যাই, আমার সেই ঘোড়াটার কল ঠিক করে দিইগে, আমি সেইটে নাড়াচ্ছি।"

কালীশঙ্করবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মা যেখানে ছেলেও সেখানে যাবে। ছেলেকে না খাইয়ে চলে যাবি, কেমন দুষ্টু মা তুই?"

রামসদয়বাবু এই সময়ে বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ কালী, কি বলছিলে তুমি? আমারও একটা কথা আছে, পরে বোলবো।"

কালীশঙ্কর বলিলেন, "বল্‌ছিলুম অরুণের কথা।"

কি আশ্চর্য্য! এই এতক্ষণ অনিলা চঞ্চলা বালিকার মত কত ছুটাছুটি, কত আবদার, কত অভিমান করিতেছিল, তাহার হাসির লহরে সারা ঘরটা ভাসিয়া যাইতেছিল; কিন্তু কালীশঙ্করবাবুর এই কথাটা শুনিবামাত্র তাহার সেই চঞ্চলতা যেন যাদুকরের ভেল্কীবাজীর মত কোথায় উপিয়া গেল, সে হাসি কোথায় লুকাইল, সে স্থির হইয়া একস্থানে বসিয়া পড়িয়া চেয়ারের একটা হাতলা লইয়া খুটিতে লাগিল, এবং আরক্ত মুখখানি অবনত করিয়া রহিল। বহুপূর্ব্বেই—অনিলার কক্ষ প্রবেশ কাল হইতেই—সরোজের ঠিক এই অবস্থাই হইয়াছিল, সে মুখ তুলিয়া একবারও কাহারও পানে চাহিতে পারিতেছিল না। রামসদয়ের দৃষ্টি কালীশঙ্করের উপর ন্যস্ত ছিল; সুতরাং তিনি অনিলার এই ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেন নাই। কেবল অনিলা একজনের দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না, তিনি কালীশঙ্কর। তিনি কথা কহিতে ছিলেন রামসদয়ের মুখ পানে তাকাইয়া, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি বরাবরই অনিলার মুখে ন্যস্ত ছিল। অনিলার এই ভাব পরিবর্ত্তনে তিনি যে পরমানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার তৃপ্তিপূর্ণ মুখের হাসির রেখা দেখিলেই সহজেই অনুমান করা যায়।

অরুণের নাম হইবামাত্র রামসদয়ের মুখে কিন্তু বিরক্তির ও অসন্তোষের চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিল। তিনি মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "অরুণের কথা? কি বল্‌বে তার কথা? তার বীরত্বের কথা শুনে শুনে কাণ ঝালাপালা হ'য়ে উঠেছে।"

কালীশঙ্করবাবু একটু অভিমানাহত স্বরে বলিলেন, "আর বেশীদিন তার কথা শুনে ঝালাপালা হ'তে হবে না, সে শিগ্‌গীরই তোমাদের কাছে বিদেয় নিয়ে যাচ্ছে—"

কথা শেষ হইল না, রামসদয়কে কথা কহিবার অবসর না দিয়াই সরোজ হঠাৎ চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া কালীশঙ্করের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "অরুণ চ'লে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, কবে যাচ্ছে? আমায় ত কিছু বলেনি!"

কালীশঙ্কর বাবু সরোজের উৎকণ্ঠা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। একবার আড়ে আড়ে অনিলার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, সেই হাসি হাসি মুখখানি মলিন হইয়াছে। কালীশঙ্কর কিন্তু তাহাতে দুঃখিত না হইয়া আনন্দিত হইলেন। অনিলার সামান্য কষ্ট দেখিলে যাহার হৃদয়ে শেলাঘাত হয়, আজ তাঁহার এ ভাব কেন? কে জানে!

কালীশঙ্কর বুড়া বড় দুষ্ট। আরও নিরপেক্ষিত-রূপে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি সরোজের কথার উত্তরেই বলিলেন, "সরোজ, দুঃখু করো না। সে নিজেই জানে না। জানলে তোমায় আগে না ব'লে থাকতে পারত না। তবে যাওয়া তার ঠিক। বিলেতে নয়, আসাম সীমান্তে, সেই আবর-দেশের কাছে।"

এবার রামসদয় বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আবর দেশ ? সে ত' ভয়ানক জায়গা, সেখানে বনের পশুর চেয়েও হিংস্র মানুষ, তারা মানুষ মারাটা খেলার মধ্যেই ধরে। সেখানে পাঠাচ্ছ অরুণকে, তার মানে কি ?"

অনিলা একবার কৃতজ্ঞ নয়নে পিতার মুখপানে তাকাইয়া তৎক্ষণাৎ চক্ষু নামাইয়া লইল। মুহূর্ত্তের জন্য সে দৃষ্টি, কিন্তু সেই দৃষ্টি টুকুও ছই বুড়া কালীশঙ্করের চক্ষু এড়াইল না।

কালীশঙ্কর বলিলেন, "না পাঠিয়ে করি কি ? তোমরা কেউ তাকে চাও না, (কথাটা বলিবার সময়ে কালীশঙ্করের গলা একটু কাঁপিল, অনিলার মুখে চোখেও একটা যাতনার চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিল), ইদানীং সে তোমাদের চক্ষুশূল হয়েছে, তার নামে তোমরা কত কথাই শুনছ, কাজেই তাকে এখান থেকে ধরান ছাড়া তার স্বভাব পরিবর্ত্তনের আর কোনও উপায় দেখছি না।"

রামসদয় বাবু বলিলেন, "তা, আবর দেশ ছাড়া আর কোথাও কি পাঠাবার স্থান নেই ?"

"না আপাততঃ ত' দেখতে পাচ্ছি নে। বিশেষতঃ কেনেডি সাহেব বলেছেন, এই রকম স্থানে পাঠালে ছেলেরা যথার্থ মানুষ হ'তে পারে। হাঁ মা, তুমি যে বলেছিলে অমির ঘোড়া সারাতে যাবে, কই গেলে না।"

বুড়ার দুষ্টামি বুদ্ধিটা যেন বেশী করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। অনিলা ক্ষণেক বিহ্বলের মত তাঁহার মুখপানে ফেল ফেল করিয়া তাকাইয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল, "এঁ্যা, কি বল্‌ছিলে জেঠামণি ?"

কালীশঙ্কর বাবু হাসিয়া বলিলেন, "না, কিছু বলিনি। কেনেডি সাহেবের ইচ্ছে, সেইখানে আমাদের করাত-কলের কারখানার মেনেজমেণ্ট ওর হাতে দেন। বড় দুর্দ্ধর্ষ সেখানকার জমাদার মেট আর কুলি মজুর, তাদের যদি বশ ক'রে কাজ চালাতে পারে, তবেই যথার্থ মানুষ হবে। শুধু ঐ কল নয়, ওর কাছে আমাদের একটা চা-বাগানও আছে, সেটাও ওকে দেখতে হবে। প্রায় পাঁচ শো লোক দু জায়গায়। এত লোককে তাঁবে রেখে চালান, এতে কম বুদ্ধির ও শাসন-শক্তির দরকার করে না।"

রামসদয় বাবু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা বেশ। ছেলে বিদেশে মানুষ হ'তে গেলে যে ভূ-ভারত উল্টে যাবে, এমন কিছু কথা নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, পারবে ত' ? যে এই ভোগ বিলাসের মধ্যে থেকেও অলস অকর্ম্মণ্য, সে সেই জঙ্গলের কষ্ট সহ্য করতে পারবে ত' ? বিপদ আপদও সেখানে কম নয়।"

কালীশঙ্কর বলিলেন, "না, তা কম নয় জানি। ঘোর কালা জঙ্গল, সাপ, বাঘ, হাতী,—ভয় কিসে নেই ? আবার বুনো পাহাড়ী আবর মিসমিরা, কাঁচা মাথা কেটে মালা করে ঘরের দোরে ঘরের নিশানা রূপে টানিয়ে রাখে। কিন্তু এসব জেনে শুনেও পাঠাচ্ছি।"

এই কথা বলিয়া কালীশঙ্কর একবার মুহূর্ত্তের জন্য অনিলার দিকে আড়ে আড়ে তাকাইয়া লইলেন। তিনি দেখিলেন, অনিলার সেই ছুটন্ত ফুলের মত সুন্দর রাঙ্গা মুখখানি ভয়ে বা উৎকণ্ঠায় বা যে কারণেই হউক একবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তাহার শ্বেতপদ্মের মত কোমল ও সুন্দর কপোলের উপর অলক্তক যে দুটী গোলাপ ফুটিয়া থাকিত, তাহা কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। বুড়ার কিন্তু মহা আহ্লাদ!

সরোজ উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, জেনে শুনে পাঠাচ্ছেন কেন ?"

রামসদয় নিজেই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "কেন ? কাজ শেখবার জন্যে, মানুষ হবার জন্যে। পাঠানতে আমি কোন ও দোষ দেখিনি। আমার ভয়, কাজ করতে পারবে কি না ?"

সরোজ পরম উৎসাহে দৃঢ়স্বরে বলিল, "কাজ

পারবে না, অরুণ কাজ পারবে না? দেখে নেবেন, আমি এখনই বলে রাখছি, সে যে কাজে হাত দেবে সেই কাজেই সফল হবে। তার মত লোক বশ করতে কে চায়?"

আবার অনিলার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি সরোজের উপর নিপতিত হইল, আবার কালীশঙ্করের গুপ্ত প্রশংসমান দৃষ্টির পর অনিলার সেই দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না।

রামসদয় বাবু বলিলেন, "বেশ, সে ত' ভাল কথা। সে যদি এত গুণবান হয়, তা'হলে তাকে পাঠাবার আর আপত্তি কি? ঘরের কোণে মেয়ে মানুষের মত ছেলেকে আগলে বসে থাকতে হবে, এমন ত' কিছু কথা নেই। পুরুষ বেটা ছেলে সংসার সংগ্রামে কত বিপদে আপদে পড়বে, কত ঝড় ঝাপটা খাবে, তবে ত' সে মানুষ হবে।"

"আর মেয়ে মানুষ?"—এতক্ষণে অনিলার মুখ হইতে হঠাৎ এই কথাটা বাহির হইয়া গেল। সে কথাটায় কেমন যেন একটা অনাস্থার সুর মাখান ছিল।

রামসদয় বাবু বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কেন নিলা, মেয়ে মানুষ কত কোমল, কত দুর্ব্বল, তা কি তুমি জান না? সংসারের ঝড় ঝাপটা হ'তে তাদের রক্ষা করাই ত' পুরুষের ধর্ম্ম।"

অনিলা ক্ষুব্ধ ও অভিমানাহত স্বরে বলিল, "আমরা, তা হলে কিছুই না? কাল থেকে তা হলে তুমি রান্না-বান্না আর ঘর করা কোরো।"

সকলে হাসিয়া ফেলিলেন। রামসদয় বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওরে পাগলী, ও যে ভিতরের ঝড় ঝাপটার কথা, আমি যে বাইরের জগতের ঝড় ঝাপটার কথা বলছি।"

অনিলা গম্ভীরভাবে জবাব দিল, "বাইরের জগতের ঝড় ঝাপটা বুঝি পুরুষ মানুষের একচেটে? তা হলে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী বৈদ্যা বাইরের জগতের ঝড় ঝাপটা কিছুই ভোগ করেন নি? দ্রৌপদী রাজরাণী হয়েও বনের কষ্ট ভোগ করেন নি?" বলিতে বলিতে অনিলার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সকলে বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে অনিলার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। রামসদয় বাবু কণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তা মা, তাঁরা মহিয়সী আর্য্যমহিলা, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।"

অনিলা বাধা দিয়া বলিল, "শ্রীরামচন্দ্র সত্যবান নল হরিশ্চন্দ্র ও মহিয়ান আর্য্যপুরুষ ছিলেন বলেই মহিয়সী আর্য্যমহিলা লাভ করেছিলেন।"

তর্কটা গুরুগম্ভীর হইয়া যায় দেখিয়া কালীশঙ্কর বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা মা, আগে তোমার একটা শ্রীরাম নল হরিশ্চন্দ্র পতিকের মহিয়ান আর্য্য বর ঠিক করি আমরা, তার পরে তুমিও মহীয়সী আর্য্য মহিলা হোয়ো, ঝড় ঝাপটাও সহ্য কোরো। কি বল?

অনিলার মুখ চোখ লজ্জায় রক্তবর্ণ ধারণ করিল, সে কৃত্রিম কোপের সহিত তাহার জেঠামহাশয়ের দিকে তাকাইয়া বলিল, "যাও। তুমি বড় দুষ্টু, তোমার সঙ্গে কথা কইবো না।" অনিলা ছুটিয়া ভিতরে পলাইয়া গেল। কালীশঙ্কর স্নেহপরিপূর্ণ নয়নে দেখিলেন যেন একটী পল্লবিনী সঞ্চারিণী লতা তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। যেখান দিয়া গেল, সেই স্থানটায় যেন স্বর্গের সুষমা ঝরিয়া পড়িল। কালীশঙ্করের অন্তরের নিভৃত কোণে সযত্নে লুক্কায়িত আকাঙ্ক্ষা ঘৃতাহুত জাতবেদার মত সপ্ত জিহ্বা সম্প্রসারণ করিয়া সর্ব্বগ্রাস করিতে উদ্যত হইল। এই মনীয় পুতলী যদি তাঁহার ঘর আলো করিতে না আসে, তাহা হইলে ধিক তাঁহার অর্থে, ধিক তাঁহার সামর্থ্যে, ধিক তাঁহার প্রতিপত্তিতে।

তিনি তন্ময় হইয়া অনিলার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়াছিলেন, হঠাৎ শুনিলেন রামসদয় বাবু সরোজকে একবার অন্তঃ যাইতে বলিতেছেন, সরোজও চলিয়া যাইতেছে।

(ক্রমশঃ)

প্রেম

(গল্প)

(শ্রীলীলা দেবী)

সত্যময়ীর কথা

যেদিন প্রথম তাঁর প্রতি আমার ভালবাসার সূচনা, সেদিন বসন্ত সমাগমে যৌবনশ্রী উদ্বেলিত বিশ্বপ্রকৃতি কি এক অপূর্ব্ব মহিমাতেই পরিপ্লুত হ'য়ে উঠেছিল। জীবনের যে মুহূর্ত্তে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিবার প্রবৃত্তি এই ক্ষুদ্র মনটার সবটুকু অধিকার ক'রে ফেলেছিল, সে এক বড় শুভ মুহূর্ত্ত! তাঁর সম্বন্ধে কত লোকের মুখে কত রকম শুনেছি কিন্তু নানামতের নানা ভাবগুলো আমায় তৃপ্ত ক'রতে পারেনি। যে রস সমস্ত কায়মনোবাক্যে উপলব্ধি করবার জন্যে প্রাণটা উন্মুখ ও উদ্‌গ্রীব, অভিব্যক্তির ব্যর্থ চেষ্টায় অক্ষরগুলো যেখানে সম্পূর্ণ নিরর্থক হ'য়ে গেছে, কেবলমাত্র সেইগুলোতে কি সে রসের কথঞ্চিৎও উপলব্ধ হইতে পারে?

দর্শন চাই! প্রত্যক্ষ অনুভব চাই! অস্তিত্বের প্রতি অণুপরমাণু সেই রসের সাগরে নিমজ্জিত হ'য়ে গেলে তবে তো শান্তি!! আমার সখী রজোময়ী কতদিন আমায় বলেছে—"আর কেন অনির্দ্দিষ্টের উদ্দেশে মরুভূমির মত শুষ্ক ও উত্তপ্ত দিনগুলো যাপন করা, রাজা অত্যুগ্রসেনের প্রণয় ভিক্ষা অবহেলা ক'রে একজন মনঃকল্পিতের প্রতি অযথা অনুরাগিণী হওয়া তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অনুচিত।" তা ছাড়া সে একথাও ব'লেছে যে পুনঃ পুনঃ রাজাকে কোপান্বিত ক'রলে অনিষ্টপাতেরই সম্ভাবনা। কিন্তু রজোময়ীর এসব উপদেশেও আমার চিরন্তন নেশার ঘোর কাটেনি। সে যখন বারবার ব'লত তখন তাকে কতবার ব'লেছি—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ
সর্ব্বস্মাৎ অন্তর তরং যদ যমাত্মা॥

এ কথার উত্তরে রহস্য পরিহাস ভিন্ন রজোময়ী কখন গ্রাহ্যর মধ্যেই আন্‌তো না। এ পর্য্যন্ত তাকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারলুম না যে, হৃদয় সেই অদেখা, অজানা, অচেনার উদ্দেশে সমর্পিত হ'য়ে গিয়েছে সহস্র উপরোধেও তা আর ফিরবে না। দুরাগ্রহ অত্যুগ্রসেনের সম্পদভাগিনী হবার জন্যে অসংখ্য রমণী সানন্দচিত্তে প্রস্তুত আছে, তাঁর কামনা পরিমূর্ত্তির অভাব কি? আমার মত কুটীরবাসিনী আশ্রমকুমারী তপস্বিনীর প্রতি তাঁর দুঃপ্রবৃত্ত হৃদয়কে দমন করা উচিত একথা ব'লতেও ক্ষান্ত হয়নি।

সত্যি ব'লছি, আমার আর কিছুই ভালো লাগে না! কবে যে তাঁর দেখা পাবো তা কে ব'লতে পারে? শুনেছি তিনি "অবাঙ মনসো গোচরম্" কিন্তু মাঝে মাঝে যখন দুর্দ্দমনীয় অশান্ত হৃদয়ে প্রিয় সমাগমের জন্য উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে তখন আমার সেই অসীম অরূপ প্রণয়ীকে রূপ কল্পনায় সসীম শান্ত ক'রে নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করি। আহা! নবনীরদকান্তি প্রেমপূর্ণিত মুখচন্দ্রের কি সেই অত্যুজ্জ্বল শোভা! কিন্তু তাতেও কি দারুণ পিপাসার নিঃশেষ আছে? কল্পনায় আমার ক্ষোভ মিটবে না আমি যে প্রত্যক্ষ রূপে চাই। ওগো চির-সুন্দর! আমার নিত্য প্রেমের নিত্য ভিখারী! ওগো আমার চির-জীবনের চির-সাথী! আর যে এ বিষম বিরহ বেদনা সহ্য হয় না।

ত্রিগুণাতীতের কথা

সত্বময়ীর ভক্তিতে আর আমি স্থির হ'য়ে আত্ম গোপন ক'রতে পারছি না। স্বপ্রকাশ না হ'লে সে আমায় ছাড়বে না। সত্বময়ীর মত অনুরাগ কি সহজে দেখা যায়? তার ভালবাসা এত প্রগাঢ় যে আমার ত্রিভুবনব্যাপী বিরাট বিশাল বক্ষটা তার প্রেমের আহ্বানে অহর্নিশি কম্পিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। তার শিশুর মত নির্ভরশীলতা আমায় মাঝে মাঝে এত বিহ্বল ক'রে তোলে যে তার অগোচরে তাকে আমি কোলে নিয়ে সেই সুগভীর নিটোল ললাটে সহস্রবার চুম্বন করি। সে যেন দিন দিন আমার প্রাণস্বরূপ চেতনস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। তাকে আর এক মুহূর্ত্তও ছাড়তে বাসনা হয় না।

সত্বময়ীর কথা

বিরহরূপ মত্ত হস্তী আমার সমস্ত হৃদয়-গ্রন্থি যেন ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়েছে। বিরহ-হুতাশনে সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে তবুও তো কই নিষ্ঠুরের দেখা পেলুম না? আশা নিরাশার বীচিবিক্ষোভে এক এক সময় এই ব্যর্থ দেহটার উপর এমন বিতৃষ্ণা আসে! যাঁকে দর্শনের জন্য এ শরীরের প্রয়োজন, যাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য কষ্টসাধ্য সুদীর্ঘ বৎসর গুলো অশ্রান্তভাবে এ দেহভার বহন ক'রে আসছে তাঁকেই যদি না পেলুম তবে আর কেন বেঁচে থাকা? কিসের প্রয়োজনে?, এতদিন যদি পেলুম না তবে আর কখনও যে পাবো তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? তার চেয়ে না হয় তাঁকে পাবার কামনা নিয়ে প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করি, সেই কি সব চেয়ে সুযুক্তি নয়? কিন্তু দুঃখ যখন অতিমাত্রায় প্রপীড়িত ক'রে তোলে সেই কি দুর্দ্দিনের শেষও সুখের প্রারম্ভ নয়? কাল থেকে কেন আমার এতখানি আশার সঞ্চার হ'চ্ছে? চারিদিক থেকে শুভ লক্ষণের নিদর্শনগুলো আমার বিরস বিকল জীবনটাকে অনেকখানি ভরসা দিয়ে মরণের পথ থেকে যেন সজোরে ফিরিয়ে দিচ্ছে। উদয়াস্ত পর্য্যন্ত নানারঙের নানা ছাঁদের মেঘগুলো যেন প্রিয়তমের দূত হ'য়ে কত কথাই ক'য়ে আমায় আশ্বাস দিয়ে ভেসে চ'লেছে, ফুলে ফুলে ভরা গাছগুলো যেন তাঁরই মাথার টোপর হবে ব'লে আনন্দে হাসচে। সবাই যেন কথা কইছে, সবাই যেন চৈতন্যময় হ'য়ে তাঁরই শুভাগমনের বার্ত্তা জানাচ্ছে।

ভক্তমাল পাঠ ক'রতে ক'রতে একটু তন্দ্রাবেশ এসেছিল। আচম্বিতে চতুর্দ্দিক আলো ক'রে জ্যোতির্ম্ময় এক সন্ন্যাসীমূর্ত্তি আমার সম্মুখে এসে ব'ল্লেন—"অনন্ত প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরকে কাল তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন করবে, শুধু আজকের দিনটা অপেক্ষা করো।" মুহূর্ত্তের মধ্যে নিদ্রালস-জড়িত চক্ষু দু'টো যখন উন্মিলিত হ'লো তখন আশার আনন্দে সমস্ত শরীর স্বেদার্দ্র রোমাঞ্চিত হ'য়ে হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুত তালে নাচ্‌ছে।

রজোময়ীর কথা

রাজা পুরঞ্জিতা অসংখ্য অন্তঃপুরচারিণীগণের মধ্যে আমি ও আমার সঙ্গী সত্বময়ীও স্থান পেয়েছিলুম। রাজা অত্যুগ্রসেনের দয়াপ্রবণ হৃদয়ের গুণে আমাদের কোনো কষ্টই ছিল না এবং অযাচিত ভাবে কতশত বার আশাতীত অনুগ্রহ লাভে রাজার স্নেহমমতার গভীরত্বটুকুই অনুভব ক'রে কৃতার্থ হ'য়েছি। আমার সখী সত্বময়ীর প্রতি চিরদিনই রাজানুগ্রহের এতদূর আধিক্য দেখা যেতো যে পুরজনবর্গ সকলে শুভমিলনোৎসবের প্রতীক্ষায় পথ চেয়েছিল। সত্বময়ী রাজাধিরাজের রাজলক্ষ্মী হবার জন্যেই এ প্রাসাদের ঊর্দ্ধাতন আলো ক'রে জন্মেছে এ কথা তার জন্মাবার পর থেকেই পুরবাসীদের মুখে মুখেই একরূপ নির্দ্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর রাজার প্রেমানুরক্তি—সে তো আছেই। তোমরা শুনলে আশ্চর্য্য হবে

যে যখন বিবাহের প্রস্তাব অত্যুগ্রসেনের মধুক্ষরিত মুখকমল থেকে বিনিসৃত হ'ল সেই থেকেই সত্যমন্যু অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য ও অতুলবৈভব গৌরবের সঙ্গে রাজার উদার হৃদয়ের অতখানি ভালবাসাকে অনায়াসে উপেক্ষা ক'রে রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে নিভৃত এক কাননপ্রান্তে আশ্রয় নিলে।

তার স্বভাবটা এমন সৃষ্টি ছাড়া! নিরন্তর সুরে লয়ে বাঁধা প্রকৃতির বিরামহীন সঙ্গীতকে বেসুরো বেতালা ক'রে দেবার প্রয়াসেই যেন সে বদ্ধপরিকর হয়েছে। আমাদের এমন সুখের সবুজ পৃথিবী তার উপর দিয়ে মধুমদে রাঙা জীবন-খানার উচ্ছ্বসিত উৎসধারা সে তার অবার্থ কৌশলে যেন নিরুদ্ধ ক'রে ফেলতে চায়। কিছুতেই আমি তাকে বুঝিয়ে উঠতে পারলুম না যে এমন নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় কেউ কখন দেয়নি। যখন ইচ্ছে করলে সোণার স্বপন দেখে সারা জীবনটা পরীরাজ্যের একটী রাত্রের মতন সুৎকারে উড়ে যেতে পারে, তখন কেন জোর ক'রে প্রস্তর ভারের গুরুত্ব গলায় বেঁধে প'ড়ে থাকা? এ সব কথার উত্তরে—"লভ লভ হরি ভক্তিং, ভব নিগড় বন্ধন ছেদীং" এই রকম সব কথা সে আওড়ায়। তার সঙ্গে কি কথায় পারবার যো আছে! আমি তো আমি, আমার হাজারটাকে সে ইচ্ছে করলে এখনি তার মত সৃষ্টিছাড়া ক'রে গড়ে তুলে প্রকৃতির শান্ত লীলাভূমিকে ঝঞ্ঝা ঝড়ে আন্দোলিত ক'রে তুলতে পারে। সেই আয়ত-লোচনের অপাঙ্গ দৃষ্টি থেকে কি কারও নিস্তার আছে না অমান্য করবার উপায় আছে? তা'ই তো সখীর প্রণয়াভিলাসিনী হয়েও দূর থেকেই মধুরালাপ করি। কাজ কি বেশী কাছে গিয়ে, কে জানে কোন্ দিন এমন সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়ে সখীর ভিতরের ছাই ভস্মের অনাসৃষ্টি বোবা আমার মধ্যে যদি চেপে বসে!

কিন্তু অত্যুগ্রসেনের মত একজন শ্রীমান্ ধীমান্ প্রবলপ্রতাপান্বিত ব্যক্তি কতদিন আর এ বাতুলতার প্রশ্রয় দিতে পারে? ক্রমে ক্রমে যখন জনরব উঠ্‌লো যে একজন হীনজনের আশায় সত্যমন্যু তাঁর মত ভাগ্যবন্তকে পরিত্যাগ করেছে তখন আর প্রিয়তমার অপরাধ বারবার ক্ষমা ক'রে রাজা যে সুবুদ্ধির কাজ করেননি এ কথা তাঁর হিতার্থীদের মুখ থেকেও যেমন তিনি অবগত হচ্ছিলেন তদ্রূপ নিজের বিবেকও তাঁকে পুনঃ পুনঃ ক্ষমার সীমা অতিক্রম ক'রে এতবড় একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধের বিহিতরূপ দণ্ড দিতে অনুযোগ করছিল। এবার শুনেছি একটা রীতিমত সহপায় না ক'রে ক্ষান্ত হবেন না। সত্যিই তো কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অদ্ভুত খেয়ালের বশবর্ত্তিনী এক অজ্ঞ তরুণীর প্রতি এতটা প্রেমশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারে? অন্য কেউ হ'লে কোন্‌দিন এর একটা মীমাংসা ক'রে সত্যমন্যুর অবাধ্যতার উপযুক্ত শাস্তি দিত।

খেয়াল! খেয়াল! শুধু একটা খেয়াল! দিন নেই রাত নেই অবিশ্রান্ত ভাবে কোন এক অজানা-দেশের অচেনা লোকের প্রতি সত্যমন্যুর এত রূপ এত লাবণ্য ব্যর্থ হ'তে চ'লেছে। এমন অনুপমেয় সৌন্দর্য্য-সম্ভার, জীবনবসন্তের মঞ্জরিত লতাখানি শুধু ত্রিদশাধিপেরই যোগ্য! কোন্ ছার মহারাজা অত্যুগ্রসেন! তবু তাও যে ছিল ভালো এযে একে-বারে বিপরীত পন্থায় পা দিয়েছে! সুললিত কমনীয় শ্রীঅঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি তপঃক্লিষ্ট হ'য়ে আতপ তাপে তাপিত বিশুষ্ক ব্রততীর মত হয়তো কোন দিন চির বিদায় গ্রহণ ক'রবে। কে জানে কে সে নিষ্ঠুর, যার প্রত্যাশায় সত্যমন্যু তার এমন শোভা সুখ পূর্ণ নবীন জীবনটার সবখানি আহুতি দিতে স্থির সঙ্কল্প হ'য়েছে! যাই হ'ক আমার সখীর এই খেয়ালের কালো মেঘে আকাশ যেরূপ ঘন ঘোর ঘটায় আচ্ছন্ন হ'য়েছে তাতে একটা সবস্ব তোল-পাড়-করা ঝড় এসে যে তুমুল তুফানের আয়োজন ক'রেছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

সত্যময়ীর উপর আমার থেকে থেকে এমন রাগ হয় যে ইচ্ছে করে তাকে ঠেলে ধ'রে তার ভিতর থেকে এই অদ্ভুত খেয়ালটাকে টেনে বার ক'রে ফেলি, আর তার সঙ্গে সেই সর্ব্ব অনর্থের মূল তার কল্পিত প্রণয়ীটাকেও দূর ক'রে দিই। অনেক পুণ্যে মহারাজা অত্যুগ্রসেনের স্থনজরে পড়েছিল, গর্ব্ব ক'রে তাকে অবহেলা করা! অকূলের নিধিকে পদ দলিত ক'রে চ'লে যাওয়া! অমৃত ফেলে গরল পান!

সত্যময়ীর কথা

সারা রাত্রি বিনিদ্র শয্যায় প্রহরগুলো গুণে গুণে কাটাচ্ছি। কখন্ পূর্ব্বাকাশে নবোদিত দিন-মণির সঙ্গে আমার ভাগ্যরবি উদয় হবেন—কখন্ ওগো কখন্? এক একটা যুগের মত সুদীর্ঘ বিরহের রাতগুলো বরং এর চেয়ে শীঘ্র কেটে গেছে, দুঃখের শেষ সীমা ব'লেই কি অবশিষ্ট রজনীটা এতই দুর্ব্বহ হ'য়েছে? দেখতে দেখতে উষার আলো ফুটে উঠ্‌লো প্রভাতী রাগিনীর মধুর আলাপ রাজপ্রাসাদের তোরণ মঞ্চ থেকে আমার শ্রবণে—মনে—প্রাণে—গভীরতম অন্তর প্রদেশে অনুরণিত হ'য়ে বিপুল পুলকাবেগে সমস্ত হৃদয়ন্ত্রী স্পন্দিত কম্পিত ক'রে তুললে। আমি কি এত খানি সুখ সইতে পারবো? আর বুঝি পারবো না—এমনিই মনে হচ্ছে! হর্ষোদ্বেগ গভীর বেদনাময় দুঃখানুভূতির সঙ্গে এত ঘনীভূত! এত খানি সুখ বুঝি আর এ ক্ষুদ্র বক্ষে ধরবে না! না না হৃদয় শান্ত হও সুস্থ হও! আজকের দিন তোমার কাছে যা আসবে তাই তুমি প্রাণবল্লভের আগমনসূচক জেনে আদরে বরণ করবে। আজ আর কাউকে ফিরিও না, কাউকে হারিও না, কাউকে বিমুখ ক'র না। কখন্ কি ভাবে কি কিকিরে যে তিনি আসবেন তাকে বলতে পারে? ঐ বাতাসের হিল্লোলে, পুষ্পের পরিমলে পল্লবের কম্পনে যেন আজ তাঁর রথের ঘর্ঘর শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমার ক্ষুদ্র গৃহ আজ কোথাও এতটুকু অমার্জ্জিত অসজ্জিত নেই। অগুরু কস্তুরীর সুবাসিত ধূমে চারিদিক আমোদিত, কুরুবক করবী ও সুবাসিত চম্পকের স্তবক গেঁথে দ্বারে দ্বারে ঝুলিয়ে দিয়েছি। স্তবকে স্তবকে গোলাপ ও রক্ত কোকনদ কোরক গুচ্ছে ফুলের সাজিগুলি পূর্ণ করেছি, সদ্যবিকসিত শ্বেতারবিন্দ ও অম্লান অপরাজিতা অর্ঘ্য পাত্রে সজ্জিত করলুম! সুগন্ধি চন্দন লেপনে ও চিত্র-বিচিত্র আলিপনায় আমার ক্ষুদ্র কুটীর আজ প্রাসাদের কনক চূড়ার উচ্চতাকে তুচ্ছ ক'রে শোভায় রমণীয় হ'য়ে উঠেছে। আজ কি কাজের শেষ আছে! আয়োজন যেন কিছুতেই সম্পূর্ণ হ'চ্ছে না—আজ আমার অফুরন্ত কাজ! খুব মনোযোগ দিয়ে চিকণ করে যুথি জাতির মালা গাঁথছি, এমন সময় শুনলুম যে গুণ্ গুণ্ করে কে গাইছে—

এস এস মম জীবন ধন
ব্যর্থ ক'র না এ আয়োজন
এস চিরসাথী পরাণ সখা
নূতন করিয়া দাও হে দেখা—

ফিরে দেখি রজোময়ী। আহ্লাদে গদগদ হ'য়ে জরীর সাজে হীরের গহনায় অঙ্গ মুড়ে রূপের ছটায় ঘর আলো করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ব'লুম, "কি বোন্ এতদিন পরে কি মনে করে?" সে উত্তর না দিয়ে গাইতে লাগ্‌লো—

চির পুরাতন তুমি ও আমি
নূতন করিয়া লও হে স্বামী—

গান শেষ হ'লে সে ব'লে, "আজ যে তোমার এখানে এত ঘটা? ঐ গগনস্পর্শী অচল গিরিশৃঙ্গের সচলতাও যেন তোমার ধ্যান ভঙ্গের চেয়ে অল্প বিস্ময়কর!" তখন আমি স্বপ্নদৃষ্ট সন্ন্যাসীর মুখে যে অপূর্ব্ব সংবাদ শুনেছি সে কথা তাকে বল্লুম। সব শুনে স্বচ্ছ নীলাকাশে অকস্মাৎ নিবিড় জলদোদয়ের

P.3055.3

মত তার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা ক্রোধে ক্ষোভে যেন মলিন হয়ে গেলো। সে দৃঢ়স্বরে আমায় যেন শাসন করে বল্লে - "পাগলের পাগলামীর আর অবসর নেই! প্রকৃতির বিরুদ্ধে আর খড়্গ তুলে অনাবশ্যক আত্মহত্যার সৃষ্টি কর না। ঐ দ্যাখো রাজা অত্যুগ্রসেনের সাদর আহ্বান নিয়ে শত শত দাসদাসী পরিবৃত স্বর্ণ চতুর্দ্দোল অপেক্ষা করছে. বিনা বাক্যব্যয়ে তাতে গিয়ে পদার্পণ করো। আজ যদি তুমি রাজার প্রতি বিমুখ হও আজ যদি তাঁকে প্রত্যাখান করো তা হলে আর রক্ষা নাই। অদৃশ্য প্রণয়ীর অদ্ভুত মিলনাশা ছেড়ে দিয়ে তোমার প্রতি চিরপ্রেমানুরক্ত পরম সুন্দর কান্তি বিশিষ্ট রাজ-চক্রবর্ত্তীর সিংহাসন-ভাগিণী হও।" তার এ কথায় প্রথমটা আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলুম—আবার সেই রাজা অত্যুগ্রসেন! উঃ কি জ্বালা! আজকের দিনেও কি তার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই? হায় হায় প্রিয়তম! এ কি করলে? এতখানি আশা দিয়ে আবার কেন নৈরাশ্যের অন্ধকূপে ফেলে দিলে! কি জানি প্রভু এর মধ্যে তোমার বৈচিত্রতাময় সৃষ্টির কোন্ অংশ তুমি দেখাবে। এখন উপায় কি প্রভু? কি করতে হবে আমায় ব'লে দাও, তুমি যা বলবে আমি তাই করব। চকিতের মধ্যে মনে পড়ে গেলো তাইতো আজ যে কাউকে বিমুখ ক'রব না ফিরিয়ে দেবোনা বলেছি, আজ যা কিছু আসবে সবই গ্রহণ ক'রবো, আজকে যে আমার সবই বরণীয় আজ তো ফেরাবার উপায় নেই। আজ যদি বিষধর ভুজঙ্গ তার সহস্র ফণা মেলে আমার দিকে এগিয়ে আসে তাকে ও যে আগ্রহে আলিঙ্গন করতে হবে। কে জানে প্রভুর অপার মহিমা, কে বুঝতে পারে তাঁর অপার লীলা? হয় তো আজ রাজপ্রাসাদেই তাঁর দেখা পাবো। আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করে রজোময়ীর হাত ধরে দৃঢ় পদে রত্নদোলায় আরোহণ করলুম।

এতদিনের প্রত্যাশিত এত সহজে পাওয়া যাবে তা কেউ ভাবেনি, তাই রাজপ্রেরিত ভৃত্যগণের মধ্যে একটা আনন্দ-কোলাহল শুরু হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যোদ্যমের উল্লাস। উৎসবমত্ত নগরের অবিরল জনতা ভেদ করে অবশেষে রাজপুরীতে প্রবেশ করলুম। সেই সুবৃহৎ ভবনের একাংশে অগণ্য পরিজন ও সভাসদবর্গে পরিবেষ্টিত হ'য়ে মহার্ঘ্য সিংহাসনে মহারাজ অত্যুগ্রসেন আমার প্রতীক্ষা করছিলেন। আজ আমারই কৃতপরাধের দণ্ড বিধানের জন্য বিশেষ ক'রে এ সভার আয়োজন।

রজোময়ীর কথা

যা ভেবেছি ঠিক্ তাই হয়েছে। প্রবলের অন্তর যদি একবার দুর্ব্বলের প্রতি রুষ্ট হ'য়ে উঠে তাহ'লে সহজে তাকে আর নিবৃত্ত করবার কোন প্রতিবিধানই থাকে না। সভায় যখন সত্যবতী প্রবেশ করলে তখন তার মুখের স্বর্গীয় প্রভায় তার অলৌকিক রূপ জ্যোতিতে সভাস্থ সকলেই সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করেছিল। উন্নত দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার শক্তি কাহারও ছিল না। কেবল রাজার দুই চক্ষু দিয়ে যেন জলন্ত অগ্নিশিখা নির্গত হচ্ছিল, তথাপি তিনি কৃপাপরবশ সখীর প্রতি সাদর অভিবাদন করতে বিস্মৃত হননি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সখীর আমার সেদিন নিশ্চয়ই আত্মবিস্মৃতি হ'য়েছিল; কারণ মহারাজকে একটা সাদর সম্ভাষণও জানালে না।

মহারাজ ব'ল্লেন "এতদিনে কি তোমার চিত্ত বিভ্রান্তি অপসৃত হয়েচে?"

দৃঢ় অকম্পিত কণ্ঠে সত্যবতী উত্তর দিলেন, "না না মহারাজ বিন্দুমাত্র নয়।"

রাজার ক্রোধের উদ্রেকে সৈন্যগণের কটিলগ্ন কোষবদ্ধ তরবারিগুলো ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে উঠ্‌লো। রোষ বহ্নিতে ঘৃতপ্রায় হ'য়ে কোপ-কর্কশ কণ্ঠে মহারাজা বল্লেন -- "আজ প্রমাণ চাই! মিথ্যা ছলনায়, কপট চাতুরীতে, আজ আর অত্যুগ্রসেনের কৃপাপাত্রী হবার কিছু মাত্র আশা নেই। দেখাও তোমার প্রেমের পাত্র কে?"

২৯.২.৬৯

অবিচলিত স্থির কণ্ঠে সখী ব'লে "যিনি শরীরী মূর্ত্তির বাইরে অথচ বিশ্বব্যাপী, যিনি সর্ব্বভূতে ভূতে বিরাজমান, স্বীয় মহিমাতে স্বপ্রকাশ, তাঁকে দেখা-বার তো কোন উপায় নেই—তবে—তবে—অন্তরে একান্ত চিন্তায় যদি কোন ফল থাকে তবে এই হৃদয় মাঝেই তাঁকে দেখতে পাবেন। শীঘ্র এ হৃদয় বিদীর্ণ করতে আজ্ঞা দিন্ মহারাজ।"

বিদ্রূপের তিক্ত হাসি রাজার মুখে ফুটে উঠ্‌লো। তিনি বল্লেন—"তাহ'লে কি তুমি তখনও জীবিত থাকবে মনে করেছ? তোমার কি মৃত্যু ভয় নেই?"

"না, সত্যময়ী মৃত্যুকে ভয় করে না, তবে জীবিত থাকা না থাকা সে তাঁর ইচ্ছা।"

"তবুও তুমি রাজরাণী হয়ে প্রচুর ভোগ বিলাসের সঙ্গে আমার একান্ত প্রেম উপভোগ ক'রতে চাও না?"

সত্যময়ীর আকর্ণবিশ্রান্ত নেত্রোৎপল এইবার বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌লো। সে বল্লে "ওরূপ কথা বলার স্পর্দ্ধা আর যেন আপনার কখনও না হয়। আমি বারবার বলেছি আর কতবার বলব যে আপনার উদার হৃদয়ের স্নেহ প্রেমের প্রত্যাশী আমি নই।"

আর সহ্য হয় না—অসহ্য—অসহ্য—সভামধ্যে এমন ভাবে অপমানিত উপেক্ষিত তা আবার একটা ক্ষুদ্র অজ্ঞান নারীর নিকট? আর একবার চেষ্টা তারপরে এর সমাপ্তি—এর সমুচিত দণ্ড! কঠোর পরুষ ভাবে মহারাজ আবার ব'ল্লেন "সত্যময়ি! তবে আজ রাজাজ্ঞা প্রেরিত দণ্ডকারীর নির্দ্দয় আঘাত থেকে কিছুতেই তোমার নিস্তার নেই—প্রস্তুত হও!"

সভায় সকলের মুখে অস্ফুট বিলাপধ্বনি শোনা গেল, হায় হায়! এমন কণকপ্রতিমা কি অকালে বিসর্জ্জন দেবার জন্যেই বিধাতা সৃজন করেছিলেন? কি অবোধ এই প্রেমত্ত রমণী? কি সত্যই সে উন্মাদিনী? কিন্তু সত্যময়ীর ফুল্ল শতদল-নিভ সুন্দর মুখে এইবার হাস্যরেখা দেখা গেলো সে শান্তভাবে বল্লে, শাণিত তরবারির তীক্ষ্ণ প্রভাবকে সত্যময়ী ভয় করে না! ঈশ্বরের বিরহশেল যে ভোগ ক'রেছে তার কাছে এ অতি সামান্য দুঃখ। বিশেষতঃ আজ এই তরবারি আমার প্রিয়তমের সঙ্গে কি মিলনের সহায়ক! এই দণ্ড আজ আমার পরমানন্দের হেতুস্বরূপ! কিন্তু রাজা অত্যুগ্রসেনের আজ্ঞায় এ দণ্ড নয় সেই ত্রিভুবনাধিপতি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র রাজা ঈশ্বরের আজ্ঞায়। কে কাকে মারতে পারে মহারাজ?

—কঃ কেন হন্যতে জন্তু জন্তু কঃ কেন রক্ষতে
হন্তি রক্ষতি চৈবাত্মা হৃদয়ন সাধু সমাচরণ্।"

সত্যময়ীর এ কথা শুনে সভাস্থ সকলে স্তব্ধ। বাক্য স্ফুরণের অবকাশ ছিল না—রাজার আদেশে আর ঐ মণিমুক্তা-খচিত সিংহাসনখানার আলিঙ্গন লোভে আমারই—আমারই—এই হাত খানা সখীর কুসুমকোমল বক্ষখানি বিদীর্ণ করলে। ক্রমে ক্রমে অস্ফুট কোলাহল, অস্পষ্ট বিলাপ, উচ্চ হাহাকারে পরিণত হ'ল। আর সত্যময়ী? ধ্যান স্তিমিত নেত্রে স্থির প্রশান্ত মুখে সত্যময়ী যোগে নিমগ্ন। কই আঘাতের সুতীব্র ব্যথা? কোথায় যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ? সেই সুমধুর রক্তাধরপুট ঈষৎ উন্মুক্ত করে সত্যময়ীর যেন কার সঙ্গে কথা কয়ছে "প্রভু! এত বিলম্ব করে এলে? এতদিন কেন আসনি প্রিয়তম?"

মহানন্দে সখীর মুহু মুহু স্বেদ কম্প ও রোমাঞ্চে শরীর পুলকন্দীত হ'চ্ছিল। একটা বিরাট জ্যোতির বিলাস ক্রীড়া তার মধ্যে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল। সকলে জড়ের মত নিশ্চল নিষ্পন্দ।

মহারাজ অত্যুগ্রসেন মুর্চ্ছিত। আর আমি? আমি অনুতাপে জর্জ্জরিত হ'য়ে সখীর সেই অমর বাঞ্ছিত শ্রীচরণ তরে মাথা নত করলুম।

সত্ত্বময়ীর কথা

রাজাকে প্রত্যাখান করায় তাঁর রোষানলের পরিণামস্বরূপ মৃত্যুর প্রতীক্ষায় অন্ধ শোধ প্রাণনাথের নাম অন্তরে জপ্‌ছিলুম। কিন্তু কোথায় মৃত্যুর অন্ধকার, আর কোথায়ই বা তীক্ষ্ণাগ্রের সুতীব্র আঘাত। তার পরিবর্ত্তে স্বামী সন্দর্শনের অপার আনন্দ। সত্যই সেদিন থেকে তাঁকে পেলুম। প্রিয়তমের বিশাল বপুর স্নেহ নীড়ে ব্যাকুল বাহুর নিবিড় বেষ্টনে, আমাকে সমস্ত দুঃখ থেকে ঘুরে ঘুরে অতি দূরে কোন এক অসীম আনন্দের রাজ্যে নিয়ে এসেছে—এখানে জরা নাই শোক নাই—মৃত্যু নাই—আছে শুধু অনন্ত প্রেম!

ত্রিগুণাতীতের কথা

আজ আমি সত্ত্বময়ীকে পেয়েছি! অবলম্বন হীন আমাকে সে তার হৃদয় মধ্যে আশ্রয় দিয়ে যে আনন্দ দিয়েছে তার তুলনা কোথায়? এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মধ্যে কেউ যাকে সর্ব্বান্তকরণে, যথার্থ রূপে, সহজে, ভালবাসতে চায় না সেই নিঃসম্বলকে সে তার যথা সর্ব্বস্ব দিয়ে ফেলেছে আমার মত নিঃসন্তান কে সে তার অসীম প্রেমের সম্বল দিয়েছে। সে দিবারাত্র আমার আলিঙ্গনে বদ্ধ হ'য়ে প্রেমসুধা পান ক'রছে আর আমি তা পলক নেত্রে তার অতুলনীয় মুখ শোভা নিরীক্ষণ করছি—

যা সুপর্ণা সু সযুজা সখায়া, সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্ন ন্য অভিচাকশীতি

"দুইটী সুন্দর পক্ষী একটী বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া আছে উভয়ের সখা। একটী সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিতেছে, অপর অনশনে থাকিয়া কেবল মাত্র দেখিতেছেন।"

হাতের পাঁচ।

[গল্প]

(শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার)

প্রথম পরিচ্ছেদ

আভাস কনিষ্ঠা ভগ্নী সুবাসের ম্লান মুখখানি সস্নেহে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—তুই ভাবছিস্ কেন সুবাস! রেস্ কি একা তোর বরই খেলছে রে! কত লক্ষ লক্ষ লোক রেস্ খেলে; আজকালকার সৌখিন লোকদের ও একটা মস্ত আমোদ!

আমি বুঝি রেস্ খেলার কথা বল্‌ছি?—বলিয়া সুবাস আবার মুখটি নামাইয়া লইল।

তবে কি,—আসে না, তাই?

এবার আর সুবাস কথা কহিল না। আভাস বলিল—কেন আস্‌বে? তুই কি আস্‌তে লিখিছিস্ তা'কে যে আস্‌বে?

বাঃ রে! আমি ত দু দু'খানা চিঠি লিখলুম, একখানারও জবাব এল?

সে ত সেই অসুখের সময় লিখিছিলি এলাহাবাদ থেকে। তার পর ভালো হয়ে আর লিখিছিস্? আমি ত এখানে এসে পর্য্যন্ত তোকে রোজ বল্‌ছি —লেখ, লেখ, তোর যে মান ভাঙ্গেই না লো।

তুমি কেবল মানই দেখ্‌ছ!—বলিয়া সুবাস কম্পিত অধরোষ্ঠ গোপন করিতেই অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

আভাস কিছুক্ষণ কথা কহিল না। সুবাসের স্বামী—সত্যেন্দ্রের উপর তাহারও রাগ কম হইতেছিল না। সুবাস এই তিন মাস হইল আসিয়াছে,

এমনই লোক সে, একখানা চিঠি লিখিয়া খবর পর্য্যন্ত নেয় নাই! শুধু কি তাই? কলিকাতায় শ্বশুরালয়ে থাকিতেই সুবাস মরে ভুগিয়া ভুগিয়া আধখানি হইয়া গিয়াছিল, তবুও সত্যেন্দ্রের এমন হুঁস হইল না যে পত্র লিখিয়া স্ত্রীর কুশল সমাচারটা জানিয়া লয়! ভাবিতে ভাবিতে আভাসের মন স্বার্থপর এই পুরুষ জাতির বিপক্ষে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। বাস্তবিক পুরুষ জাতিটাই অত্যন্ত স্বার্থপর. নিজের সুখটিই তাহারা খুঁজিয়া বেড়ায়!

মধুপুরের শেষ প্রান্তে একটি উদ্যান বাটিকায় একটি কক্ষমধ্যে উক্তরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

আভাস সুবাস হিরণের অভিভাবকত্বে মাস দুই হইল মধুপুরে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে আসিয়াছে। হিরণ আভাসের কনিষ্ঠ দেবর। অধুনা সে স্কুল ছাড়িয়া দিয়া কংগ্রেসের চাঁদা আদায় করিতেছিল। জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেই সেখানে ভর্ত্তি হইবে, স্থির আছে। আভাস সুবাসের পিতা এলাহাবাদ প্রসিদ্ধ ডাঃ নন্দী নেপালে গিয়াছেন।

অপরাহ্ণ কাল। হিরণ মধ্যাহ্নের গাড়ীতে ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেণ ধরিয়া গিরিধি বেড়াইতে গেছে, ক'দিন যাইতেছে, সেখানে তাহার অনেক বন্ধু বান্ধব জুটিয়া গিয়াছিল। আভাস সুবাসকে অপরাহ্ণ ভোজনে ডাকিতে আসিয়াছিল। সুবাস তখন একটা খোলা জানলা দিয়া মিঃ চাটার্জ্জির ফুল বাগানের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়াছিল।

হঠাৎ আভাস সুবাসের হাতে টান দিয়া বলিল —চা খাবি চল!

সুবাস বলিল—আমার খিদে নেই দিদি!

আছে আছে,—চ! বরের জন্যে ভেবে অখিদে করতে হ'বে না! তোর বরকে আমি আনাচ্ছি দেখ না! সুবাস আজ কি বার হ'ল রে?

শুক্রবার।

কাল শনিবার। রেসের দিন না? আচ্ছা, রবিবার ৯টার মধ্যে যদি তোর বরকে না হাজির করতে পারি তখন বলিস্। তাহ'লেই হ'বে ত?

না, না তোমায় আনাতে হ'বে না।

হ'বে না ত! আচ্ছা, তাই তাই!

সুবাস প্রস্থানোদ্যত বৌঠা ভগ্নীর অঞ্চল প্রান্ত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—তবু শুনি কি করে.....

এই যে বল্লি আনাতে হ'বে না?

শুনিই না!

শোনা শুনিতে আর কাজ কি! পেলেই ত— চল রবিবার সকালে—হ'বে?

তা আর পারতে হয় না!

আভাস—বাজী, যদি পারি?—বলিয়া সুবাসের হাত ধরিল।

বাজী আবার কি?

আচ্ছা অমনিই। চ' খাবি চ। রবিবার—হ' রাত্রি কাটলেই—বুঝ্লি?

সুবাস তাহাকে ঠেলিয়া দিল।

কিন্তু সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় অসুখ সত্ত্বেও সুবাস যাহা খাইতে পারিল, আভাস না-কি অনেকদিন তাহাকে সেরূপ খাইতে দেখে নাই।

স্ত্রিভাঙ্গ পরিচ্ছেদ

সত্যেন্দ্র রেস খেলিতেছিল।

বন্ধুবর প্রভাতের সহিত কথা কহিতে কহিতে টিকিট ঘরের উদ্দেশে চলিতেছে, হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠে "হুজুর" "হুজুর" শুনিয়া সত্যেন্দ্র ফিরিয়া চাহিতেই, রেলিঙের বাহিরে দণ্ডায়মান 'এম্'—আঁটা বেহারা সেলাম করিল। সত্যেন্দ্র প্রভাতের হাত ছাড়িয়া রেলিঙের ধারে আসিতেই, বেহারা উৎকণ্ঠিত মুখে একখানা হরিদ্রা বর্ণের খাম বাহির করিয়া কহিল—হুজুর, তার আসিয়াছে।

তার! সত্যেন্দ্র ক্ষিপ্রহস্তে খামটি উন্মোচন করিয়া পাঠ করিল; নিঃশব্দে সেখানি পকেটে পুরিয়া কহিল—আচ্ছা! তোম যাও।

হুজুর, মাইজী... ...

বোল্ দেও ও ঠিক চায় বলিয়া 'সত্যেন্দ্র ফিরিতে ছিল, প্রভাত ঠিক সেই সময়েই নিকটে আসিয়া কহিল—কিসের তার হে ?

বেহারা কহিল—মাজিজী কোথাকার তার জিজ্ঞাসা করিতে কহিয়াছেন।

বোল্ দেও, মধুপুরে সে আয়া !

প্রভাত বলিল—মধুপুর না কি হে ! দেখি দেখি !

কি আর দেখবে !

প্রভাত ছাড়িল না, বলিল—দেখিই না !

তাহার জানা ছিল, সত্যেন্দ্র-পত্নী কিছুদিন হইতে মধুপুরে বাস করিতেছিলেন। সত্যেন্দ্র অনিচ্ছার সহিত তার খানি বাহির করিয়া বন্ধুর হাতে দিয়া বলিল চল—হে ! ঘোড়া বেরিয়ে গেল বোধ হয় !

প্রভাত দুই মুহূর্ত্তে টেলিগ্রামটি পাঠ করিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল—যাচ্ছ ত ?

সত্যেন্দ্র অবিচলিতকণ্ঠে কহিল—ঠিক নেই ?

প্রভাত সাশ্চর্য্যে কহিল, ঠিক নেই কি বল ? তোমার স্ত্রীর পীড়া.....

সত্যেন্দ্র বাধা দিয়া কহিল পীড়া ! পীড়া ! শুন্তে শুন্তে আমারও পীড়া জন্মে গেছে।

প্রভাত কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সত্যেন্দ্র তাহার বাহুতে আকর্ষণ দিয়া কহিল—এ রেসটা মিস্ করবে বলতে চাও ?

প্রভাত হাতে বাঁধা ঘড়িতে সময় নিরীক্ষণ করিয়া কহিল - চল, সময় হয়েছে প্রায় !

উভয়ে ঘোড়দৌড়ের স্থানে ফিরিয়া আসিল। সত্য সত্য মাঠের ওপারে তখন ঘোড়াগুলি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

প্রভাত টেলিগ্রামটি ফিরাইয়া দিয়া কহিল—সত্যি তুমি যাবে না সত্যেন ?

না। আমি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র নই, রোগের নামে মেয়েদের মতন আমার হৃদয় দুর্ব্বল হয় না, প্রভাত !

প্রভাত সত্যেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তা নয়, কিন্তু এ ত অন্য লোকের রোগের কথা নয়, সত্যেন। এ যে.....

কথাটা অসমাপ্তই রহিয়া গেল, যে হেতু ওপারে ঘোড়া ছুটিয়া এক মিনিটের মধ্যেই ঝড় ঝড় শব্দে এ পারে মাঠ অতিক্রম করিয়া একেবারে বিচারকদের সামনে গিয়া গেল। সত্যেন্দ্র চিৎকার করিয়া উঠিল—এগারো। আমাদেরই !

আধঘণ্টা পরে আবার উভয়ে বেড়াইতেছিল। মনটা উভয়েরই প্রফুল্ল, বিগত বাজীটায় বেশ মোটা টাকা আসিয়াছে।

প্রভাত বলিল—দেখ সত্যেন, তোমাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাঁরা হা পিত্যেশ করে বসে আছেন তোমার স্ত্রী হয় ত,—কেন, নিশ্চয়ই টেলিগ্রামের জবাবটি আশা করে, রোগ শয্যায় পড়ে ভগবানকে ডাক্‌ছেন এমন অবস্থায় না যাওয়া তোমার অন্যায়।

আমি রোগশয্যার কাছে বসতে পারিনে, প্রভাত। অসুখের নামে আমার ভয় হয় ! আত্মীয় স্বজন কারু অসুখ শুনলে খবর নেওয়া ত পরের কথা, সে দিক কার মাটীও আমি মাড়াতে পারিনে। শুধু তাই নয় আমি মালাতন হ'য়ে গেছি প্রভাত।

প্রভাত বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল ; সত্যেন্দ্র পুনশ্চ কহিল—সেবার এখানে এলেন, এসে পাঁচ সাত দিনও গেল না, জ্বর ! দু'মাস ছিলেন, তার মধ্যে ঐ প্রথম পাঁচ সাত দিন যা উঠে হেঁটে বেড়িয়ে ছিলেন, তারপরই বিছানা ! এতে আর কে পেরে ওঠে বল ? তারপর এলাহাবাদেও গেলেন, জ্বর সেরে গেল। কলকাতায় এলেই—জ্বর !

প্রভাত মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। আর একটি বৎসর পরেই একটা ডাক্তার হইয়া বাহির হইবে। বলিল—এমনও ত হ'তে পারে সত্যেন, যে কলকাতার জল হাওয়া তাঁর সহ্য হয় নি !

সত্যেন্দ্র গোমড়া মুখে বলিয়া উঠিল—কে বলছে সহ্য হ'তে,—সেখানেই থাকুন !

প্রভাত বিবাহ করে নাই। না করুক দাম্পত্য

জীবনের ছবিখানি কল্পনার আকাশে সে এমনি স্বচ্ছ সুন্দর দেখিত যে বিবাহিত কোন লোকেরই অদৃষ্টে তেমনটি দেখা ঘটিয়া উঠে নাই। সে অত্যন্ত বিষন্ন কণ্ঠে কহিল—বেশ ত, যতদিন বেশ না সারেন, সেখানেই থাকুন, ক্ষতি কি! কিন্তু তোমারও একটা কর্ত্তব্য আছে ত।

সত্যেন্দ্র উচ্চকণ্ঠে কি বলিবার চেষ্টা করিতেছিল প্রভাত তৎপূর্ব্বেই কহিল—তুমি খবর পেয়েও না যদি যাও, তাঁরা কি ভাববেন বল ত? তোমার শ্বশুর ম'শায়……

তিনি মধুপুরে নাই।

তবে সেখানে কে আছেন? পুরুষ?

আমার ভায়রাভায়ের একটি ভাই আছেন, তবে মাস দুই আগের খবর। ইদানীং চিঠি পত্র আমিও দিই নি, তাঁরাও বড় একটা…

প্রভাত বলিল—তোমার শ্বশুর সম্ভবতঃ নেই, থাকলে টেলিগ্রামে তাঁর নামই থাকত, কৈ দেখি টেলিগ্রামটা?—সে হাত বাড়াইতে সত্যেন্দ্র খামখানি বাহির করিয়া দিল। প্রভাত বলিল—আভাস কে?

আমার বড় শালী।

দেখ কতদূর আশা করে তাঁরা তারটি পাঠিয়েছেন তুমি যে যাবে না, এ বোধ করি তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি! পারলে ট্রেণের সময়, প্লাটফরম পর্য্যন্ত তারে লিখতেন না! আবার ষ্টেশনে গাড়ী, লোক রাখবার কথাও বলতেন না! তোমার যাওয়া উচিৎ সত্যেন!

সত্যেন্দ্র নীরবে টেলিগ্রামটী আবার পড়িল—

"সুহাস সাংঘাতিক পীড়িত। তোমাকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত। রাত্রি ৮-০০ এক্সপ্রেস্ ট্রেণ ৯নং প্লাটফরম হইতে ছাড়ে, এখানে সকাল ৮ টায় পৌঁছে। আমরা ষ্টেশনে গাড়ী লোক রাখিব জবাব।—আভাস!"

প্রভাত অকস্মাৎ বন্ধুর হাত ধরিয়া বলিল—শুনতোন ভাই, স্ত্রীর মনে আঘাত দিও না!—কম্পিত আশঙ্কায় অবিবাহিত যুবকের কণ্ঠে অশ্রু যেন উথলিয়া উঠিল। সত্যেন্দ্রকে নীরব দেখিয়া একমিনিট পরে আবার বলিল—একটা জবাব দিয়ে দাও সত্যেন!

কি জবাব দেব?

দাও যে, ঐ গাড়ীতেই তুমি যাচ্ছ। এক্সপ্রেস্ টেলিগ্রাম এখনি পৌঁছুবে, পেয়ে তোমার স্ত্রী সুখী হবেন!

সত্যেন্দ্র ওষুধ গেলার মত মুখ করিয়া বলিল—আচ্ছা, ব'ড়ী গিয়ে একটা তার…

বাড়ী যেতে ত প্রায় সাতটা হ'বে! এখান থেকেই জবাবটা দিয়ে যাও। ঐ ত পোষ্ট টেলিগ্রাফ অফিস্।

বন্ধুর এতাদৃশ ব্যগ্রতায় সত্যেন্দ্র হাসিল, বলিল—এখনি কেন?

টেলিগ্রাফ প্রাপ্তিতে পীড়িতার রোগকাতর পাণ্ডুর কপোলে সুখ রেখা কল্পনা করিয়া প্রভাত বলিল—কি জবাব দেবে বল না, আমিই পাঠিয়ে আস্‌ছি।

সত্যেন্দ্র আবার হাসিল, বলিল—বাব এই কথা! আর কি!

ঐ ট্রেণেই ত?

হাঁ—শুনিয়া প্রভাত চলিয়া গেল।

প্রভাতের রোগ ছিল, বিবাহিত বন্ধুদের চিঠি পত্র শোনা, মনের মত জবাব বাৎলাইয়া দেওয়া, আর বন্ধুবান্ধবদের নিশাজাগরণের বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়া তাহাতেই রঙ চঙ ফলাইয়া নিজের বুভুক্ষু হৃদয়কে কিঞ্চিন্মাত্রায় খোরাক জোগানো। বন্ধুরা সাশ্রুনেত্রে সকল কথাই তাহাকে বলিত; বলিয়া বলিত—একটা বিয়ে কর, নিজেই বুঝবি! প্রভাতের উত্তর ছিল, দাঁড়া, সব জেনে শুনে রাখি! আর তোদের যখন টকে যাবে, পুরোণো হ'বে, তখন আমার নতুনত্ব শুনে তোদেরও আবার নূতন জীবন করিবে ধারণ!

প্রভাত ফিরিয়া আসিয়া রসিদখানি সুত্যেন্দ্রের হাতে দিয়া বলিল—গিয়ে কিন্তু আমাকে খবর দিতে ভুল না সত্যেন! আর তেমন বোঝ, তার করো, ডাক্তার টাক্তার যদি দরকার হয়, আমি নিয়ে যাব। অবশ্য দরকার না হ'লেই ভাল, কিন্তু যদিই—আর [redacted] ত যায় না।

আচ্ছা হে আচ্ছা!

একটা কেস্ হাতি করিবার সুযোগ সম্ভাবনায় প্রভাত বেশ আগ্রহান্বিত হইয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সত্যেন্দ্র জননী বারবার করিয়া বলিয়া দিলেন—সেখানে বাপু চিকিৎসার সুবিধে হ'বে না, তুই গিয়েই এখানে আনবার ব্যবস্থা করিস্, সত্য! কার কথা শুনিস্ নে, আনা চাই।

সত্যেন্দ্র অবশ্য কাপত্য করিল—মা, শ্বশুর ম'শায় নিজে বড় ডাক্তার, তিনি নিশ্চয়ই খবর পেয়ে এসে পৌঁছেছেন। তিনি থাকতে……

জননী বলিলেন—তুই বলিস্ কি সত্য! হ'লেই বা বড় ডাক্তার, সেখানে সব ওষুধ ও নেই, অন্ত পাঁচ জন বড় ডাক্তার ও নেই। না, না, তাঁকে আমার নাম করে বলবি। বলবি,- মা বলেছেন।

সত্যেন্দ্র সম্মত হইয়া বাহির হইয়া পড়িল। সে মোটরে উঠিতেছে, জননী বলিলেন—সকালে পৌঁছেই আমাকে খবর দিস্ সত্য!

শীতকাল। লাওড়া ব্রিজ পার হইবার সময় সত্যেন্দ্র অত্যন্ত শৈত্য অনুভব করিতেছিল। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া একখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট আনিয়া সে যখন ছ নম্বর প্ল্যাটফরমে ঢুকিল, চং চং শব্দে গাড়ীর ঘণ্টাও বাজিতে লাগিল। সত্যেন্দ্রের হাতে সাদা রঙের টিকিট দেখা যাইতেছিল, দ্বারে টিকিট পরিদর্শক সসম্ভ্রমে কহিল—প্রথম ঘণ্টা হইয়া গেছে, মহাশয়!—সত্যেন্দ্র ইংরাজীতেই তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া, শেষের দিকেই একখানা প্রথম শ্রেণীর দ্বার খুলিয়া উঠিয়া পড়িতেই রামলক্ষণ বেহারা প্রভুর বিছানাটি পাতিয়া দিয়া সারিতে না সারিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বেচারা রামলক্ষণ আছাড় খাইয়া নীচে পড়িল।

প্রভাত তাহাকে উঠাইয়া দিতে আসিলেও, অনেকখানি পিছাইয়া পড়িয়াছিল, বেচারা মোটা মানুষ, দ্রুত চলা তাহার পক্ষে সহজ সাধ্য ছিল না—যদিও বা কোনমতে ফটক অবধি আসিয়া পৌঁছিল, পৌঁছিতেই টিকিট পরিদর্শক-প্রভু টিকিট চাহিয়া তাহাকে আটকাইয়া ফেলিল। বলিল প্ল্যাটফরম টিকিট আনুন।

কিন্তু ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল,—প্রভাত তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ভিতরে ঢুকিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আর সত্যেন্দ্রকে দেখা গেল না।

প্রভাত ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিতেছে, সসম্ভ্রমে একবৃদ্ধ তাহাকে প্রায় জড়াইয়া ধরিয়াই বলিল—বাবা কাঁহা যাবে কোন গাড়ী?

প্রভাত বলিল—গাড়ী ত ছেড়ে গেল। ঐ……

অ্যাঁ……!……!……বৃদ্ধ বসিয়া পড়িল। টিকিট কালেক্টার জিজ্ঞাসিল—কোথা যাবে? বৃদ্ধ, কাঁহা, বাবা,—বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কাঁহা ঐ গাড়ী। শীঘ্র যাও, ২৪ মিনিট বাকী মোটে।

প্রভাত জিজ্ঞাসিল—এ'টা গেল?

সেভেন আপ্ বি এন্ আর! ওয়ালটার।

বলেন কি! ওয়ালটার?

টিকিট কালেক্টার ধাক্কা খাইয়াছিল, সেই রাগে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিল—দেখে নিন্ গে……

প্ল্যাটফরমের বাহিরে আসিয়া প্ল্যাকার্ড দেখিয়া প্রভাত বুঝিল, টিকিট কালেক্টারের কথাই ঠিক। তাইত!—প্রভাত চিন্তিত হইয়া পড়িল। অল্পক্ষণ চিন্তার পর সে ষ্টেশনের তার ঘরে আসিয়া আতাসের নামে একখানা তার পাঠাইয়া দিল। আতাসের মধুপুরের ঠিকানা তাহার মনেই ছিল।

বাহিরে সত্যেন্দ্রের মোটর অপেক্ষা করিয়াছিল, প্রভাতকে লইয়া নক্ষত্র বেগে ছুটিল।

প্ল্যাটফরমের বাহিরে আসিতে সত্যেন্দ্র ধার জানলার শার্শি, ঝিলমিল তুলিয়া দিয়া বেঞ্চে বসিয়া চামড়ার কেস্‌টা খুলিয়া ফেলিল। তোয়ালে জড়ানো একটা বোতল, কাঁচের একটা গ্লাস বাহির করিয়া সোডা ভাঙ্গিল। গ্লাসে খানিকটা উগ্র সুরা ঢালিয়া, অল্প পরিমাণে সোডা মিশ্রিত করিয়া চুমুক দিল। সোডার জলে গ্লাসটি ধুইয়া বাকী সোডাটা গল গল শব্দে গালে ঢালিয়া বোতল গ্লাস সব পোর্টম্যাণ্টুতে পুরিয়া, অঙ্গের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া রাত্রিবসন পরিল।

সত্যেন্দ্র সাহেব রাগটা শুহাইয়া শুইয়া পড়িতে ছিল, কি ভাবিয়া আবার উঠিয়া, সব ক'টি আলো নিবাইয়া স্বপ্ করিয়া শুইয়া পড়িল।

তরল মদিরার মাহাত্ম্যেই হৌক, অথবা প্রভাতের অনুরোধ ও জননীর আদেশ পালনের ইচ্ছাতেই হৌক, সত্যেন্দ্রের মনোরাজ্যে এ সময় যে ভাবের উদয় হইতেছিল, আমরা তাহার একটা মোটামুটি খস্‌ড়া তুলিয়া দিলাম।

সত্যেন্দ্র ভাবিতেছিল, যদি সত্যই দেখে সুহাসের পীড়া বাড়াবাড়ি হইয়াছে তাহা হইলে তাহাকে কলিকাতায় আনা উচিত কি-না! কলিকাতায় আনিলে তাহাকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে! সে অত সহ্য করিতে পারে না। এই সেদিন তাহার ভাইটির অমন অসুখ গেল, সত্যেন্দ্র তাহাকে কত ভালোবাসিত, কৈ তবু ত তাহার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া নিরন্তর তাহার সেবা করিতে পারিল না! সে সময় মা'ও বলিতেন, সত্য আমার সব পারে, রোগের নাম শুনলেই সত্যর হাত পা অবশ হইয়া যায়! যদিই সুহাসকে আনিতে হয়, সেই সঙ্গে আভাস ও যদি আসিয়া পড়ে এবং তাঁহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে সত্য যদিই না নিয়ত রোগের পরিচর্য্যা করিতে সক্ষম হয় তবে তাঁহারা ত মায়ের মত বুঝিবেন না,—তাঁহারা সেটিকে অবহেলা, উপেক্ষা আরও কত কি বলিয়া ভাবিবেন, নিন্দা করিবেন। কাজ নাই বাপু, আনিয়া! বরং প্রভাত যা বলিয়াছে, সেটা সহজ! প্রভাত চমৎকার পরিচর্য্যা করিতে পারে, ডাক্তার আনিয়া সেই দেখা শুনা করুক, আমার তাহাতে নিন্দা অখ্যাতিও হইবে না, কিছুই হইবে না!

সত্যেন্দ্র নিজের মনেই বলিল—সেই ঠিক! সেই ঠিক! পৌঁছিয়া, অবস্থা বুঝিয়া প্রভাতকেই টেলিগ্রাম করা যাইবে।

একটা দুশ্চিন্তা নামিয়া যাইতেই অন্য এক চিন্তা সত্যেন্দ্রের উত্তেজিত মস্তিষ্ককে পীড়া দিতে লাগিল। বড় দুঃখে বড় বেদনায় তাহার ভারাক্রান্ত হৃদয়টি যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আর্ত্তকণ্ঠে সত্যেন্দ্র আপনাকেই প্রশ্ন করিল—তাহার মত দুঃখী কে? কাহার স্ত্রী এমন চিররুগ্ন? বিকশিত যৌবনে তাহার মত কে এমন বিরহ বেদনায় চির পীড়িত আছে?

এই সকল প্রশ্নের জবাব কে তাহাকে দিবে? নিজের মনেই সে ভাঙ্গিতে ও গড়িতে লাগিল—তাহার অন্যান্য বন্ধুরা কেমন সুখে আছে! কেমন হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে! তাহাদের অনেকের অঙ্গে যে সকল দুঃখ কষ্ট আছে, সত্যেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, সে গুলি কিছুই নহে। সব চেয়ে বড় সুখে সুখী তাহারা, ছোট খাট দুঃখ অগাধ সুখের চাপা পড়িয়া গেছে। আর তাহার? সংসারে সুখ শান্তি সব ছিল, কোন অভাবই তাহার ছিল না! কোথা হইতে এই ভীষণ দুঃখের চাপে পড়িয়া সুখ শান্তিও দুঃখময় হইয়া পড়িয়াছে!—সত্যেন্দ্র আর সামলাইতে পারিল না, ব্যথিত হৃদয়ে, কম্পিত হস্তে সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল। রুমাল খুঁজিয়া মুখ চোখ মুছিয়া আবার পোর্টম্যাণ্টু খুলিল; আবার সোডা কাটিল; সত্যেন্দ্র আর ভাবিবে না স্থির করিয়া আলো নিবাইয়া শয্যাশ্রয় লইল।

কিন্তু ভাবনা কি যায়? কবে প্রথম সব সুখের

আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বসাকের সহিত হেস্‌গ্রাউতে পদার্পণ করিয়াছিল, কবে সুহাসের পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও তাহার পত্রের উত্তর না দিয়া ছিঁড়িয়া জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, কবে বাদলের প্রলোভনে প্রথম অনেক রাত্রি করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল, সব একটির পর একটি তাহার স্মৃতিপট রঞ্জিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

সত্যেন্দ্র অন্ধকারেই ঘড়ি দেখিয়া লইল, রাত্রি দুইটা!

ঘুমের ঔষধ তাহার সঙ্গেই ছিল। এবার বিনা সোডায় গ্লাস ভর্ত্তি করিল এবং নিমেষ মধ্যেই শেষ করিল।

এবার আর নিদ্রাদেবী তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সত্যেন্দ্র নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

বোধ হয় দ্বার খোলার শব্দেই সত্যেন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। দাঁড়াইয়া উঠিতেই, কালো কোটের উপর বড় বড় বোতাম আঁটা এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি কামরায় ঢুকিয়া বলিলেন—টিকিট, মহাশয়?

সত্যেন্দ্র টিকিট বাহির করিয়া দিয়া, জিজ্ঞাসিল—কোন্ ষ্টেশন?

আগন্তুক সে কথার কোন উত্তর না দিয়া সত্যেন্দ্রের মুখের পানে দৃষ্টি স্থির করিয়া রহিলেন। এক মিনিট পরে বলিলেন আপনি কোথা যাইবেন, মহাশয়?

সত্যেন্দ্র বিরক্ত হইয়া কহিল—উহাতে লেখা নাই?

আগন্তুক বোধ করি হাসি গোপন করিতে একটা ঢোঁক গিলিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—আজ্ঞে মধুপুর।

হাঁ। এ কোন্ ষ্টেশন?

এটা খুর্দ্দা রোড। বি ওন্ আর।

হোয়াট্?—সত্যেন্দ্র সাহেবী কণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—হোয়াট্?

এটা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে নহে, মহাশয়। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে! এটা খুর্দ্দা রোড জংশন ষ্টেশন। এখান থেকে পুরী ব্রাঞ্চ বেরিয়েছে।

সত্যেন্দ্র কহিল—আপনি কি বলিতে চান

ভদ্রলোক বলিলেন আপনি গাড়ীর গায়ে লেখা দেখিতে পারেন।

সত্যেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গেই শার্শি খুলিয়া প্ল্যাটফরমের উপর প্রকাণ্ড প্রস্তর ফলকে যাহা দেখিল, তাহাতে আর সে দাঁড়াইতেই পারিল না—ধপাস্ করিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই।

খোলা জানালা দিয়া কন্‌কনে শীতের হাওয়া ঢুকিয়া পড়িতেছিল সত্যেন্দ্রের সেদিকে লক্ষ্য নাই। সে হতভম্বের মত চুপ করিয়া বসিয়াছিল, রেলকর্ম্মচারিটী কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন—কি করবেন ঠিক করলেন?

সত্যেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—ফেরবার গাড়ী কখন্?

কোন্ দিকের? হাওড়ার?—রাত্রে।

রাত্রে!—সত্যেন্দ্র হতাশভাবে বসিয়া রহিল।

ভদ্রলোক কহিলেন—আপনি এখানে রেষ্ট করিতে পারেন।

সত্যেন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—উত্তম!... আপনারা কিছুই আমার নিকট হইতে ভাড়া লইবেন! কত দিতে হইবে বলুন?

ষ্টেশনে আসুন।—বলিয়া ভদ্রব্যক্তি একটা কুলী ডাকিয়া সত্যেন্দ্রের বিছানা ও পোর্টম্যাণ্ট তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন। গাড়ী হইতে নামিয়া বলিলেন—আপনি কি ওয়েটিং রুমে থাকিবেন? কিন্তু আমি বলি, একটা বাঙ্গালী পরিবার যখন রহিয়াছি, আপনি যদি.....

বাধা দিয়া সত্যেন্দ্র বলিয়া উঠিল—ধন্যবাদ! আপনাকে আর কষ্ট দিই কেন?

ভদ্রলোক বলিলেন—কই! আপনি যদি কখন বাঙ্গালীবর্জ্জিত স্থানে, বিদেশে থাকিতেন, বুঝিতেন···

বাধা দিয়া, সত্যেন্দ্র এবার বাঙ্গালাতে জবাব দিল। বলিল—আমার আপত্তি নাই।

ভদ্রলোকটী কুলীটার উদ্দেশে কহিলেন আমার কুলী চলো। সত্যেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—তবে এইদিকেই আসুন।

ভাড়াটা ?

অন্য সময়ে দিবেন।

ফটকে মস্ত পাগড়ী পরা একব্যক্তি যাত্রীদের টিকিট লইতেছিল, সম্ভ্রমে দ্বার ছাড়িয়া দিয়া লম্বা কুর্ণীশ করিল। সত্যেন্দ্র বুঝিল, তাহার এই অপরিচিত সঙ্গী স্থানীয় কৃষ্ণ বিষ্ণুর কেহ হইবেন। সত্যেন্দ্র একটু বিস্মিত হইল। হইবারই কথা,—ভদ্রলোকটির পরিধানে যে কৃষ্ণবর্ণের কোট, তৎসংলগ্ন বোতাম—সাধারণ শ্রেণীর রেলকর্ম্মচারী-কেই পরিতে হয়, ইহাই ছিল তাহার ধারণা। রেলের আইন-কানুন তাহার জানা ছিল না, তাই সে ভাবিল, নিশ্চয়ই সাধারণ ও উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারীদেরও উহাই পরিতে হয়।

ফুল বাগানে ঘেরা একটি বাংলার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ভদ্রলোক একখানি চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন বসুন। আমি চায়ের যোগাড় দেখি।

এক মিনিট, এখনো আপনার নামটি জানিতে পারিলাম না।

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন—বিমলচন্দ্র বসু। মহাশয়ের ?

সত্যেন্দ্র মিত্র।

বোধ হয়, বিমলচন্দ্রের গলার স্বর শুনিয়া একটি যুবতী মেয়ে কাঠের পর্দ্দা ঠেলিয়া হাসি হাসি মুখে বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সত্যেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া লইতেই মেয়েটি গম্ভীর হইয়া বিমলচন্দ্রের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বিমলচন্দ্র বলিলেন—ওর ট্রেন ভুল হ'য়ে গেছল। মধুপুর যাচ্ছিলেন, তাড়াতাড়িতে ভুল ক'রে আমাদের লাইনের সেন্ডেন্ আপে উঠে পড়ে···

সত্যেন্দ্র বলিল—না, ভুল টুল নয়। আমি টাইম-টেবল দেখেছি তবে ট্রেনে উঠেছি।

বিমলচন্দ্র সহাস্যে কহিলেন—টাইম্-টেব্‌ল দেখেছেন ?

সত্যেন্দ্র, হাঁ, বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

অদূরে রক্ষিত পোর্টম্যাণ্ট খুলিয়া বলিল—এই দেখুন মহাশয় বিমলবাবু, কোন ভুল হয় নি।—সে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলের টাইম টেবলখানি বিমলচন্দ্রের হাতে দিল।

বিমলচন্দ্র সেখানি পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলেন—তাই ত! ৬ নম্বর প্ল্যাটফরম থেকেই ছাড়ছে ত - কি রকম হো'ল!

সত্যেন্দ্র বলিলেন—নিশ্চয়ই ভুল এ্যারেঞ্জমেণ্ট হ'য়েছে। এখানাকে ৬ নম্বর প্ল্যাটফরমে ঢুকিয়ে সেই গাড়ী খানাকে অন্য প্ল্যাটফরমে ঢুকিয়েছে।

বিমলচন্দ্র গম্ভীরমুখে বলিলেন—তা কি হ'তে পারে ?

না পারবে কেন বলুন। আমি আথ্‌ছার লক্ষ্য করেছি, একখানা ডাইন ট্রেণ লাগবার কথা ১ নম্বর প্ল্যাটফরমে, কোথাও কিছু বলা নেই, কওয়া নেই, লাগল এসে তিন নম্বরে। সেবারে পাঞ্জাব মেলে আস্‌ছি এলাহাবাদ থেকে, চিরকাল পাঞ্জাব মেল লাগে ১ নম্বরে, লাগল গিয়ে সাতে। আমার চাকর বাকর, মোটর সব ১ নম্বরের পাশেই দাঁড়িয়েছিল আবার খুঁজে বেড়াই।

এ রকমও হয় না-কি! বড় বড় ট্রেন সম্বন্ধে ত এ রকম হবার কথা নয়।

আমি নিজে ভুগেছি মশাই···

তা বটে! তবে নোটিশ টোটিশ নিশ্চয় দিয়েছিল। বিনা-খবরে ওরকম হওয়া সম্ভব নয়।

মেয়েটি এতক্ষণ টাইম-টেবলখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছিল, আস্তে আস্তে সেখানি মুড়িয়া বলিয়া উঠিল—একি বিষম ভুল! যদি কেউ দরকারী কাজে যেত, তার এই রকম অবস্থা হ'ত খুব—উঃ!

সে কথা আর বলতে—বলিয়া বিমলচন্দ্র টাইম টেবল টানিয়া লইয়া, বলিলেন—হয়ত ই-আই-আরের সেই গাড়ীটা অন্য প্লাটফরমে দিয়েছিল। অমেণ্ট ষ্টেশন হ'লে নানান্ গোল হয়।

সত্যেন্দ্র উচ্চকণ্ঠে কহিল—আমি ড্যামেজ আদায় করব, তবে ছাড়ব! উঃ—কি বিপদের খবর শুনে যে আমি বেরিয়েছিলুম তা কি আর বলবার! কি বলেন বিমল বাবু, রেল কোম্পানী দায়ী নয়?

বিমল বাবু চিন্তিতমুখে কহিলেন—হাঁ, মনে ত তাই হ'চ্ছে!

সত্যেন্দ্র কহিল—আপনাকে আমি সাক্ষী মান্‌ব।

তা মান্‌বেন—বলিয়া বিমলচন্দ্র যুবতীকে কহিলেন—চা বলে দিয়েছ? সত্যেন বাবু, উঠুন, এই বেয়ারা, বাবুকো গোসলখানা দেখলায় দেও।

সত্যেন্দ্র গোসল শেষ করিয়া যখন হলটায় প্রবেশ করিল, তখন বিমলচন্দ্র ধুতি ও জামা পরিয়া একখানা কেদারা অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, মেয়েটি আর একখানায় বসিয়া একমনে একখানা বাঙ্গালা দৈনিক পাঠ করিতেছিল, সত্যেন্দ্রের আগমনে উভয়েই দাঁড়াইয়া উঠিলেন, মেয়েটি সত্যেন্দ্রের দিকে চাহিয়া সহাস্যনেত্রে কহিল—ভিজে আপদ্য নাই ত?

সত্যেন্দ্র হাসিয়া জবাব দিল,—কিছু না।

সে এই প্রথম দৃষ্টি ভরিয়া মেয়েটিকে দেখিয়া লইল। সীমন্ত সিন্দুর-চিহ্ন হীন, সর্ব্বাঙ্গে যৌবন যেন রূপের বন্যা বহাইয়া দিতেছে!

সত্যেন্দ্র ভাবিতেছিল, মেয়েটি কে? বিমল বাবুর সাহেবিয়ানায় সে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তাঁহার উচিৎ ছিল, সর্ব্বপ্রথমে মেয়েটির পরিচয় দেওয়া। সে ত আর নিজে যাচিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। সত্যেন্দ্র বিস্ময় দমন করিতেছিল, মেয়েটি মধুর হাস্য পূর্ণ কণ্ঠে কহিল—ভাগ্যিস্ ট্রেন আপনার ভুল হ'য়েছিল তাই ত একজন বান্ধবীর মুখ দেখ্‌তে পেলুম!

বিমল বাবুও হাসিয়া কহিলেন—সে কথা আর বল্‌তে!

হাস্যপরিহাসের মধ্যে চা পান শেষ হইল। সত্যেন্দ্র বলিল—একবার আমাকে ষ্টেশনে যেতে হ'বে! একখানা জরুরী টেলিগ্রাফ পাঠাবার দরকার আছে।

মেয়েটি বলিল—তার জন্যে ষ্টেশন যেতে হ'বে কেন? আপনি লিখে দিন না, আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সত্যেন্দ্র আণ্ডারের নামে এইরূপ একটি তার লিখিয়া দিল—

হঠাৎ ট্রেনের গোলমাল হওয়ায় আমাকে এখানে আসিয়া পড়িতে হইয়াছে, রাত্রের পূর্ব্বে আর ট্রেন নাই। পৌঁছিবার সময় জানাইয়া আবার তার করিব।—সত্যেন।

সত্যেন্দ্র একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল—কা'কে দেব?

আমাকেই দিন্। পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তুরে চলিয়া গেল।

পাঁচমিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল আজই আপনি রাত্রের গাড়ীতে যাবেন?

সত্যেন্দ্র মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া নিরুত্তর রহিল।

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর বিমলচন্দ্র বাবু বলিলেন—বেশী নয়, আধঘণ্টার জন্য আমাকে একবার বাইরে যেতে হ'চ্ছে। আপনি ততক্ষণ বিশ্রাম করুন। কাঞ্চন রইল, গল্প চলুক। কি বল বিধি?

সত্যেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন সত্যেন বাবু, কোন দ্বিধা করবেন না, এটা আপনারই বাড়ী, বুঝলেন, যা দরকার টরকার হ'বে—আর বেবিজান ত আছেই—বলিয়া বিমলবাবু কাঞ্চনের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

কাঞ্চনও আর এক বিলোল-কটাক্ষে তাহার উত্তর দিল। সত্যেন্দ্রের বুঝিতে বাকী রহিল না যে কেন বিমলবাবু সাহেবী ভাবাপন্ন লোক হইয়াও এই যুবতীটির পরিচয় প্রদান করেন নাই। তন্মুহূর্তেই এতদুভয়ের পরিচয় সত্যেন্দ্রের মনের মধ্যে জলের মত সুস্পষ্ট হইয়া গেল। সে-ও নিশ্চিন্ত মনে ইহাদের হাসিতে যোগ দিল!

বিমল বাবুকে তাহার অসাধারণ সুখী বলিয়া মনে হইল, ভদ্রলোক-টি বেশ আছেন! বোধ হয়, সংসারে নিজের কেহ নাই, বিবাহাদিও হয় নাই —বেশ আছেন।

বিমলবাবু বলিলেন—তাহ'লে আমি চলি। —যুবতীর দিকে ফিরিয়া এমনই একটা ইঙ্গিত করিলেন যে, সত্যেন্দ্র তাহার অর্থই নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইল না। তবে আর একবার বিমলবাবুর সুখসৌভাগ্যে তাহার ঈর্ষা জন্মিল।

চলি কাঞ্চন!

সত্যেন্দ্র ভাবিল, কাঞ্চন! বেশ নাম-টি! শুধু কাঞ্চন! শুদ্ধ কাঞ্চন।

কাঞ্চন হাসিয়া বলিল—বেশী দেরী কর' না কিন্তু। তুমি এলে তাস খেলা চল্‌বে।

না—দেরী হ'বে না।—বলিয়া বিমলচন্দ্র হ্যাট্-কোট আঁটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কাঞ্চন জিজ্ঞাসিল—কি কি খেলা আপনার জানা আছে বলুন?

তাস্! তাস্ বড় একটা জানি নে—আমি!

তবে আর কি হ'বে—দুঃখক্লিষ্টস্বরে কথা কয়টি বলিয়া কাঞ্চন অন্যদিকে চাহিল।

কি-জানি-কেন, মেয়েটির করুণস্বরে সত্যেন্দ্রের বক্ষের কোন একটা কোমল স্থানে বেদনা বাজিয়া উঠিল।

সত্যেন্দ্র বলিল—একেবারে জানি নে, তা নয়, তবে আনাড়ী।

তা হোক্। তা'তেই চল্‌বে আমাদের।

মেয়েটির গোলাপী অধরে আবার হাসি ফুটিল। আধঘণ্টা হইয়া গেল, বিমলচন্দ্র বাবুর দেখা নাই। কাঞ্চন অধীরভাবে বলিয়া উঠিল—কোন হুঁস যদি থাকে!

সত্যেন্দ্র এ-কথার সায় দিল না। বোধ হয়, তাস খেলার আনাড়িত্ব প্রমাণ হইতে যত বিলম্ব হয় সে তাহাই চাহিতেছিল কিম্বা তাহার মনে অন্য কোন অভিসন্ধি ছিল, জানি না, একটু পরে বলিল —কাজে বেরিয়েছেন, একটু দেরীও হ'তে পারে।

কাঞ্চন বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, একবার খুর্দ্দার নদি বাবুর ওখানে যাবার কথা আছে বটে! আচ্ছা সত্যেন বাবু, আপনি কালকের দিনটা থেকে যেতে পারেন না?

সত্যেন্দ্র কাঞ্চনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কেন বলুন ত।

কাঞ্চন সাগ্রহে কহিল—কাল আপনাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। কাল আমার জন্মদিন, বাড়ীতে একটা উৎসব হ'বে। এ অঞ্চলে যে দু'তিন জন বাঙ্গালী আছেন, সবাই আস্‌বেন। আপনিও কালকের দিনটা.....

সত্যেন্দ্র বলিতে গেল—তাই ত.

তাহার একখানা হাত টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল, কাঞ্চন সহসা তাহার শুভ্র, রমণী সুকোমল হাতখানি তদুপরি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—বলুন, কালকের দিনটা থেকে যাবেন?

সত্যেন্দ্র বিহ্বলকণ্ঠে বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা—তাই থাকব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আধ ঘণ্টার স্থানে আট ঘণ্টা কাটিয়া গেল, বিমল চন্দ্র ফিরিলেন না। তাসের বাক্স টেবিলের পরে পড়িয়াই রহিল, নামিলও না, খোলাও হইল না। তবে সারাদিনটা হাত পরিহাসে কাটিয়া গেল। অপরাহ্নের দিকে নির্ম্মলচন্দ্র নামধারী জনৈক যুবক

আসিয়া জুটিলেন। 'ছোকরা' রঙ্গ-রহস্যেও যেমন, গীতবাদ্যেও তেমনি সুপটু! সন্ধ্যা হইতেই কাঞ্চন নির্ম্মলের হাত ধরিয়া এক রকম টানিতে টানিতেই হার্ম্মোনিয়ামে বসাইয়া দিল। ছোকরাও তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া একটির পর একটি করিয়া দশ বারোটি গান গাহিল। পুরুষের এমন সুমিষ্ট কণ্ঠ অল্পই শুনা গেছে, হার্ম্মোনিয়ামে, বেহালায়—এমন দক্ষতাও বেশী দৃষ্ট হয় না,—তবুও যে সত্যেন্দ্র এই সুরূপ, সুকণ্ঠ যুবকের প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, কেন কে জানে!

ছোকরা একটি গান শেষ করে, করিয়া যাহার পানে চায়, সে অমনি উঠিয়া গিয়া আনন্দবিহ্বলকণ্ঠে বলিয়া, ঢলিয়া—"আর একটি, আর একটি" করে, মুখে "আর নয়"—বলিয়া ছোকরাও আবার গলা ছাড়িয়া দেয়! সত্যেন্দ্রের বোধ করি এইটাই ভাল লাগিতেছিল না।

এক সময়ে গানের মধ্যেই সে একটু অন্যমনস্কের মত বসিয়া গিয়াছিল, তদ্দৃষ্টে কাঞ্চন ম্লানমুখে কহিল আপনার ভাল লাগছে না বুঝি! তবে বন্ধ করা যাক্—বলিয়া সে তন্ময়চিত্ত নির্ম্মলের দিকেই যাইতেছিল, সত্যেন্দ্র বলিল—না, না বেশ লাগছে আমার!

তবে চলুক্—বলিয়া যুবকটি সত্যেন্দ্রের ঠিক পার্শ্বে আসিয়া বসিল, এবং সেখান হইতেই নির্ম্মলকে বাহা বাহা গানের ফরমাস করিতে লাগিল।

আটটার সময় গান বন্ধ করিয়া নির্ম্মল উঠিয়া পড়িল। আচ্ছা, বসুন আপনারা—বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ঠিক তদ্মুহূর্ত্তে বিমলচন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া কোথায় ও কিরূপে এত দেরী হইল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহারই একটা মোটামুটি বৃত্তান্ত দিতে লাগিলেন।

৯টার সময় ডিনার শেষ হইল।

উভয়কে শুভরাত্রি জানাইয়া কাঞ্চন কক্ষান্তরে গমন করিতেই বিমলচন্দ্র বাবু বেহারাকে কি ইঙ্গিত করিলেন। বেহারা কাঁচের আলমারী খুলিয়া একটি বোতল ও দুইটি গ্লাস বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া সোডা আনিতে গেল। বিমল চন্দ্র সত্যেন্দ্রের উদ্দেশে কহিলেন—আপত্তি নাই?

সত্যেন্দ্র ইংরেজীতে ধন্যবাদ দিল।

আধঘণ্টা পরে উভয়ে যখন পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল, তখন বাংলার কোন্ প্রান্তে থাকিয়া মিঠা সুরে একটা ঘড়ীতে দশটা বাজিয়া গেল।

সত্যেন্দ্রের নিদ্রা হইল না। ট্রেণের গোলমাল হওয়ায় তাহার ক্ষতিগ্রস্থিটা সে খতাইয়া তুলিতেছিল।

বলা বাহুল্য, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শ্যামা ধরণীর মতই বেচারার মনটি প্রফুল্ল চন্দ্রকিরণ মাত হইয়া ঝিম ঝিম ঝিম করিতেছিল।

কল্পনা রাজ্য মথিত করিয়া সে কাঞ্চনের মত রূপবতী, গুণবতী আর একটি রমণীর সন্ধান করিতেছিল কিন্তু খুঁজিয়া খুঁজিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িল তেমনটি আর চোখেও পড়িল না বা মনেও দেখা দিল না। এমন অসঙ্কোচ ব্যবহার, প্রথম দিনেই এমন আত্মীয়বৎ স্নেহ আচরণ আর কোথায় দেখিয়াছে বলিয়া সত্যেন্দ্রের মনে হইল না।

পোর্টম্যাণ্টুটা সত্যেন্দ্র ঘরেই আনাইয়া রাখিয়াছিল, কল্প-বৃক্ষমূলে একটুখানি জলসিঞ্চন করিবার উদ্দেশ্যেই সে হাতড়াইতে হাতড়াইতে আলো জ্বালিয়া ফেলিল।

আর কোন সন্দেহ রহিল না। অল্পক্ষণ মধ্যেই কাঞ্চনকে একমাত্র উচ্চশিক্ষিতা, সর্ব্ব শোভাময়ী, প্রেমময়ী নারীজ্ঞানে উদ্দেশে বার বার ভক্তি জড়িত কণ্ঠে তাহার নামোল্লেখ করিয়া সত্যেন্দ্র শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। পূর্ব্বে যে একটুখানি সঙ্কোচ বা কিসের একটা ভাব ছিল, প্রবল বন্যায় এক ঝলক ফেণার মত কোথায় যে ভাসিয়া গেল তাহার ঠিকানাই রহিল না।

পরদিন নিদ্রাভঙ্গ হইতে আট্‌টা বাজিয়া গেল।

সত্যেন্দ্র বাহিরে পদার্পণ করিতেই বেহারা জানাইল, সাহেব চায়ের টেবিলে বসিয়া আছেন।

সত্যেন্দ্র হঠাৎ জিজ্ঞাসিল—ও মেয়েছেলেটী কোন্ হ্যায় ?

প্রশ্ন করিয়াই সত্যেন্দ্রের মাথা কাটা যাইতেছিল। বেহারা সগর্ব্বে 'আপ, আস্তা নেই'—বলিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, সত্যেন্দ্র বাধা দিয়া—ঠিক হ্যায়—বলিয়া স্নান কক্ষের দিকে চলিয়া গেল।

মিনিট কুড়ি পরে সত্যেন্দ্র এ-ঘরে ঢুকিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্তের মত বলেতেছিল—আমি বড় লজ্জিত···

কাঞ্চন এক মুখ হাসিয়া—না, মশাই না, অত লজ্জিত হইতে হইবে না—বলিয়া চায়ের কেৎলি তুলিয়া লইল। সত্যেন্দ্র আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল।

কাঞ্চন বলিল—চলুন, সত্যেন্দ্র বাবু খানিক বেড়িয়ে আসা যাক্।—যাবেন ?

সত্যেন্দ্র বিমলচন্দ্রের দিকে ফিরিতেই তিনি বলিলেন—আমার ত আজ এখনই কাজে বেরুতে হ'বে সত্যেনবাবু! আপনারা দু'জনেই বেরিয়ে পড়ুন। শীতের রৌদ্রে ট্রলি চড়ে—মন্দ লাগবে না!

বাহিরে আসিতেই দেখা গেল, বাংলার পাশ দিয়াই যে দুইটা লাইন চলিয়া গিয়াছে, তাহারই উপর একখানি ট্রলি ও তাহারই নিকটে লাল পাগড়ী পরা চারজন বাহক দাঁড়াইয়া আছে।

সত্যেন্দ্র কাঞ্চন ট্রলিতে উঠিয়া পড়িতেই বেহারা ক্ষেমে-আঁটা একটি কুঁজা গ্লাস ট্রলিতে রাখিয়া গেল।

সত্যেন্দ্র ইতিপূর্ব্বে কখনো ট্রলি চড়ে নাই। ট্রলি চড়া যে এমন আনন্দদায়ক সে তাহা জানিত না। পিছনে অলক্ষ্যে থাকিয়া বাহকচতুষ্টয় মধ্যে মধ্যে নামিয়া দুইটা লোহার হাতল ধরিয়া গাড়ীখানাকে খানিকদূর ঠেলিয়া যাইতেছে, গাড়ীর গতিবেগ বৃদ্ধি হইলে লাফাইয়া উঠিয়া পড়িয়া সেই হাতল দু'ইটিরই উপরে বসিয়া পড়িয়া পাগড়ী খুলিয়া বাতাস খাইতেছে। দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড ষ্টেশন পার হইয়া হু-হু শব্দে তাহারা প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিল।

কাঞ্চন দু'হাতে ঠিক কাণের পাশেই কাপড় চাপিয়া ধরিয়া হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, সত্যেন্দ্র বিহ্বলনেত্রে তাহার সেই লজ্জা ও হর্ষ-বিজড়িত আরক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে।

অদূরে কুণ্ডলাকৃতি ধূমরাশি দেখিয়া কাঞ্চন সহর্ষে কহিল—ট্রেন্ আসছে।

সত্যেন্দ্র ভয়চকিতস্বরে কহিল—ট্রলি নামাবে ত ?

কাঞ্চন হাসিয়া বলিল—কাটবে'খন—দেরী আছে। আচ্ছা সত্যেনবাবু, এটা যদি রাত্রি হত, আর আমরা কেউ-ই ট্রেনখানাকে দেখতে বা তার শব্দ শুনতে না পেতুম, ট্রেন হুড়মুড় করে আমাদের ওপর দিয়ে চলে যেত—তা হ'লে কি হ'ত।

কি-আর হ'ত ?—মৃত্যু!

এমনই বা কি!—বলিয়া কাঞ্চন হাসিয়া দক্ষিণ হস্তে ব্রেক কষিতে লাগিল।

তাহারা লাইনের পার্শ্বে দাঁড়াইল। সুবৃহৎ মাল গাড়ীখানা ভীষণ গর্জ্জন করিয়া চলিয়া যাইতেই আবার ট্রলি বাসন হইল! কাঞ্চন জিজ্ঞাসিল—ফিরবেন না কি ?

চলুক না খানিক! না না, রৌদ্রে আপনার কষ্ট হ'চ্ছে।

রৌদ্রে! না!—সে একটু ম্লান হাসি হাসিল।

সত্যেন্দ্র বলিল—আপনার মুখ দেখে আমি বেশ বুঝতে পারছি আপনার কষ্ট হচ্ছে। আচ্ছা রৌদ্রে নয় ত কিসে বলুন ?

ট্রলি চলিতেছিল।

কাঞ্চন বলিল—না, ওকিছু না। ঐ যে পাহাড়টা

দেখছেন, এ লাইনের যত খোয়া, পাথর, সব ঐট কেটে কেটেই হ'চ্ছে।

সত্যেন্দ্র বলিল—হোক্ গে, তা জানবার আমার দরকার নেই। আপনার কি কষ্ট হ'চ্ছে বলুন?

কি হ'বে শুনে সত্যেন বাবু?

বলবেন না ত?

বলছি, বলছি।—কাঞ্চন এক মুহূর্ত্ত পরে বলিতে লাগিল, আজ আমার জন্মদিন। জন্মদিনে মান্য অতিথির সম্মান রাখা কর্ত্তব্য! কি দিয়ে যে সে সম্মান রাখ্‌ব তাই ভাবছি।

সত্যেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। কাঞ্চন কি উদ্দেশ্যে কথা কয়টি বলিল কে জানে, কিন্তু তাহার মনে হইল কাঞ্চনের জন্মদিনে তাহাকে একটা কিছু উপহার না দেওয়া অকর্ত্তব্য! এখানে কি বা পাওয়া যাইবে! যাক্—"বাংলায় ফিরিয়া বিমল বাবুর সহিত পরামর্শ করা যাইতে পারিবে" ভাবিয়া নীরব হইল।

কাঞ্চন দুঃখিত স্বরে কহিতে লাগিল—আমাদের এই নিয়ম, সত্যেন বাবু যে জন্মদিনে আত্মীয় স্বজন সকলকেই একটা উপহার দিতে হয়।

আপনাদের এই নিয়ম?

সে কথা না শুনিয়াই কাঞ্চন বলিতে লাগিল—যদি বা ভাগ্যবশে এমন একজন অতিথি পেলুম, এমনই হতচ্ছাড়া দেশ এ, যে কিছুতেই আপনার মান রাখ্‌তে পারব না।

আপনাদের নিয়ম ত দেখি উল্টো!

তা হ'বে—বলিয়া মেয়েটী ম্লান মুখখানি নত করিল।

সত্যেন্দ্র আবেগভরে কহিল—অন্যত্র প্রথা যে যার জন্মদিন উৎসব হয় তা'কেই সকলে উপহার দেয়। অন্ততঃ গেরস্থ···

হতে পারে। আমাদের সে রীতি নয়।

কিন্তু তুমি কি আমার উপহার নেবে না কাঞ্চন? আমি যদি কিছু দিই, প্রত্যাখান করবে? —নেবে না?

কাঞ্চন বলিল—কেন নেব না! তুমি দিচ্ছ—আমি কি ফেরাতে পারি। কিন্তু তুমিও আমার সামান্য উপহার গ্রহণ করবে—বল?

সত্যেন্দ্রের কণ্ঠ স্ফীত হইয়া উঠিল, কম্পিতকণ্ঠে বলিল—করব,—করব!

কাঞ্চন বলিল—চল ফেরা যাক।

এখনি?

হাঁ—আর রৌদ্র সহ্য হচ্ছে না।

তবে চল—বলিয়া সত্যেন্দ্র বাহকদের গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের আজ্ঞা দিল।

সত্যেন্দ্রের বরাত ভালোই বলিতে হইবে। রেলের লাইন পরীক্ষক এ্যাবরক্রম্বি সাহেবের স্ত্রীর এক ছড়া মুক্তামালা বিক্রয়ার্থ ছিল। দেড় হাজার টাকার একখানি চেক্ লিখিয়া দিয়া সত্যেন্দ্র মালা ছড়াটি পকেটে পুরিল। এ্যাবরক্রম্বির মেম্ (ঘাগরা পরেন বলিয়া—মেম্!) কেবল মাত্র বোস্ সাহেবের মুখ চাহিয়া চেক লইতে সম্মত হইলেন, নতুবা নেটিভদের চেকে তাঁহার আদৌ শ্রদ্ধা ছিল না।

(আগামী-বারে সমাপ্য)

প্রেমের রূপ

(শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী)

নীলের বুকে সাদার বলক—চোরাবালির চর,
তারি শেষে বাঁকের মুখে একটু ছোট ঘর ;
কোলের কাছে জলটি নাচে,
চোখটি সদাই চম্‌কে আছে—
কখন পাছে হারায় বা তার সেইটুকু নির্ভর !

বলে গেছে, এই পথে সে আস্‌বে পুনরায়—
ঠাঁইটুকু তাই ছাড়্‌তে নারি পরাণ ধরে', হায় !
চৈত্ররবি অস্তি হানে
ভাদ্র এসে ভাসায় বানে—
সবাই আমার মুখের পানে অবাক মেনে' চায় !

সেই থেকে তাই পড়ে' আছি, হ'ল কত দিন,
বারোমাসের বোঝা বয়ে গেছে বছর তিন ;
কুঁড়ের চালে নাইক পাতা,
কোনমতে লুকাই মাথা—
কোন্ বিধাতা তবে যে মোর চুকিয়ে লবে ঋণ !

নদীর পরে নয়ন মেলে চুপ্‌টি বসে' থাকি—
নৌকা আমার কখন্ এসে ফিরে বা যায় না কি !
টিটিপাখীর টিট্‌কারীতে
চম্‌কে' ফিরি আচম্বিতে,
গাংচিলেরা অম্‌নি আবার লাগায় ডাকাডাকি !

বাব্‌লা বনের ঝাপ্‌সা কোণে 'চিকেস্' ডুবে' যায়,
ঝিঁঝিরা সব ঝাঁঝর বাজায় সাঁঝের আঙিনায় ;
হাৎড়ে বেড়ায় পাগল হাওয়া—
কি যেন তার হয় না পাওয়া,
সিন্ধুশিরিষ শিউরে' ওঠে তটের কিনারায়।

সারা নিশি শুনি, পাশেই চখারা যায় ডেকে,
সকাল বেলায় দেখি, পায়ের চিহ্ন গেছে রেখে ;
চারিধারে খোঁপাই তাকাই,
ধরে' রাখার কিছুই না পাই—
একটি দুটি ঝরা পালক তাই বুকে দি তাই রেখে।

মাঝে মাঝে ধানিক-পাড়ার একটি শুধু বাঁশী,
গভীর রাতে প্রাণের পাতে পরশ করে আসি ;
হয়ত কে কার কাজের শেষে
কাহার লাগি কি উদ্দেশে
পাঠায় তাহার গোপন কথা বাঁশীতে উচ্ছ্বাসি !

তন্দ্রাঘোরে যেদিন দূরে শুনি পাঁড়ের টান,
ধড়্‌ফড়িয়ে উঠে' ভাবি, দুয়ারে ভগবান !
ছুটে' গিয়ে জলের ধারে
চোখ্‌টি বিঁধে' অন্ধকারে
চেয়ে দেখি, উজান চলে জেলের তরিখান !

আঁধার নিশি কাজল যেদিন পরায় নদীর চোখে,
সজল ব্যথা লুকিয়ে বুকে গুম্‌রে' চলে ও কে !
জ্যোৎস্না এসে হাঁসের পাখায়
লুকিয়ে যখন অস্ত যায়—
ভাবি, আমায় কে দেখে' যায় চপল চন্দ্রালোকে !

এমনি করে' দিন কাটে মোর বিজন নদীচরে,
শূন্যে-ভরা আকাশ-ধরার অথৈ অবসরে ;
আস্‌তে যেতে নদীর পথে
কেউ বা চাহে সুদূর হ'তে,
কেউ চাহেনা বাঁধ্‌তে তরি চোরাবালির ডরে।

সেদিন রাতে কোথায় হ'তে উঠ্‌ল হেঁকে ঝড়,
ঢেউএর ঘায়ে জাগ্‌ল কেঁপে চোরাবালির চর ;
জলের গায়ে সাপ খেলিয়ে
চম্‌কে চাওয়া চোখ মেলিয়ে
মেঘের জটা উড়িয়ে দিল প্রলয় বাতাকর।

তারি মাঝে হঠাৎ যেন স্বরটি এল কানে,
মনটি যারে মনের মধ্যে ভাল করেই জানে ;
অজানা কোন্ সুখের ঘায়ে
চন্‌চনিয়ে উঠ্‌ল গায়ে —
মনে হ'ল শেষ হ'ল সব সহসা সেইখানে।

বলেছিল আস্‌বে ফিরে', মিথ্যা সে কি হয় ?
প্রেমের বাণী মিথ্যা হবে, প্রাণের পরাজয় !
অবশ বাহু কণ্ঠে তুলে'
আচম্বিতে আগল খুলে'
চম্‌কে দেখি, হায়রে একি ! এত সে জন নয় !

এ যেন কোন্ অচিন্ অতিথ্—মৃত্যুলোকের চর,
রক্তে-ভরা শুভ্র তাহার সর্ব্ব-কলেবর ;
ওষ্ঠে ফুটে দারুণ ব্যথা,
চক্ষে করুণ বিহ্বলতা,
কোন্ সমাধির তমস্রতা আননে ভাস্বর !

তবু যেন তারি সাথে কোন্‌খানে মিল আছে,
পুরাণো সেই আপন আসে নূতন রূপের পাছে ;
মাধুর্য্য ও ভীষণতায়
দুটি চোখে দুইজনে চায়—
ভালবেসে, ভয় করে তাই—এগিয়ে যেতে কাছে।

তুষার-শীতল হাতটি আমার পরশ করে' হাতে,
ঝড়ের গলায় কইল শুধু পারবে যেতে সাথে ?
কোনমতে শুধানু তায়—
কোথায় ওগো, ওগো কোথায় ;
সঙ্কেতে সে চাইল কেবল নদীর সীমানাতে !

ঝিলিক-হানা বাজের আওয়াজ কড়কড়িয়ে বাজে,
জলের বুকে ঝড়ের ঝাপট প্রলয়বেগে সাজে,
তারি অসীম অতল তলে
সে কি আমায় ডুবতে বলে ?
সেইখানে কি মিল্‌বে মণি অন্ধকারের মাঝে !

তারপরে আর কি যে হ'ল, মনে সে আর নাই,
জেগে দেখি, আছি পড়ে' চরের কিনারাই,
পূর্ব্বকথা স্বপ্ন সম
জাগ্‌ছে শুধু বক্ষে মম
জীবন মরণ এক হয়ে মোর মুখের পানে চায়।

গাংচিলেরা তেম্‌নি পাখে করছে ডাকাডাকি,
রৌদ্রালোকে বালির চরে তেম্‌নি মাখামাখি,
নদীর বারি কৌতূহলে
তেম্‌নি করে শুম্‌রে চলে,
নাই শুধু সেই পরশমণি, মরণ শুধু বাকী।

জাহাজে সাত দিন

(ভ্রমণ)

(শ্রীমতী খুরশিদজাহা বেগম)

৮ ফেব্রুয়ারী, বুধবার

আজ আমাদের সুন্দরবনের জাহাজে রওয়ানা হওয়ার দিন। আমরা গত ২৩শে ডিসেম্বরে চেঞ্জের জন্য কলিকাতায় এসেছি। ভাই বোনেরা ও মা সবাই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। চিকিৎসায় অসুখ সেরেছে, কিন্তু শরীর সারে নি, তাই আমাদের

২৪দিনের আকাঙ্খা পূরণ কর্‌তে ও ভাই বোনদের শরীরও সারবে মনে করে আমরা সুন্দরবন হ'য়ে বড়মা যেতে মনস্থ করেছি। দাদা ও ভাসুরঠাকুর গেলেন জগন্নাথ ঘাটে টিকিট কর্‌তে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁরা ফিরে এসে বললেন "আজ অনেকগুলি সাহেব মেম ডিব্রুগড়ের যাত্রী আছেন, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছি টিকিট কর্‌ব কিনা?" এই শুনে আমরা সকলেই না যাওয়ার জন্যে নিরাশ হলেম, কেননা এতগুলি সাহেব মেমের সঙ্গে যেয়ে কোন সুবিধা পাওয়া যাবে না, সর্ব্বদা এটিকেট অনুযায়ী চল্‌তে হবে। সুতরাং আমাদের এত বড় উৎসাহ ও আনন্দ হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। যাত্রার আয়োজন হঠাৎ ভেঙ্গে গেলে যেমন মনমরা হয়, ছেলেমেয়েরা সবারই তাই হ'ল। তবে জাঠাকুরাণি আমাকে আরও একদিন পেলেন মনে ক'রে সুখী হলেন। যাক আমরা কোন রকমে মনমরা হয়েও একটা দিন কষ্টে-সৃষ্টে কটালুম। দিদি রাত্রে বাড়ী চ'লে গেলেন। কাল সকালে আবার আস্‌বেন।

৯ই বৃহস্পতিবার— সকালে ৮টার সময়েই দিদি এলেন। আমরা সমস্ত দিনই অপেক্ষা কর্‌ছি কবে যাত্রী হব। তবে বন্ধু-বান্ধবদের বিশেষতঃ দিদিকে ছাড়্‌তে মনটা কেমন ব্যাকুল হ'য়ে উঠছে। যাক্ রাত্রি ১০টায় আমরা ঘাটে এলাম্। সাড়ে দশটায় জাহাজখানি ঘাট থেকে নিয়ে যেয়ে মধ্য-নদীতে রাখ্‌বে। এটা কিন্তু ভালো লাগ্‌ল না। দিদি ও বন্ধুরা সকলে নেমে গিয়ে ঘাটে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনেকদিন দিদিকে পেয়ে আবার ছাড়তে মনটা বাস্তবিকই বড্ড ব্যাকুল হতে লাগল। যতক্ষণ ঘাটটী দেখা গেল, আমরা নির্নিমেষ নয়নে তাঁদের দিকে চেয়ে রইলাম। দিদিও একটী ব্যাটারী ল্যাম্প হাতে নিয়ে যতক্ষণ জাহাজ দেখা যায় দেখ্‌তে লাগলেন। দাদা ও ভাসুর-ঠাকুরকে ছেড়ে কেমন মনমরা হয়ে গেলেন। তাঁর ছুটী নেই নইলে তাঁদেরও সঙ্গে নেওয়া যেত। এই ষ্টীমারে আজ আমরা ছাড়া আর 1st class, কি 2nd class কোন যাত্রীই নাই। কাজে কাজেই আমরা বেশ সমস্তগুলি ক্যাবিনই দখল করে আরামে শোবার বন্দোবস্ত কর্‌লাম। রাত্রী ১-৪৫ মিনিটে হাওড়া ব্রীজ খোলা হ'ল। আমরা ষ্টীমার থেকে দেখতে লাগ্‌লাম। এখন চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল, নীলাকাশে অসংখ্য নক্ষত্র-রাজিসহ চন্দ্র বিরাজ করিতেছে। নীচে কলিকাতা মহানগরীর অসংখ্য আলোকরাজি নদীর জলে পড়ে এক অপরূপ শোভা ধারণ করেছে। ঠিক ২টার সময় হাবড়া ব্রীজ পার হলেম। আমাদের এই "মহন্ত" ষ্টীমারখানি এই লাইনের বড় জাহাজ।

১০ই শুক্রবার,

সকালে ৮টার সময় মা আমাকে ডেকে ঘুম ভাঙ্গালেন। ঘুম থেকে উঠে দেখি কি সুন্দর শোভা, সূর্য্য উদয় হয়েছে, নদীতে তার কিরণচ্ছটা পড়ে সে বর্ণনার অতীত শোভা বিস্তার করেছে। নদীর জলে সূর্য্যের কিরণ মিলে ঝক ঝক কর্‌ছে, যেন হীরক খচিত একখানি চাদির ওড়্‌না। আর তারি উপর দিয়ে অবিরাম গতিতে আমাদেরি মত আরও দু'এর খানি জাহাজ মাঝে মাঝে চলছে। চা খেয়ে, আমরা ডেকে এসে বসলাম। ১১টার সময় "ডায়মণ্ড হারবার" পারে বসলাম। এখানে নাকি সমুদ্র একটু মিশেছে। কি বড় নদী? এর আগে এত বড় নদী আর কখনও দেখি নাই। চারিদিকে শুধু জল, তা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। উপরে অনন্ত আকাশ, নীচে অনন্ত জল। জাহাজের গায়ে উদ্যম তরঙ্গের শুভ্র ফেণার কিরীট মাথায় পরিয়া উন্মত্তের ন্যায় আছাড়িয়া পড়িতেছে, আবার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে। এই দৃশ্য আমরা আত্মবিস্মৃত হইয়া মুগ্ধ নয়নে দেখতে লাগিলাম। আমরা এই যাত্রাটায় খুবই আনন্দ পেতে লাগলাম, তবে দিদিরা থাকলে

আরো খুব আনন্দিত মনে থাকা যেত। তাঁদের জন্যে মনটা কেমন করতে লাগল।

নদীর বিশুদ্ধ হাওয়াতে আহারের সুযোগ লেগেছে। স্টুয়ার্ডকে খুব তাগাদা করে ১২-৩০ টায় সময় ডাইনিং রুমের সর্ব্বাপেক্ষা বড় টেবিল খানাতে আমরা পরম উৎসাহে খেতে বসলাম। খাওয়ার পর বাবা প্রস্তাব করলেন "কাল রাত্রে ঘুম ভালো হয় নি এখন সকলেই একটু ঘুমিয়ে নাও।" আমরা সকলেই তাঁর অনুমোদন করে নিজ নিজ স্থানে শুতে চলে গেলাম।

সুন্দরবনের ভিতর জাহাজখানি ঢুকছে বলে, বাবা আমাদিগকে পাঁচটার সময় ডেকে তুললেন। উঠে দেখি বাঃ সত্যই সেই বিশাল অনন্ত নদী অতিক্রম করে একটী ছোট মুখের ভিতর ঢুকছি। দু'দিকে শুধুই জঙ্গল। বাবা একটী পাখী মারলেন। একধারে কতকগুলি বানর দেখে হরিণ বুঝে খুব এক দফা গোলমাল করা গেল। শেষটায় দেখা গেল—অলুক্ষণে বানর। শুনছি কাল দিনে ঠিক সুন্দরবনের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ষ্টীমার যাবে এবং সেখানে সব রকম জন্তু শিকারের জন্য পাওয়া যাবে।

সাড়ে ৬টায় সকলে মিলে চা খেয়ে ডেকে বসা গেল এবং সূর্য্যাস্তের সৌন্দর্য্য দেখতে লাগলাম। অনেক বইয়ে পড়েছি, নদীর উপরে সূর্য্যাস্ত না কি খুব সুন্দর। দার্জ্জিলিঙে সূর্য্যোদয় দেখেছিলাম, আজ নদীতে সূর্য্যাস্ত দেখছি, বাস্তবিকই এটা দেখবার জিনিষ। শুধু চোখ দিয়ে দেখা ও মন দিয়ে অনুভব করা যায়, কিন্তু আমার মত অশিক্ষিতা তা বর্ণনা করতে পারবে না। অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যের লোহিত আভা ও উজ্জ্বল নীলাকাশের নীল রংএ মিলে নদীর জলে এক অপরূপ শোভার সৃষ্টি করেছে। কতকটা সুন্দরীর চারু অঙ্গে ধূপছায়া বেনারসী শাড়ীর অনুরূপ দেখাচ্ছে। Kodak দিয়ে দু'একটী 'স্নাপ্ শট' নিতে চেষ্টা করছি, জানি না ঠিক হবে কি না।

রাত্রে নূতন আর কিছুই দেখা গেল না। খানিকক্ষণ বসে খেলা গেল, দাদা একা একা কতক্ষণ হারমোনিয়ম বাজাইলেন কিন্তু তাঁর জুড়িদারেরা কেহ নাই, কাজেই জমল না তেমন। জাহাজখানি আজ খুব ধীরে ধীরে চলছে, যাহাতে কাল সকালে আমরা আসল জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি—এই আশায়।

১৮ই শনিবার,

সকালে ৬টার সময় সারেঙ্গদের ডাকাডাকিতে তাড়াতাড়ি সকালে উঠে ডেকে আসা গেল। সে এক অভিনব দৃশ্য, একবার পশ্চিমে মথুরায় দিল্লী ও জয়পুরসিক্রীতে দেখেছিলুম, আর আজ দেখছি তা ছাড়া বঙ্গদেশে এর আগে আমি প্রথম দেখি নাই। প্রায় ২০।২৫টী হরিণ জঙ্গলের মধ্যে খেলা করছে ও ঘাস খাচ্ছে। দাদা তা দেখেই তাদের মারতে ভুলেই গেলেন। যাক তবুও বাবার তাড়াতে ফায়ার করলেন, জাহাজও থেমেছিল কিন্তু স্রোতের গতি এত বেশী ছিল যে আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ জাহাজ স্থির হ'য়ে না থাকাতে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল। আর হরিণ-গুলি অমনি বিদ্যুৎগতিতে পালিয়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে গেল। আমরা ত' হতাশ হয়ে গেলাম। তবে জাহাজের লোকেরা বলে এর পরে অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে, তখন জাহাজ নঙ্গর করে জালি বোট নামিয়ে মারা যাবে। এই জন্য আর বেশী চেষ্টা করা হল না। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি দুর্গতি যে আর পাওয়াও গেল না।

জাহাজখানি পরশু দিন কলকেতা ছেড়েছে। এর মধ্যে আর কোনখানে থামে নাই। কত প্রান্তর খাল বিল—মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম অতিক্রম করে নীরবে চলেছে, এবং জাহাজের বংশীধ্বনিতে কদাচিৎ এক আধটি মৃগশিশু দলভ্রষ্ট হয়ে নিমিষে

অদৃশ্য হ'তে যাচ্ছে। দিগন্তে ধূসরাভ্র অন্ধকার করিয়া আছে, আর তারই নিম্নে নদীর বক্ষাংশে শুভ্র জলরেখা প্রকৃতি দেবীর শাড়ীর অঞ্চলের ন্যায় বোধ হইতেছে।

ধীরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসছে জঙ্গল প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে দু'একখানি গ্রামও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে বিধাতার এই অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে কেবল এই গানটী মনে পড়তে লাগিল।

"এই বিশ্ব মাঝে, যেখানে যা সাজে তাই দিয়ে
তুমি সাজায়ে রেখেছ,
বিবিধ বরণে বিভূষিত ক'রে তার উপরে
তোমার নামটী লিখেছ।
পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয় তোমার দয়াল নামটী লেখা,
সুন্দর নামটী বিহঙ্গের অঙ্গে আঁকা—
প্রেমানন্দ নামটী নয়নে লিখেছ।"

বেলা ৬-৩০ টায় জঙ্গল একেবারে ফুরিয়ে গেছে। প্রথমে কাল যে অলৌকিক নিসর্গ দেখা গেছে, এরপরই আর হরিণ পাওয়া গেল না। আমার সব ছোট বোন সেলিমার আজ আবার জ্বর এল। আজ কয়েকদিন থেকেই পেটের অসুখ ছিল। ভগবান তাকে শীঘ্র সুস্থ করে দিন, এই তাঁর চরণে প্রার্থনা।

রাত্রি ১০ টায় খুলনায় পৌঁছিলাম। কিন্তু এখানে কোন মাল বা প্যাসেঞ্জার না থাকায় জাহাজ তীরে লাগল না শুধু একটু থামিয়ে আড়কাঠি নেওয়া হ'ল এবং আমি দিদিকে যে চিঠি লিখেছিলাম সেখানি চাপরাশীর হাতে পোষ্ট করতে দিলাম।

শীত খুবই পড়েছে এবং শুক্লপক্ষের রাত থাকা সত্ত্বেও কুয়াসার জন্যেই সার্চ লাইট দেখান হচ্ছে, নইলে দু'বার জাহাজ চড়ায় আটকে গিয়েছিল। খুলনার জল খুবই সুন্দর, কিন্তু রাত্রি বলে ফটো নিতে পারলুম না। থাক কাল সকালে মাদারীপুরে নেওয়া যাবে। আমি আর ছোট ভাই বুলু দু'জনেই ছবি তুলতে ওস্তাদ তবে আমার নম্বর দিদির কাছে লিখে নেওয়া হয়েছে, এখন তার পরিণাম কি হবে বলতে পারি না!

১২ই রবিবার—

সকালে ৭ টার সময় মায়ের ডাকে ঘুম থেকে উঠে দেখি প্রভাত-রৌদ্রে মুক্ত প্রকৃতি পরিপ্লাবিত। ধীরে ধীরে শীতল বাতাস বইছে। জাহাজ এখন নদী ছেড়ে একটী ছোট নালা দিয়ে চলেছে। পথের পার্শ্বে ধানের ক্ষেত, আমের বাগান, বাঁশ ঝাড়, কলার বাগানে পাখীর কলগান, কৃষক কুটীরে বালক বালিকার দুষ্টু কল্লোল। মাঝে মাঝে খড়ের চাল দেওয়া চারিদিকে খোলা পাঠশালায় গুরুমশায়ের কাছে সারিবদ্ধ বালকেরা চিৎকার করে পাঠাভ্যাস করছে। মুক্ত মাঠের উপর প্রাতঃ সূর্য্যের দীপ্তালোক। আমি বিস্ফারিত নয়নে এই সুন্দর দৃশ্য দেখতে লাগলুম। বাস্তবিক এই বঙ্গপল্লীর অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য শুধু আমাদের দেশে দৃষ্টিগোচর হয়। কেবল মনে হতে লাগল,

"এমন শুভ্র নদী কাহার,
কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র
আকাশ তলে ভাসে,
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে।"

এমন সুন্দর ধানের ক্ষেত হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন একখানি বহুমূল্য কাশ্মিরী সবুজ রংএর কার্পেট পাতা রয়েছে। বেলা ১১-৩০টায় মাদারীপুর বন্দরে জাহাজ দীর্ঘকাল চলিবার পর লঙ্গর করিল। বাবা, দাদা, বুলুরা সব নেমে বাজারে গেলেন মেঠাই, দই, করিদপুরের প্রসিদ্ধ গুড় আনতে। বুলু ছোট নৌকা নিয়ে চাটকা দুইটী ইলিস্ মাছ কিনে আনলে। জাল দিয়ে গঙ্গা থেকে ইলিস্ মাছ তোলা এ দৃশ্য দেখি নাই। এক একবার জালে

৩০।৪০টী মাছ তুলছে, তাহাতে সূর্য্যের জ্যোতি পড়ে কত বিচিত্র রংএর সৃষ্টি করছে।

জাহাজের সারেঙ কেরানীরা বাটলার বাবুর্চ্চী সব আজ আমাদের অতিথি। ঘণ্টা দুই মাদারীপুরে থাকার পর জাহাজ ছেড়ে দিল। এখান থেকে ঢাকা খুব নিকটবর্ত্তী। এখানকার রসগোল্লা খুব উৎকৃষ্ট। আজ পূর্ণিমার রজনী, পূর্ণ জোয়ারে পদ্মা ঝলমল করছে। বাহিত দর্শনে বিরহিনীর প্রাণ যেমন নাচিয়া উঠে, চন্দ্র দর্শনে পদ্মার হৃদয়ও তেমনি উথলে উঠছে। ষ্টীমার বজরা প্রভৃতি যাত্রী-ভাবে নদীতে বিচরণ করছে। মাঝে মাঝে ষ্টীমারের বংশীধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

আজ ১০টার সময় আমরা গোয়ালন্দে পৌঁচেছি। সেলিমার জন্ত ডাক্তারের অনেক খোঁজ করা হোল, কিন্তু ডাক্তার কোথায় বেরিয়ে গেছে কাজেই নিরাশ হয়ে হোমিওপ্যাথিক চালাতে লাগলুম। ভগবানের অসীম দয়ায় তাহাতেই আশাতিরিক্ত ফল হোল। দাদা এখানকার ঘাটের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন, তিনি খুব খাতির করে বল্লেন "জাহাজ এখানে দু'দিন থাকবে, আপনারা আমার ষ্টীমলঞ্চ নিয়ে শীকার করতে পারেন। এখানে খুব শীকার।" দাদা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর ষ্টীমলঞ্চ নিয়ে শীকারে গেলেন। রাত্রে দাদা শীকার করে ফিরলেন, তাঁর সঙ্গে কথা কইতে ও শীকার দেখ্‌তে ব্যস্ত হয়ে বাবা তাঁর গায়ের কোটটী খুলে ডেকে চেয়ারের উপর রেখে ঘরের ভিতর এসে বস্‌লেন। খানিকক্ষণ পরে গিয়ে দেখেন কোট নাই। সারেঙ অনেক খোঁজ করল কিন্তু কিছুতেই পাওয়া গেল না। দাদা গোলমাল করতে চাইলেন, বাবা বললেন "যাক্ যা যাবার তা গেছে, অনর্থক গোলমাল করে কি হবে।" আজ রাত্রে ষ্টীমার এখানেই থাকবে, ১৪ই প্রাতে ছাড়বে।

সকলে ৪টায় বাবা, বুলু ও পুটুকে নিয়ে ষ্টীমলঞ্চে শীকারে গেলেন। আজ সেলিমা ঈশ্বর ইচ্ছায় একটু ভালো আছে। বেলা ২টায় বাবা শীকার করে ফিরলেন, মাছ অনেক এনেছেন। আজ রাত্রে বাবা এই ঘাটের তিনটী সাহেবকে ডিনার দিবেন। তার সব বন্দোবস্ত হ'তে লাগলো।

৩টার সময় দাদা আবার বুলুকে নিয়ে শীকারে গেলেন। আমাদের শীকারে খুব সখ্। বাবা, দাদা শীকার করতে খুব ভালোবাসেন। দাদার আজ ৩।৪ দিন থেকে দাঁতে ব্যাথা ছিল, কিন্তু শীকারের বাতিকে সব যাতনা ভুলে গেছেন। এখান থেকে দিদিকে কলকেতায় ও মেজ মামাকে ঢাকাতে চিঠি লিখলাম।

সকালে ৭টায় জাহাজ গোয়ালন্দ ছাড়ল। ১০টায় সময় মাচাইল এলাচিপুর সব গ্রাম ছাড়িয়ে "আবড়া" ষ্টেসনে জাহাজ থাম্‌ল। এখান থেকে মাচাইল এলাচিপুর ৫।১০ মিনিটের রাস্তা এসব গ্রাম আমাদেরি পিতৃপুরুষদের নিজস্ব ছিল। তাঁহাদের শেষ নিশ্বাস এসব জায়গাতেই পড়েছে। কিন্তু আমাদের কখনও এসব দেশ চোখে দেখার ভাগ্য ঘটে নাই। শুধু নাম শুনেছি। আজ কত নিকট দিয়ে চলেছি। কিন্তু পদ্মার অনুগ্রহে আমাদের বাড়ীর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। সবই পদ্মার বিশাল বক্ষে আশ্রয় লাভ করেছে। আর তারই ফলে আমরা আজ শুধু পিতৃপুরুষদের গ্রাম দূর হতে চোখে দেখ্‌ছি, নেমে দেখ্‌বার যো নাই। বাস্তবিক দেখে বড় দুঃখ হয়! ঠাকুরদাদাদের কালে এই সব জায়গা কেমন ছিল, আর আজ তাহা কেমন হয়েছে। আমরা তাঁদেরই বংশধর হয়ে আজ কোন দূরদেশে রয়েছি। তাঁদের পবিত্র সমাধিগুলিও দর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই। বাবা বল্লেন, "একবার বজ্‌রায় এসে সমাধিগুলি দর্শন করে যাব।"

বেলা ১টার সময় জাহাজ সাধুগঞ্জে লাগ্‌ল। এখানে অনেক মাল নামাবার ছিল।

ঘাটে পল্লী-রমণীরা দলবদ্ধ হ'য়ে কাপড় কাচছে।

বালক-বালিকারা সানন্দে আপন মনে জলে সাঁতার দিচ্ছে। এই পল্লীবাসীদের বৈচিত্রহীন জীবন কেমন একটী স্নিগ্ধ শান্তির সহিত কয় হচ্ছে। সংসারে বড় হলেই বড় দুঃখ বড় চিন্তা শত, অশান্তির জ্বালা বহিতে হয়। এরা দরিদ্র, কাজেই ইহাদের চিন্তা ও ভাবনা কম। তাহারা আপন মনে দৈনন্দিন কাজগুলি সমাধা করছে। স্বামী পুত্রকে যা জুটছে তাহাই হাস্যমুখে তৃপ্ত মনে খাওয়াচ্ছে। নিজেরা পেট ভরে খাচ্ছে, কোন অসুখ বিসুখের ভয় নাই ভাবনা নাই, দিব্যি আরামে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে।

সাধুগঞ্জ ছাড়িয়ে এলাম। উঃ—কত নৌকার, বোধ হয় এক এক কাঁকে পাঁচশ, হাজার করে পড়ে আছে তার সংখ্যা নাই। কিন্তু হলে কি হয়। বন্দুকের পাল্লায় রহিবে। আর জাহাজ যেমনি নিকটবর্ত্তী হচ্ছে অমনি তারা সেকেণ্ডের মধ্যে উড়ে পথ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। মারবার উপায় নেই! এই অঞ্চলের পাখীগুলি অত্যন্ত চালাক। জাহাজের ছায়া দেখ্‌লে উড়ে। যাক তবুও মজ্জ পাওয়া যায় নাই। বাবা দাদা দু'দিনে অনেক পাখী মেরেছেন।

বেলা ৪টায় "পোড়াবাড়ীতে" এলুম। ঘণ্টা খানেক থাকার পর জাহাজ ছেড়ে দিল। রাত্রিতে সার্চ্চলাইট্ খারাপ হওয়াতে জাহাজ চালাতে অনেক ব্যাঘাত হ'ল, কাজেই রাত্রি ১২টায় "সিরাজগঞ্জে" এলাম।

১৫ই বৃহস্পতিবার—সব প্যাক করতে হবে বলে আজ খুব সকালে উঠেছি। আমরা ৭ দিনে জাহাজে ধস্তর মত সংসার পেতে বসেছি। সুতরাং সে সব উঠানোও একটা মস্ত কাজ। যাক আমাদের আশা ছিল আজ বিকালে "ফুলছড়ি" পৌছব ও ৬—৩০টায় বগুড়ায় ট্রেন ধরে রাত্রি ৮—৩০টায় বাড়ী পৌছিব। কিন্তু এখন শুন্‌ছি, জগন্নাথগঞ্জে নাকি অনেক মাল আছে, এই সব মাল নামাতে প্রায় পাঁচটা হবে, তখন ছাড়্‌লে রাত ১০।১১টার আগে "ফুলছড়ি" পৌছুতে পারব না। তখন বগুড়া যাবার কোন ট্রেন নাই। বেলা ১০টায় জগন্নাথগঞ্জে পৌছলাম। কেরাণীবাবুরা খুব তাড়াতাড়ি মাল নামাতে চেষ্টা করতে লাগ্‌লেন। কিন্তু তা অসম্ভব হ'ল। সব মাল নামাতে বেলা ৫-৩০টা হল। কুলীরা যখনই কোন ভারি মাল নামাচ্ছে, তখনই "গান্ধী মহারাজকী জয়" শব্দে দিগন্ত কম্পিত করছে। বাস্তবিকই এই মহাপুরুষের কি অসীম ক্ষমতা, যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার নামটী ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেক ষ্টেশনেই "স্বরাজ ফণ্ড" দেখ্‌লাম। আহাজেই শুন্‌লাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় ৬ মাস স্বরাজ আশ্রমে বাস করবেন। কি আশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগ! এঁরাই পৃথিবীতে ধন্য—নইলে এত লক্ষ লক্ষ প্রাণী তাঁদের নামে পূজা করে?

৬টার সময় জাহাজ ছাড়্‌ল। জাহাজে বড়ই গরম বোধ হতে লাগলো। কিন্তু জাহাজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। সমস্ত দিনের অসহ্য গরমের পর এই মিষ্ট হাওয়া টুকু সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করলাম।

জাহাজ এসে "ফুলছড়িতে" লঙ্গর করল। খালাসীদের দিয়ে মাল সব নামাবার বন্দোবস্ত করা হোল। দাদা নেমে দেখে শুনে এসে বল্‌লেন "একখানি ফ্ল্যাট্ আছে তাহাতে 1st class প্যাসেনজারদের থাকবার জন্যে একটী ড্রেসিংরুমও আছে, তাহাতেই কোন রকমে রাত্রি কাটাতে হবে।"

অগত্যা আমরা নামলাম। ছেলেরা জাহাজের কর্ম্মচারীদের নিকট হতে বিদায় নিল। আমাদের এই অসময়ে নামিয়ে দেওয়ার জন্যে কর্ম্মচারীরাও বেশ ক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু কি করবে বেচারারা—তাহাদের কোন হাত নাই। প্রত্যেক ঘণ্টায় জাহাজ চলবার হিসাব বড় সাহেবকে দিতে হবে। যাক আমাদের বেশী কষ্ট হল না। ড্রেসিংরুমে বিছানা পেতে ভাইবোনদের শুতে দেওয়া হ'ল।

আমরা আর রাত্রিটুকু শুলাম না। 'ধূলছড়ি' বগুড়ার নিকটবর্ত্তী স্থান। এখানে সকলেই আমাদের পরিচিত। ষ্টেশন মাষ্টার ভোরে সাতটার ট্রেনে দুইখানি গরু গাড়ী দিবে বলিল। তাহ'লে আর 'বেলোয় পাড়ায়' কষ্ট করে এত মালপত্র নিয়ে বদল করতে হবে না। আমরা পাঁচটার সময় অন্ধকার থাকতেই ট্রেনে এসে বসলাম। ১০টার সময় ট্রেন এসে বগুড়ার লাগল। আমরা বাড়ীতে কোন খবর দিই নাই। দাদা ও ছেলেরা বাড়ী গিয়ে গাড়ী ও পাল্কী নিয়ে এল। আমরা প্রায় আজ দু'মাস পর বাড়ী এলাম।

ভাই

(চিত্র)

(শ্রীঅজয়কুমার সেন)

(ক)

সাতপুরুষের বাস্তভিটা লইয়া যখন দুই ভাই রাম-কানাই ও শ্যাম-কানাইএর মধ্যে বিবাদ বাধিয়া উঠিল, তখন পাড়ার অতিবৃদ্ধ ঠাকুরদা মধ্যস্থতা করিতে আসিয়া কহিলেন, "বাবা রাম-শ্যাম, শেষ-কালে কি পিতৃ-পিতামহের নাম লোপ করবে? অমন কাজও কোরো না, আমার অনুরোধ।"

বৃদ্ধের এই অনুরোধ শুনিয়া দুই ভাই-ই চুপ করিয়া রহিল, পূজনীয় বৃদ্ধের সহিত তর্ক করিয়া তাঁহার অসম্মান করা কর্ত্তব্য বোধ করিল না; কিন্তু তাহাদের মনের গোল মিটিল না; তাহার সম্ভাবনাও ছিল না। বাহিরে একটু চাপা পড়িলেও ভিতরে কিন্তু আগুনি বাড়িতেই লাগিল।

একদিন রাম-কানাই দাবায় বসিয়া তামাকু খাইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ শ্যাম-কানাই আসিয়া কহিল, "দাদা, টাকার কি করলে—আজ ত দেবার কথা; আজ না দিলে ভারী অন্যায় হবে! যেখান থেকে পার—আজ আমার টাকা চাই—চাই-ই।"

রাম-কানাই কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন মুখে বলিল, "ভাই শ্যাম, আজ অনেক ঘুরে ঘুরে তবুও টাকার যোগাড় করতে পারলাম না—দেখি, বিকালে যদি কিছু করতে পারি। যখন বলেছি দেবো—তখন যেমন করে পারি দেবার চেষ্টা করব—কিন্তু না পেলে কি করবো ভাই?"

শ্যাম-কানাই এই কথা শুনিয়া রাগতঃ ভাবে কহিল, "তা আমি জানি না—টাকা তুমি কোথেকে পাবে না পাবে। আজ আমার টাকা চাই—তা যে রকম করেই হোক না কেন?"

"আচ্ছা ভাই, একবার সন্ধ্যার পর এস—যদি কিছু যোগাড় করে আনতে পারি—তখন এসে নিয়ে যেয়ো।" এই বলিয়া রাম-কানাই কল্কে বদলাইয়া আবার তামাক খাইতে লাগিল।

আজ অনেকদিন পরে তাহার একটি কথা মনে পড়িল। যেবার ওলাওঠায় ৮ বৎসরের শ্যামকে রাখিয়া তাহাদের মা চিরদিনের মত চলিয়া গেলেন, তখন সবেমাত্র রাম-কানাইএর বিবাহ হইয়াছে। নাবালিকা নব-বধূর অকৃত্রিম যত্নে ও স্নেহে নাবালক শ্যাম এত বড় হইয়া উঠিয়াছে। এমন কতরাত্রি রাম-কানাইএর নিদ্রা হয় নাই; পাছে শ্যাম নিদ্রার ঘোরে 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠে। এমনি অনেক দুঃখ ও শোকের মধ্য দিয়া রাম ও তাহার পত্নী শ্যামকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। আজ কিনা তার এই শাস্তি। এইসব চিন্তা তাহাকে আজ বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল।

যখন আর ভাবিতে পারিল না, তখন বাড়ীর মধ্যে গিয়া স্ত্রীকে বলিল, "দেখো, শ্যাম এতদিনে সত্যিসত্যিই আমার পর হয়ে গেল। কার পরামর্শে সে এই রকম হয়ে গেল—তুমি বল্‌তে পার?" এই বলিয়া স্ত্রীর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

এই কথা শুনিয়া তাহার স্ত্রী অতি দুঃখিতভাবে কহিল, "তুমি কি বল্‌ছ—শ্যাম কি আমার সেই রকমের ছেলে! তোমার নিশ্চয়ই মতিভ্রম হয়েছে; তা' না হলে শ্যামকে তুমি ও রকম মনে করতে পার? ওগো অমন কথা আর বোলো না - বোলো না।"

রাম-কানাই স্ত্রীর কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল এবং মনে মনে নিজের দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

স্বামীকে তদবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার স্ত্রী কহিল, "বেলা যে অনেক হলো—স্নান করে এস—ভাবছ কি? শ্যাম কি আমাদের পর হতে পারে? তুমি কোন ভাবনা কোরো না। এখন ওঠ, যাও।"

'হাঁ যাই' এই বলিয়া রাম-কানাই মাথায় একটু তেল দিয়া ধীরে ধীরে পুকুরের দিকে চলিয়া গেল।

(খ)

সেইদিন রাত্রে শ্যাম-কানাই আসিয়া বলিল, "দাদা, টাকা কি এনেছ?"

রাম-কানাই বলিল, "না ভাই—টাকার যোগাড় কোন মতেই কোরতে পারলাম না। যদি তোমার টাকার এত বেশী দরকার হয়, তবে তোমার বৌদিদির গহনা লইয়া গিয়া বাঁধা দিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া লও।"

শ্যাম-কানাই কিছুমাত্র না ভাবিয়া কহিল, "তাই না হয় যাও—"বলিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

"আচ্ছা ভাই একটু বোস; তোমার বউদিদিকে ডেকে আনি; যেন রাগ করে চলে যেয়ো না।" এই বলিয়া রাম কানাই স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাম-কানাইএর পশ্চাতে তাহার বৌ-দিদিকে আসিতে দেখিয়া সে পালাইবে কি অটল অচল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ধপ্ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কই—গহনা, দাও আমি এখনি যাব আমার দরকার আছে।"

"শ্যাম, তুমি এখনই যাবে? ভাত ত রাঁধা হয়ে গেছে—খেয়েই না হয় যাও।" এই বলিয়া তাহার বৌদিদি তাহার হাত ধরিবা মাত্র, সে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "বৌদিদি, ভাত আমি খাবো না—আমি এখনই যাবো।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

শ্যামের এই রকম আচরণে তাঁহার বৌদিদি চমকিত হইয়া উঠিল। কত রাত্রি, কতদিন; শ্যামের হিতের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া স্বামী-স্ত্রীতে কাটাইয়াছে, তবুও একদিনের জন্য তাহারা মনে স্থান দেয় নাই যে শ্যাম শেষে এতদূর পর্য্যন্ত করিবে।

একদিন স্বামীর কথা তাহার মনে পড়িল। 'শেষে শ্যাম আমাদের তাড়িয়ে দেবে' সে ত হ'বার আর বেশী দেরী নেই।

শ্যামকে ৮বৎসর হইতে মানুষ করিয়া শেষে কি তাহার এই ফল? তাহাকে যত্ন করাতে পাড়ার লোকে কত কথা বলিয়াছে—যত্ন করে কি হ'বে বোন শেষে টিক্‌লে হয়।'

আমি তখনই বলেছি, "না, তোমরা অমন অকল্যাণের কথা বোলো না। শ্যাম যদি সত্যিই তাড়িয়ে দেয়—আমি তার বাড়ীর কি হ'য়ে থাকবো? আমি যে তার মা! আমার ত সাতটিও নেই পাঁচটি ও নেই—একটা গেলে অন্যকে নিয়ে থাকবো—আমার যে মোটে একটা! তাকে ছেড়ে আমি কি রকম করে থাকবো? তিনি যেন পুরুষ মানুষ—তাঁর কঠিন প্রাণ; আমরা

যে মায়ের জাত! আমাদের কি কঠিন হ'লে চলে? আমাদের যে দুইতেই হ'বে—আমরা যদি না দুইবো—তবে এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করবে কারা?"

"শ্যামকে আমি কাছ ছাড়া কোরবো না—কোরবো না" এই বলিয়া রাম-কানাইএর স্ত্রী পাগলিনীর মত ঘরের বাহির হইয়া গেল।

(৯)

দৈনন্দিন হইতে এত অত্যাচার তাহাদিগের উপর হইতে আরম্ভ হইল যে অবশেষে রাম-কানাই আর স্থির থাকিতে না পারিয়া একদিন অতিকষ্টে তাহার স্ত্রীকে কহিল, "এবার বুঝি আমাদের বাস্তুভিটা ছাড়তে হয়।" বলিয়া ছল্ ছল্ চোখে অত্যাচারের কাহিনী সমস্ত তাহাকে বলিল।

সে রাত্রে রাম-কানাই আর কিছু খাইবে না বলিয়া শুইয়া পড়িলে তাহার স্ত্রী আসিয়া কহিল, "একটু কিছু খাও তা' না হলে শ্যামের আমার অকল্যান হ'বে।"

রাম-কানাই খাইতে বসিয়া শ্যামের কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। বোধ হয় শ্যামের এখনও পর্য্যন্ত খাওয়া হয়নি, শুতে যায়গা পাচ্ছে না, অনিদ্রায় রাত কাটাচ্ছে ইত্যাদি চিন্তাতে তাহার মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। বেশী কিছু খাইতে না পারিয়া চোখের জল দুইটিকে অবরোধ করিয়া ফেলিল। অতিকষ্টে উদ্গম কান্নাকে রুদ্ধ করিয়া ঘরে আসিয়া বসিল।

• • • •

তাহার পর আবার একদিন শ্যামের পুনরায় টাকার প্রয়োজন হওয়াতে, বাড়ীতে ঢুকিয়া শ্যামা যাহা দেখিল—তাহাতে সে অবাক্ হইয়া গেল। সমস্ত বাড়ীটি খাঁ খাঁ করিতেছে। একবার ভাবিল, "বৌদিদি" বলিয়া ডাক দেয়—পরক্ষণে ভাবিল "না।"

অনেক অনুসন্ধান করিয়া যখন দাদা ও বৌদিদির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন শ্যাম হতাশভাবে দাবায় বসিয়া পড়িল।

চালের বাতায় দেখিতে পাইল—একগোছা চাবি ও এক টুকরা কাগজ; তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া পড়িয়া বুঝিল—তাঁরা দুইজনেই দেশত্যাগ করিয়া চ'লিয়া গিয়াছেন। যত কিছু জিনিষপত্র সবই ঘরে ঠিক আছে—কিছুই তারা সঙ্গে লন নাই।

শ্যাম-কানাইএর বেশ সুবিধা হইয়া উঠিল। সে অত্যাচার ও ব্যভিচারে মন দিল। অধিক অত্যাচারে যাহা হইয়া থাকে—তাহাই হইল।

মৃত্যুর অতি সন্নিকট সময়ে রাম-কানাই ও তাহার স্ত্রী পাগলের মতন আসিয়া শ্যামের পাশে আসিয়া পড়িল।

রাম অতি কাতর-কণ্ঠে বলিল, "শ্যাম, তুই খবর না দিস্—মন যে খবর আগে দেয়। সেই টানে যে আমরা অতদূর থেকে এসেছি।"

"ছেলের জন্যে মায়ের প্রাণ যে কি রকম করে—সে মাই জানে; তুমি তা' কি করে বুঝবে ঠাকুরপো?" এই বলিয়া তাহার বৌদিদি নিজ সন্তানের মতন শ্যামকে কোলে তুলিয়া লইয়া বসিয়া রহিল—ডাক্তারের প্রতীক্ষায়।

স্বামী-স্ত্রীর বহু চেষ্টা ও শুশ্রূষায় শ্যাম সে যাত্রা মরণের কবল হইতে রক্ষা পাইল।

তাহার বৌদিদি শ্যামের আরোগ্যের জন্য সত্যনারায়ণের পূজা মানত করিয়াছিল। শ্যাম যেদিন অন্নপথ্য করিল, তাহার পরের পূর্ণিমায় ষোড়শোপচারে সত্যনারায়ণের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। পুরোহিত পূজা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় গাঁয়ের 'ভোলা পাগলা' সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম-কানাই বলিল, "ওরে, ভোলা এসেছিস্, বেশ, বেশ। আজ শ্যামের কল্যাণে সত্যনারায়ণের পূজা দিলাম। একটু থেকে প্রসাদ নিয়ে যা।"

ভোলা তখন আনন্দে গাহিয়া উঠিল,—এমন ঘরের হয়ে পরের মত, ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।"

স্বপন

(মহারাওকুমার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়)

আজ কি সখি এম্‌নি ক'রে আপন মনে করিবে খেলা
নিরালা নিশি এম্‌নি হবে ভোর,
মর্ম্মের কোণে বাসনাগুলি উদাসী রবে সারাটি বেলা
নয়ন-কোণে ঝরিবে দুখ-লোর।

এম্‌নি ক'রে মাধবী বনে মাধব আসি ফিরিয়া যাবে
কণ্ঠ-মালা গোপনে যাবে ঝ'রে,
এম্‌নি ক'রে তরুণ হাওয়া করুণ-গীতি গোপনে গাবে,
বকুল-শাখা কাঁপিবে ব্যথা-ভরে।

কেন গো তবে নয়ন মাঝে লুকায়ে রাখি রূপের তৃষা
হাসিলে কাল সন্ধ্যাবেলা ধীরে,
স্বপন দিয়ে ছাইলে কেন আমার ঘরে নিরালা নিশা,
সোহাগ দিঠি মেলিলে কেন ফিরে।

রঙ্গিন তব অধর যুগে, জাগালে কেন কিসের স্মৃতি—
হিয়ার মাঝে অমিয়া ঢালি দিলে,
আকাশ পাতাল নয়ন মেলি গাহিলে কেন অমর-গীতি
অলখে প্রাণ ছিনিয়া কেন নিলে।

কালিকে সখি আমার মাঝে কে-জন ছিল নিবিড় ঘুমে
আপন মনে স্বপন মাঝে হায়,
তাহারে কেন অমন ক'রে জাগালে বল গোপন চুমে
পরশ করি প্রাণের কিনারায়।

কাহার যে গো তাহার গলে পরশমণি পরালে কেন
পলক মাঝে পুলকে দিলে ছেয়ে,
সাধনা ক'রে হিয়ার কোণে অনল কেন জ্বালালে হেন,
নয়ন দিয়ে নীরব ঠারে চেয়ে।

মৌন মনে কণ্ঠ দিলে কোন সাধনে সিদ্ধি লাগি,
দৃষ্টিহীনে নয়ন দিলে—হায়,

সুপ্ত জনে চেতনা দিলে সকল সাঁঝ নিরালা আজি
কুসুম-মৃদু চুম্বনেরি ছায়।

মরণ মাঝে অমৃত যিনি তাঁহার গান গাহিলে কেন
কাঁদন দিয়ে পরাণ ভরি দিলে,
আকাশ পানে ঊর্দ্ধ-শিখা আপন হাতে জ্বালায়ে হেন
নিমেষ মাঝে সকলি হরি নিলে।

আজিকে যেই অশোক শাখে জ্বলিয়া উঠে বহ্নিশিখা
আমারি মত দহন রাগে ভরা—
আমারি মত সরম দিয়ে কত ছলনা-কাহিনী-লিখা
জীবন মাঝে মরণ-বেশ পরা।

আজিকে যেই বকুল তলে লুটায়ে পড়ে বকুলবালা
আমারি মত সকল সুখ-হারা,
পথিক-বালা আসে নি কেউ গাঁথিয়া নিতে কণ্ঠমালা
দয়ত বিনে জীবন হ'ল সারা।

আমিও সখি ওদেরি মত কালের পায়ে প্রণাম করি
চলিয়া যাব অচিন্ কোন-পথে,
যদি গো কভু স্বপন-মাঝে চমকি উঠ আমারে স্মরি
অশ্রু নামে হিয়ার তল হ'তে;

উদাসী হাওয়া গোপন সুরে তোমার কাণে গানটি গেয়ে
অসীম পথে উধাও হয় যদি,
আকাশ মাঝে অসীম তারা চমক্-চোখে পানটি চেয়ে
অমিয়া ঢালে পরাণে নিরবধি;

আমার নামে পরাণ যদি গুমরি উঠে ক্ষণেক লাগি
অনল শিখা জ্বলিয়া উঠে হায়,
ভাবিও সখি মিথ্যা খেলা করিয়াছিলে রজনী জাগি
রচিয়াছিলে মিথ্যা প্রতিমায়।

ভাগের পূজা

[ ]

(লেখিকা—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া)

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যাহ্নিক সব করিয়া সেইমাত্র পূজার ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি,—শুনিলাম ছোট ভাই তারাপ্রসন্ন বাহিরের ঘরে বসিয়া টেবিল চাপড়াইয়া তাহার প্রিয়তম গান গাহিতেছেন,—

"ওগো সুদূর বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি!"

মনটা স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল! এই গানটা অনেকের কণ্ঠে শুনিয়াছি, নির্ম্মলের কণ্ঠে ভাল লাগিত বলিয়া কয়মাস ধিয়াও দু' একবার তাহাকে গাওয়াইয়াছি, কিন্তু ভাল জমাট বাঁধে নাই। নির্ম্মল যখন কোন ফরমাসের খাতির-যত্ন না পায়, —আনমনে যখন নিজের খেয়ালে গায়, তখন তার কণ্ঠস্বরে কি বিশেষত্ব প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়া উঠে, জানি না! সে সময় যা কিছু গায়, আমার বড় মিষ্ট লাগে।

আজ শুনিলাম,—সেই আপন ভোলা, আন্‌মনা খেয়ালী সুর! সমস্ত দিনটা আজ আমার মন ভাল নাই,—একাদশীর উপবাস করিয়া, সদ্যঃ বিধবা সহীব পুরোহিত-পত্নী আজ সমস্ত দুপুর ধরিয়া যে কান্নাটা আমার কাছে কাঁদিয়া গিয়াছেন,—তাহাতে মোক্ষ চিন্তার পথে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটাইয়াই, সমস্ত হৃদয়টা আমার, কত বিক্ষত, রক্তাক্ত—বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছে! অসহায় দুর্ব্বলের উপর,—শক্তিশালী প্রবলের পীড়ন প্রতাপ আরম্ভ না ধরিলেই—যখন খুসী জাহির করা,—এ তো জন্মাবধিই দেখিয়া আসিতেছি। এ অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের দাবী লইয়া, মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার লোক যে কত বিরল, তাও খুব জানি। তবু কেন যে মানুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মন বাঁকিয়া উঠে,—কেন যে দুঃস্থের মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণ বিচলিত হইয়া উঠে জানি না। অনর্থক কপালের ভোগ—আর কি!

পুরোহিত-পত্নীর দুঃখের কাহিনীটা কিছু বেশী বৈচিত্র্য-রঞ্জিত নয়। সেই,—প্রচলিত প্রথামত, সাধারণ ঘটনা! অল্প বয়সে চার পাঁচটি শিশু-সন্তান লইয়া তিনি বিধবা হইয়াছেন, মাথার উপর বলিষ্ঠ অভিভাবক কেহ নাই,—তিনি দরিদ্র, এবং সবচেয়ে মহাপাপ, তিনি কিঞ্চিৎ সুন্দরী, এবং বুদ্ধিটা ও তাঁহার নিতান্ত হীন হীন স্বভাবের নয়। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে;—চিরদিন ধরিয়া যা ঘটিয়া আসিতেছে,—তাই ঘটিয়াছে!……অবাধা স্ত্রীলোক টাকে রীতিমত শাসন করিবার জন্য, স্বার্থ-আক্রোশে গ্রামের দু' চারজন মাতব্বর এবং জমিদার গোষ্ঠির অন্তর্গত আমার এক মহামান্য পিতৃব্য মহাশয় খুব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

বাস্তবিকই এগুলা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসাধ্য ছিল,—যদি নিজের চোখে অত্যাচারের প্রমাণ গুলা না দেখিতাম! সে সব কথা বলিয়া কোন লাভ নাই, কিন্তু ছয় বছরের পরে দু'মাসের জন্য পল্লী ছায়ার নির্জ্জন শান্তিতে বাস করিতে আসিয়া যে এত মর্ম্মব্যথা ভোগ করিতে হইবে,—এটা কল্পনার ও অতীত ছিল। অল্প বয়সে,—যখন কোন দিকে চোখ কাণ রাখিবার সামর্থ্য ছিল না,—তখন পল্লী জীবনের আবহাওয়া খুবই ভাল লাগিয়াছে। এখনও আমি এই পল্লী জীবনকে খুব ভালবাসি। কিন্তু সেই সঙ্গে আজ আমার ভয় জাগিয়াছে,—ওই প্রবল প্রতাপশীলবর্গের নৃশংস

অত্যাচারে নিরীহ দুর্ব্বলদের নিষ্পিষ্ট হওয়া দেখিতে দেখিতে পাছে, হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া নিজের মোক্ষ সাধনার পথটায় কোন সময়ে কাঁটা দিয়া বসি,—সেই ক্ষতির আশঙ্কাটাকে! কিন্তু—মানুষ হইয়া, মানুষের এ নির্য্যাতন দেখা আর সয় না যে!

মাথার শিরাগুলা দপ্ দপ্ করিতেছিল! নির্ম্মলের ঘরে বারেণ্ডায় আসিয়া অন্ধকারেই সিঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বসিলাম। নির্ম্মলের গান ঘুরিয়া ঘুরিয়া বারে বারে ধ্বনিত হইতেছিল :—

"ওগো সুদূর বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যে যাই পাশরি।"

মনে মনেই ভাবিলাম,—অন্ততঃ পুরোহিত-পত্নীকে যে আজ ইতর-নির্য্যাতনের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিতেছি না,—এ দুঃখটা এ "রুদ্ধ-দুয়ার" ঙে অসহনীয়ই বটে!

অন্ধকারে জুতা পায়ে কোন একটি কিশোর মূর্ত্তি সামনে আসিয়া সহসা ডাকিলেন "মা,—নয়?"

চমকিয়া দেখিলাম,—পুত্রবর! সহর হইতে বাড়ী আসার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলাম—"প্রসাদ? হঠাৎ এলি, কি রকম?"

ক্ষোভোত্তেজিত স্বরে সে বলিল "আর পিকেটিং করব না মা। গাঁজার দোকানে কদিন ধরে পিকেটিং করে—এবার খুব শিক্ষা লাভ হয়েছে! যে দেশের লোক এত গাঁজাখোর,—সে দেশ নন্ কো অপারেশনের যোগ্য হতে এখনও ঢের দেরী!"

নির্ম্মল আলো হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সাগ্রহে বলিল "কেন বল দেখি? কি খবর? সমস্ত আগাগোড়া বল, সহরের অবস্থা এখন কি রকম?—

সে সমস্ত খবর,—বসিয়া শুনিতে গেলে, ছেলেটার আহারের ব্যবস্থা দেখা হয় না, কাযেই আমায় উঠিয়া পড়িতে হইল। নির্ম্মল প্রসাদের সঙ্গে সামরিক প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

ভিতরে পরিচ্ছেদ

রান্নাঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া দেখিলাম গয়লা-বৌ গাই দুহিয়া আনিয়া দুধের বোক্‌নোটা রাখিতেছে। আমায় দেখিয়া বলিল "বাড়ী চল্‌লুম পিসিমা।"

মন ব্যস্ত ছিল, সংক্ষেপেই বলিলাম "যাও।"

ঘরে ঢুকিয়া অন্যমনে কাজ করিতেছি—একটু পরে শুনিলাম দূরে গোয়াল ঘরের কাছে, সকর চাকর হরি বাগ্‌দী সঙ্গে ইতিমধ্যে গয়লা-বৌয়ের বচসা সুরু হইয়া গিয়াছে!

বাহিরে আসিয়া বলিলাম—কি হোল?"

গয়লা বৌ উত্তেজিত হইয়া বলিল, দ্যাখো দেখি পিসিমা, আমি মেয়ে মানুষ, এই অন্ধকারে একলা কি করে বাড়ী যাই? হরেকে বল্‌ছি একবার আলোটা দেখিয়ে দে,—তা যাবে না। না বাবু এমন করলে কাল থেকে 'সঙ্গে' বেলায় গাই দুইতে আস্‌বো না।

হরে অলস মধুর সুরে কি একটা আপত্তির কথা জানাইল, শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু তাহার স্বভাব জানিতাম,—এক কথায়, কথা শোনা বা হিসাব বুঝিয়া আগের কাজ আগে করা, তাহার কোষ্ঠিতেই লেখা নাই!—বিরক্ত হইয়া বলিলাম "যা আগে গয়লা-বৌকে রেখে আয়।

হরে স্পষ্টস্বরে জবাব দিল "এখন, আমি খড় কাট্‌তে যাচ্ছি।—

সুতরাং ক্রুদ্ধ হইয়া উঠা ছাড়া গতি নাই, দেখিলাম! কিন্তু, এই দুর্ভোগটা আমার পক্ষে বড়ই ক্লেশাবহ ছিল।—ক্রোধের দ্বারা আমি অপরের কত খানি অনিষ্ট সাধন করিতে পারি তার হিসাব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলাম, কিন্তু নিজের জন্য যে এ পর্য্যন্ত কত পীড়া সঞ্চয় করিয়াছি—সেটার হিসাব হাড়ে হাড়েই আঁকা আছে। তবুও উপায় নাই। সংসারের

সঙ্গে যখন সম্পর্ক রাখিতেই হইয়াছে, তখন ঠেকিয়া ঠকিয়া, এটুকু শিক্ষা লাভ করিতেই যারা হইয়াছি যে,—লাল চোখ না দেখিলে কোন জাতের অনুশাসন মানিতে চায় না,—এমন এক শ্রেণীর মানুষ এ সংসারে প্রচুর পরিমাণেই আছে; অন্ততঃ আমার চারিদিকে এই শ্রেণীর মানুষের সংখ্যাধিক্য কিঞ্চিৎ বেশীই!

দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম—বড় থাক আগে গয়লা বৌকে রেখে এস।

মুহূর্ত্তে সুর নামাইয়া সে উত্তর দিল, "যাচ্ছি।"

নিশ্চিন্ত হইলাম। জলখাবার সাজাইয়া লইয়া নির্ম্মলের বারেণ্ডার দিকে যাইতেছি,—শুনিলাম পোয়ালের বেড়ার আড়ালে বসিয়া নিজের চারকোণা কাচের লণ্ঠন পরিষ্কার করিতে করিতে,—হরে নিজের মনে অস্ফুটস্বরে ছড়া কাটিয়া গোঁজ গোঁজ করিতেছে। সব কথা শুনিতে পাইলাম না, যেটুকু কাণে ঢুকিল, তাহার অর্থ এই যে,—দুতারণী-শ্রেণীর যে নির্লজ্জ-দুষ্টা অবাধে সমস্ত পাড়াটা বেড়াইয়া আসে, স্নানের সময় সেই আবার অসমর্থতার অজুহাতে পরকে খাটাইয়া, জল তোলাইয়া স্নান করে! ওই গয়লা বৌ একলা একলাই,—নিজের গরজে সারাদিন যখন হাটবাজার করিয়া বেড়ায়,—পান খাইয়া এ পাড়ায় সে পাড়ায় খবরদারী করে তখন কয়গণ্ডা চাকর উহার সঙ্গে প্রহরা দিবার জন্য থাকে?.....ইত্যাদি—

কথাটা সত্য। অভাবগ্রস্ত দীন দরিদ্র গৃহের বিধবা নারী,—ওই গয়লা-বৌটা। লোক লস্কর প্রহরী পরিজন কেহই তাহার নাই, নিজের হাট-বাজারটা পর্য্যন্ত তাহাকে নিজের হাতেই করিতে হয়। বয়স অল্প,—সুতরাং সত্য হউক মিথ্যা হউক, দুর্নাম তাহার অল্পবিস্তর রটিয়াছে,—শুনিতে পাই। হয়ত সেগুলা সত্য, কিন্তু মিথ্যা হওয়াও যে অসম্ভব নয়,—তাই বা বলি কি করিয়া? অনেকের মুখেই ত অনেক কথা এ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইলাম, কাহারও দ্বারা কাহার ক্ষুণ্ণ স্বার্থে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগিলেই ত—অমনি নির্ব্বিচারে কুৎসা-সৃষ্টির—কারখানা গজাইয়া উঠে! তা সে হউক না যত বড় মিথ্যা,—যত বড় ভিত্তিহীন অর্থহীন কাহিনী! দেশের মাটী বড় উর্ব্বর,—পরকুৎসার শস্যটা এখানে অবহেলায় বড় সুলভেই উৎপন্ন হয়! আড়াল পাইলেই হাজার থাকে ডাইন বলিবার প্রথাটা না কি এখানকারই সনাতন ধর্ম্ম! সুতরাং মিথ্যার সঙ্কোচ-বোধ করিবার মত কোন দুঃখই, এ দেশের দেশে নাই! পল্লীগ্রামের লোকের মন কি সরল,—আর কতই উদার! সহর দেশের অবস্থা, কে জানে কি রকম!

হরের কথাটা শুনিয়া লইলাম,—কোন উত্তর দেওয়ার আবশ্যকতা বোধ করিলাম না। কি উত্তর দিব? হরে যদি আমাদের গরুর চাকর না হইয়া আমার খুল্লতাত হইতেন এবং গরীব গয়লা বৌটা যদি আমাদের সেই গরীব পুরোহিত পত্নী হইতেন,—তা হইলেও এই বাঙ্গ শ্লেষ শুনা এর চেয়ে বেশী কিছু ভদ্র-সংস্করণে উন্নতিলাভ করিত না, ইহা যখন স্থির নিশ্চয়, তখন কিছু বলার চেষ্টাই ধৃষ্টতা!

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্ধকারের আড়াল দিয়াই নিঃশব্দে চলিলাম। হরে নিজের মনে আরও খানিকটা বকিল, তারপর,—যথেষ্ট অপ্রসন্ন ভাবে বাহিরে আসিয়া, গয়লাবৌকে ডাকিয়া বলিল "শীগ্‌গীর এস।"

চাহিয়া দেখিলাম,—গয়লা-বৌ চলিয়া গেল। পশ্চাদ্বর্ত্তী হরের চলনের ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলাম ইহার চেয়ে,—অনিচ্ছুক গতির চলন আর নাই।

সহানুভূতি বোধ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিলাম না। সাধ্য পক্ষে আশ্রিতদের উপর বেশ কাযের চাপ দিতে চাই না, যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিয়াই চলিতে চাই। কিন্তু, "মানুষ",—আর "মানুষের অন্যায়",—এ দুটার পার্থক্য বোধ, আজ

অনেক খা খাইয়া, অনেক ঠেকিয়া শিখিতে চাইয়াছে। মানুষের খাতিরে, মানুষের অস্তাতকে আ'ও ভক্তির চক্ষে দেখিবার সামর্থ্যও আমার নাই।

বারেণ্ডায় উঠিয়া প্রসাদের গল্প স্রোতে বাধা দিয়া বলিলাম "হাত মুখ ধুয়ে আগে জল খাও।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জল খাইতে খাইতে প্রসাদ বলিল "চরকা কাটছ না?"

সংক্ষেপেই উত্তর দিলাম "যতটুকু সময় পাই, আর চোখে যতক্ষণ সয়, ততক্ষণ সুতো তৈরী করি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, বার পর নাই অসন্তোষ ভরে মাথা নাড়িয়া সে বলিল "কিন্তু দেশের ছোটলোক গুলোকে মদ গাঁজা টাজা না ছাড়ালে কোন কাজই হবে না। এ দেশটা নেশার ঝোঁকেই মরে রয়েছে।"

শুষ্ক হাস্তে নির্ম্মল বলিল "তার কারণ,—সুশিক্ষার অভাব! আগে ছোটলোকদের শিক্ষার ব্যবস্থা কর। ছেলে ধরে, কেউটে ধরিস্, তবে ধরা সার্থক হবে।"

দুজনের মতে সামঞ্জস্য না থাকিলেও, দুটা মতই বোধ হয় মূলতঃ সত্য।—আরও কত মত শুনিয়াছি, যাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, কিন্তু একই সত্য, সকলের মধ্যে আংশিক ভাবে রহিয়াছে। কিন্তু অসমঞ্জস্যের তর্কের ভিড়ে কাজ করিবার পথ এবং অবসর দুই আটক পড়িয়াছে।—থাক, তর্ক শুনিয়া যতটা সময় আরামে কাটে, কাটুক! - চুপ করিয়া, শুনিতে লাগিলাম।

"ছোট লোকদের" মধ্যে শিক্ষা চালাইবার সখটা নির্ম্মলের যেমন ছিল, প্রসাদের তেমন ছিল না। স্কুলে ধর্ম্মঘট সুরু হইবামাত্র, সে সকলের আগে স্কুল ছাড়িয়া বাহিরে আসে। সে নিজে ছিল পেশী প্রধান ধাতুর মানুষ, সুতরাং পিকেটিং'এর 'মোরটায়' উপর আস্থা রাখিত—খুব বেশী। সেই জন্যই বিশেষ উৎসাহে ওই পথটায় গিয়াছিল। নির্ম্মল ভিন্ন ধাতুর মানুষ। তা ছাড়া স্বাস্থ্যের অভাবে,—শারীরিক শক্তি খরচের চেষ্টাটা ছিল—তাহার কল্পনা। হট্টগোলের ভিড়ে ঢুকিলেই সে ক্লিষ্ট অসুস্থ হইয়া পড়িত বলিয়া,—সে দিকটায় বড় ঘেঁসিত না। সেই জন্যই আসন্ন বি, এ, পরীক্ষায় প্রস্তুত হইবার চেষ্টায় কলিকাতার ভিড় ঠেলিয়া তাহাকে পল্লীবাসে আসিয়া, আস্তানা লইতে হইয়াছিল।

নির্ম্মলের প্রস্তাবে প্রসাদ একটু দমিয়া গেল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল "ছোট লোকদের শিক্ষা টিক্ষা সব পরে হলেও চলবে। আমাদের লীডার হেমবাবু বলছেন,—আগে ওদের দিয়ে কায করিয়ে নাও।"

নির্ম্মল বলিল "কায করতে হলেই তার উপযোগী শিক্ষা একটা চাই,.....

মুহূর্ত্তে তুমুল তর্ক বাধিয়া গেল। শিক্ষা বলিতে প্রসাদ বোঝে এ, বি, সি, ডি, অক্ষর পরিচয় হওয়া, —নির্ম্মল বোঝে অন্যরূপ।—উদাহরণের দ্বারা সে নিজের ধারণাটা প্রসাদকে বোঝাইবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইল। প্রসাদ রাগিয়া উঠিয়া বলিল "তুমি জানো না ছোট মামা,—ও সব চাল্ এ দেশে চলবে না। বিলিতি ছোট লোক গুলো আর যাই হোক,—জাতীয় স্বার্থ বলে একটা জিনিষকে বোঝে,—এ দেশের ছোট লোক গুলো তা বোঝে না। আজ একজন পেকয়া পরা সন্ন্যাসী গাঁজা কিনতে এসেছিল, ঝাড়া ছ ঘণ্টা ধরে তাকে কত কাকুতি মিনতি করলুম—হাতে ধরলুম, পায়ে পড়লুম, —শেষে পৈতে দেখিয়ে যোড় হাত করে বললুম, "গাঁজা খেও না," তাতে সে রেগে লাল্! হাঁক ডাক করে চেঁচিয়ে বল্লে, আরে, আমার মহাদেব গাঁজা খায় আমি কেন খাব না? আমি আলবৎ খাব, আলবৎ গাঁজা কিনব, তোমাদের স্বদেশীর খাতিরে কি আমি ইষ্ট দেবতার অপমান করব? বলে সে আমাদের হাত ছাড়িয়ে গাঁজা কিতে দোকানে ঢুকলে।

আমিও রাগ করে পিকেটিং ছেড়ে বাড়ী চলে এলুম। —এসব ছোট লোক নিয়ে কি কাজ হয়? এদের শিক্ষা দিয়ে কি বা হবে?

পিকেটিং ছাড়িয়া অকস্মাৎ প্রসাদের বাড়ী আসার কারণটা এতক্ষণে ব্যক্ত হইল দেখিয়া কিঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করিলাম। কিন্তু কারণটা শুনিয়া অসুখী হইলাম।—নির্ম্মল হাসিয়া বলিল "মহাদেব গাঁজা খান, অতএব তাঁর ভক্ত গাঁজা খেতে বাধ্য,—যুক্তিটা বলবান বটে, কিন্তু মহাদেব তো শুধু গাঁজা খেয়েই সব কর্ত্তব্য শেষ করেন নি,—বিশ্বনাশী হলাহলকেও তিনি পাকস্থলী বাঁচিয়ে কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন, —বিশ্বকে ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁর ভক্তটি সে বিষের কতদূর সমর্থ, - পরীক্ষা করে দেখে ছিলি প্রসাদ?"

প্রসাদ ক্ষুণ্ণ এবং কতকটা ক্ষোভোত্তেজিত হইয়াই বলিল "আরে, তখন কি আমার জ্ঞান বুদ্ধি যোগাল? রাগে তখন আমি—প্রায় দিশেহারা হয়েই উঠেছিলুম! আমার এমন ইচ্ছে হোল যে···

সবিদ্রূপ হাস্যে নির্ম্মল বলিল "ঐ তো দোষ!— ঐ জন্যেই মহাজনরা উপদেশ দিয়ে গেছেন যে, যুদ্ধের বাজনা শোনবার আগেই শিং শানিয়ে তৈরী হও।— কারণ যুদ্ধের বাজনা সুরু হবার পর শিং শানাবার ফুরসুৎ আর মিলবে না,—তখন মরো আর তরো, সেই ভোঁতা শিং নিয়েই, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে লড়তে হবে। তাতে প্রাণটা বাঁচুক আর মরুক,—তার জন্যে দায়ী তোমার বুদ্ধি আর বিবেচনা!"

অনিষ্টকর অগৌরবের জন্য, বুদ্ধি বিবেচনাকে দায়ী হইতে দেখিলে কোন মানুষই স্বস্তি পাইতে পারে না। প্রসাদ জল খাওয়া শেষ করিয়া, হাত মুছিতে মুছিতে—অপ্রসন্ন ভাবে বলিল "বুদ্ধি বিবেচনার দোষ কি বল? দৈবের গতিকে সবই"—

হঠাৎ দূরে একটা বিস্ময়োত্তেজিত নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা গেল। আমরা তিনজনেই একযোগে চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম "ও কি!"—

আবার সেই আর্ত্ত চীৎকার! আমার বুকের ভিতরটায় ধড়াশ্ করিয়া উঠিল! এ যে গয়লা বৌয়ের আর্ত্তনাদ!—মুহূর্ত্তে সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। একাদশীর উপবাসের ক্লেশকে চিরদিনই অবহেলা করিয়া চলিতেছি, কখনও কাতর হইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।—কিন্তু আজ এই একটা মুহূর্ত্তে,—মনে হইল, আমার সমস্ত দেহেন্দ্রিয় গুলা হঠাৎ এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ও আর নাই!—ওই তয়ার্ত্তা নারীকে,—লঘু হউক গুরু হউক কোন বিপদ হইতেই পরিত্রাণ করিবার চেষ্টায়—একটু সাহায্য করিবার অধিকার পর্য্যন্ত, ভগবান আমার হাতে রখেন নাই! আমি দুর্ব্বল, অপদার্থ নগণ্য! কি মহাপাপ!—

কাতর দৃষ্টিতে নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া বোধহয় অস্ফুট-জড়িত স্বরে কি একটা কথা বলিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু কথাটা শেষ হইতে না হইতে নির্ম্মল ও প্রসাদ আলোটা তুলিয়া লইয়া—এক সঙ্গেই ঝড়বেগে ছুটিয়া বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল।

সাপ.....চোর····· খ্যাপা কুকুর, পাগলা শিয়াল,—পাড়গাঁয়ের পক্ষে সুলভ ও দুর্লভ অনেকে আকস্মিক বিপদভয়ের কথাই মনে পড়িল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোনটা সঠিক কিছুই অনুমান করিতে পারিলাম না। সমস্ত বাহেন্দ্রিয় গুলা শুদ্ধ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল,—অন্তর তখন আকুল উৎকণ্ঠায় ত্রাহি মধুসূদন জপিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে বাহিরের রাস্তায় গয়লা বৌয়ের সরোষন অভিশাপ বাণী ও ভগবানের উদ্দেশে কি কতকগুলা অভিযোগ ঘোষনার কথা শুনিতে পাইলাম। কথাগুলীর অর্থ ভালরূপ বুঝিতে পারা গেল না, শুধু এই বুঝিলাম নির্ম্মলের সংক্ষিপ্ত মৃদু কণ্ঠস্বরও তাহার মধ্যে আছে, এবং তাহারা এই বাড়ীর দিকেই আসিতেছে।

সকলের আগেই সরলা বৌ বাড়ী ঢুকিল। তারপর লণ্ঠন হাতে করিয়া নির্ম্মল। নির্ম্মলের পিছনে ঘরের সঙ্গে আর একটা কে লোক,—একটু যেন জড়সড় ভাবে বাড়ী ঢুকিল। চাহিয়া দেখিলাম,—সে প্রসাদ নয়। প্রসাদকে দলের মধ্যে দেখিলাম না।

নির্ম্মল আসিয়া রোয়াকের নীচের পৈঠায় বসিল। কোন কথা না বলিয়া, গালে হাত দিয়া, গুম্ হইয়া কি ভাবিতে লাগিল।

সরলা বৌ একটু ঘুরে উঠানের উপর মাথা নীচু করিয়া বসিল। হরেও তাহার সঙ্গীটি—উঠানের এক কোণে অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সকলেই নীরব।—

দুর্ভাবনা উদ্বেগ বাড়িয়া গেল। শুষ্ককণ্ঠে বলিলাম "প্রসাদ কই?"

নির্ম্মল মাথা নীচু করিয়াই উত্তর দিল, "ছোট খুড়োকে ডেকে আন্‌তে গেছে।"

ছোট খুড়োকে!.....পুরোহিত পত্নীর কথা স্মরণ করিয়া মুহূর্ত্তে সমস্ত মনটা সেই পূজনীয় পিতৃব্যের সম্পর্কটা স্মরণ করিতেই—মনোটে বেদনায় যেন কেমন এক রকম হইয়া গেল। অধিকতর সংশয়ভীত হইয়া বলিলাম "কেন?"

নির্ম্মল তীব্রস্বরে বলিল "তাঁর আদরের চাকর অরুণ বাগ্‌দীর কীর্ত্তি দেখবার জন্যে। আর আমাদের এই হরে,—বেশ বুঝ্‌ছি, আগেরেকেই অরুণের সঙ্গে ষড়যন্ত্রটা তার ঠিক করাই ছিল, নইলে—অরুণের এত সাহস হয় যে—নির্ম্মল চাপা গর্জ্জন সহ হঠাৎ চুপ করিল।

দুয়ারের কাছে খড়ম ও জুতার শব্দ হইল।—চাহিয়া দেখিলাম, প্রসাদের সঙ্গে ছোট খুড়ো তাঁহার দারপণ্ডিতের সঙ্গে করিয়া গীতরি দুর্গানাম উচ্চারণ করিতে করিতে বাড়ী ঢুকিতেছেন।

(ক্রমশঃ)।

আমাদের কথা

পাঠক বৃদ্ধি না লেখক বৃদ্ধি

বাঙ্গালা দেশে এখন ঝাঁকে ঝাঁকে পত্রিকার আবির্ভাব হইতেছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, নানা রঙ্গে বাঙ্গালার সাহিত্য-গগনে উড়িয়া আসিতেছে। এ বৈচিত্র্য উপভোগ করিবার জিনিষ বটে। ভারতের অন্য কোন প্রদেশ এ বিষয়ে এত গর্ব্ব করিতে পারে না। তবে এখনও বুঝিতে পারিতেছি না, প্রকৃতপক্ষে পাঠক বাড়িয়াছে কি লেখক বাড়িয়াছে। এ উভয় কারণ বশতঃই অবশ্য পত্রিকার সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে পারে। তবে প্রথম কারণবশতঃ বাড়িলে কাগজগুলির স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে কিছু আশা করা যায়! কিন্তু দ্বিতীয় কারণবশতঃ বাড়িলে জলবুদ্‌বুদ্‌ মুহূর্ত্তে জলে মিশাইয়া যাওয়াই সম্ভব। অনেক সময়ে অনেকের লেখন কণ্ডূতি রোগ হয়। তখন তাহাদের লিখিবার আগ্রহ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। কিন্তু এ পৃথিবীতে সকল যন্ত্রণার সেরা অন্নাভাব। পেট জ্বলিয়া উঠিলে কলমের নেশা আর বেশীক্ষণ থাকে না। যদি পাঠকের সংখ্যা বাড়িয়া না থাকে, তাহা

---

* "ভাগের পূজা" ধারাবাহিক ভাবে "যমুনায়" প্রকাশিত হইবে। কে-কে পূজায় যোগ দিবেন এখন বলা যায় না—তবে প্রতি মাসেই এক একজনের পালা পড়িবে। পূজার পুরুতগিরি করিতেছেন—শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া, আগামী মাসে শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদারের পালা পড়িয়াছে।

যমুনা সম্পাদক।

হইলে অনেক পত্রিকার অস্তিত্ব সেই পেট যতক্ষণ ওরা থাকে ততক্ষণই পর্য্যন্ত থাকিবে। অবশ্য পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি দেশের মঙ্গলজনক। আমাদের দেশের জ্ঞানস্পৃহা যে বাড়িয়া গিয়াছে একথা শুনিলে কার না বুক আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিবে?

জ্ঞানস্পৃহা তৃপ্ত হইবে কিসে

যদি তেমন সুদিন দেশের আসিয়া থাকে, তাহা হইলে লোকের জ্ঞানস্পৃহা পরিতৃপ্ত হইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া অবশ্য অতি ভাল কথা। এবং সেরূপ ক্ষেত্রে আমরা, বাঙ্গালায় নূতন সাহিত্যে একটা বাস্তব মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিতেছে, ইহা দেখিবার আশা করি। সেখানে শুধু মাত্র কতকগুলি নবীন লেখকের পুরাতন বাঁধাবুলির গদ আওড়াইতে দেখিলে আশা অনেকটা ভাঙ্গিয়া যায়! যার নিজস্ব বলিয়া কিছুই নাই, যার করা অর্থে তার কতদিন চলিবে, শীঘ্রই তাহাকে দেউলিয়া হইয়া পলায়ন করিতে হইবে। শুধু মাত্র অনুকরণে কার্য্যের পন্থা প্রসারিত হয় না। তাহাতে ত মানুষের জ্ঞানস্পৃহা পরিতৃপ্ত হইবে না। বরং অনেকে ব্যর্থ হইয়া সমস্ত সাহিত্যের উপর একটা বিতৃষ্ণার ভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিবেন। এইজন্য শুধু মাত্র লেখন কণ্ডুয়তি নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে কলম ধরিলে দেশের উপকার হইবে কি অপকার হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার।

দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক

দৈনিক পত্রিকা অনেকটা নিত্য-নৈমিত্তিক সংবাদ সরবরাহ করিয়া থাকে। তাহাতে যে আলোচনা হইয়া থাকে তাহাও উপস্থিত ঘটনাদি লইয়া। সুতরাং তাহাদের কার্য্য প্রধানতঃ রাষ্ট্রনীতিক আলোচনা। সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি আমাদের দেশে বরাবর দৈনিকের অনুসরণ করিয়াই আসিতেছে; মাসিক পত্রিকাগুলি সাধারণতঃ সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই প্রচার করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে ইহাতে থাকিত উপন্যাস, কবিতা এবং সাধারণ সাহিত্যিক সমালোচনা। ঐতিহাসিক গবেষণাও কিছু কিছু ইহাতে স্থান পাইত। বৈদিক ও দার্শনিক আলোচনা অনেক পরে স্থান পাইয়াছে। বৈজ্ঞানিক আলোচনাই সর্ব্বশেষের। খুব সম্ভব ও জিনিষটার প্রথম অবস্থায় সকলে হাত দিতে সাহস পাইতেন না। ইদানীং কালে রাষ্ট্রনীতিক আলোচনাও মাসিক পত্রিকার অঙ্গে শোভা পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। অর্থাৎ মোটের উপর বাঙ্গালার বর্ত্তমান মাসিক পত্রিকা-গুলি মাসে মাসে সর্ব্ববিদ্যার খিচুড়ি পাকাইয়া পাঠকগণের হাতে পৌঁছাইয়া দেয়। ইহাতে একটা সুবিধা আছে। সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকই ইহার ভিতর কিছু না কিছু পড়িবার মত পাইতে পারেন। ব্যবসায় হিসাবেও ইহাতে লাভ আছে। উপন্যাস পাঠকও মাসিকের গ্রাহক, ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসুও মাসিকের গ্রাহক, দার্শনিক জিজ্ঞাসুও মাসিকের গ্রাহক আবার রাষ্ট্রনীতিক আলোচনায় যাঁহারা তৃপ্তি পাইয়া থাকেন তাঁহারাও মাসিক পত্রিকার বৎসর বৎসর টাকা দিয়া থাকেন। অতএব আজকালকার দিনে কোন মাসিক সম্পাদক এইরূপ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ মাসিক পত্রিকা বাহির করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না।

আলোচনা মূল্যহীন হয় কেন

তবে এ সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে, এইরূপ বহুবিষয় সম্যক আলোচনা করিতে সক্ষম এরূপ লেখক পাওয়া কঠিন। বাঙ্গালা দেশের পাঠক যতই বাড়ুক না কেন কোন মাসিক পত্রিকারই আর্থিক অবস্থা এত ভাল নহে যে প্রত্যেক বিষয় লিখিবার জন্য পয়সা দিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোক রাখিতে পারে। ফলে বহু বিষয়ের আলোচনা মাসিক পত্রিকার অঙ্গ শোভন করিলেও, তাহার অধিকাংশ আলোচনাই মূল্যহীন হইয়া

তখন সে সব আলোচনা ছাপার অক্ষরে বাহির হইয়া কাগজ নষ্ট করিয়াই প্রবন্ধলীলা শেষ করে। যদি প্রকৃত বিচার, সঙ্গত আলোচনা করিবার ক্ষমতা না থাকে, যদি হাসিয়া লোক হাসান কাঁদিয়া যে কাঁদান না যায়, তবে সে হাসি-কান্নায় শুধুমাত্র লোক হাসাইবার প্রয়োজন ?

নূতন মাসিক 'বঙ্গবাণী'

গত ফাল্গুন মাস হইতে মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষ হইয়া, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়দিগকে সম্পাদক করিয়া একখানি নূতন মাসিক পত্রিকা আসরে নামাইয়াছেন। ইহা আমাদের নূতন সহযোগীকে সাদরে সম্ভাষণ করিতেছি। তবে পরিচয় করিতে যাইয়া বড় তৃপ্ত হইতে পারি নাই। সেই সনাতন পন্থা,—সেই খাড়া বড়ি গোড়, গোড় বড়ি খাড়া। সেই ছোট গল্প, বড় গল্প সেই ক্রম-প্রকাশিত উপন্যাস, সেই রাষ্ট্রনীতিক ও সমাজ নীতিক ছড়া পাওয়া অনেকে কাগজ বাহির করেন ব্যবসায় করিবার জন্য, অনেকে কোন নূতনভাবে দেশকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য। অবশ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অতি কম। অথবা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শ্রীমান রমাপ্রসাদের "বঙ্গবাণী" খানি ইহার কোন শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা তাহা এখনও জানিতে পারি নাই। যাহারা শুধুমাত্র ব্যবসায়ের জন্য কাগজ করে, তাহারা অনেকটা দেশের মতের সহিত মত মিলাইয়া, দেশের লোকে যাহা চায় তাহাই দিবার চেষ্টা করে। আর যাহারা নূতন মতবাদ প্রচারের আকাঙ্ক্ষায় কাগজ বাহির করে, তাহারা সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া বস্তুস্বার্থ ত্যাগ করিয়া নিজেদের মত প্রচারের চেষ্টা করে। অবশ্য অনেকে শুধুমাত্র কতকগুলি সাহিত্যিক দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সংবাদ দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। কিন্তু তাহার ধরণটা অনেক সময় উক্ত দুই প্রকারের কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। শ্রীমান রমাপ্রসাদের 'বঙ্গবাণী' দেখিয়া যতদূর মনে হয় তাহাতে তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাগজ বলা কঠিন। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, 'কোনভাবে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে সমর্থন করাই ইহার কার্য্য বলিয়া মনে হয়। এই সমর্থন করিতে যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষগুলি আরও অধিক পরিমাণে নষ্ট করিয়া না দেওয়া হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। অবশ্য কাঁচা হাতের লেখায় সেরূপ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থনে অসঙ্গতি।

'বঙ্গবাণীতে' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কতকগুলি কথার আলোচনা হইয়াছে। আলোচনার ভিতর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সাফাই গাহিবার আগ্রহ অনেকটা পরিস্ফুট। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের অনটনের প্রতি শিক্ষা-সচিব বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই। সে প্রসঙ্গের যেরূপ ভাবায় তাহার সমালোচনা করা হইয়াছে তাহা কি ঠিক মাসিক সাহিত্যের উপযুক্ত ?—"উত্তর দিতে গিয়া মন্ত্রী মহাশয় সাটোরে এতখানি ভ্রূ কোঁচকাইলেন যে কপালে নূতন মন্ত্রীত্বের কৌটা চচ্চড় করিয়া উঠিল" শেষটুকু কি অর্থে লেখা হইয়াছে তাহা বুঝা আরও কঠিন। মন্ত্রী-মহাশয়ের মন্ত্রীত্ব ঘুচিয়া যাইবার মত হইয়াছিল কি না জানি না। আমরা মন্ত্রীবরের কার্য্যের সমর্থন করি না। ঢাকায় অধিক টাকা দিবার অপরিহার্য্য কোন কারণ উপস্থিত হইয়াছিল এরূপও আমাদের মনে হয় না। "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা অল্প বেতন পাইতেন, তাঁহাদিগকে দু-শত, তিন শত টাকা দিয়া ঢাকায় লইয়া একটি বিষয় পড়াইবার বন্দোবস্তটা বাজে খরচ হইল না, আর বাজে খরচের জন্য দোষী হইল, কলি-

কাতা বিশ্ববিদ্যালয়।" আমরা 'বঙ্গবাসীর' এ মতের সমর্থন করি। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে না কি? তাঁহারা কর্তৃপক্ষ অন্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বেশী বেতন দিয়া লোক আনিতে না পারুন, অন্তত নূতন লোক, যাহারা কোন কলেজে অল্প বেতনে কাজ পাইতে পারিত এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিত, তাহাদিগকে কি অনেক বেশী বেতন দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খাস শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় নাই? প্রবাসী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে কেহ কি তাহার কোন সঙ্গত উত্তর দিতে পারিয়াছেন?—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কি জোর করিয়া বলিতে পারেন যে শুধু মাত্র 'কর্ত্তব্যের প্রচার' বৃদ্ধির বাগ্রতায় সব সময় অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন? অবশ্য আমরা তজ্জন্য মন্ত্রীবর্গের কাছে যে সুসঙ্গত হইয়াছে তাহা বলি না। কারণ একজন অপরাধ করাতে আর একজনের অপরাধ করিবার অধিকার জন্মিতে পারে না। তবে প্রথম ব্যক্তির পক্ষ হইতে কথা বলিবার পূর্বে তাঁহার অপরাধ কমিতে দেখিলেই অধিক সন্তুষ্ট হইব।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড।

গত মাসের প্রধান ঘটনা সমগ্র দেশের জাতি গঠনের নেতা, ভারতের ভাগ্য গগনের অপূর্ব্ব সূর্য্য, মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড। তিনি মহাপুরুষ, ত্যাগী, সন্ন্যাসী, তাঁহার তাহাতে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু তাঁহাকে ছয় বৎসরের জন্য হারাইতে ভয় হয়, দেশে জাতীয়তার যে মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছিল তাহা থামিয়া না যায়! আর দুঃখ আমাদের। তাঁহাকে হারাইয়া হৃদয়ের ভিতর যেন ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। ছয় বৎসর পরে আবার পাইব, আবার নবীন উদ্যমে সাধনার মঙ্গল করস্পর্শে বেশ দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবে, এ আশাতেও যেন শান্তি পাইতেছি না। মহাত্মা গান্ধী ভারতবাসীর নিকট শুধু যে ভক্তি শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাই নহে,—তিনি ভারতবাসীর হৃদয়ের ধন, প্রাণের চাইতেও প্রিয়। তাই তাঁহার কারাদণ্ডে ভারতবাসীর হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহার মহান শিক্ষার ফলে ভারতবাসী সকল কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট এতদিন পরে এমন করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলেন কেন বুঝা কঠিন। যে সময় তিনি অসহযোগের মধ্যে যদি কোন দোষ থাকে তাহা দূরীভূত করিবার জন্য সকলকে আত্মশুদ্ধি ও পূর্ণ সংযমের পন্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁহাকে ধরিতে হইল কেন। গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্য বিশেষ সুবিবেচনা সঙ্গত হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। গবর্ণমেণ্টের অনেক কার্য্যই বুঝিয়া উঠা যায় না। কিন্তু যিনি জগৎপূজ্য মহাপুরুষ, যাঁহার চরিত্র ও নীতি মনুষ্যত্বের আদর্শের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাকে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করাই মনুষ্য ধর্ম্ম। তাহাতে বাধা প্রদান করিলে মনুষ্য অন্তঃকরণে বড় শান্তির দ্বারা প্রবাহিত হয় না।"

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। তবে সকলের অবগতির জন্য কয়েকটী কথা বলিয়া গিয়াছেন। একটী কথা সরকারেরও ভাবিয়া দেখা উচিত। "অশান্তি যখন হইয়াছে তখন তাহা প্রকাশ হইতে দেওয়াই উচিত।" বাস্তবিক মনে অশান্তি অসন্তোষের ভাব উঠিলে তাহা গায়ের জোরে থামান যায় না। তাহার কারণের উচ্ছেদ না হইলে তাহা যাইতে পারে না। তাহার কারণ, বন্যার রাখিয়া তাহাকে চাপিয়া দিতে গেলে অনেক সময়ে উল্টা উৎপত্তি হওয়াই সম্ভব। আমরা অবশ্য কোন পক্ষেরই কোন অনাচার সমর্থন করি না। মানুষকে তাহার অন্তরের দুঃখ প্রকাশ করিতে না দিলে সমাজে প্রকৃত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বিষম অন্তরায়ের সৃষ্টি করা হয়।

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and Published by P. N. Pal, 26-3 Scou Lane, Calcutta.

যমুনা

বিমল ও মানদা

মণিকাঞ্চন—

১২শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ | ২য় সংখ্যা

ভালবাসার স্মৃতি

(শ্রীগীতা দেবী)

সাদরে, পাথরে, নয়ন-সাগরে হৃদয় মথিয়া উঠিল তাজ,
ক্ষীর-সিন্ধুর অমৃত-বিন্দু অমর-প্রেমের কীর্ত্তি কাজ।
যমুনা-পুলিনে বৃন্দা-বিপিনে কীচক-রন্ধ্রে ধরিয়া তান,
আজো বাজে বেণু, কাঁদে যত ধেনু অক্ষয় চির প্রেমের গান।

তাজমহলের অগাধ রতন কোথায় পাইবে দীন সে হায়!
বাঁশী বাজানোর মতন পুরাণ কোথায় মিলিবে,—সে দীন গায়?

তাই সে গরীব প্রেমিক ফকির, প্রণয়ের স্মৃতি রাখিতে তার,
শশ্মান ক'রেছে মানস-নন্দন যা ছিল সুরম্য শোভার সার।
মরুভূ ক'রেছে বৃন্দি-উপবন, পারিজাত ফুল ফুটিত যায়,
সোনাপদ্মের ফোয়ারা ঝিলিক্ আজ শুধু ধূ ধূ সাহারা তায়!

হাতের পাঁচ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুরনো রোডে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবই কম। এক ঘর ননীবাবু ও তাঁহার স্ত্রী অন্নপূর্ণা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। আর দুইটি আত্মীয়া মহিলা আসিলেন বটে, তাঁহারা অন্তঃপুর মধ্যেই রহিয়া গেলেন। সত্যেন্দ্র আপন-মনেই কহিল—ইহাদের বিদেশবাস দেখে হিংসে হয়। ননীবাবুর স্ত্রীটি বেশ রসিক, বিমল বাবু তাঁহাকে আটিতে না পারিয়া বারান্দায় গিয়া বসিয়াছেন।

সন্ধ্যা হইতেই কাঞ্চন হার্মোনিয়াম বাজাইয়া গান ধরিল, নির্ম্মল ম্যাণ্ডোলিনে সুর দিতে লাগিল।

ননী বাবু সত্যেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন—একবার ওঘরে আসবেন?

ওঘরে বোতল গ্লাস সাজাইয়া বিমলবাবু বসিয়াছিলেন, ইঁহারা আসিতেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। উপর্য্যুপরি তিন চার পাত্র নিঃশেষ হইল। বিমল চন্দ্র বেহারাকে ডাকিয়া আহারের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন।

সত্যেন্দ্র বিমলবাবুর কাণে কাণে কহিল—ও ঘরে আমার একটু দরকার আছে।

সেরে আসুন—বলিয়া বিমলচন্দ্র ননীবাবুর দিকে আর একটি পূর্ণপাত্র অগ্রসর করিয়া দিলেন।

সত্যেন্দ্র এ ঘরে আসিয়া দেখিল, কাঞ্চন কি এক খানা খাতা উল্টাইতেছে, সত্যেন্দ্রকে দেখিয়া কাঞ্চন হাসিমুখে দাঁড়াইয়া উঠিতেই পকেট হইতে সেই মুদ্রা মালাগাছি বাহির করিয়া বলিল—তোমার জন্মদিনে, কাঞ্চন, আমার এ তুচ্ছ উপহার

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পরদার পিছন কড়া-গুলি বাজিয়া উঠিল। আসিল—নির্ম্মল!

নির্ম্মল ঘরে ঢুকিতেই সত্যেন্দ্রের হাত কাঁপিয়া গেল, সে মালাগাছি হার্মোনিয়মের উপরে ফেলিয়া দিয়া বলিল গ্রহণ করলে সুখী হব।—সে বাহির হইয়া গেল।

অভ্যাগতগণ বিদায় লওয়ার পর সত্যেন্দ্র বাহিরের বারান্দায় একখানা আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িয়াছিল। দক্ষিন হস্তের দুইটি অঙ্গুলির মধ্যে থাকিয়া সিগারেটের ধোঁয়া উঠিতেছে, সত্যেন্দ্রের হুঁস্ নাই। সেই ধরাই আছে, আর টানেও নাই। সত্যেন্দ্রের শরীর ভাল নাই।

এই সময়ে বিমল বাবু আসিয়া ডাকিলেন—সত্যেনবাবু!

বার কতক ডাকার পর সত্যেন্দ্র উঠিবার চেষ্টা করিয়া, কহিল—কে! বন্ধু?

সত্যেন বাবু! আপনি স্ত্রীর অসুখ দেখতে বেরিয়েছিলেন?

হাঁ—মনে হচ্ছে বটে—তাই!

এ কথা ত আমাদের আগে বলেন নি মশায়!

এখনই বা কা'কে বলেছি বন্ধু?

কেন, কাঞ্চনকে বলেছেন। সেই ত আমায় বল্লে।

বলেছি—বুঝি! কৈ-মনে ত হ'চ্ছে না!

ছিঃ!

সত্যেন্দ্র প্রাণপণ শক্তিতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, পারিল না।

বিমলচন্দ্র বলিলেন—আগে বলতে হয় মশায়, যেমন করে হোক্ আপনাকে পাঠাবার ব্যবস্থা

করছাম আমি ..... রাত্রে একটা ডাউন-গুড্‌স ট্রেন আছে, যাবেন সেটায়? একস্ প্রেস্ গুড্‌স—কাল দুপুরের মধ্যেই পৌঁছে দেবে কলকাতায়। সেখান থেকে.....

গুড্‌স?

ক্ষতি কি! বিশেষতঃ স্ত্রী যখন পীড়িত! দেরী করা কি আপনার উচিৎ? আর বলছি ত, এক্সপ্রেস গুড্‌স,—সচরাচর মাল গাড়ী বল্‌তে যা বোঝায় তা নয়—এ প্রায় ডাক-গাড়ীর স্পীডে চলে। যাবেন?

গাড়ী কখন?

একটা, দেড়টায়। আমি ষ্টেশনে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি ততক্ষণ একটু শুয়ে পড়ুন গে। সময়মত ষ্টেশনের লোক এসে তুলবে'খন।

সত্যেন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া শয়নকক্ষের দিকেই চলিতেছিল, কি ভাবিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল—কাঞ্চন কি.....

শুয়েছে। আচ্ছা মশায়, নমস্কার। আর হয়ত দেখা না'ও হ'তে পারে। নমস্কার।

নমস্কার। অনেক ধন্যবাদ .....

কিছু যান, শুয়ে পড়ুন গে।

সত্যেন্দ্র ধন্ অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল, চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছে। কে যেন মৃদুকণ্ঠে তাহাকেই ডাকিল। কক্ষের এক কোণে একটা ভুরেল ল্যাম্প মিটি মিটি জ্বলিয়া অতি মৃদু আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল, সত্যেন্দ্র সভয়ে চক্ষু খুলিয়া দেখিল—কাঞ্চন!

কাঞ্চন নিকটে আসিয়া বলিল—শুতে যাচ্ছেন, দোর বন্ধ করবেন না।—বলিয়াই সে সরিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিয়া সত্যেন্দ্র খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ অবধি বসিয়া বসিয়া ঐ কথারই তাৎপর্য্য অন্বেষণ করিতে লাগিল। 'দোর বন্ধ করবেন না' এর অর্থ কি? ভাবিতে ভাবিতে তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল। শীতে সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল।

একবার ভাবিল, কাজ নাই, দ্বার বন্ধ করিয়া দিই। আবার ভাবিল, না, কাঞ্চন আসিতে চাহিয়াছে, আসুক। কি বলে শুনিতে হইবে! কিন্তু যদি কেহ টের পায়? না:—কাঞ্চনের মত মেয়ে, বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, সে কি সব দিক না বাঁচাইয়াই আসিবে? কখনই না!

কিন্তু, একজন অনাত্মীয় যুবতীর সহিত একাকী রাত্রে নির্জ্জনে আলাপ করা কি উচিৎ হইবে? তখনি সত্যেন্দ্র বলিল—কে আলাপ করিতেছে! একবার শুধু বিদায় লইব! আর আর—একবার মালাগাছি আনাইয়া স্বহস্তে তাহার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া, না' না, আর কিছু না,—কেবলমাত্র পরাইয়া দিব। আর কিছু না।

সে ঘরেও একটা আলোক নিস্তেজ ভাবে জ্বলিতেছিল, সত্যেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ সেদিকে চাহিয়া একটি সিগারেট ধরাইল। সিগারেটের কুণ্ডলাকার ধোঁয়ার দিকে চাহিয়া সে ভাবিতে লাগিল—সে যদি আজ অবিবাহিত হইত!—সত্যেন্দ্র সিগারেটটি ছুড়িয়া দিয়া বলিল—না সে কথা আর ভাবি কেন!

চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, সত্যেন্দ্র আবার একটি সিগারেট ধরাইল। দু'চার টান দিয়া ফুক্ ফুক্ করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে ভাবিল, কিন্তু কাঞ্চন আসিতে চাহিল কেন?

খুট করিয়া কিসের শব্দ হইল। সত্যেন্দ্র টলিতে টলিতে উঠিয়া দ্বার অর্গল বন্ধ করিয়া দিল।

এক মিনিট পরেই দ্বারে করাঘাত শ্রুত হইল। সত্যেন্দ্র লেপ টানিয়া শুইয়া পড়িতেছে, শুনিল, দোর খুলুন!

দ্বার খুলিবে না ভাবিতে ভাবিতে সত্যেন্দ্র দ্বারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, শুনিল—কৈ, খুলুন না!

সত্যেন্দ্র দ্বারে মুখ রাখিয়া বলিল—বিমল বাবু?

এত রাত্রে কে আর আপনার মত জেগে বসে আছে বলুন! খুলবেন, না, চলে যাব?

সত্যেন্দ্র অর্গল মুক্ত করিয়া সরিয়া আসিল। কাঞ্চন বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল—আবার আলো কেন?

সত্যেন্দ্র মোহাবিষ্টের মত আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া দিল।

কাঞ্চন ঘরে ঢুকিল, অন্ধকারে তাহার কণ্ঠের মোটাকতক উজ্জ্বল প্রস্তর জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

সত্যেন্দ্র কাঁপিতে লাগিল। তাহার সকল অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, এখনই বুঝি একটা গোবিন্দলাল রোহিণীর কাণ্ড ঘটিয়া বসে! রাসবিহারী না হয় গোবিন্দলালের পদশব্দ শুনিয়াই পলাইতে পারিয়াছিল, সে যদি না পারে? বিমলচন্দ্র যদি আসিয়া সাক্ষাৎ যমের মত সামনে দাঁড়াইয়া বলে—তোমার যম!—বিমল যদি রোহিণীর বদলে তাহাকেই গুলি করে! সত্যেন্দ্রের মনশ্চক্ষে ছায়াচিত্রের মত ঘটনাটি প্রতিফলিত হইয়া উঠিল!.. ঐ বুঝি বিমল বাবু বন্দুক হাতে আসিয়া দাঁড়ায়! ঐ বুঝি তাহারই মস্তক লক্ষ্য করিয়া বলে—ওয়ান্, টু, থ্রি ও চ্!! সত্যেন্দ্র যেন সিক্ত হইয়া উঠিল। কাঞ্চন বলিল—আপনি বুঝি কথা কইবেন না? তবে আর কি হ'বে—আসি চলুম।

না, না—তুমি যেও না কাঞ্চন!—সত্যেন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে কয়েকপদ অগ্রসর হইল।

বড় অন্ধকার!—বলিয়া সে আবার স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল।

ও কি, সত্যেন বাবু?

ভয় যে কি সত্যেন্দ্র মনে জানিলেও মুখে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না।

কাঞ্চন পুনশ্চ কহিল—আপনাকে একটা উপহার দেব বলেছিলুম মনে আছে?

ওঃ!—সত্যেন্দ্র ভাবিতেছিল, সেই জন্যই কি কাঞ্চন এত রাত্রে নির্জ্জনে তাহার ঘরে ঢুকিল! সকলের সাক্ষাতে দিতে নিশ্চয়ই আপত্তা ছিল; কিন্তু সে কি উপহার? কি এমন গোপন বস্তু দিবে?—সত্যেন্দ্র বলিল—বড় অন্ধকার, কাঞ্চন!

কাঞ্চন বলিল—তবে আলো জ্বালুন, আমি দোরটি বন্ধ করে দিই।

সত্যেন্দ্র যেদিকে আলো ছিল আন্দাজে হাতড়াইতে হাতড়াইতে সেদিকেই চলিল, দ্বার বন্ধের শব্দ শুনিল। আলো জ্বালিয়া চিমনী পরাইতে পরাইতে অত্যন্ত শুষ্কস্বরে বলিল—যদিও তুমি আসবে বলেছিলে এসেওছ, আমার কিন্তু বিশ্বাসই হয় নি।

উত্তর হইল—তুমি কেন গেলে না?

যাব ত! একটায় গাড়ী, বিমল বাবু বলেছেন। কিন্তু—কিন্তু তুমি কেন—কেন—তুমি এলে কেন? কেউ যদি জান্তে পারে...

বাহিরে কিসের একটা শব্দ হইল, সত্যেন্দ্রের পা হাত নড়িয়া কাঁপিয়া আলো নিবিয়া গেল।

সর—আমি জ্বালছি।

সত্যেন্দ্র বিদ্যুৎস্পর্শে শিহরিয়া উঠিল। বলিল—ও কিসের শব্দ! কে যেন দোর ঠেলছে! না, না—তুমি বাইরে যাও, দোহাই তোমার, বাইরে যাও। তুমি না যাও আমি যাচ্ছি!—সত্যেন্দ্র দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, বাহির হইতে বিমলবাবু বলিলেন, আপনাকে ডাকবে' পন, সত্যেন বাবু! আজ বোধ হয় ভোরের দিকেই গুড্‌স আস্‌বে।

সত্যেন্দ্র অতিকষ্টে একটি হাঁ উচ্চারণ করিতে গেল কিন্তু কণ্ঠনালী ভেদ করিয়া শব্দ বাহিরে আসিল না। "এখন একটু ঘুমুন নিশ্চিন্ত হয়ে"—বলিয়া বিমল বাবু চটি জুতার পটাপট শব্দ করিয়া চলিয়া গেলেন। পদশব্দ বিলীন হইলে, সত্যেন্দ্র বলিল—আলো জ্বাল। বড় পিপাসা একটু জল।

আলো জ্বালা হইল। মেয়েটি আলোক উজ্জ্বল করিয়া দিয়া এ-ধারে আসিয়া তোয়ালায় রক্ষিত কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া সত্যেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া বলিল—নাও।

মজাবদ্ধার সামনে পুলীশ প্রহরী দেখিলে মাতালের নেশা যেমন চট্ করিয়া ছুটিয়া যায়, প্রজ্বলিত আলোকে নারীটির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সত্যেন্দ্র আকাশ হইতে পড়িয়া গেল। এ-কে? এ ত কাঞ্চন নয়! এ কোথা হইতে আসিল?—সত্যেন্দ্র চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া লইল, তাই ত! কাঞ্চন ত নয়! এ যে দেখি—সুবাস!

সত্যেন্দ্র গ্লাস শুদ্ধ হাতটি ঠেলিয়া দিয়া বলিল—রেখে দাও।

একটু পরে সত্যেন্দ্র বিরক্তিপূর্ণস্বরে কহিল—বারবার নেকামো ভাল লাগে না, জান?

মেয়েটি সভয়ে কহিল—তোমার সামনে কুঁজো থেকে গড়ালাম দেখতেই ত পেলে……

জল নয়, জল নয়! তুমি কোথাকে এলে?

কেন, পরশু প্রভাত দা'র টেলিগ্রাম পেয়েই আমরাও বেরিয়েছি।

প্রভাত দা'র টেলিগ্রাম! প্রভাত দা' কে?

কেন? বিমল বাবুর ভাই! বিমল, নির্ম্মল, প্রভাত, আর বিলেতে আছে বিকাশ! প্রভাত কলকাতায়……

থাক্—সে কি টেলিগ্রাম করেছিল শুনি?—রাগে সত্যেন্দ্রের দাঁত কিড় মিড় করিতেছিল।

কেন, সেই ত টেলিগ্রাম করলে, তুমি যে ট্রেণে উঠেছ সে ট্রেণটা মধুপুরের নয় ওয়াল-টোয়ারের। গাড়ী খানা ভোরে এখানে পৌঁছবে জেনে আমরা তখনি বিমল বাবুকে তার করলুম, তোমাকে নামিয়ে নিতে। অবশ্য আমি সাথে-পাথে থাকি নে, বড় দি'ই সব করলেন।

সত্যেন্দ্র কথা কহিল না।

সুবাস বলিতেছিল—প্রভাত দা'র টেলিগ্রাম পেতেই বড় দি বুঝতে পারলেন যে তোমার ভুল হ'য়েছে…

সত্যেন্দ্র মুখখানা গোমড়া করিয়া বলিল—আমার ভুল! সেই জন্যেই বুঝি প্ল্যাটফরম, টাইম সব খুলে তাঁর করা হ'য়েছিল?

সুবাস হাসিয়া বলিল—তুমি কেন টাইম-টেবল দেখে বেরুলে না? আমাদেরই না হয় পুরোণো টাইম-টেবল। তুমি ত একখানা…দেখতে পারতে!

পুরোণো কি-রকম?

প্রভাত দা'র টেলিগ্রাম পেতেই জানলুম যে মধুপুরের গাড়ীটা এ মাস থেকে আধ ঘণ্টা পরে পরে ছাড়ছে আর পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফরম থেকে

সত্যেন্দ্র পোর্টম্যাণ্টু হইতে টাইম-টেবল খানি খুলিয়া, প্রথম পৃষ্ঠাটি দেখিয়া, আস্তে আস্তে বলিয়া পড়িল। একটু পরে বলিল—আমি ও কথা বিশ্বাস করি নে। বড় দি', যখন মধুপুরে ছিলেন, আর তিনিই তার করেছিলেন, তখন, না, তিনি আমাকে বিপদে ফেলতেই এ-সব করেছেন, আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি।

সুবাস বলিল—আমি যা সব জানতুম, বলুম। আর কিছু জানিনে।

সত্যেন্দ্র বলিল—কাঞ্চন কে?

বা-রে! কাঞ্চন দিদি, কানন দিদি—তুমি ত চেন ওদের! আমার খুড়তুতো জেঠতুতো বোন……

সত্যেন্দ্র হাঁড়ীপানা মুখ করিয়া বলিল—ওরা কি—খৃষ্টেন বুঝি?

সুবাস সাশ্চর্য্যে কহিল—খৃষ্টেন-কি আবার?

সত্যেন্দ্র বলিল—বিমল বাবু কে?

কাঞ্চন দি'র বর। এখানকার বড় ইঞ্জিনীয়ার!

সত্যেন্দ্র কথা কহিল না। ইঞ্জিনীয়ার হইয়াও তিনি যে টিকিট কালেক্টারের পোষাক পরিয়া টিকিট চেক্ করিয়াছিলেন, সে তাহা ভুলে নাই। ক্ষোভে, রোষে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল।

সুবাস বলিল—তোমার টেলিগ্রাম পেয়েই আমরা বেরুলুম ; এখানে এসে শুনি, কাঞ্চন দিকে তুমি চিন্তে পার নি। কাঞ্চন দি'ও একটা মজা করবার জন্যে.....

মজা ? সত্যেন্দ্র তুলিতে লাগিল।

সুবাস সত্যেন্দ্রের পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া বলিল—কিন্তু ওরা লোক বেশ, না? কাঞ্চন দি'র মত মিশুকে হাসুনে মেয়ে দেখাই যায় না, নয় ?

সত্যেন্দ্র বিকৃতমুখে বলিয়া উঠিল—দিব্যি পরে না কেন ?

স্বামীর মুখের ভাব দেখিয়া সুবাস বিস্মিত ও ক্ষুণ্ণ হইল, বলিল—বিমল বাবু যে কাঞ্চন দি'কে নিয়ে বিলেত যাবেন, সেখানে ত সিঁদুর পরার রেওয়াজ নেই কি না কিন্তু কি চমৎকার লোক.....

থাক্, থাক্, খুব হ'য়েছে—বলিয়া সত্যেন্দ্র লোটমাণ্ট খুলিতে উঠিয়া গেল। সুবাস মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আচ্ছা, তুমি এমন কথায় কথায় রাগ কর কেন বল ত ?

তোমার যে রোগ হ'য়েছিল—সে সব বুঝি মিছে কথা ?

এবার সুবাসের অভিমান উথলিত হইয়া উঠিল ; সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল—আমার রোগই হোক্, আমি বাঁচি আর মরি, তোমার কি বল ? তুমি ত খুব জন্মদিন উৎসবে মত্ত ছিলে ! মালাটা চিন্তে পার ?

এই সময়ে দ্বারটি খুলিয়া হাসিমুখে কাঞ্চন বলিল—আমি ত তোমাকে বলেছিলুম ভাই, জন্ম-দিনে আমরা উপহার নিই নে, দিয়ে থাকি। আজ বিশেষ আমার জন্মদিন নয়, কিন্তু জন্মদিনের অভিনয়ই যখন করা হ'য়েছে, ঐ সুবাসটিকে আজকার দিনে তোমার উপহার দিলুম ভাই, আর মালাটা তার দাও !

সত্যেন্দ্র গোঁ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তুমি কিন্তু ভাই ভারী মজার লোক। ওঁকে না হয় না দেখেছ, না-ই চিন্লে ; আমাকে ত দেখেছ, চেন ত, প্রভাতের সঙ্গে এত ভাব, তেনা শুনো.....

আমি কাউকে চিনি নে।

ও কি কথা ভাই ! সেই সেবার যখন এলাহাবাদে তোমার শরীর খারাপ হয়, আমি যে তখন ছিলুম গো ! আমি ত ভেবেছিলুম এবার তুমি ঠিক চিন্বে। পরে যখন এলে তুমি, আমি নমস্কার করলুম তবুও চিনলে না ! তুমি চিন্তে পারলে না দেখে আমি আর পরিচয় না দিয়ে

থাক্—আর দরকার নেই—বলিয়া সত্যেন্দ্র অন্য-দিকে মুখ ফিরাইল।

কাঞ্চন হাসিমুখে কহিল—সে কি ? এরই মধ্যে দরকার নেই। এখনও যে আসল লোকের সঙ্গেই দেখা হয়নি ভাই। সাহস করে আস্তে পাচ্ছেন না, বল ত ডাকি ?

আভাস বোধ করি নিকটেই কোথাও ছিল, বলিয়া উঠিল আমি ত হাতের পাঁচ আছিই ভাই। তোকে নতুন লোক পেয়ে সত্যেনের যত আনন্দ হ'য়ে ছিল, আমরা সব পুরোণো আদ্মী

সত্যেন বোধ করি দেওয়ালটাকেই উদ্দেশ করিয়া বিড় বিড় করিতে লাগিল—অসুখ করুক যাকে —হাঁা ! কেবল আমাকে ..আচ্ছা আমিও—হাঁা।

হাতের পাঁচ বলিল—বল্তে তোমার লজ্জা হয় না সত্যেন, সুবাসের অমন ব্যায়রামের সময় একটি দিনের জন্যে যেতে পারলে না ! তুমি আবার নাক নাড় ভাই !

সত্যেন্দ্র সুবাসের দিকে চাহিয়া বলিল—বিমল বাবুকে ডেকে দাও, আমি এখনই যাব, কলকাতায় আমার কাজ আছে।

কাজ ত রেস্ ! শনিবারের এখন দেরী আছে —বলিয়া আভাস বাহির হইয়া গেল।

আমার জন্মদিনে যে অতিথিকে যেতে নেই ভাই ! —কাঞ্চন বাহিরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

চল, শোবে চল—এক রকম টানিতে টানিতে সুহাস তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিল। সমাপ্ত।

ইতিহাসের সংজ্ঞা ও ধারা

(অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ)

[সাহিত্য সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনে ইতিহাস শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে সুবিস্তৃত, বহুতথ্যপূর্ণ গবেষণাপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা স্থানাভাব বশতঃ আমরা সম্পূর্ণ উদ্ধার করিয়া দিতে সমর্থ হইলাম না। শেষাংশে তিনি যে সমস্ত অত্যাবশ্যকীয়, অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।]

আমাদের নিকট আজকাল যাহা 'ইতিহাস', খুব প্রাচীনকালে 'ইতিহাস' বলিলে ঠিক তাহা বুঝাইত না। পূর্ব্বকালে ঘটিয়াছিল, এইরূপ আখ্যায়িকা বুঝাইতে ঋগ্বেদে 'ইতিহাস' শব্দের প্রয়োগ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে ইতিহাসের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। সুদূর অতীতে কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে, সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলা হইত - ইতি—হ—আস অর্থাৎ ইতি = ইহা, হ—নিশ্চয়, আস—হইয়াছিল। ঘটনা সত্য না হইলে কখনই তাহাকে ইতিহাস বলা হইত না। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই অর্থেরই ইঙ্গিত আমরা বুদ্ধঘোষ-প্রণীত "সুমঙ্গলবিলাসিনী"র "অম্বট্ঠ-সুত্ত-বর্ণনা"য় এইরূপ পাই—"ইতিহাস—পঞ্চমং—অথর্ব্বণ-বেদং। চতুত্থং কত্বা ইতি হ আস ইতি হ আসাতি ঈদিস-বচন-পটিসংযুত্তো পুরাণকথাসংখাতো ইতিহাসো পঞ্চমো এতে সন্তি ইতিহাসপঞ্চমা। তেসং ইতিহাস-পঞ্চমানং বেদানং।" কোন প্রাচীন কথার শেষে "ইতি হ আস" এই কথাটি বলা হইত। ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়, তখন প্রধানতঃ চারিটী প্রণালীতে ঘটনা বিবৃত হইত; —প্রথম ইতিহাস, দ্বিতীয় পুরাণ; তারপর আর দুইটী হইতেছে—"শ্লোকাঃ" ও "নারাশংসী"। কোন ঘটনা সমাবেশে বড়লোকের কথা বলিয়া বহুবচনান্ত "শ্লোকাঃ" এইরূপ বলা হইত। অন্য কোন এক-প্রকারের আখ্যায়িকার নাম ছিল "পুরাণ"। "ইতি-হাস-পুরাণ" এক সঙ্গেও কোথাও কোথাও আছে।

ইতিহাস-পুরাণের সকলের চেয়ে পুরাতন উল্লেখ আমরা পাই অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষ দিকে। কোন কোন জায়গায় "পুরাতন ইতি-হাসে"র ও উল্লেখ আছে, তবে তাহা বৈদিক সাহি-ত্যের পরবর্ত্তী গ্রন্থেই পাওয়া যায়। অনুগীতায় নারদ ও দেবমতের "পুরাতন ইতিহাস" বিবৃত আছে। দেবমতের নাম বৈদিক সাহিত্যে কোথাও নাই। অনু-গীতার সময় বৈদিক প্রবাদ পুরাণ হইয়া যাওয়ায় সম্ভবতঃ "পুরাতন ইতিহাস" নাম হইয়া থাকিবে। বেদে "নারাশংসী" নামে একরূপ আখ্যায়িকা আছে। এগুলি অনেকটা "History"র মত। এগুলিতে প্রাচীন লোকদের বংশবিবরণ থাকিত, আর থাকিত তাহাদের গুণকীর্ত্তির গাথা। রাজপুতানা ও গুর্জ্জরের ভাটদের গানে এগুলির কিছু আভাস পাওয়া যায়। নারাশংসীর ন্যায় "গাথা" বলিয়া একরূপ আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে। এইগুলি বৈদিক যুগের পরে নারাশংসীর সঙ্গে মিলিয়া গিয়া "নারাশংসী গাথা" বা শুধু "গাথা"য় পরিণত হইয়াছিল। এই সমস্ত আখ্যায়িকার উপ-বিভাগও বৈদিক সাহিত্যে বিরল নয়। আখ্যান, অনাখ্যান, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান প্রভৃতি যে এই সমস্ত আখ্যায়িকার কোনরূপ উপ-বিভাগ, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু এগুলি কিরূপ ছিল, তাহা জানি না। প্রাচীন যুগের ইতিহাসের ধারা আলোচনা করিবার সময় এখনও হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে দিগ্‌দর্শন হিসাবে একটু ইঙ্গিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

ডিল্‌থে (W Dilthey), ট্রয়েল্‌ট্‌স্‌ (E. Troeltsch), ভুণ্ট্‌ (W. Wundt), এনান্‌ডেল্‌ (C. Annandale) ও অন্যপ্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। ইতিহাস কি এবং তাহা কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। এ বিষয়ে প্রধান পণ্ডিতেরা যে সমস্ত কাজের কথা বলিয়া গিয়াছেন, আমি বিশেষ সাবধানতার সহিত তাহার সংগ্রহ করিয়া, তাঁহাদের উক্তির সার নিষ্কর্ষ করিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিব।

গ্রীসদেশের সুপণ্ডিত হেরোডোটস্‌ ইতিহাসে অর্থে ঘটনার বিবৃতি ও মানুষের সামাজিক ও নাগরিক অবস্থার বর্ণনই বুঝিয়াছিলেন; বহু দিন ধরিয়া এই মনীষীর পথানুসরণ করিয়া পাশ্চাত্য জগৎ ইতিহাসের এই সংজ্ঞাই নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছিল। তারপর ইতিহাসের পরিসর আর একটু বাড়াইয়া দিয়া, পণ্ডিতেরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনার বিবরণকে ইতিহাস নামে আখ্যাত করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির অন্তস্তল তন্ন তন্ন করিয়া যে সমুদয় সত্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহাও প্রাকৃতিক ইতিহাস বা বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইল। এই অর্থেই শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাস, আবিষ্কারের ইতিহাস, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, এমন কি, জীবনবৃত্ত ও ইতিহাসের সুবিশাল গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশলাভ করিল। ক্রমে পণ্ডিতেরা বুঝিলেন, এই অতিবিস্তৃতিদোষদুষ্ট সংজ্ঞাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ইহাকে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। অবশ্য উল্লিখিত বিষয়গুলির বিবৃতিকে যে ইতিহাস আখ্যা দেওয়া যায় না, তাহা নহে; ঐগুলি মানবের সহিত সংশ্লিষ্ট—সমাজ-বদ্ধ মানবের সুখদুঃখের অনুভূতির সহিত, ওতপ্রোতভাবে জড়িত; তাহা হইলেও বলিতে হইবে, এগুলি সমাজ-জীবনের তন্ত্রীতে যে ভাবে আঘাত দেয়, প্রকৃত ইতিহাস সে ভাবে আঘাত দেয় না। ইতিহাসের আঘাতে সমাজে যেরূপ সাড়া পাওয়া যায়, এগুলির আঘাতে সেরূপ সাড়া পাওয়া যায় না। তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইতিহাসকে কেবল ঘটনার ফিরিস্তি, রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রের অধিনায়কদিগের জীবনের ঘটনার বিবৃতিতে পর্য্যবসিত না করিয়া, ইহার সীমা এইরূপভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন যে, সেই ঘটনাই ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিবে—যাহা দ্বারা সমবেত মানব সমাজ গঠনপ্রয়াসী হইয়া তাহার মঙ্গল-কামনায় মানবসঙ্ঘের উন্নতি বা [illegible]তির কারণ হইবে—মানব-সম্মেলনের ভাবধারাকে বংশপরম্পরায় সঞ্জীবিত রাখিবে; অবশ্য সেই ভাবধারা যে অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে, তাহা নহে—অবস্থাবিশেষে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে। এই সম্মিলিত সমাজের কার্য্যাবলী, জাতি, রাষ্ট্র, রাজ্য, প্রজাতন্ত্র, সাম্রাজ্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। আমরা কোন সমিতি-সম্পর্কে 'সমিতির ইতিহাস' এইরূপ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি, কিন্তু সমিতি, ব্যবহারাজীব-সমিতি, নাগরিক কর্পোরেশন, প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনবৃত্ত বা বংশাবলীর কাহিনী প্রকৃত ইতিহাস-পদবাচ্য নহে। অবশ্য এগুলি যদি রাজনৈতিক উন্নতি বা অবনতির সহায় হয়, তাহা হইলে ইহারা ইতিহাস গঠনে উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে। ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, ঘটনাবলী ও অনুষ্ঠাতাদিগের সংখ্যা অগণিত। ইতিহাস কেবল সাধারণ ঘটনার সমবায় নহে। কোন ঘটনাই আকস্মিক কারণে উদ্ভূত হয় না। যখন এইরূপ কতকগুলি সাধারণ ঘটনা কেন্দ্রাভিগ হয়, কিংবা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধন করে, তখনই বিশেষ বিশেষ ঘটনা উৎপন্ন হয়। ইতিহাসের আলোচ্য হইতেছে এই বিশেষ

ঘটনা। শুধু এইগুলির বিবৃতি করিয়া ইতিহাস ক্ষান্ত থাকে না, ইহাদের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হয়। কোন ইচ্ছাশক্তির বলে ঘটনার সমবায় বা বিয়োগ উপস্থিত হইল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টার নামই কারণ—পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা ইহাকে Psychological motive বলিয়া থাকেন। ঐতিহাসিক চিন্তা উদ্দেশ্যমূলক। অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্কল্প মানব-হৃদয়ে কেন উদ্ভূত হয়, তাহা বুঝিতে হইবে—আর বুঝিতে হইবে, কেনই বা মানব সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। বাস্তবিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ঘটনা ও ঘটনার নায়কদিগের সঠিক বিবরণ জানা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কারণ, মানব যে ইচ্ছাশক্তি-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার সঠিক পরিচয় সহজে সকলে পায় না কিন্তু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলি কেন সমাজে চলিয়াছিল, তাহা চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

একটা চলিত প্রবাদ আছে, ঐতিহাসিক ঘটনার দর্শন পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায় (History repeats itself)। কথাটা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যতটা প্রযোজ্য, ততটা অন্য ঘটনা সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কোন অবস্থাবশে কোন দেশে যে প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা হইয়াছিল, সেই অবস্থা-সমাবেশ যদি অপর দেশে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা আশা করিতে পারি, প্রাগুক্তরূপ অনুষ্ঠান শেষোক্ত দেশেও কার্য্যকর হইতে পারে। প্রকৃত ঐতিহাসিকের বহু দেশ ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সভ্যতা-ধারার অনুযায়ী অনুষ্ঠানগুলি কি অবস্থায় জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। এমিল রাইখ (Emil Reich) সত্যই বলিয়াছেন,— The untravelled historian is like a chemist who has no laboratory. Travel and sojourn in countries of different types of civilisation can alone give those object impressions of the forces of history without which the related facts can be neither interpreted nor co-ordinated" ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষাদ্বারা অবশেষে যেমন রাসায়নিক সত্য বাহির হইয়া থাকে, সেইরূপ বহু দেশের অনুষ্ঠানের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা পরিদর্শন করিয়া আমরা তেমনই ঐতিহাসিক কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি। তর্ক-শাস্ত্রের মতে কারণ সেই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনীয় পূর্ব্বঘটনা বা ঘটনার সমাবেশ, যাহা কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। শুধু বর্ত্তমানের আলোচনা করিলে প্রকৃত ইতিহাস গড়িয়া উঠিবে না। বিগত শতকে আরনল্ডপ্রমুখ পণ্ডিতেরা বর্ত্তমানের উপর ইতিহাস গড়িবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। বর্ত্তমানের দ্বারা অতীতকে বুঝিতে হইবে, আবার অতীতই যে বর্ত্তমানের কারণ, তাহাও ভুলিলে চলিবে না। তাই ঐতিহাসিকের প্রধান কর্ত্তব্য, অতীত ও বর্ত্তমানের তুলনামূলক সমালোচনা করা। আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, অতীতের সমস্ত ঘটনা পরস্পর এক অবিচ্ছিন্ন সূত্রাকারে গ্রথিত—শৃঙ্খলাবদ্ধ। কোন একটা ঘটনাকে সেই শৃঙ্খলা হইতে বিচ্যুত করা যায় না। প্রত্যেক ঘটনাই সমগ্রের অংশ—সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার কোন অর্থই থাকে না। অধ্যাপক বুরী বলিয়াছেন, জীবদেহ হইতে কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন সেই অঙ্গের কোন মূল্য থাকে না, শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনা হইতে বিযুক্ত করিয়া কোন একটী ঘটনাকে পৃথক্ ভাবে দেখিলে তাহারও কোন মূল্য থাকে না। এ বিষয়ে আমরা দর্শনাভিমুখ ইতিহাস আলোচনাকালে বিশেষ ভাবে বলিব। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইতিহাসের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সত্য এবং এইগুলিই ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু ইতি-হাসের কতকগুলি গৌণ উদ্দেশ্যও আছে। মানবের কার্য্যাবলী লইয়া যখন ইতিহাসকে নাড়াচাড়া করিতে হয়, তখন এই মানবের প্রকৃত স্বরূপ বোঝাও

আবশ্যক। নৃতত্ত্বে এই বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। তারপর সমাজ বা জাতিতত্ত্বের আলোচনাও ইতিহাসের বিষয়ীভূত।

প্রধানতঃ ভূগোল, জীবনবৃত্ত, ব্যবহারশাস্ত্র, পুরাবৃত্ত, ধর্ম, আচার ও সাধারণ জ্ঞান ইতিহাস রচনার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এগুলি গৌণভাবে ইতিহাস রচনার সহায়তা করিয়া থাকে। তারপর প্রাচীন বংশাবলীর প্রশস্তি প্রকৃতির সহিত পরিচয় না থাকিলে, ইতিহাস রচনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

ইতিহাসের স্রোত ত্রিধা প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহার একটি ধারা কলাভিমুখী, অপরটি বিজ্ঞানাভিমুখী, তৃতীয়টি দর্শনাভিমুখী। এই তিন ধারার প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলে, ঐতিহাসিক প্রণালীর সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক। মানবই ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার শক্তির একটা সীমা আছে; সেই শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে কলা বা আর্টের আবশ্যক। প্রকৃত ঐতিহাসিকের নিকট জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকা চাই—তিনিই প্রকৃত ঐতিহাসিক হইতে পারিবেন, যিনি প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া জ্ঞানী হইয়াছেন। সাংসারিক বুদ্ধি যাঁহার যত বেশী, তিনি ঐতিহাসিক সত্য তত অল্প আয়াসে নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন। ইতিহাসের লক্ষ্য সত্য—নির্দ্ধারণ। ঘটনাবলী পাইলেই ঐতিহাসিক তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন না। তিনি তর্ক ও দর্শন-শাস্ত্রের কষ্টিপাথরে সেগুলি যাচাই করিয়া দেখেন—তাহারা খাঁটি সত্য কি না। তাই বলিতেছিলাম, ঐতিহাসিক হইতে গেলে তাঁহাকে বিজ্ঞান, দর্শন ও সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে। আধুনিক বিজ্ঞান ঐতিহাসিক আলোচনার পথকে দুর্গম করিয়া দিয়াছে। এখন শুধু ঘটনার তালিকা দিলেই ইতিহাস হয় না। অবশ্য ঘটনার তালিকা বা সৌর্ব্বাপর্য্য-সূচী যে ইতিহাসের অঙ্গ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা ইতিহাসের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না বা কেবল-মাত্র ইহার উপর ঐতিহাসের সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে পারে না।

চার্লস্ এনাল্ডেল (C. Annandale) চিত্রবিদ্যার সহিত ইতিহাসের তুলনা করিয়াছেন। বাস্তবিক চিত্রকর ও ঐতিহাসিকের কার্য্য কতকটা একই প্রকারের। প্রকৃতি চিত্রকরকে উপাদান-সম্ভার দিতে কখনই কুণ্ঠিত হন নাই; কিন্তু সৌন্দর্য্য-পালিনী স্বভাবরাণী কোথাও সমগ্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখেন নাই। শ্রম ও অধ্যবসায়-সহকারে চিত্রকরকে উপাদানগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া বিষয় নির্ব্বাচন করিতে হয়; তারপর তুলিকার সাহায্যে যথাযথ বর্ণ সংযোজন করিয়া, চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে চিত্র অঙ্কিত করিতে হয়; সেইরূপ সমাজ, ইতিহাস গঠনের উপাদান দিয়াই ক্ষান্ত থাকে, ঐতিহাসিককে ঐ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনা হইতে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃত ইতিহাস রচনা করিতে হয়। ঐতিহাসিকের মনে রাখা উচিত, ঘটনার ফিরিস্তি করাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য নয়; পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহার পুনরুক্তি আবার করি—ঘটনার কারণানুসন্ধান তাঁহার অন্যতম কার্য্য। কোন্ অবস্থায় কি করিয়া ঘটনাটী ঘটিল, তাহাও দেখা ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য। পটুয়া ও চিত্রকরে যেরূপ প্রভেদ, ঘটনার ফিরিস্তি-বিবৃতিকারী ঐতিহাসিক ও ঘটনার কার্য্যকারণ-আবিষ্কারক ঐতিহাসিকের মধ্যে প্রভেদও সেইরূপ। প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর ও ঐতিহাসিক "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" শ্রেণীর নকলনবীশ মাত্র। চিত্রকর ও প্রকৃত ঐতিহাসিকের সাধারণ ও বিশেষ দুই প্রকার গুণ থাকা উচিত। সাধারণ গুণ অর্থে যে কেবল সাধারণ জ্ঞান বুঝিতে হইবে তাহা নহে, অধিকন্তু বুঝিতে হইবে—প্রকৃষ্ট মানসিক শক্তি। যে শক্তিবলে ঐতিহাসিক মানবকে জ্ঞানের পথে সত্য-নির্দ্ধারণে সহায়তা করে—যে শক্তিবলে মানব

তাঁহার নিকট হইতে ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করিয়া ধন্য হয়, তাহাই এই প্রকৃষ্ট জ্ঞানদিক শক্তি। দার্শনিক বেকনের মতে ইতিহাস স্মৃতির উপর, দর্শন জ্ঞানের উপর ও কবিতা কল্পনার উপর নির্ভর করে। বস্তুতঃ ইতিহাস যে স্মৃতির উপর কতকটা নির্ভরশীল, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না; কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, ঐতিহাসিককে মানবের ঘটনা লইয়া কার্য্য করিতে হইবে। মানবের প্রত্যেক ঘটনার সহিত স্বার্থ বা বিরাগ ও অনুভূতি কতক পরিমাণে জড়িত থাকেই থাকে। প্রকৃত ঐতিহাসিককে এগুলির হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। বুদ্ধিবৃত্তির চালনায় সত্য নির্দ্ধারণই তাঁহার কর্ত্তব্য। ভাবাবেশে ঘটনাকে বিকৃত করিয়া দেখিলে চলিবে না। প্রমাণগুলিকে ব্যবহারাজীবীর মত দেখিলেও চলিবে না; তাহা হইলে ঐতিহাসিক একদেশদর্শী হইয়া পড়িবেন। তাঁহাকে সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা রাখিয়া, স্থিরচিত্তে সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে দেখিতে হইবে প্রমাণগুলি বিচারসহ কি না। আর দেখিতে হইবে, কোন্ অবস্থাবশে মানব কোন্ কার্য্য করিতে পারে। মানবের সুখদুঃখের অংশভাগী তাঁহাকে হইতে হইবে—সহমর্ম্মী হইয়া তাঁহাকে ঘটনাগুলি দেখিতে হইবে। সর্ব্বোপরি ঐতিহাসিকের চাই 'সু-মতলব।' কু-মতলবে আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘটনাকে বিকৃত না করিয়া অথবা ঘটনা হইতে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া সত্যসন্ধ ঐতিহাসিক কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। বক্তব্য বিষয়কে হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলাও ঐতিহাসিকের আর একটী সাধারণ গুণ। বর্ণনভঙ্গী অর্থে রচনা-প্রণালী বুঝিলে চলিবে না—ভাব ও চিন্তার ধারাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করাই ঐতিহাসিকের বর্ণনভঙ্গী।

এই পর্য্যন্ত ইতিহাসের ধারা কলাভিমুখী। ঐতিহাসিকের বিশেষ গুণ আলোচনা করিতে হইলে বিজ্ঞানের সহিত ইতিহাসের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে। আজকাল বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীদ্বারা ইতিহাসের আলোচনা হউক, এ কথা আমাদের দেশে অনেকেই বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে, বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত ইতিহাস আলোচনা সম্ভবপরই নয়। ঐতিহাসিক যে যুগের ইতিহাস লিখিবেন, সেই যুগের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সহিত তাঁহার সম্যক্ পরিচয় থাকা আবশ্যক। সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানগুলির আলোচনা ও দেশের অবস্থার বিবরণ বা statistics সংগ্রহ করা ঐতিহাসিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তর্কশাস্ত্রের মতে ঘটনাপরিদর্শন জন্য যে সকল নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছে, ঐতিহাসিককে সেগুলির প্রতি অবহিত হইতে হইবে। প্রমাণগুলির যথার্থ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে, প্রমাণ-উত্থাপনকারীর ঘটনাবলী দেখিবার কতদূর সুযোগ-সুবিধা হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন, ঘটনাপরিদর্শনকারী সমসাময়িক সাক্ষ্যের মূল্য পরবর্ত্তী কালের সাক্ষ্যের মূল্য অপেক্ষা অত্যন্ত বেশী। স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিফলক, দানপত্র ইত্যাদিতে উৎকীর্ণ লিপির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলেও দেখিতে হইবে, কবে কাহাকর্ত্তৃক ঘটনার কত বৎসর পরে সেই স্তম্ভ উত্তোলিত হইয়াছে কিংবা লিপি বা ফলক উৎকীর্ণ হইয়াছে। আমি এ স্থানে (Troeltsch) ট্রএল্‌ট্‌শের সুচিন্তিত গ্রন্থের দু'একটী কথার পুনরুল্লেখ করিব। তিনি বলিয়াছেন, অন্যান্য বিষয়ের যেমন, ইতিহাসেও সেইরূপ। পুঁথিগত-বিদ্যা সাধারণ ভাবের উপর নির্ভর করে। সাধারণ ভাব আবার কার্য্য-কারণের নিয়মবশে চালিত হইয়া থাকে। ইতিহাসের ব্যাবহারিক কার্য্যকরী দিকটা ছাড়িয়া দিলে, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য—প্রত্যেক ঘটনা, কার্য্য, প্রণালী ও ঘটনার সূত্র কার্য্যকারণ-পরম্পরার নিয়মানুসারে নির্দ্ধারণ করা। এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের নামান্তর মাত্র।

আর্য্যানদেশে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে বেয়ন্‌হাইম

(Bernheim) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিমতে ইতিহাস আলোচনার প্রথম সূত্রপাত করেন। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত জার্ম্মানেরা এ বিষয়ে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, ততদূর অন্য কোন জাতির ঐতিহাসিকগণ হইতে পারেন নাই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সেনোবো (Seignobos) ও লাঙ্‌লোয়া (Langlois) সমাজ-বিজ্ঞানে এই পদ্ধতি কতদূর প্রযোজ্য, তাহা বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের আলোচনার বিষয় একই মানব। তবে সমাজতত্ত্বে মানব-সংহিতার (Communialism) দিক্ হইতে ব্যক্তিত্বকে দেখিতে হইবে। এখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য কোনরূপ নাই। ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি এখানে কার্য্যকরী হয় না। সংহতির পুর্ণতার জন্যই ব্যক্তির আবশ্যকতা। সমাজই ব্যক্তির ইতিহাস, ব্যক্তি ও তাহার কার্য্যাবলী লইয়াই ব্যস্ত। ব্যক্তির কার্য্য সমাজের পরিপন্থী কি না, তাহার বিচার ইতিহাস করিয়া থাকে। জার্ম্মান দেশের এই পদ্ধতি অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে অনুসৃত হয়। এখন সকল দেশের পণ্ডিতেরা একরূপ একবাক্যে এই পদ্ধতি, ইতিহাস আলোচনার সুষ্ঠু পদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এইবার দার্শনিক ইতিহাস সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চাই। কার্য্যকারণপরম্পরার সূত্র ও ঘটনা একত্র সমাবেশ করিয়াই ইতিহাস নিশ্চেষ্ট থাকে না। জগতের যে কার্য্যকরী শক্তি সমুদয় সৃষ্টি করিতেছে, তাহার সহিত ইতিহাসের সম্বন্ধ কি এবং প্রত্যেক ঘটনার ও তাহার কার্য্যকরী শক্তি ইতিহাসের ধারা কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, সে সমস্যা পূরণে সহায়তা করিবার জন্য ইতিহাস চেষ্টা করিয়া থাকে। দার্শনিক পরাবিদ্যায় "মানবাত্মার স্বরূপ" "জগতের আদিকারণ যিনি এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার প্রকৃতি" ও "আত্মার স্বাভাবিক জীবন ও নৈতিক জীবনের পার্থক্য" প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় ইতিহাস কতটুকু সহায়তা করিতে পারে বা করিয়াছে, তাহা দেখিতে হইবে। এই সমস্যাগুলির সমাধান সম্বন্ধে জীবনের উদ্দেশ্য কি, ইতিহাস তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করে; যুগশক্তি কিরূপে মানবহৃদয়ে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারও একটা বিচার করিয়া থাকে। এই বিষয়গুলি প্রকৃত ইতিহাসের বিষয়ীভূত নয় সত্য, কিন্তু ইতিহাস আলোচনা করিতে আমরা কেবল ঘটনা বা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। আমাদের পূর্ব্বোক্ত দার্শনিক তত্ত্বগুলির মীমাংসা করিবার ইচ্ছা মনে স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। এই প্রশ্ন-সমাধান-চেষ্টাই ইতিহাসের দার্শনিক ধারা নামে কথিত হইয়া থাকে। পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে, এখনও আমাদের দেশে এ শ্রেণীর ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা হয় নাই, তবে আশা করিতে পারা যায়, শীঘ্রই কোন শক্তিশালী ঐতিহাসিক এ বিষয়ে মনোযোগ দিবেন। এই বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে রাজনীতি, আইন, সৌন্দর্য্যানুভূতি-নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নগুলির সমীচীন সিদ্ধান্ত দ্বারা ঐতিহাসিক প্রশ্নের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এইখানে দর্শনাভিমুখী ইতিহাস, ইতিহাসের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, ঐতিহাসিক বিষয়ের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করে। ইহা নূতন একটা কিছুই নয়। চরিত্র-নীতির নিয়মবলে এ কার্য্য সহজেই সম্পাদিত হইতে পারে। পাশ্চাত্য পুর্ণয়ুরিগণ এই পথ অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক ঘটনার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন; রাইমাবের ও হেগেল প্রভৃতি জার্ম্মান মনীষীরা এই পথই অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রণালী অনুসৃত হইলে ইতিহাসের মূল্য আদর্শানুযায়ী নির্দ্ধারিত হইবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও একটু গোলমাল উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই আদর্শের স্বরূপ কিরূপ হইবে—ভাবগত বা রূপরসগত বাস্তব আদর্শ? বাস্তব আদর্শকে ত একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না।

আবার কেবল চরিত্রের দিক্ হইতে মূল্য-নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিলে সফল হইবার সম্ভাবনা কমই দেখা যায়; কারণ, চরিত্রের মাপকাঠি কোথা হইতে পাওয়া যায়?—ঐতিহাসিক ঘটনার আলোচনা করিয়াই ত চরিত্রের মাপকাঠি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। তাহা হইলেই সেই তর্কশাস্ত্রের চক্রাবর্ত্তে (Reasoning in a circle—petitio principil) পড়িতে হইল। তাই বলিয়া যে এ বিষয়ের আলোচনায় কোন ফললাভ হইবে না, তাহা বলা যায় না। ঐতিহাসিক ঘটনার জনয়িত্রী শক্তির যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলেও ভগবদ্দত্ত সামর্থ্যবলে যে কতকটা পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এখানে চরিত্রের বিকাশ সম্বন্ধেও একটা কথা উঠিবে। এই জীবনেই কি আমরা আত্মানুভূতি করিতে পারি? যদি আমাদের চরিত্রের বিকাশ আদর্শানুযায়ী এই জন্মেই না হয়, তা হইলে কি হইবে?—পরজন্মে আমরা সেই সূত্র ধরিয়া আত্মদর্শন করিতে কি পারিব না? এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও আমাদের দেশের দার্শনিক মত আলোচনা করিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাই না, তবে একটা কথা এখানে বলিতে চাই, ইতিহাস মানবের উন্নতি ও অবনতি লইয়া ব্যস্ত। দার্শনিক ইতিহাসে জাতির শুধু উন্নতির দিক্‌ই আলোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু আর একটা কথাও এখানে বিচার করিতে হইবে। আত্মদর্শন করিতে হইলে আদর্শ ভাবের পশ্চাতে ছুটিতে হয় সত্য, কিন্তু এই ভাবকে আপনার করিবার চেষ্টাও চাই। এই ভাবকে আয়ত্ত করিতে হইবে। এই আদর্শকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা ও উন্নতি-প্রবণতাবলে জগৎ যাহার অভিমুখে ছুটিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য ব্যগ্র—পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সেই সার্ব্বজনীন আদর্শের অনুসরণ—এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে সত্য; আর এই দু'য়ের সমন্বয় করাও বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়;—তথাপি বলিতে হইবে, প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনা, সার্ব্বজনীন ভাবের দিকে কতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, তাহা দেখিয়াই তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সীমাবদ্ধ ও অসীমের ভাবটা একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে—সীমাবদ্ধের সংহতি অসীম নহে; অসীম সীমাবদ্ধের ভিতর রহিয়াছে, কিন্তু ব্যষ্টি বা সমগ্রভাবে নাই, অংশতঃ আছে; আর অসীম সর্ব্বদাই সীমাবদ্ধ জিনিষে উৎপাদন করিয়া আপনার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় দিতেছে। ইতিহাস সীমাবদ্ধ ঘটনার বিবৃত করিয়া অসীমের দিক্ হইতেও তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিবে। দার্শনিক ইতিহাস ও ইতিহাসে আর একটু পার্থক্য এই, দার্শনিক ঐতিহাসিকেরা সাধারণ ঐতিহাসিকের ন্যায় স্থান, কাল, পাত্রের অতীত অসীমের সন্ধানেই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রের দিকে অবহিত হওয়া দার্শনিক ঐতিহাসিকেরও কর্ত্তব্য। সুখের বিষয়, এ শ্রেণীর ঐতিহাসিকদিগের অগ্রণী জোসেফ ফেরারি (Joseph Ferrari) এ দিকে অমনোযোগী হইয়াছেন।

আজকাল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের সঙ্গে দু'একজন পণ্ডিত আখ্যানকল্প বা romantic ইতিহাসেরও ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মেকলে ও ফ্রুড্ এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক। তবে ইঁহাদের লেখা ঐতিহাসিক আখ্যান নয়। আখ্যান-কল্প ইতিহাস ও ঐতিহাসিক আখ্যান এক জিনিস নয়। ঐতিহাসিক আখ্যানে ঐতিহাসিক উপাদান চিত্রের backgroundরূপে ব্যবহৃত হয়। মূল চিত্রটি কিন্তু একেবারে অমূলক কাল্পনিক থাকিয়া যায়। কিন্তু আখ্যানকল্প ইতিহাসে ঐতিহাসিক প্রকৃত ঘটনার অনুসন্ধান-রীতি ও প্রকৃত সূত্রের অবতারণপদ্ধতিতে গল্পকথকের ভঙ্গীবিলাসের চরম নৈপুণ্য অবলম্বন করিয়া, আখ্যানবস্তুটী অনন্ত জীবন্ত করিয়া থাকেন। এইরূপ ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য—ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ, জীবন্ত ব্যাপার করিয়া তোলা,

এবং অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে বর্ণনার সেতু নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবধানের দূরত্ব মন হইতে অপসারিত করিয়া দেওয়া। অতীতের ঘনান্ধকারের মধ্যে কীণালোকে ভীতি চকিত—আকৃষ্ট পাঠকের সানন্দ, আগ্রহকে সজাগ করিয়া তুলিবার জন্য এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক বিবৃতি-বর্ত্তিকার মাধুরীতে তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। এইটুকুই তাঁহার প্রধান গুণপণা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক বলেন, "History is not a shilling shocker"; ইতিহাসে প্রকৃত ঘটনার সত্যানন্ধ বিবৃতি থাকা চাই—ঘটনা যেমনটী পাইবে, ঠিক তেমন করিয়াই তাহা চক্ষুর সম্মুখে ধরিবে—তুমি যে সত্যানুসন্ধিৎসু, এ কথা ভুলিয়া, শুধু পাঠকের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইয়া, অনুমানের সাহায্যে নাটকীয় পদ্ধতির সার্থকতা সম্পাদন করিতে চলিবে না। দার্শনিক ঐতিহাসিক কিন্তু অনুমানের একেবারে পক্ষপাতী নন। তিনি বলেন, অনুমানের দরকার—ঘটনাকে নাটকীয় পদ্ধতিতে বর্ণনা করিবার জন্য নয়, সেই সমুদয় হইতে আমাদের উপকারে আসিতে পারে, এইরূপ ভাব নির্ণয় করিবার জন্য। আখ্যানকল্প ইতিহাসে ঘটনা নাটকীয় আকার ধারণ করে, বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে সেই ঘটনা শ্রেণীবিভক্ত হয় এবং দার্শনিক ইতিহাসে তৎসমুদয় হইতে সাধারণ সিদ্ধান্ত করা হয়।

বাঙ্গালার ইতিহাস-প্রণয়ন-কার্য্য এই তিন প্রণালী দ্বারাই সম্ভবপর হইবে। আপাততঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া আমাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। তারপর যখন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে পারিব, তখন ইতিহাসের দার্শনিক দিক আলোচিত হইবার আশা করিতে পারি। সর্ব্বাঙ্গীন ইতিহাস এখনও হয় নাই। জ্ঞানের বর্ত্তিকা ধারণ করিয়া, তমসাবৃত যুগে আলোক-সম্পাত করিবার জন্য যাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন—তাঁহাদের সাধনার ফলে বাঙ্গালার ইতিহাস-চর্চ্চা প্রসারলাভ করিয়াছে, সেই সকল অক্লান্তকর্ম্মীদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামপালের ভূমিকায় ও ধর্ম্মঠাকুরের ব্যাখ্যানে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গৌড়-লেখমালায় ও পালরাজগণের আলোচনায়, শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চন্দ গৌড়রাজমালায় ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "Plae of Bengal" ও বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক কথাই আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি বলিতে হইবে—প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক কথাই আজিও সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। আমার বোধ হয়, এ কার্য্য সময় সাপেক্ষ। বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জেলার প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলিত না হইলে বাঙ্গালার ইতিহাস আশা করা যাইতে পারে না।

কয়েকখানি প্রাদেশিক ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে বাঙ্গালার সকল জেলার ইতিহাস লিখিত হউক ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। এখানে একটা কথা বলিতে চাই। কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে হইলে যে সকল জাতি সেই দেশে বাস করিয়া থাকে, তাহাদের বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাহাদের চরিত্রগত বিশেষত্ব কোথায়, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে—তাহাদের সভ্যতার ধারা কোন্ খাতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে, আর বুঝিতে হইবে, কোন অবস্থাবশে সমাজ-বদ্ধ হইয়া তাহারা উন্নতি বা অবনতির পথে চলিয়াছে। গ্রীসের ইতিহাসে তাহাদের শিল্পানুরাগের চিত্র না থাকিলে তাহা গ্রীসের ইতিহাস বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না, রোমের ইতিহাস বুঝিতে হইলে তাহাদের প্রচারিত আইন কানুন না বুঝিলে রোমের ইতিহাসের কথা অজ্ঞাতই থাকিবে। বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে হইলে বাঙ্গালীর প্রাণ, ধর্ম্ম ও সমাজকে না বুঝিলে, বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, বাঙ্গালী ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল ও আছে—আর

বাঙ্গালী সমাজের সুশীতল ছায়ায় একান্তবর্ত্তী পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিতে যতটা ভালবাসে, ততটা অন্য কোন জাতি বাসে না।

অনুসন্ধানের উপর যখন ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, তখন বাঙ্গালার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে একজনের চেষ্টায় যে হইবে, তাহা বলিয়া আমাদের মনে হয় না; সমবেত চেষ্টা চাই। আপনাদের ন্যায় সুধী সজ্জনকে নূতন করিয়া বলিতে হইবে না যে, সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা। জেলায় জেলায় বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির ন্যায় সমিতির সৃষ্টি হউক। সমবেত চেষ্টায় ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে সত্যসন্ধ সাহিত্যিকবৃন্দ বদ্ধপরিকর হউন। সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিতে হইলে হিংসা-দ্বেষ দূর করিতে হইবে, যশের মুকুট আপনার মাথায় ধারণ করিবার লোভ সংবরণ করিতে হইবে, আপনার কৃতিত্ব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলে চলিবে না। শুধু সত্যের দিকে চাহিয়া, আত্মাভিমান ভুলিয়া, কর্ত্তব্যের প্রেরণায় কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

মনের ভিতর কোন সংস্কার লইয়া কার্য্য করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। অনুসন্ধিৎসুর মন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় থাকা উচিত। যে চিত্র তাঁহার সম্মুখে পতিত হইবে, তাহারই নিখুঁৎ ছবি যেন উহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। দর্পণের উপমা ছাড়িয়া ফটোগ্রাফের উপমা দেওয়াই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। কারণ দর্পণের চিত্র বিপরীতমুখী হয়—তাহার পর বিচার-বুদ্ধির দ্বারা আমরা তাহাকে ঠিক করিয়া লই। ফটোগ্রাফ যন্ত্রে চিত্রের অবিকল প্রতিলিপিই পাওয়া যায়। সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা থাকা উচিত; কিন্তু তাই বলিয়া কোন কর্ম্মীর ভুল-ভ্রান্তি দেখিলেই তাহার উপর খড়্গাহস্ত হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। ত্রুটি-বিচ্যুতি মানুষেরই হইয়া থাকে। দশ জনের আলোচনার ফলে মিথ্যা-মেঘ কাটিয়া গিয়া, ইতিহাসের আকাশে সত্য সূর্য্য প্রকাশিত হইবে। বিরুদ্ধ মতগুলিকে যুক্তির নিকষে যাচাই করিয়া লইতে হইবে। ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীকে ঘৃণার চক্ষে দেখা কখনই কর্ত্তব্য নয়। কারণ, এ কথাটা মনে রাখা উচিত, মানুষ আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। মনে রাখা উচিত, সুযোগ ও সুবিধার অভাবে পরীক্ষিত ঘটনাগুলি সম্যক্ পরিদর্শন না করিয়াই বা বিচার-বুদ্ধির প্রকৃত চালনা না করিয়াই তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অসদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এ কথা মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়। আর আজ যিনি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, অপরের অনুসন্ধানফলে প্রকাশিত ঘটনাগুলি তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলে তিনি যে মত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, এরূপ দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল নয়।

সন্ধ্যা-রাণী

(শ্রীকালিদাস রায় বি, এ, কবিশেখর)

সন্ধ্যাতারার টিপ্‌টি ভালে
লিয়ে চাঁদের বরণ থালি,
সন্ধ্যামণির মালা গলে,
বন-আলোর ঘেউটি আলি।

সন্ধ্যাদীপের চুমকি খচা
সেমন সেলব রেশম রচা,
আলোছায়ার ঢেলাঞ্চলে
ঘেরাটোপা অঙ্গ খানি।

এস আমার সন্ধ্যারাণী !
সন্ধ্যারাগে ঠোঁট রাঙিয়ে
কিঙ্কিণী-নূপুর বাজিয়ে পায় ;
ঘনজ্যোতিকার হিরণ ভূষায়
কলমলিয়ে সাজিয়ে গায় ;
মৃদুল মধুর নিঃশ্বসনে
আগায়ে মূলবাগান বনে,
বনবিহগে করে' তোমার
আবাহনে ঐকতানী
এস আমার সন্ধ্যারাণী !

দিগন্তের ঐ আপগা বেঁয়ায়
এলিয়ে দিয়ে চিকুররাশি,
শিশির-লোলক দুলিয়ে নাকে
বয়ানে বন-জ্যোৎস্না হাসি ;
সন্ধ্যারতির শঙ্খস্বনে
এস দেউল মঠাঙ্গনে'
ক্লান্ত ভালে শ্রান্ত আখে
বুলাও তোমার কুসুম পাণি,
এস আমার সন্ধ্যারাণী !

স্নেহের-ক্ষুধা

(গল্প)

(শ্রীঅজয়কুমার সেন)

(ক)

সে দিন রবিবার। হাতের কাজকর্ম সবগুটুকাইয়া দিয়া বসিয়া আছি, এমন সময় বাঁশীতে করুণ হুৎকার দিয়া এক সাপুড়ে আসিয়া আমার ঘরের জানালার দিকে চাহিল। বাঁশীর আর্ত্তধ্বনিতে আমি বিচলিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম,

"তুমি কি চাও ?"

সে মাথা নত করিয়া অভিবাদন করিল, বলিল, "বাবুজী সাপ্ খেলান হোগা ?"

আমি অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "না।"

আমার উত্তর শুনিয়া যখন সে যাইবার উপক্রম করিবে, সেই সময় আমার পাঁচ বছরের কন্যা মীনা বোধ হয় বাঁশীর স্বর শুনিয়া ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে ডাকিল, "ওগো এসো না—আমি সাপ্ খেলানো দেখ্‌বো।"

মীনার আধ-আধ কথায় সে ফিরিয়া আসিয়া, আমার দরজায় দাঁড়াইয়া বাঁশীতে আর একবার হুৎকার দিল। মীনা ছুটিয়া গিয়া তাহার অতি জীর্ণ আলখেল্লা ধরিয়া বলিল, "আমাদের বাড়ীতে এস না—আমি, মা সাপ্ খেলানো দেখ্‌বো। বাবা কিছু তোমায় বলবে না—তুমি এস।" এই বলিয়া মীনা তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিল—আমার উঠানে।

আমি মীনার এই ব্যবহার দেখিয়া হাসিব কি ধমকাইব, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, গৃহিণীকে ডাকিবার জন্য বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলাম।

একটু পরেই আমি বাহিরে আসিয়া দেখি, মীনা সেই সাপুড়ের কোলের উপর বসিয়া মহা-আত্মীয়ের মতন তাহার সহিত জিজ্ঞাসা-পড়া করিতেছে। তার ছেলে আছে কি না, এখন তারা বাসায় কি করিতেছে ইত্যাদি কথায় তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আমাকে দেখিতে

পাইয়া মীনা জড়সড় হইয়া তাহাকে আরও জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল।

গৃহিণী বাহিরের দিকে আসিয়া মীনাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, "একি গো, মেয়ের আক্কেল দেখেছ—ওর কোলে বসে কেন? তুমিই বা কি রকমের মানুষ একটুও কি ঘটে বুদ্ধি নেই!"

আমি মীনাকে বলিলাম, "মীনা, চলে এস, আমার কোলে বসে সাপ খেলানো দেখ।"

যখন তাহার উঠিবার কোন লক্ষণ দেখিলাম না, তখন আমি তাহাকে জোর করিয়াই সাপুড়ের কোল হইতে উঠাইয়া লইয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া যাইতে আমার স্ত্রীকে বলিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভিতরে চলিয়া গেলাম। একটু পরে বাহিরে আসিয়া দেখি সাপুড়ে জড়ের মতন বসিয়া আছে—চোখে-মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। তাহাকে বলিলাম, "তুমি এখন যাও—আর একদিন এস।"

সে মুখ ভার করিয়া বলিল, "বাবুজী, লেড়কীকে নিয়ে গেলেন কেন? আমি কি তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতুম—বাবুজী?"

এই বলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার অতি-জীর্ণ আলখেল্লার পকেট হইতে একটা লাল রঙের পুতুল বাহির করিয়া আমাকে দিয়া বলিল, "এই আপনার লেড়কীকে দেবেন—বাবুজী।" বলিয়া সে পুতুলটা মাটিতে রাখিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরবে প্রস্থান করিল।

আমি ভালমন্দ কিছুই বলিলাম না, পুতুলটা যেখানে ছিল, সেখানেই পড়িয়া রহিল।

(খ)

সমস্তদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া মীনা সন্ধ্যার সময় কিছু না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলে, তাহার মাতা আসিয়া আমাকে বলিলেন, "জোর করে কেন ওকে সাপুড়ের কোল থেকে তুলে আনলে না? না হয় একটু বসেই ছিল; তা বলে কি ও মেয়ে নিয়ে পালাতো? সমস্তদিন কেঁদে কেঁদে মাটা গরম হয়েছে, আর কিছু না হয়!" বলিয়া তিনি তাঁহার কাজে চলিয়া গেলেন।

আমি সকালের ঘটনা ভাবিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু মীনার কাতরতাপূর্ণ মুখখানি বারংবার মনে উদয় হওয়াতে, আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। যখন মনে কিছুতেই শান্তি পাইলাম না, তখন বাজারে গিয়া দামি-দামি খেলানা আনিয়া দিলাম; কিন্তু তাহার একটাও মীনা স্পর্শ করিল না। বরং বলিতে লাগিল, "আমি সাপ খেলা দেখব।"

রাত্রি যত অধিক হইতে লাগিল, মীনার জ্বর ততই বাড়িতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে সে চম্‌কাইয়াও উঠিতে লাগিল। মীনার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি চিন্তিত হইলাম। স্বামী-স্ত্রীতে সমস্তরাত্রি তাহার পাশে বসিয়া রহিলাম। মীনা মাঝে মাঝে ক্ষীণ স্বরে বলিতে লাগিল, "আমি তার কাছে যাব, বাবা আমি একবার যাব।"

রাত্রি প্রভাত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই দেখিয়া, আমি ডাক্তার আনিবার জন্য যেমন বাহির হইব; দেখি সেই সাপুড়ে। আমি যেন তাহাকে দেখিতে পাই নাই—এইভাবে চলিয়া যাইব ভাবিতেছি; হঠাৎ সে আমার সামনে আসিয়া বিনীত স্বরে কহিল, "বাবুজী, সে লেড়কী কোথায়—একবার তাকে আনুন না?" বলিয়া আমার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

এত ভোরে তাহাকে দেখিয়া আমার আপাদ-মস্তক রাগে জ্বলিয়া উঠিল, এবং মনে মনে বলিতে লাগিলাম; ব্যাটা, তোর জন্যে ত আমার মীনার এই দশা! কেন এসেছিস্ তার খোঁজ করতে?

তখন যদি বুঝিতাম এই রকম হ'বে—তা'হলে কি তাকে এত অবহেলা করি?

তাহার কথায় কোন জবাব না দিয়া যেমন দুই-একপা গিয়াছি, সে সামনে আসিয়া পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বাবুজী, লেড়কী।"

বলিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার দিকে না চাহিয়া আমি চলিয়া গেলাম। সে চীৎকার করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া চলিয়া গেল—মাতালের মত টলিতে টলিতে।

ডাক্তারের বাড়ী হইতে আসিয়া দেখি, সে আমার জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ঐরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, আমি বলিলাম, "তুমি এখনি এখান থেকে চলে যাও, না হলে পুলিসে দেবো।" সে তাহাতে কিছু-মাত্র বিচলিত না হইয়া ছিন্নলতার মত ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। কত বড় কঠোর কথা না জানি তাকে বলেছিলাম!

ডাক্তার আসিয়া মীনাকে দেখিয়া বলিলেন, "এখন কিছুই হয়নি—তবে মনে বড় একটা আঘাত লেগেছে, তাহার ফলে এই অসুখ। আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন—কি জানি কখন কি হয়?" এই বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

ডাক্তারের কথা শুনিয়া আমি বিচলিত হইয়া উঠিলাম। মীনার অসুখের সম্বন্ধে স্ত্রীকে কিছু না বলিয়া বরং বলিলাম, "আবার সেই সাপুড়েটা এসে মীনার খোঁজ করছিল; আমি কিন্তু তাকে কোন কথা বলি নাই।" এই কথা শুনিয়া আমার স্ত্রী ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "যাও—যাও—শীঘ্র যাও, তাকে একবার ডেকে আন?"

আমি বিহ্বলের মতন বাহিরে আসিয়া তাহার খোঁজ করিলাম—কিন্তু সে বিফল-মনোরথ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে না পাইয়া হতাশভাবে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, "সে চলে গিয়েছে, এখন তাকে কোথায় পাই?"

তাহার কোন সন্ধান না পাইয়া বারংবার মনে আসিতে লাগিল কে সেই মীনার কতকালের পরিচিত বন্ধু!

(গ)

অকালে মীনাকে হারাইয়া আমরা স্বামী-স্ত্রীতে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় ছিলাম, এমন সময় এক কেশভার লইয়া একদিন দেখা দিল—সেই সাপুড়ে।

প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারি নাই;—যখন সে বলিল, "বাবুজী, খুকী এখন কেমন আছে?" এই কথাতে আমার চৈতন্যোদয় হইল। তখনি তাহাকে বসিতে বলিয়া, আমি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলাম, স্ত্রীকে সংবাদ দিতে।

বাহিরে আসিয়া দেখি, সেই সাপুড়ে মাথা নত করিয়া বসিয়া আছে। আমাকে একেলা আসিতে দেখিয়া সে বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "বাবুজী, খুকীকে আনলেন না?" এই বলিয়া সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল

তাহার বিষাদক্লিষ্ট দৃষ্টিতে আমি তাহার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিয়া লইলাম—এক নিমিষে! কতবড় বেদনা জমাট বাঁধিয়া না জানি তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে লুক্কায়িত আছে!

আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি আমার মেয়েকে দেখ্‌বার জন্য বারবার কেন এখানে এস, বল ত?"

সে করুণ-স্বরে বলতে লাগলো, "বাবুজী, আজ প্রায় এক বছর হোল, আপনার খুকীর মতন আমারও এক খুকী হয়েছিল। সে যে কি সুন্দরই হয়েছিল—তা আর কি বলবো বাবুজী; এক বছর পর্য্যন্ত তার কাছ-ছাড়া হতে পারি নাই, এমনি মায়ার ডোরে সে আমাকে বেঁধেছিল। কে জান্‌ত বাবুজী, যে সে এমনি করে চলে যাবে।" এই কথা বলিয়া সে মুসড়াইয়া পড়িল।

কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিবার পর, সে বলিল, "বাবুজী, আমি তার কাছে না থাকাতে, না জানি সে কত কষ্ট পেয়ে চলে গেছে। আমি কাছে থাকলে কি সে এমন করে যেতে পার ত? আমরা দু'জন তাকে বেঁধে রাখ্‌তাম্ না?" এই বলিয়া সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বালকের মতন কাঁদিয়া উঠিল।

আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম, "তুমি

থাকলে ও যা কি করতে পারতে—যে যাবার সে ত যেতই।"

সে আমার কথায় বাধা দিয়া কহিল, "না বুবাজী, আমি থাকলে সে যেতেই চাইতো না—এ আমি খুব জানি—খুব জানি?" বলিয়া উদাস দৃষ্টিতে আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর, আমি কাতর-কণ্ঠে কহিলাম, "আমার মীনাও যে তোমার খুকীর কাছে গিয়েছে?" বলিয়া কাপড়ের প্রান্ত দিয়া চক্ষু মুছিলাম।

এই কথা শুনিয়া সাপুড়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "কি আপনার খুকীও গিয়েছে—আপনি বুঝি সে সময় তার কাছে ছিলেন না—ও বুঝেছি!" বলিয়া সে স্বপ্নের মতন ঘরের বাহির হইয়া গেল।

• • •

বাড়ীর চাকর-বাকরের মুখে এখনও শুনি, কে যেন নিশিথরাত্রে আসিয়া আমার জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং আপন মনে কি বলিয়া চলিয়া যায়।

বংশের কলঙ্ক

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু]

যতক্ষণ সরোজের মূর্ত্তি দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, ততক্ষণ রামদয়ালবাবু একটী কথাও উচ্চারণ করিলেন না। তাহার পর ধীরে-ধীরে বলিলেন, "দেখ, অনেকদিন হ'তে যে কথাটা বল্‌বার জন্যে স্থির করেছি, আজ সেটা বলব। ভাই, তোমার আমার কোনও কথায় লুকোচুরি চলে না। তাই ভাবছি, এতে যতই কেন অসুবিধে হ'ক না, কথাটা খোলসা করে বলে ফেলি।"

এই গম্ভীর ভণিতা শুনিয়াই কালীশঙ্করের অন্তরটা কি জানি কেন দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কি কথা? এমন কি কথা যাহাতে বহুকালের বন্ধুত্ব সত্ত্বেও তাঁদের কোনও অসুবিধা বা অস্বাচ্ছন্দ্য হতে পারে? তিনি শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "কি এমন কথা, যার জন্যে সবাইকে সরিয়ে দিলে?"

"কথাটা বিশেষ যে গুরুতর, তা নয়। কথাটা আমাদের দু'জনের সংসার নিয়ে।"

"সংসার নিয়ে? সে কি?"

"সব বলছি। এই মাত্র অনিলার আধা-বয়ের কথা বলছিলে না? ওতেই কথাটা আরও মনে পড়ে গেল?"

"অনিলার বর? সে ত' ঠিক হয়েই আছে, কেমন না?" কথাটা বলিবার সময় কিন্তু কি জানি কেন কালীশঙ্করের বুকটা একটু কাঁপিয়া উঠিল।

"আছে না, ছিল বল, কেন না বহুকাল আগে কথার পিঠে কথায় কে কি বলেছি, তাই নিয়ে ঘরে বসে থাকলে ত' চলে না।"

"তুমি কি বলছ, আমি বুঝতে পারছি না। তুমি কি অরুণের সঙ্গে অনিলার বিবাহের কথা উল্লেখ করে এই সব বলছ"?

"হাঁ, তাই বটে। দেখ, ছেলেবেলায় দু'জনের বিয়ের কথা হয়েছিল বটে, কিন্তু ছেলে মেয়ে কার কি রকম দাঁড়াবে, তা ত' জানা ছিল না।"

"না, তা ছিল না। কিন্তু তা ব'লে কথার খেলাপ হবে কেন?"

রামসদয়বাবু একটু উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "বিবাহ ত' ছেলে খেলা নয়, চিরজীবনের সম্বন্ধ। এতে তুমিও যেমন তোমার ছেলের ভবিষ্যত দেখবে, তেমনই আমিও আমার মেয়ের দেখবো।"

কালীশঙ্করবাবুর মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "তুমি কি করবে জানি নি, কিন্তু আমি যখন একবার কথা দিইছি, তখন পূবের সূর্য্য পশ্চিমে উঠলেও আমার কথার নড়চড় হবে না, তা এতে আমার ছেলের ভাগ্যে যাই থাক।"

"যদি, যদি আমার মেয়ে কুৎসিত বা কালো হ'ত, অথবা যদি কাণা খোঁড়া হ'ত—"

"তা হলেও অরুণের সঙ্গে তার বিয়ে হ'ত।"

"তোমার তাই মত হতে পারে, আমার নয়। কথার পিঠে কথা হয়েছে, বাঁধাবাঁধি বা পাকাপাকি কোনও কথা হয় নি, এতে তুমি রাগ করছ কেন? তোমার ছেলে, মেয়ে নয়। খুঁজলে কত শত সুন্দরী মেয়ে পাবে।"

"আমি অনিলার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে চাই নে। সে আমার ঘর আলো করবে বলে আমি বহুদিন থেকে বুকে আশা বেঁধে আছি। ভাই, এ আশায় আমায় নিরাশ কোরো না।" কালীশঙ্করের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। রামসদয় নীরব, গম্ভীর।

কালীশঙ্কর আবার বলিলেন, "আচ্ছা, অরুণের সঙ্গে বিবাহে আপত্তি কি? তুমি কি ওর চেয়ে ভাল পাত্র মনোনীত করেছ?"

"হাঁ করেছি, পাত্র তোমার সামনেই ছিল, এই কতক্ষণ চলে গেল। তুমি কি স্বীকার কর না যে সরোজ অরুণের চেয়ে সর্ব্বগুণে উপযুক্ত পাত্র?"

কালীশঙ্কর কণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। স্বতঃই তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটী দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইল। কণপরে হৃদয় সংযত করিয়া বলিলেন, "যা ভয় করেছিলুম, তাই হতে চল্‌লো, ভবিতব্য কে খণ্ডাবে? ভাই, সরোজ বা অরুণের গুণের তারতম্য নিয়ে তর্ক করবার আমার ইচ্ছে নেই, প্রবৃত্তিও নেই, তবে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি সরোজ নিজে সর্ব্বগুণে গুণবান হয়েও অরুণের গুণে মুগ্ধ।"

"সেটা সরোজের নিজেরই মহৎ হৃদয়ের পরিচয়।"

"পাঁচ শ' বার। কিন্তু সরোজ একলা কেন, ছেলেদের মধ্যে কে তার গুণে মুগ্ধ নয়? আমি তার বাপ বলে বলছি না। তার যত দোষই থাক, তার মত উদার, উচ্চ, সরল মন আজকাল ছেলেদের মধ্যে দেখতে পাই নে।"

"বাপ বলেই তুমি অন্ধ, তার দোষ দেখতে পাও না, কিন্তু তা বলে তার যে যথেষ্ট দোষ নেই, এমন কথা বলতে পারি না। আর সব ছেলেই যে তা গুণ গায়, তাও নয়। বিশেষতঃ আজকাল তার চরিত্র সম্বন্ধে যে সব কথা শুনতে পাচ্ছি, তাতে তার হাতে মেয়ে দেওয়া অসম্ভব; অন্ততঃ আমি ত' পারি নে দিতে।"

কালীশঙ্করের মুখে চোখে দারুণ ক্রোধের চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিল, শিরাও স্ফীত হইয়া উঠিল। তথাপি তিনি যথাসম্ভব ক্রোধের ভাব দমন করিয়া বলিলেন, "চরিত্র, অরুণের চরিত্র? কে তার চরিত্রে দোষ দেয়? নির্ম্মল গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র যার চরিত্র, নিষ্পাপ বালকের মত যার আচরণ, ব্যবহার, তার চরিত্রে কলঙ্ক? ভাই, বিয়ে দাও আর নাই দাও, তাতে তত্টা এসে যায় না, কিন্তু তা বলে তার নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে আমার মনে ব্যথা দিও না, আমাদের একদিনের বন্ধুত্ব নয়—"

রামসদয়বাবুও একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "চটছ কেন ভাই, এতে চটবার কথা কিছুই নেই—"

কালীশঙ্করবাবু তাঁহার কথা শেষ হইতে না দিয়াই হঠাৎ অত্যন্ত ভীতস্বরে বলিলেন, "সহু, তোমাতে আমাতে একদিনের বন্ধুত্ব নয়। তাই সেই বন্ধুত্বের খাতিরে তোমার অনিলাকে ভিক্ষা দাও আমি তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাচ্ছি!"

রামসদয়বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি কখনও বন্ধুকে এমনভাবে বিচলিত হইতে দেখেন নাই। একটু বিস্ময়ান্বিতভাবে বলিলেন, "তোমার ভাব দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছি কালী! আমার মেয়ে ত' জগতে একটী মেয়ে নয়। তোমার রূপবান ধনবান একটী ছেলে, অতুল ঐশ্বর্য্যের ভাবী অধিকারী, তার বিয়ের জন্য ভাবনা? কত শত মেয়ের বাপ তোমার ছেলের হাতে মেয়ে দেবার জন্য লালায়িত হয়ে বেড়াচ্ছে, তুমি অনিলার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করছ কেন, বুঝতে পারছিনে।"

"বুঝবে না, সহু, তুমি বুঝবে না। আজ কয় বছর এই সোনার পুতলী আমার কতখানি হৃদয় জুড়ে বসে আছে, তা তুমি বুঝবে না, আমি যে তাকে অরুণের চেয়েও বেশী ভালবাসি। আমার ঘরের লক্ষ্মী সে, তাকে কেড়ে নিয়ে তুমি আমার জীবনের সাধ হতে বঞ্চিত করতে চাও? তুমি না আমার বাল্যবন্ধু?" কালীশঙ্কর দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কালীশঙ্করের চোখমুখ দারুণ উত্তেজনাবশে রাঙ্গিয়া হইয়া আসিতেছে, হাত পা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, চোখ দিয়া একটা অভূতপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। রামসদয়বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কালী, স্থির হ'য়ে বস, এসব কথা এ রকম মেজাজে হতে পারে না। তুমি আসবার আগেই অনিলার বিয়ের কথা ঠিক করে ফেলেছি। সরোজকে সব খুলে বলেছি, বুঝেছি এতে সে কতখানি আনন্দিত হয়েছে। তাকে আশায় উৎফুল্ল করে এখন আর নিরাশ করতে পারি না।"

"তা পার না, কিন্তু বাল্যবন্ধুর নিকট আবাল্যের প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হতে পার!"

"বাল্যবন্ধুর সঙ্গে ত আর বিয়ে নয়। সত্যি কথা বলতে কি, ধর যথার্থই অনিলার উপরে তোমার এতটা স্নেহ হয়ে থাকে, তা হলে সরোজের সঙ্গে বিয়ে হ'লেও সেই স্নেহ হ্রাস হবার কথা নয়। যদি তোমার যথার্থ স্নেহ হয়ে থাকে, তা হলে তার ভাল দেখতেই ত' তোমার ইচ্ছা করবে। তা, সরোজের চেয়ে তার উপযুক্ত পাত্র যখন নেই, তখন সরোজের হাতেই তাকে দিলে তোমার বিশেষ আনন্দ হওয়া উচিত।' আর সরোজের সঙ্গে বিবাহিতা হলে সে ত' এইখানেই থাকবে, তুমিও তাকে আমার মত রাতদিন দেখতে পাবে। কেমন, এতে তোমার কিছু বলবার আছে?"

"আমি তর্ক করতে চাই না, তবে এইমাত্র বলতে চাই, আমি অনিলাকে আমার ঘরের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী না দেখলে কিছুতেই সুখ বা আনন্দ পাব না। তুমি বললে আমার সঙ্গে বিবাহ নয়, এ কথা ঠিক। কিন্তু যার সঙ্গে যার বিয়ে দিচ্ছ, তাদের মনের ভাবটা জেনেছ? সরোজ আনন্দিত হতে পারে, সে কেন, জগতে যে ছেলে এই দুর্লভ রত্ন লাভ করবে সেই আনন্দ লাভ করবে। কিন্তু অনিলার মনের ভাব কি জেনেছ?"

"তার মনের ভাব জানবার দরকার কিছু দেখছি না। আমাদের ঘরে কোর্টসিপও নেই, স্বয়ম্বরও নেই।" এটা রামসদয়বাবু একটু রুদ্ধ স্বরেই বলিলেন।

"তা নেই, কিন্তু এক্ষেত্রে একটু আছে। অনিলাকে তুমি যে ভাবে মানুষ করেছ, তাতে তার মতামত প্রকাশ্যে না জেনেও অন্ততঃ তার মনের ভাবটার গতিবিধি লক্ষ্য করে বিবাহ দেওয়া উচিত। আর তুমিই না প্রাচীন আর্য্য মহিলাদের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করে সর্ব্বদা গর্ব্ব প্রকাশ করে থাক।"

"হাঁ, তা করি; কিন্তু স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতা একই জিনিষ নয়। আমার মত এই যে,

মেয়েকে খুব উঁচুরকম শিক্ষিতা না করে তার উপর স্বাধীন বিচারের ভার দেওয়া উচিত নয়।"

"তা হলে তুমি বলতে চাও অনিলার উচ্চ-শিক্ষা হয় নি?"

"নিশ্চয়ই! উচ্চ শিক্ষা কাকে বলে? হাঁ, মাষ্টার মাষ্টারণী রেখে বা স্কুলে পড়িয়ে লেখাপড়া শেখান হয়েছে বটে, কিন্তু যাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে—যেমন ভাবে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী শিক্ষিতা হয়েছিলেন—তেমনই ভাবে বাপ, মা, গুরু, পুরোহিতের কাছে শিক্ষালাভ হয়েছে কি? অত কথার কাজ কি, মায়ের কোলে যে শিক্ষা, জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, অনিলার সেই শিক্ষাই হয়েছে কি? আমাদের শাস্ত্রে শিক্ষা কাকে বলে জান? ছেলের মত মেয়েকে অতি যত্নে লালনপালন করতে আর সুশিক্ষা দিতে হয়। সে শিক্ষা কি রকম? হেমাদ্রিতে আছে, "কুমারী কন্যাকে বিদ্যা শেখাবে, ধর্মনীতিতে তার মন নিবিষ্ট করাবে।" যে বিদ্যায় ধর্ম আর নীতি জড়ান-মাখান আছে, সেই বিদ্যাই যথার্থ বিদ্যা, তাতেই সংসারের কল্যাণ, শুধু পুঁথি-পড়া বিদ্যাতে হয় না: অনিলা নিজের গুণে ধর্ম-নীতি কতকটা শিক্ষা করেছে বটে, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ নয়। সে শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে বাপ মা আর অন্যান্য গুরুজন।"

"ভাই, অত কথা জানি না। অনিলা শিক্ষিতা হোক বা নাই হোক, আমায় তাকে ভিক্ষা দাও। আমি তার অনেক আচরণের ভাবে বুঝেছি, সে মনে-মনে অরুণকে ভালবাসে, অন্ততঃ অরুণের প্রতি তার মনের একটা টান আছে। আজ যখন অরুণের আসামের জঙ্গলে যাবার কথা উঠেছিলো, যখন তার বিপদের সম্ভাবনার কথা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়েছিলো, তখন তার মুখের ভাব লক্ষ্য করেছিলে?"

"না, আমি ত' তোমার মত পাগল নই—"

এইবার কালীশঙ্কর তাঁহার কথায় বাধা দিয়া অত্যন্ত উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "হাঁ ভাই, আমি পাগল! কিন্তু আমি পাগলই হই আর যাই হই, তোমার ছেলেবেলার বন্ধু। ভাই, বন্ধুকে এই ভিক্ষাটা দেবে না? কালীশঙ্করের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি রামসদয়ের হাত দুটী ধরিয়া আবার অত্যন্ত কাতরস্বরে বলিলেন, "ভাই, ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও, আমি সেই সোণার পুতুলটীকে যে আদরে, যে যত্নে রাখবো, জগতে তা কেউ রাখতে পারবে না। অরুণও যে তার রূপ-গুণে মুগ্ধ, তা তার অনেক কথাবার্ত্তায় আর আচরণে ব্যবহারে জানতে পেরেছি।"

রামসদয় কোন জবাব দিলেন না, গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। কালীশঙ্কর সকাতরে সজলনয়নে বলিলেন, "ভিক্ষে দেবে না ভাই, অনিলাকে ভিক্ষে দেবে না? এমন করে পথের কুকুর ভিক্ষে চাইলেও দেওয়া হয়! আচ্ছা ভাই, একটা অনুরোধ রাখ। একবছর আমায় অনিলাকে কারও হাতে দিও না, কারও সঙ্গে বিয়ের কথা ঠিক কোরো না। এই একটা বছর অরুণকে মানুষ হবার অবসর দাও। দেখ ভাই, আমি তোমার দুটো হাত ধরে অনুরোধ করছি, নিরাশ কোরো না। একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কেবল অনিলার উপযুক্ত করবার জন্যই আমি আমার বাপের দুলালকে জেনে-শুনে বাঘ ভালুকের মুখে পাঠাচ্ছি, না হলে আসামে যাবার আমার অরুণের কি দরকার? বল, বল, ভাই আমার এই অনুরোধটা রাখবে?" কালীশঙ্করের চক্ষে দারুণ কাতরতা ফুটিয়া উঠিল।

রামসদয় বাক্তিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারই ন্যায় পরিণত বয়স্ক লোক যে এমন গভীরভাবে বিচলিত হইতে পারে, তাহা তাঁহার ধারণা ছিল না। কি জবাব দিবেন তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। ক্ষণপরে বলিলেন, "আচ্ছা, আমি ভেবে দেখবো।" বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিন্তাস্রোতে ব্যাঘাত ঘটিল না।

কালীশঙ্করবাবু বহুক্ষণ বহির্বাস লইয়া

চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রামদয়ালবাবু তাহার পরেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত স্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন। তিনি আকাশ-পাতাল ভাবিতেছেন। তাঁহার মনে আর কি ভাবনার উদয় হইতে পারে? বালোর সেই সতীর্থ কালীশঙ্করের কথা কেবলই মনে পড়িতে লাগিল। দুজনের সেই মেলামেশা, সেই খেলা ধূলা, সেই শোওয়া-বসা, একে একে তাঁহার স্মৃতিপটে উদয় হইল। দুই দেহ, কিন্তু এক প্রাণ। তারপর যৌবন, সেই যৌবনেও উভয়ে অভিন্ন-হৃদয়। উভয়ের বিবাহ হইল উভয়ের সহধর্ম্মিণীর মধ্যে কি প্রণয়! উভয়ের সন্তান হইল, তাঁহার দুর্ভাগ্যে তাঁহার সন্তান মুকুলেই ঝরিয়া পড়িল, কিন্তু কালী-শঙ্করের সৌভাগ্যে কি নয়নানন্দ পুত্রই তাহার ঘরের শোভা বর্দ্ধন করিল। সেই পুত্র দিন দিন শশি-কলার ন্যায় তাহারও হৃদয় অধিকার করিয়া বসিতে লাগিল। তারপর তাঁহার ঘরের লক্ষ্মী ননীর পুতলী অনিলার জন্ম। কিন্তু জন্মের পূর্ব্বেই তাঁহার অনিলা ত' বাগ্‌দত্তা হইয়া আছে! যদি ধর্ম্মের মুখ চাহিতে হয় তাহা হইলে অরূপের হাতে অনিলাকে দেওয়া ব্যতীত উপায়ন্তর নাই। কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্য তাঁহাকে অন্য পথে যাইতে বলিতেছে। হিন্দুর শাস্ত্রে বলিতেছে—তাঁহাকে বিলাত-ফেরত বলিয়া সমাজ হিন্দু নাই বলুক তিনি জানেন, তিনি শাস্ত্র মানেন—"বরং কন্যাকে সন্ন্যাস দান করিবে না, তথাপি অপাত্রে কন্যা সমর্পণ করিবে না।" তাঁহার মতে অরূপ অপাত্র। হইতে পারে সে কোটিপতির সন্তান, হইতে পারে সে সুরূপ সুকান্তি সুস্থ-সবল শক্তিমান যুবক, হইতে পারে সে ধনবান হৃদয়বান উদার উন্মুক্তপ্রাণ পুরুষ কিন্তু তাহার দোষগুলিও ত' অমার্জ্জনীয়,—সে বিলাসী, আরামপ্রয়াসী, কর্ম্মে অপরাঙ্মুখ, বিদ্যাশিক্ষায় অনাস্থাবান; বিশেষতঃ আজকাল তাহার বিপক্ষে নানা কথা শুনা যাইতেছে; এমন পাত্র তাঁহার কন্যার—যে সে কন্যা নহে সুশিক্ষিতা অনিলার—যোগ্য বর হইতে পারে না। সেইজন্যই সরোজ কত শ্রেষ্ঠ! সরোজের ন্যায় রূপে-গুণে অনিলার যোগ্য পাত্র তিনি ত' আর খুঁজিয়া পান না। তবে তিনি কি করিবেন? এখন তিনি কোন পথে যাইবেন? একদিকে প্রতিশ্রুতি, অপর দিকে সন্তানের মঙ্গল; একদিকে ধর্ম্ম, অপরদিকে কঠোর কর্ত্তব্য; এ ঘোর সমস্যা কে মীমাংসা করিয়া দিবে?

ঠিক সেই সময়ে অমিয়কুমারের কলহাস্যে পার্শ্বের কক্ষ মুখরিত হইয়া উঠিল এবং ক্ষণপরেই অমিয়কুমার একখানা বাঁধান ছবি লইয়া দ্রুতপদে লাইব্রেরী-কক্ষে প্রবেশ করিল। সে প্রথমে তাহার পিতাকে দেখিতে পায় নাই, তাই কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব হইতেই সহাস্যে একটা কথা বলিতে বলিতে কক্ষে প্রবেশ করিল; কিন্তু ঘরে ঢুকিয়াই পিতাকে দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল।

রামদয়ালবাবু কিন্তু তাহার কথাটা শুনিয়াছিলেন; কথাটা এই:—

"ও দিদি, দুষ্টু দিদি, ফটো লুকিয়ে রাখবে? এই দেখ, কেমন বার করেছি—"

রামদয়ালবাবু অমিয়কুমারকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন,—

"কিসের ফটো, অমি? কে লুকিয়ে ছিলো?"

অমিয়কুমার ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "দেখ না বাবা, দুষ্টু দিদি সেদিন বাগানে বসে লুকিয়ে এই ফটোখানা দেখছিলো, আমি দেখতে চাইলুম দিলে না। কাপ্তেন দাদার ফটো আমি বুঝি জানিনি, হুঁ।"

রামদয়ালবাবু চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার বুকের হাড়ের ভিতর দিয়া কে যেন একখানা বরফের মত ঠাণ্ডা করাত টানিয়া লওয়া গেল। উদ্বিগ্নচিত্তে জিজ্ঞাসিলেন, "কার ফটো? কৈ দেখি?"

ফটোখানা কেবিনেট সাইজের, উহাতে ফুটবলের কাপ্তেনের পোষাকে অরুণকুমারের প্রতিকৃতি

রহিয়াছে তাঁহার মনে পড়িল, কিছুদিন পূর্ব্বে সরোজ ঐ ফটোখানা আনিয়া তাহার পড়িবার ঘরে টাঙাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ দেখানা অন্তর্দ্ধান হওয়াতে সে দুই একদিন উহার জন্য খানসামা চাকরদের বকাবকি করিয়াছিল।

রামসদয় স্তম্ভিত হইলেন। তিনি প্রাণপণ যত্নে অনিলার ভবিষ্যৎ মঙ্গল চেষ্টা করিলে কি হয়, অদৃষ্টচক্র অন্যথাতে চলিতে ত' বিরত হইতেছে না। লোকে বলে ভবিতব্য, অদৃষ্ট ইত্যাদি কিন্তু তিনি ত' ঐ সব মানেন না। অদৃষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু পুরুষকারই আছে ত'! অদৃষ্ট কেন পুরুষকারকে ছাপাইয়া যাইবে? না তিনি পুরুষ মানুষ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবেন যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহার সম্পাদনে প্রাণপাত করিবেন।

অমিয়কুমারের হাতে ছবিখানি দিতেই মহানন্দে লম্ফপ্রদান করিয়া অন্যত্র দিদির সন্ধানে গেল। রামসদয়বাবু আবার গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। অল্পপরে অনিলা আসিয়া ঘরে দেখা দিল। সে পিতাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া পাকা চুলের উপর কোমল কুসুম ৫ সব হপোল স্থাপন করিয়া আদরের সুরে বলিল,

"বাবা, কি ভাবছ?"

রামসদয় যেন নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চারিদিকে ফেল ফেল চাহিয়া বলিলেন, "এঁ্যা, কৈ না, কি ভাবছি?"

"তুমিই জান।"

রামসদয় এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইলেন, গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'ভাবছি? ভাবছি, তোমারই কথা মা।"

অনিলা বিস্মিত হয়ে বলিল, "আমার কথা? আমার আবার কথা কি যে ভাববে? দুষ্ট ছেলে, অত অত ভাবে না, চল খাবার খাবে চল, আর বাইরের ঘর থেকে জেঠামনিদের ডেকে নিয়ে এস।"

"তোমার জেঠামণি ত' অনেকক্ষণ চলে গেছে।"

"এঁ্যা চলে গেছে? ইস্ আমায় না আনিয়ে? কেমন যাক দিকি দেখি?"

"না, সত্যিই চলে গেছে। আমায় বলে গেছে। অনিলা যখন খোঁজ লইয়া জানিল, কথাটা সত্যি তখন তাহার অভিমানহত চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল, সে ভাল করিয়া কাহারও সহিত কথা কহিল না।

কান্ত-কবি রজনীকান্ত

(সমালোচনা)

(শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম. এ. বি. এল)

পরিহাসরসিক, স্বদেশপ্রেমিক, সাধক কবি রজনীকান্তের জীবন-চরিত লিখিয়া শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন ও আমাদিগকে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। ধন্য হইবার কারণ, এইরূপ সৎকার্য্য করিবার সদিচ্ছা ভগবান তাঁহার মনে দিয়াছিলেন, আর সৎঅনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। বাদশ বৎসরের পরিশ্রমের ফলে এই সুন্দর জীবন-চরিতখানি আমরা পাইয়া ধন্য হইয়াছি। বাঙ্গালাভাষায় যে কয়খানি জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়া সৎসাহিত্যের প্রচারকল্পে সহায়তা করিয়াছে ও সম্মুখে আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া আমাদের ন্যায়

ভ্রান্ত পথিককে সৎপথ দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে ইহা তাহাদের অন্যতম।

আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যে আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। ভাষার লালিত্যে, ভাবের গভীরতায় ও লেখার সংযমে ইহা বাঙ্গালা-সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব সম্পৎ হইয়াছে। 'সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে', 'হাসপাতালে মৃত্যু-শয্যায়' ও 'বঙ্গবাসীর মনোমন্দিরে' এই তিনভাগে পুস্তকখানি বিভক্ত। কবি রজনীকান্ত সেনের কাব্যগুলি গানে গ্রথিত। যখন দুরন্ত কণ্ঠক্ষত আসিয়া রাজসাহীর কলকণ্ঠ বিহঙ্গের কাকলীধ্বনি বন্ধ করিয়া দিল—তখন তিনি লিখিবাই মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া ভগবানের যে অযাচিত করুণা লাভ করিলেন তাহাতেই তিনি ধন্য হইলেন। হাস-পাতালের মৃত্যু-শয্যায়, তাঁহার "রোগ-নামচা" প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালা-সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব উপভোগ করিবার জিনিষ। বাঙ্গালার বরেণ্য মহাকবি মধুসূদন ও ইংলণ্ডের কবি সেক্সপিয়রকেও হাসপাতালে জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের জীবনও আলোচ্য কবির ন্যায় শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট ছিল, কিন্তু তাঁহাদের নিকট আমরা ভগবানে আত্মসমর্পণের একান্ত বিশ্বাসের এরূপ জলন্ত চিত্র পাই নাই। বলিতে পারি না, কোন ভাষায় এরূপ মনোমদ রোগ-নামচা আছে কি না? আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে এই রোগ-নামচাটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ভাই বাঙ্গালী, যদি খাঁটী মানুষ হইতে চাও, তবে এরূপ সদ্গ্রন্থ পাঠ কর। উপন্যাসের মত সরল সহজ ভাষায় যদি ব্যথিত হৃদয়ের কাতর-ধ্বনি শুনিতে চাও—যদি আশার আলোক দেখিতে চাও—যদি ভগবানের শ্রীচরণে মতি স্থির রাখিতে চাও, তবে এই অমূল্য রোগ-নামচা পাঠ কর। যদি তুমি নিষ্পাপ হও, তবে তোমার জন্য এ ব্যবস্থা চলিবে না—আর যদি পাপী তাপী হও, যদি অনুতাপ তোমার মনে আসিয়া থাকে—যদি তুমি হৃদয়ে বল পাইতে চাও, তবে এ রোগ নামচা পাঠ কর। রামকৃষ্ণ কথামৃতের বা Imitation of Christ প্রভৃতি পুস্তক পাঠের যে ফল এই রোগ-নামচা পাঠেরও সেই ফল। হয়ত কেহ কেহ আমার এই উক্তিকে অত্যুক্তি বা প্রলাপের উক্তি বলিতে পারেন, কিন্তু আমার তাপিত সরল হৃদয়ের যাহা অভিব্যক্তি তাহাই ব্যক্ত করিলাম। আশা করি, এই রোগ-নামচা স্বতন্ত্র ভাবে মুদ্রিত হইয়া বাঙ্গালার গৃহে-গৃহে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় ব্যবহৃত হইবে। 'বঙ্গ-বাসীর মনোমন্দিরে'র ভিতর প্রথম পরিচ্ছেদে (ক) হাস্য-রস (খ) দেশাত্মবোধে (গ) সাধনতত্ত্বে ও (ঘ) কাব্য-পরিচয়ে কবি রজনীকান্ত আলোচিত হইয়াছেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় রজনীকান্তের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই' প্রভৃতি গীতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা-সমস্যার সমাধান করিবার যে চেষ্টা দেখা গিয়াছিল, তাহা কখনও নিষ্ফল হইতে পারে না। এই স্বদেশ-প্রেমের ভাব-ধারা কখনও একেবারে শুষ্ক হইতে পারে না। মধ্যে কিছু দিনের জন্য এই ধারা একটু ক্ষীণ হইয়াছিল; আবার প্রকৃত পথে চলিবার যে চেষ্টা দেখা গিয়াছে, তাহাতে বাস্তবিকই মনে আনন্দের উদ্রেক হয়।

সাধন-তত্ত্বের স্তরগুলি নলিনী বাবু যে সুন্দর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় তিনি সনাতন সাধন-তত্ত্বের ভাব-ধারার সহিত সুপরিচিত। প্রথম স্তরে কবির মনে যখন গভীর অতৃপ্তি আসিত—নির্জ্জনে উপস্থিত হইত, তখন কে যেন তাহার কানে কানে বলিয়া গেল,—

"বেলা যে ফুরায়ে যায়, খেলা কি
ভাঙ্গেনা হায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!

তখন জীবনের কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা আসিল, কবি গাহিলেন,—

নয়নে বরষা বাঁধিয়া,
বলে, আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া।

ভারপরের স্তরে অনুতপ্ত রজনীকান্তকে দুঃখ-জ্বালার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে পরিত্রাতার অন্বেষণ করিতে ব্যস্ত দেখি—'বিপদের ত্রাণকর্ত্তা, নিরাশ্রয়ের আশা' সেই দয়ালের দিকে ছুটিতে দেখিতে পাই। তাঁহার সন্ধান পাইয়া সাধক রজনীকান্ত মনঃশিক্ষার দিকে অবহিত হইলেন।

তিনি গাহিলেন—

'যদি, বেলাবেলি ঘাটে যাবি,
হাল্‌কা হ'য়ে চল্‌বি,
তবে, খুলে ফেল তোর পায়ের বেড়ী,
ফেলে দে তোর তল্‌পি।

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ধারণা করিলেন—

'কাজ কিরে তোর সের ছটাকে
বেঁধে নে তোর দেহের ছ'টাকে
শিখেনে রে সামিত্বের বিষমটাকে
রাখ চতুর্ভুজের গুণটী জেনে।

তখন তিনি দয়ালের অযাচিত করুণা উপলব্ধি করিলেন,

(আমি) অকৃতী অধম বলে'ও তো কিছু—
কম ক'রে মোরে দাওনি!
যা' দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া,
কেড়েও ত কিছু নাওনি!'

তার পর যখন হৃদয়ের পরতে পরতে বুঝিলেন, দয়াময় তোমাকে ডাকিবার অপেক্ষা তু রাখ নাই, তোমার অযাচিত করুণা বলে, তুমি—

—(আমার) হৃদয় দুয়ারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছে।
• • •
(আমি) ঘুরে ছুটে যেতে দু'হাত পাসরি।
ধরে টেনে কোলে নিয়েছে।

শুধু দয়া পাইয়া ত সাধক নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, সাধকের মন দেব-দর্শনের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। যখন চাহিয়া চাহিয়া প্রাণের ঠাকুরের দর্শন লাভ হয় না, তখন সাধকের মনে নিদারুণ অভিমান আসিয়া উপস্থিত হয়। কবিরও এই অবস্থা যখন হইয়াছিল, তখন তিনি প্রার্থনা করিলেন—

'কবে, তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব,
তোমারি বিশাল নন্দনে;
কবে, তাপিত এ চিত্ত, করিব শীতল,
তোমারি করুণা চন্দনে!'

তখন সার বুঝিলেন, দয়ালের করুণা না হইলে কাহার ভগবদ্দর্শন অসম্ভব, তিনি যুক্তহস্তে কাতর অন্তরে প্রার্থনা করিলেন,—

'তুমি নির্ম্মলকর, মঙ্গল করে
মলিন মর্ম্ম মুছায়ে;
তব পুণ্য-কিরণ দিয়ে যাক্ মোর
মোহ কালিমা ঘুচায়ে।'

এইরূপে আত্মনিবেদন করিতে করিতে তিনি সর্ব্বভূতে ভগবানের সত্তানুভব করিয়া গাহিলেন;—

'আছ, অনল-অনিলে, চির নভোনীলে,
ভূধর সলিলে গহনে,
আছ বিটপি-লতায়, জলদের গায়
শশিতারকায়, তপনে।'

অন্যত্র তিনি গাহিলেন,—

'তুমি সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর শোভাময়
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল দৃশ্য নয়ন প্রভাময়।'

এরূপ গাহিয়াও তাঁহার প্রাণের তৃপ্তি হইল না। চিরসুন্দরের সৃষ্ট সকলই সুন্দর দেখিতে লাগিলেন—

'সুন্দর তব সুন্দর সব,
যে দিকে ফিরাই আঁখি।'

সাধক রজনীকান্তের ভগবানে বিশ্বাস এতদূর ছিল, যে তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন,—

'কেন বঞ্চিত হব চরণে?

আমি কত আশা করে বসে আছি,
পাব জীবনে না হয় মরণে!'

আশার অভয় বাণী শুনিয়া, তিনি জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিয়াছিলেন।

ভগবানে আত্মনির্ভর করিয়া তিনি গাহিতে পারিয়াছিলেন,—

'তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।'

তারপর ভগবানের স্বরূপ দর্শন করিয়া তিনি মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

কাব্য-পরিচয়ে নলিনীবাবু যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তি ও বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই কলাকুশলী সমালোচকের উপযোগী হইয়াছে। ইহার কোন স্থানে রসাভাস হয় নাই। তাঁহার নিপুণ তুলিকায় কবির অঙ্কিত চিত্রগুলি যে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এইবার আমরা হাস্যরসে কবি রজনীকান্ত সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলিতে চাই। রজনীকান্ত 'রোজনামচা'য় লিখিয়াছেন—"প্রকৃত Humour তাই, যাতে সমাজ বা ব্যক্তি-বিশেষের weakness দেখিয়ে তার ridiculous side expose করে, সাধারণ ভাবে শিক্ষা দেয়। আমি যে সব humour এর অবতারণা করিয়াছিলাম, তার একটাও নিষ্ফল বাজে লিখিনি।" কথাটা ঠিক এবং গ্রন্থকারের সহিত আমরাও বলিতে চাই "তাঁহার ব্যঙ্গ, তাঁহার রঙ্গ, তাঁহার রহস্য স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল, শরতের আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, শিশুর হাসির মত সুন্দর, মাতার স্নেহের মত পবিত্র; উজ্জ্বলো মনের আঁধার ঘুচিয়া যায়,—সুনীল, নির্ম্মল স্নিগ্ধতায় চোখ জুড়াইয়া আসে, আর সুন্দর, সরল ও পবিত্র স্নেহ ও হাসিতে প্রাণ ভরিয়া উঠে। তাঁহার বাঙ্গে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই, সংকীর্ণতার সঙ্কোচন নাই, অশ্লীলতার স্থান নাই, অনর্থক খোঁচা মারিয়া রক্তপাতের চেষ্টা নাই—তাঁহার বাঙ্গে ধার আছে, তাহা খাঁটী সোনা, তাহার সবটুকু সুন্দর মনোহর ও পবিত্র।"

গভীর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, এই অনবদ্য সুন্দর পুস্তকখানির এই অধ্যায়টী সাবধের সহিত লিখিত হয় নাই। লেখক মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের উপর যে অবিচার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ইচ্ছাকৃত বলিয়া বোধ হয় না। তিনি, Wit humour, satire, ও parody র পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"দ্বিজেন্দ্রলালের গানে ও কবিতায় ব্যঙ্গ অপেক্ষা কৌতুক বেশী, শ্লেষের উপর কশাঘাত অপেক্ষা তাহাকে লইয়া রসিকতা করার ভাবটা বেশি, কেবল হাসির জন্য লোককে হাসাইবার চেষ্টা অধিক, বেশীর ভাগ ভাঁড়ামী বা fun বা রঙ্গ — humour বা satire নয়।" তাঁহার ব্যঙ্গ কৌতুক ও রসিকতার সংজ্ঞা ভাল করিয়া বুঝা যায় না। আমরা wit and humour কে এক পর্য্যায়েই ফেলিয়া থাকি; ইহাদের অর্থে বুঝি রঙ্গরস লোককে হাসাইবার চেষ্টা। শুধু উপায়ে রসাত্মক বাক্যে লীলতার সাহায্যে আনন্দদানের ব্যবস্থা করাই রঙ্গরসের প্রধান কার্য্য। ব্যক্তিগত শ্লেষকে humour বলা যায় না—উহা satire. রঙ্গরসের আলোচনা করিতে হইলে স্থান কাল পাত্র বিচার করা উচিত। রঙ্গরস মনের অবসন্নতাকে দূর করিয়া উত্তেজনা আনয়ন করে। মনের স্বাস্থ্যকে ফিরাইয়া আনে। আনন্দ দান করে; সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানও করিয়া থাকে। ব্যক্তি বা সমাজের দোষ দেখাইয়া সংশোধনের পথে লইয়া যাইবার রঙ্গরসই অমোঘ যন্ত্র। রঙ্গরস ঘটনা বা অবস্থাকে অতিরঞ্জিত করে, ভাবের বৈপরীত্য ঘটায়, অসম্ভব বা অঘটনের ঘটন করিয়া লোকদিগকে হাসায়। কোন প্রসিদ্ধ রঙ্গরসিক রঙ্গরসকে (humour) বায়ুমণ্ডলের সহিত ও রসকে (wit) চঞ্চলা দামিনীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। (Humour is the atmosphere, wit the

flash) বিদ্যুৎ যেমন নয়ন সমক্ষে সহসা প্রতিভাত হইয়া চমকিত করিয়া দেয়, রসও সেইরূপ শ্রোতৃবর্গের মুখে একটি কথায় ফুটিতে হইয়া কেবল আনন্দধ্বনিই করিতে থাকে। বসা বা wit এর ভিতর কোনরূপ শিক্ষা থাকে না। রঙ্গরস ও রসের ভিতর পার্থক্য এইখানে। তবে বলিয়া রাখা ভাল, রঙ্গরসেও কোন কোন স্থলে কোনরূপ শিক্ষা থাকেও না। আর যেখানে আনন্দের সহিত শিক্ষা লাভ করা যায়, সেই সকল রঙ্গরসকে প্রথম শ্রেণীর রঙ্গরস বলা যাইতে পারে। এ শ্রেণীর হাস্য রসরচনায় কান্তকবি দ্বিজেন্দ্রলালের অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে; কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ হাসির গান দ্বিজেন্দ্রলালের অনুকরণ। দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দের, ভাবের ও বিশেষ-ভঙ্গীর (style) এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজীর queer amalgam ও কান্তকবি অনুকরণ করিয়াছেন। তবে পরবর্ত্তীকালে লিখিয়াছেন বলিয়া স্থানে স্থানে কান্তকবি দ্বিজেন্দ্রলালের তীব্রতাকে একটু কোমল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রভক্তগণ কান্তকবিকে "রাজসাহীর ডি, এল রায়" বলিয়া আখ্যাত করায় পণ্ডিত মহাশয় তাহাদের উপর যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহাতেও সংযমের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কয়েকস্থলে ব্যক্তিগত ঈর্ষাও ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে 'না পড়িয়া পণ্ডিত, না জানিয়া সমালোচক কি না' তাহা বলিতে পারি না, তবে এই সামান্য কথাটার অর্থ পণ্ডিত মহাশয় কেন বিকৃত করিয়া ধরিয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। কথাটার অর্থ হাস্যরসে উভয়েই এক শ্রেণীর কবি। বহুদিন বাঙ্গালা দেশ হইতে হাস্যরস অন্তর্হিত হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আর স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল ভগীরথের ন্যায় হাসির গানরূপ গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কান্তকবিও সেই খাতে চলিয়াছেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'রাজসাহীর ডি, এল, রায়' আখ্যা দিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে আলোচ্য জীবনীকার একস্থানে লিখিয়াছেন, 'তিনিও personal attack এর ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আক্রমণের লোভ এড়াইতে পারেন নাই। তিনি শশধর ও হাক্সলির খিচুড়ি রাঁধিয়া গিয়াছেন,—

"আমরা beautiful muddle, a queer
amalgam
of শশধর, Huxley & goose"

হায়! শ্লেষের চিহ্নও কোথাও দেখিতে পাইতেছি না। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আক্রমণ কোথায়? ইঙ্গবঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল দুঃখের সহিত বলিতেছেন, আমরা পরিপাক করিয়া রস গ্রহণ করিতে জানি না, আমরা শশধর, হাক্সলি প্রভৃতি মনীষীদের মতগুলি মিলাইয়া এক অদ্ভুত মত প্রচার করিয়া থাকি। লেখক মহাশয়ের মতে "শ্রীহরি গোস্বামী" প্রভৃতির শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের উপর আক্রমণ, একথাও আমরা নূতন শুনিলাম। গানটী পাঠ করিয়া ত বুঝিতে পারি নাই। আর দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সুযোগ্য শিষ্য মাননীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চারি খানি মাসিক পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার হাস্যরসের ('comic songs') বিশদ আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও এ কথাটা বলিয়াছেন বলিয়াত মনে হইতেছে না।

৩১৫ পৃষ্ঠায় নলিনী বাবু লিখিয়াছেন,—'আমাদের বিশ্বাস দ্বিজেন্দ্রলালের "নন্দলাল" ভিন্ন আজ কাল কার অন্য কোন হাসির গানের ভাগ্যে (কান্তকবির ঔদরিকের মত) এরূপ সৌভাগ্য ঘটে নাই। তবে নন্দলালের পিছনে খোঁটার জোর ছিল—তাঁহার মুরুব্বী ফনোগ্রাফ, ও গ্রামোফন তাঁহার এই পদ-বৃদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।' এইরূপ কথা তিনি কিরূপে লিখিলেন বলিতে পারি না। ফনো-গ্রাফ ও গ্রামোফন 'নন্দলালের' প্রসিদ্ধ-লাভের

কারণ নয়, কারণ প্রকৃত হাস্যরস তাহাতে আছে। আর ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে বলিয়াই গ্রামোফোন ও ফনোগ্রাফের যন্ত্রমধ্যে ইহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে। আর বোধ হয় আমরা নলিনী বাবুকে একটা নূতন খবর দিতে পারিব যে, অন্ততঃ দশ বৎসর পূর্ব্বে, রজনীকান্তের "বুড়োবাঙ্গাল" "ঔন-রিক" প্রভৃতি গান প্রসিদ্ধগায়ক "বঙ্কুবাবু"র কণ্ঠে গীত হইয়া গ্রামোফোন-যন্ত্রমধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান সম্বন্ধে আমার নিজের যে ধারণা তাহা ভারতবর্ষের ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ভায়া যাহা লিখিয়াছেন তাহারই অনুরূপ। এস্থলে ঐ অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম "দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষত্ব তাঁহার হাসির গানে। তাঁহার গানে শ্লীলতার অভাব নাই, শ্লেষ-বিদ্রূপ নাই, মর্ম্মভেদী ব্যাঙ্গ নাই—আছে সরল হাসি ও কৌতুক। সময়ে সময়ে হাসির আবরণ ভেদ করিয়া অকস্মাৎ জ্বালা প্রকাশ হইয়া পড়ে, কিন্তু কখনও তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন নাই। ব্যথীর জন্য সমবেদনার উৎস তাঁহার ভাব প্রবণ হৃদয় হইতে সর্ব্বদাই ছুটিতে থাকে। হাস্যরসিকেরা সামাজিক ব্যাধিগুলি দূর করিবার জন্য হাস্যরসের অবতারণা করেন, দোষীর দোষ গুলি অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইয়া থাকেন—হৃদয়ের পরতে পরতে যাহাতে তাহারা ঘৃণা অনুভব করিতে থাকে, তাহাই করিয়া থাকেন। আর আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল যাহাকে লইয়া কৌতুক করেন আপনাকে তাহাদের একজন করিয়া লন,—"আমরা সেজেছি বিলাতীবাঁদর" We are reformed Hindus "আমরা বিলাত-ফের্ত্তা ক ভাই" প্রভৃতি গানে তিনি আপনাকে বাদ দেন নাই। তিনি বলিতেছেন ভাই আমি তোমাদেরই একজন, কিন্তু আমরা কোথায় চলিয়াছি, একবার নয়ন মেলিয়া দেখ। তাঁহার এই শ্রেণীর হাসির গানে আমরা হাস্যরসিক Edgar Allen Poeর করুণ রসের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই। নন্দলালের দেশ-হিতৈষণায় আমরা তথাকথিত স্বদেশ-প্রেমিকদিগকে বিপথগামী হইতে দেখিয়া হাসিয়া থাকি, কিন্তু তাহাদিগকে ঘৃণা করি না। ব্যঙ্গরসাত্মক বা খাঁকারের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের এই খানেই পার্থক্য। তাঁহারা মানব-দ্বেষী (cynic); তাঁরা মানবকে তাঁহারা ঘৃণা করেন; দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাদের দোষ সংশোধন করিবার জন্য আপনিও তাহাদের দলে মিশিয়া তাহাদেরই একজন হইয়া তাহাদের সহিত সমবেদনা দেখাইয়া থাকেন—এই সমবেদনা ও করুণাই তাঁহার হাসির গানের বিশেষত্ব।" Parody বা অনুকৃতি সম্বন্ধেও নলিনী বাবু যে মত পোষণ করিয়াছেন তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। যাহা আস্বাদ করিয়া রসাভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে আলঙ্কারিকেরা রস নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আর এই রসের ভিতর যাহা কৌতুক উৎপাদন করিতে সমর্থ তাহাই হাস্যরসের অন্তর্গত। শ্লীলতা রক্ষা করিয়া মানব মনে আনন্দ দান করা ইহার মূল উদ্দেশ্য। এখন দেখিতে হইবে অনুকৃতি (parody) হইতে কৌতুক লাভ ও আনন্দ পাওয়া যায় কি না; আর সেগুলি ভদ্র সমাজে গুরুজন বা পূজ্য-স্থানীয়দিগের নিকট পাঠ করা যায় কি না। যদি তাহা যায় তাহা হইলে বলিতে হইবে সে অনুকৃতি ব্যর্থ নয়। বাঙ্গালাভাষায় অনুকৃতির (parody) প্রথম প্রবর্ত্তককে নলিনীবাবু 'রসের কালাপাহাড়' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন; আমাদের নিকট তিনি কালাপাহাড় ত নহই—তিনি একজন প্রকৃত রসিক। রসের কালাপাহাড় তাহাকেই বলিব যিনি বিকৃত অনুকরণ করিয়া শ্লীলতা রক্ষা করেন না। দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে রবীন্দ্রনাথের অমর গীতি "এস ফিরে এস, বঁধু হে ফিরে এস!" নির্য্যাতিত হইয়াছে কি না তাহাও নলিনীবাবুর ন্যায় বলিতে পারি না, তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার করিব রসটা একটু বেশী রকমের তরল হইয়াছে।

হবে অনুকৃতির আলোচনা করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে, অনুকৃতি সকল সময়েই তরল হইয়া থাকে। কবি কালিদাসের রঘুনীকান্তের "কেন বঞ্চিত হব চরণে"র অনুকৃতি "কেন বঞ্চিত হবো ভোজনে" কবিতাটী নলিনীবাবুর নিকট কলা-নৈপুণ্য-সাহিত বিকট বিকৃত অনুকৃতি; কিন্তু আমরা ইহা পাঠ করিয়া বাস্তবিকই প্রাণ ভরিয়া হাসিয়াছি। অনুকৃতির সহিত আসলের তুলনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। অনুকৃতিটীকে পৃথকভাবে দেখিতে হইবে—দেখিতে হইবে অনুকৃতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে কি না—আনন্দ দান করিতে পারিয়াছে কি না।

নলিনীবাবু ২৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 'রহস্যবিদ্ রবীন্দ্রনাথ কখনও প্যারডি রচনা করেন নাই। ইচ্ছা করিলে একটা কেন তিনি শতসহস্র প্যারডি লিখিতে পারিতেন,—কিন্তু তাহাতে রসের সৃষ্টি হয় না—রসের সংহার হয়, তাই তিনি এই রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই।' আসল কথাটা নলিনীবাবু ভুলিয়া যাইতেছেন, রবীন্দ্রনাথ মৌলিকতার জন্য প্রসিদ্ধ—তাঁহার প্রতিভা কি কাহারও প্রতিভার অনুকরণ করিতে পারে। নবনব উন্মেষশালিনী শক্তি বলে যিনি জগতের সাহিত্যে নূতন ভাবধারা দিতেছেন তিনি কাহার অনুকরণ করিবেন। যিনি স্বীয় সাধনবলে ইন্দ্রাণীর নিকট হইতে পারিজাত মালা উপহার পাইয়া ভাবা জননীর গলদেশ স্থাপন করিয়াছেন, তিনি কাহার দারস্থ হইবেন? অনুকরণ করি আমরা কাহার? আদর্শের!—রবীন্দ্রনাথ কাহার আদর্শের অনুকরণ করিবেন। আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে স্বাভাবিক তরলতা না থাকিলে হাস্যরসের ভিতর অনুকৃতি করিতে পারা যায় না। গম্ভীর প্রকৃতির লোককে হাস্যরসিক নয় বলিয়া দোষারোপ করিতে পারা যায় কি? অনুকরণ করিয়া হাস্যরসের উদ্রেক করিতে পারেন নাই বলিয়া কোনরূপ অভিযোগও করা চলে না। আমাদের বিশ্বাস ইহা তাঁহার ধাতুর অনুরূপ নহে। ইচ্ছা করিলে তিনি এইরূপ করিতে পারিতেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কারণ আমরা জানি চিন্তাধারা তাহার মাথা মুড়িয়া ফেলিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির ইহা অনুযায়ী নহে। রসের সৃষ্টি হয় না বলিয়া তিনি অনুকৃতি করেন নাই এ কথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। অনুকৃতিতে যে সর্ব্বত্রই রসের সংহার হয় এরূপ কথাও আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। আবার বলি, এই পরিচ্ছেদটী অন্যান্য পরিচ্ছেদের ন্যায় সুচিন্তিত-ভাবে ও সংযমের সহিত লিখিত হয় নাই। আমাদের অনুরোধ ভবিষ্যতে এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তকের যখন পুনঃ সংস্করণ হইবে তখন যেন আমাদের এই কথাকয়টার দিকে তিনি একটু অবহিত হন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি 'জনপ্রিয় রজনীকান্ত' ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'সাধক রজনীকান্ত' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস রজনীকান্তের সাধন ও পারমার্থিক সঙ্গীতগুলি বাঙ্গালীকে চিরদিন হৃদয়ে বল দান করিবে—শ্রীভগবানের উপর নির্ভরতা ও বিশ্বাস আনয়ন করিয়া দিবে; হাস্যরসিক বলিয়া হয় ত তাঁহার নাম লোকে ভুলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সাধক বলিয়া রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত কাঙ্গাল হরিনাথ প্রভৃতি ভক্তগণের নামের সহিত তাঁহার নাম চিরকাল অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথ কান্তকবির রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটী জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়াছিলেন, বাঙ্গালার বহু বরেণ্য ভদ্রমহোদয়ও কান্তকবিকে ঐরূপ ভাবে দেখিয়াছিলেন। এরূপ লোকের জীবনচরিত হইতে শিক্ষা করিবার অনেক উপদেশ যে আছে তাহা একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে।

পুস্তকখানির ভাষা ও লিখনভঙ্গী প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠিতে পারা যায় না। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

ইহাতে ১৫ খানি চিত্র আছে। কলিকাতা ৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, বেঙ্গল বুক কোম্পানী হইতে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৪৲ টাকা।

ভাগের পূজা

[লেখক—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অন্ধকারেই তীক্ষ্ণ ও তীব্র দৃষ্টি মেলিয়া ছোট খুড়ো একবার চারিদিক দেখিয়া লইয়া, আমার পানে চাহিয়া বলিলেন—আমাকে ডেকেছ, সত্য ?

এ-হেন সময়ে এ-হেন স্নেহের সম্বোধনে বাস্তবিকই আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইয়া গেল। সাধ্যপ্রকারে কোনদিনই আমি ছোট খুড়োর সম্মুখীন হইতে চাহিতাম না। তাঁহার সরল তরা অন্তঃস্থল হইতে স্নেহের কথাগুলি কোনদিনই আমার কাণে অমৃত বর্ষণ করিত না, আজও করিল না। আমি নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া অদূরে উপবিষ্ট নতমুখী গয়লা বৌ-এর দিকে চাহিয়া বক্তব্য স্থির করিয়া লইতেছি, ছোট খুড়ো প্রসাদের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন—কি হে, খবর কি ?

এবারেও আমি কথা কহিতে পারিলাম না, নির্ম্মল বোধ করি আমার লজ্জা কুণ্ঠা বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই বলিল—খবর আছে, বলছি।

জানি না কেন, ছোট খুড়ো আমাকে এক আধটু স্নেহ করিতেন, কিন্তু নির্ম্মল একেবারেই যে নয়নের বিষ ছিল। নির্ম্মলকে বোধ করি ইতিপূর্ব্বে অন্ধকারে তিনি চিনিয়া লইতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহার কণ্ঠস্বরে বিরক্ত হইয়া, আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বিরক্তস্বরে বলিলেন—সত্য, তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ ?

আমি ছোট খুড়োর উচ্চকণ্ঠস্বরে একটু খানি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম, জড়িতকণ্ঠে বলিলাম—ছোট কাকা, আমি…

নির্ম্মল দীপ্তকণ্ঠে বলিল—উনি নন্, খুড়ো, আমরাই আপনাকে ডেকেছি।

ছোট খুড়ো একবারমাত্র প্রদীপ্ত নেত্রে বক্তার মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া, দুর্গা, দুর্গা বলিতে বলিতে দ্বারের দিকেই ফিরিতেছিলেন, নির্ম্মল বলিল—যাবেন না কাকা…

প্রসাদ এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল, বলিল—আপনার চাকর অকণে বাগ্দী কি করেছে শুনেছেন ?

আমার পুত্র বলিয়াই বোধ করি প্রসাদ তাঁহার স্নেহ পাইয়াছিল, ছোট খুড়ো চমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—না—কি করেছে ?

রাস্তায় গয়লা বৌ-কে ··

কে গয়লা বৌ ?

নির্ম্মল বলিল—দিদি, একটা আলো দাও ! একটু খানি সরিয়া আসিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে গয়লা বৌকে দেখাইয়া বলিল—এই গয়লা বৌ ! বেচারা আমাদের গাই দুয়ে বাড়ী ফিরছিল, আমাদের ছয়ে সঙ্গে ছিল, তা সন্ধের আপনার আদুরে গোপাল চাকর অকণে বাগ্দী আর এক বেটা কে বাদুনদের পুকুর-পাড়ের গাব-তলা থেকে বেরিয়ে মুখে কাপড় বেঁধে……

ছোট খুড়ো প্রাসাদের দিক চাহিয়া কহিলেন, তার পর?—তবুও নির্মল উত্তর দিল।

বলিল—গয়লা বৌ চেঁচিয়ে উঠতে আমি আর ভাগনে ছুটে গিয়ে দেখি, হরের হাতের লণ্ঠন ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেছে, অরুণে গয়লা-বৌকে টান্‌তে টান্‌তে……

সন্ধ্যাবেলা,—বেটাদের স্পর্দ্ধা ত কম নয়!

হরি! হরি! সন্ধ্যাবেলা ঘটিয়াছে বলিয়াই কাণ্ডটা ঘোরের?—আমি আলো হাতে বাহিরে আসিয়া বলিলাম—কাকা এ-কি আচরণ?

কাকা আমার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। আমার মুখে তিনি কি দেখিলেন, কে জানে, একটি কথাও না বলিয়া আর একবার তীব্র দৃষ্টিতে গয়লা-বৌকে দেখিয়া লইলেন।

প্রসাদ বলিল—আমরা সময় মত গিয়ে না পড়লে যে কি হোত তা বলা যায় না।

কিছু হ'ত না তাহা।—বলিয়া খুড়ো মহাশয় সহাস্যে প্রসাদের পিঠে একটি মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। প্রসাদ একটু সরিয়া গিয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল—কি বলেন ঠাকুর্দা! আমরা দু'জনে না গিয়ে পড়লে নিশ্চয়ই

হাঁ তারপর?—তিনি একটুখানি থামিয়া পুনশ্চ কহিলেন—তারা, গাই বাছুরে ভাব না থাকলে কি আর অরুণো ওর সন্ধ্যেবেলা গায়ে-ঘরে কাক পাখে হাত দিতে পারে?

আমার বুকটা জ্বলিয়া উঠিল, বলিলাম—মিথ্যে গয়লা বৌকে খুব ভাল জানি আমি।

খুড়া মহাশয় কি একটা উত্তর দিবার জন্য হাঁ করিতেছিলেন, নির্মল তাহার পূর্ব্বেই বলিল—ও-সব ছেঁদো কথায় আমরা ভুলছি নে। আপনার চাকর যে গাঁয়ের বৌ-ঝি, মেয়েদের গায়ে হাত দেয়—এ'তে নিশ্চয়ই আপনাদের উৎসাহ আছে।

প্রসাদ বলিল—ঠাকুর্দা, আপনি অরুণো বেটাকে আমাদের হাতে দিন, আমরা তার বিচার করব। সে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিয়েছে……

খুড়ো হাসিয়া বলিলেন—স্ত্রীলোক বলেই ত গায়ে হাত দিয়েছে তারা। পুরুষ হ'লে কি আর হাত দিত?

ছোট খুড়ো মহাশয়ের কথার মর্ম্ম আমরা কেহই বুঝিতে পারিলাম না। প্রসাদও পারে নাই, জিজ্ঞাসিল—স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দেবে?

দেবেই ত! স্ত্রীলোককে যে সাধারণ ভোগ্যা করেই বিধি সৃষ্টি করেছেন। নদী রাজপথ, শুঁড়ির দোকান, সভাস্থল, জলাশয়ে যেমন সকলের সমান অধিকার, স্ত্রীলোকের ওপরও তেমনি সকলের সমান অধিকার আছে—ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং একথা বলেছেন।

নির্ম্মল তিক্ত কটু কণ্ঠে বলিল—জ্ঞান ত অগাধ দেখছি আপনার! বুদ্ধ বলেছেন! বুদ্ধদেবের সব উপদেশ কি এমনি করেই মানা হয়?—রাগে সে কাঁপিতেছিল। নির্ম্মলের রাগটা চিরদিনই আমার ভয়ের বস্তু। রাগিলে গুরু লঘু বিচার বুদ্ধি অনেকেরই হারায়, কিন্তু নির্ম্মলের রাগের সময় অনেক অঘটনও ঘটাইয়া বসিত, সেই ভয়ে আমি কেমন আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। কিন্তু খুড়ো মহাশয়ের উত্তরে আমার ভয় অনেকটা কমিয়া গেল। খুড়ো মহাশয় নির্ম্মলের কথার কোন উত্তর না দিয়াই অদূরে দণ্ডায়মান তাঁহার সহীস উদ্দেশে কহিলেন—চল-হে মহীন!

যাবেন কি! বলিয়া নির্ম্মল তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

খুড়ো মহাশয় একবার তীব্রদৃষ্টিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ দেখিয়া লইয়া, আমাকেই বলিলেন—সত্য ওসব নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

আর নিরুত্তর থাকিতে পারিলাম না, ছোট খুড়োর সামনে আসিয়া বলিলাম—কাকা, এ-সব অনাচার অত্যাচার হ'তে থাকলে গ্রামে বাস করা যে দুষ্কর হ'য়ে উঠবে! রোজ রোজ এ সব কি

হ'তে চল্ল!—গলাটা কাঁপিয়া গেল। কথাটা যেমন করিয়া বলার ইচ্ছা ছিল, বলিতে পারি নাই।

ছোট খুড়ো বলিলেন—কিছু হয় নি, সতা, কিছু হয় নি। ওসব নটী মাগীদের কথার মধ্যে থেক না মা! আস্তাকুঁড় ঘাটলেই গায়ে নোংরা লাগে, পথ বাঁচিয়ে চলতে জানলে কোন গোলই হয় না। ঐ যে তোমার গয়লা বৌটি বসে রয়েছেন, মুখটি নীচু করে, বড় সহজ ভেব না মা ওঁকে, মস্ত একটি খেলোয়াড়। ও যদি না আস্কারা দেবে, অরণো বাগ্দীর সাধ্যি কি ওর গায় হাত দেয়!—এই একটি কথায় তোমায় স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলুম মা। আর ও সবে মন দিও না!

গয়লা বৌএর মাথাটা মাটীর সঙ্গেই মিশিয়া যাইতেছিল, আমরা তাহা দেখিতেছিলাম, ও হতভাগিণী যে এত বড় অপবাদের বোঝাটা মাথা নীচু করিয়া মানিয়া লইবে, তাহা আমার জ্ঞানেরও অগোচর ছিল, আমি যেন কি এক রকম হইয়া মুখ নত করিয়া ফেলিলাম। আস্তাকুঁড় ঘাটাঘাটির কথাটা মনে ধিক্কার জন্মাইয়া দিতেছিল।

নির্ম্মলের স্বভাবটাই ছিল, তার্কিকের। সে দুই মুহূর্ত্ত পরে বলিল—আপনি বলতে চান্—গয়লা বৌ আপনাদের আস্কারা দিয়েছে?

খুড়ো মহাশয় তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, খড়মের খটমট শব্দে চক্ষু তুলিতেছি, শুনিলাম—আলবৎ দিয়েছে! বলুক হারামজাদী—নিজেই বলুক দিয়েছে কি না?

আপনার চাকর অরুণ বাগ্দীকে...নির্ম্মল গয়লা বৌএর দিকে চাহিয়া থমকিয়া গেল। গয়লা বৌ মাথা তুলিয়াছিল, তাহার মুখের ঘোমটা সরিয়া গেছে,—হঠাৎ মেঘমুক্ত হইয়া নিদাঘ সূর্য্যের মত তাহার চোখ দুইটা হইতে আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। আমার বুকখানি আশায় আনন্দে দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল।

খুড়ো মহাশয় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—অরুণ বাগ্দীর বাবার বাবাকে খেলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে! বলুক না, সত্যি কি মিথ্যে, জমিদারের ছেলেটাকে...

বাগ্দী বেটা তার দূত?—নির্ম্মলের বজ্রগম্ভীর স্বর ধ্বনিয়া উঠিল।

জমিদারের আবার দূত, অদূত কি! প্রজা,—যখন যা হুকুম জমিদার করবে—মান্তে বাধ্য!

আমি বলিলাম—অমন জমিদারের মুখে আগুন!

নির্ম্মল বলিল—আপনি কি, তার মন্ত্রী?

খুড়ো মহাশয় এ কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন—মাথা গরম কর না, ছোকরা!

ছোকরার মাথা গরম একটুও নয়। মাথা গরম হ'লে এতক্ষণ কি আর ঐ খড়ম পায়ে দিয়ে ঐখেনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে পারতেন, না, আপনার জমিদারই নাবালের বৈঠকখানায় শুয়ে আলবোলায় তামাক টান্তেন? দু'জনকেই এতক্ষণে গঙ্গাযাত্রী হ'তে হ'ত!

ছোট খুড়ো নির্ম্মলের মুখের দিকে চাহিলেনও না, কথার উত্তরও দিলেন না। আমাকেই বলিলেন—চলুন সতা, রাত হ'য়ে যাচ্ছে।

এক মুহূর্ত্তে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ দেহ মনকে সংযত করিয়া লইয়া খুড়ো মহাশয়ের পা দু'টা চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—কাকা আপনি গুরুজন, আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলছি রমণীর উপর অত্যাচার করবেন না! মা বসুমতী অনেক পাপ সহ্য করছেন, ও পাপ সইবেন না। কাকা গ্রামটাকে উজর দেবেন না।

হিতে বিপরীত হইল। খুড়ো মহাশয়ের মেজাজটি ঝর ঝর করিয়া খসিয়া পড়িয়া গেল, চিৎকার করিয়া বলিলেন—আমি উজর দিচ্ছি—কোন্ হা—কে বলে?

কাকা আমাদের বিধবা পুরুত.....

কথাটা শেষ হইবার আগেই নির্ম্মল 'দিদি' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখি,

সর্ব্বনাশ! গঙ্গা-বৌ-এর মেয়েটি সানের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়াছে। ছুটিয়া তাহার মাথাটা কোলে তুলিয়া লইলাম। তাহার মুখ দিয়া একটা গোঁ গোঁ শব্দ নির্গত হইতেছিল। নির্ম্মল উঠানের এক পার্শ্বে রক্ষিত প্রকাণ্ড বাল্‌তিটা আনিয়া আমার পায়ের কাছে রাখিয়া বলিল—দিদি, জলের ছিটে দাও, মূর্চ্ছা গেছে।

প্রসাদ বলিল—দাঁড়াও, আমি একটা সোঁকার ওষুধ তৈরী করেছি, নিয়ে আসি—সে ঘরের দিকে যাইতেই, আমি সমস্ত উঠানটা সাদা দেখিতে পাইলাম—হরকে দেখিলাম, কিন্তু ছোট খুড়া বা তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গদের কাহাকেও দেখিলাম না, বুঝিলাম, ইতাবসরে তাঁহারা গা-ঢাকা দিয়াছেন।

দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নির্ম্মল বোধ হয় আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সেই দিকেই চাহিয়াছিল, বলিল—শালারা গেল কোথা! দাঁড়াও ত, সে ছুটিয়া যাইতেছিল, আমি তাহাকে নিরস্ত করিতে বলিলাম—নির্ম্মল! থাক্-সে ওরা! তুমি বস, গঙ্গা বউ-কে বাঁচাও।

প্রসাদ লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া এ-দিকেই আসিতেছিল, হঠাৎ দ্বারের দিকে চাহিয়া বলিল—কে?

আমি শচী।—সঙ্গে সঙ্গেই একজন হারিকেন বাহী পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শচীকে আসিতে দেখা গেল।

শচী! আয় মা, আমি তোদের কথাই ভাব্‌ছিলুম!

শচী আমাদের বিধবা পুরোহিত পত্নীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, বয়স বছর এগারো হইবে।

প্রসাদ বলিল—মা, এটা সুঁকিয়ে দাও দেখি বারকতক, মূর্চ্ছা ভেঙ্গে যাবে'খন?

ও-কে পিসমা?—বলিয়া শচী আমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গঙ্গা-বৌ ঘোমটা-টা টানিয়া দিয়া, উঠিয়া বসিতেই প্রসাদ ব্যস্ত হইয়া বলিল—মা, ওকে এখন উঠ্‌তে দিও না। জানি কি, আবার যদি মাথা-টাথা ঘুরে যায়—মুস্কিল হ'বে। বরং ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে খানিক শুইয়ে দাও, সুস্থ হ'ক—তার পর আমরা বাড়ী রেখে আসব।

নির্ম্মল-ও ঐ ধরণের একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল, আমি নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া বলিলাম—তুমি শচীর সঙ্গে ওদের বাড়ী যাও নির্ম্মল!

নির্ম্মল অবাক্ হইয়া একমুহূর্ত্ত চাহিয়া বলিয়া উঠিল—তবে আহ্লাদকে যেতে দিলে কেন? সেই এনেছিল, সেই নিয়ে যেত!

কথা কাটাকাটি করিবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না। বিশেষতঃ আমার সংসারের কর্ত্রীত্বের ভার যখন আমার 'পরে গুস্ত ছিল, তখন কাহারো কাছে কৈফিয়ৎ দিয়া কোন কাজ করানো আমি পছন্দ করিতাম না,—সে'টাকে কর্ত্রীত্বের অভিমান বলা চলে না; তবে আমি যে নিরভিমানিনী—সে কথাও বলিতে চাহি না। তবে আমার ভাই বা পুত্র—ইহারা চিরদিনই আমার আদেশ অম্লান-মুখে নীরবে পালন করিত বলিয়াই বোধ করি আমার অভ্যাসটা ঐরূপ হইয়া গিয়াছিল।

দুই মিনিট পরে প্রসাদের পানে চাহিয়া দেখি, সে অনেক দূরে দাঁড়াইয়া শচীরই মুখের দিকে চাহিয়া আছে। বুঝিলাম, প্রসাদ অনেক দিন শচীকে দেখে নাই তাই আজ তাহাকে এতবড়টী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেছে। প্রসাদ ইদানীং বাড়ী আসিত রাত্রে, আবার চলিয়াও যাইত—রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে। কলকাতায় তাহার কি-যে এত কাজ সেই জানিত। আমরা কিছু জানিতে চাহিলে এত বড় বড় কথা আবৃত্তি করিত যে আমরা না জিজ্ঞাসা করিয়াই সুস্থ থাকিতাম।

প্রসাদকে জিজ্ঞাসিলাম—তুই বুঝি শচীকে অনেক দিন দেখিস্ নিরে?

না মা, অনেক দিন দেখি নি। শচী বেশ্‌টী হ'য়েছে।

শচী মাথা নত করিয়া লইল; প্রশংসা শুনিয়া কাণ দু'টি তাহার লজ্জা পাইল। শচীর ঈষৎ আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলাম—শচি কি প্রসাদকে চিন্তে পারছিস্ নে?

শচী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—চিনি, পিসিমা!

বলিলাম, প্রসাদ, তুমি শচীর সঙ্গে ওদের বাড়ী যাও। আজ তোমাকে সেখানেই থাকতে হ'বে হয় ত! আহ্লাদ ওদের বাড়ীতে বরাবরই রাত্রে শুত, আজ তাকে বরালে না কোথায় যেতে হ'বে বলে'—শচীর মা আমাকে খবর পাঠিয়েছেন।

এখনই যাব মা?

তোর যে খাওয়া হল্ না রে!···তা হোক্, যাও—শচীর মা'র কাছেই খাবে'খন।

প্রসাদ ও শচী এক সঙ্গেই দাঁড়াইয়া উঠিল। 'তুমি একটু দাঁড়াও শচি', বলিয়া প্রসাদ রান্নাঘরের দিকে গেল এবং এক মিনিটের মধ্যে একগাছা প্রকাণ্ড লাঠি হাতে বাহিরে আসিয়া বলিল—এস!

প্রসাদের বীর-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া অন্তর ভরিয়া গেল; হাসিয়া বলিলাম—বেশ।

নির্ম্মল অনুতপ্তের মত স্বরে বলিল—আমি কি যেতুম না, দিদি?

তাহার কণ্ঠস্বরে যে খানিকটা ব্যথা বাজিয়াছিল, তাহা গোপন করিবার ব্যর্থ প্রয়াস না করিয়া বলিলাম—তোমার যে এখানে কাজ রয়েছে ভাই! গয়লা-বৌকে রেখে আস্‌তে হ'বে ত তোমাকেই! —এক মুহূর্ত্ত থামিয়া বলিলাম—আর ত আমি কার সঙ্গেই ওকে পাঠাতে পারব না।

ছেলে এতক্ষণ নির্ব্বাক ছিল, আমার কথা শেষ হইতেই বলিল—আমার তাতে দোষ কি-না! আমি ভালো মানুষের ছেলে, সাতেও নেই, পাঁচেও নেই তবু ছোট বাবু রাস্তায় আমার ঘাড়েই ঘুঁষী মেরে বল্লেন, তুই হারামজাদ, যত নষ্টের গুরু! ওনারা হ'ল জমিদারের তাঁবেদার, ওঁদের আর কি বলবে, যত রোখ এই গরীব হরের ওপর।—বলিয়া মিট্ মিট্ করিয়া নির্ম্মলের পানে চাহিতে লাগিল।

নির্ম্মল কি কথা বলিবার উদ্যোগ করিতেই, বলিলাম—নির্ম্মল, এর প্রতিকার করতে পারবে?

কেন পারব না দিদি, খুব পারব। তুমি শুধু অনুমতি দাও, তুমি শুধু ব'স, দেখ, আমরা মামা ভাগ্নের কি না করতে পারি! সে চুপ করিল, আবার তখনি স্বর ঈষৎ নামাইয়া কহিল—কিন্তু গয়লা বৌএর কথায় আর আমরা নেই দিদি।

জিজ্ঞাসিলাম—গয়লা বৌ এর অপরাধ কি নির্ম্মল?

নির্ম্মল আমার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বক্তব্য বুঝিয়া ছিলাম, কিন্তু সেই চাপাপড়া কথাটাকে আর জাগাইয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইতেছিল না, মৃদুস্বরে বলিলাম—নির্ম্মল, ছোট খুড়োর কথা বিশ্বাস করা আর পৃথিবীটাকেই মিথ্যে ভাবা এক কথা।···তবুও নির্ম্মলকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলাম, আমি বল্‌ছি তোমাকে, গয়লা বৌ নিষ্পাপ।

গয়লা বৌ হঠাৎ আমার পা দুটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—পিসিমা, ওনারা সব মিথ্যে বলেছে।

নির্ম্মল গর্জ্জিয়া উঠিল—মিথ্যে বলেছে! তখন —তুমি চুপ করে রইলে কেন!

মনে মনে নির্ম্মলের প্রতি বিরক্ত হইলেও মুখে বাধা দিতে ইচ্ছা হইল না; গয়লা বৌ কি উত্তর দেয়, সেটা শুনিবার আগ্রহও বড় অল্প ছিল না। নীরবে গয়লা বৌএর দিকে চাহিয়া রহিলাম। শুনিলাম,—পিসিমা, ওনাদের সামনে আমি কি কথা বলব? ওরা কি সেই লোক!·····

ওরা যাই হোন্ তুমি কেন বল্‌লে না মা?

গয়লা বৌকে ইতঃস্তত করিতে দেখিয়া আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলাম, বলিলাম—তুমি কেন পাপ কথা গোপন করতে গেলে মা! ওরা যাই হোক্, যতই ক্ষমতা ওদের থাক্, পাপী ত। পাপীকে ভয় কিসের মা? তুমি নিজে যখন ধর্ম্ম পথে আছ, তখন যে তুমি যমরাজেরও সামনে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পারণ।

গয়লা বৌ-এর পাতলা ঠোঁট দু'খানা নড়িয়া উঠিল; আর দুই ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া সেই যে মাথা নমিত করিয়া লইল, পাঁচ সাত মিনিট কাটিয়া গেল, আর সে মাথা তুলিল না। মনে মনে কত আশাই না করিতেছিলাম, কতবার আকুল আগ্রহে তাহার বুকের কথাগুলিকে বাহির করিয়া আনিবার ব্যর্থ প্রয়াসে তাহার মুখের পানে চাহিলাম, কিন্তু একটা শব্দ শুনিতে পাওয়া ত দূরের কথা, ক্রমে তাহার মুখখানিও আর দেখিতে পাইলাম না। কেবল সেই সরু সরু শ্যামবর্ণ হাতের মণিবন্ধ বেষ্টন করিয়া যে কয়গাছি লাল চুড়ীর পলস্তরা আলোয় পড়িয়া চিক্‌চিক্ করিতেছিল, নিঃশব্দে সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ পরে বলিলাম—নির্ম্মল, গয়লা বৌ-কে বাড়ী রেখে এস।—ঘরে অদূরে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট মনে আমাদেরই কার্য্য কলাপ দেখিতেছিল, বলিলাম, আলো নিয়ে মামা বাবুর সঙ্গে যেতে হবে।

ঘরে বিড় বিড় করিয়া যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই, বিনা কারণে যখন তাহারই ঘাড়ে দোষ পড়ে তখন আবার তাহার হাতে আলো দিয়া পাঠানোর কি এমন দরকার আছে?

নির্ম্মলের সরল হৃদয় মন কোন দিনই ভয়কে সহীহ সমাঃ করিতে জানিত না। সে অনুচ্চ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—ও ব্যাটার দরকার নেই যাবার! গয়লা বৌ, উঠে এস।

গয়লা বৌ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া উঠিল; কি ভাবিয়া আর একবার বসিয়া পড়িয়া আমাদের পায়ের কাছে মাথা নামাইল,—মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলাম—এস মা! আর, কাল সকালে একবার এস।

নির্ম্মল আলোটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল,—ঘরের কাছে আসিয়া এতক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে আলোকটাকে দেখা গেল, নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, যখন নিজের ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন নির্ম্মলের ঘরের ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল।

শরীর অত্যন্ত অবসন্ন থাকিলেও শয়নের ইচ্ছা হইল না। অন্ধকার আকাশ ভেদ করিয়া যাহারা নির্নিমেষ নেত্রে ধরার পানে অগণিত দৃষ্টি বিস্তার করিয়া নিশা জাগিতেছিল, তাহাদেরই দিকে চাহিয়া রোয়াকে বসিয়া ভাবিতেছিলাম—গয়লা বৌএর কি বলিবার ছিল? কেনই বা না বলিয়া অমন চুপ করিয়া গেল! নির্ম্মল ছিল বলিয়াই কি অভাগীর মুখ খুলিল না। কিন্তু নির্ম্মলের জানাটা যে কত দরকার তাহা ত আমি জানিতাম তাই ইচ্ছাসত্ত্বেও নির্ম্মলকে সরিতে বলিতে পারি নাই। উহারাই ত আমার বল, বুদ্ধি, ভরসা, নতুবা আমার কি আছে? দীনা, দুর্ব্বলা নারী আমি! উহাদের মুখ চাহিয়াই যে আমার বুক দশহাত হইয়া উঠে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রসাদ অতি দ্রুতবেগে লাঠি হাতে ছুটিতে ছুটিতে গৃহাঙ্গনে আসিয়া ডাকিল—মা!

উপবাস-ক্লিষ্ট মস্তকটি উপাধান হইতে না তুলিয়াই বলিলাম—ঘরে আয়।—বলিয়াই ক্লান্ত নেত্র দুটি মেলিয়া পুত্রের আগমন পথ নিরীক্ষণ করিতেছি,—রণভঙ্গে আহত সৈনিকের মত প্রসাদ ঘরে ঢুকিয়া বলিয়া উঠিল—মা, রাস্তায় হৈ চৈ হ'চ্ছে—গয়লা বৌ-কে পাওয়া যাচ্ছে না।

এত যে অবসাদ, ক্লান্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল, চকিত গতিতে উঠিয়া বসিয়া ডাকিলাম,—নির্ম্মল!

মাথা পথে বেড়াচ্ছিল মা, আমার কথা শুনেই ছুটেছে! গয়লা পাড়ায় বিষম ঘোঁট হ'চ্ছে মা!

কি-যে বলিব ভাবিয়া পাইলাম না! শ্রান্ত দেহও যেন আবার নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল, মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া মস্তিষ্কের কার্য্য আরো গুরুতর করিতেছিল, শুনিতে পাইলাম, ছোট খুড়ো ডাকিতেছেন—সত্য! সত্য!

প্রসাদ আমার দিকে চাহিয়াই হাতের প্রকাণ্ড লাঠিটা মাটিতে ঠুকিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, বলিলাম—আমি দেখ্‌ছি, তুমি বরং ওদিকে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে ফেল।

বাহিরে আসিতেই দেখি, ছোট খুড়ো মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের মত রুদ্রমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান। তাঁহার ঠিক পশ্চাতে একটি দিব্যকান্তি কিশোরমূর্ত্তি দেখিলাম বটে, চিনিতে পারিলাম না। মাথার কাপড়টা আরো একটু বাড়াইয়া দিয়া বলিলাম—উঠে আসুন, কাকা!

কাকা বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন—তোমার ভাই কোথা সত্য?

জানি না—বলায় ছোট খুড়ো মহাশয় আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—এই বলে যাই সত্য, পার ভাইকে ঠাণ্ডা রাখতে, রাখ, নইলে একটা কাণ্ড ঘটলে আমায় দুষো না।

কি হ'য়েছে কাকা?—স্বরটা ভয়ার্ত্তেরই।

যা হ'বার নয়। বারোয়ারি তলায় দাঁড়িয়ে ছোকরা যা তা বলে জমিদারকে অপমান করে আসে—এত বড় বুকের পাটা? ভাগ্যে জমিদারের লোকজন কেউ ছিল না নইলে আজ··

বাধা দিয়া বলিলাম—অমন জমিদারকে শুধু অপমান করেই নির্ম্মল নিশ্চিন্ত হ'ল। সে যদি আজ জমিদারের মুণ্ডুটা কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আসত, দিয়ে ফাঁসীও যেত, আমি অসুখী হোতাম না।

ছোট খুড়ো মহাশয় বিস্মিতস্বরে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—ওঃ! তাই! তবে তুমিও আছ এর মধ্যে?

আছি। হাজারবার আছি। যে জমিদার দুর্ব্বল নারীর উপর অত্যাচার করে, সে জমিদারের···

আস্তে আস্তে কে আমার কাণের কাছে বলিল—ঐ ত জমিদার পিসিমা, আমাদের বাড়ীর কাছে ঘুরে বেড়ায়—

ফিরিয়া দেখিলাম—শচী!—সে দৃষ্টি সঙ্গেতে সেই নধর দেহ কিশোরকেই দেখাইয়া দিল।

চক্ষু তুলিতেই দেখি, অল্প-বয়স্ক যুবক একদৃষ্টে এদিকেই চাহিয়া আছে! কি সে সুন্দর চক্ষু দু'টি, আর কি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ সুন্দর সেই তরুণ মুখখানি! শচীর দিকে ফিরিয়া কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি, খুড়ো মহাশয় ডাকিলেন—সত্য! মেয়ে মানুষের প্রতাপ বাড়লে কি হয় জান?—পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়! স্ত্রীলোকই জগতের ধ্বংসের কারণ—একথা শাস্ত্রে আছে।

(ক্রমশঃ)

"ভাগের পূজা"র তৃতীয় পূজাঙ্কী—শ্রীমতী সরলা বালা বসু। যমুনা সম্পাদক।

ব্যথাতুর

(গল্প)

(শ্রীবাণী দেবী)

আমি অনন্ত-পথের যাত্রী, এ পথের আর যেন শেষ না হয়; ক্রমাগতই যেন চলি।

অনন্তাকাশের অসীম গান, জাহ্নবীর কুলুতান অন্তর ছাপিয়ে উঠ্‌ছে; আকাশের নীলিমা, প্রকৃতির স্নিগ্ধ-শ্যামছবি নয়ন ভরিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু তাতে অন্তর-দাহ নিবারণ হচ্ছে কৈ?

হিমাদ্রির তুহিন্ পরশে, দারুণ দহন জুড়াবার জন্য—চলেছি তার শীতল ক্রোড়ে. শান্তি সুপ্তির আশে কিন্তু শান্তি কোথায়?

আত্মসংবরণ করতে পারবো না। ব্যর্থতার বিপুল রোষে, নিরাশার আর্ত্তনাদে শূন্য গগন ভরে তুল্‌বো; বুকের রক্তে অটল হিমাচলের পাষাণ বুক রঞ্জিত করে দেব। অশ্রু পড়্‌তে দেব না, অক্ষি-যুগল উপ্‌ড়ে ফেলে জনমের মত দৃষ্টিহীনা হয়ে থাকবো। এ বুকের বেদনা জুড়াতে সমস্ত অসম্ভব কার্য্যই সম্ভবপর করে তুলবো।

মাতৃত্ব হতে যদি বঞ্চিতা করলেই ভগবান, তবে তার সঙ্গে নারীত্বটুকুও লুপ্ত করে দিলে না কেন? সব সুখ-স্মৃতি ও সেই সাথে বিস্মৃতির গর্ভে লীন করে দিলে না কেন? বুকভরা বাসনা, অন্তর-ভরা, কামনাই যদিই রইল, তবে এমন করে সর্ব্বস্বহারা করলে কেন? এ অনাথার দুঃখ-কাহিনী তোমার অন্তরে পশে না কি?

শ্বশুরালয় হতে আমি তাড়িত হয়েছি—নিকৃষ্ট শেয়াল কুকুরেরই মত। একদিন আদরের অন্ত ছিল না—আর আজ অনাদর ও অপমানে শরীর-মন জর্জ্জরিত হয়ে যাচ্ছে!

উছ্‌লে পড়া লাবণ্যের জ্যোতিতে তোমরাই না একদিন যেচে নিয়েছিলে, তবে এখন এত বিরাগ কেন?

মাতৃত্বের মধুরাস্বাদ হতে বঞ্চিতা হয়েছি বলে সে কি আমার অপরাধ? নির্ম্মম বিধি ললাটে লিখেছে ললাটে, সেও কি আমার অনুমতি নিয়ে? তবে—তবে কেন আমায় এর ফল ভোগ করতে হবে? আমার দুঃখভোগ যে করতেই হবে, এতে যে আমি বাধ্য। তুমি বিশ্ব নিয়ন্তা তোমার ইচ্ছা কি অপূর্ণ রইবে নাথ!

বাবাকেও মনে পড়ে না, যা স্মৃতিতে আসে সে খুবই কম এবং তা বড় অস্পষ্ট। তাই যেন কেউ নেই; সব সুখ হতে বঞ্চিতা হয়েই জন্মেছে এ অভাগিনি। হে বিশ্বস্রষ্টা, যত কিছু অভিশাপ আমার জন্যেই কি সঞ্চয় করে রেখেছিলে? জন্ম মাত্রই একটীর পর একটী করে দিতে বিধা বোধ করলে না!

কাকাদের দয়ায় বড় হলাম। তাঁহাদেরই মুখের গ্রাস লইতে লাগিলাম। তারপর ভাগ্যাকাশে সুখ-রবি উদিত হ'ল. কি দুঃখের ঘন কৃষ্ণ মেঘে জীবন আমার তিমিরাবৃত হল জানি না; তবে আত্মীয়-স্বজনের বুকের বোঝা যে নেমে গেল এটা ঠিকই।

পরের তিনটী বছর কেটে ছিল বড় সুখে। সে কথা মনে হলে এখনও আত্মহারা হয়ে যাই, বিশ্বসংসার ভুলে যাই, জগতের বাস্তব যা কিছু সব নিভে যায়, মনে ভাসে কেবল সেই প্রাণ-মন আলো করা নীল দুটী চোখ। আর মনে পড়ে, তাঁর মুখের পানে স্থির-দৃষ্টি রাখা। যা দেখে

সরমে বল্‌তাম, "কি যে দেখ অমন করে আমিনা!" তখন তিনি গভীর অনুরাগে আমার হাতখানি টিপে দিয়ে বল্‌লেন—"দেখ্‌ছি কেবল তোমার ডাগর আঁখির চপল চাউনি আর নিত্য-কম্পন-শীল রক্তাধরের লীলাময়ী ভঙ্গিমা।"

সূতিকাগারে মা আমার, শেষ বিদায়ের দিনে, এ মুখে কি রেখে গেছেন জানি না। কল্পনায় অনুভব করতে চেষ্টা করি—সে অমিয়া মাখা ঠোঁট দু'খানির মোহন স্পর্শ।

বয়স আমার একুশই হবে, তখন অন্তরে চির-বসন্ত বিরাজ করছে; অনুরাগের ফাগ্ খেলা সেখানে নিত্য নতুন চল্‌ছে। কোকিলের কুহুধ্বনি প্রাণে নব-জাগরণের সূচনা করছে; মলয় সমীর নবীন প্রাণটীকে নিয়ে আনন্দে দিশেহারা হয়ে যেতে আছে।

আমি জমীদারের একমাত্র পুত্রবধূ, সকলেই একটা কিছুর প্রত্যাশী হয়েছিল আমার কাছে। শিশুর কল-ধ্বনিতে শূন্য ঘর ভরে তুলি এই ছিল তাঁহাদের একান্ত বাসনা। একটা কচি-কোমল হাতের মধুর-পরশ পাওয়ার জন্য পাগল হয়েছিলেন—আমার শ্বশুর-শাশুড়ীই বেশী।

এমনই করে কত জ্যোছনা রাত কেটে-গিয়ে ভোরের পাখীর তানে চমক ভেঙ্গেছে, কত নিরালা রাত্রি এমন করে কেটেছে। কিন্তু এখন থাক্ সে সব আলাময়ী কথা—ভাব্‌লে বুকটা জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যায়।

সোণার চেনে গাঁথা শেফড়ও মাদুলীতে আমার বুকটা প্রায় ভরাট হয়ে উঠেছিল, তা ছাড়া মানত-বাসসিকের ত অন্তই ছিল না। এত লোকের সুখ একসঙ্গে চাওয়াতে বিধাতার করুণা হোল না; এত টোট্‌কা-টাট্‌কা সবই নিষ্ফল হোল। যা হবার নয়—তা এমনি করেই বিফল হয়েই যায়!

সকলের পরিপূর্ণ আশা নিরাশায় পরিণত হোল কিন্তু আমার বন্ধ্যাত্ব কেউ ঘুচাতে পারলো না। মাতৃ-স্নেহ মধুরাস্বাদ আমায় কেউ দিতে সক্ষম হোল না। হতাশার হলাহল পানে প্রাণ মুহ্যমান হ'য়ে পড়লো, অবসাদে মন ভেঙ্গে গেল।

শ্বশুর মহাশয় চোখে চশমাটা দিয়ে বল্লেন, "বৌমাকে মাসিক কিছু বৃত্তি দিয়ে, বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া যাক্!" শাশুড়ী ঠাকুরুণও নথটা ঘুরিয়ে সায় দিয়ে বল্লেন, "তাতে আর কিন্তু কি? সেটা তো কর্ত্তব্য কাজ।"

এই হোল আমার সব অগ্নীকার—শেষ পরীক্ষা। এ স্থান আমাকে ছেড়ে যেতে হবে বিনা বাক্য-ব্যয়ে—সকল দাবী-দাওয়া চুকিয়ে। এই কি আমার ললাট-লিখন!

শেষ মিনতি তাঁদের কাছে করলুম—'দাসীর মতন রেখে যদি দেন তাও সৌভাগ্য বলে মাথা পেতে নেব, সব দুঃখই সহ্য কোরবো কিন্তু বিদায় করে দেবেন না।'

শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতিজ্ঞা অটল রইল। তাঁরা দয়া করে মাসিক ১০ টাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। সন্তানহীনার উহার অধিক প্রাপ্য আর কি থাকতে পারে? তোমরাই নারীর হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা, তোমাদের বাম-খেয়ালি আদেশ পালন করতে আমরা যে সর্ব্বদাই বাধ্য। নারীজন্মের সব সার্থকতাই তোমরা এই রকম করে অতল জলে ডুবিয়ে দাও!

সারারাত মধুর গুঞ্জনে কত প্রেমগান গেয়ে তিনি কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত করে দিলেন। সে গান শুনে আমার তৃষিত প্রাণ জুড়িয়ে গেল। যেখানেই থাক না কেন তোমার মূর্ত্তি চিরতরে এ বুকে আঁকা রইবে। পরলোকে মিলন হলে সব দুঃখ ভুলে গিয়ে আবার আনন্দে মাতোয়ারা হব। তোমার আসনে অন্যকে ঠাঁই দেব তা মনে ও কোর না। এ জন্মে সব দুঃখ সয়ে আমরা, অন্য লোকে মিলিত হব' তখন সে পথে আর কেউ আমাদের অন্তরায় হবে না।

চিরদিনের জন্য গোপন আশাটী বুকে চেপে

এলাম। তাই ছোল একমাত্র সম্বল। তিনি মাঝে মাঝে এসে দেখা দিয়ে যাবেন—এই বলেন। এযে আমার পরমসৌভাগ্য। অনেক করে বেড়ার ধারে বসে বসে দিন হাত কাটান ছোল আমার দৈনন্দিন কাজ। ভোরের পাখী থেকে সাঁঝের তারা অবধি একটী একটী করে গুনতাম; পাখীরা সারাদিন খেলা ধূলার পর মুখের কোলে ঢোলে পড়তো. দিনের আলোয় নক্ষত্র সব আকাশের গায়ে মিলিয়ে যেত. অভাগিনী নারী আমি তপ্তদীর্ঘশ্বাস ফেলে বাথি হৃদয়ে ঘরে ফিরতাম।

শুকনো এই বুকখানা নিজের উত্তাপে নিজেই দিন দিন শুখিয়ে যেতে লাগলো। তবু ঐ ব্যর্থ আশা বুকে নিয়ে কাটিয়ে দিলাম একটী বছর। তারপর একদিন কিসের জন্ত বড়ই আকুল হয়ে পড়লাম। সেদিন মনকে তার স্ববশে আন্‌তে না পেরে, অবশেষে গভীররাতে ভাঙ্গা ঘরের আগড় খানি খুলে বেরিয়ে এলাম জগতের সামনে নিজ নামে গাঢ় কালিমা লিপ্ত করে দিয়ে। সারারাত ক্রমাগত পায়ে হেঁটে, শ্রান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিলাম আমার শ্বশুর-বাড়ীর গাঁয়ের বাইরে একটা ডোবার ধারে। বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়াতে চোখ দুটি আপনিই বুজে এল। সব কষ্ট এক নিমিষে ভুলে গেলাম।

রোদের তীব্র তাঁতে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল, তখন মনে হোল গাঁয়ের ভেতর একবার যাই। কিন্তু যদি কেউ চিন্‌তে পারে? তা'হলে তো সর্ব্বনাশ হবে! মনের আশা মনেই চেপে আকুল মনে তেমনই করে শুয়ে রইলাম্। ক্রমে সন্ধ্যার আঁধার দিগন্ত ছেয়ে ফেল্লে।

তখন বর্ষার সময়। বিকালবেলায় বিকটাকার দৈত্যের মত কালো-কালো মেঘগুলি আকাশ-খানাকে ছেয়ে ফেল্‌লে। খানিকপরই চারিদিক কম্পিত করে ভীষণ ঝড় নেমে এল।

এতক্ষণে আমি যাবার সুযোগ পেলাম, অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে চলতে লাগলাম, অন্তরের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে। প্রকৃতির তাণ্ডব-নৃত্য বেড়েই চলেছে মেঘের গর্জ্জনে কানে তালা লাগছিল, বিদ্যুৎ চমকে চোখকে ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল, তবু তারই নিশানা ধরে যাচ্ছিলাম নিজ গন্তব্য পথটীতে। পুলকে শরীর রোমাঞ্চ হয়ে উঠ্‌লো। মনে হ'ল গিয়ে যেন কি দেখবো? কি ভাবছেন, কি করছেন, হয় ত ঘুমিয়েছেন—এমনই কত কি!

এই দুর্য্যোগ রাতে ফটিক বন্ধ করতে তাদের হয়ত ভুলে হয়েছিল, তাই নির্ব্বিবাদে আমার ঘরটীর দিকে যেতে লাগলাম।

একতলা বাড়ী, আমাদের শয়ন ঘরের পেছনের জমীটা আগাগোড়াই ফুলবাগান। বেশীর ভাগই সুগন্ধি ফুলের গাছ। ফুলের সুগন্ধে বাগান খানি ভরপুর হয়েছিল।

খোলা জানালার ধারে আস্‌তেই দেখলাম, আলো অন্ধে ঘরখানা দিনের মত হয়েছে। আলো দেখে মন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলো। এই নিরালায় বাদলা রাতে বিনিদ্র স্বামী কার চিন্তায় বিভোর হয়ে আছেন? তবে কি মিথ্যে ব্যথা বুকে বয়ে কষ্ট পাচ্ছিলাম; এখনও কি ঐ অভাগিনীর কথা মনে-করেন? সারা অন্তর আনন্দ হিল্লোলে দোলন হয়ে দুলে উঠ্‌লো।

ক্ষণকাল পরই আমার সব আনন্দ, মায়া-মরীচিকার এক মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল। পালঙ্কে ধব-ধবে বিছানায় বসে আমার আরাধ্য দেবতা, আর তাঁর পাশে শুয়ে? এই দৃশ্য দেখে মাথাটা ঘুরে গেল। সারা পৃথিবী পায়ের তলায় টল্‌মল্ করে উঠলো।

ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখি, পাশে যে সে তরুণী। সুন্দর উজল-করা চোখ দুটী তাঁর মুখের ওপর তুলে চেয়ে আছে। সুন্দর মুখ খানি বেড়ে কোঁকড়া কালো চুলগুলি যেন বিশ্রামের জন্ত নেতিয়ে পড়ে আছে।

কে তুমি কুহকিনী, তোমার যাদু দৃষ্টির মোহন-স্পর্শে আমার স্মৃতির পরে কৃষ্ণাবরণ টেনে দিয়ে, নিজের নামটী স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল করে দিলে? নিজের জয়-পতাকা উড়িয়ে দিয়ে, আপন জয়-গীতিতে আমার স্বামীর হৃদয়াকাশ ভরে দিলে? এ অধিকার তুমি কোথা থেকে পেলে? আমার হাতে অধিকার তাতে তোমায় হস্তার্পণ করতে কে অনুমতি দিল? রাক্ষসী! এত বল হৃদয়ে তোমার কোথা হ'তে সঞ্চয় হলো? পরক্ষণে প্রকৃতিস্থ হয়ে ভাব্‌লাম—তাই ত আমি কেউ নই, কোন অধিকার যে আমার নাই—তোমারই সব!

বিপুল আগ্রহে তিনি যেন তাকে কি শোনা-চ্ছিলেন, তাহা আর বুঝিতে পারিলাম না বা বুঝি-বার চেষ্টাও করিলাম না।

মনে হোল তিনি যেন বল্লেন—"আমি তোমারই রেণু আর কারো নই।"

আর শোনবার বা বুঝবার কোন আবশ্যক ছিল না। যথেষ্ট শুনেছি আর শুনতে চাই না—ওগো আর চাই না!

জন্ম-অভাগিনীর যেদিকে দুনয়ন যায়—সেইদিকে চলে যাব চির-জনমের মত। ব্যথাটুকু যা পেয়েছি তাই নিয়েই চলে যাব, কাউকেও জানতেও তা দেব না। হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে আমার সঙ্কল্পে বাধা দিল। আমি ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখলাম, এক তরুণী তার রক্তরাঙা গলাটীতে একটী সোহাগের টোকা খেয়ে জানালার দিকে মুখ ফেরালে, সেই সঙ্গে তিনিও ফিরিলেন। বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠ্‌লো সেই মুহূর্ত্তে। তখন কি আমার জ্ঞান ছিল? প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম, হাঁফ ছাড়লাম ফটকের কাছে এসে। ভয় হচ্ছিল—দেখ্‌তে পেয়ে যদি তিনি খোঁজ করতে আসেন। পর মুহূর্ত্তেই মনে হল কি ভ্রম আমার! এই মুখখানা তাঁর সুখের বাসর ভেঙ্গে দেবে? এইটুকু রেণুর বিচ্ছেদ তার হৃদয়ে সইবে? রেণু যদি আজ আমার মতই অভিশপ্ত-জীবন নিয়ে পরিত্যক্তা হয়, কিম্বা জনমের মত ধরার বুক থেকে ওর নামটী মুছে যায়; তা'হলে তার স্থানে আবার ঠিক এমনই অনুরাগে অন্যকে বরণ করে নেবে।

* * * *

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিলাম বল্‌তে পারি না; হঠাৎ চোখ খুলে দেখি তিনি আমার এত কাছে যে তাঁর নিশ্বাস আমার গায়ে লাগছে এবং তাঁহার অঙ্গের সুবাস আমার মনকে মাতিয়ে দিচ্ছে।

স্নেহ-বাধা-স্বরে তিনি ডাক্‌লেন, "মীরা," উত্তর দিতে পারলাম না, দেবারও ক্ষমতা ছিল না। আমার হাতখানা তাঁর হাতের মধ্যে নিয়ে আবার ডাক্‌লেন, "মীরণ!" তাঁর কণ্ঠের অমিয়ায় যেন এতক্ষণের সব গ্লানি দূর হয়ে গেল, কিসের আবেশে নয়ন আমার মুদে এল।

তিনি আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন, "মীরণ, তোমায় হারিয়ে কি ব্যথাতেই বুকখানা ভেঙ্গে গেছে, তা কেবল একমাত্র অন্তর্য্যামীই জানেন। আমার অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার পরিত্যক্ত স্থান তেমনই অক্ষুণ্ণ রয়েছে এ হৃদয়ে। বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রাণে শাস্তি দিতে গিয়ে যেটুকু অপরাধ করেছি, তা ক্ষমা করা কি এতই দুরূহ মীরা?"

তখন অতি কাতর-কণ্ঠে বল্লাম, "তুমি তোমার মনের মধ্যে আমার স্থান যে এখন ও রেখেছ এই আমার সৌভাগ্য। নারী-জন্মের যাহা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা তা আমার সব মিটেছে, আমি এখন অনন্ত-পথের যাত্রী। আমাকে বিদায় দাও।" এই বলিয়া ব্যথাতুর হৃদয় লইয়াও তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া আমি বাহিরলাম—এই অসীমঅনন্তের পথে।

জাভায় বিবাহ-প্রথা

(শ্রীজানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)

বিবাহ সম্বন্ধ উত্থাপন—বিবাহ উৎসব—বিবাহের আহার। অনেক দেশের মত জাভাতেও বিবাহ সম্বন্ধ মধ্যস্থ দ্বারাই উত্থাপিত হয়। তাহারা বর কনে সম্বন্ধে যথাসাধ্য সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া উভয়ের নিকটে তাহা বর্ণনা করে, উদ্যোগ পর্ব্বের অনেক কাজই তাহাদের করিতে হয় এবং বিবাহ রাত্রে 'ওয়াকসি' রূপেও তাহাদের কর্ত্তব্য আছে। অনেক সময় মধ্যস্থ এবং 'ওয়াকসির' কাজ ভিন্ন লোক দ্বারা সম্পন্ন হয়—কিন্তু কাজ একই।

'ওয়াকসিকে' কনের পোষাক পরিচ্ছদ পরাইয়া দিতে হয়, এবং বিবাহকালে সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে থাকিতে হয়, এইরূপে সে নারীর পিতামাতার স্থান অধিকার করে। কারণ জাভার অধিবাসীদের নিয়ম কন্যার বিবাহ আসরে পিতামাতা উপস্থিত থাকেন না।

উজ্জ্বল বর্ণ জাভাবাসীদের বিবাহের একটা চিহ্ন; গ্রামের মাতব্বরেরা, পুরোহিত আত্মীয়, বন্ধু আসিয়া কনের নূতন গৃহ জাঁকাইয়া বসেন

দুধ, চিনি ছাড়া চা, সুপুরী, পিত্ত, এবং কিছু মিষ্টি সাজাইয়া প্রত্যেক অতিথির সম্মুখে রাখা হয়। ভিতরের একটা কুঠুরীতে কনের পাতিয়া বেশ ভাল ভাবে সাজান হয়—সে ঘরের পর্দ্দা সব সাদা,—লেস, সোণা, রূপা ও সিল্কের কাজ করা। কনের উঠিবার জায়গায় ছ' ইঞ্চ উঁচু করিয়া বেদী করা হয়। তাহার উপরে সাদা একখানা কাপড় রাখা হয় এবং তার উপর রঙ্গ চৌতে নানারঙ্গ মেঠাই থাকে।

পরে গান ও গোলমালের সঙ্গে কনের আগমন ঘোষিত হয়। কনে ভিতরে আসিলে তার খোলা ছোট পা দু'খানিতে জল ঢালিয়া দেওয়া হয়, বর নিজেই অবশ্য কনেকে গৃহে লইয়া আসিয়াছেন, কনের পেছনে বর গৃহে প্রবেশ করিয়া কনেকে বাঁয়ে বসান। কনের সমস্ত দেহে হলুদ মাখাইয়া রাখা হয়। কনের পোষাকের মধ্যে শুধু ভাল সিনেনের একটা সেমিজ বগল হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আর যা অঙ্গ খোলাই থাকে। কোমরের কাছে একটা রূপার বেল্ট বাঁধা হয়,—চুলগুলি পেছনে খোঁপা করিয়া বাঁধা—ফুল দিয়ে সাজান। কনের পাশে তার ওয়াকসি বসিয়া তাহাকে বাতাস করে, ও সুপুরী হাতে তুলিয়া দেয়। বরের পাশেও তাহার ওয়াকসি বসিয়া থাকে—বরের পা, হলুদ মাখা, এবং ভ্রুতে কাল রং দেওয়া হয়। বরও একটা সেমিজ পরিয়া থাকে—বহু মূল্যবান কোমরবন্ধের সঙ্গে একখানি কিরিচ ঝুলান থাকে, তাহার দীর্ঘ কেশরাশি পিঠের উপর ছড়ান থাকে, মাথা একটা টুপিতে আবৃত থাকে।

বিবাহ হইয়া গেলে বর কনে অনেকদিন ছাড়াছাড়ি থাকিত, এই পূর্ব্বে রীতি ছিল, যদিও বর প্রত্যহ কনেকে দেখিত ও বন্ধুগণের সম্মুখে গান বাজনা চলিত। খাবার আসিলে বর কনেকে সকলের সম্মুখে খাওয়াইয়া দিবে এই নিয়ম ছিল। মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত উৎসব চলে—বর তখন পরদিন আসিবে বলিয়া বিদায় লয়।

ফাঁড়া

(শ্রীসুধীরঞ্জন মল্লিক বি-এ)

১

শ্রীভাগবতের কথক তিনি, হরির অনুরাগী,
নিত্য তাঁহার অশ্রু ঝরে দীন দুঃখীদের লাগি।
জীবন তাঁহার পুণ্যব্রত, পাপ নাহি ত তাতে,
গণক বলে জীবন যাবে ব্যাঘ্র নখাঘাতে।
বিধির বিধি খণ্ডাবে কে? তাই ভাবিয়া মনে,
বাঁধেন জীবন হরির পদে আত্ম-সমর্পণে।
বর্ষফল যে বড়ই বিষম, এবার ফাঁড়া ভারী,
আত্মীয়েরা দেয়না যেতে ক্ষণেক গৃহ ছাড়ি।

২

বিপ্র কহেন বিশ্বনাথের ইচ্ছা যাহা হবে,
বিলম্বে তাঁর কার্য্য করা ক্ষুদ্রে কি সম্ভবে।
নিয়ম তাঁহার মঙ্গলময়, অন্য ভাবা দোষ,
শির পাতিয়া লবই লব দয়াময়ের রোষ।
কথকতায় নিমন্ত্রণ এক দূরকা বেলা হতে,
হঠাৎ এলো, যেতে তারে দেয় না কোনো মতে
ভক্ত ভাবেন যাবোই যাবো ভগবানের ডাকে,
হর্ষে লব বরণ করি ভাগ্যে যাহা থাকে।

৩

দিনে দেখিয়া যাত্রা করি, বিদায় লয়ে হেসে,
গেলেন তিনি বাঘের পুরী সাঁওতালেরি দেশে
নিত্য-নূতন নিমন্ত্রণে গ্রামান্তরে যান,
মুগ্ধ তাঁহার কথকতায় মুগ্ধ-সরল-প্রাণ।
শুনবে তাঁহার কথকতা সাঁওতালেরা সব,
কদিন ধরে তাহার লাগি চলছে মহোৎসব।
তাইতে আজি বিকাল বেলা স্বস্থ্য বালক মনে,
বিজন বনের ভিতর দিয়া চলেন আপন মনে।

৪

ডেকে ডাকিছে নিকট বনে, নেই সোকালয় কাছে
হঠাৎ তাঁহার পড়লো মনে কোষ্ঠীতে কি আছে।
বাঘের ডাকে চমকে উঠি দেখেন চারিধার,
একখন সাধু সময় হলো, নাইকো দেরী আর।
এ:প তুমি মাতৃরূপে পান করালে স্তন,
এখনকে এলো করালরূপে করবে আলিঙ্গন।
যদের তোমার স্নেহের ধারায় পুষ্ট হলো দেহ,
এখনকে এলো রক্তে আমার করবে অবলেহ।

৫

ভাষ দিয়া ত বাঘ পলালো বিপ্র গেলেন গ্রামে,
চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরে মধুসূদন নামে।
সকলে কথা পাগলো হঠাৎ উঠলো কেঁপে শির,
এক ব্যাথা লাগলো কাণে করলে যে অধীর।
সজন নাহি দিলেক তারা বাঘের নখর হাতে,
ভক্ত আপন কর্ণ চপল পরশ করেন তাতে।
সকলে ঝরে রুধির ধারা ত্রাস্ত সবাই দেখি,
সর্ব্ব শোণিত পড়লো আজি অলক্ষণ হায় একি?

৬

কহে বলেন ভয় করো না, দয়াল শ্রোতাগণ,
দেহে হরির করুণার এক নূতন নিদর্শন।
বাঘের হাতে মৃত্যু আমার ছিল ললাট-লেখা,
খণ্ডালো তা' বাঘ নখরের সঙ্গে হয়ে দেখা।
হরির কৃপায় ব্যাঘ্র এলো ক্ষুদ্র সূচী হয়ে,
চামুণ্ডা আজ ফিরলো শুধু রুধির কণা লয়ে।
রক্তাসব ব্যাঘ্র এসে পথেই গেছে ধায়,
ধন্য হরি প্রণাম করি তাঁহার রাঙ্গাপায়।

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য-প্রতিভা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(কালিদাস মিত্র এম, এ)

২৬। প্রণয়-মূলক নাটক।

গিরিশচন্দ্রের প্রণয়-মূলক উপাখ্যান-ঘটিত নাটকাবলীর মধ্যে 'ভ্রান্তি' সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। এই শ্রেণীর মধ্যে 'ভ্রান্তি', 'বিষাদ' 'মুকুল মুঞ্জরা' ও 'মনের মতন' এই চারিখানিই প্রধান। এই কয়খানি নাটকেই গিরিশচন্দ্র কি নিপুণতা সহকারে প্রেমের বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা দেখিলে বাস্তবিকই তাহাকে একজন সূক্ষ্মদর্শী মনস্তত্ত্ববিৎ সমালোচকের শীর্ষ আসনে বসাইতে ইচ্ছা হয়। প্রকৃত কলা-সমালোচকের ন্যায় তিনি এই অনুভূতির বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিরূপে নর-নারীর হৃদয়ে প্রেমের প্রথম মৃদু রশ্মিপাতে বাসনা-মুকুল ফুটিয়া উঠে, প্রেমই আবার কিরূপে সেই মুকুলকে প্রস্ফুটিত সুরভি কুসুমে পরিণত করে, কিরূপে অলক্ষ্যে প্রেম নরনারীর হৃদয়ে যাদুকরের মোহন করস্পর্শে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া পরকে আপন করিয়া ফেলে, ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বস্ব বিনিময়ে প্রেমিকাকে সুখী করিতে ও সুখী দেখিতে চায় গিরিশচন্দ্রের দক্ষ তুলিকা তাহার যথাযথচিত্র অঙ্কিত করিয়া এই নাটকাবলীর মধ্য দিয়া সুধী সমাজে উপহার দিয়াছেন। প্রেমে মানুষকে কি করিয়া দেবতা করিয়া তুলে, আঁধার হৃদয়ে প্রেমের আলোকপাতে কি অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য বিকাশ সম্ভব, কিসে প্রেমের চরম পরিণতি, নর-নারীর রূপজ প্রেম কোথায় কি ভাবে, কোন স্তরে মানবকে উন্নীত করিতে পারে, কিরূপে প্রেমই পৃথিবীতে স্বর্গ আনিয়া দিতে পারে, তাহা যদি দেখিতে চান তবে গিরিশচন্দ্রের এই শ্রেণীর নাটকাবলী পাঠ করুন।

'ভ্রান্তি' নাটকে মানব-চরিত্র বিশ্লেষণে গিরিশচন্দ্র স্বীয় প্রতিভার যে অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যে কোনও দেশের সাহিত্যের গৌরবের বিষয় হইতে পারিত। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য তাঁহার এই অপূর্ব্ব দান, গৌরবের সহিত জগৎ সমক্ষে দেখাইতে পারে। পরোপকার-মহাব্রতধারী 'রঙ্গলাল' চরিত্র বঙ্গ-সাহিত্যে একটী অভিনব বস্তু। এই রঙ্গলাল চরিত্রের মধ্য দিয়া গিরিশচন্দ্র প্রকৃত জ্ঞানী ও উপদেষ্টার মত যে উচ্চশিক্ষা নরনারীকে দিয়াছেন, যে মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে আপামর সাধারণকে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুধাবন যোগ্য। ধর্ম্ম কি, প্রকৃত ধর্ম্ম কাহাকে বলে, নিষ্কাম ধর্ম্ম ও তাহার অনুসরণে নিবৃত্তি-জনিত যে সুখ পাওয়া যায় তাহা কিরূপ রমনীয় যদি জানিতে চান, তাহা হইলে 'রঙ্গলাল' চরিত্র অনুশীলন করুন।

বুঝিবার ভুলে 'নিরঞ্জন' ও 'পুরঞ্জন' দুই বন্ধু স্ব স্ব প্রেমিকাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিতেছেন, অথচ তাঁহারা দুইজনে আবাল্য-সহচর, অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ। প্রেমের সন্দেহ তাঁহাদের মনে উপস্থিত হইলেও তাহাতে ঈর্ষার জ্বালাময়ী বহ্নি নাই। বন্ধুত্বের খাতিরে তাঁহারা উভয়েই স্বার্থ বা রমণী-প্রণয় বলিদান দিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের বন্ধুত্ব নিষ্কলঙ্ক, অপার্থিব, আদর্শ স্থানীয়। রমণী-প্রেম প্রকৃত বন্ধুত্ব-পরীক্ষার যন্ত্র স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে পরীক্ষায় নিরঞ্জন-পুরঞ্জন উভয়েই উত্তীর্ণ হইয়া প্রকৃত বন্ধুত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। অপর পক্ষে 'মাধুরী' ও 'ললিতা' বাল্যকাল হইতে একত্রে ললিতা, পরস্পরের একান্ত অনুগতা সখী।

অনঙ্গদেব স্বীয় কুসুমায়ুধের দ্বারা এই দুইটী কুমারী হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছেন। বুঝিবার ভুলেও ইহারা স্ব স্ব প্রেমিককে অবিশ্বাসী ও চঞ্চল প্রকৃতির লোক ভাবিতেছেন, কিন্তু ইঁহার উভয়েই স্বীয় প্রাণসখীর অনিষ্টাশঙ্কায় ব্যাকুল, তাই স্বীয় স্বার্থ বিসর্জ্জনে প্রেমের মন্দিরে আপন আপন জীবন আহুতি দিয়া স্বীয় সখীর সুখ-সাধন-প্রয়াসী। এই বিষম ভুলের ফলে নাটকখানি বিয়োগান্ত (tragedy) হইয়া উঠিতেছিল ; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সেরূপ অভিপ্রায় না থাকায়, এই বিষম ভুলের সংশোধন হইয়াছিল। যদিও এই ভুল-সংশোধন করিতে গিয়া মাধুরীর পিতা রাজসাহীর জমিদার উদয়নারায়ণের ও নিরঞ্জনের পিতা রাজমহলের জমিদার শালিগ্রামের মধ্যে বিষম বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল ও পরিণামে উদয় নারায়ণের নবাব-বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বহু শোণিতপাত প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছিল ; নাটকখানি কিন্তু বিয়োগান্ত হয় নাই। গিরিশচন্দ্র ইহাকে মিলনান্ত করিয়াছেন, কিন্তু সে মিলন শ্মশানের চিতাধূমের পার্শ্বে সংঘটিত হইয়াছে। পতিপ্রাণা সতী সাধ্বী উদয়নারায়ণের পত্নী অন্নদার সহমরণ-চিতা-ধূমান্বিত-স্মৃতি মিলনে মধুর! উদয়-নারায়ণ ও শালিগ্রামের মধ্যে কলহ বাঙ্গালার তদানীন্তন ভূস্বামী সমাজের একটী যথাযথ চিত্র। কি বিষম ভুল, কি হঠকারিতার বশে জমীদার গণ স্ব স্ব প্রতিবেশী ভ্রাতার সর্ব্বনাশ সাধনে পিশাচ প্রকৃতিতে পরিণত হইতেন ও পরিণামে অন্তর্বিদ্রোহজাত বলক্ষয়ে নিজেদের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিতেন, এই দুই ভূস্বামীর কলহের বিবরণ হইতে জানা যায়। শালিগ্রামের নিধন-সাধন ব্যাপারে স্বদেশীয় প্রতিবেশী ভ্রাতার রক্তে হস্ত অনুরঞ্জিত করিয়া উদয়নারায়ণ যে পাপ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহারই অনিবার্য্য ফলে তাঁহার জীবন আত্মহত্যা রূপ নিরয়-পন্থা প্রদর্শক শোচনীয় পরিণামে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বোধ হয় তদগতঃ প্রাণা সতী সাধ্বী পত্নী অন্নদার নির্ম্মল প্রেমের অগ্নিতে পুড়িয়া উদয় নারায়ণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল। পতি-পত্নীতে সংসারে অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর পরপারে গিয়া পত্নীর প্রেমের বলেই উদয় নারায়ণকে বোধ হয় নিরয়-ভোগ করিতে হয় নাই।

'মাধুরীর' চরিত্র-মাধুরীতে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়। 'প্রেম যে চুপে চুপে তাহার মনেরই অন্ধকূপে' আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কিশোরী অনুভব করিত, সে অমৃতমদিরা পানে সে বিহ্বল হইত ; কিন্তু সে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিত না। কি এক আবেশে কুমারীর তরুণ হৃদয় ভরিয়া আসিতেছে, অথচ সে ইহার কারণ ভালরূপে বুঝিত না। কস্তুরী মৃগ যেমন স্বীয় সুবাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকে, অথচ সেই গন্ধে ব্যাকুল হয়, সেইরূপ এই বালিকার হৃদয়-কোরক প্রেমের প্রথম মৃদু আলোক স্পর্শে মুকুলিত হইয়াছে, আশা নিরাশার মৃদু বায়ু হিল্লোলে ঈষৎ ঈষৎ হেলিতেছে দুলিতেছে, অনাঘ্রাত সদ্য প্রস্ফুটিত এই কুসুমটীর কোমল মধুর সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়াছে, তথাপি বালিকা বুঝিতে পারিতেছে না যে, প্রণয় তাহার অজ্ঞাতে আসিয়া তাহার মোহিনী সোণার কাটির সংস্পর্শে তাহার হৃদয়ে এরূপ ভাবের লহর তুলিতেছে, তাহাকে এরূপ উন্মনা করিয়াছে। * প্রথম অঙ্কের প্রথমে গর্ভাঙ্কের

---

* এই সুচিন্তিত প্রবন্ধ আমার কনিষ্ঠ সহোদরের লেখা। আমি কীট-দষ্ট পত্র হইতে বহুকষ্টে এগুলির উদ্ধার করিয়া সম্পাদন করিয়া আসিয়াছি। পরবর্ত্তী অংশের উদ্ধার করা সম্ভব-পর নয় ও শেষাংশের পাণ্ডুলিপিও খুঁজিয়া পাই নাই। বন্ধু-বান্ধবদের উপরোধ এড়াইতে প্রবন্ধটী শেষ করিতে হইবে। এই শেষাংশের বক্তব্যের জন্য আমার স্বর্গীয় ভ্রাতা কোনরূপে দায়ী নয়। তবে তাহার মতামত আমি বেশ ভালরূপ জানিতাম বলিয়া আশা করিতে পারি যে আমার মতও অনেকটা তাহার মতেরই অনুযায়ী হইবে।

শ্রীচারু চন্দ্র মিত্র

মাধুরীও গঙ্গার কথোপকথন পাঠ করিলে মাধুরীর তৎকালের চিত্র বেশ ফুটিয়া উঠে। ভালবাসা একবার হৃদয়ে জন্মিলে যে মানসিক অবস্থা হয়, গিরিশচন্দ্র তাহা গঙ্গার মুখে যে গীত দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিলাম :—

একি দায় মন কেন তায় চায়।
পায় কিনা পায় ভাবে না হায়, উধাও হয়ে ধায়॥
অঘোরে সোহাগভরে, আপনি বিকোয় কিনতে পরে,
আশা ধরে আকুল অন্তরে, কাঁপে আশা প্রাণ কাঁপায়॥
মনে মনে উঠা গড়া, মনে মনে ভাঙ্গা গড়া,
আকুল সাগরে ভাসে সাধ করে,
কাঁদে প্রাণ ফিরতে ফুলে,সাধের তরী বয়ে যায়।

'ললিতা' 'মাধুরী' অপেক্ষা সজীব, বুদ্ধিমতী, কর্ম্ম-কুশলী। ললিতা নিরাশ-প্রণয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বীয় সখী মাধুরীর সুখের জন্য সন্ন্যাসিনী হইয়া পুর-ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু বেশ-ধারণ করিলেই যে সন্ন্যাসিনী হওয়া যায় না, তাহা গিরিশচন্দ্র চতুর্থ অঙ্কে প্রথম গর্ভাঙ্কে দেব-মন্দিরে ললিতা ও গঙ্গার কথোপকথন হইতে বেশ বুঝাইয়াছেন।

গঙ্গা। আপনি কি উদাসিনী হয়েছেন?

ললিতা। না, আমার বেশ দেখে ভুলো না। যেমন তোমার বেশ দেখে বোধ হয় তুমি প্রণয়হীনা বারবিলাসিনী, কিন্তু দেখ্‌ছি তুমি তা নও। নারী নারীই থাকে। কৈ—উদাসিনী ত হওয়া যায় না!

গ। আপনি কি গৃহ ত্যাগ করে এসেছেন?

ল। আমার কখনো গৃহ ছিল না, ত্যাগও করি নাই, আমি চিরদিন সংসারে একাকিনী। তবে গৃহের বাসনা ছিল, আজও যে নাই, তা বলতে পারি নে। অনেক দিনের বাসনা, অনেক যত্নে রত্ন করেছি, কত সোহাগ করেছি, কত তার মধুময় কথা শুনেছি, তারে ছাড়্‌বো মনে করি, ছাড়তে পারি না। তখন সে আদরিণী ছিল, সোহাগিনী ছিল, এখন সে সাপিনী—দংশন করছে; তবু তার সেই আদরই আছে, সেই সোহাগই আছে।

গ। যা ছাড়া যায় না, তবে তারে ছাড়্‌বার চেষ্টা কেন করছেন? কেন ফিরে যান না?

ল। ফির্‌বো কোথায়? ফিরে কি কর্‌বো? আমার সোহাগই আমায় ফির্‌তে দেয় নাই। আচ্ছা তুমি কি এখনো বল' যে যারে ভালবাসে, তারে সুখী দেখে তার সুখ?

গ। তারে দেখে সুখ, তারে ভেবে সুখ, তার কথায় সুখ, তারে নিয়ে দুঃখে সুখ।

বাস্তবিক গঙ্গার মুখ দিয়া গিরিশচন্দ্র যে ধ্রুব সত্য বলাইয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রণয়ভাজনকে, দেখিয়া সুখ, তাহার কথায় সুখ—স্মরণে সুখ। তাঁহার সংসর্গে দুঃখ সুখে রূপান্তরিত হইয়া যায়। প্রকৃত প্রেমিকের দয়িতাই তাহার 'ধ্যান জ্ঞান মন প্রাণ'। —'ধর্ম্ম কর্ম্ম জীবন স্বর্গ'। আর ললিতার এই প্রেমের মোহন ছবি সচক্ষে দেখিয়াই রামবৃত্তি চরিতার্থ করিতে আসিয়া সারদরাজ খাঁ নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলেন। রঙ্গলালের চরিত্রের ভিতর দিয়া গিরিশচন্দ্র যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চাই। মানুষই দেবতা—ভগবানের অংশ। প্রাণময় মানুষের সেবা করলে মনে যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় তাহার তুলনা হয় না। মানুষের সেবায় অর্থ-ব্যয়িত হইলে সে অর্থ সদুপায়ের সার্থকতা আছে। মূর্ত্তিপূজাতে ভগবানের সত্তা আছে মুখে বলিলে চলিবে না—কার্য্যে দেখাইতে হইবে যে ভগবান সর্ব্বজীবে বিরাজ করিতেছেন। মানুষকে ছোট করিয়া দেখিলে চলিবে না; দুষ্কর্ম্মের আশ্রয় লইলেও চলিবে না। মানুষ যদি মানুষের সেবা করিতে পায় তাহা হইলেই তাহার জীবন সার্থক। গিরিশবাবু রঙ্গলালের মুখে বলাইয়াছেন 'আমি যেন দু একটা দুঃখী মানুষকে ভাত দিতে পারি, যে শীতে কাঁপ্‌চে তাকে একখানা কম্বল দিতে পারি, তা হ'লেই আমি চরিতার্থ হব।' মানুষ 'দেবতার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি।' তাহার স্বরূপ

চিনিবার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ভাই মানব! তুমি যদি প্রকৃত বল পাইতে চাও তবে স্বার্থকে ত্যাগ কর—পরের ভাবনা ভাব, ধর্ম্মের জন্য পরের কাজ করিলেও তাহাতে স্বার্থ আছে; নিঃস্বার্থভাবে পরের জন্য কাজ কর। 'স্বার্থ কভু উচ্চ কার্য্য না করে সাধন' এটী খাঁটী সত্য কথা। 'আর মানুষ বড় দুঃখী, তাকে ভালবেসো'। এই বড় কথাটা বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদকুলিখাঁকে সামান্য চিকিৎসা-ব্যবসায়ী রঙ্গলাল প্রাণের আবেগে একবার বলিয়া ফেলিয়াছিল। মানুষকে ভালবাসিয়া জননী জন্মভূমির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। দেশের প্রতি অনুরাগী হইতে হইলে খাঁটি স্বদেশী হইতে হইবে—অশনে বসনে ভূষণে স্বদেশী হইতে হইবে। আর এই স্বদেশানুরাগ-প্রণোদিত হইয়া রঙ্গলাল প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার উদয় নারায়ণকে বলিতে পারিয়াছিলেন,—'আপনার সম্পূর্ণ যবনের প্রতি অনুরাগ স্বদেশের প্রতি নয়। আপনার যে অঙ্গের পরিচ্ছদ, এ কার হাতে প্রস্তুত? যবনের! দিন দিন যে রাজভোগ প্রস্তুত হয়, তা কার অনুকরণে? যবনের! কার দোকান হ'তে আসবাব দ্রব্য করে, আপনার রাজপ্রাসাদ সজ্জিত? যবনের। যবন পরিত্যাগ ক'রে, কোন হিন্দুশিল্পীকে উৎসাহ দেন? যবন গোলাম মহম্মদ আপনার বন্ধু, সে হিন্দু নয়। যবনকে আপনি ঘৃণা করেন না। তবে নবাবের প্রতি ক্রোধ হয়েছে তাই বিদ্রূপে সজ্জিত হচ্ছেন।'

প্রকৃত স্বদেশ-সেবা করিতে হইলে কি করা উচিত তাহা ২০ বৎসর পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। শুধু আকারে ইঙ্গিতে আভাষ দেন নাই—স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে স্বর্গগত কবি মনোমোহন বসু মহাশয় দুঃখ করিয়া গাহিয়াছিলেন,—

এখন "ফ্যাসন্যালিটি" আর "লিবার্টি" কথায়
কথায় কয়,
কাজের বেলা বিজাতী চাল স্বজাত ঠেলা রয়!'

* * *

দুটো বক্তিতা করেই ভাবে (দেশের)
প্যারিবন্ডী তারা,
ধরে নাম পেটি-ঘটি কাজে প্যাচটি পেটে স্বার্থ
পোরা।"

স্বদেশ-সেবা করিতে হইলে স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। মানুষকে ভালবাসিতে হইবে। প্রেমের ডোরে সকলকে বাঁধিতে হইবে। সনাতন ভারতের ইহাই ছিল ধর্ম্ম। পরবশে থাকিয়া পরপ্রত্যাশী হইলে দেশের দুর্দ্দশা কোন দিনই ঘুচিবে না। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমাদের সুপ্ত কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে জাগ্রত করিবার জন্য মনোমোহন বাবু দুঃখে গাহিয়াছিলেন,—

"দিনের দিন সবে দীন হ'য়ে পরাধীন
অন্নতাবে ক্ষীণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ,
অপমানে শুষ্ক ক্ষীণ!
*
তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার
সুতা জাঁতা টেনে অন্ন মিলা ভার
দেশী বস্ত্র অন্ন বিকায় না আর
হায় দেশের কি দুর্দ্দিন!
ছুঁইস্থতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে
দিয়াশালাই কাটি তাও আসে পোতে
প্রদীপটী জ্বালিতে খেতে শুতে যেতে
কিছুতেই লোকে নয় স্বাধীন।"

এক কথায় তিনি আত্মনির্ভরশীল হইতে বলিয়াছিলেন ঠিক এই ভাবেই ১৩০৮ সালে আমাদের জাতীয়-কবি করুণানিধান আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে 'বঙ্গ মঙ্গলে' গাহিয়াছেন,—

"একটা কি প্রাণ নেই এত বড় দেশে
বড়ের মতন আসে নেশা সর্ব্বনেশে?
সাথে আনে শত শত কলকারখানা—
সাগরে মিশাবে দেয় আশার মোহনা!—

চিমনির ধূমপুঞ্জে ছায় নীলাকাশ,
বঙ্গের সর্ব্বত্র বয় উতাস বাতাস !—
চালায় সুতার কল, যোগায় কাপড়,
জ্বালায় পাথর ভেঙ্গে লোহার হুকুর
কাচের কারখানা খোলে, কমলা উঠায়,"

তার পর আমাদিগকে লজ্জা দিবার জন্য কবি গাহিলেন,—

"চিরদিন রহিব কি ঘৃণিত ভিখারী,
পর-পরিত্যক্ত জীর্ণ পরিচ্ছদ ধারী !
জননীর শাক-অন্ন অবজ্ঞায় ঠেলে'
ঘুরিতে পরের দ্বারে যদি ভিক্ষা মেলে !"

এই সকল ভাবের অগ্রদূতের ও অন্যান্য মনীষীদের ভাবের প্রেরণায় "স্বদেশীর যুগ" হইতে আমরা ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আত্মনির্ভর শীল হইতে আর আমাদের মনে হয় দেশে জাতীয়ভাব আনিতে হইলে গিরিশচন্দ্র প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত।

ভ্রান্তির আখ্যায়িকা "মুরশীদাবাদ কাহিনী" হইতে গৃহীত। (ক্রমশঃ)

প্রেমের জয়

(গল্প)

(শ্রীমতী খুরশিদজাঁহা বেগম)

(১)

লণ্ডনের ক্ষুদ্র পল্লীতে একটী সুসজ্জিত ড্রইংরুমে ২৬।২৭ বৎসরের একটি যুবক বিষণ্ণ-চিত্তে ললাটে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন। আজ সে আদালতে "ডাইভোর্স কেসে" জয়লাভ করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব ধনের মত বিচ্ছিন্ন করিয়া আসিয়াছে। নবেম্বর মাসের শীতের অপরাহ্ণ সত্ত্বেও মানসিক উদ্বেগে তাহার ললাট বহিয়া ঘাম ঝরিতেছে। জোন্স মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, আমি জয়লাভ করিলাম বটে, কিন্তু লুইসি তাহার উপর ন্যায্য অভিযোগের একটিও প্রতিবাদ করিল না ? তবে কি সে নির্দ্দোষী, অভিমানভরে কোন উত্তর দিল না। তাই যদি হয়, তাহ'লে আমার এই অন্যায় আচরণের জন্য কি শাস্তি হবে ? না, না এটা আমার অপরিমিত ভালবাসার কল্পনা ; সে সত্যিই যদি নির্দ্দোষী হ'ত তাহ'লে নিশ্চয়ই আদালতে সপ্রমাণ করে আমাদের জীবন আবার মধুময় ক'রে তুলত।

"এই সেই ঘর যেখানে আমরা কত সুখে, কত আমোদে কাটিয়েছি ; এই সেই ঘর যার প্রতি কোণটীতে পর্য্যন্ত তাহার মধুময় স্মৃতি জড়িত আছে। সব জিনিষই তেমনি সাজানো আছে, এবং প্রত্যেক দ্রব্যে তাহার সুকোমল হস্তের দাগ এখনও পর্য্যন্ত মিলায় নাই, কিন্তু সব শূন্য। আমি আদালত হ'তে বেরিয়ে এলাম রাস্তায় কত পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু সকলেই যেন তাচ্ছিল্যভরে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। তাড়াতাড়ি বাড়ীতে চলে এলাম তাও ত নিস্তার নাই, বাড়ীর প্রত্যেকটী জিনিষ আমাকেই অপরাধী ভেবে তাকিয়ে আছে। না এখানে এ ভাবে বসে থাকলে পাগল হয়ে যাব।" এই ভেবে সে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়।

(২)

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। লণ্ডন মহানগরী আলোকমালায় বিভূষিত হইল। হাইড পার্কে ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল, বিবিধ রংএর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকাতে পার্ক সব

গরম হইয়া উঠিল। যখন সকলেই আমোদে উৎফুল্ল, এমন সময় উস্ক-খুস্ক বেশে, শুষ্কমুখে নিঃশব্দে একটী যুবক পার্কে প্রবেশ করিয়া, চারিদিকে সন্ত্রস্ত-নয়নে চাহিয়া নির্জ্জন একখানি বেঞ্চে বসিল। যুবকটির নাম জোন্স। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত 'হাইড্ পার্কে' জোন্স নীরবভাবে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, সমস্ত দিন যে কিছু আহার হয় নাই। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সম্মুখের একটী হোটেলে ঢুকিয়া পড়িয়া "বয়কে" খানা আনিবার জন্য আদেশ করিল। আহার আসিলে সে আহার করিতে বসিল, এবং তাহার মনে হইল এই সেই হোটেল এবং এই সেই টেবিল, যথায় তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহারা বিবাহ-রজনীতে আসিয়া ডিনার খাইয়াছিল। এই সব চিন্তা তাহার মনে হওয়ায় সে হৃদয়ে দারুণ জ্বালা অনুভব করিল এবং মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, বিল চুকাইয়া দিয়া হোটেল হইতে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে বাহির হইয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়া একটী যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "মিঃ জোন্স, তোমাদের মামলার না আজ দিন ছিল—তাহার কি হইল?" জোন্স এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া যেমন চলিয়া যাইবে, তখন আগন্তুক পুনরায় বলিল, "আমি শুন্‌লাম তুমি তালাক করেছ কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌লাম, না মিসেস জোন্স আপত্তি করেন নাই কেন? তাঁরও আপত্তি করা উচিত ছিল।"

জোন্স অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তুমি আমাকে পথ ছেড়ে যাও তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে কোন আলোচনা করিতে চাই না।" আগন্তুকটি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "তা চাইবে কেন, কিন্তু মনে রেখো, তুমি একটী মস্ত ভুল করলে ও একটী নিরপরাধিনী বালিকার মধুময় জীবন জন্মের মত বিষময় করে দিলে এবং এর জন্য একদিন তোমাকে অনুতাপ কর্‌তে হবে।" বলিয়াই যুবক ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেল।

(৩)

জেমিলিক কোন বিখ্যাত বণিকের একমাত্র পুত্র। তাহার সহিত লুইসির খুব আলাপ ছিল। জেমিলিকের উপর সন্দেহ হওয়াতে জোন্স আদালতে কেস করে। কিন্তু লুইসি আদালতে কোন প্রতিবাদ করে নাই, পূর্ব্বেই তা বলা হইয়াছে। জোন্সহোটেল হইতে বাহির হইয়া সোজা বাড়ীতে গেল। গৃহে পৌঁছিয়া সে ওভারকোট ও কিছু টাকা লইয়া বাড়ী বন্ধ করিয়া চাবি উকীলের বাড়ীতে দিয়া আসিল এবং বাড়ীটাকে ভাড়া দিতে বলিয়া সে সোজা ষ্টেসনে গেল।

ট্রেণের সময় হইলে, প্যারিসের টিকিট কিনিয়া কিছু দিনের জন্য দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইল। ট্রেণে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলে, জেমিলিকের কথাগুলি তাহার মনে পড়িল এবং ভাবিতে লাগিল,"জেমিলিক যেরূপ নির্ভয়ে ও অসঙ্কোচে আমার সহিত আলাপ করিল, তাহাতে মনে হয় যেন তাহারা নির্দ্দোষী। সত্যই কি আমি নিজের পায়ে নিজে কুড়ল মারিলাম? নিজের হৃদয় নিজে ছেদন করিলাম? না-না ইহা ভুল, জেমিলিক আমাকে দৈবগতিকে দেখিতে পাইয়া সাফাই গাহিয়া গেল।" জোন্স পাগলের ন্যায় ভাবিতে লাগিল ও সন্দেহ দোলায় দুলিতে দুলিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

(৪)

ঘটনার পর তিনমাস অতীত হইয়াছে। ফেব্রুয়ারীর প্রচণ্ড শীতে লণ্ডন সহর কম্পিত। ঘন কুয়াশায় সহর আবৃত। কেবল অসংখ্য দীপালোকে উদ্ভাসিত বলিয়া বাড়ীঘর অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। এমনি একটী সন্ধ্যায় হতভাগ্য জোন্স লণ্ডনে পৌঁছিল। সংবাদ লইয়া জানিল তাহার বাড়ী ভাড়া হইয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া সে একটি হোটেলের কামরা ভাড়া লইল। এই তিনমাসে জোন্সের অসম্ভব রকম পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, সে সুপুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিল, এখন দেখিলে তাহাকে যেন ছয়মাসের রোগী বলিয়া

ভ্রম হয়। শুধু মানসিক যন্ত্রণায় তাহার এই দুর্দশা হইয়াছে। হোটেলে থাকিয়া যখন তাহার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, সে একদিন বাড়ীতে আসিয়া দেখিল বাড়ীর দরজা খোলা। মনে করিল বোধ হয় কোন ভাড়াটিয়া এসেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গৃহে কোনরূপ সাড়াশব্দ নাই। লোক সমাগমজনিত সাড়াশব্দ ও নাই। ইহাতে সে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। জোন্স ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া সব ঘর দেখিল—যেমনটি পূর্ব্বে ছিল—এখনও তেমনি। এতটুকুও পরিবর্ত্তন বোধ হইল না, এবং আরও দেখিল তাহাদের শয়ন গৃহের মোটা লাল পরদার অন্তরাল হইতে ক্ষীণ আলোক-রশ্মি আসিতেছে। তবে কি ঘরে চোর ঢুকিয়াছে? জোন্স কম্পিতপদে শয়নগৃহে ঢুকিয়া নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। ইহা কি কখন সম্ভব না স্বপ্ন? তখন সে ধীরে ধীরে সোফার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল লুইসি চিবুকে হস্ত স্থাপন করিয়া নীরবে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন। জোন্স দশ মিনিট পর্য্যন্ত প্রাণ ভরিয়া সেই নিশ্চল প্রতিমাকে মুগ্ধ-নয়নে দেখিয়া যখন তাহার আশা আর মিটিল না, সে তখন আবেগ-ভরা কণ্ঠে ডাকিল, "লুইসি!" এই অপ্রত্যাশিত আহ্বানে লুইসী ত্রস্তা হরিণীর ন্যায় চমকিত হইয়া গ্রীবা উত্তোলন পূর্ব্বক জোন্সকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

একটু পিছনে সরিয়ে জোন্স লুইসের আরও নিকটে সরিয়া গিয়া করুণ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল। হায়, এই হাসি, যে হাসি তাহার জীবনের একমাত্র সুখ-শান্তি ছিল, যাহার রূপের জ্যোতিতে তাহার গৃহ আলো ছিল। যাহাকে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে রাখিয়াও তৃপ্তি হইত না; সেই প্রাণাধিকা লুইসি এত নিকটে দাঁড়াইয়া আছে, তবুও তাহাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিবার তাহার ক্ষমতা নাই। হায় লুইসি আজ মেসিলিকার অর্দ্ধাঙ্গিনী। না-না, তাহলে কখনই সে এখানে আসিত না। এই সব নানা কথা জোন্সের মনে পড়িয়া হৃদয়কে তোলপাড় করিয়া তুলিল লুইসি জোন্সকে নীরব দেখিয়া অতি ধীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি বিরক্ত হয়েছ,—আমার এই অনধিকার প্রবেশের জন্য?" জোন্স নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "কখনও না লুইসি, তবে জিজ্ঞাসা করিতে পারি তুমি কেমন করিয়া এ বাড়ীতে এলে?"

লুইসি বলিল, "এই বাড়ীখানি দেখবার জন্য আমার সর্ব্বদাই আগ্রহ হত। আজ নিতান্ত না থাকতে পেরে, উকিলের নিকট থেকে চাবি এনে এ বাড়ীতে ঢুকেছি।" এই বলিয়া ড্যাল্ ড্যাল্ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

জোন্স বলিল, "তুমি অবাধে এখানে আসতে পার, এই চাবি তোমার নিকটেই থাক। লুইসি, মনে পড়ে এই ঘরটীকে তোমার মনমত সাজাইবার জন্য আমি কত চেষ্টা কত যত্ন করেছিলুম।"

লুইসি বিষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "হাঁ, খুব মনে পড়ে, তোমার অনুগ্রহের জন্য তোমাকে শত ধন্যবাদ।"

জোন্স তখন কাতর স্বরে বলিতে লাগিল, "লুইসি, আমার জন্য তুমি কইভোগ করেছ কিন্তু তুমিও ত কোনরূপ প্রতিবাদ করনি; তুমি যদি আদালতে প্রমাণ করতে নির্দ্দোষী,—তা'হলে আবার আমাদের আনন্দের জীবন ফিরে আসতো।" এই বলিয়া সে দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

লুইসি স্বাভাবিক-স্বরে কহিল, "আমি জানি আমি নির্দ্দোষী, আদালতে প্রমাণ করতে যাব কেন? আমার বিশ্বাস ছিল, একদিন না একদিন তুমি তোমার ভুল বুঝিতে পারিবে—সেইজন্য আমি কিছুই বলি নাই।" ইহা বলিয়া লুইসি জোন্সের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন জোন্স লুইসির দক্ষিণ হস্তখানি নিজ হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "লুইসি, আমি তোমার সব কথাই বুঝলাম। এখন আমার সমস্ত ভুল বুঝিতে পারিলাম।

জোন্স তৎক্ষণাৎ লুইসির মৃণাল নির্ম্মিত হস্ত দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া আবেগ পরিপূর্ণ ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—"লুইসি বল, তুমি আমাকে ক্ষমা কর্‌লে? যদি তুমি ক্ষমা না কর—কি করিয়া তোমার সাম্‌নে দাঁড়াইব?" বলিয়া লুইসির দিকে অপলক দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল।

লুইসী এতক্ষণ নিজের অগাধ প্রেম পরিপূর্ণ হৃদয়কে বহুকষ্টে সংযত করিয়া রাখিয়াছিল। জোন্সের আকুল অনুরোধে সে পাগলিনীর ন্যায় প্রিয়তমের বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। জোন্স গভীর অনুরাগে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখখানিকে তুলিয়া ধরিয়া একটী চুম্বন রেখা অঙ্কিত করিয়া দিল।

সঙ্কলন

উপসংহার

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভোজরাজের দেশে মেয়েটি ভোর বেলাতে দেবমন্দিরে গান গাইতে যায়। সে ছিল কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে।

আচার্য্য বলেন, একদিন শেষরাত্রে আমার কানে একখানি সুর লাগল। তারপর যখন সাজি নিয়ে পারুলবনে ফুল তুলতেগেছি তখন মেয়েটিকে ফুলগাছ তলায় কুড়িয়ে পেলুম।"

সেই অবধি আচার্য্য তাকে আপন তম্বুরাটির মত কোলে নিয়ে মানুষ করেচে; মুখে যখন কথা ফোটেনি এর গলায় তখন গান জাগ্‌ল।

আজ আচার্য্যের কণ্ঠ ক্ষীণ, চোখে ভাল দেখেন না। মেয়েটি তাঁকে শিশুর মত মানুষ করে।

কত যুবা দেশ বিদেশ থেকে এর গান শুন্‌তে আসে। তাই দেখে মাঝে মাঝে আচার্য্যের বুক কেঁপে ওঠে, বলেন,—"যে বোঁটা আলগা হয়ে আসে ফুলটি তাকে ছেড়ে যায়।"

মেয়েটি বলে, "তোমাকে ছেড়ে আমি এক পলক বাঁচিনে।"

আচার্য্য তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বলেন, "যে গান আজ আমার কণ্ঠ ছেড়ে গেল, সেই গান তোরই মধ্যে রূপ নিয়েচে। তুই যদি ছেড়ে যাস্ তাহলে আমার চিরজন্মের সাধনাকে আমি হারাব।"

২

ফাল্গুন পূর্ণিমায় আচার্য্যের প্রধান শিষ্য কুমার সেন গুরুর পায়ে একটি আমের মঞ্জরী রেখে প্রণাম করলে। বল্‌লে, "মাধবীর দেখা পেয়েচি, এখন প্রভুর যদি সম্মতি পাই তাহলে দুজনে মিলে আপনার চরণ সেবা করি।"

আচার্য্যের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌ল। বল্‌লেন, "আন দেখি আমার তম্বুরা। আর তোমরা দুইজনে রাজার মত রাণীর মত আমার সামনে এসে বস।"

তাম্বুরা নিয়ে আচার্য্য গান গাইতে বস্‌লেন। দুলহা-দুলহার গান সাহানার সুরে। বল্‌লেন, "আজ আমার জীবনের শেষ গান গাব।"

এক পদ গাইলেন। গান আর এগোয় না, বৃষ্টির ফোঁটায় ভরে'ওঠা জুঁই ফুলটির মত হওয়ায় ঝাঁপতে কাঁপতে থেমে পড়ে। শেষে তাম্বুরাটী কুমার সেনের হাতে দিয়ে বল্‌লেন, "বৎস, এই লও আমার যন্ত্র।"

তারপরে মাধবীর হাতখানি তার হাতে তুলে দিয়ে বল্‌লেন, "এই লও আমার প্রাণ।"

তারপরে বল্‌লেন, "আমার গানটি দুজনে মিলে শেষ করে যাও, আমি শুনি।"

মাধবী আর কুমার গান ধরলে—সে যেন আকাশ আর পূর্ণ চাঁদের কণ্ঠ মিলিয়ে গাওয়া।

৩

এমন সময় দ্বারে এল রাজদূত, গান থেমে গেল।

আচার্য্য কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আসন থেকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজের কি আদেশ?"

দূত বল্‌লে, "তোমার মেয়ের ভাগ্য প্রসন্ন, মহারাজ তাকে ডেকেছেন।"

আচার্য্য জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ইচ্ছা ওঁর?"

দূত বল্‌লে, "আজ রাত পোয়ালে রাজকন্যা কাম্বোজে পতিগৃহে যাত্রা করবেন, মাধবী ওঁর সঙ্গিনী হয়ে যাবে।"

রাত পোয়াল, রাজকন্যা যাত্রা করলে।

মহিষী মাধবীকে ডেকে বল্‌লে, "আমার মেয়ে প্রবাসে গিয়ে যাতে প্রসন্ন থাকে সে ভার তোমার উপরে।"

মাধবীর চোখে জল পড়ল না, কিন্তু অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে যেন রৌদ্র ঠিকরে পড়ল।

রাজকন্যার ময়ূর-পংখী আগে যায়, আর তার পিছে যায় মাধবীর পাল্কী। সে পাল্কী কিংখাবে ঢাকা, তার দুই পাশে পাহারা।

পথের ধারে ধূলোর উপর বড়ো তলা অশ্বত্থ তালের মত পড়ে রইলেন আচার্য্য, আর স্থির দাঁড়িয়ে রইল কুমার সেন।

পাখীরা গান গাইছিল পলাশের ডালে, আমের বোলের গন্ধে বাতাস বিহ্বল হয়ে উঠেছিল। পাছে রাজকন্যার মন প্রবাসে কোনো দিন ফাল্গুন সন্ধ্যায় হঠাৎ নিমেষের জন্য উতলা হয় এই চিন্তায় রাজপুরীর লোকে নিঃশ্বাস ফেল্‌লে।

"ভারতী"—বৈশাখ ১৩২৯।

পরীর পরিচয়

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১

রাজপুত্রের বয়স কুড়ি পার হয়ে যায়, দেশ বিদেশ থেকে বিবাহের সম্বন্ধ আসে।

ঘটক বল্‌লে, "বাহ্লীক রাজার মেয়ে রূপসী বটে, যেন শাদা গোলাপের পুষ্পবৃষ্টি।"

রাজপুত্র মুখ ফিরিয়ে থাকে, জবাব করে না।

দূত এসে বল্‌লে, "গান্ধার রাজার মেয়ের অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য ফেটে পড়চে, যেন প্রাক্‌কালতার আঙুরের গুচ্ছ আর ধরে না।"

রাজপুত্র শিকারের ছলে বনে চলে যায়। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, ফিরে আসে না।

দূত এসে বল্‌লে, 'কাম্বোজের রাজকন্যাকে দেখে এলেম; ভোরবেলাকার দিগন্ত-রেখাটীর মত তার বাঁকা চোখের পল্লব, মিশিয়ে দিয়ে, আলোতে উজ্জ্বল।"

রাজপুত্র ভর্তৃহরির কাব্য পড়তে লাগ্‌ল, পুঁথি থেকে চোখ তুল্‌লে না।

রাজা বল্লে, "এর কারণ? ডাক দেখি মন্ত্রী-পুত্রকে।"

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা বল্‌লে, "তুমি ত আমার ছেলের মিতা, সত্য করে বল, বিবাহে তার মন নেই কেন?"

মন্ত্রীর পুত্র বল্‌লে, "মহারাজ যখন থেকে তোমার ছেলে পরীস্থানের কাহিনী শুনেচে সেই অবধি তার কামনা সে পরী বিয়ে করবে।"

২

রাজার হুকুম হল পরীস্থান কোথায় খবর চাই।

বড় বড় পণ্ডিত ডাকা হল, যেখানে যত পুঁথি আছে তারা সব খুলে দেখ্‌লে। মাথা নেড়ে বল্‌লে, "পুঁথির কোন পাতায় পরীস্থানের কোন ইসারা মেলে না।"

তখন রাজসভায় সওদাগরদের ডাক পড়্‌ল। তারা বল্‌লে, "সমুদ্র পার হয়ে কত দ্বীপই ঘুরলেম,—এলা দ্বীপে, লবঙ্গলতার দেশে। আমরা গিয়েচি মলয় দ্বীপে চন্দন আনতে ; মৃগনাভির সন্ধানে গিয়েচি কৈলাসে দেবদারু বনে, কোথাও পরীস্থানের কোন ঠিকানা পাই নি।"

রাজা বল্‌লে 'ডাক মন্ত্রীর পুত্রকে।'

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "পরীস্থানের কাহিনী রাজপুত্র কার কাছে শুনেচে ?"

মন্ত্রীর পুত্র বল্‌লে, "সেই যে আছে নবীন পাগ্‌লা, বাঁশি হাতে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, শিকার করতে গিয়া রাজপুত্র তারি কাছে পরীস্থানের গল্প শোনে।"

রাজা বল্‌লে, "আচ্ছা ডাক তাকে।"

নবীন পাগ্‌লা এক মুঠো বনের ফুল ভেট্ দিয়ে রাজার সাম্‌নে দাঁড়াল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "পরীস্থানের খবর তুমি কোথায় পেলে ?"

সে বল্‌লে, "সেখানে আমি ত সদাই যাওয়া আসা করি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় সে জায়গা ?"

পাগ্‌লা বল্লে, "তোমার রাজ্যের সীমানায় চিত্রগিরি পাহাড়ের তলে, কাম্যক সরোবরের ধারে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "সেইখানে পরী দেখা যায় ?"

পাগ্‌লা বল্‌লে, "দেখা যায় কিন্তু চেনা যায় না। তারা ছদ্মবেশে থাকে। কখনো কখনো যখন চলে যায় পরিচয় দিয়ে যায়, আর ধরবার পথ থাকে না।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি তাদের চেন কি উপায়ে ?"

পাগ্‌লা বল্‌লে, "কখনো বা একটা সুর শুনে, কখনো বা একটা আলো দেখে।"

রাজা বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, 'এর আগাগোড়া সমস্তই পাগ্‌লামি, এ'কে তাড়িয়ে দাও।"

৩

পাগ্‌লার কথা রাজপুত্রের মনে গিয়ে বাজ্‌ল।

ফাল্গুন মাসে তখন ডালে ডালে শালফুলে ঠেলা-ঠেলি আর শিরীষ ফুলে বনের প্রান্ত ছিউয়ে উঠেচে। রাজপুত্র চিত্রগিরিতে একা চলে গেল।

সবাই জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাচ্ছ ?"

সে কোনো জবাব করলে না।

গুহার ভিতর দিয়ে ঝরনা ঝরে আসে, সেটি গিয়ে মিলেচে কাম্যক সরোবরে ; গ্রামের লোক তাকে বলে, "উদাস বোরা।" সেই ঝরনার তলায় একটি পোড়ো মন্দিরে রাজপুত্র বাসা নিলে।

এক মাস কেটে গেল। গাছে গাছে যে কচি পাতা উঠেছিল তাদের রং ঘন হয়ে আসে, আর ঝরা ফুলে বনপথ ছেয়ে যায়। এমন সময় একদিন ভোরের স্বপ্নে রাজপুত্রের কানে একটি বাঁশির সুর এল। জেগে উঠেই রাজপুত্র বল্‌লে, "আজ পাব দেখা।"

তখনি ঘোড়ায় চড়ে কাম্যক সরোবরের তীর বেয়ে চল্‌ল, পৌঁছল কাম্যক সরোবরের ধারে। দেখে, সেখানে পাহাড়েদের এক মেয়ে পদ্মবনের ধারে বসে আছে। ঘড়ায় তার জল ভরা, কিন্তু ঘাটের থেকে সে ওঠে না। কালো মেয়ে কানের উপর কালো চুলে একটি শিরীষ ফুল পরেচে, গোধূলিতে যেন প্রথম তারা।

রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে তাকে বল্‌লে, "তোমার কানের শিরীষ ফুলটি আমাকে দেবে ?"

যে হরিণী ভয় জানে না এ বুঝি সেই হরিণী ? ঘাড় বেঁকিয়ে একবার সে রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। তখন তার কালো চুলের উপর একটা কিসের ছায়া আরো ঘন কালো হয়ে নেমে

এল—মেঘের উপর যেন স্বপ্ন দিগন্তে যেন প্রথম প্রাবণের সঞ্চার।

মেয়েটি কান থেকে ফুল খসিয়ে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বললে, "এই নাও।"

রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কোন্ পরী আমাকে সত্য করে' বল।"

শুনে একবার মুখে দেখা দিল বিস্ময়, তার-পরেই আশ্বিন মেঘের আচম্‌কা বৃষ্টির মত তার হাসির উপর হাসি, সে আর থামতে চায় না।

রাজপুত্র মনে ভাবলে "স্বপ্ন বুঝি ফলল—এই হাসির সুর যেন সেই বাঁশির সুরের সঙ্গে মেলে।"

রাজপুত্র ঘোড়ার চক্ষে দুই হাত বাড়িয়ে দিলে, বললে, "এসো।"

সে তার হাত ধরে ঘোড়ায় উঠে পড়ল, একটুও ভাবল না। তার জলভরা ঘড়া ঘাটে রইল পড়ে।

শিরীষের ডাল থেকে কোকিল ডেকে উঠল, কুহু কুহু কুহু কুহু।

রাজপুত্র মেয়েটিকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার নাম কি।"

সে বললে, "আমার নাম কাজরী।"

উদাস ঝোরার ধারে দুজনে গেল সেই পোড়ো মন্দিরে। রাজপুত্র বললে, "এবার তোমার ছদ্মবেশ ফেলে দাও।"

সে বললে, "আমরা বনের মেয়ে, আমরা ত ছদ্ম-বেশ জানি নে।"

রাজপুত্র বললে, "আমি যে তোমার পরীর মূর্ত্তি দেখতে চাই।"

পরীর মূর্ত্তি! আবার সেই হাসি, হাসির উপর হাসি। রাজপুত্র ভাবলে, "এর হাসির সুর এই ঝরনার সঙ্গে মেলে, এ আমার এই কল্পনার পরী।"

(৫)

রাজার কানে খবর গেল, রাজপুত্রের সঙ্গে পরীর বিয়ে হয়েচে। রাজবাড়ি থেকে ঘোড়া এল, হাতি এল, চতুর্দ্দোলা এল।

কাজরী জিজ্ঞাসা করলে, "এ সব কেন?"

রাজপুত্র বললে, "তোমাকে রাজবাড়িতে যেতে হবে।"

তখন তার চোখ ছলছলিয়ে এল। মনে পড়ে গেল, তার ঘরের আঙিনায় শুকোবার জন্যে ধানের বীজ মেলে দিয়ে এসেছে; মনে পড়ল তার বাপ আর ভাই শিকারে চলে গিয়েছিল, তাদের ফেরবার সময় হয়েচে; আর মনে পড়ল তার বিয়েতে একদিন যৌতুক দেবে বলে তার মা গাছতলায় তাঁত পেতে কাপড় বুনচে, আর গুন গুন করে গান গাইচে।

সে বললে, "না, আমি যাব না।"

কিন্তু ঢাক ঢোল বেজে উঠল, বাজল বাঁশি, কাঁসি, দামামা,—ওর কথা শোনা গেল না।

চতুর্দ্দোলা থেকে কাজরী যখন রাজবাড়িতে নামল, রাজমহিষী কপাল চাপড়ে বললে, "এ কেমন-তর পরী!"

রাজার মেয়ে বললে, "ছি, ছি কি লজ্জা!"

মহিষীর দাসী বললে, "পরীর বেশটাই বা কি রকম?"

রাজপুত্র বললে, "চুপ কর, তোমাদের ঘরে পরী ছদ্মবেশে এসেচে।"

(৬)

দিনের পর দিন যায়। রাজপুত্র জ্যোৎস্নারাত্রে বিছানায় জেগে উঠে চেয়ে দেখে কাজরীর ছদ্মবেশ একটু কোথাও খসে পড়েছে কিনা। দেখে যে কালো মেঘের কালো চুল এলিয়ে গেচে, আর তার দেহখানি যেন কালো পাথরে নিখুঁৎ করে খোদা একটী প্রতিমা। রাজপুত্র চুপ করে বসে ভাবে, "পরী কোথায় লুকিয়ে রইল, শেষ রাতে অন্ধকারে আড়ালে উষার মত।"

রাজপুত্র ঘরের লোকের কাছে লজ্জা পেলে;

একদিন মনে একটু রাগও হল। কাঞ্চনী সকাল বেলায় বিছানা ছেড়ে যখন উঠতে যায় রাজপুত্র শক্ত করে' তার হাত চেপে ধরে বল্‌লে, "আজ তোমাকে ছাড়ব না,—নিজরূপ প্রকাশ কর, আমি দেখি।"

এমনি কথাই শুনে বনে যে হাসি হেসেছিল সে হাসি আর বেরল না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুই চোখ জলে ভরে এলো।

রাজপুত্র বল্‌লে, "তুমি কি আমায় চিরদিন ফাঁকি দেবে?"

সে বল্‌লে, "না, আর নয়।"

রাজপুত্র বল্‌লে, "তবে এইবার কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় পরীকে যেন সবাই দেখে।"

৭

পূর্ণিমার চাঁদ এখন মাঝ গগনে। রাজবাড়ির মহলে মাঝরাতের সুরে কিমিকিমি তান লাগে।

রাজপুত্র বরসজ্জা পরে' হাতে বরণমালা নিয়ে মহলে ঢুক্‌ল, পরী বৌয়ের সঙ্গে আজ হবে তার শুভদৃষ্টি।

শয়নঘরে বিছানায় শাদা আস্তরণ, তার উপর শাদা ফুল্ল ফুল রাশ করা; আর উপরে জান্‌লা বেয়ে জ্যোৎস্না পড়চে।

আর কাঞ্চনী?

সে কোথাও নেই।

তিন প্রহরের বাঁশি বাজ্‌ল। চাঁদ পশ্চিমে হেলেচে। একে একে কুটুম্বে ঘর ভরে গেল।

পরী কই?

রাজপুত্র বল্‌লে, "চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায়, আর তখন তা'কে পাওয়া যায় না।"

"বঙ্গবাণী,"—বৈশাখ, ১৩২৯।

কার্পাসের চাষ

(আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়)

বৈশাখ মাস আসিয়াছে এতদিন অনাবৃষ্টির পর অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। কার্পাসের চাষ আরম্ভ করিবার এই প্রশস্ত সময়। যাহাতে বঙ্গদেশে ঘরে ঘরে সাধ্যানুরূপ কার্পাসের বীজ এই সময়ে রোপণ করা হয় তাহার সুব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। আমি চরকা সুতার প্রচলন উদ্দেশ্যে সংপ্রতি নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—সর্ব্বত্রই এই অভিযোগ 'তুলার বেজায় দাম'। কলিকাতার নানা রকম তুলা খুলনার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অঞ্চলে বিতরণ করিয়া এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, কলিকাতার মুদী হাটার শ্রীযুক্ত জমুনাস বাজাজের কুঠীর তুলাই চরকার পক্ষে উপযোগী। ইহার আঁশ লম্বা ও অপেক্ষাকৃত শক্ত। ইহার নাম ওয়ারদা তুলা (Wordah cotton)। ইহার এক এক গাঁইটে ৪৯ মণ হইতে ৫ মণ পর্য্যন্ত থাকে। কিন্তু ইহার মূল্য প্রতি মণ ৪৲ টাকা হিসাবে। ইহা ছাড়া পল্লীতে পৌঁছিতে রেল ষ্টিমার ভাড়া স্বতন্ত্র ধরিতে হইবে। এজন্য এবার অনেকেই চরকায় সুতা কাটিতে নারাজ—মজুরি পোষায় না। কিন্তু মনে করিয়া রাখুন যদি আজ ঘরে ঘরে কার্পাস জন্মিত, তাহা হইলে কত সুবিধা হইত। আমরা এক সের সুতা নম্বর হিসাবে ২৷৷০ হইতে ৩৲ পর্য্যন্ত মূল্য দিতেছি। কিন্তু যদি তুলার দাম দেওয়া যায়, তাহা হইলে মজুরি বাদ সের প্রতি ১৲ টাকা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রকৃত রোজগার বুঝিতে হইবে।' এই জন্যই ঘরে ঘরে তুলার চাষ একান্ত প্রয়োজন।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে গাছ কার্পাস বা রাম কার্পাস (tree cotton) সর্ব্বাপেক্ষা চরকা কাটিবার উপযুক্ত। ইহার আঁশ লম্বা ও শক্ত। ইহার আর একটা সুবিধা এই যে, ইহার তুলা পাঁজ করিয়া লইতে হয় না এবং বীচি পর্য্যন্ত

ও না ছাড়াইলে চলে। গাছ জমির আলিতে আলিতে লাগান সুবিধাজনক, কারণ তাহাতে জমিতে অন্য ফসলের জায়গা থাকে, পরন্তু একটু বড় হইলে তাহাতে বেড়ার কাজও চলে। এই কার্পাস তাও বৎসর ভাল রকম ফসল দেয় এবং অনেক ডালপালা হওয়াতে তুলার পরিমাণও অনেক বেশী হয়—অর্থাৎ যতই বাড়িতে থাকে ততই ফলবন্ত হয়। ইহা ছাড়া জমির প্রকারভেদে নানা জাতীয় ক্ষেত কার্পাসেরও চাষ করিতে হইবে। এ বিষয়ে এখনও বাঙ্গালার ভাল রকম অভিজ্ঞতা নাই। তবে বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ হইতে এ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রচারিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পাঠকবর্গ ইহা হইতে অনেক খবর জানিতে পারিবেন :—

"পূর্ব্ববঙ্গে কার্পাসের বিশেষ চাষ নাই; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় অল্প পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে বিদেশীয় অনেক প্রকার কার্পাসের পরীক্ষা করা হইয়াছে; কোন জাতিই ভাল জন্মে না; ইহাদের মধ্যে ইজিপ্ট, কম্বোডিয়া, বয়েড প্রলিফিক অপেক্ষাকৃত ভাল।

দেশীয় কার্পাসের মধ্যে নিম্নলিখিত জাতগুলি ভাল :—

১। বুড়ি—ইহা ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণায় ভাল জন্মে এবং ইহার ফলন অধিক।

২। বারোয়ার—ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে একটি মার্কিন দেশীয় জাতি কিন্তু অনেককাল এদেশে আবাদের পর প্রায় এদেশীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

৩। ব্রোচ—এদেশীয় কার্পাসের মধ্যে একটী উৎকৃষ্ট জাতি। বাজারে ইহা সুরাট বলিয়া পরিচিত।

৪। গাছ কার্পাস—ইহার গাছ অনেক বৎসর বাঁচে; ইহার সূতা লম্বা, শক্ত ও মসৃণ হয়। দেও কার্পাস, রাম কার্পাস প্রভৃতি ইহার নানা নাম আছে। এদেশীয় ব্রাহ্মণগণ এই সূতা হইতে যজ্ঞোপবীত তৈয়ার করিয়া থাকেন।

কার্পাসের চাষ করিতে হইলে প্রথম হইতে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। স্থানীয় মৃত্তিকা ও আবহাওয়া ভেদে উপরোক্ত যে জাতি যে জেলায় ভাল জন্মে তাহারই অধিকতর আবাদ করিতে হইবে। কোন মাসে বীজ বপন ও চারা রোপণ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়, তাহারও পরীক্ষা করিতে হইবে।

মৃত্তিকা—বুড়ি কার্পাস প্রায় সকল মাটীতেই জন্মে; ব্রোচ এবং বারোয়ার, দোআঁশ ও আঁটাল মাটীতে ভাল হয়। কার্পাসের পক্ষে উচ্চ জমি প্রশস্ত; ভূমি হইতে যাহাতে ভালমত জল নিকাশ হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। জল দাঁড়াইলে ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যে জমি সাধারণতঃ ভিজা উহাতে আইল করিয়া বীজ বুনিতে হয়। ২।৩ ফিট অন্তরে প্রায় অর্দ্ধ হাত উচ্চ আইল করিতে হয়; এইরূপ ভাবে জল-নিকাশের বন্দোবস্ত করিলে ফসল ভাল হইতে পারে।

জমি প্রস্তুত প্রণালী—মৃত্তিকা গভীর ভাবে চাষ করা কর্ত্তব্য। ৮।১০ বার চাষ ও মৈ দিয়া উহা ধূলা করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৪/০ মণ গোবর সার দেওয়া উচিত, উহার সহিত ছাই চূর্ণ দিলে আরও ভাল হয়। জমিতে সার ছিটাইয়া দিয়া ২।৩ বার চাষ ও মই দিয়া উহা ভাল করিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়।

—বসুমতী

আগামীবারে সমাপ্য।

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and 166
Published by P. N. Pal, 26-3 Scott Lane, Calcutta.

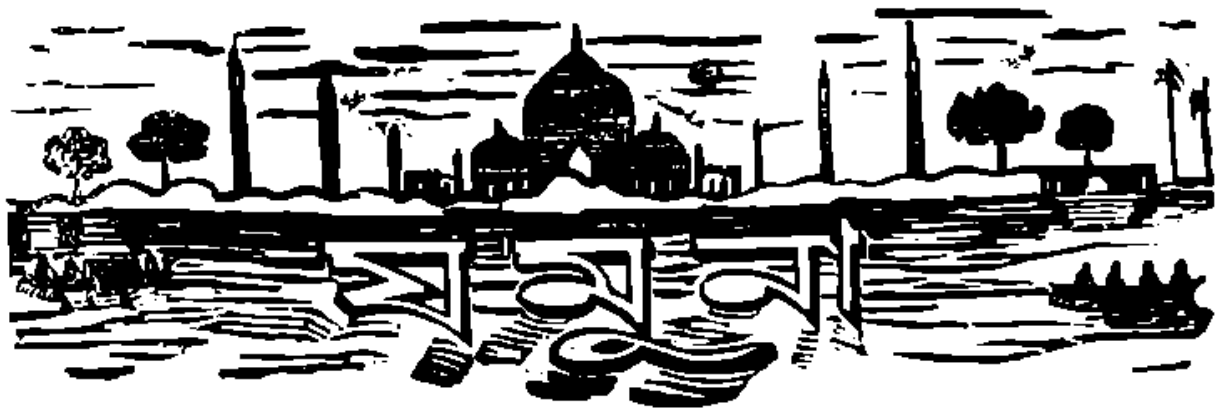

১২শ বর্ষ | আষাঢ় ১৩২৯ | ৩য় সংখ্যা

তীর্থ-সঙ্গম ও স্বর্গ

(শ্রীলীলা দেবী)

সবার পায়ের ধূলায় যখন আসন পেতেছি আজ,
তার চেয়ে বড় তীর্থ কোথায় বিপুল ভুবন মাঝ?
সবার চোখের জলেতে যখন মিশিল চোখের জল,
তার চেয়ে বড় এ জগতে কোথা কোন সঙ্গম-স্থল?
সবার সুখের হাসিতে যখন হাসিতে পেরেছি সুখে,
তার চেয়ে বড় স্বর্গ আছে কি দূর ত্রিদিবের বুকে?

বিবেকানন্দ ও ধর্ম্মজগৎ

(শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

ইঙ্গিত,—প্রথম বয়সে স্বামী বিবেকানন্দের ঘোর সন্দেহ-বাদের কথা অনেকেই অবগত আছেন। রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আস্‌বার পর হতে তাঁর এই সব ভাবের পরিবর্ত্তন দেখা দিল। একদিন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দকে—তখনকার নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন,—লেখাপড়া শেষ করে তিনি কি করবেন। ইহার উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বল্‌লেন—'বি, এ পাশ করে আইন-অধ্যয়ন কর্‌বো।' পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করেন—'তারপর।' নরেন্দ্রনাথ বল্‌লেন,—উকিল হব, মক্কেল আস্‌বে, অনেক টাকা-কড়ি রোজগার হবে।' পরমহংসদেব আবার যখন জিজ্ঞাসা করেন, 'তারপর।' নরেন্দ্রনাথ তখন বাকীটুকু সমাপ্ত করার জন্য বল্লেন—'ভাল বাড়ী কর্‌বো, গাড়ী, ঘোড়া—ইত্যাদি।'

পরমহংসদেব বল্লেন, তোরও এই কথা? এ তো সাধারণ লোকের কথা—এই আমার বাড়ী, এই আমার ঘর। একটু জায়গা ঘিরে রেখে হয়ত বা তাতে দু' একটা গাছপালা দিয়ে সর্ব্বদা পাহারায় ব্যস্ত ছাগল, গরুর আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করতে। কারো গরুটা বা ছাগলটা সেখানে ঢুকে নিজের স্বত্ব সপ্রমাণ করতে সদা ব্যস্ত—সে, তাকে খোঁয়াড়ে পাঠাবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। কারণ সে জানে সেই ছোট গণ্ডিটুকুই তার সব, সেই তার ঘর বাড়ী। তার চেয়ে বেশী কিছু ভাব্‌বার তার শক্তি হয় নি। কিন্তু তোর কাজ তো তাদেরই দল-পুষ্ট করা নয়,—

তোর বাড়ী যে জগৎ জুড়ে।

নরেন্দ্রনাথ একটু চিন্তা করে বল্লেন—'তাই হোক।' তিনি তাঁর জীবনে তা' বিশেষভাবে দেখিয়েও গিয়েছেন। গুরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের জীবনে এই মহৎবাক্যের সার্থকতা তিনি প্রতিপাদন কর্‌তে পেরেছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবনে আমরা কবি-বাক্যের সার্থকতা দেখ্‌তে পাই—

"ভুলিয়ে যা'রে আত্মপর পরকে নিয়ে আপন কর,
বিশ্ব তোর নিজের ঘর—আবার তোরা মানুষ হ'।"

রামকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান অবসানের পর, সকলে বল্‌তে লাগ্‌লেন ঠাকুর আপনাকে এত বড় বলেছেন, আপনি কি বুঝ্‌লেন? স্বামিজী বল্লেন, 'তিনি বলেছেন সে কথা আমি খুব মানি কিন্তু এখন ও কিছু বুঝিনি।' কেউ কেউ ভাব্‌তে লাগ্‌লেন—ঠাকুর কি তবে পাগ্‌লামী করে গেলেন? কিন্তু সিকাগোর কথা প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের ভাবনা বদ্‌লে গেল।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা,—একটা নূতন ধারার প্রবাহ আজ জগতের সর্ব্বত্র অনুভূত হচ্ছে। ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক, সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্য নিয়ে আজ বিশ্বের মানব-চিত্তে চাঞ্চল্যের চলাফেরা বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান। সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই আজ চিন্তার একটা নূতন স্রোত বইতে সুরু করেছে।

সেদিন চলে গেছে যে দিন বিশ্বাস ছিল—জাতির আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্কল্প। আজ বিজ্ঞানের যুগে সবাই সন্ধানী—সবাই চায় প্রত্যক্ষ কর্‌তে—সবাই চায় রিসার্চ—সবাই চায় প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝ্‌তে। সাদা কথায়—হে প্রভো, হে পিতঃ বল্লে এখন আর চলে না। সন্ধানী, জিজ্ঞাসু কবি অম্‌নি বল্‌বেন—"তাঁরে

* জেমসেদপুরে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে পঠিত।

যে প্রভু বলিস্, দাস হলি তুই কবে।" নিজের দাস-ভাব যখন প্রত্যক্ষীভূত হয়, জগৎও তখন প্রভুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত হয়। এই বিশ্বস্ততার প্রভাবই ধর্মজগতের নবযুগ। সে যুগের লক্ষণ হচ্ছে সাম্য, মৈত্রী, প্রেম।—যার অভাব আজ জগতের সর্ব-সভ্য সমাজগুলিতে অতিমাত্রায় অনুভূত হচ্ছে। সেখানে ধর্ম শিক্ষকগণ কেবল বক্তৃতার দ্বারাই কাজ সারতে চান। কিন্তু শুধু কথায় তো চিঁড়ে ভেজেনা। শিক্ষকের বাজে উপদেশেও কোন কাজ হয় না। লোকে অমনি বলবে, কই ঠাকুর, তোমার নিজের জীবনে এ সবের বিকাশ কৈ? সুসভ্য সমাজগুলির এই তো অবস্থা। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য সমাজগুলির—সভ্যতার গর্বে যাঁরা অতিমাত্রায় স্ফীত, "তাদের অন্তর আজ শূন্য, সেথায় কেবল করুণ-ধ্বনি। তার অগাধ ঐশ্বর্য্য, বিজ্ঞানের জ্ঞান গরিমা, কিছুই এ হাহাকার-ধ্বনি চেপে রাখ্‌তে পারে না। সেথায় সেই করুণ-সুর কেবলই ভেসে বেড়াচ্ছে—আমরা সবই আয়ত্ব করেছি তবুও কেন এত অশান্ত? উপনিষদের ঋষি এর শ্রেষ্ঠ উত্তর দিয়েছেন—"ভূমৈব সুখম্।"

পাশ্চাত্যের এই শোচনীয় অবস্থায় বিক্ষোভিত হয়ে মণীষী অধ্যাপক Huxley তাঁর অন্তরের কথা প্রকাশ করে বলেন—I do not hesitate to express the opinion that if there is no hope of a large improrement of the condition of the greater part of the human family..... I should hail the advent of some kindly comet which would sweep the whole affair away as a desirable consumation.

পাশ্চাত্যের এই অবস্থার সূত্রপাত কি? শতাব্দী ধরে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার নামে উন্মত্ত অনাচার; ধর্মের নামে অর্থের ও স্বার্থের উপাসনা, স্বেচ্ছাচার, ভেদ, ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রবল যাত্রা।

এ সঙ্কট শুধু পাশ্চাত্যে কেন, এদেশেও দেখা দিল। এ যে জগৎব্যাপী সঙ্কটের যুগ। মোগলের ময়ূর-সিংহাসন অন্তর্হিত হ'ল। মারহাট্টার মেরুদণ্ড ভেঙে গেল। শিখ নত হয়ে পড়্‌ল। বণিকের দাস-রূপ ভারতের রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিল। ধর্মজগতে আর্য্য-অনার্য্যের সংঘর্ষের দীর্ঘকাল পর, তখন ইস্লাম হিন্দুত্বের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় জয় ক্লান্ত, দেশ তখন বরং রাজ জাতির ধর্মানুরাগের অনুকরণ প্রয়াসী।

ভেদবুদ্ধি ও অনাচারের তখন পূর্ণমাত্রা। ভারত সকল বিষয়ে ইউরোপকে নকল করতে সচেষ্ট। ফলে বিদেশের সাহিত্য-বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া নানারূপ নূতন চিন্তার সহিত উপস্থিত হ'ল—নাগরিক সভ্যতা, আসিল কলকারখানা, আসিল পল্লীর বুক শূন্য করে সহস্র সহস্র শ্রমজীবি।

উদ্দেশ্য—কিন্তু আজ পর্যন্ত জগতে একঘেয়ে, একটানা স্রোতে কেহ চলেনি। সমাজ ও ধর্ম, অত্যাচার ও অনাচারে পঙ্কিল ও কলুষিত সর্বত্রই হয়েছে, কত জাতির নাম পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হতে লোপ পেয়েছে, আবার কোথাও বা মহাপুরুষগণের উজ্জ্বল উদাহরণে আবার তারা জীবন-গতি ফিরে পেয়েছে। ভারতের ইতিহাস এ বিষয়ের উজ্জ্বলতম সাক্ষী।

এইরূপ যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা, একটা 'মূলের' অভাব তখন সকলেই বিশেষভাবে বোধ করছে—এরূপ একটা 'মূল' যাকে অবলম্বন করে সকলে সকলকে বুঝ্‌তে পারে,—দ্বন্দ্ব দ্বেষ পরিহার করে এক উদ্দেশ্যে, একই পথে যাত্রার উদ্যোগ করতে পারে।

"বাহিরের ঝড় ঝাপটা যা পারেনি, ভিতরের কি একটা অদ্ভুত-শক্তি হঠাৎ আপনি তাই করে দিয়েছে। সন্ধানী বিশ্বাসী সবাই কি একটা অনুভব করে শুরু হয়ে গিয়েছে। ভিতর থেকেই এক-একটা জানালা খুলে গিয়ে বাহিরের আলো অচলায়তনের ঘরের মধ্যে প্রবেশ কচ্ছে। এই শক্তিই নব

যুগের যুগ-ধর্ম—নূতনের প্রকাশ।" এরই অগ্রদূত হয়ে এলেন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। আর তাঁর পবিত্র চিত্তের পূতঃ গাথার প্রচার করতে অগ্রসর হলেন—কৌপীনসম্বল, গৈরিকবেশধারী, ভক্ত, জ্ঞানী, ব্রহ্মবিদ্, সনাতন ধর্ম্মাদর্শের সংরক্ষক ও প্রচারক, অগ্নিমূলিঙ্গসম নবযুগের নবীন-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। কেবলমাত্র বিবেকানন্দ বলে বলাটুকু সম্পন্ন হতে পারে না, তেমনি কেবল রামকৃষ্ণ বলেও সবই অসমাপ্ত থেকে যায়। রামকৃষ্ণ মূল, বিবেকানন্দ কাণ্ড; রামকৃষ্ণ শাখা, বিবেকানন্দ প্রশাখা, রামকৃষ্ণ জননী ধরিত্রী, বিবেকানন্দ ফলাল মহীরুহ। দুয়ে এক, জ্ঞান ও কর্ম্ম, প্রতিষ্ঠা ও দীপ্তির সমন্বয়। যেমন অগ্নি ও দাহিকা-শক্তি, আলোক ও রশ্মি, তর্ক ও দ্বারা, তেমনি রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ।

স্বামিজী একবার বুদ্ধ গয়ায় পালিয়ে গেলেন; গুরু ভাইরা ঠাকুরের কাছে ব্যস্ত হয়ে বলায়, ঠাকুর বলেন—'কোথাও কিছু নেই, সব এইখানে।' স্বামিজী দু'একদিন পরেই ফিরে এলেন।

উপযুক্ত সময়ে বাঙ্গালায়, সম্পূর্ণ নেকেলে ধরণের গোড়া ব্রাহ্মণের ঘরে দেখা দিলেন—এই গুরু, আর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও আধুনিক ভাবের মাঝখানে পালিত পালিত হয়ে তাঁর কাছে এসে আশ্রয় নিলেন—নরেন দত্ত—তাঁর উপযুক্ত শিষ্য। এই গুরু-শিষ্যের অপূর্ব্ব সম্মিলনে, জরাজীর্ণ সমাজ নববলে বলীয়ান্ হয়ে উঠ্‌ল। ঠিক এই মাহেন্দ্রক্ষণের প্রতীক্ষাতেই যেন সকলে আকুল হৃদয়ে চিন্তা করছিল—

"কোন্ সুদূর নব প্রভাতে
তুমি উদিবে ধরা জাগিবে হে।"

যখন জোয়ার আস্‌বার সময় হয়, তখন সে আস্‌বেই, কেউ তাকে থামিয়ে রাখ্‌তে পারে না। বন্যার প্লাবন বালির বাঁধে বাধা পায় না। উপযুক্ত সময়ে সকলে দেখিল—

"উষার ললাম ললাট ভেদিয়া উদিল যে জ্যোতিঃ
উজলি বঙ্গ,
হেরিয়া যাহার বিমল কিরণ, মানিল অমর
লভিতে সঙ্গ।
"বন্দিল ধীরে প্রাচ্য-প্রতীচ্য অভিনব কত
প্রীতির ছন্দে,
ভারতীর প্রিয় ভারত-ভাস্কর আচার্য্য ঋষি
বিবেকানন্দে।

ভারতের প্রচারকবর্গ, প্রচারকের প্রচার, জ্ঞানীর বাণী, বিশ্বের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ববাসীদের জন্য। কিন্তু সে বাণী সময়োপযোগী না হলে মানবের অন্তর স্পর্শ করতে পারে না। এজন্য মহাপুরুষগণ যা কিছু প্রচার করে গেছেন তা তত্তৎ সময়ের উপযোগী গ্রহণ করবার শক্তি সকলের সমান হয় না। ভারত ধর্ম্মক্ষেত্র, চিরদিনই গ্রহণ পরায়ণ—আবার চিরদিনই দান পরায়ণ।

দর্শন কি, ভারত তা জানে, ধর্ম্ম কি, ভারত তা জানে। যা সে জানে তা অন্যকে দিতে সে কোন দিনই কার্পণ্য করে নি, তা নিতেও সে সদাই প্রস্তুত। আবার এ সব জানে বলেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারত সবাই কে শুনতে ও প্রস্তুত, নিজেকে বিলিয়ে দিতেও তৎপর। এরই নাম সনাতন ভাব। গোঁড়া ভারত যত গোঁড়াই হোক, এ বিষয়ে সব চেয়ে উদার, সব চেয়ে উন্নত। আর এই বিষয়টিই মানব-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

সে মরিয়া হয়ে তখনই উঠেছে, যখন তাকে সেই ভাবে উঠ্‌তে বাধা করা হয়েছে—এ কথা সর্ব্বজন-বিদিত।

যুগ-যুগান্তর হতে ভারত ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই তার পরিচয় প্রদান করে আস্‌ছে। ধর্ম্মই ভারতের ওজঃ শক্তির একমাত্র উৎপত্তি স্থল। তীব্র প্রয়োজন অনুভব করেই মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ হয়। জাতীয়-শক্তির বিচার করতে হলেও সকলের সমানভাবে অনুভব যোগ্য এক জাতীয়

প্রয়োজনকে অবলম্বন করতে হয়। সেই সাধারণ প্রয়োজনের ভিতর দিয়াই সংহতি-শক্তির স্ফুরণ হয়। জাতীয়-শক্তির উহাই মূল কেন্দ্র।" ভারতে যখনই জাতীয়-শক্তির উন্মেষ হয়েছে, তখন তা ধর্ম্মকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। প্রাচীন ভারতে শ্রীরামচন্দ্রের ও পাণ্ডবগণের ধর্ম্মরাজ্য এইভাবে স্থাপিত হয়েছিল। সেই ভারতে যখন অনাচার দেখা দিল, বুদ্ধদেব তাঁর আত্মত্যাগের উদাহরণ দেখিয়ে দেশকে মাতিয়ে তুল্লেন। তাঁর মহাভাবের মহাপ্লাবনে ভারত নিজেকে প্লাবিত করে পবিত্র হ'ল, জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার দান করে "আজিও ভুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ" ধন্যজ্ঞান করছে। ত্যাগীর ও যোগীর সৌম্যমূর্ত্তি অশোককে নূতন পথ দেখিয়ে দিয়ে, বুদ্ধের শিক্ষাকে কেন্দ্র করে, ধর্ম্মরাজ্য গড়ে তুলতে ইঙ্গিত করলে। কিছুদিনে তাঁদের সে আদর্শ শিথিল হয়ে এল। তাঁরা চেয়েছিলেন সকলেই ত্যাগী হোক, সকলেই বৈরাগ্য গ্রহণ করুক। শঙ্করের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অসাধারণ অভূতপূর্ব্ব বেদানুরাগ ভারতের সম্মুখে দেখা দিল। সমস্ত ভারত সাগ্রহে তা গ্রহণ করে। মুসলমান প্রাধান্যের সময় ধর্ম্মকে কেন্দ্র করেই রাজপুত "ম্লেচ্ছধর্ম্ম তুচ্ছ" করেছিল। "মারাঠা অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া" জীবন প্রভাব ফুটিয়ে তুলেছিল; পঞ্চনদীর তীরে শিখ "গুরুজীর জয়" ধ্বনি সহকারে আত্মাহুতি প্রদান করতে অগ্রসর হয়েছিল। আবার সেই ধর্ম্মকেই কেন্দ্র করে রামানুজ, কবীর, শ্রীচৈতন্য একে একে লোক-শিক্ষা প্রদান করেন। আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করে, প্রেমের প্লাবনে দেশকে প্লাবিত করে দিলেন।

দেশ তারপর অনেকদিন ধরে চুপ করে বসে রইল। পরে নব্যভারত বিলাস-সভ্যতার গা ভাসিয়ে দিল। একটা সামঞ্জস্যের অভাব আবার অনুভূত হল।

আর্য্য-সমাজ, ব্রাহ্মসমাজ সময়োপযোগী কার্য্যে রত হল। রাজা রামমোহন, ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে বিদেশী ও স্বদেশী ভাবের একটা সামঞ্জস্যের জন্য উপনিষদের আদর্শকে বা বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে সকলের সম্মুখে ধরলেন। ব্রাহ্মসমাজের গুরুরূপে দাঁড়ালেন দুই জ্ঞানী পুরুষ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও মহাত্মা কেশবচন্দ্র।

"ব্রাহ্মসমাজে নাটকের অভিনয়ে নরেন্দ্রনাথ শিব সাজলেন। পরমহংসদেব অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। নরেন্দ্রনাথকে ঐ বেশে নেমে আসতে বল্লেন; নরেন্দ্রনাথ ইতস্ততঃ করছেন দেখে কেশবচন্দ্র বল্লেন "উনি যখন বলছেন নেমে এস না।" পরমহংসদেব বল্লেন—"দেখ কেশব, তোমার একটা বক্তৃতা দেবার শক্তি আছে, এর আঠারটা শক্তি আছে।" কেশবচন্দ্র খুব আনন্দিত হয়ে বল্লেন—"এতো ভাল কথা, আমিও তাই চাই।" নরেন্দ্রনাথ তার অনেক আগেই ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখিয়েছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ তখন ছাত্র। অন্তর তাঁর জিজ্ঞাসুর, যোগীর ও মর্ম্মীর পূর্ণভাব। কিসে শান্তি, কিসে আনন্দ তারই সন্ধানে তিনি ব্যাকুল। অন্তরের গভীরতম প্রদেশে ঘোর আকুলতা। কিন্তু এ সন্ধান দেয় কে? যখনই শুনছেন কোথাও গেলে সত্যের আভাষ পাওয়া যেতে পারে, তখনি সেখানে ছুটে যাচ্ছেন। কত সাধু দেখলেন, কত সমাজ থেকে ফিরে এসেছেন নিরাশ শুষ্ক-হৃদয়ে! কখনও সতীর্থ সুপণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহিত জ্ঞান বিজ্ঞানের তর্কে বিভোর, আবার কখনও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কক্ষে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদের ন্যায় উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করছেন—"মহাশয়, আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?" মোট কথা নরেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান জীবনে ঘোর অবিশ্বাসী, সত্যে তাঁর ঘোর সন্দেহ। এখন চান তিনি এই অবস্থার পরিবর্ত্তন। তিনি চান শান্তি, তিনি চান জানতে কিসে সেই সত্য "চির বিচিত্র আনন্দরূপে ধরা দিবে জীবনে।" কি করে তিনি তাঁর তনুর প্রতি অণুতে অণুতে তাঁরই প্রতিমা উপলব্ধি করতে পারবেন।

গুরুর শিক্ষা—পবিত্র ভাগীরথীকূলে প্রখ্যাত পঞ্চবটীমূলে পরমহংসদেবের পদতলে হিন্দুত্বের দিগ্‌ছায়ায় এসে আশ্রয় নিলেন নরেন্দ্রনাথ—সেই মহাব্রতের সন্ধানে। আর সেইখানে তিনি দেখতে পেলেন, সেই সবের পূর্ণ বিকাশ, যার জন্যে তিনি উন্মত্তের মত চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। গুরু পরমহংসদেব বুঝিয়ে দিচ্ছেন, সব এক, সব অভেদ,—হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সবই সেই এক ব্রহ্মময়ীর সন্তান। পাঁচ ছেলের জন্য পাঁচ রকম বিধান করে সবারই কল্যাণ তিনি করছেন। এ শুধু তাঁর মুখের কথা নয়—অন্তরের বাণী। তিনি বলতেন, "যেমন গ্যাসের আলো এক স্থান হতে ক্রমে গ্রামের নানা স্থানে, নানা ভাবে জ্বলছে, তেম্‌নি নানা দেশের, নানা জাতের লোক সেই এক ভগবান হতে আস্‌ছে।" ভারতীয় আধ্যাত্মজ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি এবং ভিন্নদেশীয় কোরাণ, বাইবেল ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহও যে সত্যের আভাষ দিতে সমর্থ হয়েছে, তা এই লোকত্তম পুরুষের দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনে আত্মপ্রকাশমান হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ বেদের পবিত্র বাণীর বিকাশ এই মহাপুরুষের মধ্যে বিকশিত দেখে বিস্ময়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে বলতে লাগলেন,—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং
প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং
প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥

গুরুর অলোকসামান্য জীবনের সংস্পর্শে এসে "জাগিয়া উঠিয়া নবীন আলোকে" জগত সমক্ষে বিভিন্নকালে প্রচারিত সত্য সমূহ প্রকাশ করলেন, দেখিয়ে দিলেন—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—এসব বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নয়—একটীর সত্যতা অন্যটীর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করে না—এ সব রুচি ভেদে সাধক জীবনের বিভিন্ন সোপান মাত্র। সকল দেশের শ্রেষ্ঠ সাধকগণের জীবন আলোচনায় দেখা যায় যে তাঁরা একই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বৃন্দাবনের ভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্বানুভব করে সকলেই মনে করতেন, "আমিই কৃষ্ণ।" শ্রীচৈতন্য ভগবানের সঙ্গে একত্বানুভব করে অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় বলতেন, "মুই সেই।" যীশু বলেছেন, 'I and my father are one,' দ্বৈতবাদী মুসলমান সাধকও কেউ কেউ বলেছেন, "আনল্ হক্" বা আমিই সেই। বেদান্তের দিগ্‌-ধ্বনি ঘোষণা করছে, "সোঽহং সোঽহং অয়মাত্মা ব্রহ্ম।"

বিবেকানন্দ বুঝিয়ে দিলেন সকলেরই এক উদ্দেশ্য, শুধু বিভিন্ন পথ—বিভিন্ন রুচির সাধক কেবল রুচিভেদে উপলব্ধি করছেন নানাভাবে সেই একই অসীম, অনাদি, অনন্ত সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি গল্প বলে উদাহরণ দিতেন.—"কোনও গাছে একটা বহুরূপী থাকতো। একজন লোক ঘটনাক্রমে সেই গাছের তলায় এসে সেটাকে দেখে গিয়ে বল্লে, "আমি অমুক গাছে একটা লাল গিরগিটী দেখে এলাম।" আর একজন বল্লে, "সেটা লাল নয়, সেটা সবুজ।" আর একজন বল্লে, 'না সেটা নীল', আর এক জন বল্লে 'না নীল ও নয় ওটা হল্‌দে'। চার জনে গোল বেধে গেল। সেই গাছের নীচে একজন লোক থাকতো, সে এসে হেসে বল্লে, 'তোমরা সবাই ঠিক বল্‌ছ; সেটার অবস্থা কখনও লাল, কখনও নীল, কখনও হল্‌দে, আবার কখনও সবুজ এবং আরও কত কি রং ধরে। বস্তুত সেটা একটা বহুরূপী, সুতরাং সেটার কোন রং নাই।" তখন তাহাদের গোল সব মিটল।

সেইরূপ সেই ভগবানকে—সেই সত্যকে যে যে ভাবে অনুভব করে তার সেই ঠিক। তিনি এই রকম সুতরাং অন্য রকম হতে পারে না—এই সঙ্কীর্ণতাই যত বিসম্বাদের মূল। তিনি আবার রকম-বেরকম কি? তিনি যে অসীম, অনাদি, অনন্ত।

পরমহংসদেব বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করতেন

এই রকম সহজভাবে—নরেন্দ্রনাথ তা হৃদয়ঙ্গম করে প্রচার করেছেন বিবেকানন্দরূপে বিশ্ববাসীর কাছে অমুরূপ, সুন্দর ও সরলভাবে।

বিবেকানন্দ ও ভারত—ভারতকে বিবেকানন্দ জান্‌তেন, শুধু জান্‌তেন না,—'অম্বর-চুম্বিত-ভাল হিমাচল' হতে কন্যা-কুমারীর পদচুম্বি নীল সিন্ধুতট পর্য্যন্ত সমগ্র দেশকে সুন্দর ভাবে চিন্‌তেন। ভারতের প্রতি ধূলিকণা, আকাশ-বাতাস তিনি পরম পবিত্র বলে মনে করতেন। পাশ্চাত্যের সহিত তুলনা করে তিনি বুঝলেন, ভারত দুর্দ্দশার চরম-সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতের মেরুদণ্ড আজ ভগ্নপ্রায়।' প্রত্যেক জাতিই এক একটা জিনিষকে তার মেরুদণ্ডস্বরূপে গ্রহণ করে—ভারতের মেরুদণ্ড চিরদিনই তার ধর্ম্ম। তিনি দেখ্‌লেন, সেই মেরুদণ্ড একবার ভেঙ্গে গেলে এ জাতটাও একেবারে বিলীন হয়ে যাবে। এ অধঃপতনের কারণ কি?—কারণ, বিলাসস্রোত, অন্ধ অনুকরণ, অজ্ঞানতার নানারূপ কুসংস্কার ও প্রকৃত শিক্ষার অভাব।

ভারতে তাই ধর্ম্মের কথা তিনি নূতন ভাবে নূতন সুরে সবাইকে শুনিয়ে দিলেন; বুঝিয়ে দিলেন চাই "ত্যাগ-শিক্ষা ত্যাগই আমাদের সকলের আদর্শ।" বিপক্ষবাদীরা বল্লেন, "ও ত্যাগ-মন্ত্রের আর আবশ্যক নাই, ঐ সব মন্ত্র নিয়েই দেশটা চিরকাল পদদলিত হয়ে রইল।" কিন্তু তাঁরা হয়ত ভেবে দেখেন নি এমন ঢের দেশ বা জাতি ছিল, যারা ত্যাগের আধ্যাক্ষরটী শোনেনি অথচ জগতের রক্ষক হতে অমৃত রয়েছে। পৃথিবীর অনেক জাতি এখন অতীতের গর্ভে—ত্যাগের অভ্যাস করে নয়, ভোগ বিলাসে নিমজ্জিত থেকে। গ্রীস, রোম, কার্থেজ, ইজিপ্ট, ব্যাবিল ত্যাগ করে মরেনি, ভোগের অনুসন্ধান করেই লোপ পেয়েছে। ত্যাগের লেশমাত্র থাকলেও জাতীর জীবন-প্রদীপ একটু একটু জ্বল্‌তে থাকে কিন্তু ভোগ-সর্ব্বস্ব হওয়ার সঙ্গে সে শিখাটুকুও নিভে যায়। স্বামিজী বলেছেন—"Renunciation and service—These are the two great national ideals of India, intensify them in their proper channel."

তিনি বলেছেন, পাশ্চাত্যে যাবন হতে বংশের উৎপত্তি পরিচয় প্রদান, কর্ত্তে তারা গৌরবানুভব করে। এই যাবনরা কে? এঁরা দস্যু, পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করত ও সুযোগ মত পথিকদের যথা-সর্ব্বস্ব লুটপাট করে নিজেদের ধনবৃদ্ধি করত। আমরা কিন্তু পর্ব্বত-গুহাবাসী ফলমূলাহারী ব্রহ্মধ্যান-পরায়ণ ত্যাগের জলন্ত-উদাহরণ ঋষি মুনির বংশধর বলে পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করি।

সমাজের গ্লানিগুলি তিনি অতি পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। এই যে হিন্দুস্থানের এক পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান, গত দেড়শ' বৎসরের মধ্যে দশ লক্ষ লোক খ্রীষ্টান হয়ে গেল—কেন? কাদের এ দোষ? সমাজ তাদের প্রতি সুবিচার করেনি, সকল রকম সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়ে অথবা নিরাশ হয়েই তারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছে। সমাজের দুর্ব্বলতা বহিষ্কৃত করে না দিলে তার উন্নতির আশা কোথায়?

"এখন আমরা তাদের হারিয়ে বুক চাপড়াচ্ছি, বুঝ্‌তে পাচ্ছি কতদূর দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। পূর্ব্বে আমরা তাদের জন্য আর কিছুই করিনি কেবল ঘৃণাই করে এসেছি, অস্পৃশ্য বলে দূর দূরই করেছি। আজও দ্রাবিড়ে ব্রাহ্মণত্বের বাহাদুরী নেবার জন্য ব্রাহ্মণত্বশূন্য ব্রাহ্মণগণ এইভাবে চলেছেন। হায়, অধঃপতন এখনও তাদের অন্ধ আঁখিকে উন্মীলিত করতে পারেনি। ফলে কি হচ্ছে?—এই সব ঘৃণ্য অস্পৃশ্য জাতিই—যাদের এক পুকুরে জল খেতে দেওয়া হয় নি, এক রাস্তায় হাটতে দেওয়া হয়নি, যাদের জন্য ধর্ম্ম ও মোক্ষের পথ রুদ্ধ রাখা হয়েছিল,—তারাই যখন দেখ্‌লে যে মুসলমান রাজত্বে মুসলমান হলে, খ্রীষ্টান রাজত্বে খ্রীষ্টান হলে, ব্রাহ্মণে

তার উচ্চ সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য করা যেতে পারে,—জোর করে সম্মান আদায় করা যেতে পারে,—তখন তাদের কাছ থেকে,—যথেচ্ছাচার, হৃদয়হীন, অশাস্ত্রীয় দেশাচার, কুলাচার, স্ত্রী-আচার-প্রধান-ধর্ম্ম ত্যাগ করা ছাড়া আর কি আশা করা যেতে পারে? হিন্দুধর্ম্মের ক্ষয়ের কারণ এই আমরা উচ্চ বর্ণেরাই। স্বদেশে অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতে এখন ও সেই ক্ষয় প্রতি নিয়ত দেখ্‌তে হচ্ছে। আমাদের পিতৃ পিতামহের ধর্ম্ম, যা আকাশের চেয়ে নির্ম্মল ও প্রশান্ত—যা সাগরের চেয়েও গভীর, স্নিগ্ধভাবের মাধুর্য্যে মধুর—সাধারণকে তার দ্বারা উন্নত না করে নিজেদের সমাধি নিজেরাই খনন করেছি।"

দেশের বা সমাজের দোষগুলি তিনি আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। বলছেন—"গত ৬০০।৭০০ বৎসর ধরে কি ঘোর অধঃপতিই না হয়েছে। পণ্ডিতরা এই শত শত বৎসর ধরে বিচারে ব্যস্ত এক ঘটী জল আর তা' ডান হাতে না বাঁ হাতে, হাত ধোব ফিনবার না চারবার। ছুল-কুচো করব পাঁচবার না ছ'বার! যারা সারা জীবন এই সব 'হুরূহ' প্রশ্নের সমাধানে বড় বড় পাণ্ডিত্যপূর্ণ দর্শন লিখ্‌তে ব্যস্ত, তাদের কাছ থেকে কি আশা কর্‌তে পার? ধর্ম্মটা হয়ত আমাদের রান্নাঘরেই আবদ্ধ থাকবে কখন কখন এরূপ আশঙ্কা হয়। আমরা এখন না বৈয়াত্মিক, না পৌরাণিক, না তান্ত্রিক—আমরা এখন কেবল ছুঁৎমার্গী; রন্ধন মন্দির এখন আমাদের ধর্ম্মমন্দির, ভাতের হাঁড়ি আমাদের ঈশ্বর, আর মন্ত্র শুধু 'আমায় ছুঁয়োনা—ছুঁয়োনা—আমি শুদ্ধ! আর শতাব্দী ধরে এই ভাবে চল্‌লে জগতের লোক এক হয়ে হয়ত আমাদের পাগ্‌লা গারদের ব্যবস্থা কর্‌বে।"

"যখন মানুষের দেহমন দুর্ব্বল হয় তখন মৌলিক তাদের নিজের বস্তিকে স্থান পায় না। কার্য্যকরী-চিন্তা শক্তি হারিয়ে জীবন সংগ্রামে ভীত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য গণ্ডীর পর গণ্ডী টেনে শেষে শ্বাসরোধে প্রাণ হারায়।"

একমাত্র এই ভারতেই ভিক্ষুক ও তার ভিক্ষালব্ধ অন্ন থেকে দান কর্‌তে কুণ্ঠিত হয় না। রাজা শিবি, রাজা হরিশ্চন্দ্র, দাতাকর্ণ এই দেশকেই পবিত্র করে গেছেন। সেই দেশ আজ এই। আচণ্ডালে আমাদের দান আরম্ভ কর্‌তে হবে। স্বামিজী তাই বলেছেন—"যদি আমরা সকলেই অমুতোভয়ে, দৃঢ় হৃদয়ে, তাবের ঘরে এক বিন্দু চুরি না রেখে, কাজে লেগে যাই, তবে আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের সমুদয় সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে, বিরুদ্ধ মতাবলম্বী আর কেউ থাকবে না, নবীন ভারতবাসী আবার প্রাচীন আর্য্যগণের ন্যায় উন্নত হবে।"

তারপর তিনি বলেছেন, "যেমন আমরা ইচ্ছা করি বা না করি পাশ্চাত্যদিগের সম্মিলিত কার্য্য-প্রণালী ও বাহ্যসভ্যতার ভাব আমাদের দেশে প্রবেশ করে; সমগ্র দেশকে ছেয়ে ফেল্‌বার উপক্রম করেছে; সেইরূপ ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনের বন্যা পাশ্চাত্যকে ভাসিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে। এর গতি রোধ কর্ত্তে কেউ সমর্থ নয়। আমরাও পাশ্চাত্যের জড়বাদ প্রধান সভ্যতার প্রভাব প্রতিরোধে অসমর্থ। সম্ভবতঃ কিছু কিছু বাহ্যসভ্যতা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর, আবার তাদের পক্ষে একটু আধ্যাত্মিকতাও আবশ্যক। এই রকম হলে তবে উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হবে। আমাদের যে পাশ্চাত্য থেকেই সব শিখ্‌তে হবে তা' নয়। সমগ্র জগৎ যুগ-যুগান্তর ধরে যে আদর্শ কল্পনা করে আস্‌ছে, যাতে শীঘ্র তার আবির্ভাব হয়, যাতে সকল জাতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেকেরই যতটুকু সাধ্য ভবিষ্যদ্বংশীয়দের দেওয়া উচিত।"

"আমাদের চল্‌তে হবে দুই পথের মাঝামাঝি যার একদিকে কুসংস্কারপূর্ণ প্রাচীন সমাজ, অন্য-

দিকে জড়বাদী ইউরোপীয় ভাব—নাস্তিকতা। এই দুই হতেই আমাদের সাবধান হতে হবে। "অনুকরণ বৃথা। সিংহচর্ম্মে আবৃত হইলেই গর্দ্দভ সিংহ হয় না। অনুকরণ দ্বারা তোমরা পাশ্চাত্য-জাতি হতে পারবে না, ইহা অসম্ভব। কিন্তু যদিই তা পার সেই মুহূর্ত্তে তোমাদের মৃত্যু, সেই মুহূর্ত্ত হতে তোমাদের জীবনে আর কিছু থাকবে না। সমুদ্রের প্রারম্ভ হতে, মানবজাতির ইতিহাসের লক্ষ লক্ষ বর্ষ হতে, একটী নদী হিমালয় হতে প্রবাহিত হয়ে আসছে; তুমি কি তাকে তার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাও? তাও যদি সম্ভব হয় তথাপি তোমার ইউরোপীয় হওয়া সম্ভব নয়।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বংশের কলঙ্ক

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু]

প্রথম পরিচ্ছেদ

ষড়যন্ত্রের ফল

সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে, দিনটাই মেঘলা ছিল। গোধূলির সময় ঝড় উঠিল, আকাশের কোলে কাল ছায়া পড়িল, চক্র দিয়া কাক চিল উড়িতে লাগিল, পশ্চিমের দিকটা আঁধার হইয়া আসিল। সকলে ভাবিল, ঝড় উঠিল, এইবার মেঘ কাটিয়া যাইবে। কিন্তু সামান্য একটু ঝড় উঠিয়াই থামিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কলিকাতার রাস্তা কাদায় প্যাচ্ প্যাচ্ করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে জল জমিল, স্থানে স্থানে কর্দ্দমাক্ত পথ পিচ্ছিল হইল। ক্রমে ফোঁটা ফোঁটা হইতে বৃষ্টি একটু জোরে নামিল, শীতল বাতাস বহিল, সঙ্গে সঙ্গে লোকের পথ চলাচল একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। কচিৎ দুই একটী লোক নিতান্ত দরকারে বাটীর বাহির হইল। কচিৎ দুই একখানা ছকড় গাড়ী জলে ছপ্ ছপ্ করিতে করিতে চারিদিকে কাদা ছড়াইয়া অন্ধকারের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিল।

কলিকাতা অপেক্ষা ভবানীপুর অনেকটা জন-হীন। বিশেষতঃ বৃষ্টি পড়িতেছিল বলিয়া বকুল বাগানের রাস্তায় জন-মানবের সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এই দুর্য্যোগেও একটী লোক দমস্ত পাড়া কাঁপাইয়া একখানি ডগ্-কার্ট হাঁকাইয়া আসিতেছিল, সে অরুণ-কুমার। তাহার আপাদ-মস্তক একটী বর্ষাতিতে মোড়া, কেবল মুখখানি সেই ঘুনর আবরণের মধ্য হইতে পাপড়ী মোড়া গোলাপের মত শোভা পাইতেছিল। গলির মধ্যে দুইটী মিউনিসিপাল আলোক হইতে ক্ষীণ রশ্মিপাত হইতেছিল, তাহাতে মেঘাচ্ছন্না ঘোরা-কৃষ্ণা রজনীর অন্ধ তামিস্র ভেদ হইতেছিল না। একস্থানের খানিকটা জায়গা এক দোকান ঘরের কেরোসিন ল্যাম্পের মিটমিটে আলোকপাতে অপেক্ষাকৃত আলোকিত হইয়াছিল, সেটা মুড়ীওলীর দোকানের সম্মুখ ভাগ। বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত অরুণকুমার একটু জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া আসিতেছিল। দূর হইতে দোকানের আলোক দেখিয়া সে অধিকতর আগ্রহের সহিত শিক্ষিত অশ্বের গতি বৃদ্ধি করিয়া দিল।

হঠাৎ এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। দোকানের সম্মুখে গাড়ীখানা আসিয়া পড়িতেই, একটী শ্বেত-বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তি পথের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে পার হইতে গেল। অরুণকুমার প্রাণপণ শক্তিতে অশ্ববল্গা টানিয়া ধরিয়া একবারে গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে হেলিয়া শুইয়া পড়িল, অশ্বও সম্মুখের পদদ্বয় শূন্যে তুলিয়া ভীষণ হ্রেষা-রব করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে "ও মাগো!" শব্দ করিয়া সম্মুখস্থ মূর্ত্তিটী পথিপার্শ্বে নিপতিত হইল। এ সকল কাণ্ড নিমেষের মধ্যে ঘটিয়া গেল!

অরুণকুমার লম্ফ দিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিল এবং ভূতলে জানু পাতিয়া বসিয়া নিপতিত মূর্ত্তিকে অঙ্কে উঠাইয়া লইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু মূর্ত্তির বিষম বাধাজনিত অস্ফুট কাতরোক্তি শুনিয়া ক্ষণেক থমকিয়া দাঁড়াইল, পরে গাড়ীর একটা লণ্ঠন আনিয়া মূর্ত্তির মুখপানে স্থির-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; সে দারুণ বিস্ময়ে ও ভয়ে দেখিল—রমণী-মূর্ত্তি! কি সর্ব্ব-নাশ! সে কি দেখে স্ত্রীহত্যা করিল? তাহার এ মহাপাপের শাস্তি কি? অরুণকুমার নিজেকে নিরুপায় মনে করিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কেহ কোথাও নাই, চারিদিকে ঘোর অন্ধ-কার, কেবল মুড়ি-ওলীর দোকান হইতে একটা ক্ষীণ আলোকরশ্মি নির্গত হইতেছে। অরুণকুমার একটু উচ্চস্বরে বলিল, "কে আছ দোকানে শীঘ্র এস, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।" কথা বলিতে বলিতে অরুণকুমার সেই ভূতলে নিপতিত স্ত্রী-মূর্ত্তিটীর দেহে প্রাণ আছে কিনা দেখিবার নিমিত্ত তাহাকে ধীরে ধীরে অঙ্কে উঠাইয়া লইল এবং তাহার বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া দেখিল বক্ষে স্পন্দন হইতেছে, শ্বাস-প্রশ্বাসও নির্গত হইতেছে। তখন তাহার অন্তঃস্তল হইতে একটা স্বস্তির নিশ্বাস প্রবাহিত হইল, সে ভগবানকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিল। রমণী হাতও পায়ের দিকে দেখাইয়া ইঙ্গিতে জানাইল, ঐখানেই আঘাত লাগিয়াছে, অন্য কোথাও নহে। অরুণ-কুমার অতি সন্তর্পণে রমণীর দেহখানি অঙ্কে উঠাইয়া লইয়া মুড়ি-ওলীর দোকান ঘরে প্রবেশ করিল, ঠিক সেই সময়ে বাবাজীও আলোক-হস্তে ঘারে উপস্থিত। তখন আহতা রমণী একেবারে অরুণের অঙ্কে এলাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বিপুল কেশরাশি কবরীচ্যুত হইয়া অরুণের হস্ত ও পৃষ্ঠাংশ আচ্ছাদিত করিয়াছিল। সে যেন দারুণ যাতনাবশে জ্ঞানহারা হইয়া একবারে অসংযত-বসন ও শিথিলেন্দ্রিয় হইয়া অরুণের অঙ্গে অজস্রতা ঢালিয়া দিয়াছিল।

বাবাজী আলোকটী উচ্চে উত্তোলন করিয়া হেঁটমুণ্ডে আহতা রমণীর পানে তাকাইতে গিয়া বলিলেন, "কি হয়েছেক বাবু? এই দুকানপাট তুইলে দিইছিলাম আর কি! এ কি দেখছি বটেক? এ যে মেইয়া লোক গো? আহা হা। গাড়ীকে লাগলো বটেক? লাগাও কেন্ নে বাবু হেথাকে?"

এই বলিয়া বাবাজী আলোক লইয়া ভিতরে পথ দেখাইয়া চলিল এবং ভিতরের একটা ঘরের শিকল খুলিয়া দিয়া তন্মধ্যস্থ তক্তপোষের উপর সজ্জিত ধপ্‌ধপে সাদা বিছানার উপর রমণীকে শোয়াইয়া দিতে ইঙ্গিত করিলেন। বাবাজী আলোক রাখিয়া রমণীকে শয়ান করাইবার ব্যাপারে অরুণকে সাহায্য করিলেন; কিন্তু সেই সময়ে সরল-বিশ্বাসী অতএব মূর্খ অরুণের সাক্ষাতেই রমণীর চোখের সহিত তাহার চোখের যে বিদ্যুৎ-বার্ত্তার চলাচল হইয়া গেল এবং তাহার ফলে উভয়ের চোখে-মুখে যে ঈষৎ হাসি খেলিয়া গেল, তাহা অরুণ সজাগ হইয়া থাকিলেও দেখিতে পাইল না। রমণী ক্ষণ-মাত্র চক্ষু মেলিয়া অরুণকে দেখিয়া লইয়াও বাবাজীর সহিত ইশারা করিয়া সেই যে চক্ষু মুদ্রিত করিল, সেই চক্ষু আর একবারও খুলিল না। তাহাকে দেখিয়া এইরূপ মনে হইল যেন সে অজ্ঞান অচৈ-তন্য।

অরুণ তাহার দিকে চাহিয়া ব্যাকুল ভীতি-

ব্যগ্রকণ্ঠে বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাঁচিবে ত ?" ওঃ কি গর্দ্দভ আমি, এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছি। যাই গাড়ী আনি গে, এখনই হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে হবে"—

অরুণ ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, বাবাজী তাহার হাত ধরিয়া থামাইলেন। এতক্ষণ অরুণ তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখে নাই, সে আহতা রমণীকে লইয়াই এত ব্যস্ত ছিল যে, কোনও দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না বলিলেই হয়। হঠাৎ এইরূপে বাবাজী তাহার হাত ধরাতে সে চমকিত হইয়া তাঁহার মুখ-পানে কিছুক্ষণ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে তাকাইয়া রহিল। ক্রমে তাহার মুখে চোখে দারুণ ঘৃণার চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "একি বাবাজী, তুমি এখানে ? তোমায় এ গলি দিয়ে দু'চার দিন যাতায়াত করতে দেখছি বটে, কিন্তু তুমি যে মুড়ি-ওলীর বাড়ী থাক, তা ত' জানি নি—"

"বাড়ী-ওলী যে মোর মাসী হইছেক গো বাবু, তার অর হইছেক, তাই ত দোকানপাট দেখ্‌ছি নিজেই গো। হাঁসপাতালে দিবেক্ কি গো ? হাঁসপাতালে দিলেক্ কি ফুলার অমনি শেষ লিখাসটি ছেড়েছেক্ গো! এই দেখেন না বাবু, হইছেক কি ? চেতন পাইছেক, বস্! হাড় গোড় ভাঙছেক্ (কথাটা বলিবার সময় বাবাজী জিব কাটিলেন) কি ?"

"তা ত' জানিনি। একজন ডাক্তার ডেকে আনি, ডাক্তার দেখলে বুঝতে পারবো।" অরুণকুমার যাইতেছিল, বাবাজী বাধা দিয়া বলিলেন, "না বাবু, তুমি হেথাকে থাক। মাসীকে ডাক পাড়ছি এসে বস্‌বেক। চিনা-শুনা নেই, মেয়েলোকের কাছেকে আমি বলতে পারছিক কি বাবু ?"

অরুণ বলিল, "আমারও ত চেনা-শুনা নেই। আজ প্রথম দেখলুম।" গাড়ীতে ধাক্কা লেগেছিল বলে বাবাজী একটু মুচকিয়া হাসিয়া চোখের ইসারা করিয়া বলিলেন, "তাই হবে বটেক। মাসী, ও মাসী মাসী গো। ঝট্ এসো হেথাকে একবারকে। তুমি বস হেথাকে বাবু, আমি চট ডাক্তার ডাক্ পাড়ছি, ঐ উপাশের গলিকে আছেক গো, যাব আর আসব বটেক।"

এই সময়ে মুড়ি-ওলী কাঁথা মুড়ি দিয়া ঘরে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই ঘরে উপস্থিত হইল। বাবাজী তাহাকে সংক্ষেপে ব্যাপার বুঝাইয়া দিয়া ডাক্তার ডাকিতে চলিয়া গেলেন। অরুণ এতক্ষণ কেমন হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। বাবাজী ঘরের বাহির হইলে অরুণের বুদ্ধিটা যেন আবার ফিরিয়া আসিল। সে মুড়ি-ওলীকে একবার ভাল করিয়া শয্যায় শায়িতা রমণীকে পরীক্ষা করিতে বলিয়া বাহিরে গেল। তখনও টিপ্ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছে। শিক্ষিত অশ্ব তখনও গাড়ী লইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বৃষ্টির জলে ভিজিতেছে। গলির মোড়েই অরুণের বাড়ী, কাজেই অরুণ গাড়ী ও ঘোড়া কাটতি বাড়ীর আস্তাবলে রাখিয়া আসিল এবং গৃহ-প্রবেশ অথবা বেশ-পরিবর্ত্তন না করিয়াই মুড়ি-ওলীর ঘরে ফিরিয়া আসিল।

তখন সেখানে ডাক্তার আসিয়াছেন। অরুণ ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র শুনিল, ডাক্তার বাবু মুখ বিকৃত করিয়া বলিতেছেন, "বড় সিরিয়াস (কঠিন), কেটালও (সাংঘাতিক) হতে পারে। অবশ্য হাত পা ফ্র্যাক্‌চার (হাড় ভাঙ্গা) বা ডিস্‌লোকেসান্ (হাড় সরে যাওয়া) হয় নি বটে, কিন্তু স্পেনটা (মচকিয়া যাওয়াটা) একটু বেশী রকমের হয়েছে। ভয় ওসবে নেই, ভয়ের কারণ আরও কিছু আছে।"

অরুণ দারুণ উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসিল, "কি, কারণটা কি ? প্রাণের ভয় আছে কি ?"

ডাক্তার বাবু বিজ্ঞের মত গম্ভীরভাবে হাসিয়া বলিলেন, "আছেও বটে, নাও বটে। আপাততঃ

একটা প্রেস্‌ক্রিপসন্ লিখে দিচ্ছি, আনতে পাঠান, আর একটু গরম জল করতে বলুন, সব ঠিক করে দিচ্ছি। হাঁ দেখুন, ওষুধ আনবার সময় লিন্ট, তুলো, ব্যাণ্ডেজের কাঠ, আইস-ব্যাগ একটা আনতে হবে, সে সবও লিখে দিচ্ছি।" অরুণ তখনই নিজে ডাক্তারখানায় ছুটিতেছিল, কিন্তু বাবাজী বাধা দিতে সে দুইখানা দশ টাকার নোট তাহার হাতে দিয়া ডাক্তারখানায় পাঠাইল। বাবাজী চলিয়া গেলে অরুণ সাগ্রহে বলিল, "টাকার জন্যে ভাববেন না ডাক্তার বাবু, যত টাকা লাগে দেবো, অভাগিনীর প্রাণরক্ষা করুন।" অরুণের চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। অরুণের অজ্ঞাতে কিন্তু জল দেখিয়া ঘরের মাঝে অজ্ঞাত চোখের সহাস্য ইসারা হইয়া গেল। অরুণ আবার বলিল, "আচ্ছা ডাক্তার বাবু, এর সেবা-শুশ্রূষা করতে ত' লোকের আবশ্যক। ভাল নার্স না হলে ঠিক মত ওষুধ-পত্র খাওয়াতে বা মাথায় আইস্-ব্যাগ ধরতে পারবে না। তাই বলছিলাম, হাঁসপাতালে নিয়ে গেলে হয় না?"

"বিপদ ত' ঐখানেই। এর আসল রোগ কন্‌কাসান্ অব দি ব্রেণ (মস্তিষ্কের সঙ্ঘোভ)। এ অবস্থায় একটুকু নাড়াচাড়া চলতে পারে না। তাতে হঠাৎ আবার একটা সক্ লাগলে হয় ত' তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হতে পারে।"

অরুণ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, তবে থাক। এইখানেই নার্সের ব্যবস্থা করতে হবে। আচ্ছা, ডাক্তার বাবু, মাথায় কোথায় লেগেছে, আমরা দেখতে পাই নি, হাতে পায়ে ব্যথাই দেখেছি।" এই সময়ে বাবাজী ঔষধ-পত্র লইয়া হাজির হইলেন।

ডাক্তার বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আপনাদের লে-ম্যানের (ডাক্তারি শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ লোকের) চোখে সেটা ধরা না পড়বারই কথা। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক বলে চুলে সে স্থানটা ঢাকা রয়েছে। দেখবেন সেটা? তবে একটু নাড়াচাড়া করতে হবে।"

"না, না, থাক্, থাক্। আপনি যখন বলেছেন, তখন তাই যথেষ্ট। তা ওখানটায় ওষুধ দেবেন কি করে?"

"এখন ওখানে এক্‌সটারনাল্ (বাহ্য) ওষুধ লাগান অসম্ভব, আজ কেবল ব্রেণ সুদিং (মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা) রাখবার ওষুধ খাওয়াতে হবে, স্প্রেণগুলোর (মচকান জায়গা-গুলোয়) ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে হবে। আর মাথায় আইস ব্যাগ দিতে হবে। অধিকন্তু ঐ যে লোমগুলো দেখ্‌ছেন ওটা একটু লিণ্টে ভিজিয়ে মাথার ক্ষতটায় আজ বেঁধে দিলেই হবে। তার পর কাল ক্ষতের আশপাশটা কামিয়ে দিয়ে অয়েণ্টমেণ্ট (মলম) লাগাতে হবে। দেখুন এই বালিশটা সেই ক্ষতের রক্তে ভিজে রাঙ্গা হয়ে উঠেছে।"

অরুণকুমার শিহরিয়া উঠিল। সে এত শক্ত, এত শক্তিশালী, এত সাহসী, অথচ স্ত্রীলোকের অঙ্গে রক্তপাত দেখিয়া (বিশেষতঃ তাহারই কৃত) বড়ই কাতর হইয়া পড়িল। সে আবার ব্যগ্রভাবে ডাক্তারের হাত দুটী ধরিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবু, যেমন করে পারেন আরাম করুন, যাকে কনসাল্ট (বড় ডাক্তারের পরামর্শ) করতে হয় করুন, সাহেব ডাক্তার আনতে হয় আনুন; পয়সার জন্যে ভাববেন না। নার্স, কম্পাউণ্ডার, এসিষ্টাণ্ট, কি চাকর, রুগীর পথ্য—যা লাগবে তার খরচ আমি দেবো। এই বাবাজীর কাছে যা দরকার বলবেন, বাবাজী আমার কাছে গেলেই টাকা পাবে।"

"কেন, আপনি কি আর দেখতে আসবেন না? আপনারই লোক না?"

"আসবো না? রোজ আসবো। আমি সে জন্য বলছি না। তবে বাবাজী রাতদিন থাকবে, আপনার দরকার মত তাকেই সব বলবেন।"

"তা বল্‌বো। তবে খরচাটা বড় কম হবে না বলে রাখছি। রাত্রি ৯টা থেকে সারারাত থাকতে

একটা নার্স ডেলি (প্রত্যহ) নেবে ৩৲ টাকা। তার পর কি আছে, আঙুর বেদানা আছে, দুধ আছে, ওষুধ-বিষুধ আছে।"

"আমি ত' বলেছি, ও সব খরচের জন্ত ভাব্‌বেন না, যা দরকার হয়, তাই দেবো। এখন কেমন দেখছেন, আরাম হবে ত' ?"

"তা ঠিক বল্‌তে পারছি নি, অন্ততঃ এখন না। হয়েছে কি জানেন, স্ত্রীলোকটীর ডেলিকেট অবস্থা (অন্তঃস্বত্বা), তার উপর এই আঘাত আর সক্। বাঁচলেও বাঁচাতে পারে, কিন্তু এর স্থল্ কন্‌সাস্‌নেস্ (সম্পূর্ণ জ্ঞান) ফিরে আসে কিনা সন্দেহ। যদিই বা ফিরে আসে, হয় ত' আঘাতের আগেকার কোনও কথা এর মনে না পড়তেও পারে।"

"তা হলে ওর ঠিকানা কি করে জানতে পারা যাবে ? ওর বাড়ীর লোকে ত' ওর জন্তে বড়ই চিন্তিত হয়ে থাকবেন ?" এই কথাটা বলিবার সময় অরুণের মুখে অত্যন্ত উৎকণ্ঠার চিহ্ন প্রকটিত হইল।

কক্ষের অন্ত সকলে কিন্তু মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, অরুণ তাহা দেখিতে পাইল না। ডাক্তার বাবু সেই হাসির মাঝেও মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "ঠিকানার কথা আপনি নাই বল্লেন, এর পর সেরে উঠলে ওকে যথাস্থানে দিয়ে আসবেন।" অরুণ এ কথার প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু ডাক্তার বাবু অন্ত কথার অবতারণা করাতে অরুণের কথা চাপা পড়িয়া গেল। ইহার বহুদিন পরে কিন্তু অরুণ এ কথার মর্ম্ম হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছিল !

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা ও সলা-পরামর্শের পরে, ডাক্তার বাবু উঠিলেন, অরুণও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল, বাবাজী আলোক লইয়া পথ দেখাইয়া চলিলেন। পথে নামিবার সময়ে ডাক্তার বাবু যখন টুপিটা পরিতে গেলেন, তখন হঠাৎ তাঁহার অপসারিত কেশগুচ্ছের অন্তরালে বাম ললাটের দীর্ঘদেশে একটী দীর্ঘ ক্ষত-চিহ্ন বাবাজীর ধৃত কম্পিত দীপশিখার প্রভায় স্পষ্টই নয়ন পথে প্রতিফলিত হইল। অরুণকুমার চমকিয়া উঠিল। ঠিক এই রূপেই না সে আর কোথায় দেখিয়াছে ? কোথায় —কোথায়—কোথায় দেখিয়াছে সে ? সেই স্মৃতির সহিত একটা বিভৎস কাণ্ড যেন সংমিশ্রিত। কোথায়—কোথায়—দেখিয়াছে সে ?

অরুণ চলিয়া গেল। ডাক্তার বাবু তাহার বিপরীত দিকে চলিলেন। কিছু দূর গিয়া তিনি এক মোড়ে একটী গাড়ী-বাড়াওয়ার নিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে আবার মুড়ি-ওলীর আস্তানায় ফিরিয়া আসিলেন। তখন দোকান-ঘরের দোর বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার বাবু দ্বারে আঘাত করিবামাত্র-ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, "কে ?" ডাক্তার বাবু বলিলেন, "আমি"। তখনই দ্বার খুলিয়া গেল, দ্বার পথে আলোক হস্তে দাঁড়াইয়া বাবাজী। রোগিনীর ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাক্তার বাবু দেখিলেন, রোগিনী শয্যার উপর সহজ মানুষের মত বসিয়া আছে এবং মুড়ি-ওলী গায়ের কাঁথা ফেলিয়া দিয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া কথাবার্ত্তায় মগ্ন আছে। ডাক্তার বাবুকে দেখিয়া সকলে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ডাক্তার বাবু একটা কেরোসিনের বাক্সের উপর বসিয়া চুরুট টানিতে টানিতে বলিলেন, "বাহাদুর মেয়ে বটে ! থিয়েটারে গেলে নাম কিন্‌তে পারতে। ওঃ কি চমৎকার অজ্ঞান অচৈতন্তের ভাণ করে অতটা কাল পড়ে রইল ! মাষ্টারলাদ (আশ্চর্য্য) !

গিরিবালা (পাঠককে বোধ হয় বলিতে হইবে না "আহতা" রমণীই গিরিবালা) হাসিয়া বলিল, "আমাদের জাতের সবাই কিছু না কিছু একটিং (অভিনয়) করতে জানে, আমি বা বাদ যাব কেন ?"

মুড়ি-ওলী কিন্তু গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমি বাপু কিন্তু ভাল বুঝছি নি। আগুন নিয়ে খেলা,

হাত পুড়তে বেশীক্ষণ লাগে না। যদি কাকে-বকে খবর পায়, তা হলেই ফাটক।"

বাবাজী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "থাম না কেন মাসী? ফাটককে দিবেক না মাথাকে দিবেক। ছেমড়ার ঘটকে বুদ্ধি আছেক কি?" যা বুঝাবেক তাই বুঝবেক।"

গিন্নিবালা ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বলিল, "তা না থাকুক, কিন্তু মনটা ওর বড় সরল। আহা! ভাবলে সত্যিই আমার লেগেছে, কি কষ্ট, কি কাকুতি-মিনতি জানালে। ওর উপরে অত্যাচার করতে মায়া হয়!"

যদি গিন্নিবালা এতক্ষণ বাবাজীর মুখের দিকে তাকাইত, তাহা হইলে তাহার মুখের কথা মুখেই থাকিয়া যাইত। বাবাজীর চোখ-মুখ হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। তিনি ভীষণ ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, "ওঃ মায়া দেখাতে আসছেক বটে! তবে ইহাতে নামলেক কেনে বাপু? কার মাথাকে বাধা ঘটছিল বটেক?"

ডাক্তার বাবু মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, "আর যেতে দাও না বাবাজী, ছেলে মানুষ, বলেই থাকে যদি একটা কথা। এখন বন্দোবস্তটা হচ্ছে কি রকমের। এ যা দেখছি, এ তো একটা বড় রকমের দাঁও।"

বাবাজী টিকায় আগুন ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন, "আরে যা কথা আছেক, চার বখরাই হবেক, মোকে, মাসীকে, গিরিকে আর তোমাকে, কেমন বটেক?"

"আরে তা ত জানলেম। এখন আদায় কত হবে জানবো কি করে? আমি রইলেম কালীঘাটে, তোমরা এখানে মাল হাতিয়ে ভাগ বাঁটোয়ারা করে পরে আমায় ছোবড়াটা দেবে ত? ওতে আমি নেই।"

"গৌরচন্দ্র! রাধেচন্দ্র! মোকে এমনই ভোকলা পেলে বটেক। মাসীকে জিজ্ঞেসো, কড়া-ক্রান্তিটাকে নিতাই বাবাজী ঠকেক হইছে নি।"

"তোমাদের কি, তোমরা বাসা বেঁধে আছ। আমার সেই কালীঘাটের পসার ফেলে আজ দশদিন ধরে এইখেনে হাড় চক্কোত্তির হোটেলে ছেঁড়া কাঁথায় পড়ে থাকতে হয়েছে। খাওয়ার সুখটা কি? বুকড়ি চাল, ফেন-মেশান ডাল, ঘেরা চচ্চড়ি, আঁশ-শুদ্ধ মাছ। তার উপরে ছারপোকা মশা, আবার চুড়োর উপর ময়ূরপাখা—ইঁদুরের কামড় আর ছুঁচোর গু! তার উপর জেল কয়েদির মত লুকিয়ে থাকা। বাবা, এর সুদ পোষান চাই।"

"কেনে কোন দিনকে পাওনি বটেক? এই যে সেদিনকে পুষ দেশকে ছুঁড়ি—ফেলাতে আসলেক খুড়ার সাথেকে কালীঘাটকে—"

ডাক্তারবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "থাক্, থাক্, ও কথা যেতে দাও। তবে বলছ কি, বুঝে-সুঝে বখরাটা কোরো। আমায় এখন কালীঘাট হতে যেতে আসতে হবে, আর এখানে থাকবার ত' দরকার নেই।"

গিন্নিবালা হাসিয়া বলিল, "না, পাখী খাঁচায় পোরা হয়েছে, আর দরকার কি, তবে আমায় দেখতে আসতে হবে ত'।"

"হাঁ, তা হবে। কিন্তু খুব সাবধান! ছোঁড়াকে তুলিয়ে রাখতে পারলেই কিছু হাতান যাবে। আর বকসিসের কথা যা আছে।"

ডাক্তার বাবু এইবার সত্যসত্যিই বিদায় লইলেন। যখন সদর দরজা বন্ধ হইল, তখন মুড়ী-ওলীর ঘর হইতে একটী লোক গুটি-গুটি বাহির হইয়া আসিল, সে রমেশ।

রমেশ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "বকসিসের কথা ডাক্তার বেটা কি বলছিল?"

বাবাজী বলিলেন, "তুমি যা দিব বলেছোক বাবু।"

রমেশ বলিল, "হাঁ, হাঁ, তা দেবো। কিন্তু যেন ওর কাছে ঘুণাক্ষরে আমার নাম কোরো না। বাবাজী, তোমার আর মাসীর আমি সোণার তাগা

গড়িয়ে দেবো, যদি ঐ ছোড়াকে তাড়াতে পারো রাম-সদন থেকে।" বলিতে বলিতে রমেশের হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইল, দন্তে দন্ত নিষ্পিষ্টিত হইল, চোখে-মুখে একটা দারুণ ঘৃণা হিংসার ভাব ফুটিয়া উঠিল।

বাবাজী সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "দেখে লিবেক্ বাবু ইয়ার পরকে, বড়মানুষের বেটাকে এই লাকের জলকে চোখের জলকে করছিক কি না! বেটা, মোকে দেয় কি না পুলিসের হাত্‌কে?"

গিন্নিবালা এ তথ্য জানিত না, সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসিল, "সে কি রকম?"

মুড়ি-ওলী বাবাজীকে জবাব দিবার অবসর না দিয়া বলিল, "ও মড়ার কথা কেন বল! কালীঘাটে একটা ছোট মেয়েকে ভুলিয়ে আন্‌ছিল বাবদার জন্যে, ঐ বড় মানুষের পো তখন কালীঘাটে স্কুলের ছোঁড়াদের খেলা শেখাতে যেতো। সে ঐ সব জানতে পেরে ওকে নাকালের একশেষ করেছিলো। তাই ত মিন্‌সের এত রাগ!"

বাবাজী তাহাকে দম দিয়া বলিলেন, "গৌর! গৌর! দিও চরণতরী গৌর!" ইহার পরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মুড়ি-ওলীর বাড়ীতে পরামর্শ চলিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

বিদায়

(মহারাজকুমার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়)

ভুলে যাও সব কথা, চ'লে যাও তুমি;
ওই যে সুদূর ক্ষুদ্রি দিগন্তের চুমি
শুধু চেয়ে আছে শূন্যে মহা পারাবার;
তুমিও তাহারি মত অনন্ত, অপার
কথা, ডুবাইয়া দাও আজি অতলের
তলে। জীবনের বঁধু মোর, মরণের
সাথি! যদি কোন দিন, নিতান্ত দারুণ
ব্যথা, উছলিয়া উঠে শূন্যে নিষ্করুণ
লাজে, নিরন্তর ধ্বনি তোলে অন্তরের
বাণী তব, নব প্রভাতের মন্তরের
সাথে, উদলিয়া উঠে হায় সর্ব্বজন
মাঝে আমাদের বাণী সুপ্ত-সুগোপন,
তবে, ওই সুনীলের সুদূর উচ্ছ্বাসে—
কহিও কাহিনী তব; সুরের আভাসে
শুধু নিবেদিও জীবনের দৈন্য তার
যত; কেহ বুঝিবে না কিছু—বেদনার
বাণী, রাগিণীর ছায়াতলে বিকশিবে
কান্না; অন্তরের অন্তস্তলে উজলিবে
অতীতের স্বর্ণময় রেখা!

ওই দোলে
অস্তমান রবি-কর দিগন্তের কোলে!
দিনমান হোমানল দহনের শেষে
সবারে প্রণাম করি, চ'লে যাব হেসে
অজানা আঁধার লোকে, কোন ভয় নাই,
পূজা তার সাঙ্গ হ'ল শুধু ভাবে তাই!
তুমিও অমনি মোর জীবনের ধন,
ক্ষণিকের লাগি এই অনল-দহন
সমাপিয়া, চ'লে যাও বিস্মৃতির দেশে,
সবারে প্রণাম করি সবে ভালবেসে।

আজো মনে পড়ে, মোর জীবনের প্রাতে
কেমনে আসিলে তুমি; মালাখানি হাতে,
চাহিলে মুখের পানে। বাজিয়া উঠিল দূরে
বসন্তের বাঁশি; আঁধার হৃদয়-পুরে

শরতের শত-সূর্য্য উঠিল জলিয়া,
কম্পিত অধর তব কি-কথা বলিয়া
কাঁপিতে লাগিল পুনঃ ; উঠিল মর্ম্মরি
কাননের সব-শাখা নব-তান ধরি।
নীলাম্বরী অঙ্গে পরি, করবীতে ফুল,
অলক্ত-চরণ দুটি রক্ত সমতুল ;
কাঞ্চন কঙ্কণ মৃদু রিণি-ঝিনি বাজে ;
রক্তিম কপোল যেন ঘুরছিছে লাজে ;
নয়নের কোলে আঁকা রহস্যের রেখা
ললাটের পরে শ্বেত-চন্দনের লেখা,
নিঃশ্বাসে নিচোলখানি কাঁপি কাঁপি উঠে
বিকচ-কমল-হিয়া কার লাগি ফুটে !

শিথিল দুইটি হাতে ল'য়ে থালা গাহি
পরাণু তোমার গলে—কতবার যাচি,
শুনিনু একটি কথা বার বার ক'রে,
নয়নের কোণে কত অশ্রু প'ল ঝ'রে।
মনে হ'ল, যেন কোন স্বপনের দেশে,
এসেছিলে একদিন ম্লান হাসি হেসে—
গেয়েছিলে জীবনের বিচিত্র রাগিণী ;
শোকের তড়িৎ-শিখা, সুখের কাহিনী
মূর্ত্তি লভেছিল মোর হৃদয়ের পুরে,
কল্পনায় তুলি আর, কবিতের সুরে।
তার পরে শুধু বঁধু বিজয়ার পালা,—
নিভিল উৎসব-দীপ, অন্ধকার শালা।
চ'লে যাও মুছি ওই নয়নের ধার
বিদায়, বিদায় বঁধু, বিদায় এবার।

ছিন্ন-বন্ধন

(গল্প)

(শ্রীঅজয়কুমার সেন)

যেদিন দুই-ভাই একটি সামান্য পেয়ারা গাছ লইয়া মন-কসাকসি করিয়া যে যাহার ঘরে ফিরিয়া আসিল, সেদিন তাহাদের কি ভাবে যে কাটিয়াছিল ; তাহা ভাবিলে এখনও তাহাদের নিজ-নিজ গা শিহরিয়া উঠে।

পেয়ারা গাছ ছিল—দুই বাড়ীর সিমানার মধ্যে। এখন বিবাদ হইল এই লইয়া যে—এ ধারেও পেয়ারা পড়ে ও ধারেও পেয়ারা পড়ে। যিনি প্রথমে গিয়া বসন্তা বাধাইলেন তাহার মত, আমার পেয়ারা গাছের ফল তোমরা খাবে কেন ? তোমার ধারে যে সব পড়ে সব আমাকে ফেরৎ দেওয়া উচিৎ। এই উচিৎ ও অনুচিৎ লইয়াই তাহাদের দুইজনের মধ্যে বিবাদ।

তার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত এমনি করেই চলিয়া গেল। কেউ কাহারো সহিত কথাটি পর্য্যন্তও বলে না।

একদিন সাধুচরণ কোন একটা কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে। গাঁয়ের যত বালক সুমিষ্ট পেয়ারার লোভে সাধুচরণের বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া, পেয়ারা গাছে উঠিয়া, যে যাহা পারিল খাইল এবং কোঁচর ভরিয়া বাড়ীতে লইয়া ফিরিয়া আসিল। সাধুচরণের স্ত্রী স্বামীকে খাওয়াইয়া এবং নিজেও সকাল সকাল খাইয়া বিছানা যে লইয়াছিল—তাহা হইতে উঠিবার আর কোন লক্ষণ ছিল না। এইভিমধ্যে পাড়ার বালকেরা আসিয়া পেয়ারা উজাড় করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

ঘুম হইতে উঠিয়া সাধুচরণের স্ত্রী, পেয়ারা গাছের ভাঙ্গা ডাল, কাঁচা কাঁচা পেয়ারা গাছতলায় ছড়ান

এবং উঠানময় পেয়ারার খোসা চিবান ইত্যাদি দেখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলিয়া উঠিল। গায়ের জ্বালাকে দমন করিতে না পারিয়া মুখখানাকে এমন ভাবে বিকৃত করিয়া তুলিল যে সে মুখ দেখিলে বালকের অন্তর-পুরুষও বোধ হয় উড়িয়া যাইত।

মুখ বিকৃত করিয়াও যখন গায়ের অসহ্য জ্বালা নিবিল না, তখন সাধুচরণের স্ত্রী এমন ভাবে হুঙ্কার দিল যে পাড়াপ্রতিবাসীরা মনে করিল, না জানি সাধুচরণের বাড়ীতে বুঝি কোন ডাকাত পড়িয়াছে।

পাশেই ছিল সাধুচরণের বড় ভাই হরিচরণের ঘর। তখন বিকাল বেলা। হরিচরণ বাবার বসিয়া আপন মনে তামাক খাইতেছিল এবং সম্মুখে বসিয়া রহিম সেখ পাটের দড়ি পাকাইতেছিল।

হঠাৎ পাশের বাড়ী হইতে বিকৃত শব্দ আসাতে, হরিচরণ বাড়ীর মধ্যে যাইয়া স্ত্রীকে বলিল, "দেখ তো একবার ও বাড়ী গিয়ে বৌমা বুঝি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন?"

এই বলিয়া হরিচরণ সংবাদের জন্য উন্মুখ হইয়া বাহিরে চলিয়া আসিয়া উঠানে পায়চারি করিতে লাগিল। এবং রহিমকেও বলিল, "ওরে ও বাড়ীর পেছনটা একবার দেখে আয় ত রে?"

যখন কিছুকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল—কাহারও দেখা সাক্ষাৎ নাই—তখন হরিচরণ এক পা এক পা করিয়া নিজে সাধুচরণের উঠানে উপস্থিত হইয়া হাঁকিল, "সাধু—ও সাধু, বাড়ী আছ?"

কাহারও কোন উত্তর না পাইয়া হরিচরণ বাড়ীর পেছনে গিয়া দেখিল—একমাত্র পুত্র বলাই, কোঁচড় ভরিয়া পাকা পাকা পেয়ারা লইয়া খাইতেছে এবং দুই বৌয়ের মধ্যে যে ভীষণ রকমের একটা ঝগড়া হইয়া গিয়াছে—তাহা তাহাদের মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল।

হরিচরণকে দেখিবামাত্র সাধুচরণের স্ত্রী অঞ্চল দিয়া মুখ ঢাকিল এবং তাহার স্ত্রী আসিয়া বলিল, "দেখ দেখি—এই হতচ্ছাড়া ছোঁড়ার জন্য দেশত্যাগি হব নাকি? কতদিন যে বারণ করেছি - এ পোড়া পেয়ারা খেয়ে কাজ নেই—তাও কি এই মড়া শুনবে?" এই বলিয়া স্বামীর মুখের দিকে সজলনেত্রে উত্তরের আশায় চাহিয়া রহিল।

হরিচরণ এক নিমেষে সব কথা বুঝিয়া লইয়া, বলাইএর গালে ভীষণ এক চপেটাঘাত করিয়া, তাহার কোঁচরের সমস্ত পেয়ারা মাটিতে ছড়াইয়া দিয়া, মারিতে মারিতে বাড়ীতে আনিয়া ঘরের খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখিল। যখন ইহাতেও তাহার মনের গুমোর কমিল না—তখন তাহাকে ঘরের মধ্যে চাবি দিয়া, কিছু খাইতে দিবার ব্যবস্থা হইল।

এই কঠোর ব্যবস্থা করার দরুণ হরিচরণের অন্তঃকরণ যেন পুত্রস্নেহে সিক্ত হইয়া উঠিল—প্রাণ তাহার হাহাকার করিয়া উঠিল।

(২)

সামান্য এক পেয়ারার জন্য এত বড় একটা কাণ্ড চোখের সামনে হইয়া গেল দেখিয়া সাধুচরণের স্ত্রী হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া সব দেখিল। ইহার মধ্যে একটা কথাও বলিবার সে সময় পর্য্যন্ত পাইল না।

যখন মনের মধ্যে কোন রকমে সোয়াস্তি বোধ করিতেছিল না বরং প্রাণকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল, এমন সময় ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিল,—রহিম কাজ শেষ করিয়া ঘরে ফিরিতেছে। গোপনে তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া সাধুচরণের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রহিম, বলাই এখন কি করছে বলতে পার? আহা, ছেলেমানুষকে এত মার কেন—না হয় একটা পেয়ারাই খেয়েছিল?" বলিয়া সজলকণ্ঠে, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, পুনরায় কহিল, "আচ্ছা রহিম, তুমিই বল না কেন—মানুষে এমন মার মারতে পারে?" এই বলিয়া রহিমের দিকে উন্মুখ হইয়া চাহিয়া রহিল।

এই কথা শুনিয়া রহিম বলিল, "আহা, যে রকম করে বড়বাবু তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন—" আর বলিতে না পারিয়া চুপ করিয়া গেল।

এই কথা শুনিয়া সাধুচরণের স্ত্রী শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "কচি ছেলেকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে যাওয়া—এ কি রকমের আদর?" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু আরও আর্দ্র হইয়া উঠিল।

পুনরায় রহিম কহিল, "আবার তাকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছে—আজ আর কিছু খেতে দেওয়া হবে না।" এই বলিয়া সে চুপ করিলে, সাধুর স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "রহিম, তুমি বল্‌তে পার এত বড় কঠিন কাজ বাপ্‌মায়ে কখনো কর্‌তে পারে? সে বাপও নয়—মাও নয়—তারা শত্রু!" বলিয়া কাপড় দিয়া চোখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রহিম এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এদিকে সন্ধ্যাও গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। রহিমের কথা শুনিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিলে, সাধুর স্ত্রী কহিল, "রহিম, তুমি কি কোন রকমে বলে কোয়ে বলাইকে আন্‌তে পার না?"

রহিম চুপ করিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না। সাধুর স্ত্রী কোন রকমে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দাবায় শুইয়া পড়িল। শুইয়া কিছুক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িল, এমন সময় বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া সাধু ডাকিল, "আলোটা একবার দেখাও না, বড় যে অন্ধকার?"

কিয়ৎকাল চলিয়া গেল, তথাপি কাহাকেও আলো আনিতে না দেখিয়া, সাধুচরণ এবারে জোর গলায় ডাকিল। স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ধড়পড় করিয়া উঠিয়া চক্ষুকে ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া আলো দেখাইবার জন্য দাবা হইতে উঠিয়া পড়িল।

আলো লইয়া যখন স্বামীর নিকট আসিল, তখন কাতরকণ্ঠে কহিল, "আমার আজ শরীরটা ভাল নেই—ঘুমিয়ে পড়েছিলুম তাই তোমার ডাক আমি শুন্‌তে পাইনি।"

"হুঁ বলিয়া কোন রকমে ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

সাধুচরণ কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে "শরীর কেমন আছে" প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সে কোনটারও বা উত্তর পাইল আর কোনটারও পাইল না।

স্ত্রীর এইরূপ ভাব দেখিয়া সাধুচরণের মনে সন্দেহ হইল; ভাবিল বোধ হয় কিছু একটা হয়েছে—তাহার ফল এই মন ভাল নাই।

সন্ধান লইয়া জানিল, সেদিন আর কিছুই রাঁধা হয় নাই, তখন কোন রকমে সাধুচরণ নিজেই সমস্ত গুছাইয়া লইয়া কিছু খাইল এবং স্ত্রীর জন্য রাখিয়া দিল।

রাত্রিতে শুইয়া সাধুচরণের স্ত্রী স্বামীকে অতি করুণ-কণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা, আমাদের ঐ সর্ব্বনেশে পেয়ারা গাছটাকে কেটে ফেল্‌লে হয় না? এর জন্য ত যত গোলমাল। বলাইকে আজ যে রকম মার দিয়েছেন ভাসুর—আহা ছেলে মানুষকে অত মার মারতে হয়?" বলিয়া চাপা গলায় চুপ করিল।

সাধুচরণ একে একে সমস্ত কথা শুনিয়া "হুঁ" বলিয়া চুপ করিলে, তাহার স্ত্রী কহিল, "তোর হোলে একবার ও বাড়ী গিয়ে বলাইকে ডেকে নিয়ে এস।" বলিয়া স্বামীকে ভেদ করিতে লাগিল।

(৩)

পরদিন অতি ভোরে সাধুচরণ গিয়া দেখিল—হরিচরণ দাবায় বসিয়া তামাক খাইতেছে।

সাধুকে অত ভোরে আসিতে দেখিয়া, হরিচরণ ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, "কি খবর ভাই সাধু—কোন সংবাদ আছে?" বলিয়া উত্তরের আশায় তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

"বলাইকে একবার দেখ্‌তে এসেছি দাদা, কাল নাকি—" আর বলিতে না পারিয়া চুপ করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

"হাঁ, এত বারণ করা সত্ত্বেও হতচ্ছাড়া পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা খেয়েছিল—সেই জন্য তাকে শাস্তি দিয়েছি। কেন—ও ছাই না খেলে কি

একদণ্ডও চলে না, এখন কি জিনিষ ?" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আপন মনে সব বলিয়া যাইতে লাগিল।

সমস্ত কথা শুনিয়া সাধুচরণ বলিল, "দাদা, মারলে কি গায়ের সব জ্বালা মিটবে ?"

"কি করি বল—পেয়ারা গাছ ত আমার নয় যে ছাই আমি কাটবো ?" এই বলিয়া হরিচরণ অন্যমনস্কভাবে অন্য দিকে চাহিয়া রহিল।

হরিচরণের এই উক্তি সাধুচরণকে বিদ্ধ করিল। সে কোন কথা না বলিয়া মন্থরপদে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

সাধুচরণকে একলা আসিতে দেখিয়া, তাহার স্ত্রী বলিয়া উঠিল, "কই—বলাইকে আন্‌লে না, ওরা বুঝি দিলে না ?" বলিয়া যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেই স্থানেই শুম হইয়া বসিয়া পড়িল।

হরিচরণ যে সব কথা বলিয়াছিল, একে একে সমস্তই সাধুচরণ তাহার স্ত্রীকে বলিল। পরিশেষে ইহাও বলিল যে যত অনর্থের মূল ঐ পেয়ারা গাছ।

এই রকম করিয়া দুই একদিন অতীত হইলে; একদিন সত্যই সাধুচরণের স্ত্রী শয্যা লইল। হঠাৎ এই রকমের শয্যা লওয়াতে সাধুচরণ বিষম বিপদে পড়িয়া গেল। এমন কি শেষে তাহার উঠিবার শক্তি পর্য্যন্তও তাহার লোপ পাইল।

সাধুচরণ ডাক্তার ডাকিয়া আনার কথা বলাতে, সাধুর স্ত্রী কহিল, "ডাক্তার আমার কি করবে—যার মনের মধ্যে অসুখ, বাইরে ডাক্তার তার করবে কি ?" এইরূপ কথা শুনিয়া সাধুচরণ হতাশ হইয়া পড়িল।

যখন মরণ তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে না লইয়া ছাড়িবে না, তখন এক দিন স্বামীকে ডাকিয়া কাতরে বলিল, "এত দিন তোমার কাছে আছি, একদিনও কোন জিনিষ চাইনি, এবারে আমার এক প্রার্থনা তোমাকে পূরণ কর্ত্তে হবে। মরণের আর ত দেরী নাই—একবার বলাইকে ডেকে আন, জনমের মত তাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে চিরদিনের অশান্ত প্রাণকে শীতল করে নিই।" এই বলিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সাধুচরণের সংযত-প্রাণ শিথীল হইয়া গেল। সে উল্কার মতন ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

হরিচরণের ঘরে আসিয়া সাধু দেখিল—ঘর ভরিয়া লোক কিসের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া দাদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা বলাই কোথায়—তার খুড়িমা যে তাকে ডাকছে।" এই বলিয়া হরিচরণের দিকে কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সাধুর এই কথা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, হরিচরণ বলিল, "ভাই, বৌমার কি কিছু হয়েছে ?"

"আপনার বৌমার আর ত বেশী দেরী নেই—কেবল বলাই—বলাই বলে কাত্‌রাচ্ছে। দাদা, একবার আপনার বলাইকে দিন—একবার দিন।" বলিয়া উত্তরের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

এই কথা শুনিয়া হরিচরণ আরও যেন মুস্‌ড়াইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হরিচরণ কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল, "সাধু, বলাই যে আমার এখন যায় তখন যায় এই তার অবস্থা। আর তার কি ভাই—দুই মায়ে-পোয়ে এইবার একসঙ্গে চল্লো।" এই বলিয়া হরিচরণ ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া উঠিল।

এই কথা শুনিয়া সাধুচরণ তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুনিল, বলাই একবার শেষ ডাক ডাকিল—"খুড়িমা" বলিয়া এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিল।

বলাইএর নিকটে উপস্থিত হইয়া সাধুচরণ তাহাকে বুকের মধ্যে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা বলাই, তোর খুড়িমা যে তোকে ডেকে

পাঠিয়েছে—একবার কি যাবি না বাবা ?" বলিয়া তাহাকে লইয়া মাটির উপর লুটাইয়া পড়িল।

* * * *

হরিচরণ সাধুচরণের গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র—শব্দ শুনিয়া সাধুর স্ত্রী বলিয়া উঠিল, "বাবা বলাই, এতক্ষণ পরে এলি একটু আগে আস্‌তে পারলি না বাবা ?" এই বলিয়া যে মন বিছানা হইতে উঠিতে যাইবে, অমনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। হরিচরণ তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া দেখিল, দেহ প্রাণশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে।

তখন রাস্তা দিয়া এক পাগল আপন মনে মন খুলিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে,

"এত সাধের মানব জনম,
রইল পড়েরে হে-হে-রে।"

পাগলের আর্ত্ত-ধ্বনী আকাশ ও বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

পরদিন সাধুচরণ সেই সর্ব্বনেশে পেয়ারাগাছটাকে সমূলে কাটিয়া ফেলিয়া বাবার চরণমূলে আছড়াইয়া কাঁদিয়া পড়িল।

ম্যাক্সিম গোর্কির কথা

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)

ম্যাক্সিম গোর্কির নাম আজ বিশ্ববিখ্যাত। ইঁহার প্রকৃত নাম এ্যালেক্সি ম্যাক্সিমেভিচ্ পেশকভ্। ১৮৬৯ খৃঃ নিজনি-নভগর্ডে ভ্রমজীবি পিতামাতার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। এ্যান্ড্রুয়েডের মত বাল্যকাল হইতেই ইঁহাকেও নিজের উপায় নিজেকে করিয়া লইতে হইয়াছিল। সামান্য পাঁচ মাসকাল স্কুলে যাতায়াতের পর, ইনি এক মুচির নিকট শিক্ষানবিশরূপে ব্রতী হন। সেই সময় হইতে তাঁহার জীবন নানা বিচিত্র ঘটনা ও অভিজ্ঞতায় অতিবাহিত হয়। ইনি যখন ষ্টীমারে কাজ করেন, সেই সময় একজন বাবুর্চ্চি ইঁহাকে 'গল্প' ও 'ডুমার' রচনার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া গোর্কির হৃদয়ে প্রথম সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা জাগাইয়া দেন। পোনের বৎসর বয়সে ইনি ক্যাজান ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশের চেষ্টা করিয়া সেখানে স্থান না পাইয়া, এক বিস্কিটের কারখানায় মাসিক ছয় শিলিং বেতনে কাজে লাগিয়া যান। এই ঘটনার বর্ণনা আমরা ইঁহার রচিত "Twenty six of us and one other" নামক গল্পে পাই। ইহার পরে ইনি জিপ্‌সিদের মত কর্ম্মহীন অবস্থায় ভবঘুরের মতন জীবন-যাপন করেন, ইহার পরিচয় আমরা "A Rolling stone" "In the steppe" এবং "One Autumn Night" হইতে পাই। ইহার পর ইনি রাস্তায় 'আপেল, বিস্কুট' প্রভৃতি বিক্রয় করেন, এবং পরে একজন ব্যারিষ্টারের সেক্রেটারী হন। পরে আবার দক্ষিণ রাশিয়া, উক্রেনিয়া, ক্রিমিয়া' ককেসাস প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া বেড়ান, এই ভ্রমণ ইহাতেই "Chelkash" বই লেখা।

১৮৯৩ খৃঃ প্রসিদ্ধ স্বাধীনচেতা সম্পাদক ও ঔপন্যাসিক ভেঁডাইমির কোরলেঙ্কোর সহিত গোর্কির পরিচয় হয় এবং ইঁহারই উৎসাহে গোর্কির আশা সাফল্যে মণ্ডিত হয়। পর হইতেই তাঁহার ইহার এবং লেখা প্রকাশিত হইতে থাকে এবং শীঘ্রই ইনি নির্য্যাতিত, বাক্তি-দলের মুখপাত্র হইয়া উঠেন।

পুলিশদের অত্যাচার পূর্ণ একটি সঙ্গীত গাওয়ার জন্য ইনি ক্রিমিয়ায় নির্ব্বাসিত হন, এবং রাশিয়ান এ্যাকাডেমির মাননীয় সভ্যপদ হইতে

ইহাঁর নাম কাটিয়া দেওয়া হয়। ১৯০৪ খৃঃ পুটিলভ লোহার কারখানার ধর্ম্মঘটে যোগ দেওয়ায় এবং জারের নিকট আবেদন পেশ করিতে যাওয়ায় বহুলোক পুলিশের গুলিতে নিহত হয় এবং গোর্কিকেও সেইসঙ্গে কারাগারে পাঠান হয়।

বাল্যজীবনের প্রভাব এবং বিপ্লবে সহানুভূতি ইহাঁর প্রত্যেক রচনাতেই পাওয়া যায়। এমন হৃদয়-ভেদী জ্বালা, এমন বিপ্লব মতের সহিত এমন কোমল স্নেহের-পরশ, এমন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য জ্ঞানের মিলন, এইরূপ অসাধারণ মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। ইহাঁর বাস্তব চিত্র ও চরিত্রগুলি জগতের সাহিত্য ভাণ্ডারে অতুলনীয়।

নীজের জীবনের জ্বালা অশ্রুসিক্ত অভিজ্ঞতায়—স্বাধীনতার অদম্য ইচ্ছায় এবং প্রকৃতিগত কবিত্বে গোর্কির লেখা তাঁহার দেশের সকলের নিকট আদৃত। বোধ হয় সকল দেশেরই উদার মনের নিকট ইহা সমানভাবে আদৃত হইয়াছে।

ইনি অনেক ছোট গল্প এবং কয়েকটি মাঝারি গল্প ছাপাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে "Foma Gordeyoo", "Creatures that once were men" "Mother" "A Confession" "The spy" প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"The Smug citizen" "A Night's

সহ্য করিয়াছেন বরং কাহারও নিকট হইতে একবিন্দুও স্নেহ বা সহানুভূতি না পাইয়া নিজের চেষ্টায় ও নিজের মনের জ্বালা, দৈন্য ও আশা—কাগজের পাতায় ছড়াইয়া দিয়া জগৎ-বরেণ্য হইয়াছেন। ইহাদিগকে দেখিয়া সামাজিক জীব একটু বিব্রত হয়—কিন্তু শত অত্যাচারে জর্জ্জরিত; ক্লিষ্ট ও ব্যথিত দরিদ্রেরা ইহাদিগকে পরম বন্ধু ভাবিয়া পূজা করে।

আরো এক কথা—আমাদের দেশে এক শ্রেণীর রুচিবাগিশ লোক আছেন, যাঁহারা মনে ও মুখে কখনও এক হইতে দিতে চাহেন না। 'রাখি ঢাকি ছাপি ছুপি' ইহাদের মূল-মন্ত্র। সমাজেও সাহিত্যে, নীতিজ্ঞানে, শিক্ষায়, সকল ব্যাপারেই এই কথা। যাঁহারা এ নীতির পক্ষপাতী তাঁহাদের পক্ষে বিদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদিগের রচনা না পড়াই ভাল। Realistic রচনা বা মানুষের মন ও অন্তঃপ্রকৃতির কথা লইয়া কোন কিছু কহিতে গেলেই এমন কতকগুলি কথা কহিতে হইবে যাহা 'রাখি ঢাকি ছাপি ছুপি' দলের মোটেই প্রিয় হইবে না। অথচ আধুনিক অধিকাংশ পাঠকই এই শ্রেণীর রচনার একান্ত ভক্ত।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'

পড়িতে

আমাদিগের সহানুভূতি যেন আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।

দেশের সত্য অবস্থা বুঝাইয়া নির্ভীক্ ভাবে পাকা আর্টিষ্টের মত ঘটনা সংস্থানও বর্ণন করিয়া চরিত্র গড়িয়া তোলাই রচনার সার্থকতা, সে ধরণের রচনা আমাদিগের সাহিত্যে নাই বলিলেই হয়। গোর্কি, ডষ্টয়েভ্স্কি প্রভৃতি অধিকাংশ রুশ-সাহিত্যিকদিগের কৃতিত্ব এই ধরণের রচনাতেই। শেখভের রচনার কৃতিত্বও এইখানেই। ইহাঁর কোন কোন গল্প পাঠ করিলেই রুশিয়ার সমাজ, দেশ, মানব-চরিত্র প্রভৃতি সহজেই বোঝা যায়।

লেখকের শক্তি থাকিলেও তাহা দেখাইতে জানিলে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার প্রশ্ন এবং আরও নানা অবান্তর ও তুচ্ছ ব্যাপার, এ সমস্ত অনেক নীচে চাপা পড়িয়া যায়—পাঠকের চক্ষের সম্মুখে শুধু ভাসিতে থাকে—তখন দেশের সনাতন শাশ্বত-মূর্ত্তি ও চরিত্র, এবং দেশের মরম ও তাহার অবস্থা।

আমরা বড় বড় আর্ট পূর্ণ বহি রচনা করি, কিন্তু দেশ — দেশের মরমকে বঙ্গোপসাগরের জলে বিসর্জ্জন দিয়া। এ আর্ট ও আর্টিষ্টকে লইয়া দু'দিন খুব হৈ চৈ চলিতে পারে বটে, কিন্তু দু'দিন পরেই তাহার নাম ও আর শোনা যায় না

সত্যি কথা, সমস্তটা জাতি তিল তিল করিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। দেশের নবীন দলেদের হৃদয় আশাহীন, চক্ষু দীপ্তিহীন। চাকরী—চাকরী করিয়া দেশের তরুণের দল মত্ত, দেশের বিদ্যা-মন্দিরগুলিও সেই চাকরীর পথেই দেশের যুবকগণকে মরীচিকা-মুগ্ধ পথিকের ন্যায় টানিয়া লইতেছে। কৈ এ সব জীবন-মরণের সম্পাদনকারী ঘটনাবলী লইয়া তো তরুণদলের ভিতর হইতে কেহ ত একখানিও উপন্যাস রচনা করিতেছেন না? এদেশে আজ সমস্যার ত অভাব নাই। সত্য ঔপন্যাসিকের রচনার খোরাকেরও অভাব নাই, অভাব রহিয়াছে শুধু তেমন লেখকের, যিনি দেশের সত্য মরম-কথাটি লেখনী মুখে ফুটাইতে পারেন।

গোর্কি প্রভৃতি লেখকের রচনায় দেশের ছায়া-চিত্র এই ভাবে তাঁহারা সাহিত্যে ফুটাইতে পরিয়াছেন বলিয়াই আজ তাঁহাদিগের খ্যাতি বিশ্ব-ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

রহস্য

(চিত্র)

(অধ্যাপক শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম, এ)

(১)

চিরদিন আমাদের গ্রামটির দশা এমন ছিল না। এক সময় গমপেষার ব্যবসা খুব চলত এখানে। দশক্রোশের মধ্যে যত চাষা ছিল, তারা তাদের গম আনত পেষাবার জন্যে। গ্রামের উত্তরদিকের ছোট পাহাড়টিতে অনেক আটার কল ছিল। এই কলগুলি চলত হাওয়ার জোরে। উঁচু পাইন গাছের মাথার উপরে কলের কাপড়ের চাকা দিন-রাতই ঘুরত। মোটা মোটা গাধাগুলো গমের বস্তা পিঠে করে, এক লম্বা সারি বেঁধে পাহাড় বেয়ে বেয়ে ধীরে ধীরে উঠত। সপ্তাহের ছয়দিনই গ্রামের রাস্তায় চাবুকের ছপ্ ছপ্ শব্দ, কলের চাকার ঘুর ঘুর আওয়াজ, আর কলের মজুরদের গান নিরালা গ্রামটিকে সরগরম করে তুলত। রবিবার দিন গ্রামের লোকেরা কলে বেড়াতে যেত, কলওয়ালারা অতিথিদের খুবই আদর আপ্যায়ন করত। তাদের গৃহিণীরা মিহি লেসের জামা পরে আর সোনার ক্রস ঝুলিয়ে অতিথিদের বাঁশীর সুরের তালে তালে নাচত। বাস্তবিক এই সকলগুলি ছিল গ্রামের সম্পদ আর আমোদের উৎস।

এই উৎস শুকিয়ে গেল। জনকয়েক বিদেশী এই গ্রামের আর এক প্রান্তে এসে এক বাষ্পে চালানো আটার কল খুলে বসল। বাষ্পে চলে—এ এক নূতন কথা। সকলে স্থির করলে এই নূতন কলে গম পাঠাতে—আর হাওয়াকল গুলি রইল উপোষী। কিছুকাল তারা ঘুরল বটে, কিন্তু শীঘ্রই তাদের একে একে কলগুলি বন্ধ করতে হল। আর গাধার দল পাহাড় বেয়ে উঠত না—অভাবে পড়ে কলওয়ালার সুন্দরী গৃহিণীরা সোনার ক্রস বিক্রী করতে বাধ্য হল। কলবাড়ীর গানবাজনা, আমোদ উৎসব সবই থেমে গেল। একে একে কলগুলি ভেঙ্গে গেল এবং সেই জমিতে আঙ্গুরের চাষ সুরু হল।

কিন্তু এই সব ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মাঝেও একটি কল এখনও মাথা উঁচু করে রইল, আর বাষ্পীয় কলকে অগ্রাহ্য করে তার চাকা ঘুরতে লাগল। কর্ণেল আজ ৬০ বছর তাঁর কলে গম পিষছেন। এই কলটি ছিল তাঁর প্রাণ। বাষ্পীয় কলের কাজ আরম্ভ হওয়াতে, তিনি যেন ক্ষেপে গিয়েছিলেন। সপ্তাহ খানেক তিনি গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় ছুটে বেড়িয়ে, লোক জড় করে প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে সোনাতে লাগলেন—"ভাই সকল, এতদিন ধরে আমাদের হাওয়ার কল চলে আসছে। তোমরা যদি নিজেদের সর্ব্বনাশ করতে না চাও, তা'হলে ঐ নূতন বাষ্পীয় কলে গম দিও না। ও কলের আটা বিষ মাখা—বদমায়েসেরা ঐ আটা তৈরী করে

তখন ...বাড়ীতে ঢুকলেন। মানুষের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবেন না স্থির করলেন। এমন কি তাঁর নাতনী ডিভেট-কেও তাঁর বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। সে বেচারী বাপমাকে' হারিয়ে এতদিন তাঁরই আশ্রয়ে ছিল, এখন বাধ্য হয়ে তাকে খেটে খেতে হল। কিন্তু বুড়ো তাকে খুব ভালবাসত তাই কোন কোন দিন দুপুরের দারুণ রোদে ছক্রোশ রাস্তা হেঁটে নাতনীকে দেখতে যেত। যতক্ষণ ডিভেটের কাছে থাকত, কেবল তার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত।

গ্রামের লোকে ভাবলে যে বুড়ো শেষে কি পয়সা বাঁচাবার জন্যে খরচের ভয়ে নাতনীকে তাড়ালে। এর চেয়ে গর্হিত কাজ আর কি হতে পারে? বেচারী ডিভেট, ছেলে মানুষ, তাকে এখন অন্য পুরুষের সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে—আর অর্থলোভী বুড়ো তাই দেখে। সকলে আরও বিরক্ত হল কর্ণেলের মত প্রাচীন লোকও কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে গ্রামের রাস্তার উপর দিয়ে দিন দুপুরে একশত ছেঁড়া পোষাক পরে যাতায়াত সুরু করেছেন —লজ্জাসরম কি একটুও তাঁর নেই?

বুড়োর কলের রহস্য কিছু বোঝা যেত না। বহুকাল গ্রামের কেউ তার সম জোগায়নি, অথচ তার কলের চাকা সমান ভাবেই ঘুরত, এটা সবাই লক্ষ্য করত। সন্ধ্যার সময় দেখা যেত কর্ণেল তার গাধার পিঠে এক বস্তা চাপিয়ে তার পিছনে চলত—' পিষছি।" এর বেশী আর সাধ্য ছিলনা যে—কলের ভিতর মাথা গলান—এমন কি ডিভেটেরও না। কলের সামনে কেউ গেলে দেখতে সদর দরজা বন্ধ, কিন্তু কলের চাকা সমান ঘুরছে। সেই বুড়োর আর গাধাটা অলসভাবে ঘাস খাচ্ছে সামনের মাঠে।

এ সবে বেশ রহস্যের গন্ধ মাখানো বলে লোকে নানা রকম জল্পনা কল্পনা করত। সকলে এই রহস্যের নানারকম ব্যাখ্যা করত, কিন্তু সবাই স্থির করেছিল যে কলে গমের বস্তা থাকুক আর নাই থাকুক, টাকার বস্তা ছিল অনেক।

কিন্তু হঠাৎ একদিন রহস্য ভেদ হয়ে গেল। কি করে হল বলছি।

এ কদিন আমি বসে বসে বাঁশী বাজাচ্ছি আমার ঘরের দাওয়ায়। হঠাৎ মনে হল আমার বড় ছেলে ডিভেটের প্রেমে পড়েছে। প্রায়ই তারা সুযোগ পেলেই একসঙ্গে বেড়াতে যায়—আড়ালে নির্জ্জনে কত গল্প করে। মনে মনে বিশেষ বিরক্ত হলুম না, কারণ কর্ণেল বংশ গ্রামের মধ্যে বনিয়াদী আর ডিভেট মেয়েটা খুব ভাল। সে আমার ঘরে ঘুরে বেড়াবে, দেখতে আমার ভাল লাগবে। ভেবে দেখলুম যে এদের প্রেমের ব্যাপারটা বেশীদূর অগ্রসর হবার আগেই একবার বুড়া কর্ণেলের মত জানা আবশ্যক। তাই আমি গেলুম কলে বুড়ার দেখা করতে। সেই বুড়ো ছুঁচো! যদি দেখতে সে আমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করলে। কিছুতেই তাকে দরজা খোলাতে পারলুম না। পাচীলের

বাহির থেকে কোন মতে তাকে আমার বক্তব্যটা শোনালুম। কিন্তু আমার কথায় বাধা দিয়ে বুড়ো আমাকে বললে—"এখানে ওসব কিছু হবে না। যদি তোমার ছেলের বিয়ে দিতে চাও, নতুন কলে যাও, অনেক পাত্রী পাবে।" বুঝতেই পারছো, আমার সর্ব্বশরীরের রক্ত রাগে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে লাগলো এই অভদ্র ব্যবহারে কিন্তু কোন মতে রাগ সামলে আমি ফিরে এসে ডিভেট আর আমার ছেলেকে বললুম। বেচারিরা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারল না—তারপরে আমার কাছে অনুমতি চাইলে—তাঁরা একবার বুড়োর কাছে যাবে। এদের করুণ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করতে পারলুম না।

যখন তারা কলে গিয়ে পৌঁছাল তখন কর্ণেল বেরিয়ে গেছে। দরজা বেশ শক্ত করে ভেতর থেকে বন্ধ করা, কিন্তু বুড়ো যাবার সময় পাঁচিলের ধারে সিঁড়িটা ফেলে গিয়েছে। হঠাৎ এই প্রেমিক-যুগলের খেয়াল হল যে ভিতরে কি আছে, দেখতে হবে। তারা সিঁড়ি বেয়ে পাঁচিলে উঠ্‌ল।

কি আশ্চর্য্য। কলের বড় ঘরটি একেবারে খালি—একটা বস্তা বা একদানা গমও কোথাও নেই—নীচের বুড়োর শোবার ঘরেও সেই রকম দারিদ্র্য ও অযত্নের চিহ্ন -এক ময়লা বিছানা, ছেঁড়া কয়েকটি পোষাক, এখানে এক টুকরো, ওখানে এক টুকরো রুটী, এককোণে ওই বস্তা,—তা'তে সুরকি বোঝাই করা।

এতদিনে কলের রহস্য-ভেদ হল। এই চুপ সুরকির বস্তা চাপিয়ে বুড়া তার গাধাকে নিয়ে যেত রাস্তা দিয়ে তার কলের মাল রাখবার জন্যে, আর লোককে বোঝাতে চাইত যে তার কলে এখন ও আগের মত আটা তৈয়ারী হয়। বেচারা কর্ণেল! বহুপূর্ব্বেই বাষ্পের কল তার বহু খদ্দেরকে ভাঙিয়ে নিয়ে গেছে—তবুও কল সেই পূর্ব্বের মতই চলে—আর পেষা হয় তাতে চুণ সুরকি।

ডিভেট আর আমার ছেলে কাঁদতে কাঁদতে এসে সব বললে। শুনে আমার বুক ফেটে গেল। এক মুহূর্ত্তও আর না নষ্ট করে পাড়ার সকলের সঙ্গে দেখা করে গুপ্তকথা ব্যাপারটা সব বুঝিয়ে দিলুম। স্থির হল যে প্রত্যেকের বাড়ীতে যা' কিছু গম অবশিষ্ট আছে, কর্ণেলের কলে তা' পৌঁছে দেওয়া হবে।

কিছুক্ষণ পরে আমার পিঠে বোঝাই করে সতিকার গম নিয়ে আমরা সব কলে গিয়ে উপস্থিত হলুম। কলবাড়ীর দরজা খোলা—সামনেই দেখি—কর্ণেল এক সুরকির রাস্তার ওপর বসে হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। ফিরে আসবার পর সে বুঝতে পেরেছে যে কেউ তার কলবাড়ীতে ঢুকেছিল—তার রহস্য-ভেদ হয়ে গেছে! আর কি হবে আমার? মরণই আছে বাকী। কলের মান-মর্য্যাদা আর রইল কই?" কলের নাম করে—ঠিক ছেলের মত—কত কথা, কত আক্ষেপ করে ব্যাকুলভাবে বুড়ো কাঁদছিল।

ঠিক সেই সময় আমরা গিয়ে পৌঁছলুম আর পূর্ব্বের মত হাঁক দিলুম—"ও কলওয়ালা, মাল নাও।" দরজার সামনে বস্তাগুলো উঁচু করে জমা করা হল আর মিহিগমের দানাগুলি দরজার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

বিস্ময়ে কর্ণেলের চোখ বেরিয়ে পড়ছিল। কয়েকদানা হাতের তেটোতে নিয়ে সে কখনও হাসে কখনও বা কাঁদে। "হাঁ, এই গমের দানা বটে? ভগবান, খাঁটী গম, সাচ্চা গম।" তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললে—"বলিনি আমি, তোমাদের আবার ফিরতেই হবে। নতুন কল নিয়ে কি চলে?"

আমরা স্থির করলুম যে তাকে কাঁধে করে গ্রামে ফিরে যাব। সে বাধা দিয়ে বললে—"দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমার উপোসী কলকে আগে কিছু খেতে দিই। কতদিন বেচারা একটি দানাও পায়নি।" বুড়ো তাড়াতাড়ি বস্তা উজোড় করে কলে ঢালল। কল আবার চলল, গম পেষা হল,—আর বুড়াও কলের তালে তালে নাচতে লাগল।

ভাগের পূজা

পূর্ব্ব পূজারীগণ ঃ—

[(১) শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া

(২) শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র মজুমদার]

৩

[লেখিকা—শ্রীসরসীবালা বসু]

শাস্ত্রে আছে ?—বজ্রনাদে কথা কয়টি বলিয়া নির্ম্মল একেবারে উন্মত্তের মত উঠানে আসিয়া দুই চক্ষু পাকাইয়া বলিয়া উঠিল—তোমার শাস্ত্রের নিকুচি করেছে, বুড়ো শয়তান !···সে বাঘহস্তে ছোট খুড়োর গলাটা উঁচিয়া ধরিয়া অগ্নিতেজে বলিল—আমি পালিয়েছি গয়লা বৌ-কে নিয়ে ! আমি ?—আমার নামে···

নির্ম্মল, সরে এস।

ছোট খুড়োর জিভ্ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি অতি কষ্টে করুণনেত্রে বার বার আমারই পানে চাহিয়া মুক্তি প্রার্থনা করিতেছিলেন। জমিদার পুত্র নীরবে দাঁড়াইয়া বোধ করি নির্ম্মলের দুঃসাহসিক কাণ্ডই প্রত্যক্ষ করিতেছিল, আমার কথা শেষ হইতেই সে নির্ম্মলের প্রসারিত হস্তের উপর তাহার সবল হাতখানি চাপাইয়া বলিল—ছাড়ুন।

না, ছাড়ব না। তাহার চোখ দুইটা আগুনের মত জ্বলিতেছিল।—ছাড়ব না, কখন ছাড়ব না। আমার নামে বদনাম দেওয়া, এত বড় স্পর্দ্ধা !

জমিদার-পুত্র জোরে ঝাঁকানি দিতেই নির্ম্মলের হস্ত ছোটখুড়োর স্কন্ধচ্যুত হইয়া পড়িল। যাহা আশা করিয়াছিলাম, ঠিক তাহাই ! ছোট খুড়ো ছাড়া পাইয়া বজ্রিশ লাফ্ মারিলেন ; কোঁচার খুঁটটাকে পাকাইয়া পশ্চাদ্দিকে গুঁজিয়া, প্রবলস্বরে কহিলেন—এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার গায়ে হাত···

নির্ম্মল বলিল—হ'য়েছে কি তোমার এখুনি ! আমার নামে বদনাম, চেননা তুমি আমাকে ! ভালোয় ভালোয় গয়লা-বৌ কোথায় বলে দাও—তুমি আর তোমার জমিদার দু'জনে মিলে তাকে কোথায় সরিয়েছ ! গয়লাপাড়াশুদ্ধ লোককে আমি বলে এসেছি, তোমাদের কথা, সব জাহির হ'য়ে গেছে এতক্ষণে ! নিজেরা করে' আবার আমার নামে বদনাম !

জমিদার পুত্র শান্তস্বরে বলিল—বদনাম নয়, আপনার সঙ্গে তা'কে যেতে লোকে রাত্রে দেখেছে।

নির্ম্মল এক মুহূর্ত্ত বক্তার পানে চাহিয়া স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। সেই অবসরে জমিদার পুত্রকে সম্বোধন করিয়া আমিই বলিয়া উঠিলাম—নির্ম্মলকে আমিই পাঠিয়েছিলাম, তা'কে বাড়ী রেখে আস্‌তে !

আমার কথাও শেষ হইয়াছে, একদল লোক হৈ-চৈ করিতে করিতে অঙ্গনে ঢুকিয়া পড়িয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—এই যে বেটা বদ-মাস্ ! মার শালাকে··· ···

তাহাদের উদ্যত মিলিত বাহুর দিকে লক্ষ্য করিয়াই বুঝিলাম—ইহারা গয়লাপাড়ার লোক এবং জাতিতেও গয়লা ! নির্ম্মলের মাথার উপর ঝাঁক তুলিয়া যখন তাহারা সমস্বরে এক অকথ্য, অশ্রাব্য ভাষায় অগ্রসর হইতেছিল, আমি ঘরের দিকে ফিরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিলাম—প্রসাদ ! প্রসাদ ! —নিমেষ মধ্যে কি-যে ঘটিল বলা যায় না, চক্ষু

চাহিতেই দেখি, গোঁয়ার গোবিন্দ লোকগুলার হাতের বাঁক খুলে স্থির হইয়া গেছে! তাহাদের এবং নির্ম্মলের মধ্যে দুই বাহু বিস্তার করিয়া স্বয়ং সেই সুকুমার জমিদার পুত্র দাঁড়াইয়া!

নির্ম্মল যে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল এবং অন্তরের প্রবল জ্বালায় তাহার বাহ্যিকজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল, তাহা আমি তাহার মুখ দেখিয়াই নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলাম।

গয়লাদের সম্বোধন করিয়া জমিদার পুত্র বলিল—বেরিয়ে এস। ভদ্রলোকের বাড়ীতে দাঁড়িয়ে, ভদ্রমহিলার সাম্নে লাঠি তোলে না, বেরিয়ে এস···

দু'একটা লোক অসন্তোষভরে কি-একটা কথা বলিতে গেল, জমিদারপুত্র গম্ভীরস্বরে ডাকিল—রাখাল!

সব চেয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তি উত্তর দিল—হুজুর!

জমিদারপুত্র নিঃশব্দে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দ্বার নির্দ্দেশ করিলেন। লোকটা-ও নিঃশব্দে অনুচরদের লইয়া বাহির হইয়া গেল। সে যেন একটা যাদুমন্ত্র প্রভাবে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। গৃহ-প্রবেশকালে যাহারা বীরদম্ভরে মেদিনী কম্পান্বিত করিয়া ঢুকিয়াছিল, তাহাদেরই এমন নিঃশব্দে ও শান্তভাবে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া শচী বালিকা-সুলভ আবেগভরে বলিয়া উঠিল—কি গোঁয়ার গোবিন্দ লোক মা!—না পিসিমা?

ছোট খুড়ো ভৎর্সনার স্বরে বলিলেন—তাড়ালে কেন কমল? বাছাধন একটু টের পেতেন, মজাটা কেমন হয়?

প্রসাদ যে কখন্ আসিয়া রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, দেখি নাই। তাহার কণ্ঠস্বরে ফিরিতে দেখি—হাতে সেই লাঠি গাছি। মলযোদ্ধার বেশে কাঁপড় আঁটিয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতেছিল। বলিল—মজা উনি দেখ্‌তেন না, ঠাকুর্দ্দা, মজা আপনাকেই দেখ্‌তে হো'ত। কিন্তু যাক্ সে কথা। গয়লা বৌ কোথা? ঠাকুর্দ্দা, এর জন্যে যদি আপনাকে মেরে আমাদের জেল-ও খাটতে হয়, তা'তেও আমরা পেছপাও হ'ব না···রাগে তাহার প্রশস্ত বুকখানা কাঁপিতেছিল।

আর কেন—ভাই!—বলিয়া জমিদারপুত্র কয়েক পা অগ্রসর হইয়া একেবারে ভূতলে বসিয়া পড়িয়া বলিল—মা! এর সবটাই ভুল হ'য়ে গেছে! দোষ আমাদেরই—মাপ করুন মা!

এই নৃশংস হৃদয়হীন জমিদার পুত্রের বিরুদ্ধে কয়দিন ধরিয়াই আমার হৃদয় মন উত্তেজিত হইয়াছিল, সেই যে আমাদের এই পল্লীটিতে হঠাৎ এক কুগ্রহের মত আসিয়া পড়িয়া, ছোট খুড়োর সহযোগে সমস্ত দুর্ঘটন ঘটাইতেছে জানিয়াই আমি ইহার মৃত্যু-কামনা করিতেও বুঝি দ্বিধা করি নাই, কিন্তু তাহার এই করুণস্বরে, ততোধিক তাহার করুণ দৃষ্টিতে আমি আত্মহারা বিহ্বলের মত 'ও' হইয়া গেলাম। তন্মুহূর্ত্তে মনে পড়িয়া গেল—তাহার মা নাই। শৈশবে সে মাতৃহীন। নাম শুনিয়াছি, কমল। তাহার কমলের মত নয়নদ্বয় তুলিয়া আমার মুখের পরে স্থির করিয়া করুণকণ্ঠে কহিল—মা, গয়লা-বৌ এর খবর আমি জানি-নে, মা!

নির্ম্মল গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—কে তুমি?

যুবক নির্ম্মলের কথার কোন উত্তর না দিয়া আমার পায়ের উপর হাত দিয়া বলিয়া উঠিল—আপনার পা ছুঁয়ে বলছি মা!

বাছারে!—বলিয়া দু'হাতে তাহাকে তুলিয়া চুম্বন করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(প্রসাদ বলিতেছে)

সারা সকালটা মেঘ করিয়া আছে, অথচ এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িবার নাম নাই। বাতাস যে উধাও হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে তা কে জানে! অসহ্য গুমোট গ্রীষ্মে প্রাণটা আইঢাই করিতেছে, গত

হাতের সেই চৈ চৈ ব্যাপার—সকালে আর এক পালা হইয়া গিয়াছে, যাতে না ছিল করুণ রস, না ছিল হাস্য রস, বীররস যা ছিল সেটা বীভৎসরসেই নামান্তর, সুতরাং ঐ সবের গোলেমালে মনটা মোটেই ভাল ছিল না, দুপুরবেলা ভাত খাইয়া বিছানায় পড়িয়া হাতপাখা ঘুরাইতে ঘুরাইতে একটু চোখ বুজিবার চেষ্টা করিতেছি, হঠাৎ কোথা হইতে সারা সকালের উহাও হাওয়া দমকা বেগে আসিয়া ঘরে ঢুকিল, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখি ঝড় উঠিয়াছে, দম দাম্ ঝন ঝন শব্দে এদিকে সেদিকে অনেক গুলা জিনিষ পড়িল, অতঃপর দরোজা জানালা বন্ধ করার ধুম,—মা আসিয়া কহিলেন "ওরে প্রসাদ, নির্ম্মল কোথা গেল? হাঁ করে জানালা খুলে বসে আছিস—ঘরে ধুলো ঢুকচে দেখছিস কি? বন্ধ করে দে না।"

আমি কহিলাম—প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছিল মা, একটু হাওয়া আসছে আসতে দাও।

তা বলে ঝড়ের হাওয়ায় ধুলো এসে নাকে চোখে ঢুকবে সে ভাল? বলিয়া মা নিজেই জানালা বন্ধ করিতে গেলেন, আমি বলিয়া উঠিলাম "বৃষ্টি পড়তে সুরু হয়েচে, বন্ধ করো না মা, বন্ধ করো না।

মা হাসিয়া কহিলেন—বৃষ্টিই বোধ হয় তুই মানছিলি?

বাহির হইতে ডাক আসিল "মা।"

মা সসব্যস্তে বাহির হইয়া গেলেন, আগন্তুককে চক্ষে না দেখিলেও চিনিতে আমার বিলম্ব হইল না, এবং তার আগমনে বড় খুসী হইতে পারিলাম না, বরং ভয় হইতে লাগিল, পাছে মা তাঁহার নর্দ্দমস্ত সন্তানটিকে এই ঘরেই লইয়া বসেন, সৌভাগ্য আমার যে মা ঘরে আসিলেন না রান্নাঘরেই সতরঞ্জ পাতিবার জন্য ঝিকে হাঁক দিলেন।

ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি সুরু হইয়াছিল, আমি প্রসন্ন মনে সেদিকে চোখ ফিরাইলাম, কতদিনকার কত উত্তাপ পলে পলে সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা ঝরিয়া পড়িতেছে, উত্তাপের চরম সীমায় পৌঁছিয়া আজ তা শীতল বাদল ধারায় পরিণত হইয়া পৃথিবীর তপ্ত বক্ষে শান্তি সুধার ধারাবর্ষণ করিতেছে সৃষ্টির এ কি বিচিত্র রহস্য। জগতের ইতিহাসে মানবের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক ইতিহাসেও ইহার লীলা চলিতেছে। বয়সে কম হইলে ও নেতাদের সঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া এ সব দিকে বেশ একটু নাড়া চাড়া করিতে শিখিয়া ছিলাম, সুতরাং ভাবনাটাকে খানিকটা আগাইয়া লইয়া চলিলাম, কিন্তু সে অগ্রসর হওয়াতে যে সব দিকে চিন্তার গতি চলিতে চলিল তাহা আমার ন্যায় পরাধীন জাতির বালকের পক্ষে অনুচিত, এমন কি অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য, অথচ এই আমাদেরই দেশে বার বৎসরের বালক বীর বিক্রমে শত শত শত্রুর মধ্যে দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে যুদ্ধ করিয়াছে, তের বৎসরের বালক বিপুল সাম্রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ রাজদণ্ড হাতে লইয়া বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছে—কিন্তু থাক্ সে কথা, অতীত এখন অতীতেরই গর্ভে, তার ছায়া অপেক্ষা বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিই বেশী পরিস্ফুট এবং সেইটাই হইতেছে সত্যস্বরূপ, সবলে মনের গতি ফিরাইয়া তাহাকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিলাম। বাতাসের খেলা পাগল বালকের মত নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছিল শাখা প্রশাখা দুলাইয়া গাছগুলি যেন মনের আনন্দে জানপর্ব্ব জুড়িয়াছে, পাখীগুলি সেই পত্র রাশি বহুল শাখা প্রশাখার মধ্যে বসিয়া স্থিরভাবে বৃষ্টিপাত দেখিতেছে, যাহাদের নীড় আছে, তাহারা নীড়ের মধ্যে আশ্রয় লইয়া মুখটি বাহির করিয়া আছে। বাগ্দীদের রামা আর গয়লা পাড়ার কৈলাস হাঁকাজাল লইয়া আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তার নালাতে মাছ ধরিতে সুরু করিয়া দিল, মাথার উপর অজস্র বৃষ্টির ধারা,—তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, নালার জল পুকুরের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই স্রোতে উজানের মুখে পুকুরের বড় বড় কই মাগুর এখনি উঠিয়া আসিয়া জালে

আটকাইবে সেই আশায় আনন্দেই তাহারা তখন মত্ত,—পিছন হইতে মার কণ্ঠ শুনিলাম—

"হাঁ করে কি দেখিস্ প্রসাদ, ছেলেটি এসে বসে আছে, দুটো কথা কইবি চল্।"

আমি মুখ ফিরাইয়া মার মুখের দিকে চাহিলাম, —যে-জমিদার পুত্রের নামে মার মুখের বিরক্তি আর ঘৃণার ভাব তীব্র ভাবে ফুটিয়া উঠিত, আজ তাহার চিহ্ন কোথায় উধাও হইয়া, সমস্ত মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে মাতৃত্বের অপরূপ স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ, সে মুখে তারই বিজয় পতাকা উড়াইয়া বিরাজ করিতেছে, মাকে আমি খুব জানি, প্রাণ ভরিয়া 'মা' নাম উচ্চারণ করিয়া নির্ভয়ে যে তাঁহার কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে পারিবে সেই জিতিয়া যাইবে। হোক না সে অপরাধী, মার সরলতাকে জয় করিয়া লইতে তার একটুও বিলম্ব হইবে না, অথচ অপরাধটাকে সাধু-তার আচরণে ভাল করিয়া ঢাকিয়া লইতে হইবে। বেশ বুঝিলাম, জমিদার পুত্র মার মনে তার আসন বিছাইয়া লইয়াছে। কি জানি কেন মন আমার খুসী হইয়া উঠিল না, কহিলাম "তুমি তো বেশ গল্প কচ্ছ মা, কর-গে-না, আমাকে আর কেন, আমি একা একা বসে একটু বৃষ্টি পড়া দেখ্‌ছি, দেখি না—"

"অদ্ভুত ছেলে" বলিয়া হাসি মুখে মা চলিয়া গেলেন। বৃষ্টির বেগ কমিয়া আসিল, ক্রমে থামিয়া গেল, বারান্দায় বিদায় অভিনন্দনের পালা চলিতেছে শুনিতে পাইলাম। মা বলিতেছেন,—"একটু মিষ্টি মুখ করে যাও বাবা, মার কাছে এসে কি শুধু মুখে যেতে হয়?"

খুব সম্ভবতঃ সকাল বেলায় ইহারই মরণ কামনা করায় স্মৃতিতে মার মন করুণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল তাই তাঁর কণ্ঠস্বরে মমতা ঝরিয়া পড়িতেছিল। কমল উত্তর দিল "সন্ধ্যের পর এসে খেলে হবে না মা? আমি নিশ্চয় আস্‌ব দেখ্‌বেন, পেট ভরে খেয়ে যাব। এখন আসি, ওদিকে একটু চোখ রাখতে হবে, বুঝতে পাচ্ছেন তো?"

"তাই এসো বাবা—"

যখন কমলের জুতার শব্দে বুঝিলাম সে চলিয়া গেল, মা আবার আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন, আমি কহিলাম—"নতুনছেলের সঙ্গে এতক্ষণ কিসের গল্প চলছিল মা?"

"মা কহিলেন "নতুন ছেলের হিংসেতে তুই তো ঘর থেকেই বেরুলি না, বেরুলেই তো সব কথা শুনতে পেতিস্।"

না হয় তোমারই মুখে শুনলাম। তাতে আর দোষ কি মা?"

মা সে কথার উত্তর না দিয়া কহিলেন—

"নির্মল কোথা, সেই যে দুটো ভাত মুখে দিয়ে বেরিয়েছে, আর দেখা নেই—"

"কি-জানি!" বলিয়াই আমি মায়ের মুখখানি আমি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। তাঁর চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ সহজ মুখ, অনেক দিনের ঘোলাটে আকাশের পরে সূর্য্যবিকাশের মতই সৌম্য উজ্জ্বল বোধ হইতেছিল। মায়ের মুখের উদ্বেগ চিহ্ন সকল যে কেন হঠাৎ লোপ পাইল, কি-সে তাঁহার মনের সমস্ত গ্লানি বিদূরিত হইয়া আবার পূর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে এতটুকু বিলম্ব হইল না। মা কমলকে পুত্রাধিক স্নেহে পুত্রের মতই টানিয়া লইয়াছেন। তাহাতে আমার এতটুকু ক্ষোভ বা হিংসা নাই। মা যাহাকে পুত্র-স্নেহে সাদরে বক্ষে ধরিয়াছেন, তাহার প্রতি ভায়ের স্নেহ দিতে না পারিলেও তাহার মর্য্যাদা হানি যে আমার দ্বারা ঘটিবে না, তাহা আমি জানিতাম। এবং কমলকে আপনার করিবার একটা অকান্ত চেষ্টা যে আমাদের পরিবারটির মধ্যে তীব্র বেগে চলিতেছে, তাহা জানিতাম বলিয়াই আমি নিজেও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করি নাই।

আমার সঙ্গে কাল রাত্রে ইহা লইয়া অনেকক্ষণ তর্ক চলিয়াছিল। মামা আমার মায়ের পক্ষ লইয়াই লড়িতেছিলেন, আমিও যে খুব বিরুদ্ধতা করিয়াছি

তা নয়, তবে ইহা আমার মোটা বুদ্ধিতে কিছুতেই ঢুকিল না যে একা ঠাকুর্দ্দা মহাশয় এত ক্ষমতা ধরেন কিসে? মামা না-কি কমলের মুখেই শুনিয়াছে, ছোট খুড়ো কয়দিন হইতে আমাদের পুরোহিত পল্লীর গৃহের পাশে-পাশে কমলের হাত ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন! কমলের দোষ নাই! কমল ঘুরিল কেন? সে না কি বলিয়াছে, ভাল মন্দ সে কিছুই জানে না, ছোট খুড়ো তাহার অভিভাবক স্বরূপ, তাঁহার নির্দ্দেশ মত সে সব কাজই করিয়াছে!—মা, মামা উভয়েই কথাটা বিশ্বাস করিয়াছেন। এতই বাড়া সেই বিশ্বাস যে আমার সকল তর্কই পরাজয় মানিয়াছে।

মানুক পরাজয়! এ আমি বিশ্বাস করি না। করিতে পারি না। কমল শিশু নয়, কমল যুবক, কমল কিছু-কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছে, শুনিয়াছি—সে বুঝিল না, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা অন্যায়? ঠাকুর্দ্দা ঘুরাইলেন, সেও ঘুরিল···!···মা বলিতেছেন, ছোট খুড়ো জমিদারের নাম লইয়া আপন উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন! কিন্তু.....

মা অন্যমনে মালা জপিতেছিলেন, হঠাৎ মালাটা মুষ্টি মুক্ত করিয়া দু'হাতে কপালে ঠেকাইয়া, মনে মনে কি মন্ত্রোচ্চারণ করতঃ কহিলেন—নির্ম্মল এসে বাঁচি বে!

ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথা গেছে মামা জান তুমি?

গেছে ত।—মা কি-যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দেখিলাম, এই সুযোগ। বলিলাম—ক'দিনই মামা এই রকম ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখ্‌ছি—কাল নদীর ধারে দেখলাম জমিদারের সঙ্গে...

তারা গহনা-বৌ-এর সন্ধান করছে।

আমার হাসি পাইল—বলিলাম—নদীর জলে! তা হ'বে।

দেখি, মা'র মুখ আমার এই বাঙ্গ হাসির প্রভাবে একেবারে শ্বেত ও শুষ্ক হইয়া গেছে, অত্যন্ত বেদনা বোধ হইল, বলিলাম—

গহনা-টহনা এরই সন্ধান করছে, কিন্তু কোথায় পাবে মা, সন্ধান?···মা, দিনে দিনে যা ঘটে উঠ্‌ছে তাতে আর এখানে একদণ্ডই থাক্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না। মা, চল মা, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।"

মার মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল, তিনি অনুযোগের স্বরে কহিলেন "এই কি তোর দেশ-হিতব্রত সাধনের পরিচয় প্রদান? বাড়ীতে আবর্জ্জনা জমেছে বলে তুই যদি বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও থাকিস্ সে তো তোর সুবুদ্ধির পরিচয় নয়, সেই আবর্জ্জনা ঝেঁটিয়ে তোদের পরিষ্কার করতে হবে, আর তাই হচ্ছে তোদের কর্ত্তব্য; কর্ত্তব্য পালন করাতে বাহাদুরী নেই বাছা, না করাতে মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ হয় বটে।

মনে পড়িয়া গেল সোমবারের সন্ধ্যাবেলার ঘটনা, পিকেটিং করিতে গিয়া পুলিশের হাতে মার খাইয়া যে দিন বিপন্ন হইয়াছিলাম, সুপ্রকাশ কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল, মটর থামাইয়া পুলিশের সহিত বকাবকি করিয়া তাহাদের গ্রাস হইতে আমায় মুক্ত করিয়া, মটরে তুলিয়া তাহাদের বাড়ী লইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে তাহার সহিত আমার এক স্কুল কলেজে পড়ার দরুণ মুখ চেনাচেনি ছিল মাত্র।

ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ মোটেই হয় নাই। সে পড়িত ফার্ষ্ট ইয়ারে, আমি পড়িতাম ফার্ষ্ট ক্লাসে। আমি ছিলাম গ্রাম্য গৃহস্থ সন্তান, সে ছিল বিলাসে লালিত সহরের সুসভ্য ধনীর দুলাল, সুতরাং আমাদের প্রত্যেকও ছিল আসমান জমীন্,—যাহা হউক, সেদিনকার আমার শোচনীয় নিগ্রহের জন্য সুপ্রকাশের জননী ও পিতামাতা সহানুভূতি দেখাইয়া উপদেশ ছলে যে সুপরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে সেদিন আমি মার উচ্চারিত ঠিক ঐ কথাটি

কথাই আবৃত্তি করিয়াছিলাম, আর সেই আমিই এখন কি বলিয়া ফেলিলাম।

মার কথায় যে আমি লজ্জিত হইয়াছি, মা তাহা বুঝিতে পারিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন "গয়লা বউকে ছোট কাকার লোকেরাই সরিয়ে রেখেছে, সেই খবরই কমল বলতে এসেছিল—ওকে ছোট কাকা না জানালেও ও তা টের পেয়েছে। ছেলেটিকে যত মন্দ ভেবেছিলাম তা মোটেই না, ওর ভিতরে অনেক গুণ আছে, কুসংসর্গ আর কুপরামর্শতেই গোলায় যাবার পথ ধরেছিল, মাথার ওপর কেউ অভিভাবক নেই, হাতে অগাধ পয়সা ক্ষমতাও অসীম! কাঁড়া বুদ্ধি, কাজেই বেগড়ানো আর শক্ত কি, কিন্তু চেষ্টা করলেই ওকে ও পথ থেকে ফেরানো যায়, আহা বেচারীর মা-ও নেই।" মার এই মন্তব্য, এবং মাতৃহীনের প্রতি সস্নেহ করুণ অনুভূতির উত্তরে আমি কোন মতই প্রকাশ করিলাম না, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ মা বলিয়া উঠিলেন "তোর কপালের পাশে কিসের কালশিটে পড়ে রে প্রসাদ? ও কি—পিঠে ও হু তিন জায়গায় দাগ দেখ্‌ছি, ব্যাপার কি রে?"—অন্ধকারে বাড়ী আসি, প্রত্যুষেই গৃহত্যাগ করি, সুতরাং আমার নির্য্যাতন কাহিনী ঐ অন্ধকারের অন্তরালে সহজেই আত্ম গোপন করিয়াছিল, আজ সকালে কলিকাতা যাওয়া ঘটে নাই সুযোগ হইয়া উঠে নাই। কালশিরা গুলা যে এমন করিয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, সে কথা স্মরণ ও ছিল না, নহিলে যা একটু সাবধান হইতাম, যাহা হউক, মার ভয়-ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, "ও কিছু না মা, একদিন চোট লেগেছিল—তারই দাগ।"

"নিশ্চয় কোন দিন মারপিট হয়েছিল, সত্যি ক'রে বল দেখি প্রসাদ,—ব্যাপার কি? তুই তো চারা দিন উধাও থাকিস্, রাত্তিরেই যা তোর বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক, সারাদিন কোথায় থাকিস্, কি করিস্, জিজ্ঞেস করলে যা বলিস্ তার একবর্ণও বুঝি না।"

বেশ বুঝিলাম, আর কোন কথা লুকান চলে না, মা যাহা পাইবেন, চিন্তিত হইবেন সেই ভয়েই পুলিশের নির্য্যাতন কাহিনী প্রকাশ করি নাই, কিন্তু সেদিনকার ঘটনা হইতে ব্যাপার যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে হয় তো আমার কারাবাস ও হইতে পারে! সুপ্রকাশের পিতা স্বনামখ্যাত একজন এটর্ণী, তাঁহার পরিবারে আমার পরিচয় হওয়ায় তাঁহারা আমায় স্নেহের চক্ষেই দেখিয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা সাহেবী ধরণের লোক তাহা হইলেও আমার উপর তাঁহাদের খুব অনুগ্রহ, আমায় বাঁচাইবার জন্য সুপ্রকাশের পিতা অবিনাশ বাবু তাঁহার এটর্ণী বুদ্ধিতে আমার জন্য যে অমানবদনীর খসড়া প্রস্তুত করিয়া আমায় শিখাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে আমি রাজী হই নাই, আমি স্পষ্টই বলিয়াছি, যে আত্ম পক্ষ সমর্থন আমি করিব না, ইহাতে যে দণ্ডই আমি পাই তাহাই লইতে প্রস্তুত!—যাক্ সে কথা, এখন তাহা হইলে যাকে সব কথাই আগা গোড়া খুলিয়া বলিতে হয়, মুহূর্ত্তের জন্য মাথা তুলিয়া মার মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম মার চক্ষে যে দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাতে তিনি ব্যগ্রতরেই পুত্রের অন্তরের অন্ধকারতম প্রদেশ পর্য্যন্ত দেখিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত। বেশ বুঝিলাম, অতঃপর সে কাহিনীর প্রকাশই মঙ্গল! বুঝিয়া তখন সব কথা বলিবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হইয়াছি—ঠিক সেই সময়ে মাগী লাফাইতে লাফাইতে ঘরে ঢুকিয়া বলিয়া উঠিল—দিদি, গয়লা বৌ কে পাওয়া গেছে!

মা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—কোথায় রে?

কালীদ'র বাগান বাড়ীতে, দিদি!

কালীদ'র বাগান বাড়ী? সে ত জমিদারের বাগান রে?—মা ধীরে ধীরে অবসন্নের মত বসিয়া পড়িলেন।

মাগী বলিল—জমিদারের বাগান বটে, কিন্তু জমিদার এ সবের কিছুই জানত না। ছোট খুড়োর আদেশেই ছোট খুড়োর লোক সেই রাত্রেই গয়লা

আমি ভীষনাদে বলিয়া উঠিলাম—দাঁড়াও।
মাষা বলিল—খাব। ক্রমশঃ
শ্রাবণ মাসের পুরাণী—শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী।

ভাবনা

(শ্রীলীলা দেবী)

তোমার কথা ভাব্‌ছি আমি
আমার কথা তুমি,
ঘুমাই আমি জাগিয়া তুমি
রক্ষা করো স্বামী।
ঘরের কাজে যেদিন আমি
পাই না অবসর,
সেদিন বৃথাই তরুর তলে
ফুলের থরথর।
গন্ধ-অনিল বৃথাই বহে
কেবল মনে জাগে,
ঐ বুঝি বা ফিরলে সখা
অভিমানের রাগে।
আহা! গহন বনের পথে
হয় তো ফুটে কাঁটা,
চলায় ব্যথা দিলাম মিছা
এই এতদূর হাঁটা।
শুষ্কমুখে ফিরলে তুমি
আঁধার ঘেরা পথ,
হায়রে কপাল নাই তো সাথী
নাইকো তোমার রথ,
আমি যখন এমনি ক'রে
ভাবি তোমার কথা,
তুমি তখন ভাব্‌ছ কিসে
ভুলবো আমি যথা?
তাইতো ধরায় পাঠাও রবি
পাঠাও গ্রহ চাঁদ,
কতই সাজে সাজাও ধরা
ফেলতে মোহন ফাঁদ।
জোগাও ছায়া আলো বাতাস
নিত্যি নতুন রূপে,
করো আমায় সুপ্তি মগন
কেমন চুপে চুপে।
আমি তখন কেবল ভাবি
ঐ কি এলে তুমি?
বকুল বেলা যুঁই চামেলীর
পরাগ রেণু চুমি'।
পিয়াল রসাল তমাল বনে
স্নিগ্ধ ঘনশ্যামে,
চপল আঁখি চকিত প্রাণে
চাই যে কুসুম দামে।
এমনি ক'রে তোমায় আমি
ভাব্‌ছি দিবস যামী,
অনাদি কাল আমার তরে
ভাব্‌ছ তুমি স্বামী।

উপেক্ষিতা

(গল্প)

(শ্রীমতি পুরবিহারী বেরম)

(১)

এক, এ, পরীক্ষা দিয়া উষা দাদাকে ধরিয়া বসিল "চল দাদা এই ছুটীটা দার্জ্জিলীংএ কাটিয়ে আসি।"

প্রভাত বলিল, "চল, তুই যখন বলেছিস্ তখন কি আর আমি আপত্তি করতে পারি?"

কাজে কাজেই সপ্তাহ খানিকের মধ্যে সমস্ত গুছিয়ে-গাছিয়ে দু'ই ভাইবোনে দার্জ্জিলীং রওয়ানা হোল। প্রভাত তাহার কোন এক বন্ধুকে টেলিগ্রাম করে বাড়ী ঠিক করলে।

জলা পাহাড়ের নিচেই "রোজভিলা" বাড়ীখানি বড় সুন্দর। এপ্রিল মাস, দার্জ্জিলীং পুষ্পে-পুষ্পে পরিপূর্ণ, চারিদিকে লাল, নীল গোলাপী, হলদে নানা বিচিত্র বর্ণের ফুল দিয়ে বিধাতা এই সহরটীকে সজ্জিত করে রেখেছেন। তারি মধ্যে উদ্যান-বেষ্টিত এই বাড়ীখানি বড়ই মনোরম।

প্রভাত ও উষা বাড়ীতে ঢুকে মনোরম দৃশ্য দেখে পুলকিত হয়ে উঠ্‌লো। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাহারা ভাইবোনে বেড়াতে বাহির হয়। কয়েক-দিনের মধ্যে অনেক লোক জনের সঙ্গে চেনা পরিচয় হয়ে গেল। উষা খুব আলাপী ও মিশুক। মেশ্‌-বার ক্ষমতা তার ছিল অসীম। উষা পূর্ণা যুবতী। শিল্পীর নিপুন হাতের আঁকা ছবির মত তার গঠন, টুকটুকে গোলাপী আভা মিশ্রিত উজ্জ্বল রং, পৃষ্ঠে গোলাপমান মিশমিশে কাল আজানুলম্বিত কেশরাশি, ভ্রু দু'টী কালো ও টানা, নাসিকাটী প্রতিমার নাসি-কার ন্যায় টিক্‌লো, ঠোঁট দু'খানি রক্ত গোলাপের অর্দ্ধ স্ফুট পাপ্‌ড়ি, চোখ দুটীও যেন পদ্মের পাপড়ি। সে যখন চাইত মনে হ'ত সেই শান্ত চুলু চুলু নয়ন দু'টী থেকে অমৃত স্নেহ ক্ষমতা ঝরে পড়ছে। উষা ক্ষীণাঙ্গী, কিন্তু তাহাতেই তাকে আরও মনোহারিণী দেখায়। কিন্তু সর্ব্বদাই যেন তাহার সুন্দর মুখখানি শ্রাবণের আকাশের ন্যায় মেঘাবৃত, যদি কখনও হাসে, মনে হয় যেন পূর্ণিমার চাঁদ মাঝ গগনে উদয় হয়েছে।

প্রভাত এই পিতৃমাতৃহীনা ছোট বোনটীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে। উষার সুখের জন্য প্রভাত সকল সময়ই ব্যস্ত। উষার ব্যবহারে বাড়ীর সকলে প্রসন্ন—বিষাদের চিহ্নমাত্র নাই। এমনি তাহার গুণ!

(২)

আজ ২।৩ বৎসর পূর্ব্বের কথা, উষার বয়স তখন ১৫ বৎসর। বাল্য ও যৌবনের সন্ধিস্থল কবির চক্ষে চিরমনোমোহন সমবয়সীনিদের সঙ্গে তখনও দৌড় ঝাঁপ করিবার ইচ্ছা প্রবল কিন্তু কি যেন একটী মধুর সঙ্কোচ আসিয়া তাহাতে বাধা দেয়। এমনি সময়ে একদিন একটী বাল্যসঙ্গীর বিবাহে অনিলের সঙ্গে তার আলাপ হয়। অনিলও দেখ্‌তে সুপুরুষ। কিছুদিনের মধ্যে অনিল প্রভাতের বাড়ীর একটী অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিগণিত হ'ল। সময় অসময় সর্ব্ব-দাই সে যাওয়া আসা করে। কোন প্রকার সঙ্কো-চের ভাব নাই।

এমনি ভাবে চার মাস কাটার পর, উষা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো। ডাক্তারদের পরামর্শ মত প্রভাত উষাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মধুপুর গেল। অনিলও তাহাদের সহযাত্রী হোল। মধুপুরে কিছু-

দিন থাকার পর উষা প্রায় সেরে উঠেছে। একদিন অপরাহ্নে সমুদ্রের খোলা বারান্দায় দুইখানি চেয়ারে অনিল ও উষা বসে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করছিল। প্রভাত তখন বেড়াইতে গিয়াছে। রৌদ্র পড়ে এসেছে, সূর্য্য পশ্চিম দিকের ধূসরবর্ণ গিরিশ্রেণীর অন্তরালে লুকুতে যাচ্ছেন। মহিষের দল নিয়ে সাঁওতাল পুরুষ ও রমণী গোয়ালারা বাড়ীর দিকে ফিরছে। এবং মনের আবেগে গলা ছাড়িয়া গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে।

এক একবার নিকটবর্ত্তী জঙ্গল থেকে বনফুলের মিষ্টি গন্ধ নিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। এমন সময় মালি নানা বর্ণের ফুল দিয়ে তৈরী করা এক তোড়া অনিলের হাতে দিয়ে গেল।

ফুলগুলি দেখে অনিল উষাকে লক্ষ্য করে বলল, "কি সুন্দর সুন্দর ফুলগুলি! আচ্ছা, আপনি কি ফুল ভালবাসেন?" কথার স্রোতের মধ্যে কখন যে সেই শুষ্কটী উষার কোমল করপুটে আশ্রয় নিয়েছে, তা কাহারও দৃষ্টি হয় নাই। উষা সেটী অত্যন্ত যত্নের সহিত নাকের নিকট নিয়ে, তারপর বলে, "হাঁ, আমি ফুল খুবই ভালোবাসি। আমারই যত্নে কলকেতার বাগানখানি তৈরী।"

কতক্ষণ এমনিভাবে কেটে গেলে অনিল বলিল, "আজ আপনি কেমন আছেন? উঃ, এবার খুব ভুগলেন!" এই বলিয়া উষার দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

উষা এই কথায় লজ্জিতা হইয়া সলজ্জ মুখে বলিল, "সত্যিই, আমি বড্ড কষ্ট দিয়েছি, কেবল আপনাদেরি সেবায় আমি সেরে উঠেছি, সেজন্য সত্যি অনেক অনেক ধন্যবাদ।"

অনিল স্মিতহাস্যে অধর রঞ্জিত করে বললে, "না, না, এমন কথা বলে লজ্জা দিবেন না, আপনি যে এই সামান্য কাজে সুখী হয়েছেন, ইহাই আমার সৌভাগ্য।" একটু থামিয়া অনিল আবার বলিল, "বোধ হয় আমাকে শীঘ্রই আপনাদের সাহচর্য্য ছেড়ে বিদায় নিতে হবে, আমি কালই যাব স্থির করেছি।"

উষা চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বলুন ত' এত শীঘ্র চলে যাবেন? কোন অসুবিধা হচ্ছে বুঝি?"

অনিল বলিল, "সে কি, আপনি এমন অন্যায় কথা বলবেন না, আমার শেষ পরীক্ষাটা দিয়ে এক বৎসরের জন্যে বিলাত যেতে হবে, তাই তাড়াতাড়ি চ'লে যাচ্ছি, কিন্তু যে আনন্দ আপনাদের কাছে পেয়ে গেলুম তা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভুলবো না।" এই বলে অদূরবর্ত্তী পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। উষা বিষণ্ণমুখে বলিল, "চোখের আড়াল হলেই মানুষ মনের বাহির হয়ে যায় তা'ও আবার এত দীর্ঘ দিনে।"

অনিল অত্যন্ত আবেগের সহিত উষার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, "অন্যের পক্ষে সম্ভব হ'লেও, আমার কাছে নয় উষা, আপনি কি এতদিনেও আমাকে চিন্‌লেন না?" অনিলের "আপনি" সম্বোধনে বাধা দিয়া উষা লজ্জিত মুখে বলিল, "আপনি আমাকে তুমি বললেই সুখী হব।"

অনিল হৃদয়ের সমস্তখানি ভালবাসা ঢেলে দিয়ে কহিল, "উষা, অনেক দিন থেকেই তোমাকে একটা কথা বলতে চাই কিন্তু সাহস পাই নি, আজ আর চেপে রাখতে পারছি না। উষা, আমার এ হৃদয়ের পরতে পরতে, অন্তরের প্রতি স্তরে স্তরে, তোমার ওই মোহিনীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, এখন বল তুমি আমার হবে কিনা?"

উষা লজ্জিতা হয়ে কাপড়ে মুখ ঢাকিলে, অনিল সোহাগ ভরে মুখখানি তুলে ধরে বললে, "না, তুমি এমন করে মুখ লুকুতে পাবে না, আমাকে বলতেই হবে তোমার মনের ভাব। বল, তুমি আমার হবে কিনা?" বীণানিন্দিত-স্বরে উষা বলল, "আমি কি আপনার যোগ্য অনিলবাবু?"

অনিল বলিল, "তোমাকে লাভ করা অনেক ভাগ্যের কথা।" এই বলিয়া সে চুপ করিল।

"না না, আপনি এমন কথা বলবেন না—আমি ত নগণ্যা নারী!"

অনিল উষার সম্মতি লাভ করে ধন্য হোল। আকুল অন্তরে বারংবার উষার অনিন্দ্য-সুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

(৩)

অনিল বিলাতে পৌঁছিয়া প্রথম প্রথম প্রভাতকে পত্র দিত। ক্রমে ক্রমে তাহাও বন্ধ হয়ে এল। ইহাতে প্রভাত ও উষা কিছুই বুঝতে না পেরে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। প্রভাত গোপনে সর্ব্বদাই খোঁজ লইতে লাগিল। অনিল ফিরে এল কিনা। প্রায় দুই বৎসর পর, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়ে ফিরে এসেছে এবং অনতিবিলম্বে তার বিবাহের সংবাদ শুনলে উষা প্রাণে বাঁচবে না বুঝে, নিজ মনে চেপে রেখে নিদারুণ মর্ম্ম যাতনায় সে জ্বলতে লাগল। উষা সত্যই অনিলকে মন প্রাণ দিয়ে ভালো বেসেছিল, তা শুধু দু'দিনের মোহে নয়। সেই জন্যই আজ তিন বৎসর অনিলের স্মৃতি তাহার মন থেকে মুছে নাই। আহারে-বিহারে শয়নে-স্বপনে, অন্তরে-বাহিরে সর্ব্বদাই অনিলের প্রিয় মুখখানি তার অন্তরে চিরসাথী হয়ে থাকত। যদিও সে মাঝে মাঝে মনে করত যে, অনিলের আশা বৃথা, কিন্তু মুখ ফুটে দাদাকে সে একদিনের জন্য ও জিজ্ঞাসা করে নাই। মনের আগুন নিয়ে সে দিন দিন মলিনা হয়ে যাচ্ছিল। প্রভাত চির আদরের একমাত্র স্নেহময়ী বোনটীর দুঃখ-ভার-প্রপীড়িত শুষ্ক মলিন মুখখানি দেখে অন্তরে বড়ই বেদনা অনুভব করত।

উষা নিজের কামরাটীতে চুপ্‌টী করে বসে আছে। ঠাণ্ডার জন্য সমস্ত বন্ধ, কেবল বাগানের দিকের একখানি জানালা খোলা; সেই জানালা দিয়া বাহিরের সব দেখা যাইতেছে।

ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, চারিদিক কুয়াশায় সমাচ্ছন্ন। বেলফুলের মাড়ের ন্যায় পুঞ্জীভূত কতকগুলি মেঘ পাহাড়ের উপর দিয়ে আকাশের গায় এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে শীতল সজল দুই হাওয়া গোলাপের মাড়ের মিষ্টি সুগন্ধটুকু বয়ে নিয়ে আসছে, বিলাতী কার্পেট গাছগুলি তাদের চিরপ্রিয়-বাঞ্ছিত মেঘ, বৃষ্টি ও হাওয়া পেয়ে ধীরে ধীরে নেচে নেচে একে অন্যের গায় ঢুলে পড়ছে, প্রকৃতির এই মধুর দৃষ্টি দর্শনে উষারও কোমল প্রাণটি যেন কাহার দরশন পিয়াসায় আকুলা ও উৎকণ্ঠিতা হয়ে কেঁদে উঠতে লাগল। অন্তর যেন অশ্রুতে ভরে উঠল যেন কিসের ব্যথায়? কিসের এ অশ্রু?

হঠাৎ প্রভাতকে আসতে দেখে, কণ্ঠে নিজের উদ্দাম চঞ্চল হৃদয়বেগকে রোধ করে বললে, "দাদা, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

প্রভাত বলিল, "কি আর করি বোন, বসে বসে কাগজ পড়ছিলাম। ভাললাগ ছিল না—তাই এলুম দেখতে—তুই কি করছিস্।"

উষা বলিল, "দেখ দাদা, আজকের দিনটা বড় বিশ্রী, কিছুই যেন ভাল লাগছে না।"

ভগিনীর মনের ভাব বুঝতে পেরে, প্রভাত আর কিছু বলে না। উভয়ে নানা রকমের গল্প করতে লাগল।

(৪)

আজ দীর্ঘ দিন পরে দার্জ্জিলিংএ সূর্য্যের দর্শন পাওয়া গেছে। বহু দিনের অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও কুয়াশার পর এই সুন্দর চিক্‌চিকে রৌদ্রটুকু কত মধুর তা বলা যায় না। রাস্তা ও বাজার সব নর-নারীতে পূর্ণ। ছুটিয়া স্কুলিয়া মনের আনন্দে পিঠের উপর বোঝা নিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে। গাছের মাথায় সূর্য্যের নব-কিরণ পড়ে তাহা বিচিত্র করে তুলেছে।

"দাদা, আজ কি সুন্দর দিনটী, এস আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখে আসি। দার্জ্জিলিংএ

আসা অবধি আমরা ভাল করে বেড়াতে পারলুম না।" বলিয়া উষা চুপ করিল।

উষার উৎফুল্ল-ভাবভঙ্গিতে দিবা হাসি হাসি মুখখানি দেখিয়া প্রভাত বড় সুখী হইল এবং অবিলম্বে রাজী হয়ে জোসাবা স্বরে বলল, "বেশ ত চল না, তোর মনই পাওয়া যায় না, কোন সময়ে আমি তোকে ভয়েই কিছু বলি না।" প্রভাতের কথায় উষা চকিতে মুখখানি তার করে কহিল, "তুমি বুঝি দাদা আমাকে ভয় কর? কেন আমি কি তোমায় কষ্ট দেই?" বলিয়া প্রভাতের দিকে চাহিয়া রহিল।

"এই দেখ্ পাগ্‌লি বোন্ আমার, অভিমান করে বলল, না নাকি বোনটী মুখ ভার করিস্ না। তোর বিষণ্ণ মুখখানি দেখ্‌লে আমার কত কষ্ট হয় তুই তা জানিস্ না?" বলে প্রভাত চুপ করে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌লে।

উষা কিছুই না বলিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

(৫)

"রোজভিলা" থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেন বহু দূর। রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে কতবার উষা থম্‌কে গিয়েছে, আবার হাস্‌তে হাস্‌তে দাদার হাত ধরে চলেছে। অবশেষে বাগানে পৌঁছিয়া উষা আজ বড়ই উৎফুল্ল, যেন পূর্ব্বজীবনের হাসি আহ্লাদ সব ফিরে পেয়েছে। বাগানটীর চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর উষা বলল, "চল দাদা, একটু গ্রীন-হাউসে বসে জিরিয়ে নিয়ে।" গ্রীন হাউসটী বড় সুন্দর, নানা জাতীয় ফুল ও গাছের টব্ দিয়ে পূর্ণ, মধ্যস্থলে গোলাকার একটী জলাশয়, তাহাতে ছোট বড় লাল রংএর মাছ ছুটাছুটী করছে। উষা মুগ্ধ নয়নে সে সব দেখ্‌তে লাগ্‌ল। ঠিক সেই সময় উষা দেখ্‌তে পেলে কারা যেন এদিকে আস্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছাট্ কোট্‌পরা একটি যুবক একটি যুবতীর বাহু বেষ্টন করিয়া সেই গ্রীন-হাউসের ভিতরে ঢুক্‌ল। ঠিক সেই সময়ে যদি অশনি-পাত হইত তাহাতেও বুঝি উষা ও প্রভাত বিস্মিত ও এত স্তম্ভিত হইত না, যেমন নাকি অনিলকে সস্ত্রীক দেখিয়া হইল। অনিলও হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাদিগকে দেখিয়া শীঘ্রপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হায় রে বিশ্বাস-ঘাতক পুরুষ, একদিন এই উষাই তোমার জীবনের একমাত্র আরাধনার, একমাত্র আকাঙ্ক্ষার জিনিষ ছিল। এই উষার মাথা ধরলে তুমি জগৎ অন্ধকার দেখেতে আর আজ তাকে দেখে তুমি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলে, পা'ও বাধলো না?

অমলা বলিয়া উঠিল, "ওগো দেখেছ, গ্রীন-হাউসের মেয়েটী কি সুন্দরি! তুমি কি চেন ওদের?"

অনিল বলিল, "না অমু, আমি ভাল করে চিনলুম না। তোমার চেয়ে কি বেশী সুন্দরী ঐ মেয়েটী?"

উষা অনিলকে দেখে চিনিবামাত্র দাদাকে সজল নয়নে কহিল,—"দাদা, তিনি না?"

প্রভাত আর কোন কথা না বলিয়া সস্নেহে তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া অত্যন্ত স্নেহভরে বলিল, "হাঁ বোন অনিলই বটে। চল বাড়ী যাই।"

হায় প্রভাত কি বুঝবে রমণীর প্রেম? আজ যে উষার হৃদয়খানি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। যার বিমল প্রেমের মধুর স্মৃতি সে সযতনে বুকে লুকিয়ে রেখেছিল, আজ তা হুৎকারে উড়ে গেল। তার সাধের সুখ নিয়তির নিষ্ঠুর বিষানে ধূলির সঙ্গে মিশে গেল। হায় কে বুঝবে এই যাতনা? আশা যে ছিল এর চেয়ে ঢের ভাল। সারা জীবনের প্রতিজ্ঞা এরূপ দর্শনের চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

প্রভাতের প্রবোধবাক্যে উষা সমস্ত বুঝল এবং তার নবকুসুম-তুল্য ছোট হৃদয়খানি এই শুরুভার

মূর্চ্ছিত অবস্থায় কেবল মাত্র একটি উঃ শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়্‌ল। প্রভাত অত্যন্ত অধীর হয়ে তাড়াতাড়ি কোন রকমে তার চৈতন্য করে এক-খানি রিক্সা ডেকে উষাকে সযত্নে তাহাতে বসাইয়া নিজে গাড়ীর সঙ্গে হেঁটে বাড়ী রওনা হ'ল।

(৬)

সেই দুর্ঘটনার পরে আজ প্রায় দুই সপ্তাহ অতীত হয়েছে। উষা সেই যে বাড়ী এসে জ্বরে পড়েছে, আজ পর্য্যন্ত তার বিরাম হয় নাই। প্রভাত দার্জ্জিলীংএর বড় ডাক্তারদের দেখাচ্ছে। তার এই একটি মাত্র ছোট ভগ্নীর জন্য সে অকাতরে অর্থ ব্যয় করছে। নিজে দিবানিশি তার অহরহঃ শয্যাপার্শ্বে কাটিয়ে দিচ্ছে। আজ তিন দিন উষা প্রায় অচৈতন্য। মাঝে মাঝে জ্বরের তাড়নায় দু'টী চোখ খুলে দাদার পানে চেয়ে থাকে। অযত্ন-বিন্যস্ত রুক্ষ কেশরাশি মুখের দু'ধারে বালিসের উপর এলায়িত ভাবে পড়ে আছে। এক একবার জ্বরের তাড়নায় লাল টুকটুকে পাত্‌লা দু'খানি ঠোঁট নেড়ে তার অন্তর্নিহিত বেদনা ভাষায় প্রকাশ করছে। "উঃ নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় অনিল এমনি করে আমাকে দাগা দিতে হয়, আমি আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে তোমাকে ভাল বেসেছিলুম, আর তুমি বুঝ্‌লে না?" স্নেহের পুত্তলীর ক্ষীণ কণ্ঠের এই মর্ম্মস্পর্শী কথা কয়টী শুনে প্রভাতের হৃদয় সমবেদনায় আকুল হয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। তার বোন যে এরকম দারুণ আঘাত অন্তরে নিয়ে তারই চোখের সামনে চলে যাচ্ছে, এটা যেন প্রভাত কিছুতেই সহ্য করতে পার্‌ল না, কিন্তু নিয়তির বিধান কেহই খণ্ডাতে পারে না। প্রভাতের অজস্র স্নেহরাশি, সমস্ত শক্তি দিয়েও উষাকে ধরে রাখ্‌তে পারলে না। একদিন সন্ধ্যার সময় সূর্য্য ধীরে ধীরে পাহাড়ের আড়ালে লুকুতে গেছেন, ধরণী যখন তারই লোহিত আভায় সজ্জিত হয়ে সন্ধ্যা-রাণীর অপেক্ষা করছিল, ঠিক সেই সময়ে স্নেহময় দাদার কোলে মাথা রেখে জন্মের মত উষা চলে গেল। দূরের পাহাড়গুলি গাঢ় সবুজ মখ্‌মলের অঙ্গাবাস ও ডুবু ডুবু সূর্য্যের কিরণ-ছটায় রঞ্জিত ওড়্‌না মাথায় পরিয়া সন্ধ্যার কোলে লুকাইয়া গেল।

পুনর্ম্মিলন

(শ্রীকালিদাস রায় বি, এ কবিশেখর)

প্রথম রাতে ঝগড়া ঝাঁটি করে'
শেষের রাতে মিলনটা যে হয়,
সাধ করে কি মিটাই মোরা তাই?
দোঁহার মাঝে কম ত কেহ নয়!

ঘুম-পাহাড়ের কোন পরী যে এসে
কুহকভরা মায়ার পরশ দিয়া,
আচ্ছাদিয়া স্বপন পাখার তলে
মিলাইয়া দেয় গো দুটী হিয়া।

প্রথম রাতি পূর্ব্ব-জনম যেন,
মধ্য রাতি কাটে গহন মোহে,
শেষ রাতিতে সকল স্মৃতি হারা
ফুটে উঠি এক বোঁটাতে দোঁহে।

প্রথম রাতির ছাড়াছাড়ির পালা
আড়াআড়ি ঝগড়া ঝাঁটী যত,
নীড় পাখারে সব মুছে যায় ধুয়ে
সাগর বেলায় টানা রেখার মত।

স্বপ্ন ধ্বনিকার পরপারে
মিলন আরো নিবিড় হয়ে উঠে,
নূতন পরশ দেয় সে রোমাঞ্চুরে
নূতন মোহাদ দেয় সে অধর-পুটে।

প্রথম রাতির থাকৃত যদি স্মৃতি
হতো কি আর মিলন গাঢ় অত ?
মোদের মাঝে কম ও কেহ নয়
কেহই মোরা হ'তাম নাক নত।

চোর

(শ্রীমনোলেখা দাসী)

অনেক দিন থেকে ত এ কাজ কর্‌ছি, একদিনও মনের মধ্যে এরূপ রেখাপাত করেনি, আজ কেন তবে এমন হোল ?

সেদিন যেন কিসের এক উৎসব। চারিদিকে আনন্দের অন্ত ছিল না। সারা সহর আনন্দ-কোলাহলে মুখর। নানা বেশ-ভূষায় সজ্জিত হোয়ে কত ছেলে-মেয়ে বাপ, দাদার ও মির হাত ধরে চলেছে।

হঠাৎ চোখ পড়্‌ল এক অনিন্দ্য-সুন্দর বালকের উপর। তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে খচিত, বোধ হয় কোন বড় মানুষের ছেলে। গলায় তার রতন-হার। লোভ গিয়ে পড়্‌ল ঐটীর উপর। কি করিয়া যে উহা লইব তাহারই সন্ধান কর্‌তে লাগ্‌লাম।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা নেমে এল। রাস্তার ধার একে একে আলোক-মালায় বিভূষিত হয়ে উঠ্‌ল।

তখনও রাস্তায় অসম্ভব জনতা—চারিদিকে মানুষের মাথার অসংখ্য ঢেউ—স্তরে স্তরে তরঙ্গায়িত।

অবসর বুঝিয়া যেমন ঘর দিয়া হারটিকে কাটিয়া লইব, বালকটি এমন ভাবে কাতর-স্বরে কেঁদে উঠ্‌ল যে, আর তা নিতে পার্‌লাম না—ধরা পড়ে গেলাম।

ওঃ—সে কি করুণ ক্রন্দন—প্রাণের ভিতরে গিয়া বিঁধিল!

বালকটির সঙ্গে অনেক লোক-লস্কর ছিল। তারা সকলে মিলে একজোটে আমায় মার্‌ল—এমন মার মার্‌লে যে জীবনে কখনও খাইনি; তারপরে আমায় তারা পুলিশে দিল।

গারদ থেকে অব্যাহতি পেয়ে ভাব্‌লাম, আর ও কাজ কোর্‌ব না। আমি বলি কোরব না—কিন্তু মনের মধ্যে থেকে কে যেন বলে কর—তাই ত করি।

* * * *

সে দিনে ঐ কাজ করে হৃষ্ট-মনে বাড়ী ফির্‌ছি, এমন সময় হঠাৎ কান্নার রোল শুন্‌তে পেলাম—সাম্‌নের বাড়ী থেকে। কি জন্ত যেন সেখানে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলাম। পা দুটী অবশ হয়ে এল, মন বিষাদে ভরে গেল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থানে দাঁড়িয়ে রইলুম, কিসের যে প্রতীক্ষায় তা' আমি জানি না।

এমনি করে অনেকক্ষণ অতীত হোলে, হঠাৎ শুন্‌তে পেলাম সাম্‌নের বাড়ী থেকে কাকে যেন 'হরিধ্বনী' করে নিয়ে গেল। প্রাণটা ছ্যাৎ করে চম্‌কে উঠ্‌ল।

দৌড়াতে দৌড়াতে উপস্থিত হলাম সেই শ্মশান ঘাটে। গিয়া দেখি—সেই বালক, যার গলা থেকে রতন-হার কাট্‌তে গিয়েছিলাম। আরও সাম্‌নে গিয়ে দেখি—সেই অনিন্দ্য সুন্দর প্রভুর মুখখানি শুষ্ক শ্বেত-পদ্মের ন্যায় বিবর্ণ—শ্রীহীন। পাটা কেঁপে উঠ্‌ল—

অতি কষ্টে নিকটে গিয়ে তার বিবর্ণ ওষ্ঠপুটে চুম্বন দিতে - শরীর যেন জুড়িয়ে গেল, প্রাণ যেন শীতল হোল।

যারা বালকটীর চারিপাশে ছিল, তারা চোর ভেবে আমাকে আবার ধরলে। আমি আকুল-কণ্ঠে তাদের কাছে প্রাণের কথা খুলে বললাম।

সজল-নয়নে আলিঙ্গন-বদ্ধ করে তারা বল্লে,—"তুমি আমাদের বন্ধু—চোর নও।"

আমি ব্যথিত-কণ্ঠে বল্লুম, "আমি ঘৃণিত চোর—অস্পৃশ্য।"

পুনরায় তারা বুকের মধ্যে আমাকে জড়িয়ে ধরে রইল—চোখের জলে সমস্ত বুকটা ভেসে গেল।

হু হু করে মক্কা এক-বাতাস এসে, খিল্ খিল্ করে হেসে, কানে কানে বলে গেল ঐ চোর—চোর—চোর।

———

সঙ্কলন

বস্ত্র সমস্যা

(দেশীয় উপাদানে রঞ্জন)

[আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়]

আমাদের দেশের লোক রংকরায় একদিকে অত্যন্ত সুরুচির পরিচয় দিয়াছিল। কি বস্ত্রে ব্যবহৃত রং, কি চিত্রে ব্যবহৃত রং, উহাদের স্থায়িত্ব ও সামঞ্জস্যের বিরুদ্ধে বলিবার কিছু ছিল না। সে কালকার রঙ্গীন পশমী ও সূতী বস্ত্রাদি এবং অজন্তার চিত্রে ব্যবহৃত বর্ণাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কোন রংয়ের সহিত কোন রংয়ের সামঞ্জস্য প্রীতিকর বোধ হয়, কোন কোন রং উজ্জ্বল আবশ্যক আর কোন রং উজ্জ্বল হইলে ব্যবহার্য্য পরিচ্ছদ বা দ্রব্যবিশেষের শোভা নষ্ট করে, এ সম্বন্ধে ধরা-বাঁধা নিয়ম না থাকিলেও শিল্পীরা সাধারণতঃ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। কতকগুলি রংয়ের যোগের প্রসিদ্ধি চলিয়া আসিতেছে, যাহা বিলাতী নেশায় আজও নষ্ট হয় নাই। পূর্ব্বকার পদ্ধতিতে রঞ্জিত কতকগুলি পর্দ্দা বা গালিচার ছাপ দেখিলে চোখ জুড়ায়। দেশীয়ের চেষ্টায় এই যে সব কার্য্য হইত, বিলাতী আমদানী রংয়ে তাহারা অপসৃত হইয়াছে। এখন অস্থায়ী রঙ্গ্‌রঙ্গে এনিলিন রংয়ে দেশের সমস্ত সূতা ও পশম রঞ্জিত হইতেছে। লাখ লাখ টাকার বিলাতী রং প্রতি বৎসর এক একটী প্রদেশে ব্যবহৃত হইতেছে। রঙ্গ্‌রঙ্গে রংয়ের ফুশ্রী দেশ আজ ভারতের সর্ব্বত্র। এনিলিন ও এলিজারিণ রংয়ের হাজারো শেড্ আছে। উহার ভিতর সুন্দর এবং স্থায়ী রং ও আছে। তবুও সাধারণতঃ বলিতে গেলে বিলাতী রঙ্গ্‌রঙ্গে রংয়ে আমার রুচি নষ্ট করিয়াছে। আর দেশের পয়সা যে নষ্ট হইতেছে, তাহার উপর ত কোন তর্কই চলে না। অস্থায়ী রং যাহা অতি সহজেই দেশেরই উপাদানে বাড়ীতে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়, তাও বিলাতী আমদানী হয়। একটু হলুদ, চুন-হলুদ বা শিউলী ফুলের ডাঁটায় যে রং একরকম বিনা পয়সায় হয় তাহারো আজ আর চলন নাই। আল্‌তা আর আবীর আজ

দেশের ত [illegible] রাজা। চারটী চাল পোড়াইয়া জলে দেলিয়া একটু ভূষা মিশাইয়া লিখিবার কালি হইত। একমুঠা চালের দামই বা কি, আর প্রস্তুত করিবার হাঙ্গামাটাই বা কতটুকু। সে কালি যাহা হইত তাহা চিরস্থায়ী, কোন কালে তাহার রং বদলায় না বা কাগজ নষ্ট করে না। ঐ জিনিষকে ইংরেজীতে (Indelible record ink) বলে। উহার ব্যবহার উঠিয়াই গিয়াছে। উহার পরিবর্ত্তে বিলাত হইতে ডেক্সট্রীন (dexirine) আসিতেছে; বিলাতী নীল রং আসিতেছে। ট্যাবলেট্ মেশিনে চাকৃতি হইয়া উদ্ভিদ কালীর বড়ী বলিয়া বিক্রয় হইতেছে। সুদূর পল্লীগ্রামেও পৌঁছিয়াছে। সে কালি এমন, যে বর্ষাকালে ডাকহরকরা যদি এক পশলা বৃষ্টিতে ভিজিয়া পত্র বিলি করে তবে কার্ডের লেখা একাকার হইয়া যায়। অথচ এই কালি সস্তা নয়। একমুঠা চালে এক বোতল কালি হয়, ইহার চাইতে কিছুই সস্তা হইতে পারে না। আমরা বিলাতী জিনিষ কিনিয়া অর্থহীন হইতেছি, ইহার একমাত্র কারণ যে আমাদের রুচি-বিকার ঘটিয়াছে। বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করিয়া সুসভ্য হইবার সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা দেশময় রহিয়াছে। ওদিকে যাহারা হাজার হাজার মণ এনলিন রং প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহাদের প্রাচীন বাজারে বিক্রয় করা চাই, নহিলে কলের কর্ত্তা ও মজুরদিগের ব্যবসা যায়। আর এদিকে মোহান্ধের এই বিরাট দেশ পড়িয়া আছে, তাহাকে যাহা বিলাতী বলিয়া গিলাইবে তাহাই গিলিবে। আমাদের কুমার, কামার কাঁসারির গড়া হাঁড়ি কড়া গেলাসের পরিবর্ত্তে আর্থেনওয়ার বা বিলাতী পোড়ামাটী এনামেল ওয়ার বা কলাইকরা টুনকো বাসন ব্যবহার করিতেছি। দেশের কামার কাঁসারি যে কি করে, তাহার ভাবনা আমাদের নাই। খয়ের হরিতকী মল্লিষ্ঠা দিয়া রং না করিয়া বিলাতী রংয়ে রঞ্জন করিতেছি। আমাদের জীবনযাত্রার সমস্ত আয়োজন ও চেষ্টার বিলাতী মোহে গলাযাত্রার আয়োজন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

এই বিলাতী মোহ কাটিয়া গেল বলিয়া লোকে ধরমুখো হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহাতে খেতে, শুতে, বসতে, প্রদীপটী জ্বালিতে, বিলাতের সাহায্য না লইতে হয়, তাহার জন্য অনেকে উৎসুক হইয়াছে। দেশীয় রংয়ের ব্যবসা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কাপড় ছোপাইবার রং বিলাতী ছাড়া আর কিছু হইতে পারে এই সংস্কার পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে "আল" লইতে লাল রং হইত। "আল" গাছের শিকড় রংয়ের জন্য একটা বড় পণ্য ছিল। আজকাল কলিকাতার বাজারে কোথাও 'আল' পাওয়া যায় না। 'আল' মঞ্জিষ্ঠা জাতের গাছ, কিন্তু মঞ্জিষ্ঠার ন্যায় লতা নহে। অনেক অনুসন্ধানের পর একজন ব্যবসায়ীর নিকট সন্ধান পাইলাম যে, তিনি যুদ্ধের সময় কিছু আলের ব্যবসা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন চেষ্টা করিয়া যোগাড় করিতে হইবে।" এত বড় একটা বিখ্যাত রং, ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র যাহা বিভিন্ন নামে ব্যবহার হইত, আজ কলিকাতার মত বাণিজ্য কেন্দ্রে তাহার পরিচয়ও মিলে না। আর একটা লালরংয়ের উপাদান বকম্ কাঠ। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মের মেরেগুই প্রদেশ হইতে কেবল মাত্র চাকাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার কাঠ আমদানী হইত। বকম্ ব্রহ্মে এবং মাদ্রাজে প্রচুর জন্মে। উহার ব্যবহার সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী ছিল। বকমের আর এক নাম "পতং।" পতং বলিয়া এখন বিলাতী রং ব্যবহার হইতেছে। কলিকাতার বাজারে একমণ বকম এক যায়গায় পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। আট দশ টাকা মণের সামগ্রী আজ দুই তিন টাকা সের দরে বিক্রয় হয়। উহার চাহিদা নাই। বাণিজ্য উঠিয়া গিয়াছে। কোচিনাল বলিয়া আর এক রকম কীট হইতে লালরং প্রস্তুত হয়। ডাক্তারী ঔষধে ব্যবহার হয় আর পশমী ও গয়নের কাপড়ের

উৎকৃষ্ট রং হয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই, তলঙ্কে ঐ কীট আছে, আর উহার দেশীয় ব্যবসায় ছিল। দেশীয় ভাষায় 'কিরম্ভ' বলে, উহার ব্যবসায় নষ্ট হইয়াছে। আমেরিকান কীট হাজার হাজার টাকার আমদানী হইতেছে। লাক্ষা হইতে লাল রং প্রস্তুত হইত। এখনও লাক্ষা প্রস্তুত করিতে লাল রং বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। অথচ ঐ রকম বিলাতী রং আমদানী করা হয়। ইহা উপকথার মত শোনায়, কিন্তু তাহা হইলেও সত্য। এইরূপ দৃষ্টান্ত রংয়ের ইতিহাসে পরিপূর্ণ।

আমার সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সম্পর্কিত আমার দুইটী ছাত্রকে দেশীয় উপাদান হইতে রং করিবার পদ্ধতি পুনরুদ্ধার করিতে বলি। তাঁহারা কয়েক মাস হইতে এই কার্য্য আরম্ভ করিয়া এক্ষণে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। পুস্তকাকারে তাঁহাদের চেষ্টার ফল প্রকাশিত হইবে। বইখানা বাহির হইলে দেশীয় উপাদানে কত সহজে স্থায়ী রং করা যায় এবং কত সস্তায় রং করা যায় তাহা স্পষ্ট হইবে। এখন আভাস মাত্র জানাইবার জন্য এই কথা বলিতে পারি যে, দুই পয়সার হরিতকী ও বাইক্রোমেটে একটী সুন্দর খাকী রং করা যায়। স্থায়িত্বে এবং বর্ণে তাহা কোনও বিলাতী খাকী অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে।

এককালে হাজার হাজার লোক রঞ্জন কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত, আর তাহাদের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে কত যে লোক অনুসন্ধান করিত, তাহা অনুমেয়। আজ সে সমস্ত লুপ্ত হইয়াছে। রং করার ব্যবসা এমনি গিয়াছে, যে "রঞ্জক" ছিল, আজ সে কেবল রজক বা ধোপা মাত্র। রঞ্জনের কর্ম্ম তাহার নাই। অথচ ধোপারই মত "রঞ্জক" গ্রামে গ্রামেই ছিল, কেহ বা দুই বৃত্তিই করিত। হিতোপদেশের যে রজকের গামলায় শৃগাল পড়িয়া গিয়া ছিল, সে রজক নীল রং করিত। আজকাল-কার ধোপাদের কাপড় ছোপান নীলের গামলায় ডুব দেবার পর কোন শৃগালের ও রকম অভিনয় করা সম্ভব হইত না। কিন্তু খাসল রজকের নীলের গামলায় ডুব দিলেই ও রকমটী যে হতে পারে তাহা চন্দননগর ও ঢাকার নীলের রঞ্জকেরা জানেন। কিন্তু তাঁহারা আজ কয় জন?

—বসুমতী

কার্পাসের চাষ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

[আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়]

বীজ বপন—প্রতি বিঘায় /১৷৷০ —/২ সের বীজ বুনিলে চলিতে পারে। গোবর, ছাই ও চূণ একত্র মিশাইয়া উহার মধ্যে বীজ মাখাইয়া বুনিলে ফল ভাল হয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ বুনিবার প্রশস্ত সময়; এই সময় জমিতে রস না থাকিলে জল সেচন করিয়া বীজ বুনিতে হয়। ২।৩ ফিট অন্তর ২।৩টী বীজ একত্র বুনিতে হয়।

ইজিপ্ট ও আমেরিকার কার্পাসের বীজ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কিংবা আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে বুনিলে ভাল হয়। এ বিষয়েও পরীক্ষা করা আবশ্যক; বর্ষাকালে ফল পাকিলে সুতা ভাল হয় না। এ কারণ কোন্ মাসে কোন্ জাতীয় কার্পাস বুনিলে মাঘ ফাল্গুন মাসে ফল পাকিবে তাহা জানা আবশ্যক।

চারা একটু বড় হইলে কেবল ভালগুলি বাছিয়া রাখিয়া অন্যগুলি উঠাইয়া ফেলিতে হয়; কোনটা মরিয়া গেলে পুনর্ব্বার রোপণ করা কর্ত্তব্য; এই সময় একবার নিড়ানী করা আবশ্যক। ফুলের কলি বাহির হইবার পূর্ব্বে জমি একবার কোদাইয়া দিতে হয়। কার্পাসের সহিত উরিদ, অরহর, শণ, ধঞ্চা প্রভৃতিরও আবাদ করা চলে।

ফল সংগ্রহ—কার্পাসের ফলগুলি সম্পূর্ণ না পাকিলে ও উহার খোসা ফাটিয়া তুলা বাহির না হইলে সংগ্রহ করা উচিত নহে। তুলা মাটিতে

পড়িয়া বৃষ্টি কিম্বা শিশিরে ভিজিয়া গেলে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। একারণ খুব সাবধানের সহিত সংগ্রহ করা আবশ্যক। খোসা হইতে তুলা বাহির করিবার সময়ও বিশেষ সাবধান হইবে কারণ খোসার অংশ মিশ্রিত থাকিলে উহার মূল্য কমিয়া যায়। যে সমস্ত ফলগুলি প্রথম পাকে উহার তুলা ভাল হয়। এই সমস্ত তুলা রৌদ্রে ভাল মত শুকাইয়া ঘরে ভরিয়া রাখিতে হয়। কম শুকাইলে সূতা খারাপ হইয়া যায়।

খরচ—চাষ আবাদে বিঘা প্রতি ৮।১০ টাকার অধিক খরচ লাগে না। কিন্তু এক বিঘায় ভাল ফসল হইলে প্রায় ২৷৷০ মণ—৩/০ মণ বীজ সহ তুলা পাওয়া যায়। বীজ ছাড়াইয়া ফেলিলেও প্রায় ৮০ সের কি ১/০ মণ তুলা থাকে। উহার মূল্য ২০—৩০ টাকা। ইহার আবাদে আমাদের কাপড় পোষাক তৈয়ার করার জন্য একমাত্র উৎকৃষ্ট সূতা পাওয়া যায় এমন নহে, ইহার বীজ হইতে মূল্যবান তৈল ও গবাদির খাদ্যের জন্য খৈল পাওয়া যায়। ইহার আবাদে খরচ বাদেও বিঘা প্রতি ১৫—২০ টাকা লাভ হইতে পারে।

পোকা—

সাধারণতঃ কার্পাসের গাছে নিম্নলিখিত পোকা দেখিতে পাওয়া যায়—

১। চুনি পোকা—ইহা এক প্রকার সূতলী পোকা। কীড়াগুলি পাতা গুটাইয়া উহার মধ্যে থাকে এবং পাতা খায়। যখন গাছের পাতা চুণীর মত হইতে দেখা যায় তখন তাহাদিগকে পোকা সহিত তুলিয়া কেরোসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারিতে হয়। অথবা মাটিতে পুতিয়া রাখিতে হয়। ইহাতে পোকার বংশ বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। একটী জলের পাত্রে কিছু কেরোসিন দিলেই চলিতে পারে।

২। গুটী পোকা—ইহা এক প্রকার সূতলী পোকা কার্পাসের গুটীর ভিতরে ঢুকিয়া যায়। প্রথম হইতে নজর রাখিয়া আক্রান্ত গুটীগুলি অথবা যে গুটী মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে তাহা একত্র করিয়া মাটীর নীচে পুতিয়া রাখিতে হয়।

কাপাসী পোকা—গাঢ় লাল রংয়ের এক-প্রকার লাল পোকা কার্পাসের গুটীর ভিতরে বীজের রস চুষিয়া খায়। এক একটী গুটীর উপর অনেকগুলি পোকা থাকিতে দেখা যায়।

একটী টুকরী গাছের নীচে রাখিয়া গাছ নাড়া দিলে পোকাগুলি পড়িবে। এইরূপে পোকা সংগ্রহ করিয়া কেরোসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারিতে হয়। পোকা কিম্বা অন্যান্য রোগ যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্য প্রথম হইতেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। একবার অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলে উহার দমন করা বড়ই কষ্ট ও শ্রমসাধ্য।"

—বসুমতী

পুনরাবৃত্তি

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১

সেদিন যুদ্ধের খবর ভালো ছিল না। রাজা বিমর্ষ হয়ে বাগানে বেড়াতে গেলেন।

দেখতে পেলেন প্রাচীরের কাছে গাছতলায় বসে' খেলা করচে একটি ছোট ছেলে, আর একটি ছোট মেয়ে।

রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি খেলচ?"

তারা বল্‌লে, "আমাদের আজকের খেলা রাম-সীতার বনবাস।"

রাজা সেখানে বসে' গেলেন।

ছেলেটি বল্‌লে, "এই আমাদের দণ্ডক বন, এখানে কুটীর বাঁধ্‌চি।"

সে একরাশ ভাঙা ডালপালা খড় ঘাস কুড়িয়ে এনেচে, তারি ব্যস্ত। আর মেয়েটি শাকপাতা নিয়ে খেলার হাঁড়িতে বিনা আগুনে রাঁধ্‌চে; রান্ন

খাবেন, তারি আয়োজনে সীতার একদণ্ড সময় নেই।

রাজা বল্‌লেন, "আর ত সব দেখ্‌চি, কিন্তু রাক্ষস কোথায়?" ছেলেটিকে মান্‌তে হল তাদের দণ্ডকবনে কিছু কিছু ত্রুটি আছে। রাজা বল্‌লেন, "আচ্ছা, আমি হব রাক্ষস।"

ছেলেটি তাঁকে ভালো করে' দেখ্‌লে। তার পরে বল্‌লে, "তোমাকে কিন্তু হেরে যেতে হবে।"

রাজা বল্‌লেন, "আমি খুব ভালো হার্‌তে পারি। পরীক্ষা করে' দেখ।"

সেদিন রাক্ষসবধ এতই সুচারুরূপে হতে লাগ্‌ল যে, ছেলেটি কিছুতে রাজাকে ছুটি দিতে চায় না। সেদিন এক বেলাতে তাঁকে দশ-বারোটা রাক্ষসের মরণ একলা মর্‌তে হল। মর্‌তে মর্‌তে তিনি হাঁপিয়ে উঠ্‌লেন।

ত্রেতা যুগে পঞ্চবটীতে যেমন পাখী ডেকেছিল সেদিন সেখানে ঠিক্ তেমনি করেই ডাক্‌তে লাগ্‌ল। ত্রেতাযুগে সবুজ পাতার পর্দায় পর্দায় প্রভাত-আলো যেমন কোমল ঠাটে আপন সুর বেঁধে নিয়েছিল আজও ঠিক্ সেই সুরই বাধ্‌লে।

রাজার মন থেকে ভার নেমে গেল। মন্ত্রীকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "ছেলে মেয়ে দুটি কার?"

মন্ত্রী বল্‌লে, "মেয়েটি আমারই, নাম রুচিরা। ছেলের নাম কৌশিক, ওর বাপ দরীব ব্রাহ্মণ, দেব-পূজা ক'রে দিন চলে।"

রাজা বল্‌লেন, "যখন সময় হবে, এই ছেলেটির সঙ্গে ঐ মেয়ের বিবাহ হয় এই আমার ইচ্ছা।"

শুনে মন্ত্রী উত্তর দিতে সাহস কর্‌লে না, মাথা হেঁট করে' রইল।

২

দেশে সব-চেয়ে যিনি বড় পণ্ডিত রাজা তাঁর কাছে কৌশিককে পড়তে পাঠালেন। যত উচ্চ বংশের ছাত্র তাঁর কাছে পড়ে। আর পড়ে রুচিরা।

কৌশিক যেদিন তাঁর পাঠশালায় এল সেদিন অধ্যাপকের মন প্রসন্ন হল না। অন্য সকলেও লজ্জা পেলে। কিন্তু রাজার ইচ্ছা। সকলের চেয়ে সঙ্কট রুচিরার। কেন না, ছেলেরা কানাকানি করে। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়, রাগে তার চোখ দিয়ে জল পড়ে।

কৌশিক যদি কখনো তাকে পুঁথি এগিয়ে দেয়, সে পুঁথি ঠেলে ফেলে। যদি তাকে পাঠের কথা বলে, সে উত্তর করে না।

রুচির প্রতি অধ্যাপকের স্নেহের সীমা ছিল না। কৌশিককে সকল বিষয়ে সে এগিয়ে যাবে এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা, রুচিরও সেই ছিল পণ।

মনে হল সেটা খুব সহজেই ঘট্‌বে, কারণ, কৌশিক পড়ে বটে কিন্তু একমনে নয়। তার সাঁতার কাট্‌তে মন, তার বনে বেড়াতে মন, সে গান করে, সে যন্ত্র বাজায়।

অধ্যাপক তাকে ভর্ৎসনা করে' বলেন, "বিদ্যায় তোমার অনুরাগ নেই কেন?"

সে বলে, "আমার অনুরাগ শুধু বিদ্যায় নয়, আরও নানা জিনিষে।"

অধ্যাপক বলেন, "সে-সব অনুরাগ ছাড়।"

সে বলে, "তাহলে বিদ্যার প্রতিও আমার অনুরাগ থাক্‌বে না।"

৩

এমনি করে' কিছুকাল যায়।

রাজা অধ্যাপককে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তোমার ছাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?"

অধ্যাপক বল্‌লেন, "রুচিরা।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কৌশিক?"

অধ্যাপক বল্‌লেন, "সে যে কিছুই শিখেছে এমন বোধ হয় না।"

রাজা বল্‌লেন, "আমি কৌশিকের সঙ্গে রুচির বিবাহ ইচ্ছা করি।"

অধ্যাপক একটু হাসলেন, বল্‌লেন, "এ যেন রোদ্দুরের সঙ্গে ঊষার বিবাদের প্রস্তাব।"

রাজা মন্ত্রীকে বলে দিলেন, "তোমার সঙ্গে কৌশিকের [illegible] বিরোধ না।"

মন্ত্রী বল্‌লে, "মহারাজ, আমার কন্যা এ বিবাহে অনিচ্ছুক।"

রাজা বল্‌লেন, "স্ত্রীলোকের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়?"

মন্ত্রী বল্‌লে, "তার চোখের জলও যে সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

রাজা বল্‌লেন, "সে কি মনে করে কৌশিক তার অযোগ্য?"

মন্ত্রী বল্‌লে, "হাঁ, সেই কথাই বটে।"

রাজা বল্‌লেন, "আমার সাম্‌নে দুজনের বিদ্যার পরীক্ষা হোক্। কৌশিকের জয় হলে এই বিবাহ সম্পন্ন হবে।"

পরদিন মন্ত্রী রাজাকে এসে বল্‌লে, "এই পণে আমার কন্যার মত আছে।"

৪

বিচার-সভা প্রস্তুত। রাজা সিংহাসনে বসে', কৌশিক তাঁর সিংহাসনতলে। স্বয়ং অধ্যাপক রুচিকে সঙ্গে করে' উপস্থিত হলেন। কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে' তাঁকে প্রণাম ও রুচিকে নমস্কার কর্‌লে। রুচি দৃক্‌পাতও কর্‌লে না।

কোনোদিন পাঠশালার রীতিপালনের জন্যেও কৌশিক রুচির সঙ্গে তর্ক করেনি। অন্য ছাত্রেরাও অবজ্ঞা করে' তাকে তর্কের অবকাশ দেয়নি। তাই আজ যখন তার যুক্তির মুখে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ তীব্রের ঝলায় আলোর মত ঝিক্‌মিক করে' উঠ্‌ল, তখন গুরু বিস্মিত হলেন, এবং বিরক্ত হলেন। রুচির কপালে ঘাম দেখা দিল, সে বুদ্ধি স্থির রাখ্‌তে পার্‌লে না। কৌশিক তাকে পরাভবের শেষ কিনারায় নিয়ে গিয়ে তবে ছেড়ে দিলে।

ক্রোধে অধ্যাপকের বাক্‌রোধ হল, আর রুচির চোখ দিয়ে ধারা বেয়ে জল পড়তে লাগল।

রাজা মন্ত্রীকে বল্‌লেন, "এখন বিবাহের দিন স্থির কর।"

কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে জোড় হাতে রাজাকে বল্‌লে, "ক্ষমা কর্‌বেন, এ বিবাহ আমি কর্‌ব না।"

রাজা বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, "অমনত পুরস্কার গ্রহণ কর্‌বে না?"

কৌশিক বল্‌লে, "এর আমারই থাক্, পুরস্কার অন্যের হোক্।"

অধ্যাপক বল্‌লেন, "মহারাজ, আর এক বছর সময় দিন, তার পরে শেষ পরীক্ষা।"

সেই কথাই স্থির হল।

৫

কৌশিক পাঠশালা ত্যাগ করে' গেল। কোনোদিন সকালে তাকে বনের ছায়ায়, কোনোদিন সন্ধ্যায় তাকে পাহাড়ের চূড়ার উপর দেখা যায়।

এ দিকে রুচির শিক্ষায় অধ্যাপক সমস্ত মন দিলেন। কিন্তু রুচির সমস্ত মন কোথায়?

অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন, "এখনো যদি সতর্ক না হও, তবে দ্বিতীয়বার তোমাকে লজ্জা পেতে হবে।"

দ্বিতীয়বার লজ্জা পাবার জন্যেই যেন সে তপস্যা কর্‌তে লাগ্‌ল। অপর্ণার তপস্যা যেন অনশনের, রুচির তপস্যা তেমনি অনধ্যায়ের। ষড়দর্শনের পুঁথি তার বন্ধই রইল, এমন কি কাব্যের পুঁথিও দৈবাৎ খোলা হয়।

অধ্যাপক রাগ করে' বল্‌লেন, "কপিল-কণাদের নামে শপথ করে' বল্‌চি আর কখনো স্ত্রীলোক ছাত্র নেব না। বেদ-বেদান্তের পার পেয়েছি, স্ত্রীজাতির মন বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।"

একদা মন্ত্রী এসে রাজাকে বল্‌লে, "অবন্তীর বাড়ি থেকে কন্যার সম্বন্ধ এসেচে। কুলে শীলে

মনে মানে তারা অদ্বিতীয়। মহারাজের সম্মতি চাই।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কন্যা কি বলে?"

মন্ত্রী বললে, "মেয়েদের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়?"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তার চোখের জল আজ কি রকম সাক্ষ্য দিচ্ছে?"

মন্ত্রী চুপ্ করে' রইল।

৬

রাজা তাঁর বাগানে এসে বললেন। মন্ত্রীকে বল্লেন, "তোমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

রুচিরা এসে রাজাকে প্রণাম করে' দাঁড়াল।

রাজা বললেন, "বৎসে, সেই রামের বনবাসের খেলা মনে আছে?"

রুচিরা স্মিতমুখে মাথা নীচু করে' দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বললেন, "আজ সেই রামের বনবাস খেলা আর একবার দেখ্‌তে আমার বড় সাধ।"

রুচিরা মুখের একপাশে আঁচল টেনে চুপ করে' রইল। —প্রবাসী

রাজা বললেন, "বনও আছে, রামও আছে, কিন্তু শুন্‌চি বৎসে, এবার সীতার অভাব ঘটেচে। তুমি মনে কর্‌লেই সে অভাব পূরণ হয়।"

রুচিরা কোনো কথা না বলে' রাজার পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম কর্‌লে।

রাজা বল্‌লেন, "কিন্তু বৎসে, এবার আমি রাক্ষস সাজতে পার্‌ব না।"

রুচিরা স্নিগ্ধ চক্ষে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

রাজা বল্‌লেন, "এবার রাক্ষস সাজ্‌বে তোমাদের অধ্যাপক।"

কলার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি

(শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র, এম্-এ, বি-এল্)

কলার উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ যুগের কলাবিদের প্রকৃতি কিরূপ হইবে, তাহা কলানুশলী মহামতি টলষ্টয় ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টার ন্যায় জ্ঞাননেত্রে দর্শন করিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই একটু আলোচনা করিব। তিনি বলিয়াছেন, য়ুরোপের অধুনাতন কলা বা আর্ট ধর্ম্মের পথ হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন সার্ব্বজনিক প্রেম বা ভ্রাতৃভাব আমাদের কলার উদ্দেশ্য নয়। য়ুরোপের কলাবিদ্ মনীষীরা খৃষ্টের বিশ্বপ্রেমের নীতিকে আর আদর্শরূপে গ্রহণ করেন না। কেহ কেহ অজ্ঞেয়-বাদের দোহাই দিয়া ব্যক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ নগ্ন সৌন্দর্য্যের উপাসনার অজুহাতে অশ্লীল চিত্র অঙ্কিত করিয়া গর্ব্বানুভব করেন। আত্মপ্রতিষ্ঠা ইঁহাদের জীবনে, কাব্যে, লেখায় ও চিত্রে ফুটিয়া উঠে। জগৎকে যে এক প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে পারা যায়—আত্মানুভূতিকে, সাধারণানুভূতির ভিতর ডুবাইয়া রাখিয়া আপনাকে ভুলিয়া দেশের দশের জন্য কার্য্য করিয়া যে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে পারা যায়, তাহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। খৃষ্টের নীতি অনুসরণ করিলে মানব-জীবনের, তথা কলার, প্রকৃত আদর্শ যে কি, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ না হইলে, অচ্ছেদ্য প্রেমের সূত্রে সকল মানবকে গ্রথিত করিতে না পারিলে, মানব-কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না—পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এখন একথা এক-বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। টলষ্টয় আমাদের কল্যাণ একীকরণ ও ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের উপর নির্ভর করে বলিয়া যে সত্য ইউরোপে প্রচার করিয়াছেন, তাহা ভাববর্জ্জিত-আত্মসর্ব্বস্ব ইউরোপে নূতন। (Our welfare lies only in the unification and the brotherhood of man.)

এই মঙ্গলগ্রন্থ আদর্শ যিনিই আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্‌রূপে পরিচিত হইবেন। টেলিগ্রাম, টেলিফোন, সংবাদপত্র দূরত্বের ব্যবধানকে অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছে। পূর্ব্বে এদেশের চিন্তাধারা অন্য দেশের লোক জানিতে

'হত না। এক্ষণে তাহা পারিতেছে। অধিকন্তু জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি হওয়ায় ও কুসংস্কার-মেঘ অনেকটা কাটিয়া যাওয়ায়, মানুষকে প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারা এখন যত সহজ হইয়াছে, পূর্ব্বে তত্টা ছিল না। যে কলাবিদ্ এ আদর্শমূলক অনুভূতি আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারিবেন ও যাঁহার সৌভ্রাতৃত্বের চিত্র দেখিয়া আমরা ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য ব্যগ্র হইব, তিনিই এ যুগের শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ বলিয়া গণ্য হইবেন। এ যুগের ডিকেন্স, হিউগো ও ডষ্টয়েভস্কির লেখনী হইতে, মিলেট, Bastien, Lepage, Jules, Breton, L' Mermille প্রভৃতির অনুপমসুন্দর চিত্র হইতে এই আদর্শের চিত্র পরিস্ফুটভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা সমাজের শ্রেষ্ঠবর্গের বা উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের ভাবধারাকে সাধারণের ভিতর প্রচলিত করিতে চেষ্টা করেন নাই; ইঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন সেই ভাবধারা সমাজের মধ্যে প্রচলন করিতে—যাহার দ্বারা সকলের একসূত্রে বদ্ধ হইয়া বিশ্বমানবতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। যে কলাবিদ্ ভোগলালসার উদ্রেক করেন, তিনি কখনই আমাদের আদর্শস্থানীয় হইতে পারেন না। তাঁহার কলা-নৈপুণ্য আমাদের চক্ষুকে কিয়ৎক্ষণের জন্য কলসিত করিয়া দিতে পারে, আপাতমধুর ভোগলালসার অভিমুখে একটু টানিয়া লইতে পারে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখিতে পারে না—কোন স্মৃতি রাখিয়া যায় না।

মনীষী টলষ্টয় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, আমাদের আধুনিক কলা রূপজীবিনীর ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে রমণী মাতৃত্বের অধিকারিণী, মানবকে গর্ভে ধারণ করিয়া বিশ্বমানবের উপর শ্রেষ্ঠদান উপহার দিবেন,—তিনি কি করিতেছেন? না, ভোগলালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য যাহারা তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিতেছে, তাহাদের লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন—তাহাদের কামানলে ইন্ধন যোগাইতেছেন।

নানা দিক হইতে দেখিতে গেলে এই উপমা যে সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বেশ্যার ন্যায় এখনকার কলাও স্থান-কাল-পাত্র বিচার করে না। সর্ব্বদাই সে লজ্জিত-ভাবে দেখা দিয়া থাকে। উভয়েরই প্রকৃত বেশ দেখিতে পাওয়া যায় না, উভয়ই সর্ব্বসময়ে বিক্রীত হইয়া থাকে, এবং উভয়ই মানবকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়।

প্রকৃত 'কলা' বা আর্ট এত সহজসাধ্য জিনিষ নয়। সকল রমণী যেমন পুত্র প্রসব করিয়া মাতৃত্বের গৌরব লাভ করিতে পারে না—জগতে বন্ধ্যা রমণীর ত অভাব নাই—সেইরূপ প্রকৃত আর্ট কলাবিদের প্রাণের মধ্যে সময়-বিশেষে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ক্রেতার আবশ্যকমত সামান্য কারিগর যেমন দ্রব্য নির্ম্মিত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে, প্রকৃত কলাবিদ্ সেইরূপ বিক্রয় করিয়া অর্থলাভের জন্য 'কলার' সৃষ্টি করিতে পারেন না। এইরূপে কৃত্রিম কলার সৃষ্টি হইতে পারে; এবং এখনকার অধিকাংশই এই শ্রেণীর কলা।

প্রকৃত কলা সাজসজ্জার অপেক্ষা রাখে না। সে স্বামী-প্রেম-সোহাগিনী রমণীর ন্যায়,—তাহার অলঙ্কারের কোনরূপ আবশ্যকতা নাই। কৃত্রিম 'কলা' মানবকে ভুলাইবার জন্য সর্ব্বদাই কুলটার ন্যায় সাজগোছ করিয়া থাকিতে ভালবাসে। সন্তান-সন্ততি যেমন স্ত্রীপুরুষের প্রেমের নিদর্শন, সেইরূপ সাধারণ ভাবধারার সহিত কোন এক নূতন ধারা সম্মিলিত হইয়া কলার সৃষ্টি করিয়া থাকে। কলাবিদের আন্তরিক ভাবধারা ভাষায় বা চিত্রে প্রকাশিত হইলে 'কলা' নামে অভিহিত হয়।

কৃত্রিম কলা মানুষের স্বাভাবিক ভাবগুলিকে বিকৃত করিয়া দেয়। সুখের সন্ধান বলিয়া দেয়, প্রাণে আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিয়া দেয়, কিন্তু তৃপ্তির

শক্তি দিতে পারে না; মানবের ধর্ম্মের শক্তিকে শিথিল করিয়া দেয়।

দুই পাঁচজনের বা কোন শ্রেণী-বিশেষের লোকদের চিত্ত-বিনোদন করিবার জন্য কলার সৃষ্টি হইতে পারে না। সৌন্দর্য্যানুভূতি সাধারণের সম্পত্তি, সকলে একত্র মিলিয়া আনন্দ বা শান্তি উপভোগ করিতে না পারিলে কলার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। উচ্চশ্রেণীর লোক বা শিক্ষিত লোকদিগকে আনন্দদানই কলার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃত কলা হইতে সকলে একই সময়ে রসগ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়। কলা এমন উচ্চআদর্শ সৃষ্টি করিবে যাহাতে সকলেই সেই আদর্শকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া মানবত্বের উচ্চ গ্রামে উন্নীত হইতে পারে—মানব দেবত্বের অধিকারী হইতে পারে। শ্রেষ্ঠ কলাবিদের আদর্শ স্থান-কাল-পাত্রের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে না। তিনিই শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্, যিনি চিত্রে বা কাব্যে মানবকে ছোট করিয়া দেখেন না—যিনি মানবকে মানব বলিয়াই আলিঙ্গন করিয়া থাকেন—যাঁহার কার্য্যে ও ব্যবহারে এই উচ্চাদর্শ কখনও ক্ষুণ্ণ হয় না। তিনিই শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্, যাঁহার কার্য্য বংশাবলীকে ও জাতি-সকলকে ভ্রাতৃত্বের হেম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখে। ভবিষ্যতে 'আর্টের' ধারা কোন্ খাতে প্রবাহিত হইবে, বিচার করিতে গিয়া ঋষি টলষ্টয় সত্যই বলিয়াছেন, সাধারণ মানবের মনে যে কলাবিদ্ উচ্চ আদর্শ ও সময়োপযোগী ধর্ম্মভাব জাগরূক করিতে পারিবেন, তিনিই ধন্য হইবেন। ভবিষ্যতে উচ্চ আদর্শ ও ধর্ম্মভাবের ভিতর দিয়া আর্টের ধারা প্রবাহিত হইবে। সাধারণ মানব-হৃদয়ে ভাবের বন্যা যিনি প্রবাহিত করাইতে পারিবেন, তিনিই কলাবিদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। আর্টের কার্য্যকরী শক্তি তখন আর লোক-বিশেষের মধ্যে বা বিশেষ কোনও শ্রেণীর ভিতর আবদ্ধ থাকিবে না,—সর্ব্বজনমধ্যে সমান ভাবে কার্য্য করিতে থাকিবে। তখন আর আর্টের দুর্ব্বোধ্যতা থাকিবে না। আর্ট সরল, প্রাণস্পর্শী হইবে; প্রকৃত সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের সহিত আর্টের উন্নতি হইবে। পুঁথিগত বিদ্যা লাভ করিয়া প্রকৃত শিল্পী বা artist হওয়া যায় না। পুঁথিগত বিদ্যা বা বিদ্যালয় হইতে অর্থকরী আর্টের (professional art) শিক্ষা করিতে পারা যায়, কিন্তু বড় বড় শিল্পীর জীবন-চরিত ও কার্য্যাবলী আলোচনা না করিলে প্রকৃত আর্টের সন্ধান পাওয়া যায় না। সমাজে যে আর্টের নিদর্শন ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেগুলির প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে প্রকৃত কলাবিদ্ হওয়া যায় না।

ভবিষ্যতে কলাবিদ্ অর্থলোভে কার্য্য করিবেন না। অর্থের জন্য কলাসৃষ্টিই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে না। ভবিষ্যতে সমাজের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তি কলার কার্য্যকরী শক্তির প্রেরণাবশে কলা সৃষ্টি করিতে পারিবেন; সেই অন্তর্নিহিত শক্তির অভাব হইলে কেহ অর্থলোভে কলার সৃষ্টি করিতে বাগ্র হইবেন না। এই শক্তি লাভ করিতে হইলে সৌন্দর্য্যজ্ঞান যাহাতে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। বিদ্যালয়গুলিতে নৃত্যগীতাদি ও চিত্রাঙ্কনী-বিদ্যা অন্যান্য বিদ্যার সহিত অধীত হওয়া উচিত। এইগুলির অনুশীলন করিতে করিতে মানব-হৃদয়ে সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অনুভূতি আসিবে। এই অনুভূতি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। তারপর নব নব উন্মেষশালিনী শক্তিবলে কার্য্য করিয়া তিনি কলাবিদ্ হইতে পারেন। আর যদি তাঁহার ভিতর কলার কার্য্যকরী শক্তির প্রেরণা না আসে, তাহা হইলে সাধ্য-সাধনা করিয়াও তিনি প্রকৃত কলার সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

অনেকের ধারণা, সচ্ছল অবস্থায় না থাকিলে, কলাবিদ প্রকৃত কলার জন্ম দিতে পারেন না। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করা উচিত। কলাসৃষ্টি কলাবিদের অনুভূতির প্রেরণার উপর যখন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর

করে, তখন যে অবস্থা মানবের পক্ষে স্বাভাবিক, যে অবস্থায় পড়িলে মানবের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সহজেই, সেই অবস্থাই কলাসৃষ্টির [illegible] পারে। প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্ব ক[illegible] মানবকে সংসারে আত্মপ্রতিষ্ঠা [illegible] তাই বলিতেছি, যিনি দারিদ্র্যের সহ[illegible] করিয়া থাকেন—যিনি অত্যাচার ও [illegible]রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান—যিনি মানবের কল্যাণকামী হইয়া সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হিমালয় পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিয়া থাকেন, এই সকলের নির্ম্মম আঘাতে যাঁহার হৃদয়ে সুকুমার বৃত্তিগুলি অধিকতর স্ফূর্ত্তিলাভ করে, তিনিই আপনার ভাবনিচয় অন্যের মনে যত শীঘ্র সঞ্চারিত করিতে পারেন, অপরে তাহা তত শীঘ্র পারে না। পরিশ্রমী কর্ম্মী ব্যক্তিই কলাবিদ্ হইতে পারেন। সুখ স্বচ্ছন্দে লালিতপালিত ব্যক্তির পক্ষে কলানুশীলন হওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। টলষ্টয় সত্যই বলিয়াছেন,'There is no position more injurious to an artist's productiveness than that position of complete security and luxury in which artists usually live in our society.' ভবিষ্যতের শিল্পীকে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় অর্থোপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এইরূপ শিল্পীর ভাবধারা যাহাতে সাধারণের ভিতর অনুসৃত হয়, সে বিষয়ে শিল্পীর যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। শিল্পের মূল্য সামান্য টাকা-কড়িতে হইতে পারে না—শিল্পীর আনন্দই তাহার যথার্থই মূল্য।

ব্যবসায়ী শিল্পীরা যখন শিল্পমন্দির হইতে বিতাড়িত হইবে, তখনই ইহা প্রকৃত মন্দিররূপে পরিগণিত হইবে; এবং ভবিষ্যতের শিল্পীরা ব্যবসাদারদিগকে মন্দিরদ্বার হইতে দূর করিয়া দিতে পারিবেন।

ভবিষ্যতের আর্ট এখনকার আর্ট অপেক্ষা কোন মতেই হীন হইয়া পড়িবে না; বরং সরলতাগুণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। কলাবিদের প্রাণে যে ভাব-লহর উত্থিত হইবে, তাহাই সরলভাবে সাধারণ মানবের মনে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে জ্ঞানবান্ করিবে ও উচ্চ আদর্শের সন্ধান দিয়া দিবে। সরলভাবে বর্ণন করা যে কত দুরূহ ব্যাপার, তাহা আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। ভবিষ্যতে কলার বিষয় হইবে, সেই সমুদয় অনুভূতি যাহা মানবকে একতাবন্ধনে আবদ্ধ করিবার সহায়তা করে অথবা আবদ্ধই করে; আর তাহার আকার এরূপ হইবে, যাহা সকল লোকেরই বোধ্য, যাহা ব্যক্তিবিশেষকে বা কোন শ্রেণীবিশেষকে আনন্দ দান না করিয়া সাধারণকে আনন্দ দান করে। এখনকার আর্টের মত [illegible] আর্ট আমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে না—আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়তা করিবে।

টলষ্টয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই; বস্তুতঃ যাহা আমাদের উন্নতির সহায়তা করিবে—যাহা আমাদিগকে ধ্রুবের দিকে, সত্যের দিকে লইয়া যাইবে, তাহাই কলা বা আর্টের বিষয়ীভূত হইবে। সাধারণের ভিতর ভাব-সঞ্চরণই যে কলাবিদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাতেও কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না। কলা আমাদিগের রসের নামান্তর মাত্র। যাহা কিছু সুন্দর—যাহা কিছু পবিত্র, তাহাই রসের আধার। আর প্রকৃত রসভোগ করিতে পারিলেই আমরা আনন্দ লাভ করিয়া থাকি। রসিক বা কলাবিদ্ তিনিই—যিনি জগতে প্রেমের রাজ্য স্থাপন করিতে সহায়তা করেন। এ পর্য্যন্ত তাহার সহিত আমাদের কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু যেখানে তিনি অর্থ-প্রতিগ্রাহী কলাবিদের উপর খড়্গ হস্ত হইয়াছেন, সেখানে আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি না। জগতে কোন দ্রব্য ত বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। শিল্পীর কল্পনা-প্রসূত চিত্র বা কাব্যের মূল্য ত দিতেই হইবে।

অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে বলিয়া জগতের বরণো চিত্রশিল্পীদের অঙ্কিত চিত্র কোথায় আদর্শভাব উদ্রেক করিতে অসমর্থ হইয়াছে? শিল্পীরও ত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। আর এ কার্য্য করিতে হইলে অর্থের আবশ্যকতা আছে। এ অর্থ আসিবে কোথা হইতে? জীবন-সংগ্রাম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে টলষ্টয় উপদেশ দিয়াছেন। বেশ কথা; কিন্তু এই দুর্দ্দিনে যদিও অন্য ক্ষেত্র হইতে অর্থ উপার্জ্জন করিতে শিল্পীর সমস্ত বা অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়া যায়, তাহা হইলে শিল্পানুশীলন তিনি করিবেন কখন? অনুশীলন না করিলে, সাধনা না করিলে যে সিদ্ধিলাভ হয় না, একথাও সর্ব্বজনগ্রাহ্য। তাই বলিতেছিলাম, ব্যবসাদারী কলাবিদ্ বা professio nal artist বলিয়া যাহাদিগকে টলষ্টয় ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন, বাস্তবিক তাহারা ঘৃণার্হ কি না, তাহাও বিবেচ্য। শিল্পী ব্যবসাদার-পেশাদারই হউন, আর অবৈতনিকভাবে অহেতুক প্রেমের বশে শিল্পানুশীলন করুন, উভয়ের কৃতকার্য্যের বিচার টলষ্টয়ের প্রদত্ত উচ্চ আদর্শ দিয়া করিব; আর তখনই তাঁহাকে ঘৃণা করিব, যখন সেই আদর্শ হইতে শিল্পী বিচ্যুত হইবেন—যখন শিল্পী ঘৃণিত ধিক্কারজনক চিত্র অঙ্কিত করিবেন; তা শিল্পী অবৈতনিক শিল্পীই হউন আর পেশাদার শিল্পীই হউন। পেশাদার শিল্পীর স্বপক্ষে আর একটা কথা বলিবার আছে। অর্থ পাইবার আশায় শিল্পী তাঁহার কার্য্যকে নিখুঁৎ করিবার চেষ্টা করে না, তাহাই বা কি করিয়া বলিব? শিল্পীর কার্য্য সুন্দর না হইলে তাঁহার চিত্র অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবে কেন? আর এই শ্রেণীর শিল্পীরাও যে সাধনা করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই; অবশ্য সফলতা লাভ করা বা না-করা শিল্পীর হাতে ত নয়।

আর একটা কথা, দারিদ্র্যকে আমরা যেরূপ বরণ করিয়া লইতে পারি, জগতের কোন জাতি সেরূপ পারে কি না সন্দেহ। আমরা জানি, দুঃখ-দারিদ্র্য আমাদের সুপ্ত শক্তিকে কার্য্য করিতে উদ্বুদ্ধ করে—তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় নির্দ্ধারণ করিতে ব্যস্ত হয়। আমাদের দেশে সাধ-কেরাই বলিতে পারেন, "দাও প্রভো দুঃখ দাও মাথা পাতিয়া লইব; সুখের মধ্যে থাকিলে তোমাকে ত ভুলিয়া যাইব নাথ, দাও প্রভো দুঃখ দাও। দুঃখ পাইলেই তোমাকে স্মরণ করিব।" সত্য কথা, কিন্তু তাই বলিয়া টলষ্টয়ের এ কথা কি করিয়া মানিয়া লইব যে, সচ্ছল অবস্থার ভিতর থাকিলে প্রকৃত কলার পরিচয় পাওয়া যায় না। আমাদের রবীন্দ্র-নাথের দিকে একবার চাহিয়া দেখুন। সুখৈশ্বর্য্যের কোলে লালিত-পালিত হইয়া সচ্ছল অবস্থার ভিতর থাকিয়াও সাহিত্যে তিনি যে রসসৃষ্টি করিয়াছেন, যে কলার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা জগতের মনীষীরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। শিল্পীর অবস্থার সহিত তাঁহার উদ্ভাবিত শিল্পের যে বিশেষ কোন সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা ত দেখিতে পাইতেছি না, বা অন্ততঃ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ যে নাই, তাহা রবীন্দ্র-নাথের দৃষ্টান্ত হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, জগতে ভ্রাতৃপ্রেম যিনি সংস্থাপিত করিতে চান, তাঁহার নিকট বিদ্বেষের ভাবসূচক কোন কথা শুনিলে আমরা মর্ম্মাহত হই। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথম টলষ্টয়ের *What is Art* পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, 'Until the dealers are driven out, the temple of art will not be a temple. But the art of the future will drive them out." তখনও যেরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম, এখনও তদ্রূপই হইয়াছি। ঐ সকল পেশাদার কারিগরকে শিল্পিরূপে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা ত তিনি কোন দিন করেন নাই। আমার বোধ হয় তাহাদের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া তিনি হৃদয়ে ব্যথা পাইয়া-ছিলেন। ইংরাজীতে যাহাকে honest indignation বলে, তাহা তাঁহার হইয়াছিল। ঘৃণার কারণ যে

ছিল না তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি না। আর টলষ্টয় ছিলেন ভাবপ্রবণ, তাই বোধ হয় ভাবের বশে পূর্ব্বোক্ত দুই ছত্র লিখিয়া ফেলিয়াছেন।

—শিক্ষক, বৈশাখ

সিদ্ধি

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১

স্বর্গের অধিকারে মানুষ বাধা পাবে না এই তার পণ। তাই কঠিন সন্ধানে অমর হবার মন্ত্র সে শিখে নিয়েচে। এখন একলা বনের মধ্যে সেই মন্ত্র সে সাধনা করে।

বনের ধারে ছিল এক কাঠকুড়নী মেয়ে। সে মাঝে মাঝে আঁচলে করে তার জন্য ফল নিয়ে আসে, আর পাতার পাত্রে আনে ঝরণার জল।

ক্রমে তপস্যা এত কঠোর হল যে, ফল সে আর ছোঁয় না, পাখীতে এসে ঠুক্‌রে খেয়ে যায়।

আরো কিছু দিন গেল। তখন ঝরণার জল পাতার পাত্রেই শুকিয়ে যায়, মুখে ওঠে না।

কাঠকুড়নি মেয়ে বলে, "এখন আমি করব কি? আমার সেবা যে বৃথা হ'তে চল্‌ল।"

তারপর থেকে ফুল তুলে সে তপস্বীর পায়ের কাছে রেখে যায়, তপস্বী জান্‌তেও পারে না।

মধ্যাহ্নে রোদ যখন প্রখর হয় সে আপন আঁচলটী তুলে' ধরে' ছায়া করে' দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু তপস্বীর কাছে রোদও যা ছায়াও তা।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্তে অন্ধকার যখন ঘন হয় কাঠকুড়নি সেখানে জেগে বসে থাকে। তাপসের কোন ভয়ের কারণ নেই তবু সে পাহারা দেয়।

২

একদিন এমন ছিল যখন এই কাঠকুড়নীর সঙ্গে দেখা হ'লে নবীন তপস্বী স্নেহ করে জিজ্ঞাসা করত, "কেমন আছ?"

কাঠকুড়নি বলত, "আমার ভালই কি আর মন্দই কি! কিন্তু তোমাকে দেখবার লোক কি কেউ নেই? তোমার মা? তোমার বোন?"

সে বল্‌ত, "আছে সবাই, কিন্তু আমাকে দেখে হবে কি? তারা কি আমায় চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে পার্‌বে?"

কাঠকুড়নি বল্‌ত, "প্রাণ থাকে না বলেই ত প্রাণের জন্যে এত দরদ।"

তাপস বল্‌ত, "আমি খুঁজি চিরদিন বাঁচবার পথ। মানুষকে আমি অমর কর্‌ব।"

এই বলে' সে কত কি বলে যেত, তার নিজের সঙ্গে নিজের কথা, সে কথার মানে বুঝবে কে?

কাঠকুড়নী বুঝত না, কিন্তু আকাশে নব মেঘের ডাকে ময়ূরীর যেমন হয় তেমনি তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠত।

তার পরে আরো কিছুদিন যায়। তপস্বী মৌন হয়ে এল, মেয়েকে কোন কথা বলে না।

তার পরে আরো কিছু দিন যায়। তপস্বীর চোখ বুজে এল, মেয়েটীর দিকে চেয়ে দেখে না।

মেয়ের মনে হল সে আর ঐ তাপসের মাঝখানে যেন তপস্যার লক্ষযোজন ক্রোশের দূরত্ব। হাজার হাজার বছরেও এতটা বিচ্ছেদ পার হয়ে একটুখানি কাছে আস্‌বার আশা নেই।

তা নাই বা রইল আশা। তবু ওর কান্না আসে, মনে মনে বলে, দিনে একবার যদি বলেন, কেমন আছ, তাহলে সেই কথাটুকুতে দিন কেটে যায়, একবেলা যদি একটু ফল আর জল গ্রহণ করেন তাহলে অন্নজল ওর নিজের মুখে রোচে।

৩

এদিকে ইন্দ্রলোকে খবর পৌঁছিল, মানুষ মর্ত্তকে লঙ্ঘন করে' স্বর্গ পেতে চায়—এত বড় স্পর্দ্ধা!

ইন্দ্র প্রকাশ্যে রাগ দেখালেন, গোপনে ভয় পেলেন। বল্‌লেন, "দৈত্য স্বর্গ জয় করতে চেয়ে-

ছিল বাহুবলে, তার সঙ্গে লড়াই চলেছিল, মানুষ স্বর্গ নিতে চায় দুঃখের বলে, তার কাছে কি হার মানতে হবে ?"

মেনকাকে মহেন্দ্র বললেন, "যাও তপস্যা ভঙ্গ করগে।"

মেনকা বললেন, "সুররাজ, স্বর্গের অস্ত্রে মর্ত্যের মানুষকে যদি পরাস্ত করেন তবে তাতেও স্বর্গের পরাভব। মানবের মরণবাণ কি মানবীর হাতে নেই ?"

ইন্দ্র বললেন, "সে কথা সত্য।"

৪

ফাল্গুন মাসে দক্ষিণ হাওয়ার দোলা লাগতেই মধুমাতী মাধবীলতা প্রফুল্ল হয়ে উঠে। তেমনি ঐ কাঠকুড়নির উপরে একদিন নন্দন বনের হাওয়া এসে লাগল। আর তার দেহ মন একটা কোন্ উৎসুক মাধুর্য্যের উন্মেষে উন্মেষে ব্যথিত হয়ে উঠল। তার মনের ভাবনাগুলি চাক-ভাঙা মৌমাছির মত উড়তে লাগল, কোথা তারা মধুগন্ধ পেয়েছে।

ঠিক সেই সময়ে সাধনার একটা পালা শেষ হ'ল। এইবার তাকে যেতে হবে নির্জ্জন গিরি-গুহায়। তাই সে চোখ মেলল।

সামনে দেখে, সেই কাঠকুড়নী মেয়েটি খোঁপায় পরেছে একটী অশোকের মঞ্জরী, আর তার গায়ের কাপড়খানি কুসুম্ভ ফুলের রং করা। যেন তাকে চেনা যায় অথচ চেনা যায় না। যেন সে এমন জানা সুর, যার পদগুলি মনে পড়ছে না। যেন সে এমন একটি ছবি যা কেবল রেখায় টানা ছিল—চিত্রকর কোন্ খেয়ালে কখন এক সময়ে তাতে রং লাগিয়েছে।

তাপস আসন ছেড়ে উঠল। বললে, "আমি দূর দেশে যাব।"

কাঠকুড়নি জিজ্ঞাসা করলে, "কেন প্রভু ?"

তপস্বী বললে, "তপস্যা সম্পূর্ণ করবার জন্য।"

কাঠকুড়নি হাতজোড় করে বললে, "স্বর্গের পুণ্য হতে কেন আমাকে বঞ্চিত করবে ?"

তপস্বী আবার আসনে বসল, অনেকক্ষণ ভাবল, আর কিছু বলল না।

৫

তার অনুরোধ যেমনি রাখা হল অমনি মেয়েটীর বুকের একধার থেকে আর একধারে, বারে বারে যেন বজ্রসূচি বিঁধতে লাগল।

সে ভাবলে, "আমি অতি সামান্য, তবু আমার কথায় কেন বাধা ঘটবে ?"

সে রাতে পাতার বিছানায় একলা জেগে বসে তার নিজেকে নিজের তত্ত্ব করতে লাগল।

তার পরদিন সকালে সে ফল এনে দাঁড়াল, তাপস হাত পেতে নিলে। পাতার পাত্রে জল এনে দিতেই তাপস জল পান করলে। সুখে তার মন ভরে উঠল।

কিন্তু তার পরেই নদীর ধারে শিরীষ গাছের ছায়ায় তার চোখের জল আর থামতে চায় না। কি ভাবলে কি জানি!

পরদিন সকালে কাঠকুড়নি তাপসকে প্রণাম করে বললে, "প্রভু, আশীর্ব্বাদ চাই।"

তপস্বী জিজ্ঞাসা করলে, "কেন ?"

মেয়েটী বললে, "আমি বহুদূর দেশে যাব।"

তপস্বী বললে, "যাও, তোমার সাধনা সিদ্ধ হোক্।"

৬

একদিন তপস্যা পূর্ণ হল।

ইন্দ্র এসে বললেন, "স্বর্গের অধিকার তুমি লাভ করেছ।"

তপস্বী বললে, "তা হলে আর স্বর্গে প্রয়োজন নেই।"

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাও ?"

তপস্বী বললে, "এই বনের কাঠকুড়নিকে।"

সবুজপত্র, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২৮।

বাঙ্গালার একখানি প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার

[অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার এম, এ, পি, আর, এস, আই, ই, এস]

মুসলমান যুগের বাঙ্গলার একখানি মাত্র ইতিহাস আছে, তাহার নাম "রিয়াজ-উস্-সলাতীন" অর্থাৎ সুলতানগণের সমাধি-উদ্যান। ১৭৮৭—৮৮ খৃষ্টাব্দে জর্জ আড্‌লী সাহেবের মুন্সী ইহা রচনা করেন। কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটী ইহার ফারসী মূল এবং ইংরাজী অনুবাদ (আবদুস্-সলাম্ কৃত) ছাপিয়াছেন। রচনার তারিখ হইতেই বুঝা যায় যে এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত আধুনিক, মুসলমান-রাজত্ব শেষ হইবার ত্রিশ বৎসর পরে রচিত। সুতরাং ইহা বর্ণিত ঘটনার সমসাময়িক অর্থাৎ "আদি ও অকৃত্রিম" ঐতিহাসিক উপাদান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যদি ইহার রচয়িতা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সব সমসাময়িক আদি ইতিহাস পড়িয়া থাকেন এবং তাহা হইতে নির্ভুল ও ঠিক মত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তবেই ইহার বর্ণিত বিবরণের মূল্য আছে, নচেৎ একেবারেই নাই।

চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট তাঁহার প্রসিদ্ধ ইংরাজী হিষ্ট্রি অব্ বেঙ্গল (১৮১৩ খৃঃ প্রকাশিত) প্রধানতঃ এই রিয়াজের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, "রিয়াজের রচয়িতা যে সব বঙ্গের ইতিহাস দেখিয়াছিলেন তাহা সংখ্যায় অত্যন্ত কম, কাজে কাজেই অনেক তথ্য বাদ পড়িয়াছে; এবং ইহাতে তারিখের অভাবও অত্যন্ত বেশী।'

রিয়াজের গ্রন্থকার যদি কোন পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সমসাময়িক ফারসী ভাষায় রচিত বাঙ্গালার ইতিহাস দেখিয়া থাকিতেন, তবে তাহা লোপ পাওয়া অসম্ভব; কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বঙ্গদেশে সাহেব কর্ম্মচারীগণ অক্লান্ত শ্রমে ও অজস্র অর্থব্যয়ে এ দেশের ফারসী ইতিহাসের পুঁথি সংগ্রহ করিতেন; তাহা বিলাতে রক্ষা পাইয়াছে। রিয়াজের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গলার ফার্সী একখানি ইতিহাসেরও নাম এখন শুনা যায় না; সুতরাং এ কথা নিশ্চয় যে এরূপ কোন গ্রন্থ ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিল না। অতএব রিয়াজ একমাত্র প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত।

মুসলমান-বিজয়ের পর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ পাঠান যুগের, বাঙ্গলার ইতিহাস সর্ব্বপ্রথম একত্র করিয়া নিজামুদ্দীন আহমদ নিজের "তবকাৎ-ই-আকবর শাহীতে" নিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং ফিরিশ্‌তা, আব্দ্ বদায়ুনী এবং আবুল ফজল্ নিজ নিজ ইতিহাসে ঐ গ্রন্থেরই সার সংগ্রহ দিয়াছেন, তাঁহাদের মৌলিকতা একেবারে নাই কিন্তু নিজামুদ্দীনের বঙ্গবিবরণও অতি ক্ষুদ্র,—যুদ্ধ, রাজ-পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নাই বলিলেই হয়।

মুঘলযুগের বাঙ্গলা সম্বন্ধে আমরা যে সংবাদ পাই তাহা সাম্রাজ্যের ইতিহাসের অংশ মাত্র, অর্থাৎ যে সময়ে দিল্লীর চক্রবর্ত্তী বাদশাহের সহিত বঙ্গের সামন্ত-রাজদিগের বা বিদ্রোহী সুবেদারের সংঘর্ষ হইয়াছে কেবল তাহাই অথবা অদ্ভুত ঘটনা, মহামারি ইত্যাদি মাত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বাঙ্গলা দেশের স্বতন্ত্র ইতিহাস রচিত হইয়াছিল না, সুতরাং দিল্লীর সরকারী ইতিহাসে মাঝে মাঝে দশ বার বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলার উল্লেখ মাত্র নাই, তাহার পর হয়ত সামান্য দু একটি কথা (যেমন আজ কালকার সরকারী গেজেটের মত কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তনের তারিখ)। ইহা ইতিহাস নহে। তখন বাঙ্গলাতে যুদ্ধ বিদ্রোহ হওয়াই বাঙ্গলার পক্ষে ইতিহাসে স্থান পাইবার একমাত্র উপায় ছিল।

যিনি মধ্যযুগে বাঙ্গালার ইতিহাসের চর্চ্চা করিতে ব্রতী, তাঁহার সর্ব্ব প্রধান আবশ্যক, ঠিক সমসাময়িক লোক কর্ত্তৃক লিখিত বাঙ্গালার বিবরণ সংগ্রহ করা,—যেমন যে সব লিপি-কুশল মুসলমান সৈনিক বা

দেওয়ানী কর্ম্মচারী বাঙ্গলা প্রদেশে কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদের আত্মকাহিনী বা চিঠি পত্র। এ পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর একমাত্র গ্রন্থ জানা ছিল, তাহা সিহাবুদ্দীন তালিশ রচিত "ফৎহিয়াই ইব্রিয়া" অর্থাৎ মির জুমলা কর্ত্তৃক কুচবিহার ও আসাম জয় (জুন ১৬৫৯ হইতে মার্চ্চ ১৬৬৩ পর্য্যন্ত ঘটনা।) ১৯৭২ সালের বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে ব্লকমান সাহেব ইহার সংক্ষিপ্ত সার ইংরাজীতে প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থের আসাম ও অহোম জাতির বিবরণের বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ অনুবাদ আমি বিহার ও উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটীর জর্ণালে ছাপিয়াছি। তাহার পর অক্সফোর্ড বিখ্যাত বডলিয়ান লাইব্রেরীতে আমি ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয়-ভাগের হস্তলিপি অনুসন্ধান করিয়া পাই, তাহাতে বাঙ্গলার ইতিহাস শায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক চাটগাঁ অধিকার (জানুয়ারি ১৬৬৬) পর্য্যন্ত আনা হইয়াছে। এই অংশের অনুবাদ J.A.S.Bতে ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে প্রকাশ করিয়াছি।

অল্পদিন হইল প্যারিসের জাতীয় পুস্তকাগারে (Bibliotheque Nationale) একখানি অধিতীয় প্রকাণ্ড হস্তলিপি পাইয়াছি, তাহাতে ১৬০৮ হইতে ১৬২৪ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার বিস্তৃত, সম্পূর্ণ ও অমূল্য সমসাময়িক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইখানির নাম "বহারিস্তানই ঘাইবী"। মির্জা নথন্ (বা সহিন্) আলাউদ্দীন ইস্‌পাহানী ইহার রচয়িতা। জহাঙ্গীর তাঁহাকে শিতাব খাঁ উপাধি দেন; মুসলমান জগতে প্রায় প্রত্যেক কবি ও গ্রন্থকারই একটা ছদ্মনাম (তাখাল্লুস্) লইতেন; ইহাঁর ছদ্মনাম "ঘাইবী" ছিল। ইহাঁর পিতা মালিক আলি সম্রাটের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং ইহতমাম খাঁ উপাধি পান। মির্জা নথন্ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু পারসীক জাতীয় "ইস্‌পাহানী" বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। গ্রন্থের প্রায় অর্দ্ধেক মির্জা নথনের বঙ্গদেশের যুদ্ধের বিবরণে পূর্ণ, সুতরাং ইহাকে "শিতাব খাঁর আত্ম-কাহিনী" নাম দিলে অন্যায় হয় না।

প্রতাপাদিত্য ও উসমানের শেষ কীর্ত্তি ও পতন সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ ও অজ্ঞতপূর্ব্ব কাহিনী পাওয়া যায়, তাহা ইতিপূর্ব্বে "প্রবাসীতে" প্রকাশ করিয়াছি।

বহারিস্তান চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। সমগ্র গ্রন্থে ৬৫৬ পৃষ্ঠা, প্রতি পৃষ্ঠায় ২১ পংক্তি। প্রথমভাগে ২৮২ পৃষ্ঠা, ইহাতে ইস্‌লাম খাঁর সুবাদারীর অর্থাৎ ১৬০৮ হইতে ১৬১৪ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার বিবরণ। দ্বিতীয়ভাগে কাসিম খাঁর সুবাদারীর ইতিহাস (২০ পৃষ্ঠা)। তৃতীয়ভাগে ইব্রাহিম খাঁর বঙ্গ শাসন এবং যুবরাজ শাহজাহানের সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে (১৮০ পৃষ্ঠা)। চতুর্থভাগে বিদ্রোহী শাহজহান কর্ত্তৃক বঙ্গ অধিকার এবং তাঁহার পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন নিবদ্ধ আছে (৬৪ পৃষ্ঠা)।

বঙ্গের জমিদারগণের এবং কুচবিহার কুচহাজো (অর্থাৎ কামরূপ), আসাম এবং ত্রিপুরার রাজগণের অতি বিস্তৃত ও নূতন বিবরণে এইগ্রন্থকে অমূল্য করিয়াছে।

[১৯২০ ডিসেম্বরে বিহার ও উড়িষ্যার রিসার্চ সোসাইটীর বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের অনুবাদ।]

—প্রভাতী, বৈশাখ।

বেদনা

(গল্প)

(শ্রীনলিনী মিত্র)

"প্রবাসী"র সাদা পাতায় তোমার বুকছেঁচা রক্ত দিয়ে যে ভাব তুমি ফুটিয়ে তুলেছ; তা বিশ্বের আর কেউ না বুঝুলেও—আজ এই তুষার-ধবল হিমগিরীর পাদমূলের ক্ষুদ্র আশ্রমের অধিবাসিনীর বুঝতে বাকী নেই।

বিশ্বের সামনে, তুমি যে ভাবধারা ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করেছ, তা কি আমি বুঝবো না? আমি কি চিরদিনই মূক হয়ে থাকবো? এই যে সাদা পাতে কালীর আখরে আমার পুঞ্জীভূত মনের বেদনা এ কি কেউ দেখবে না বা কেউ বুঝবে না?

আজ মনে পড়ছে সে দিনের সব কথা। সে দিন সবে ভোর হয়েছে। সূর্য্যের রাঙা রঙ তখনো ধরার গায়ে ছড়িয়ে পড়েনি, এমন সময়ে মা আমায় উঠিয়ে দিয়ে বল্লেন, "ও বাসন্তী, তোর বাপকে পাঠিয়ে দে; ঘোষ বাবুর চাকর এসেছে চাষের দুধ নিতে, তাদের রাত্রে কুটুম এসেছে।"

বাবাকে দুধ দোহাবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে, আমি আঁচলা ভরে মটর ভাজা চিবুতে বসলুম। কিক্ষণে জানিনা কেন সেদিন প্রভাত হয়েছিল। তরুণ অরুণের লালিমা মেখে, সামনে এসে দাঁড়ালে তুমি, চোখে তোমার কৌতূহল, মনে পরম বিস্ময়, দীর্ঘ, উন্নত, পরম-সুন্দর দেহলতা নিয়ে!

তার পর, এই কৃষক কন্যার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় এমনি রঙিন আলোতে আলোকিত হয়ে দেখা দিল, যা নেহাৎ অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালার হওয়া উচিৎ নয়। পরদিন থেকে নিত্য দেখা হয় সেই নীরব নিথর ক্ষেতের পাশের পথে শুধু দুজনের ক্ষণিক চাউনি—আর যাওয়ার বেলা একটু মুচ্‌কি হাসির রেখা। মনের ভাব ভাষায় ফোটাবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না,—কেননা তুমি হলে বাঙ্গালী আর আমি হলাম পশ্চিমের চাষার মেয়ে—তাতে আবার অশিক্ষিতা।

বয়স তখন আমার ১৩।১৪. বিয়ে হয়ে যেত কবে, কিন্তু বিধির-বিধান অন্যরূপ। বিয়ের ছ'মাস আগে আমার স্বামী মারা গেলেন। আবার পাত্র দেখা হতে লাগলো, এমন সময় সুধাপাত্র নিয়ে এলে তুমি! নিমেষের মধ্যে তোমার চরণে আমার সংযতপ্রাণ অর্পণ করে দিয়ে নিঃশেষ হলাম।

একদিন যেমন সূর্য্যের মত চারিদিকে আলো করে উদিত হয়েছিল তেমনি সূর্য্যাস্তের মতন ম্লান-মুখে চলিয়া গেল! কিন্তু তোমার মুখশ্রী আজও হৃদয়াকাশে দীপ্যমান। তুমি চলে যাবার পর আমাদের গ্রাম্য নদীর শান্ত তটে বসে কত কাঁদলাম, কেন যে অমন আকুলভাবে কাঁদলাম তাও জানি না; তবে দেখলাম শিশির ভেজা ঘাসের মতন আমার শত-ছিন্ন বক্ষের বসন সিক্ত হয়ে উঠেছে।

তুমি এসেছিলে ছ'মাসের জন্যে তোমার বোনের কাছে শরীর সারাতে। যখন তুমি সুস্থ হয়ে দেশে চলে গেলে, তখন দেখি আমার স্মৃতির ঘরখানায় ভরে আছে তোমার মধুরোজ্জ্বল অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্ত্তি। সেইটুকুই নিয়ে আমি আপন-হারা হয়ে রইলুম—আর তুমি?

সেবারের প্লেগে মা-বাবা দুজনেই এক সঙ্গে মারা গেলেন, চিরদিনের মত আশ্রয়হীনা হলাম

আমি। আমায় তখন আশ্রয় দিলেন তোমার বোন; তাঁর ছোট ছেলেটীকে নেবার জন্ত।

মাঝে মাঝে তোমার চিঠি আসতো। আমার কথা অবশ্য তাতে কিছু থাকতে পারে না, তবুও মন কেবলি ঘুরে বেড়াতো চিঠি খানার পাতায় পাতায়, কালো আখরের গুঢ় রহস্ত জান্‌বার জন্ত।

যতই কেন দুঃখদায়ক বিষয় হোক না, তথাপি সেই অজানাকে জান্‌বার জন্ত মানুষের কৌতূহল সময় সময় তার অবস্থাকে ছাপিয়ে উঠে; আমারো হলো তাই,—তোমাদের বাঙ্গলা ভাষা শিখতে, বাবার মেয়ে হয়ে আরম্ভ করলুম, কেন জান—তোমার স্নেহ-লিপি পড়্‌বার জন্ত।—তোমার স্নেহের ভাগেটী হোলো আমার গুরু। গ্রাম্য মেয়ের মাটিভরা মগজ, আর বড় খোকার দ্বিতীয় ভাগ অবধি বিদ্যের বহর; এই সম্বল করে আমি তোমাদের ভাষা-সমুদ্রে সাঁতার দিতে চল্লুম—কি দুরাশা! কি স্পর্দ্ধা আমার!

সারাটি রাত বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে পরিচয় করে করে সত্যই আমি প্রথম ভাগ শেষ ক'রে ফেল্‌লাম। হঠাৎ খোকা তার বাপের কাছে আমার বিদ্যের পরিচয় দিল। কিন্তু কি উদার তোমার ঐ ভদ্রলোকের মন! যেমন আমায় তিনি কন্যার মত স্নেহ করে স্থান দিয়েছিলেন, তেমন হাস্যমুখে ও অসঙ্কোচে আমার শিক্ষার ভার তুলে নিতে একটুও ইতস্ততঃ করলেন না; আর আজ তাঁরই দয়ায়, আমার এই অতি দুষ্ট মনের খবর পাতার পর পাতা ভরে লেখবার শক্তি পেয়েছি, যা কিনা এতদিন শক্তির অভাবে তোমায় জানাতে পারি নি।

বাবার যা কিছু সামান্ত এষিরদা ছিল, তা জ্ঞাতিরাই দখল করে নিল। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার ভার নিতে তাদের একটুও আগ্রহ দেখা গেল না, কেন না নেহাৎ বাঙ্গালী ধরণে থাকা দেখে আমায় তারা এমনি বিশ্রী একটু ইঙ্গিত করলে যা সাধারণ ভাবে কেউ ঠেলে ফেলতে পারে না কিন্তু ওই বিশ্রী হেলে আমার কাছে সুশ্রী, সুন্দর, সুপবিত্র, বিশ্রীর মাঝে আমি সে পূত, শুদ্ধ, সুনির্ম্মল রইলুম এই আমার পরম ভাগ্য—পরম লাভ!

আমার সেই রঙ্গিন স্বপ্নের পর কত বর্ষ কেটে গেছে, কত শীত-বসন্ত পৃথিবীতে নেমে এসে একে একে চলে গেছে। আমার প্রাণের বেলার মধ্যে সিরাজী শুরু, শূন্য প্রায়,—নিরাশা ব্যথিত জীবন মরণের পদচুম্বন করতে উদ্যত, উন্মুখ;—এমন সময়ে হে দরদী! তুমি সাম্‌নে ধরলে তোমার ব্যথাকাতর প্রাণের আকুল আবেগ ভরা, প্রাণস্পর্শী ছন্দ-ঝঙ্কারে পরিপূরিত কবিতা নির্ঝর!

সামান্ত চাষার মেয়ের জন্ত, হে প্রেমিক, তুমি একি অমিয় সাগর তোমার বুকের মধ্যে সৃষ্টি করেছ,—যার প্রতি তরঙ্গেই ভাবের হিল্লোল বইছে।

কবির হৃদয় তোমার, কত অতীতের সেই সামান্ত স্মৃতি; তাকে তুমি বর্ত্তমানের ভিতর দিয়ে টেনে এনেছ। প্রাণ তোমার সেই মধুর নেশায় উন্মাদ! তাইতে এ নিদাঘ বেলায় কোন এক অবসরের দিনে; কোন শ্যামল পল্লীর ছায়া-শীতল দেবদারুর তলায় বসে, কত দিনান্তের কথা সাদা পাতায় রঙ ফলিয়ে লিখেছ,—কি ভাবুক তুমি গো! তোমার ভাবের ঘরে নগণ্য তুচ্ছ হয়েও স্থান পেলাম আমি!

তোমার জীবন-কুঞ্জে কত বসন্তের রজনী, বেল, চাঁপা, ভাদেরশ্বদীয় গন্ধে দিক ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে, কত শরতের শেফালি ফুটে ঝরে গেছে, তাদের কেন্দ্র না করে, তোমার ভাবের কেন্দ্র হলাম কিনা আমি—জন্তু ও বর্ণ-গন্ধ-হীন ঘেঁটুফুল!

আজ এই সূর্য্যাস্তের সাম্‌নে শুয়ে ভাব্‌ছি—অতীতের দিনগুলো, তারাও নিত্য রাঙ্গ-সূর্য্যের রক্তিমা মেখে, রঙ্গিন হয়ে সাম্‌নে এসে, অবহেলায় গত হয়ে গেছে। সে দিনের মর্য্যাদা বোঝবার ক্ষমতা কি আমার ছিল? থাকলেও বা আশা করতাম কোন সাহসে? তখন তো জানি না, যে

তুমি এই কুশ্রী, কুরূপা মেয়েটার দেহটাকে "কুন্দ-কলী"র সঙ্গে উপমিত করেছ, তাই আজ এই চিন্ত-অবজ্ঞাত দেহটার প্রতি চেয়ে দেখ্‌ছি,—মা গো মা, কি বিশ্রী,—এ যে মরে স্বরে পড়া অপ্‌রা-জিতারও অধম! এ কি দেওয়া গো তোমার! তোমার এ বিপুল দান আমার সইবার ক্ষমতাই বা কই? তোমার দানের গর্ব্বে, আজ মৃত্যুর মাঝে ও আমি ধন্য—আজ কেমন করে জানাব তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা এখন সে সে উপায় নেই।

মৃত্যু তুমি আজ এস—অতি ধীরে ধীরে, এস আমার ধ্যান-পরায়ণ মনের উপর, আমার মৃত্যু-নিলীন চোখের উপর। তুমি ঘুমের জাল বিছিয়ে দাও, এ ঘুম আর যেন আমার না ভাঙ্গে এখানেও না মরণের ও পারেও না! *

---

* "মুনায়নিধি" কবিতা দ্রষ্টব্য; ঐ কবিতা হইতে উক্ত ভরসার জন্য, এজন্য আমি লেখকের নিকট ঋণী।—লেখিকা।

পুস্তক পরিচয়।

স্বপন-পসারী।—শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস, কলিকাতা; দাম ১।০ মাত্র।

এখানি কবিতা গ্রন্থ। ইহার মধ্যের অনেকগুলি কবিতাই নানা মাসিকে বাহির হইয়াছিল; এক্ষণে সেগুলি সংগৃহীত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

আমরা মোহিত বাবুর কবিতার একান্ত পক্ষ-পাতী। যখনই তাঁহার কোন কবিতা বাহির হয়, আমরা আকুল আগ্রহে তাহা পাঠ করিয়া অপার আনন্দ পাইয়া থাকি।

কবির রচিত 'মহামানব,' 'সুরদাহান,' 'বেদু-ইন,' 'নাদির শাহ,' 'অঘোর পন্থী,' 'কিশোরী,' 'বিলদার,' 'চোখের দেখা,' 'চ্যুত-মঞ্জরী,' 'গাজন গান,' 'কলহ-ভরা,' 'পূর্ণিমা স্বপ্ন,' প্রভৃতি কবিতা ও গাথা বঙ্গভাষার অমিতীয় সামগ্রী। নানা-ভাবের হিল্লোলে 'স্বপন-পসারী' হৃদয়-গ্রাহী হই-য়াছে। এই গ্রন্থ, আমরা আশা করি, কবিকে উচ্চাসন দিবে। প্রচ্ছদ পটের ছবিটিও বেশ মনোজ্ঞ ও চিত্তগ্রাহী হইয়াছে। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট।

কর্ম্ম-মন্দির।—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

আমরা কর্ম্ম-মন্দির পড়িয়া প্রীতি-লাভ করি-লাম। আজ কালকার এই দিনে দেবেন্দ্রবাবুর কর্ম্ম-মন্দির উপযুক্ত বই তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বলিবার ভঙ্গি, লিখন প্রণালী এবং ভাষা হৃদয়-গ্রাহী। পুস্তকের সমুদয় চরিত্রই বেশ ফুটি-য়াছে, এবং আখ্যান ভাগটিও অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস উপন্যাসের এই যুগে দেবেন্দ্রবাবুর কর্ম্ম-মন্দির অনাদর লাভ করিবে। ইহার কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই উত্তম।

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and
Published by P. N. Pal, 26-3 Scott Lane, Calcutta.

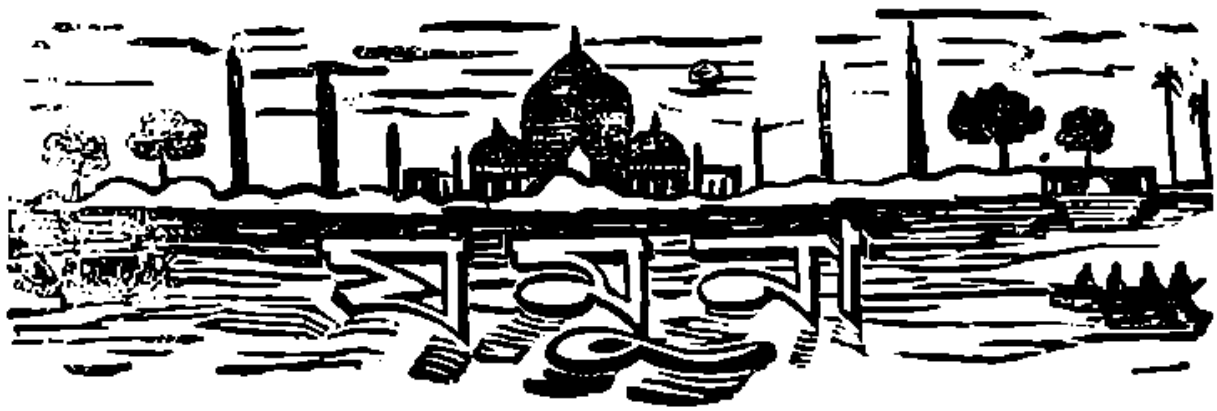

১২শ বর্ষ | শ্রাবণ ১৩২৯ | ৪র্থ সংখ্যা

কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ

(শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী)

হে দীর্ঘপথের বন্ধু, হে কবি সচ্ছন্দছন্দরাজ !
এ কি অভিনব ছন্দে মৃত্যুমন্ত্রে বরি নিলে আজ
আপন মর্ম্মের মাঝে, সহসা পথের মধ্যখানে ;—
অতৃপ্ত তৃষ্ণার মত সুর শুধু ঘুরে' মরে কানে।
রিক্ত-আশা বঙ্গভাষা—বিয়োগিনী কাঁদিছে করুণ
দুর্ভাগ্য দেশের বুকে—মধ্যপথে মুদিত অরুণ !
বিরহের মন্দাক্রান্তা আষাঢ়ের মেঘমন্দ্রমাঝে
গুমরি গুমরি তাই বাঙ্গলার বক্ষে আজি বাজে !

শুনেছি করুণমন্ত্রে বিনা-মেঘে বৃষ্টিধারা ঝরে,
প্রমূর্ত্ত দীপকরাগে কলাবিৎ নিজে পুড়ে' মরে ;—
জানিনাক কোন্ সুরে বন্ধু তুমি সেধেছিলে বাঁশী,
রুদ্র পরিণাম যার মূর্ত্তিমান দেখা দিল আসি'

সমস্ত দেশের বুকে অকস্মাৎ বজ্রবাণী হানি'—
বঙ্গসারস্বতকুঞ্জে মূর্চ্ছাতুর নিজে-বীণাপাণি।
যান্ত্রিকের হোমশিখা সমারব্ধ যজ্ঞ সূচনায়
লাগিল কেবল গৃহে—যজ্ঞ শেষ হ'লনাক, হায়!

ভৃঙ্গারে শুকায়ে গেল সমাহৃত পুণ্যতীর্থবারি,
ভক্তের নয়নে শুধু রাখি তার শেষ অশ্রুঝারি;
কাব্যের নিকুঞ্জ থেকে কুহু-কেকা লভিল বিদায়,
চোখ গেল—চোখ গেল—ভগ্ন বুকে আজি বাহিরায়!
তুলিখানি অশ্রুজলে অঙ্কে তুলি' রাখিলা ভারতী,—
কে লিখিবে লেখা আর, কে করিবে একান্ত আরতি,
নিত্য নব নব ছন্দে মন্দিরেতে তুলিয়া ঝঙ্কার—
কভু সহজিয়া ভাষা, কভু সাম কভু বা ওঙ্কার!

আর কেন ছন্দ গাঁথি! বন্ধু গেছে ছন্দ লয়ে সাথে,
মোরা শুধু মন্দভাগ্য পড়ে' আছি চাহিয়া পশ্চাতে,
শুধিতে দুঃখের ঋণ! নেত্রপথ রুদ্ধ অশ্রুজলে—
কবে মিলাইবে তার দৃশ্যপট জবনিকাতলে!
শুধু একখানি কথা থেকে-থেকে পড়ে আসি মনে—
কেন তুমি চলে' গেলে, অকস্মাৎ হেন অকারণে!
যাবার সময় তা যে শুধাবার দিলে না সময়—
শুধাবার দূরে থাক্—হ'লনাক দৃষ্টি-বিনিময়!

দুর্ভাগিনী বঙ্গভূমি! ছিল যে প্রাণের চেয়ে প্রিয়,
যার নাম জপমালা, নামাবলী যার উত্তরীয়
ছিল তব অনুদিন,—সে বঙ্গ তেমনি ভাগ্যহীন,
লাঞ্ছিত বিশ্বের দ্বারে, পায়ে-পায়ে পরের অধীন;
তারে কি বলিয়া আজি ছেড়ে গেলে, তাই ভাবি মনে,
সিংহাসন কই দিলে, লুটায় সে কণ্টক আসনে!
রাণী বলে' ডেকেছিলে,—এই কি রাণীর যোগ্য সাজ;
জননী বলিয়া ডাকি'—ঘুচালেনা জননীর লাজ!

কি ফল বিফল প্রশ্নে, গেছ যদি—যাও কবি, যাও,
ফুলের ফসল ফেলি' এ ধরার, যদি সুখ পাও
নবীন নন্দনে আজি অম্লান মন্দারে গাঁথি' মালা,
গাঁথিতে নূতন ছন্দে বরদার বরকণ্ঠমালা।
হেথা সবি পুরাতন, ধূলিম্লান, দৈন্যভারাতুর ;
চিত্ত নিত্য অশ্রুনেত্রে চায় হেথা বিয়োগবিধুর !
নিষ্পলক মাতৃনেত্রে ঝরে যেথা যে প্রসন্ন হাসি—
তারি স্পর্শে ধৌত হোক্ হেথাকার সর্ব্বগ্লানিরাশি।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্ম্মজগৎ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

বাহিরে বিবেকানন্দ—

স্বামী বিবেকানন্দ ক্ষুদ্র প্রতিত্বের গণ্ডি ভেঙ্গে লীন হলেন বিরাট আমিত্বে, কিন্তু তাতেই তাঁর কাজ পূর্ণ হ'ল না। জগতের দুঃখ দেখে হৃদয় তাঁর কেঁদে উঠ্‌ল,—বৌদ্ধ যোগীদের মত বল্লেন, "একটী জীব থাকতেও নিজের মুক্তি চাই না। তুদ্ধং ব্রহ্ম-পদম্। অন্তকে উঠাতে হবে, সমগ্র জাতিকে, দেশকে, জগতকে জাগাতে হবে। এক জীবনে না হয়—এজন্য শত শতবার তিনি জন্ম-গ্রহণ করবেন।" গম্ভীর স্বরে তিনি সকলকে আহ্বান করে বল্লেন, "Therefore, children of the Aryans do not sit idle, awake, arise and stop not till the goal is reached."

তাঁর মর্ম্মের বাণী, ভারতের বাণী, গুরুদেবের শিক্ষা তিনি প্রচার করে, হিন্দুধর্ম্মের জয় ঘোষণা কল্লেন—শিকাগোর ধর্ম্ম মহাসভায়। ভারতের জ্ঞান-মর্ম্ম দেখে পাশ্চাত্য মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল। বেদান্তের গম্ভীর পাঞ্চজন্য জগৎময় ধ্বনিত করলেন। পাশ্চাত্য বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে দেখ্‌ল—অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাবার জন্য আঁধার-কালো Heathen হিন্দুস্থানও আলোর জগতে ধর্ম্ম-শিক্ষক পাঠাতে পারে। তিনি কোন নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করেন নি, এবং কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ও প্রতিষ্ঠা করেন নি। যা আছে সনাতন তাই তিনি নূতন করে বুঝিয়ে দিলেন পূর্ব্ববর্ত্তী শিক্ষকগণের প্রচার হতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। সেখানে তিনি বুঝিয়ে দিলেন—Religion is not intellectualisation nor sentimentalism but realisation. বুঝিয়ে দিলেন Hinduism is not idolatory—হিন্দুত্ব পৌত্তলিকত্ব নয়, আর বুঝিয়ে দিলেন তার অর্থ, তার বিশাল উদারতা, বিশ্বজনীনতা। পাশ্চাত্য তাঁকে মাথায় তুলে নিল। যার অপমানে এত আয়োজন—উচ্চ আসনে সে স্থান

দেশব্যাপী বিস্ময়-পুলক-স্পর্শে

তের আধুনিক ধর্ম্মযুগের কর্ম্মযোগী, বেদান্তবিদ্ বিবেকানন্দ সত্য প্রচার,—মহাসাগরের পরপারে মহামানবত্বের বিকাশের প্রয়াস। *

শিক্ষা—

আজ যদি দেশে ধর্ম্মাশোকের রাজত্ব হ'ত তা হ'লে বিবেকানন্দের উপযুক্ত সম্মানের নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হ'ত। যদিও তিনি সম্মানের ভিখারী ছিলেন না তবুও যখন বিশ্ববাসীকে বেদান্তের বাণী বিতরণ করে, বিপুল বিশ্বে বেদান্তের বিজয়বার্ত্তা ঘোষিত করে, বেদান্তের বিজয় বৈজয়ন্তীর বহু বিস্তৃতের বিধান করে, বিশ্বশ্রেষ্ঠ বেদান্তবিদ্ বিবেকানন্দ বিশ্ব-বিশ্রুত হয়ে দেশে ফিরে এলেন, ভারত তখন তাঁর যথাযোগ্য সম্মান দান করে ধন্য জ্ঞান করেছিল। তখন শতকণ্ঠে উচ্চারিত হল,—

ধরি কৌমার্য্য গৈরিকবাস
হৃদয়ে জাগ্রত ঐক্য মন্ত্র,
ভোগী যোগী ত্যাগী, কর্ম্মের সাধক,
বিবেকানন্দ পূর্ণচন্দ্র।
* * *
গাহিছে বিশ্ব যাঁহার মহিমা,
তৃপ্ত শুনিয়া শ্রবণ-রন্ধ্র,
ভারতীর প্রিয় বন্ধনভোমনী
বিবেকানন্দ পূর্ণচন্দ্র।

বিবেকানন্দের শিক্ষা, তাঁর আদেশবাণী মূলমন্ত্র হয়ে সকলের ঘরে ঘরে বিরাজ করুক—যে বাণী অভিনব, অভয়, অথচ শান্ত-মধুর-কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত ও আপ্লুত করেছিল। মহামানবের মাঝে দাঁড়িয়ে তাঁর ভাবে উদ্বোধিত হয়ে সবাই বলতে শিখুক—

এস হে আর্য্য, এস অনার্য্য
হিন্দু মুসলমান—
এস এস আজ, তুমি ইংরাজ
এস তুমি খৃষ্টান।

আর এই ভারতের পুণ্যক্ষেত্রের কুলাঙ্গারের উপর দাঁড়িয়ে সকল সঙ্কীর্ণতাকে পরিহার করে সকলে বলতে শিখুক—

এস ব্রাহ্মণ, শুচি কর মন
ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থ-নীরে,
আজি ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।

---

* আজ আমরা স্বামিজীর স্মৃতির পূজা করছি এমন এক স্থানে (আমেদাবাদ) যা' আর এক কর্ম্মী পুরুষের নামে মহিমান্বিত। শিল্পের সেই অভ্রান্ত-কর্ম্মী, জ্ঞান-কর্ম্মী স্বামিজীর অসাধারণ কর্ম্মতায় মুগ্ধ হয়ে যে পত্রখানি লেখেন, তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করতে চাই। (পত্রখানি লেখেন শ্রীযুক্ত আমেদভাই নাসেরওয়ানজী টাটা)

Dear Swami Vivekananda,

I trust you remember me as a fellow traveller on your voyage from Japan to Chicago. I very much recall at this moment your views on the growth of the ascetic spirit in India, and the duty not of destroying but of diverting it into useful channels.

I recall these ideas in connection with my scheme of Research Institute of Science for India, of which you have doubtless heard or read. It seems to me that no better use can be made of the ascetic spirit than the establishment of monasteries or residential halls for men dominated by this spirit, and devote their lives for the cultivation of sciences—natural and humanistic. I am of opinion that if such a crusade in favour of an asceticism of this kind were undertaken by a competent leader, it would greatly help asceticism, science and the good name of our common country, and I know not who would make a more General of such a campaign than Viveka-

[illegible] উত্তর যেন, তা জানতে [illegible] তোর উপায় নেই।

পুরাতনের পুনরাবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তারই সূচনা আজ সম্মুখে। আঁধার-যুগে ভারতই সবাইকে জ্ঞানালোক বিতরণ করে পথ দেখিয়েছিল, বর্ত্তমানে, সেই আঁধার-যুগেরই সমতুল্য, হিংসা, ভেদ ও স্বার্থ দ্বন্দ্বের যুগে—সেই ভারতই আবার সবাইকে নূতন করে পথ দেখাবে। যুগে যুগে বিশ্বময় বিশ্বনাথের বাণীর বৈচিত্র্যতার ব্যাখ্যা করে,—আলোকের রশ্মি-রেখা দেখিয়ে সারা জগৎকে সঞ্জীবিত করবে,—তাই সে আজও বেঁচে আছে। সহস্র অত্যাচার-অনাচার, পীড়ন-পেষণ, অনশন-অর্দ্ধাশন, দুর্ভিক্ষ-মহামারী বন্যাপ্লবের মধ্য দিয়েও ভারতের সেই সনাতন আর্য্যধর্ম্ম বয়ে চলেছে। সে পুরাতন রোম নেই, সে গ্রীস নেই, সে মিশর ব্যাবিলন নেই, সিরিয়-ব্যাকট্রিয়া কিছুই নেই, সব গিয়েছে, কিন্তু সে হিন্দু আছে,—'হিন্দু মরে মরে না' তারা আছে জগতে ধর্ম্মের বন্যা বইয়ে দেবার জন্য—তা তারা করবে। জগতের শিক্ষকের অভাব তারাই পূর্ণ করবে।

'যদি রুসো ও ভল্টেয়ারের ভাবের বন্যায় সমগ্র ফ্রান্স এমন কি ইউরোপের অন্যান্য দেশও ভেসে যেতে পারে, যদি টলষ্টয় ও লেনিনের চিন্তারূপ ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ সমগ্র জগৎ তোলপাড় করতে সক্ষম হয়,যদি রোঁমা রোঁলা বা রবীন্দ্রনাথের ভাব-লহরী জগতের ভাবস্রোতের পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে, অথবা মহাত্মা গান্ধীর নৈতিকযোগ সুমেরু হতে কুমারীকা পর্য্যন্ত চক্ষের নিমেষে প্লাবিত করতে পারে, তা'হলে এক-জন মাত্র যথার্থ আত্মজ্ঞের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুভবের ভাব-মন্দাকিনী যে সমগ্র জগতের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হবে, যথায় নন্দনের শান্তি-পারিজাত ফুটিয়ে তুলতে পারে তাতে সন্দেহের কিছুমাত্র কারণ নেই।' বিবেকানন্দ তার পথ দেখিয়েছেন—সেই বৃহৎ উদ্দেশ্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাই দেশ আজ তাঁর উদ্দেশ্যে গাইছে—

"কোন্ সুন্দর নবপ্রভাতে
তুমি উদিলে ধন্য নিশিথ হে"।

আর তাঁর সেই প্রতিষ্ঠা ভারত উদ্‌যাপন করবে আজ তার স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছে—

"ঐ যে প্রাচীতে হাসিতে হাসিতে,
উদয় অরুণ উষার সহ।"

বংশের কলঙ্ক

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু)

একাদশ পরিচ্ছেদ

দিবা-স্বপ্ন

সরোজনাথের চোখে আজ সারা পৃথিবীটাই যেন স্বপ্ন-রাজ্যের মত দেখাইতেছে। যেন এই পৃথিবীটাতে যেখানে যা আছে, তাতেই স্বর্গের সুধা মাখান; যেন সবই মধুর, যেন সবই সুন্দর, যেন সবই রঙীন, যেন সবই সতেজ, যেন সবই হাসি মাখা! যেন মহাপ্রাণ তপনদেবের সহস্র কিরণে তেজ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে দাহিকা-শক্তি নাই; যেন সুধাংশুর অংশুমালা মধুর স্নেহ-রসে ভরপুর, কিন্তু তাহে শৈত্যের লেশমাত্র নাই; যেন ফলে পাতায় শ্যামল সজীবতা চিরবসন্ত জা[illegible]

তাহার যেন নাশ নাই ; যেন স্রোতস্বিনীর কলতানে, যেন বিহগ কাকলিতে, যেন নির্ঝরের ঝর্ ঝর্ সঙ্গীতে বিশ্বব্যোম ছাইয়া গিয়াছে। মধুর! মধুর! সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই কি মধুর-রসে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে! এ সংসার কি সুন্দর সুখের আগার, এমন সুন্দর মধুর সংসারের সুখের কাছে স্বর্গের সুখ!

সে কি শুনিয়াছে! অনিলা কি তাহারই হইবে? স্বর্গের সুধা ছানিয়া বিধাতা যে সোণার পুতলীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ভুবনসুন্দরী অনিলা কি তাহার অযোগ্য তুচ্ছ হৃদয়-সিংহাসন আলো করিয়া বসিবে? না, না, এ তার দুরাশা, সে বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার স্বপ্নে বিভোর হইয়াছে! সে কি তপস্যা, কি পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছে, যে ভগবানের এই অমূল্য দান গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবে?

এ জগতে ভগবানের অপার করুণার যত দান আছে, তাহার মধ্যে তরুণীর প্রেমময়ী বালিকা পত্নীর অপরিমেয় প্রেমের দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই আপন-হারা সর্ব্বস্ব-দেওয়া প্রথম প্রেমের তুলনায় আর সকলই তুচ্ছ, নিকৃষ্ট। এ প্রেমের যে অধিকারী সে জগতের অন্য সুখ-সম্পদের অধিকারী না হইলেও পরমসুখী। ভগবান সরোজনাথের ললাটে সেই সুখ লিখিয়াছেন কি?

কিন্তু সরোজনাথের বুক গুরু গুরু কাঁপে কেন? অনিলা ত তাহার বাগ্‌দত্তা হইয়াছে, অনিলার পিতাই তাহাকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তবে তার ভয় কি? না, ভয়ের একটা কারণ আছে বৈ কি। অনিলা যে ভাবে লালিতা পালিতা ও শিক্ষিতা হইয়াছে, তাহাতে ভয় থাকিবারই কথা। এ দেশে অনিলার বয়সে বহু বালিকাই সন্তান-জননী হইয়া থাকে; সুতরাং সে বয়সে বালিকার নিজের মতামতের বা নিজের ও অপরের কমতা হইয়া থাকে। অন্ত পিতার [illegible] করিবে, অনিলা সে ধাতুতে গঠিত [illegible] তাহারও একটা স্বতন্ত্র বিচার শক্তি আছে ত'। যদি সরোজনাথ ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে অনিলার মনের কোণে এই বিচার-শক্তির ফলে সামান্য একটু অ-পছন্দের ছায়া আছে, তাহা হইলে সরোজনাথ এই বিবাহে সম্মত হইবে না। কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরোজনাথ নিজের স্বার্থসাধন করিবে? ছিঃ ছিঃ! শত অনুরোধ উপরোধেও নহে। তাহার পূর্ব্বে সরোজনাথের যেন মৃত্যু হয়।

কিন্তু এ আশঙ্কার মূল্য ত' নাই। অনিলার মন ত' নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, চিন্তাশূন্য, তাহাতে এযাবৎ ত' কোন দাগ বসে নাই। তবে এই অমূল্য রত্ন—এই বালিকার সরল শুভ্র পবিত্র মনটী যদি বিধাতা তাহার হাতে তুলিয়া দেন, তাহা হইলে সারা জীবনের আদরে যত্নে সে কি তাহা নিজের করিতে পারিবে না? কেন পারিবে না, সে ত' পুরুষমানুষ, পুরুষেরই ন্যায় সে এই রমণীরত্নলাভে বত্নবান হইবে। ইংরেজ কবি ব্রাইডেন যথার্থই বলিয়াছেন,—"যে সাহসী নহে, সে সুন্দরী রমণী রত্ন লাভের উপযুক্ত নহে।" তাহাকে ভগবান অপার দয়া দেখাইয়াছেন, সে অযোগ্য হইলেও আজ ভগবানের দয়ায় সকল সম্পদেরই অধিকারী। ভগবান কি এখন তাহাকে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত করিবেন? কুহকিনী আশা বলিল, না, কখনই না। হায় কুহকিনী!

সরোজনাথ এই সমস্ত কথা তোলাপাড়া করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল। বাহিরের অন্ধকার হইতে ঘরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক ঝাড়ের আলোকের মাঝারে আসিয়া পড়িতেই তাহার চক্ষু প্রথমে ঝলসিয়া গেল। তাহার পর দৃষ্টি সংযত হইলে সরোজনাথ যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে তাহার সর্ব্ব-শরীরের ভিতরে আনন্দের তড়িৎ-প্রবাহ বহিয়া গিয়া সোমাঞ্চ হইল।

ইলেকট্রিক ঝাড়ের নীচে টেবিলের উপরে দুই হাত পাতিয়া একখানি মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি-নিবদ্ধ

করিয়া অনিলা চেয়ারে বসিয়াছিল। সরোজনাথ এত নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল এবং অনিলা এত তন্ময় হইয়া ম্যাপ দেখিতেছিল যে, অনিলা সরোজের কক্ষ-প্রবেশের কথা কিছুই জানিতে পারিল না। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে স্নাত ও প্লাবিত হইয়া অনিলা যেন নিজের একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ পদার্থের মত প্রতিভাত হইতেছিল। মনে হইতেছিল যেন উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি তাহার দেহ-লাবণ্যের সহিত জড়াজড়ি মাখামাখি করিয়া পরম-আনন্দ উপভোগ করিতেছিল।

কি সুন্দর নবকিশলয় লাবণ্যমাখা চলচলে কাঁচা মুখ খানি! ভাসা ভাসা টানা চোখ দুটীর একাগ্র-দৃষ্টি মানচিত্রের উপরে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ঘন কৃষ্ণ আঁখিপল্লব যুগল-রঞ্জন ঈষদ্বক্রিম স্নিগ্ধ, শান্ত, সরল দৃষ্টিতে কত পবিত্রতা মাখান রহিয়াছে। সেই শান্ত, পবিত্র, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি চোখে পড়িলেই ধ্রুব বিশ্বাস হইবে যে, সেই দৃষ্টির অধিকারিণীর হৃদয়ের অন্তস্তলটাও শুভ্র, শান্ত, সরল, পবিত্র, অনাবিল, পাপলেশহীন। গাঢ় কৃষ্ণ বিপুল কেশরাশি কবরীবদ্ধ হইয়াও বন্ধনের মধ্যে থাকিতে চাহিতেছিল না,- আশে পাশে চোখের মুখের উপর চূর্ণ-কুন্তল সমূহ সর্প শিশুর মত খেলা করিতেছিল, দুই একটী অসংযত কুঞ্চিত কুন্তল ক্ষুদ্র ললাটের দুই এক স্থানে পড়িয়া শ্বেতমর্ম্মরের উপরে কাল লতা পাতার মত অঙ্কিত দেখাইতেছিল। উর্ধ্বা-বিনিন্দিত কোমল কপোলে কি সুন্দর দুটী গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছে! পক্ক বিম্বের মত অধরোষ্ঠ সদা হাস্য-স্ফুরিত হইয়াই রহিয়াছে, সেই ঈষদ্বক্রিম অধরোষ্ঠের মধ্য দিয়া মুক্তা বিদ্রুম তার দশন-পাঁতি যেন অতি যত্নে একটীর পর একটী সাজান রহিয়াছে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কৃশোদরী অনিলাবালার সকল সৌন্দর্য্যের সার তাহার মুখের হাসিটুকু। মৃদু মধুর মুনির মন ভোলান হাসিতে যখন তাহার মুখ-খানি বালারুণোদয়ে পদ্মিনীর মত বিকশিত হইয়া উঠে, তখন তাহাতে সত্য সত্যই যেন স্বর্গের সুষমা ঝরিয়া পড়ে। মধুর, মধুর, স্বর্গের সুধামাখা সেই হাসিটুকু। কোন ভাগ্যবান এই অমূল্য হাসিটুকুর অধিকারী হইবে!

কিন্তু এই মধুরতার মাঝেও এমন একটা ভাব ছিল, যাহা দেখিয়া তাহার অন্তর্নিহিত একটা দৃঢ়, স্বাধীন, অন্যায়ের বিরোধী মতের আভাস পাওয়া যাইত। এই শান্ত, স্থির, প্রফুল্ল, সদাহাস্যময়ী বালিকাটীর মুখে সময়ে সময়ে এমন একটা ভীষণ তেজোগর্ব্ব প্রকাশ পাইত, যাহাতে সাহস করিয়া কেহ সেই কাঁচের কাছে অগ্রসর হইতে পারিত না।

আজ সরোজনাথ সেই সদাহাস্যস্ফুরিতার মুখে মধুর হাসি দেখিতে পাইল না। যেন কোনও অভাবনীয় কারণে সেই মুখ চিন্তারেখাগ্রস্ত হইয়া মানচিত্রের প্রতি সন্নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে। চিত্রটি আগ্রহের সহিত দেখিতেছিল বলিয়া তাহার ভ্রূযুগটী যেন একটী সরলরেখার মত দেখাইতেছিল। কিন্তু তবুও সে মুখখানি কি সুন্দর! এ মুখের তুলনায় জগতে আর একখানি আছে কি?

সরোজনাথ কিছুক্ষণ প্রাণ ভরিয়া সেইরূপ সুধাপান করিল। তাহার পর গদগদ-কণ্ঠে ডাকিল, "অনিলা!" ঘরের মধ্যে অজান্তে একটা বোমা ফাটিলে অনিলা যতটা না চমকিত হইয়া উঠিত, মাত্র এই "অনিলা" সম্বোধনে তদধিক চমকিয়া উঠিল। তাহার হাত হইতে মানচিত্র টেবিলের উপরে খসিয়া পড়িল, মুখখানি শুকাইয়া গেল। চোর চুরি করিতে গিয়া ঠিক চুরির সময় ধরা পড়িলে তাহার যেমন মুখের ভাব হয়, বেচারা অনিলারও ঠিক সেই ভাব হইল। সরোজের মন অন্য দিকে পড়িয়াছিল বলিয়া সে অনিলার এই ভাব লক্ষ্য করে নাই। সে তখন অনিলার ক্ষুদ্র ললাটের উপরে তরঙ্গায়িত অলোক গুচ্ছের রেখা দেখিতে ছিল। কিন্তু অনিলা তাহা ঘুণাক্ষরেও

জানিতে পারিল না, সে ভাবিতেছিল, তাহার লুকাইয়া মানচিত্র দেখা বুঝি জগৎশুদ্ধ লোকে দেখিতে পাইয়াছে। তাই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া মানচিত্রখানা ঢাকা দিয়া দাঁড়াইল এবং ভীত চকিত-নেত্রে সরোজের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

সরোজ মধুরস্বরে বলিল, "ঐকলাটী রয়েছো, অনিলা? অমি কোথায়?"

অনিলা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এতক্ষণে তাহার মুখে হাসি ফুটিল। সে হাসি কি মিষ্ট, কি মধুর! সরোজনাথের চক্ষে সে হাসি যেন শারদীয়া জ্যোৎস্নার মত পাগল-করা প্রাণ-মাতান বলিয়া অনুভূত হইল। গোলাপ পাপড়ীর মত নরম দুধে-আলতা ঠোঁটদুটীর দুইটী কোণে যখন সে হাসিটী খেলিয়া গেল, তখন সরোজনাথ একবারে আপন-হারা উন্মাদের মত হইয়া পড়িল।

"কি সুন্দর তুমি অনিলা! ভগবান যেখান-কার যত সৌন্দর্য্য নিয়ে কি তোমার ঐ মন-ভুলান হাসিটী সৃষ্টি করেছেন? অনিলা—" সরোজনাথের ভাবাবেশে বাকরুদ্ধ হইল। তখন সরোজনাথের আপনার উপরেই আপনার কর্তৃত্ব নাই। সে কি বলিতেছে, কি করিতেছে, সে নিজেই জানে না। অনিলার এই হাসিটুকুই তাহার কাল হইল। এই হাসি সে কতদিন দেখিয়াছে, কিন্তু এখন সেই হাসি সে আর এক চক্ষে দেখিতেছে। অনিলার পিতার আশ্বাস-বাণী তাহার চোখে যে আশার গোলাপী চশমা পরাইয়া দিয়াছে, সেই চশমার ভিতর দিয়া সে যে আজ অনিলাকে নিজস্ব বলিয়া মনে করিতেছে!

অনিলা তাহার কথার ভঙ্গীতে বিস্মিত হইল, ততোধিক বিস্মিত হইল সে তাহার আকার-ইঙ্গিতে ও ভাবভঙ্গীতে। তাহার সরোজদা কখনও ত' এমন কথা বলে না, এমন ভাবে ত' কখনও তাহার দিকে তাকায় না, আজ সরোজদার কি হইয়াছে? সে হাসিয়া বলিল, "সরোজদা যেন কি! কি যে বলে, তার ঠিক নেই।"

সরোজ উত্তেজিতস্বরে বলিল, "সব ঠিকই বলেছি, কোন কথার ভুল হয় নি। অনিলা, তুমি স্বর্গের দেবী, তুমি যার ঘর আলো করবে, তার কত সৌভাগ্য! সে পথের কাঙ্গাল হ'লেও রাজরাজেশ্বর তার সঙ্গে অবস্থার বিনিময় করতে লালায়িত হবে অনিলা!"

অনিলার বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সরোজ দাদা এ কি পাগলের মত বকি-তেছে? সত্যই ত' তাহার পাগলের মত চোখ দুটী ঘুরিতেছে। অনিলার ভয় হইল, সে বলিল, "যাই, অমির খাবার হল কিনা দেখে আসি গিয়ে। দুষ্টু বায়স্কোপ হতে ফিরে এসে কি খাই কি খাই করবে—"

অনিল ঘরের বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ সরোজ তাহার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিল। বস্তু-তঃই তখন উন্মত্তের মত সরোজের চক্ষু ঘুরিতেছিল। যখন অনিলা পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তখন সে যেন সেই স্থানটা দিয়া সত্য সত্যই একটা নন্দন-পারি-জাতের সুবাস ছড়াইয়া যাইতেছিল। সরোজ স্বভাবতঃ ধীর, স্থির, শান্ত, সংযত হইলেও সেই সুবাস তাহাকে অসংযত করিয়া দিল। সে হিতাহিত জ্ঞান রহিত হইয়াই অনিলার মৃণাল কোমল বাহুলতা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "কোথা যাবে অনিলা, আমি দরিদ্র ব'লেই কি আমায় দূরে রাখ্‌তে চাও? তুমি যেখান দিয়ে চলে যাও, সেইটেই যে আমি আমার স্বর্গ ব'লে মনে করি।"

অনিলা হাত ছাড়াইয়া লইল। অন্য কত সময়ে সরোজ তাহার হাত ধরিয়াছে, কিন্তু আজিকার হাত ধরাটা অনিলার ভাল লাগিল না; সেটা যেন তাহার বিষবৎ বোধ হইল; তাহার মনে হইল, সরোজ যে স্থানটা ধরিয়াছিল সেই স্থানটা যেন আগুনের মত জ্বলিতেছে। তথাপি সে মনোভাব গোপন করিয়া কপট হাসিয়া বলিল, "সরোজদা, আজ বুঝি খেলায় হেরে গেছ, তাই এত রাগ হয়েছে।"

"রাগ হয়েছে? আমার রাগ হয়েছে?"

"না হলে আমায় ভয় দেখাচ্ছ কেন? ছাই কালাকারের!"

এ কি! এ যে তাহারই অনুগতা শিষ্যা বালিকা ভগিনী কথা কহিতেছে! সরোজনাথের দিবা-স্বপ্ন কোথায় অন্তর্দ্ধান হইল? সরলা বালিকা যে কিছুই বুঝিয়াও বুঝে না, তাহাকে এবারও একটু খুলিয়া বলিলেই সে লজ্জায় ছুটিয়া পলাইবে, কথার জবাব দিতে পারিবে না। তাহা হইলেই তাহার মন জানিতে পারা যাইবে।

সরোজ আবার অনিলার হাত ধরিয়া বলিল, "তোমায় ভয় দেখাচ্ছি? অনিলা, তুমি যে আমার কি তা ত' জান না। তোমায় ভয় দেখাবো? যাকে ভয় থেকে দূরে রাখ্‌বার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি! অনিলা, অনিলা, তুমি কি আমার কথার ভাব বুঝতে পারছো না?"

অনিলা বুঝিল কি না বুঝিল, তাহা তাহার চোখ মুখের ভাবে বা কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে কিছুই জানা গেল না। তাহার নীলোৎপল নয়ন দুটী পক্ষ্মাদিত থাকিয়া অন্তরের সকল ভাবই ঢাকিয়া রাখিল। সে এইবার ব্যঙ্গের সুরে বলিল, "হো হো! আমারও ভয় হয়েছে, তুমিও প্রাণ দিয়েছ, সরোজদা, বেশ একটিং করতে পার যা হ'ক্। নাও, এখন হাত ছাড় দিকি। আজ কেমন খাবার তৈরী করেছি দেখো এখন।"

অনিলা হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু সরোজ ছাড়িল না। তাহার সমস্ত মুখ চোখ আগুন হইয়া উঠিয়াছে, কি একটা ভাবাবেগে সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে। অনিলা সত্য সত্যই এইবার ক্রুদ্ধ হইল, তাহার মুখে চোখে ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। সরোজনাথ তাহা দেখিয়াও দেখিল না। সে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে পাশার কাঠি ফেলিয়াছে, এখন আর পিছন ফিরিবার পথ নাই।

সরোজনাথ কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "আজ হাত ছাড়তে বলছ, কিন্তু একদিন যখন এই হাতেই হাত দিতে হবে, ইহজন্মে তখন ত' আর হাত ছাড়াতে পারবে না।"

অনিলার নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল। সে ক্রোধ-কম্পিতস্বরে বলিল, "এ সব কি বলছ সরোজদা? অমনধারা কর যদি, তা হ'লে আর তোমার সামনে বেরুবো না।"

তখন সরোজ বিচলিতচিত্তে ও কাতরস্বরে বলিল, "কেন অনিলা! অন্যায় ত' কিছু বলি নি। তুমি ত' জান না, কাকাবাবুর সঙ্গে কি কথা হয়ে গিয়েছে। তিনি যে আমাদের দুজনের চার হাত এক করতে সঙ্কল্প করেছেন। দুদিন আগে না হয় পরে। তবে আমার হাত ধরতে তোমার আপত্তি কি?"

অনিলার মুখে কোনও কথা নাই, কিন্তু তাহার চোখে দারুণ বিস্ময়, ভয়, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল। সরোজ তাহার ভাব বুঝিয়া বলিল, "কেন অনিলা, এত ভয় পাচ্ছ কেন? তোমার উপযুক্ত আমি নই—শুধু আমি কেন, জগতের কেউ নেই—তা জানি। স্বর্গের দেবীর সমকক্ষ মানুষ হতে পারে না। কিন্তু তা হলেও মানুষের আন্তরিক পূজা আরাধনায় দেবতা তুষ্ট হয়ে থাকেন। আমি অযোগ্য অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ হলে সারা-জীবন তোমায় দেবীর আসনে বসিয়ে পূজো করবো, বুক দিয়ে তোমার সকল বিপদ আপদ ঘুইয়ে পুঁছিয়ে দেব, তুমি কি আমার হবে না? তোমার কষ্ট, একটু অসুখ, একটু বিপদ শুনলেই আমার বুকের ভিতরে কেমন করে। তোমার কি আমার জন্যে একটুও তেমন করে না? বল অনিলা, বল, বল, আজ না হ'ক, দুদিন পরে, আমি তোমায় যে চোখে দেখি, তুমি আমায় সেই চোখে দেখতে চেষ্টা করবে? আমি কেবল তোমার কাছে একটী আশার কথা প্রত্যাশা করে এসেছি। বল অনিলা, আমার প্রার্থনা বিফল হবে না!"

অনিলা হাত ছাড়াইয়া লইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—সে কান্নার যেন আর বিরাম নাই। ক্ষণে ক্ষণে তাহার হৃদ্‌-পঞ্জর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। সরোজ হতভম্ব হইয়া অনেক তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিষম উৎকণ্ঠা ও আবেগের সহিত ভাবিল, একি, আমি কি করলুম! আমি কি নিষ্ঠুর কসাই? আমি কি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন পশু?" তাহার পর প্রকাশ্যে বলিল, "অনিলা, অনিলা, লক্ষ্মীটী আমার, কেঁদো না, কেঁদো না, আর আমি তোমায় কোন কথা বলব না। আমি পাগলের মত কি বলেছি আমার কিছুই মনে নেই। লক্ষ্মীটী, চুপ কর অনিলা, লক্ষ্মীটী আমার।" বাঁধ এইবার সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গেল, হু হু শব্দে অনিলার চোখে জলের ধারা নামিল। সে লুকাইয়া লুকাইয়া অনেকটা কাঁদিল। অনিলা বুঝিল না, কিন্তু তাহার এক একটী অশ্রুকণা যেন গলিত শীসকের মত সরোজনাথের ব্যথিত মর্জ্জিত হৃদয়ের পরতে পরতে ঝরিয়া পড়িয়া দারুণ জ্বালা দিতে লাগিল। সরোজনাথ ভাবিতেছিল, "ভগবন্! কি করিলে আবার পূর্ব্বের শান্তি ফিরিয়া পাওয়া যায়! যাহাতে যে হুতাশন জ্বালিয়াছি, তাহাতে সারা জীবন স্বয়ং পুড়িব কিন্তু এই নিষ্পাপ সরলা বালিকাকে সে আগুনের তাপ সহাইলাম কেন? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, বলিয়া দাও প্রভু!"

অনিলা অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া সরোজনাথের মুখের উপর স্থির, ধীর, শান্তিপূর্ণ-দৃষ্টি পাতিত করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল, "সরোজদাদা, আমি যে তোমার ছোট বোন অনিলা। আমি যে তোমায় দেবতার আসনে বসিয়ে পূজো করে আসছি। তুমি কত বড়, কত উঁচু, তা কি জানি নি! সে উচ্চ আসন থেকে তাকে নামালে যে বড় ব্যথা পাই সরোজদাদা!" অনিলা আর দাঁড়াইল না, এক টু জোরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সরোজনাথের চোখে জল নাই বটে, কিন্তু সমস্ত প্রাণটা তাহার সপ্ত-সমুদ্রের তুফান বহিতেছে, তাহার মুখে হাসি ফুটিল বটে, কিন্তু সে হাসির অন্তরালে তাহার নিহত হৃদয়ের মৃত্যু-যাতনাক্লিষ্ট হইয়াছে,—সে প্রাণের কান্না, সে হৃদয়ের যাতনা আকৃতি ব্যাপিয়া যেন অনন্তের বিষাদের কালিমা লেপিত তাহার অন্তর্যামী ব্যতীত কেহই দেখিল না, কেহই জানিতে পারিল না।

কেন রামসদয় বাবু তাহার চোখের সম্মুখে আশার সম্মোহন চিত্র খুলিয়া ধরিয়াছিলেন? কেন সে—অযোগ্য অপাত্র সে—সেই আশায় প্রলুব্ধ হইয়া মায়া মরীচিকার পানে উধাও হইয়া ছুটিয়াছিল? সরলা সরল-বিশ্বাসে তাহার উপর ভগিনী স্নেহের অগাধ অমৃতের ধারা ঢালিয়া দিয়াছিল, সে আজ নির্ম্মম নিষ্ঠুর হৃদয়হীন দানবের মত সেই বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দিল কেন? সবই কি ভবিতব্যের খেলা? ইহাতে কি তাহার কোন হাত ছিল না? ছিল বৈ কি! সরলা বালিকা তাহাকে ত একদিনও ভগিনীর স্নেহ ব্যতীত কিছুই দেয় নাই। সে কি এতখানি আশা ঘুণাক্ষরেও জানাইয়াছিল?

আজ কি কুক্ষণে শর্ব্বরী প্রভাত হইয়াছিল? আজ তাহারই অদৃষ্টদোষে কি এই কাল-রজনী সমাগতা হয় নাই? কি করিলে আজ মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে যে কথাগুলি বলিয়াছে, সেগুলি ফিরাইয়া লওয়া যায়! কি করিলে অনিলার মন হইতে এই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের বিসদৃশ দৃশ্য ধুইয়া মুছিয়া যায়? এই ত' ক্ষণেক পূর্ব্বে সরলা অনিলা আপনার মনে পাঠে নিযুক্ত ছিল। সে যখন একমনে মানচিত্র দেখিতেছিল, তখন ত' তাহার সেই নীলোৎপল নয়নে জল ছুটাইবার কোন কারণই উপস্থিত হয় নাই। এই ত' টেবিলের উপরে সেই মানচিত্র এখনও খোলা পড়িয়া রহিয়াছে।

একি, এ কাহার কটো মানচিত্রের দুইটী পৃষ্ঠার মধ্যে স্থান নির্দ্দেশের নিমিত্ত স্থাপিত রহি-

যাচ্ছে! অরুনের না? হাঁ, অরুনেরই বটে। এই ফটোই ত' আজ ক'দিন থেকে সে পাচ্ছে না। অনিলা এই ফটো নিয়ে রেখেছে কেন? সর্ব্বনাশ! তা'হলে সে একবার যে আশঙ্কা করেছিল, তাই কি সত্য!

সরোজনাথ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অনিলার পরিত্যক্ত চেয়ারে বসিয়া পড়িল। ক্ষণকাল এই ভাবে থাকিবার পর সে যখন চোখ মেলিল, তখন হঠাৎ মানচিত্রের খোলা পাতার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। সরোজনাথ সবিস্ময়ে দেখিল, সেখানা আসাম ও উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশের মানচিত্র। অনিলা ইহার প্রতি এত তন্ময় হইয়া কি দেখিতেছিল? কি দেখিবার আছে ইহাতে? এত পড়িবার জিনিষ থাকিতে আসামের মানচিত্রে তাহার কি দরকার? কি দরকার, কি দরকার? কেহ বলিয়া দিবে কি ইহাতে অনিলার কি দরকার? সরোজনাথ মাথা ধরিয়া নাড়া দিল, চুলেরগোছা মুঠা করিয়া ঝাঁকার দিল, ওষ্ঠ দন্ত নিষ্পীড়ন করিল।

অকস্মাৎ সরোজনাথ লাফাইয়া উঠিল, তাহার চোখমুখ ঠিকরিয়া বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। ঘোর সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীণ অতি ক্ষীণ, আলোক-রশ্মি দেখিলে পথ-হারা পথিকের যেমন ভাব হয়, সরোজনাথের ঠিক সেই ভাব হইল। আর্কিমিডিস একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়া "পেয়েছি", "পেয়েছি" বলিয়া যেমন করিয়া লাফাইয়া উঠিয়াছিলেন, সরোজনাথ অবশ্য তেমন কিছুই করিল না বটে, তবে আর্কিমিডিসের মত যে তাহার মনের আঁধারটা কাটিয়া গেল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনিলার মনটা স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিত্রের ন্যায় তাহার নয়ন সমক্ষে স্পষ্টই প্রতিভাত হইল।

আসামের মানচিত্র! আসামেই অরুণ ঘাটতেছে! এই যে লখিমপুর জেলা, এই যে ডিব্রুগড়, এই যে সাদিয়া, এই যে ব্রহ্মপুত্র, এই যে ডিংং, এই যে আরব দেশ।

ওঃ অরুণ কি পুণ্য করেছে! জগদীশ্বর তার জন্য কি জগতের সকল সম্পদই সঞ্চিত করে রেখেছেন! অরুণ, অরুণ, ভাই অরুণ, তোকে আমি কত ভালবাসি তা ত' জানিস। ভাই, সেই ভালবাসার দাবী দিয়ে সকাতরে তোর কাছে একটী ভিক্ষে চাচ্ছি। তুই জগতের সব সুখ-ঐশ্বর্য্য নে, কেবল—কেবল—অনিলাকে আমায় ভিক্ষে দে।

এ কি, আমি কি বলছি? অরুণ ত' এর কিছুই জানে না। অনিলা যে লুকিয়ে তার ভাবনা ভাবছে, সে কথা ত' জগতে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। এই জন্যেই অনিলা আমার কথা শুনে চমকে উঠেছিল। যে অরুণকে একবার মন দিয়েছে সে কি আর কাউকে সে মন ফিরিয়ে দিতে পারে!

সরোজনাথ এমন কত কথাই ভাবিল। তাহার সেই দিবা-স্বপ্নে ঘেরা রামধনু-রঙের আকাশ-প্রাসাদ কোথায় উড়িয়া গেল! এ পৃথিবীটা এত বিশ্রী লাগে কেন? এ চাঁদে যেন জ্যোৎস্না নাই, এ ফুলে যেন সুগন্ধ নাই, এ বাতাসে যেন আরাম নাই। সবই আছে, কিন্তু সবই যেন ফাঁকা ফাঁকা, যেন কি নাই, যেন সব তাতেই কিসের অভাব! সরোজনাথের জীবনে এ ফাঁকা ফাঁকা ভাবের অভাব কখনও হইবে কি? ওগো, তোমরা বলিয়া দাও, কি করিলে আবার যাহা ছিল তাহাই হয়!

(ক্রমশঃ)

পুষ্প বিকাশ

(শ্রীকালিদাস রায় বি, এ কবিশেখর)

আমার হৃদয় কুঞ্জবনে ফুটেছে ফুল ফুটেছে,
কুটিত কুণ্ঠিত তার মনের বাঁধন টুটেছে।
স্বপন-ভরা ঘুমের শেষে
হৃদয়, আঁখি মেলল হেসে
আনন্দেরি অশ্রু হয়ে নীহার তাহে লুটেছে।

বিজ্ঞঠাকুর ব্যঙ্গভাবে হেসে কি আর করবে?
জানি এ ফুল দুদিন রবে মানি এ ফুল ঝরবে।
ঝরবে বলেই মধুর এত
এমন মোহন তাই গো সে ও
তাইত এত তাড়াতাড়ি মলয় অলি জুটেছে।

মৌমাছিরা মৌচাকে মোর মধু তাহার রাখবে,
আমার প্রাণের অন্তরদানে গন্ধ তাহার থাকবে;
হাসছে আমার কল্পলতা
গেছে তাহার মোহন ব্যথা
নীরব ব্যাকুল বাসনা তার সফল হয়ে উঠেছে।

মায়ার ডোর

(গল্প)

(শ্রীঅজয়কুমার সেন)

(১)

রায়চরণ যখন দুইটী সাবালক পুত্র ও বিধবা স্ত্রী রাখিয়া, তাহাদের নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইলেন; তখন পাড়া-প্রতিবেশীরা এই প্রকারের অতর্কিত প্রস্থানে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিল।

ঐ অঞ্চলে রায়চরণ ছিলেন—গরীব দুঃখীর মা-বাপ। বিপদে-আপদে তিনি সকলের আশে-পাশে থাকিতেন; সেইজন্য সকলে ভাবিত—রায়চরণ নয়া-কারে দেবতা।

পৈতৃক বিষয় যাহা ছিল—তাহা হইতে বুদ্ধিবলে রায়চরণ কিছু বেশী করিয়াছিলেন। তিনি বাজারে একখানি মুদির দোকানও করিয়াছিলেন। সে সময়ে মুদের বাজার খুব কম ছিল বলিয়া, অধিক লাভবানের আশায় তিনি বিলাতে অধিক পরিমাণে মুদের ফরমাস দিলেন।

যখন মুদের জাহাজ কলিকাতার বন্দরে আসিয়া পৌঁছিল, তখন তিনি এক প্রকাণ্ড বজ্‌রা ভাড়া করিয়া, নদী-পথে তাহা দেশে আনিবার ব্যবস্থা করিলেন; এবং ভাল দিন দেখিয়া, মুদে বজ্‌রা পরিপূর্ণ করিয়া, তিনি রেলপথে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন।

এদিকে দেখিতে দেখিতে মুদের বাজারও ক্রমশঃ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। রায়চরণের অন্তঃকরণও সেই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। কবে তাঁহার বজ্‌রা আসিয়া নদীর ঘাটে লাগিবে, তাহার প্রতীক্ষায় তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন।

পাঁচ ছয় দিন প্রতীক্ষার পর, রায়চরণ বড়ই

উন্মনা হইয়া উঠিলেন এবং একদিন হঠাৎ তিনি শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার নূপ পরিপূর্ণ বজ্‌রাখানি নদীর অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

অধিক চিন্তা ও মানসিক কষ্টে রামচরণ অকালে দেহত্যাগ করিলেন। ছেলেরা নূপের কারবার উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলে, শোকাতুরা মা বলিলেন, "তার কোন চিহ্নও তোরা রাখ্‌লি না—সব তুলে দিলি?" ছেলেরা তখন বলিল, "বাবা যখন উহাতে গেলেন, ও পাপ আর রাখ্‌বো না মা।" তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "যা ভাল বুঝিস্ তাই কর বাছা।"

(২)

রামচরণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে যেদিক থেকে যে উপায়ে পারিল; সে সেদিক থেকে সেই উপায়ে নিজের প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া লইবার আশায় ছুটিয়া আসিল।

বড়ছেলে রামচরণ বড় নিরীহ প্রকৃতির মানুষ; না আছে সাতে, না আছে পাঁচে। সে বড় হাঙ্গাম-হুজ্জুক ভালবাসিত না। এই জন্য প্রতিবেশীরাও তাহাকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখিত।

যখন সকলে আসিয়া তাহাকে ধরিল, এবং বলিল, "তুমি যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র; তখন তোমাকে সব টাকা শোধ কোরে দিতে হবে; নইলে আমরা তোমাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে ডাকিয়া লইব এবং যে যাহার মতন ভাগ করিয়া লইব।"

এই কথা শুনিয়া রামচরণ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিবার পর কহিল, "বাবা যা' যা রেখে গেছেন, বা ধার কোরে গেছেন, তাহা পরিশোধ করতে আমরা বাধ্য; তবে আমি মার সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাদের যার যাহা পাওনা সব মিটাইয়া দিব।" তখন একযোগে সকলে বলিল, "অত কথা আমরা শুনতে চাই না—তুমি আমাদের প্রাপ্য টাকা শীঘ্র দিবে কিনা—সেই বল?"

অতি ভাল মানুষের মতন রামচরণ বলিল, "আচ্ছা, আপনারা দু' দিন বাদে আস্‌বেন, তখন যা হোক একটা কিছু কোর্‌ব।"

সেই দিন সন্ধ্যার সময় রামচরণ, মা ও ছোট ভাই হরিচরণকে ডাকিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া তাহাদিগকে বলিল।

সব কথা শুনিয়া হরিচরণ বলিল, "আপনি যখন আছেন, তখন আমার কাছে পরামর্শ নেবার প্রয়োজন কি? আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন।"

শোকাতুরা মাতাও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "রামচরণ, তোর হাতে যখন আমাদের সঁপে দিয়ে তিনি গেছেন—তখন তোকেই সব দেখ্‌তে-শুনতে হ'বে। তুই যা ভাল বুঝিস্ তাই কর। আর কেন বাবা ও সবে আমাকে জড়াস্?" এই বলিয়া তিনি একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁর স্বর্গগত স্বামীর উদ্দেশ্যে দ্বিগুণ বেগে কাঁদিতে লাগিলেন; এবং মনে মনে ইহাও ভাবিতে লাগিলেন রামচরণ অতি ভাল মানুষ—না জানি ওকে ফাঁকি দিয়ে কত লোক কত নিয়ে যাবে। বাবা যে আমার কিছুই জানে না—বড় ছেলে হ'লে কি হয়—সে যে আমার ছোট ছেলেরও সমান নয়?

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি গৃহান্তরে গমন করিলেন।

রামচরণ সবেমাত্র হিসাব-পত্র সারিয়া উঠিবে উঠিবে করিতেছে; এমন সময় ঝড়ের মতন অতর্কিতে আসিয়া উপস্থিত হইল—হরিচরণ। তাহার মূর্ত্তি পূর্ব্বদিনের মূর্ত্তি অপেক্ষা অন্য রকমের। ঠিক সম্মুখে দাদা রামচরণকে দেখিতে পাইয়া, হরিচরণ অসংযত ভাষায় কহিল, "দাদা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে—এত টাকা হাতে পেয়ে?"

হরিচরণের এতবিধ কথা শুনিয়া রামচরণ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এবং কিছুই বলিতে না পারিয়া ভ্রাতার মতন তাহার দিকে কিয়ৎকাল তাকাইয়া তারপরে কহিল, "ভাই, আমার মাথা খারাপের অবস্থা তুমি কি দেখ্‌লে! মাথা যে খারাপ হবে তার আর আশ্চর্য্য কি ভাই? এতা আমি সবদিক দেখ্‌তে হচ্ছে জানত!" এই বলিয়া তাহার দিকে বাথিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

হরিচরণ রামচরণের কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় উগ্রভাবেই কহিল, "না দাদা তুমি যাকে তাকে টাকা দিতে আরম্ভ কোরেছ! এমন কোরে যদি সমস্ত টাকাই খরচ কর, তা'হলে কি রকমে চল্‌বে?"

রামচরণ এই কথাতে ভীষণ আঘাত পাইয়া বলিল, "হরিচরণ, যদি আমার উপর তোমার এতটাই সন্দেহ হয়ে থাকে তা হ'লে তুমি না হয় টাকার ভার নাও। তা হ'লে আমি এই টাকার হাঙ্গাম থেকে একটু অব্যাহতি পাই।" বলিয়া তাহার দিকে ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

হরিচরণ ইহাতে কি যে উত্তর দিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। ইতিমধ্যে তাহাদের মাতা আসিয়া দেখিলেন দুইভাই চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহাদের এইরূপ অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া; তখন তিনি রামচরণকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "হাঁরে রাম, পিসর ছেলে যে সে দিন টাকার জন্য এসেছিল—তাকে কি কিছু দিলি? বাছাদের যে কি কষ্ট সে আর চোখে দেখা যায় না!" এই বলিয়া অঞ্চলের শেষ-প্রান্ত দিয়া চক্ষুকে মুছিয়া লইয়া পুনরায় বলিলেন, "ওরে, ওদের কিছু কিছু দিস্—কর্ত্তাও মাঝে মাঝে ওদের কিছু দিতেন।" বলিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

হরিচরণ ও অন্য দরজা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

একদিন রামচরণ ঘরের বারান্দায় বসিয়া ক্ষেত হইতে আনীত ছোলা মটর কলাই প্রভৃতির রাশ দেখিতেছিল; এমন সময় তাহাদের মা আসিয়া কহিলেন, "রাম, ঘর সংসারের মতন কিছু রেখে বাকী বেচে দিলে হয় না রে?"

রামচরণ অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়িয়া মার কথায় জবাব দিল। পুনরায় তিনি বলিলেন, "এবার কার ক্ষেতের ফলন্ত মন্দ নয়—যদি উপ্‌রি উপ্‌রি এমন ফসল হয়, তা হ'লে লোকে খেয়ে দু'দিন বাঁচে। আজকাল জিনিষ পত্র যে রকম আক্রা, তাতে লোকের দিন চলা ভার হয়ে উঠেছে। দেখ্ রাম, বেচে ফেলবার আগে আমাকে একবার জানাবি।" এই বলিয়া তিনি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

মা চলিয়া যাইবার পরই, হরিচরণ বারান্দায় দাদাকে বসিতে থাকিতে দেখিয়া কহিল, "দাদা, এবারকার ক্ষেতের এই বুঝি জিনিষ! এযে নিতান্তই কম—কম নয়কি দাদা? ব্যাটারা সব চোর—যেদিক্ থেকে সুবিধা পায়, সে সেইদিক থেকে নিয়ে সরে পড়ে—তা' না হলে এত কম!" বলিয়া মুখখানাকে বিকৃত করিয়া তুলিল।

রামচরণ এই সব কথার উপর কোন জবাব মাত্র না দিয়া চুপ করিয়া রহিল; একটি কথা মাত্রও বলিল না।

দাদার কোন উত্তর না পাইয়া হরিচরণ একটু উত্তেজিতভাবেই কহিল, "এর কি কোন উপায় হয় না দাদা? পুরোনো জোত্‌দারদের ছাড়িয়ে দিয়ে নতুন রকম বন্দোবস্ত করা দরকার; না হলে এ বছর যা কিছু পাওয়া গেছে; সামনের বছরে হয়ত কিছুই পাওয়া যাবে না?" এই বলিয়া উত্তরের আশায়

রামচরণের মুখের উপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

রামচরণ অতি ধীরভাবে কহিল, "হরি, যার যার কাছে আমাদের ভোগ-জমি যাহাল আছে, তারা বাবার পুরাণ প্রজা। তারা কি এখন সহজে ছাড়তে স্বীকার করবে—না আমাদের উচিৎ তাদের ছাড়িয়ে দেওয়া? আপদ বিপদের সময় তারা যে কত সাহায্য করে, তার আর অন্ত নেই। আমার ইচ্ছা নয় যে নূতন লোক বাহাল করি।" বলিতেই যেমন উঠি-উঠি করিবে, এমন সময় পিক মণ্ডলের ছেলে আসিয়া দুইভাইকে প্রণাম করিয়া কহিল, "দাদাঠাকুর, বাবার কাল রাত থেকে ভেদ আর বমি; দয়া করে যদি একবার শ্রীচরণের ধুলো দেন, তা' হ'লে বাবা আবার দেরে উঠতে পারে।" বলিয়া মলিন-মুখে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

হরিচরণ অতি তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, "তোর বাবা বুঝি কতকগুলো করে খেয়েছিল, তার এই ফল আর কি? যা যা এখন আমরা কেউ যেতে পারবো না? ব্যাটা যেন নবাবপুত্তুর—ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছে, নিজের আসবার মুরোদ নেই। যত সব ছোটলোকের আদায় গ্রামে থাকা দায় হয়ে উঠলো।" বলিয়া অপ্রসন্ন-মুখে রামচরণের মুখের দিকে চাহিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

রামচরণ হতবুদ্ধি হইয়া গেল—হরিচরণের এই কথায়। "তুই এখন যা, আমি এখনি যাচ্ছি," বলিয়া সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

পিকর ছেলে রহিম মুখখানিকে কাঁচুমাচু করিয়া চলিয়া গেল।

(৫)

রামচরণ গিয়া দেখিল—রহিমের অবস্থা বড় সঙ্কটজনক—বাঁচিবার আশা খুবই কম। অতি যত্নে তাহার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যেমন ঘর হইতে বাহিরে আসিবে; হঠাৎ পায়ের উপুড় হইয়া পড়িল—পিকর স্ত্রী। কাঁদ-কাঁদস্বরে পিকর স্ত্রী কহিল, "যে রকম রোগ তাকে বাঁচিয়ে দিতে হবে—আপনি দেবতা—পীর।" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া রামচরণ বাহিরে আসিয়া দেখিল—রহিম মুখখানি ভার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া রামচরণের অন্তঃকরণ কাঁদিয়া উঠিল। তখনি তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহে বলিল, "ভয় করছিস্ কেন, দু'দিনে সব সেরে যাবে। আজ একবার সন্ধ্যার পর আমার ঘরে দেখা করিস্, বুঝলি?"

রহিম কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, "দাদাঠাকুর, বাবার কি কোন কঠিন অসুখ হয়েছে—মা যে বড় অস্থির হয়ে পড়েছে।" বলিয়া সে কাপড়ে প্রান্তে চক্ষু ঢাকিল।

তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া রামচরণ কহিল, "রহিম, অত ভাবছিস্ কেন—তোর বাবা নিশ্চয়ই সেরে উঠবে। মাকে একটু ঠাণ্ডা করে রাখিস্—তোর কাজ কর্‌বি—বুঝেছিস্।" বলিয়া টাঁক হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিল এবং পথ্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতেও বলিল।

কিছুদূর আসিয়া রামচরণ দেখিল, পাড়ার ঠাকুর্দা ঠক্ ঠক্ করিয়া লাঠিতে ভর দিয়া এদিকে আসিতেছেন। নিকটবর্তী হইবামাত্র রামচরণ তাহার পদধূলি লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর্দা, কোথায় যাচ্ছেন?"

একমনে আসিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার কোন-দিকে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ঠাকুর্দা সম্বোধন শুনিয়া, চমকিত হইয়া সামনে চাহিয়া দেখিলেন—রামচরণ। তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "কি বাবা রাম, এদিকে কি কোন কাজে এসেছিলে বুঝি?" বলিয়া খক্ খক্ করিয়া কাশিতে লাগিলেন।

কাশির বেগ একটু থামিলে, রামচরণ বলিল, "পিরুর কাল রাত থেকে বেশ আর বমি; সেই খবর পেয়ে তাকে একবার দেখ্‌তে এসেছিলাম।" এই কথা শুনিয়া তিনি পুনরায় কাশিতে কাশিতে বলিলেন, "এখন কি রকম দেখ্‌লে রাম?" বলিয়া রামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রামচরণ বলিল, "অবস্থা যে খুব ভাল তা নয়—তবে টিক্‌লেও টিক্‌তে পারে; এখন কেবল ঘণ্টার পর ভগবানের হাত।" বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর পুনরায় বলিল, "ঠাকুর্দা, আপনি যাচ্ছেন কোথায়?"

রামচরণের কথায় ঠাকুর্দা বলিলেন, "ও পাড়ায় একবার যাচ্ছি বাবা—আমার মেয়ের বড় অসুখ।"

রামচরণ কহিল, "আপনার মেয়ের কি অসুখ ঠাকুর্দা? একদিনও ত একথা বলেন নি?"

"আর বাবা অসুখে অসুখে হাড় জলে গেল—শরীর কঠ হয়ে গেল।" বলিয়া তিনি গুটি গুটি চলিয়া গেলেন।

(৬)

অত দেখাশুনা করিয়াও পিরুকে বাঁচান গেল না; সে মহাকালের ডাকে চলিয়া গেল।

পিরুর মৃত্যুতে রামচরণ বিব্রত হইয়া পড়িল; কি যে করিবে তাহা স্থির করিতে পারিল না। পিরুর বিধবা স্ত্রী এবং নাবালক পুত্র রহিম কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, এই হইল তাহার প্রধান চিন্তা।

একদিন সকাল বেলা রামচরণ দাবায় বসিয়া একমনে গত সনের হিসাব-পত্র দেখিতেছিল; এমন সময় রহিম আসিয়া বলিল, "দাদাঠাকুর, আর একবার পায়ের ধুলো দেবেন চলুন—মা যেন কি রকম কর্‌ছে?" বলিয়া আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল।

রহিমের এই কথায় তাহার বুক আবার শুকাইয়া গেল। কিছুকাল নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া কহিল, "রহিম, তোর মার কি হয়েছে রে?"

কাঁদ-কাঁদ স্বরে সে বলিল, "বাবা মারা যাবার পর থেকে মা ত কিছু খান না—সেই যে বিছানা নিয়েছেন এর মধ্যে এক দণ্ডের জন্ত ও ওঠেন নি। আপনি একবার চলুন—যদি মা আমার বাঁচে।" বলিয়া শুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই হরিচরণ আসিয়া কহিল, "দাদা, আবার এ ছোঁড়া এসেছে কেন, আবার কার অসুখ?" বলিয়া রহিমের দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল।

হরিচরণের বিকৃত মুখ ও রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া রহিম কাঁদিয়া বলিল, "ছোট বাবা ঠাকুর, মার আমার অসুখ—তাই দাদাঠাকুরের কাছে এসেছি।" বলিয়া রামচরণের পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

রহিমের এতদূর আস্পর্দ্ধা দেখিয়া হরিচরণ রাগে কাঁটা হইয়া উঠিল। সে রাগের জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল কিন্তু দাদার সামনে কিছুই বলিতে না পারিয়া অন্ত দরজা দিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

হরিচরণের হাবভাব দেখিয়া রামচরণ বিস্মিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল। শেষে রহিমকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "রহিম, আমি এখনই যাচ্ছি—তুই যা।" বলিয়া উঠিয়া পড়িলে ইতিমধ্যে পুনরায় হরিচরণ আসিয়া কহিল, "দাদা, পিরু মরলেই বা আমাদের কি—আর থাকলেই বা আমাদের কি? তুমি অত ছোট জেতের জন্ত জেবে সারা হচ্ছ কেন? ছোট জেতের মরণ ঐ রকম করেই হয়ে থাকে!" বলিয়া মুখখানিকে তিক্ত করিয়া তুলিল।

হরিচরণের এইরূপ কথায় রামচরণ মনে বড় দুঃখ পাইল। দাদার কোন উত্তর না পাইয়া হরিচরণ বলিল, "দাদা, শুন্‌লাম তুমি নাকি পিরুর অসুখের সময় অনেক টাকা দিয়েছ, কেন ও সব ছোট জাতদের সাহায্য করা? একবার আস্কারা পেলে—ঘাড়ে উঠ্‌তে চাইবে তখন নামান হ'বে দায়। ওরা

ছোট—পায়ের তলায় থাকবে, মাথায় উঠবে—এতদূর আস্পর্দ্ধা ?"

এই প্রকারের কথা শুনিয়া রামচরণ যেন কি রকম হইয়া গেল। প্রকৃতিস্থ হইয়া তারপর কহিল, "ভাই হরি, ছোট জাত বলে কি তাদের ঘৃণা করতে হয়ে—তারা কি তোমার আমার মত মানুষ নয় ? তাদের কি প্রাণ নেই ? যাদের তুমি ছোট জাত বলে গাল দিচ্ছ, তারা যে বাবার প্রাণ ছিল—তাদের ভরসাতে বাবা ভরসা পেতেন। পিরুকে ছোট জাত বলে গাল দিও না। তুমি যেমন আমার ভাই—সেও তেমনি আমার ভাই ?" এই বলিয়া কাপড়ের প্রান্ত দিয়া চোখ মুছিয়া লইয়া পুনরায় কহিল, "পিরুই তোকে ছোট বেলায় মানুষ করেছিল। ওর কোলে পিঠে চোড়েই তুই এত বড়টা হয়েছিস, সে কথা ভুলে যাস্‌নি। সে তোর পালক, একথা তুই চিরকাল মনে রাখবি। তাদের উপর কোন দিনের তরে ও অকৃতজ্ঞ হোসনি ?" এই বলিয়া সে বিহ্বল-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

দাদার কথায় হরিচরণ একটু যেন তটস্থ হইয়াই বলিল, "দাদা, তা'বলে কি ওরা যা বলবে তাই কি কোরতে হবে নাকি ; সে এমন কি পীর ?"

রামচরণ হরিচরণের কোন কথার জবাব মাত্র না দিয়া অপ্রসন্ন-মুখে বাহিরে চলিয়া গেল।

হরিচরণ ও দাদার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া শুম্ হইয়া সেইখানেই বসিয়া রহিল ; দাদা চলিয়া গেল তাহাও দেখিল কিন্তু একটা কথা মাত্রও বলিল না।

(৭)

একদিন রামচরণ শুনিল হরির চেষ্টায় পিরুর বসতবাটী নিলাম হইবে। কথাটি শুনিয়া তাহার প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিল—হরি ও অন্যান্য পাড়ার ছেলেরা পিরুর বাড়ী চড়াও করিয়া বসিয়া আছে। রামচরণকে অসময়ে আসিতে দেখিয়া হরির অন্তঃকরণ শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল।

হরির নিকটে গিয়া রামচরণ কহিল, "হরি, তুমি যে এখানে—কোন দরকার আছে কি ?" বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

দাদার কথায় তখন কোন প্রকারের জবাব দিতে না পারিয়া, সে হতবুদ্ধির মতন বসিয়া রহিল। হরিকে এমত অবস্থায় দেখিয়া অন্যান্য সহচরেরা প্রমাদ গণিল। তাহারা কহিল, "হরি, তবে আমরা যাই ?"

তাহাদের কথায় চমক ভাঙ্গিলে হরি কহিল, "একটু দাঁড়াও না।" তখন সে দাদাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "দাদা, তুমিও যা এখানে কেন ? আমরা এসেছি পিরুর বাড়ী দখল করতে। তার বাকী বকেয়া অনেক খাজনা বাকী। সে ত মরে গেল, টাকাও কি তার সঙ্গে সঙ্গে ভূত হয়ে যাবে নাকি ? তুমি এখনই এখান থেকে চলে যাও।" বলিয়া তাহার দিকে বিষ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

এই কথা শুনিয়া রামচরণ বিহ্বল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর রামচরণ বলিল, "হরি, পিরুর বাড়ী দখল করবার আগে আমাকে জানান কি কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না ?"

দাদার কথা শুনিয়া হরিচরণ জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "তুমি পিরুর সব খাজনা মাপ কোরতে পার কিন্তু আমি ত তা পারি না ? আমার অংশের খাজনা আমি জোর করে আদায় করে নেবো—তুমি এতে বাধা দিতে পারবে না ? যদি আমাদের কাজে বাধা দাও, তবে অপ—।" বলিয়া চুপ করিয়া গেল।

রামচরণ অতি প্রসন্ন-মুখেই বলিল, "পিরুর অনাথা পরিবারের জন্য আমি সব অপমান তোর কাছ থেকে সহ্য করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তোর ভাগের খাজনা যদি তুই একান্তই নিতে চাস্ ; আমিই তার জন্য দায়ী—ওরা তার কি

জানে?" বলিয়া ক্রন্দনরত রহিমকে নিকটে টানিয়া লইয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল।

তারপর হরিচরণকে পুনরায় কহিল, "ভাই হরি, তোমার যা অভিরুচি তাই তুমি কোরতে পার। ভগবানের এই বিশাল জগতে যদি এই গরীব ও অনাথ পরিবারের একটুমাত্র স্থান হয়, তবে আমারও সেই সঙ্গে নিশ্চয়ই একটু হ'বে।" এই বলিয়া রামচরণ পিতৃহীন ও রহিমকে লইয়া চলিয়া গেল।

সমবেত জনমণ্ডলী বিস্ময়ে ও পুলকে তাহাদের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

অভিমান

(শ্রীলীলা দেবী)

আবার তোমার ডাক এসেছে
মধুর মধুর বাণী,
দাসী কি আর রইতে পারে
ব্যথায় অভিমানী।
হাওয়ার সাথে চরণ চলে
কুঞ্জলেতে নিশান ঝুলে
পাল তুলেছে নীলাঞ্চলে
মনের অভিমানই।
আমায় তুমি ডেকেছ আজ
হৃদয়ে কর হানি!

বিভীষণ

(লেখক—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার)

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাত্রি এগারোটা, আকাশ অন্ধকার, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে।

ট্রেণ ষ্টেশনে থামিতেই একটি বঙ্গীয় যুবাপুরুষ দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার দ্বার খুলিয়া উঠিয়া পড়িল। কামরার ভিতরে একটা প্রচণ্ড হাস্যকলরব চলিতেছিল, যুবক উঠিতেই হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল—দুইটি সৈনিক বেশী গোরা ওধারের দুখানা বেঞ্চে বসিয়া যুবকের পানে কটমট করিয়া চাহিয়া উঠিল। এদিকের বেঞ্চটায় একটি সুবেশা রমণী বসিয়া ছিল, যুবক চকিতে একবার চারিদিকে দেখিয়া লইয়া আবার দ্বারটি খুলিয়া নামিয়া যাইবে, অকস্মাৎ রমণীটি দাঁড়াইয়া উঠিয়া আর্ত্তস্বরে কহিল—

আমাকে একটা অন্য গাড়ীতে তুলে দিন। অই ওরা.....

যুবক হাস্যপরিহাসের হেতু বুঝিল, অগ্নিদৃষ্টিতে একবার গোরা দুটোকে দেখিয়া লইয়া রমণীর উদ্দেশে কহিল—কিন্তু গাড়ী কোথাও খালি আছে কি-না তা ত আমি জানি নে!

রমণী আকুলস্বরে কহিল—তবে আপনি এখানে থাকুন দয়া করে। এই ত উপরের বাঙ্কটা খালি রয়েছে,...সে মাথার উপরের বাঙ্কটি দেখাইয়া দিল।

আচ্ছা—বলিয়া যুবক মুটের মাথা হইতে পোর্টম্যানটুটা নামাইয়া মুটে বিদায় করিয়া, দরজাটি বন্ধ করিয়া সার্টি ঝড় ঝড়ি তুলিয়া দিয়া, টুপি ও কোট টা খুলিয়া দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গাইয়া রাখিল; সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া একটি চুরুট ধরাইয়া ফেলিল। গোরাদ্বয় ইতাবসরে অন্তের অবোধ্য ভাষায় কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে এদিকে বঙ্কিম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেও অবহেলা করিতেছিল না।

যুবক পাৎলুনের পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া হাতমুখ মুছিয়া ফেলিয়া, জিজ্ঞাসিল—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

পুরী থেকে। আর সেই থেকে ওরা ও···

বুঝেছি—যুবক অন্য মনে সিগারেট ফুঁকিতেছিল।

রমণী দেওয়ালের দিকে সরিয়া যাইতে যাইতে বলিল—আপনি বসুন-না...দু'ই তিনটা হাঙ্গামাতুরীয়ক পরিধিত হতে সে ব্যাগটা সুবিন্যস্ত করিয়া বাড়িয়া দিল।

গোরা দুইটা যদিও প্রকাশ্যে আর কোনরূপ অভদ্রতা করিল না কিন্তু তাহারা যে ইহার প্রসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে নাই, যুবক তাহাদের কথার ভাবে এবং হাসাহাসিতে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছিল—কিন্তু গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করা যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়াই সে সেদিকে লক্ষ্য করিল না, বেঞ্চের এক কোণে বসিয়া নিঃশব্দে চুরুট টানিতে লাগিল।

বৃষ্টির মধ্যেই ট্রেণখানি আর একটা ষ্টেশনে থামিতেই গোরাদ্বয় তাহাদের মোট-মাটরা লইয়া নামিয়া গেল। যাইবার সময় আবার কতকগুলা কি বলিয়া গেল, যুবক তাহার এক বিন্দুও বুঝিল না। রমণী হাফ্ ছাড়িয়া বলিল—আঃ বাঁচা গেল।

যুবক দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আর ত ভয় নেই, এবার আপনি নিশ্চয় থাকতে পারবেন।

না, না—আবার হয় ত কে এসে জুটবে। আপনি বসুন আর গাড়ী ত খালি হ'য়ে গেছে, আপনি কেন ওধারের বেঞ্চিটায় শুয়ে পড়ুন না।

অগত্যা যুবককে তাহাই করিতে হইল। ওধারে বসিয়া বলিল—আপনি কি একলা আসছেন?

না। আমার চাকর আছে থার্ড ক্লাসে।

রাত্রে তা'কে ত আপনের কাছে ডেকে নিতে পারতেন—বলিয়া যুবক আবার একটি সিগারেট ধরাইল। রমণী বলিল—এ-রকম ট্রাভল আমরা প্রায়ই করে থাকি।

যুবক কিছুই বলিল না। অর্থাৎ বলিবার মত মত ভাব ভাষা তাহার মনের মধ্যে তখন ছিল না। মেয়েটির কথায় তাহার যথেষ্ট রাগ হইয়াছিল, ভাবিতেছিল, বাঙ্গালীর মেয়ে তুমি বাবু, এতটা সাহস নাই দেখাইতে! দুইটা গোরা দেখিয়াই যখন তোমার হৃৎকম্প হয়, তখন জুতা মোজাই পর আর যাই কর, একা ট্রাভল করিবার মত ক্ষমতা আজিও তোমার হয় নাই। কেন এ বাহাদুরী করা, যাবা নিশ্চিত টিকিবে না জান?

রমণী বেঞ্চের তলা হইতে একটি পিতলের গোলাকার বাক্স তুলিয়া খোটাকতক পান বাহির করিয়া বলিল—খাবেন?

ধন্যবাদ। পান আমি খাই নে।

রমণী নিজের গালেই পান ফেলিয়া দিল; ক্ষুদ্র একটি কৌটা হইতে খানিকটা দোক্তা বাহির করিয়া মুখে দিয়া বলিল—আপনি কলকাতা যাবেন ত?

হ্যাঁ। আপনি?

আমিও তাই, মশাই। এসেছিলাম রাজার বাড়ী মুজরোয়।·····সে উঠিয়া, বাথ্ রুমের মধ্যে গিয়া পিচ্ ফেলিয়া আসিল।

যুবক একবার তাহার আপাদ মস্তক দেখিয়া লইয়া বিছানায় কাৎ হইয়া পড়িল। ট্রেণ হু হু শব্দে ছুটিতেছে। সাসির ফাঁকে ফাঁকে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের গায়ে বিদ্যুৎ চমকিয়া

ফিরিতেছে, যুবক একদৃষ্টিতে তাহাই দেখিতেছিল, রমণী জিজ্ঞাসিল—আপনার নামটি জান্‌তে পারি কি?—স্বর অত্যন্ত বিনম্রসূচক।

আমার নাম সত্যেন্দ্র মিত্র।

কলিকাতাতেই বাড়ী ত? কোন পাড়ায় বলেন? হোগলকুঁড়ে? ওঃ, সে ত আমার বাড়ীর কাছেই। আমার বাড়ী, নূরজাহান বাইজীর নাম শুনেছেন আপনি? শোনেন নি? তাঁরই বোন্ বি আমি···আমার নাম মেহেরজান।

সত্যেন্দ্র নীরব।

মেহের বলিতে লাগিল—আজ আপনি না এসে পড়লে ওঃ! তাহার মুখে চোখে কৃতজ্ঞতা যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল।—আমার বিপদ বুঝে ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন! সত্যেন্দ্র ফিরিয়া দেখিল মেহেরের মুখ খানিতে এক স্বর্গীয় আভা ফুটিয়া উঠিয়া অতীব মনোরম করিয়া তুলিয়াছে।

মেহের সুন্দরী বটে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভালোবাসা? ভালোবাসা আছে কবির কাব্যে, ভালোবাসা আছে লোকের মুখে। যেখানে মানুষ খুঁজিয়া মরে, রমণীর বুকে,—ভালোবাসা নাই—এই মত গঠন করিয়াই সত্যেন্দ্র খুরদা রোড হইতে ফিরিতেছিল। ভালোবাসা যদি থাকিত তাহার স্ত্রীর বুকখানিতে, তবে কি সে-ই কখনো তাহাকে সেই অভিশপ্ত হার ছড়া লইয়া বাঙ্গ বিদ্রূপ করিত? সুবাস যদি এতটুকু ভালোবাসাও বাসিত, তবে কি সেই ভুলটাই টানিয়া টানিয়া এতখানি করিয়া তাহাকে মর্ম্মপীড়া দিত?·····নাই, নাই, ভালোবাসা নাই।

কিন্তু মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। মেহেরজান হাওড়া ষ্টেশন প্লাটফর্ম্মে নামিবার ঠিক পূর্ব্বে তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া, অশ্রু-পূরিত-কণ্ঠে বলিল—একদিন আস্‌বেন, দয়া করে?

সত্যেন্দ্র বলিতে যাইতেছিল যে কোথায় যাওয়া আসা তাহার অভ্যাস ·····

মেহের বলিল—আমাদের মত হতভাগিনীরাও ঠাকুর গড়িয়ে পুজো করে। ঠাকুর ত আস্‌তে দ্বিধা করেন না। বলুন, আস্‌বেন?

সত্যেন্দ্রের 'এম্' তক্‌মা আঁটা রামলক্ষ্মণ মোটর হাজির সংবাদ দিল; বেহারা দ্বারের সামনেই দাঁড়াইয়া; সত্যেন্দ্র বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা, আসব।

ভুল্‌বেন না?—স্বর ছল-ছল করিতেছিল।

না—বলিয়া সত্যেন্দ্র নামিয়া গেল। গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়াছে, দৃষ্টি পড়িল, সেই স্থানটায়—মেহের তখনও ঠিক সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, নিশ্চল, পাষাণ মূর্ত্তিটির মত, নিষ্পন্দ!

সত্যেন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে চলিল—এ কিসের আকর্ষণ! উহারা ত ভালো বাসিতে জানে না, ভালোবাসা ত উহাদের জীবন-কোষ্ঠীতে লেখে না, মেহের অমন করিয়া চাহিল কেন? চক্ষু হইতে তাহার কি ঝরিতেছিল? সে কি কৃতজ্ঞতা?

বলা বাহুল্য, ভাবনা সত্যেন্দ্রকে নিষ্কৃতি দিল না। একদিন গেল, দুই দিন গেল, তবুও সত্যেন্দ্র সেই একই কথা ভাবিতেছে—মেহের অমন করিয়া চাহিল কেন?

তিন দিনের দিন, আর সে স্থির থাকিতে পারিল না, সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে সত্যেন্দ্র বেশ ভূষা করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার বাড়ী হইতে মেহেরজানের বাড়ী বেশী দূরের পথ নয়। সত্যেন্দ্র দশ মিনিটের মধ্যে বাড়ীটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর দ্বারে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, কি বলিয়া ডাকিবে, একেবারে ঢুকিয়া পড়িবে কিনা এইরূপ চিন্তা করিতেছে—বৃদ্ধা গোছের একটি স্ত্রীলোক কেরাসিন তেলের বোতল হাতে করিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসিল—কা'কে খুঁজছ গা?

মই-ঘাড়ে ছুটিতে ছুটিতে একটা গ্যাস হয়করা গ্যাস আলিয়া দিয়া গেল। বৃদ্ধা গ্যাসালোকে সত্যেন্দ্রের বেশভূষা দেখিতে দেখিতে বলিল—এখানে দাঁড়িয়ে কেন বাছা? ঐ—আগে যাও।

সত্যেন্দ্র থতমত খাইয়া গিয়াছিল। বলিল মেহেরজান বাইজী···

হ্যাঁ। তার হ'য়েছে কি?

সত্যেন্দ্র নির্ব্বাক। বৃদ্ধা বলিল—ভালা লোক ত তুমি বাপু! কি চাও খুলেই বল না শুনি?

সত্যেন্দ্র অতি কষ্টে কহিল—মেহেরজান বাইজী আমাকে একবার—আসতে বলেছিল।

বৃদ্ধা বোধ করি কথাটা বিশ্বাস করিতে পারে নাই, দাঁড়াও বাছা, দেখ্‌ছি—বলিয়া হন্ হন্ করিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। দুই মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তোমার নাম কি বাছা—সত্যেন বাবু?

সত্যেন্দ্র ঘাড় নাড়িল। "এস বাছা এস!" বৃদ্ধা কোথা হইতে ছুটিয়া একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া আসিল। সত্যেন্দ্রের পা দু'টি কাঁপিতেছিল; একটা ঘরের দ্বার সমীপে দাঁড়াইয়া কয়েকটি সুবেশা রমণী তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। ভাবিল, কাজ নাই আর গিয়া। না, সে আর হয় না—ফিরিতে হইলে এখনি আবার উহাদের চোখে পড়িতে হইবে।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে সত্যেন্দ্র জিজ্ঞাসিল—মেহের কোথা?

আর বাছা মেহের! মেহের ত আজ ক'দিন বিছানাই নিয়েছে ভেবে ভেবে! তোমরা বাছা লোক ত সুবিধের নও। এই যে আসব বলে মেয়েটাকে আশা দিলে, তা বাপু তোমার হ'লই হ'ল না। আর ভেবে ভেবে বাছার সোণার অঙ্গ কালী হ'য়ে গেল। এই রকমটাই কি করতে হয়?

সত্যেন্দ্রের জিহ্বা কণ্ঠ মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল, একটি শব্দও সে উচ্চারণ করিতে পারিল না। বৃদ্ধা এসব কি যা-তা বলিতেছে?

দ্বিতলে একখানি বিদ্যুতালোকিত কক্ষের পরদার সামনে আসিয়া বৃদ্ধা কহিল—যাও বাছা, ঐ ঘরে তোমার মেহের আছে।

সত্যেন্দ্রের বাহুতে এখন শক্তি ছিল না যে পরদাটা সরাইয়া ফেলে! বৃদ্ধা তখনই স্বহস্তে পরদা টানিয়া বলিল—যাও না। ও মেহের, মেহের···

সত্যেন্দ্র ঘরে ঢুকিল। মেহের শুষ্ক মুখে করুণ নয়নে এইদিকে চাহিয়াই শুইয়াছিল, ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—এসেছ!···মেহের অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল।

আপনার কি হ'য়েছে?

কৈ কিছু না ত···বলিয়া সে অতি ক্ষীণ, অতি করুণ হাসি হাসিল। ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সরে এস, এখানে বস···

সত্যেন্দ্র একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িতেছিল, মেহের কাতরস্বরে বলিল—কেন, এখানে বসবে না বুঝি! ওঃ!···সে যেন কাঁদিয়া ফেলিল।

কেন বসব না?—বলিয়া সত্যেন্দ্র খাটের উপরে উঠিয়া বসিল। মেহের নতমুখে নীরবে বসিয়া ছিল, সত্যেন্দ্র জিজ্ঞাসিল—আপনার ত অসুখ হ'য়েছে বোধ হ'চ্ছে। কি হ'য়েছে তা ত কৈ বলেন না?

কি আবার হবে? কিছু না। কৈ তুমি ত আজ এখনো চুরুট খেলে না? চুরুট আনাব, খাবে?

না—আনতে হ'বে না আমার কাছেই আছে।

আছে ত খাও না, মিনিটে মিনিটে খেতে যে তুমি! এখানে এসে তোমার ক—কষ্ট হ'চ্ছে বুঝি?

কষ্ট হ'বে কেন?—বলিয়া সত্যেন্দ্র পকেট হইতে সিগারেটের কেস্ বাহির করিল; একটি মুখে দিয়া বলিল—আপনার অসুখ হ'ল কবে থেকে? সেদিন ত ভালোই এসেছিলেন।

হ্যাঁ তা এসেছিলুম।—সে এক মুহূর্ত্ত থামিয়া আবার বলিল—অসুখ আমার কিছু নেই আর।

বেশ আছি।—বলিতে বলিতে মেহেরের শুষ্ক অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সত্যেন্দ্রের বুঝিতে বাকী রহিল না যে কি কষ্টেই মেহের এটুকু হাসিই হাসিতে পারিয়াছে।

পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল, সত্যেন্দ্র নীরবে মুখ পান করিতেছিল, মেহের আস্তে আস্তে ফুল বাগটি দিয়া সত্যেন্দ্রের হাতটি ধরিয়া জিজ্ঞাসিল—আচ্ছা বলতে পার কেন এমন হয়?

সত্যেন্দ্র তাহার মুখের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, কিন্তু একটি কথাও আর শুনা গেল না। মেহের চক্ষু মুদিয়া কি ভাবিতেছিল, সত্যেন্দ্র শুষ্ক মুখটি দেখিতে দেখিতে বলিল—কি বলছিলেন?

মেহের চক্ষু মেলিল; একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিল—তোমার সঙ্গে ত সেই দেখা, সেই কতটুকুরই বা? আর সেই একটি দিন মাত্র—তবুও কেন এমন হয়—বলতে পার?

সত্যেন্দ্র বাকী কথাটা শুনিবার আশায় উদ্গ্রীব হইয়া রহিল। কিন্তু অনেকক্ষণ আর কোন কথাই শুনিতে পাইল না। বাহিরে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল, মেহের তাহার হাতটি ছাড়িয়া বলিল—কৈ বললে না?

কি বলিবে? সে যে প্রশ্নটাই বুঝিতে পারে নাই, কি জবাব দিবে?

বলতে পার, একদিনের দেখা, ক'ঘণ্টার আলাপ তা'তে কেন এমন হয়? তুমি আসবে বলেছিলে সেদিন, ক'দিনই ভেবেছি, কখন আসবে?, কবে আসবে? কেন আসবে? আর কেনই বা না আসবে? এত ভাবনা ত কৈ আর কখনো ভেবেছি বলে মনে হয় না। কেন এমন হয় বলতে পারো?

সত্যেন্দ্র নীরব। তাহার পা-টা যেন সিড় সিড় করিতেছিল।

মেহের বলিল—একটা কথা বলব? জবাব দেবে?

সত্যেন্দ্র 'কি' বলিতে গেল, পারিল না। শব্দ মিলেই রহিয়া গেল।

তুমি নিজের ইচ্ছেয় এসেছ? সত্যি বল, ভদ্রতা রাখতে, আমার মনকে প্রবোধ দিতে যা তা বল না—ঠিক করে বল দেখি—স্বেচ্ছায় এসেছ?

স্বেচ্ছায় হই কি! আর ত কেউ-ই...

না, না—সে কথা হ'চ্ছে না। আমি ভাবছি আমি যে আকুল স্বরে সারাটা দিন ডেকেছি, তা কি বিফলে যেতে পারে!—বলিয়া সে মুখ খানি নীচু করিল।

কিছুক্ষণ পরে সত্যেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া স্থিরকণ্ঠে কহিল—আমার কি ইচ্ছে হ'চ্ছে জান! ইচ্ছে হচ্ছে, আমার সব চেয়ে ভাল গানটি, ভালো গলায়, ভালো করে গেয়ে তোমার চরণে...মেহের থামিল, এক মিনিট পরে গদগদ স্বরে বলিল, ভক্ত যেমন করে' ভগবানের নাম গায়, গেয়ে আত্ম-নিবেদন করে দেয়, তেমনি করে একটি গান গাই, কিন্তু আজ আর পারব না! এবার যেদিন আসবে ...একদিন আসবে? না, কবে আসবে বল? কেন ঠিক বলতে পারবে না? সময় নেই?—আছে—তবে আর কি?...আচ্ছা এসো কাল...ঠিক ঠিক্ ঠিক্!

সত্যেন্দ্র রাস্তায় পড়িয়া ঘড়ি দেখিল, ৮টা বাজিয়া গেছে, প্রভাতের আসিবার কথা আছে, সাড়ে সাতটার সময় নিশ্চয়ই আসি বসিয়া আছে, সত্যেন্দ্র মোড়টা ফিরিয়াই ট্যাক্সি ডাকিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আর এক পেয়ালা করে হুকুম কর সত্যেন! হাঁ যা বলছিলুম! খুব বেশী আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই এতে। তুমি যদি হাজারটা অকাট্য নজির আওড়ে যাও, তবুও আমি বিশ্বাস করি যে যে ওদের বুকটা আমাদেরই মত করেই সৃষ্টি হয় নি! সুযোগ পায় না, সুবিধে হয় না, এ সব হ'তে পারে

কিন্তু ওদের পা'ও যে ঐ প্রেমের খানায় পড়ে না এ আমি মানি নে, মান্তে পারি নে। কাজেই তুমি যদি তাদের একজনেরও কাছ থেকে সত্যিই কিছু পেয়ে থাক, আমি তোমাকে অভিনন্দন করছি, বন্ধু, তুমি ভাগ্যবান।

প্রভাত কথাগুলা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়া, ঘন ঘন দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিল। সত্যেন্দ্র ডাক দিল—বেহারা!—তাহ'লে তোমার মতে, হওয়া সম্ভব?

কি হওয়া?—প্রভাত যেন চমকিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই বলিল, Love? হ্যাঁ হ'তে পারে বৈ কি—খুব হ'তে পারে। তবে কম হয় বটে! তার কারণ কি জান? ওটা দিয়েই ওদের ব্যবসা চলে কি-না, তাই কোন্‌টা আসল কোন্‌টা ঝুটো বাছা যায়।

কিন্তু তুমি ত শুন্‌লে···

হ্যাঁ—তা'তে আসল বলেই মনে হয়। দেখ, ওর একটা কারণ আছে। ওদের ব্যবসায় ওরা হুবাহরি লোককে চোখ বুজে ঐটে দিতে থাকে, চোখ বন্ধ থাকার দরুণ কখন কখন দৈবে পা বসে বৈকি!

আচ্ছা প্রভাত, তুই এত জান্‌লি কোত্থেকে?

প্রভাত ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল—জানি, গো আমি।···

কি রকম? কিছু হ'য়েছিল না-কি?·· সেই জন্যেই বুঝি অত ঘন ঘন থিয়েটার যাওয়া হয়?

যা বলেছ।···লাও...লাও, পান লাও···দেখ, সত্যেন, তুই ছোঁড়া বিয়ে করেই সব মাটী করে ফেলেছিস্।

সে কথা আর বল্‌তে।

প্রভাত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলিল—দেখ, এই প্রেম জিনিষটা বিবাহিত লোকদের জন্যে নয়। বিবাহিত লোকে প্রেমের মর্ম্ম বুঝবে কি? জান্‌বে কি? যৌবনের সঙ্গে প্রেম হয়?

সত্যেন্দ্র মনে মনে প্রভাতকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছিল, প্রভাত পুনশ্চ বলিল—তোদের বাপু ও সব পথ বন্ধ! কিন্তু তা'ও বলি, একটু যদি পাশ পরিবর্ত্তন করেও নিস্, আর কালকারদিনে তা বোঝেই হ'বে না ···আচ্ছা ভাই, চলি, কাল থেকে আবার নাইট ডিউটি পড়'বে। তুই ত পান খাস্‌নে ·····গুড গুড বেড়ী গুড নাইট্!

সে রাত্রে সত্যেন্দ্রের নিদ্রা আসিল না। চোখ মুদিলে বেণী করিয়া একখানা মুখ ভাসিয়া উঠে! মুখখানা কি সুন্দর, কে-যেন খুঁদিয়া তুলিয়াছে! চোখ দু'টি কি স্নিগ্ধ, কে-যেন উহার উপরে পদ্মপত্র বুলাইয়া দিয়াছে। সবার বাড়া সুন্দর তাহার মুখের নিম্নে যে একটি সুন্দর বক্ষঃস্থল আছে সেইটি! কি প্রেমপূর্ণ মধুর সে হৃদয়খানি!

কিন্তু কানটা কি ভালো হইতেছে? সুহাস ত কোন দোষ করে নাই! সে যদি শুনিতে পায় তাহার মুখটি কি মলিন হইবে না? তাহার কচি বুকখানি কি ভাঙিয়া যাইবে না? কেন যাইবে? আমি ত অবিশ্বাসী হইতেছি না। ভালোবাসা কি দু'জনকে দেওয়া যায় না?

প্রভাতটা বেশ আছে। ও ত বলেই, বাবা, চুরি বিদ্যেটা বড় বিদ্যে, চলুক না যতদিন চলে। ধরলে ত বেড়ী আছেই। এই যে বিয়ে হ'বার আগে পর্য্যন্ত দু'হাজার বার মার, আর কম করে সাত হাজার মেয়ের মন চুরি করা চল্‌ছে—এমন আনোদেটা তাকবে না বাবা। বিয়েটি করেছ আর ভালুয়ে-মনে গোল্লা! শুধু তাই? কত স্বাধীনতা, কত 'ফ-ই! আহা আজ যদি সত্যেন অন্ধ থাকিত!

পরদিন অপরাহ্ণ হইতেই প্রণয় দেবতা আবার সত্যেন্দ্রকে স্মরণ করিলেন।

এদিন যখন সে পদব্রজে ধীরে ধীরে বিডন উদ্যানের মধ্যে আসিয়া একখানা বেঞ্চে বসিল, তখন তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত, হৃদয়টি ভারাবনত! সত্যেন্দ্র প্রভাতের সেই কথা কটাই ভাবিতেছিল। আসল ভালোবাসা ইহারা বাসে। দশবিশ জনের মধ্যে থেকে, অত লোকের মন রেখে, আগুনে পুড়ে, পিরিটে সিদ্ধ

হ'বে, থাকে যা তা খাটি, একেবারে নিখাদ! উঃ—মেহের ইচ্ছা, মেহের বাইজী করিয়া কম লোকটা আসে ও কিন্তু সকলকেই ভাগায়, না-জানি কত কষ্টই হয়? সত্যেন্দ্র আজ শ দুই টাকা লইয়া গিয়াছিল। গোপনে তাহার হাতে গুঁজিয়া দিবার চেষ্টাও করিয়াছিল, তাহাতে মেহের সেই যে ও-দিকে ফিরিয়া বসিল, আধ ঘণ্টা আর কথাই কহে না। কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। অভাব তাহারই, ভালো-বাসার বিনিময়ে অর্থ! ধিক্!

একবার সত্যেন্দ্রের বাড়ীটি দেখিতে চাহিয়াছে, তাও বলিয়াছে ঢুকব না, দেব-মন্দির কলুষিত করব না, একবার শুধু দেখব, আর—আর আবার গাড়ী থেকে নেমে সেখানকার একটু মাটী তুলে মাথায় দেব।...সত্যেন্দ্র স্বীকার করিয়াছে, কালই দেখাইয়া আনিবে।

আচ্ছা—যখন আসি, মুখটি অমন ভার করিয়া রহিল কেন? কাল দেখাইব বলিয়াছি বলিয়া দুঃখ হইল না-কি? অন্যায় হইয়া গেছে। আজ একখানি গাড়ী আনাইয়া ঘুরিয়া আসিলেই ত হইত। সেই জন্যই বোধ করি...সত্যেন্দ্র উঠিল, সেই পথে ফিরিল।

কিন্তু আর সে গৃহ-প্রবেশ করিতে পারিল না। বাড়ীটা হইতে বামাকণ্ঠের সঙ্গীতের সঙ্গে তবলা, হারমোনিয়ম ও বাঁয়ার মিশ্রিত সুর ভাসিয়া আসিতেছিল, সত্যেন্দ্র সে বাড়ীর আর কাহাকেও চিনিত না, কাহারো গান শুনে নাই। বুঝিতে পারিল না-কে গাহিতেছে?—সে, পাছে কোন মজলিসের সামনে পড়িয়া যায়—অনতি-বিলম্বে গৃহ মুখে চলিতে লাগিল।

ঢুকিলে বেচারার আপশোষের সীমা থাকিত না। তাহার প্রেমময়ী মেহের জান তখন পূর্ণপাত্রটি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মেড়ো বাবুর নাকের কাছে গাহিতেছিল—

এ তুয়া অধরমে হাম...

এ তুয়া...

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাড়ী দেখানো হইয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্র তার পর কয়দিন আর যাইতে পারে নাই—একটি বাল্য বন্ধুর বিবাহ গেল। বন্ধুর ফুলশয্যার রাত্রে প্রভাত অন্যান্য অন্তরঙ্গদের সামনে বসিয়া মেহেরজান-ঘটিত ব্যাপারটা বিবৃত করিল। শুনিয়া অনেকেই জিভটা উপর নীচে নাচাইয়া বার দুই চাক্ চাক্ করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। দু' চারিজনের বেশ সিমপ্যাথীও দেখা গেল; কবি নগেনের উল্লাস দেখি সকলের চেয়ে বেশী। সে সত্যেনকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া ভগ্নাত চিত্তে বলিল—বুঝলো সত্যেন, বেচারাদের কলঙ্ক যদি ঘোচাতে পারিস্। ওদের ঠেলে রেখে সমাজ যে কতদূর পেছিয়ে আছে তা আর বলবার নয়! কিন্তু ভাই যখন যেমন হয়, বল্‌তে হ'বে। আমি রোজ যাব তোর ওখানে। কখন্ থাকিস্ সত্য?

সকালে—

বেশ!

প্রভাত হাসিয়া বলিল—তুই যে বড়ই রহস্য হ'য়ে পড়লি রে নগেন?

নগেন সাড়া দিল না। সে প্রত্যহ সকালে সত্যেনের ওখানেই চা-পাউরুটীর শ্রাদ্ধ করিতে লাগিল; দু'একদিন অতিরিক্ত বেলা হওয়ায় মধ্যাহ্ন ভোজটা ও করিতে হইল। সত্যেনও কবির বেগবতী ভাষার তোড়ের মুখে পড়িয়া অগাধ জলেই ভাসিয়া চলিতেছে।

একদিন সন্ধ্যা হইয়া গেছে, পথে একটু বিলম্ব হইয়া গেল—সত্যেন্দ্র আসিতেই মেহেরজান বলিল—এত দেরী করে আস্‌তে হয়? তা'ও—দেরীই যদি হ'বে একটা খবর পাঠালে না কেন? আমার যে ভেবে ভেবে মাথাটা আবার তেমনি টিপ টিপ করছিল!

সত্যেন্দ্র সস্নেহে বলিল—পথে দেরী হয়ে গেল মেহের!

ছিলাম; পড়তে পড়তে বইটা ছুড়ে ফেলে দিতে হল?

কেন?

কেবল তোমার কথা মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল —উড়ে যাই চলে যাই যেথা মোর পিয় পাই তুমি জানী জান?

না? কেন বলত?

দুজনে বেশ "ওমর খায়েম" পড়তাম। পিও মোর হেথা নাই···এসব ওমর খায়মের—বুঝলে?

আচ্ছা ওমর খৈয়েম ত ইংরেজীতেও বেরিয়েছে, আমি সেইটে পড়ব!

দুধের স্বাদ কি আর ঘোলে মেটে? ইংরেজিতে ওমর এর "ও-ও" নেই। পড়ো না, পড়লে বেয়া হ'য়ে যাবে। বরং জানী শেখ, বেশ দুজনে পড়ব। আজ পড়ছিলাম, আর কি ভাবছিলাম জান?

সত্যেন্দ্র মোহাবিষ্টের মত বলিল—কি?

মেহের ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, বসিয়া বলিল—চল সত্যেন, তোমাতে আমাতে চলে যাই। যাবে?

কোথায়?

যেখানে দু'জন যাবে?

সত্যেন্দ্র ভাবিতেছিল, কোথাও বেড়াইতে যাইবার কথা বলিতেছে। কিন্তু-মিন্তু করিয়া বলিল—হ্যাঁ—তা—

ওঃ—বুঝেছি·····বলিয়া মেহের ম্লানমুখে বসিয়া রহিল।

সত্যেন্দ্র বলিল—কি বুঝেছ, মেহের?

অনেক সাধ্যসাধনার পর মেহের অধরোষ্ঠ ফুলাইয়া কহিল—এই বুঝি তোমার ভালোবাসা। নিষ্ঠুর। না, অন্যায় বলেছি। ছিঃ প্রিয়তম, রাগ করলে? মুখ তোল, তোল। আমি কি তাই বলছি।

সত্যেন্দ্র একটু পরে বলিল—যাবে মেহের?

যাব, যাব, এখনি যাব, এখানকার বাস উঠিয়ে দিয়ে—চল এখনি যাই। এই নাও চাবী, সিন্দুকটা খোল, যা কিছু আছে গুছিয়ে নাও, চল এই মুহূর্তেই যাই। এই নাও চাবী·····

সত্যেন্দ্র চাবীটা হাতে করিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল—সত্যই তুমি কলকাতা ছেড়ে যেতে চাও?

চাই। যদি তুমি যাও। সত্যেন্দ্র চমকিয়া উঠিল, এতখানি সৎসাহসের তাহার একান্তই অভাব ছিল সে চিন্তান্বিত মুখে বসিয়া আছে, মেহের বলিল—কি ভাবছ?—তাহার কণ্ঠস্বরে যেন খানিকটা ধিক্কার মিলিয়াছিল, সত্যেন্দ্র তাহা বুঝিল। একটু ব্যথাও পাইল কিন্তু তবুও সে মনঃস্থির করিতে পারিল না।

কিয়ৎ পরে সত্যেন্দ্র কহিল—কাল বলব মেহের।

বেশ। ভুলবে না?

না, গো না, ভুলব না।

মেহের ঘড়ির দিকে চাহিতে চাহিতে বলিল এর মধ্যে আটটা বেজে গেল! তুমি কাছে থাকলে সময় এত দৌড়োয় কেন বলত? আচ্ছা রুমালের কোণে ও 's' লেখা কেন? তোমার নাম বুঝি? বাঃ বেশ রুমালটি ত! তুমি গন্ধ মাখ-না কেন? মেয়ে মানুষে মাখে! কেন পুরুষ-ও ত···

সত্যেন্দ্র বলিল—আজ উঠি!

কেবল উঠি আর উঠি!

আবার কাল আসব।

একটা কথা, না থাক্—যাও।

সত্যেন্দ্র ছাড়িল না, বলিতেই হইবে। মেহের সত্যেনের হাতখানা তুলিয়া ধীরে ধীরে মুখের কাছে আনিল, তখনি ছাড়িয়া দিয়া বলিল—আমাদের মুখে বিষ আছে, স্পর্শ করো না—এসো।

নগেন শুনিয়া বলিল—বেশ জমেছে তা'হলে বলা

সত্যেন্দ্র রুমালে মুখ মুছিতে যাইবে, ঝন্ ঝন্ শব্দে চাবিটা পড়িয়া গেল। এ চাবী ত তাহার নহে —এ যে মেহেরের সেই রিঙ-টা!

নগেন খুব তারিফ করিয়া বলিল—বাবা, সর্ব্বস্ব ছেড়েছে যে দেখ্‌ছি, মায় চাবি কাঠটি! কিন্তু.. দুই ভাই মেয়ে মানুষেরও অধম।

সত্যেন্দ্র গম্ভীরস্বরে কহিল—কেন?

কেন? চিরকাল ইলোপ্ টিলোপ ঐ পুরুষগুলোই মেয়েদের করতে! তা'কে নেয়ে মানুষে ইলোপ্ করছে—এই কেন, আর কি! নাঃ, এইবার উপন্যাস লিখ্‌তে হ'বে।

কবিতা ছাড়লি?

হাঁ! কবিতা ত হাত পাকাবার জন্যে কি না! পেকে একেবারে টুক্ টুক্ করছে হাতটা, দেখ্‌ছিস্ নে? দেখ সত্য, উপন্যাসের একটা প্লট ঠিক করেছি···আমাদের বাড়ীর সামনের বাড়ীতে একটা ঘরে একজনরা থাকে, স্বামী স্ত্রীতে তারা প্রায় রোজই·····

সত্যেন্দ্র বলিল—থাক্, যথেষ্ট হ'য়েছে। ভদ্রলোকের ঘরে কি-হয়-না-হয় তা শোনবার প্রবৃত্তি তোমার থাকতে পারে, আমার নেই।—বলিয়া সে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে অন্য একটা ঘরে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সত্যেন্দ্র খালি গায়ে বারান্দায় বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছিল, মেহের স্নানের চাকর আসিয়া জরুরী খবর আছে বলিয়া ডাকিয়া লইয়া গেল। পথে কোন কথাই হইল না। সেখানে গিয়া যা শুনিল তা যেমন আশ্চর্য্যজনক তেমনি ভয়াবহ! মেহের নাই, সে তাহার মাসীর বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। তাহার সিন্দুক খুলিয়া কে তাহার পনেরো হাজার টাকার জড়োয়া গহনা বাহির করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অথচ ঘরে রাত্রে মেহের ছিল এবং সিন্দুকের তালা যেমন লাগান থাকে, তেমনই আছে! মেহের সকালে বাড়ী ভাড়া দিবে বলিয়া টাকা বাহির করিতে গিয়া দেখে, চাবী নাই। খুঁজিয়া খুঁজিয়া চাবী যখন পাওয়া গেল না—মাসীর বাড়ী হইতে ডুপ্লিকেট্ চাবী আনাইয়া খুলিতে দেখা গেল, সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে—কিছু নাই।

চাবীটা যে তাহার বেয়ারের ভিতর আছে, সত্যেন্দ্রের তাহা স্মরণ ছিল কিন্তু সে কথা সে বলিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা পড়া করিতেছিল এক বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক, শুনা গেল, সেই মেহেরের মাসী। সে বলিল—হ্যাঁ বাছা, তোমার কাছে নাকি কাল চাবীটা ছিল?

এলোচুলে আর একটী যুবতী মেয়ে অদূরে দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সেই বলিল—ওকথা আবার জিজ্ঞেস করছিস্ কি মাসি? মেহের ত বলে—ওরই কাছে বরাবর চাবী থাকত···

সত্যেন্দ্রের মাথা ঘুরিতেছিল, এত বড় মিথ্যা কথাটার সে প্রতিবাদ করিতেও পারিল না।

মাসী বলিতে লাগিল—তা বাছা, ঠাট্টা তামাসা করে জিনিস পত্তরগুলা রেখেই থাক্ যদি—দিয়ে দাও, ছুঁড়ী কেঁদে কেটে মাথা খুঁড়ে মরছে।

সত্যেন্দ্র অভিভূতকণ্ঠে কহিল—জিনিসপত্তর?

হাঁ গো মশাই, জিনিসপত্তর! বুঝতে পারছেন না বুঝি? বিদেশে নিয়ে যাবেন, রাজরাণী করবেন, কি কি গয়না আছে আর কি কি গড়াতে হ'বে মেহেরের জন্যে যে ক'দিন আগে চাবীটা নিয়ে ছিলেন, মনে নেই?···যুবতী কথা কয়টি বলিতে বলিতে সত্যেন্দ্রের ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সত্যেন্দ্র অভিভূতকণ্ঠে কহিল—আপনারা কি বলছেন?

বলাবলি আর কি বাছা, ছুঁড়ীর জিনিসগুলো পেলেই মিটে যায়! দেখ্‌ছত, এক বাড়ী লোক জড় হ'য়েছে, সবাই ত বল্‌ছে পুলিশে খবর দাও, থানায় নাম লেখাও। সব বেরিয়ে পড়বে—হচ্ছে না ত শুধু ভাবি জন্যে, সে বলে তিনি যদিই নিয়ে থাকেন, ঠাট্টা করেই নিয়েছেন···দেবেন'খন। তা

কথা সত্যি বাছা, ভাল বাসার লোক, অল্প বিস্তি-চাসি করে বৈ কি! করে না!!

সত্যেন্দ্র দৃঢ়স্বরে কহিল—রঙ্গ রহস্যই বলুন আর যাই বলুন—আমি ও সবের কিছুই জানিনে।—সে প্রস্থানোদ্যত হইল।

মাসী তাহার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—কি কথাই বল্লে বাছা! জানিনে। কেন বাছা কেলে-ছারী বাড়াচ্ছ? ভালোয় ভালোয় জিনিষপত্তর গুলো পাঠিয়ে দাও, কেন ভদ্দর লোকের ছেলে পুলিশে দিয়ে লোক ঢলাঢলি করবে? বড় লোকের ছেলে, পয়সা আছে—এসব হীন বৃত্তি কি তোমাদেরসাজে?

সত্যেন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। শেষে চোর অপবাদ! ওঃ! ঘরে এবং বাহিরে কম করিয়া বিশ পঁচিশটি লোকের চোখগুলা তাহাকে একেবারে গিলিয়া খাইতেছিল—সে সাহসে ভর করিয়া, একবার চারিদিক দেখিয়া লইয়া কঠিন স্বরে কহিল—

আপনি বল্‌তে চান্, আমি চুরী করেছি?

তুমি যদি বলাও, বল্‌তে হবে বৈ-কি!

যা খুসী বলুন গে—যান।

মাসী হাসিয়া নন্দীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—ও ভালো কথায় মনিষ্যি ও নয়, বাছা! ওরে বেহারী বড়াল বাবুকে খবর দিয়ে আয় ত রে! দেখ বাছা তোমায় যখন ঢলাঢলি করাই ইচ্ছে, তখন আমিও বলি, বড় শক্ত পাল্লায় পড়েছ বাছা! মেহেরের মাসিটিকে বড় সহজ ভেবো না, পুলিশের বড় সাহেব পর্য্যন্ত মুটোর ভেতর। ঐ হুগলীর বড় সুপারিন্‌টন বাগছি সাহেব হুগলীতে আছেন, তাঁকে ডাকাই.....

যা পারেন করবেন—বলিয়া সত্যেন্দ্র নীচে নামিয়া গেল। তাহার চোখ কাণ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। এ কি ভীষণ আবর্ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িল সে! যদিও সে নির্দ্দোষ, কিন্তু ফাঁসাদ ত বড় অল্প নয়। আর পুলিস। পুলিস কেস্ হইলেই ত দেখা যাইতেছে সর্ব্বনাশ! প্রথমতঃ কাঠগড়ায় দাঁড়ান, বিচারে যাহাই প্রতিপন্ন হোক্‌না। তারপর খবরের কাগজ ওলা। পরদিনই ত দেশময় ঢাক পিটাইয়া দিবে! ভাবিতে ভাবিতে সত্যেন্দ্র স্বীয় অট্টালিকার দ্বার দেশে আসিয়া দাঁড়াইল কিন্তু মনের এইরূপ অবস্থায় গৃহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না—দারওয়ান সেলাম করিয়া কহিল—নগেন বাবু!

সত্যেন্দ্র লাফাইয়া উঠিল—হ্যাঁ?...তবু একজনের সঙ্গে পরামর্শ করা যাইবে! নগেন বলিল—এ সময়টা মেহেরেরসঙ্গে একবার দেখা করা উচিৎ ছিল।

কি করে হ'বে ভাই—সে যে এখানে নেই? আর...থাকলেই বা কি হ'ত—এ-সব কি তার অজ্ঞাত আছে—তুমি ভাব?

তবু একবার.....

দেখা হ'লে কোন কাজ হ'বে মনে কর? তা যদি কর, নগেন, চলো না ভাই পার্ক লেনে সে আছে—শুনেছি, দেখা ক'রে আসি। যাবে ভাই?

নগেন বলিল, যেতে আমার কোনই আপত্তা ছিলনা ভাই, কিন্তু কথাটা কি জান? কবিরা চরিত্র হীন বলে বিশ্বজুড়ে একটা দুর্নাম আছে। সে টা ঘোচাবার একটা চেষ্টা করছি আর...

আরে কাজ নেই, খুব হ'য়েছে। আমার খাট হ'য়েছে, তোমার কাছে বলেছি।—সত্যেন্দ্র রক্তবর্ণ হইয়া বাহির হইয়া গেল। শুনিল, নগেন বলিতেছে আচ্ছা ভাই সত্য, তুমি রাগ করলে, তা কর কিন্তু যদি আজ বন্ধু ... থিয়েটারি চংএ কথা কয়টি বলিয়া সেও বাহির হইয়া গেল।

আহার নাই, চক্ষু নিদ্রা শূন্য হইয়াছে। সত্যেন্দ্র খোপে খাপে বাঘ দেখিতেছে। তিন তিনটা দিন যে কেমন করিয়া কাটিয়াছে, কে আর তা জানিবে, জানে সেই! রাত্রে যদি চক্ষু মুদিয়াছে, কাহার মাথা জোড়া লালপাগড়ী সেই মুদিত চোখের পাতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—তবু সে নির্দ্দোষ। কাল সারা রাত্রি জাগিয়া সে চোর ডাকাতদের মনের কথাই ভাবিয়াছে। তাহারা কি ভাতের গ্রাস গিলিতে

পারে? রাত্রে তাহারা নিদ্রা যায়? না—তাহারা ইহার শতগুণ সংস্রগুণ যন্ত্রণা ভোগ করে?

অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিয়া ফেলিল—সে কালই গিয়া একটা মিটমাট করিয়া আসিবে। এমন করিয়া পারা যায় না! কি আর হইবে? টাকাটা দিয়া দিবে, দিয়া তাহার সেই বিলাত ফেরৎ বন্ধুটির বাপকে চিঠি লেখার মত হিসাব খাতায় লিখিবে—youthful indiscretion যৌবনকালের অবিবেচনা—১৫০০০৲ টাকা।

কিন্তু ব্যাঙ্কে ত এত টাকা নাই। উপায়? মা?...কিন্তু···সত্যেন্দ্র ব্যাঙ্কের খাতা পরীক্ষা করিতেছে, প্রভাত ভীষণরঙ্গ করিতে করিতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—সত্যেন এঁরা এসেছেন···

হাত হইতে খাতা পড়িয়া গেল; সত্যেন কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভাতের হাত দুটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—এসেছে? এসেছে? প্রভাত, প্রভাত? এখানে নয় ভাই, ওদের নিয়ে যাও, আমি এখনি একখানা চেক কেটে···

চেক কেটে কি হে? তোমার শ্বশুর ডকটর···

অ্যাঁ—সত্যেন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি ভেবে ছিলে, পুলিশ?

সত্যেন্দ্র নতমুখ। প্রভাত হাসিয়া বলিল—আর ভয় নাই, ডকটর নন্দী হাওড়ায় নেমেই ভল সাহেব কমিসনারের কাছে গেলেন···

তিনি—তিনি জানেন? সত্যেন্দ্র ঘামিয়া উঠিতেছিল।

তা আর জানেন না! নৈলে এদের আনবেনই বা কেন?

এ তোর কাজ! সত্যেন্দ্র বজ্রমুষ্টিতে প্রভাতের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ঘরের শত্রু বিভীষণ—উঃ! কিন্তু প্রভাত, এই তোর উচিত হ'ল? আমি আমি তোকে বিশ্বাস করে বল্লুম আর···

দোহাই বন্ধু, মিছে কথা, আমাকে বল নি। অন্য কাউকে·····

সেই নগ্ন রাক্ষসটা ...···তাহার দাঁত কিড় মিড় করিতেছিল।

তার জন্যে তুই ভাবিস্ নে সত্যেন! তোর শ্বশুর—বিলেত-ফের্তা লোক, মহা সাহেব! তিনি খুব সহজ ভাবেই নিয়েছেন দেখা গেল, বল্লেন, আমি এখনি ঠিক করে আস্‌ছি। বিলেত থেকে আমাকেই একবার ···...

আর এরা? এরা জানে?

ছোঃ ছোঃ—তুই কি পেলি বল দিকিন আমায়? এরা জানবে কি! আর দেখ, সত্যেন্, ও কেস্ আর হ'বে না বলেই আমার মনে হ'চ্ছে।

কি রকম? কি রকম?

ওরা দেখ্‌ছিল যদি চাপ দিয়ে কিছু আদায় করে নিতে পারে সেই জন্যেই তোকে গোড়াতে বেশ ছেড়েই রেখেছিল। যখন দেখ্‌লে জমেছে তখনি তোর সঙ্গে সরে পড়বার মতলব করলে, কিন্তু দেখ্‌লে তোর তেমন গা নেই—বুঝি বা পাখী উড়ে যায়, তাই যা হয়, এই বেলা নিদেন ঘটটে বাটিটে! ও যে বলছিল হুগলীর সুপারি ঠন ঠন মন ঠন, ওসব বাজে কথা! চারদিন কেটে গেল—দূর! তবে মজা ওর এই টুকু, ছুঁড়ীটে লুকিয়ে রইল কেন? চক্ষু লজ্জা কি এতই বেশী তার? হ'তেও পারে দেখ্‌লে ভালো বাসার অভিনয় অনেক খানি করা হয়ে গেছে, বাস্তবিক একটু চক্ষু লজ্জা হ'বার কথা, তাই মাসীকে ঠেকিয়ে দিয়ে নিজে বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

না, না, পার্ক লেনে—

নিকুচি করেছে তোর পার্ক লেনের! সে খবর বুঝি না নিইছি। ১৯ নম্বরে ম্যাকিনলের হোয়াইট সাহেব থাকে! ও ঐ বাড়ীর মধ্যেই একটা ঘরে লুকিয়ে দেখ্‌ছিল, কত দূর কি হয়। যখন দেখ্‌লে এত মতলব এটেও কিছু হ'ল না তখন আমার তোর

মত এক আধটা গাড়লের সন্ধানে লেগে গেছে—নিশ্চয়। এ—তোর কি মনে হয় রে?

আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু তুই অত জান্‌লি কোত্থেকে বল দিকিনি? সত্যি থিয়েটারে কিছু হ'য়েছিল না নাকি?

হ'য়েছিল তোর মাথা গর্দ্দভ! সবাই তোর মত কি না···

আহা চেঁচাস কেন ভাই।

প্রভাত আরো জোরে বলিতে সুরু করিল—কেন পুরুষ মানুষ ত···

সত্যেন্দ্র আকুলস্বরে বলিল—প্রভাত, তোর দুটি পায়ে পড়ি ভাই, ওদের আর বলিস্ নে। শশুর মশয়কে বলেছ, আর কেন···

কেন ঘরের শত্রু বিভীষণ ত বলেইছ!

কে আবার বিভীষণ হ'ল গো!···বলিতে বলিতে পথশ্রম ক্লান্ত বিমল মুখে আভাস ঘরে ঢুকিল।

সত্যেন্দ্র বিস্মিতস্বরে—বড় দি! কেমন, ভালো ছিলেন? শশুর মহাশয় এসেছেন নাকি?...

হ্যাঁ ভাই এসেছিলেন। কিন্তু তিনি অমনি অমনি শেয়ালদহ থেকে হাজিলিঙ মেল্ ধরতে গেলেন। তোমাকে দুঃখ করতে মানা করলেন...

হ্যাঁ—শেয়ালদহ গেলেন না আরো কিছু! সত্যেন জানে গো জানে—সত্যি কথাটিই বল না?

কি আবার সত্যি কথা? সুবাস এসেছে? সে কি আর ও না বোঝে? কি বল ভাই সত্যেন?

প্রভাত অনেকদূরে চলিয়া গিয়াছিল, সত্যেন্দ্র দেখিয়া শুনিয়া বলিল—হ্যাঁ।

নারী-মঙ্গল

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)

সহস্র অমঙ্গল, অত্যাচার, উপদ্রবের মধ্যেও দেশবাসিগণ দেশ সেবা করিয়া আজ নিজেদের ধন্য মনে করিতেছেন। দেশের নর নারী সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই আজ দেশাত্মবোধের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নারী ও পুরুষ পাশাপাশি হইয়া আজ দেশসেবা-ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশ-জাগরণের এই আন্দোলনকে সার্থক ও সুন্দর করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন।

ভারত তাহার রাজনৈতিক জীবনে ও সমাজ-জীবনে অবসাদগ্রস্ত ও চারিদিক হইতে হীন হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের দায়িত্বপূর্ণ প্রত্যেক কার্য্য হইতে ভারতীয় মহিলাদিগকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া আসিতেছিল। জীবনের অর্দ্ধাংশকে এভাবে দূরে দূরে সরাইয়া রাখিবার জন্য ভারতীয়গণ তাহাদের পূর্ণ-জীবনের যে কত ক্ষতি ও অপমান সহ্য করিয়া আসিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

যে মাতৃজাতি সন্তানের কল্যাণ কামনায় যুগে যুগে সহস্র কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াও সন্তানকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, আজ সন্তানের জীবন হইতে সেই মাতৃশক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার জন্যই ভারতের এমন নীচ অধঃপতিত অবস্থা ঘটিয়াছে। আজ বন্দী স্বামীর জায়ারূপে ও বন্দী সন্তানের মাতারূপে ভারত-রমণিগণ মাতৃজাতির গৌরব মহিমার যে অপূর্ব্ব-চিত্র প্রকাশ করিতেছেন;

তাহা জগতের যে কোন বীর জাতির পক্ষেই অশেষ গৌরব ও সম্মান সূচকই হইত সন্দেহ নাই।

একদিন এই গৌরব-মহিমামণ্ডিত অপূর্ব্ব স্নেহ-করুণা-ভূষিত ভারত-মহিলাগণ নিজ হস্তে স্বামী-পুত্রকে রণসাজে সাজাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন, স্বামী ও পুত্রের সুখের জন্য নিজের সকল সুখ-বিলাস হাসিমুখে স্বচ্ছন্দ-মনে বর্জ্জন করিয়াই সুখ উপভোগ করিয়াছেন, স্বামী ও পুত্রের সুখ-সম্মানই নিজেদের পরম-সৌভাগ্য মনে করিয়াছেন, আজও ভারত-মহিলা যে তেমনি আদর্শস্থানীয় রহিয়াছেন, নানাকার্য্যে আমরা তাহার বিশেষ প্রমাণ পাইতেছি।

দেশ জাগরণের এই শুভ মুহূর্ত্তে দেশের এই সঙ্কট সময়ে আজ দেশের পুরুষদিগকে পূর্ণভাবে নারীদিগকে তাহাদিগের সহায় করিয়া লইতে হইবে। সমাজ-জীবনে ও জাতীয়-জীবনে দেশের নারী ও পুরুষকে একযোগে কার্য্য করিয়া লইতে হইবে। তবে দেশের সমাজ-জীবন ও জাতীয়-জীবন আবার সুখ-সৌন্দর্য্যে পূর্ণ এবং ধন্য হইয়া উঠিবে। জাতীয়-জীবনের এই সন্ধিক্ষণে দেশের পুরুষ-সমাজ যদি নারীকে তেমন ভাবে সঙ্গিনী করিয়া লইতে না পারে, তাহাদের মাতা, ভগিনী, পত্নী ও কন্যার লাঞ্ছনা ও অপমান দেখিয়াই যদি তৃপ্তি বোধ করে; তবে এ জাতি সমাজ-জীবনে ও দেশ-জীবনে কোন কার্য্যই করিতে সক্ষম হইবে না।

দেশবাসিগণ আজ অত্যাচার ও বন্ধনের হাত হইতে মুক্তিলাভের আশাতেই মহাত্মার প্রবর্ত্তিত এই আন্দোলনে সাগ্রহে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। জগৎ-পূজ্য মহাত্মা একাকী এ আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েন নাই, সঙ্গে তাঁহার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী রহিয়াছেন; ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত মতিলাল বা চিত্তরঞ্জনের সহধর্ম্মিণীরাও স্বামীর কার্য্যে তাঁহাদের সহায়রূপে দাঁড়াইয়াছেন। মৌলানা মহম্মদ আলী ও সৌকৎ-আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতা ও পত্নী তাঁহাদের পার্শ্বে হাসিমুখে দণ্ডায়মান, দেশের কার্য্যে নারীশক্তির সহায়তা কতখানি প্রয়োজন তাহা দেশনেতৃগণের মাতা ও সহধর্ম্মিণীরা তাহা পদে পদে দেশবাসীকে দেখাইয়া দিতেছেন।

দেশের রাজনৈতিক জীবনের ব্যর্থতায় ও ত্রুটিতে দেশের সমাজ-জীবনও পূর্ণভাবে গঠিত হইতে পারে না, সমাজ-জীবন পূর্ণভাবে গঠিত হওয়ার অবকাশ না পাইলে দেশবাসিগণের দ্বারা কোন মহৎ-কার্য্য সাধন হওয়াও সম্ভবপর নহে। দেশের সমাজ-জীবন হইতে সুপুত্র, সুকন্যা গঠিত হইয়া উঠে, এই সব পুত্র কন্যাদের দ্বারাই পরে দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়। নারীকে অবহেলার চক্ষে দেখিয়া, তাহাদিগকে সমাজ-জীবনে লাঞ্ছনা ও অপমানের হস্তে নিক্ষেপ করিয়া আমরা দেশের পুরুষগণ সমাজ-জীবনে ও জাতীয়-জীবনের যে দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়াছি; আজ তাহা বুঝিয়া এখনও যদি আমরা আমাদের সে দোষ সংশোধনের চেষ্টা করি, তবে আজও দেশের সমাজ-জীবন আবার তেমনি সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিব।

নারী যে সমাজ-জীবনে প্রাণহীন কোন একটা বস্তু নহে—তাহারও যে হৃদয় আছে—দেশ ও জাতিকে গড়িয়া তুলিবার কার্য্যে তাহারও যে বিশেষ অধিকার আছে, তাহা আজ নারীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই অধিকার লাভের জন্য তাহাকে যোগ্যতা অর্জ্জনের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে, সর্ব্বকার্য্যে ও সর্ব্ববিষয়ে নারীকে দেশ-বাসীর যোগ্য সঙ্গিনীর আসন দিতে হইবে। ভারতের বিভিন্ন দেশে, আজ মাতৃজাতি প্রচার-কার্য্যে ব্যাপৃতা হইয়াছেন, এই প্রচার কার্য্যে তাঁহাদিগকে সকলের আগে দেশের নারীদিগের প্রাণ-শক্তিকে সজাগ করিয়া তুলিতে হইবে। সে প্রাণে আশা ও ভাষা দিতে হইবে, অত্যাচার সহনের ও বহনের ক্ষমতা নারীদের আর অর্জ্জন না করিলেও চলিবে, অত্যাচার সহিতে সহিতে দেশের নারীগণ

পাষাণ প্রস্তরের মত হইয়া গিয়াছেন, সমাজ-জীবনে নারীদের প্রাণ-স্পন্দনের সাড়া আমরা যেন আর পাই না। নারীদিগের মধ্যে আজ সেই প্রাণের স্পন্দন জাগাইয়া তুলিতে হইবে, তবে নারীর নারীত্ব গৌরব-মণ্ডিত হইবে, তবে ভারতের সমাজ-জীবনও রাজনৈতিক-জীবন আবার নব নারীর মিলনে পূর্ণ ও শ্রী-সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিবে। নারী-বন্দন গান আজ জাতি ভুলিয়া গিয়াছে, দেশের নারীরাও আজ তাঁহাদের গৌরব-মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়াছেন, তাই দেশের সমাজ-জীবন ও রাজনৈতিক-জীবনের আজ এই দুর্দ্দশা, তাই দেশের নারীরা আজ হারি ভুলিয়া গিয়াছেন, তাই তাঁহাদের প্রাণ-স্পন্দনের পরিচয় আর আমরা পাই না। নারীও যে জীবন্ত প্রাণী তাঁহারও যে সত্য প্রাণ আছে—সে প্রাণের যে যথেষ্ট কার্য্যকরীশক্তি আছে, আজ নারীদিগের নিকট আমরা সেই পরিচয় পাইতে চাহি। ততটুকু আত্মবোধ নারীদিগের মধ্যে জাগিলেই আর কেহ নারীনিগ্রহ বা নারীদিগের আত্মহত্যার খবর শুনিয়া দেশের দুর্ভাগ্য পুরুষদের শিরোভূষণ হইতে হইবে না। প্রতিকারের ভার মাতৃজাতিকে স্বহস্তে গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহাদের আত্মবোধ ও আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের হতভাগা সন্তানদেরও আত্মবোধ ফিরিয়া আসিবে, তাহারা আবার মাতৃ-জাতির আদর ও সম্মান করিতে শিখিবে।

স্বামী-ভাগ্য

(গল্প)

(শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু বি, এল)

উর্ণনাভ আপনার জালে আপনি জড়াইয়া পড়ে। মানুষ সমাজ গঠন করিয়া নিজকে বাসর শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছে। সমাজের আবশ্যক মনে নাই। কিন্তু তাহার নিয়মগুলি তাঁহার উদ্দেশ্য ছাড়া হইয়া মানুষকে জড়াইয়া পড়িয়া আছে। সমাজ কেন, তাহার স্থিরতা নাই। নিয়মের প্রয়োজনীয়তা, তাহার বিশিষ্ট সত্তার কারণ, মানুষ যুক্তির উপর যুক্তি দিয়া মিথ্যার জালে চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

সমাজের বিচার করিয়া কি হইবে? বুঝিতে পারি নাই কাহার অপরাধে এ জীবনের মত প্রতি মুহূর্ত্তে নিদারুণ যাতনা সহ্য করিতে বাধ্য হইলাম। লোকে পূর্ব্বজন্মের দোষ দেয়। সে যুক্তির দ্বারা অপরকে বুঝাইবার চেষ্টা করা যায়; কিন্তু তাহাতে নিজের প্রাণে কোনও শান্তি পাওয়া যায় কি? যেখানে পরিষ্কার দেখিতে পাই আমার কোন অপরাধ নাই, সেখানে সৃষ্টির বাহিরের খোঁজ লইয়া অন্ধকারের আবরণে সৃষ্টিকে ঘিরিয়া মিথ্যা সান্ত্বনার আশায় শুধু ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রাণ হওয়া সার। এদিকে প্রতিনিয়ত শাস্তির তীব্রতা কিছুমাত্র কমিবার সম্ভাবনা ত দেখি না।

শুনিয়াছি লোকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। সে কি এর চাইতেও কষ্টকর? মানুষের যখন আশা থাকে না, তখনই নাকি মানুষ অতি তীব্র যাতনা অনুভব করে। এমন অবস্থা নাকি মানুষের জীবনে সাধারণতঃ কখন হয় না। গভীর জঙ্গলে বাঘের মুখে পড়িয়াও মানুষ সে মুহূর্ত্তেও জীবনের আশা ত্যাগ করে না। অতল সমুদ্রে জাহাজ ডুবি হইলেও মানুষ বাঁচিবার আশা রাখে। এ পৃথিবীতে আশাহীন হইবার একমাত্র উদাহরণ নাকি ফাঁসির হুকুমের পর। কারণ শাসকের কঠোর আইন,

পাথরের দেওয়াল, খাড়া প্রহরী, সেখান হইতে উদ্ধারের কোন উপায় কল্পনা করা যায় না। তবুও সে সংসারে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া মরিতে পারে। কিন্তু আমি? যাই বিপ্লবে কয়েদী মুক্তি লাভ করিতে পারে, রাজ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, কোন রাজ-উৎসবে কয়েদী ক্ষমা পাইতে পারে; অথবা সে তাহার নিজের অপরাধের পরিমাণ করিয়া যদি ভগবান কেহ থাকেন, তাঁহার কাছে আত্ম-নিবেদন করিয়া মনুষ্য করিতে এক প্রকার মানসিক শান্তির চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু আমি কি করিব? এ বিশ্ব-সংসারে এমন কি ব্যবস্থা মনুষ্যের কল্পনায় আসিতে পারে, যাহাতে আমি অন্ততঃ এক তিলেকও তরেও অন্তরের অন্তরে একটু শান্তি পাইতে পারি?

আমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে। পিতা আমার পাড়াগাঁয়ে ভদ্রিয়া কুঁড়ে ঘরে বাস করিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। সম্পত্তি বলিতে কিছুই ছিল না। অতি কষ্টে গ্রামে বসিয়া অন্ন জুটিত। কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ের বিয়ে ত তাতে হয় না। রূপ থাকলেও হয় না। কারণ বাঙ্গালী রূপের আদর করা যে একটা মানসিক নীচতার পরিচায়ক, তাহা সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে শিখিয়া ফেলিয়াছে। আর গুণ, তাহার পরিমাণ কেহ করিতে পারে না। কারণ বিবাহের পূর্ব্বে তাহার পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। আর যে বয়সে মেয়ের বিবাহ হয়, সে বয়সে গুণের হিসাব করিতে যাওয়া বড় শোভন হয় না। তবুও সকল মেয়েই আজকাল একটু লেখাপড়া শেখে। আমরা দুইটী বোনও শিখিয়াছিলাম। শিশুশিক্ষা, বোধদয় এবং কার্ষ্টবুকের কয়েক পৃষ্ঠা আমরাও পড়িয়াছিলাম। সূচের কাজও কিছু কিছু মায়ের কাছে বসিয়া বসিয়া করিতাম, রান্নাঘরে সব সময়েই প্রায় মাকে সাহায্য করিতাম। কোন কোন সময় নিজেরাই সব কাজ সারিতাম। কিন্তু ইহাতে ত বিবাহ হয় না। এ হিসাব কেহ ত চায় না? তাই আমাদেরও বয়স বাড়িতে লাগিল, আর বাবারও যেন দুঃখের ভার শরীর ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল। দাদা স্কুলে যাইতেন। আমাদের মাঝে মাঝে একটু একটু পড়াইয়া দিতেন। কত গল্প বলিয়া শুনাইতেন। তাঁহার পর্য্যন্ত যেন কেমন ভাবান্তর হইতে লাগিল। শুনিলাম তাঁহার আর পড়া চলিবে না চাকরী করিতে হইবে। মা আমাদের উপর দিন দিন বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। প্রায় সব সময়ই তিরস্কার করিতেন। আমরা বালিকা বয়সেই বুঝিয়া ফেলিলাম, আমরা সংসারে মূর্ত্তিমান অভিশাপ।

দিদির সম্বন্ধ আসিল। সহজেই বেশ ভাল বিবাহ হইল। তাহাদের অবস্থা ভাল। তাই অর্থের জন্য বিশেষ লোভ করে নাই। আর তাহারা বোধ হয় চরিত্র-নীতি-শাস্ত্রের বিপুল প্রবাহে পড়িয়া স্ত্রীলোকের রূপ একেবারে অগ্রাহ্য করিতে শেখে নাই। অথবা হয়ত জন্মান্তর বলিয়া কিছু আছে, এবং দিদির কিছু সুকৃতি ছিল।

এত সহজে একটী কন্যা এমন সুন্দরভাবে পার হওয়ায়, আমাদের সংসারে সহসা বেশ একটী আনন্দের ধারা বহিয়া গেল। বাবার যেমন পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। মায়ের মুখে আবার হাসি দেখিলাম। দাদাও যেন আবার পড়াশুনায় মন দিলেন। তারপর চেষ্টা হইতে লাগিল আমাকে পার করিবার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। কিন্তু মনের মত কাহারও হয় না। এদিকে দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। আর এ হতভাগিনীর শরীর দ্রুত বাড়িয়া যাইতে লাগিল। বয়স গোপন করিয়া, একটু বাড় বেশী বলিয়াও আর ত চলে না। তখন যেন উপন্যাসের রাজার মত 'কাল সকালে যাকে প্রথমে দেখ্‌ব তার সাথেই বিয়ে দোব' গোছ প্রতিজ্ঞা চলিতে লাগিল। তার পর একদিন সন্ধ্যাকালে আমিও একজন যুবা পুরুষের চারিধারে সাতবার ঘুরিয়া বাবাকে রক্ষা করিয়া সমাজের মান বজায় রাখিলাম। রক্ষা সব

ঠিক হইল, কেবল আমার কি হইল তাহা আজও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

যে বিবাহ হইল তাহাতে বাবার কোন দোষ দিতে পারি না। তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন তাঁহার পূর্ব্বে আর একবার বিবাহ হইয়াছিল। সে স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে, তাই আমাকে অনুগ্রহ করিয়া উদ্ধার করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছে। তবু তাঁহার বয়স বেশী নয়। বোধ হয় পঁচিশের বেশী হইবে না। দেখিতে সেরা সুপুরুষ না হইলেও, সুশ্রী বটেন। বাড়ীর অবস্থা ভাল। অতএব সকলেই মনে করিলেন যে দিদির চাইতে আমার ভাগ্য কোন অংশে মন্দ নহে। লেখাপড়া তিনি বেশী করেন নাই। তবে তাঁহার নিরক্ষর অবস্থা কত দূর হইতে পারে ভদ্রলোকের ছেলেরা সেটা কেহ বিচার করিয়া দেখিবার দরকার মনে করে না। আর পুরুষ ছেলে, ঘরে খাইবার আছে,—এ অবস্থায় বাঙ্গালা দেশে বিবাহের বাজারে তাহার দর বড় কম হয় না। কন্যা শুনিতে পাই আজকাল অনেকে পাশ করা অকর্ম্মা ছেলের চাইতে এইরূপ ছেলেই পছন্দ করেন। এ কথা কেহ ভাবিয়া দেখেন না যে অল্প সহজে ছুটিতে পারে। কিন্তু সামাজিক শৃঙ্খলার খাতিরে ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ মানুষের অন্তঃকরণটীকে বাঙ্গালার হিন্দু অবহেলে বলিদান করিয়াছে। এত বড় বলিদানের ফলে কতটুকু শৃঙ্খলা বজায় আছে জানি না। অন্যই বা কত সহজে গলার ভিতর নামিয়া যাইতেছে তাহাও বুঝিতে পারি নাই।

আমার শ্বশুর বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রের যথেষ্ট যশোগান করিয়াছিলেন। অবশ্য পিতা মাত্রেই পুত্রকে সুন্দর দেখেন। কিন্তু অতি রঞ্জনের মাত্রা হিসাব ছাড়াইয়া গেলে লোকের সন্দেহ আসিতে পারে। তবে আমার পিতার সাদা বুদ্ধিতে এবং আমার সৌভাগ্যের স্বপ্নে তিনি সে সব তখন ধরিতে পারেন নাই। আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া অন্তঃকরণে ব্যথা পাইবার জন্য আজ আর তিনি ইহলোকে উপস্থিত নাই। দাঁতে দাঁত চাপিয়া রাখিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহার জীবনের কয়টা দিনের সুখে ব্যাঘাত জন্মাই নাই। কিন্তু আজ অসহ্য। কাহাকে আমার অন্তরের ব্যথা শুনাই?

বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছিলাম। সেবার মাত্র দুই চারিদিন ছিলাম। নব বধূর অবশ্য আদরের কোন অভাব হয় নাই। কিন্তু স্বামীর সহিত আমার সে কয়দিনের ভিতর সাক্ষাৎ লাভ ঘটে নাই। স্বামীর সহিত আমার সম্বন্ধ কি তখনও আমি বুঝি নাই। আজও কিছু বুঝিয়াছি কি না তাহা বলিতে পারি না। তখন বুঝি নাই তাহাতে সুবিধাই হইয়াছিল। কারণ তাহাতে অদর্শনে যে কি দুঃখ তাহাও কিছু বুঝি নাই।

বাপের বাড়ী আসিয়া প্রায় তিন মাস কাটাইলাম। সমবয়সীদের নিকট স্বামীর গল্প করিবার আমার কিছুই ছিল না। তাহারা আমাকে 'বর চাপা মেয়ে' বলিয়া ঠাট্টা করিত। আমি বুঝিতে পারিতাম না কি তাহাদিগকে গোপন করিতেছি। কিন্তু মনে মনে একটু একটু বুঝিতে পারিতেছিলাম যে আমার জীবনে এমন একটা কিছু ঘোর হইয়া গিয়াছে যাহার জন্য অন্যের জীবনে আর আমার জীবনে একটা মস্ত পার্থক্য হইয়া যাইতেছে। সেটা কি তাহা কখনও ঠিক বুঝি নাই। তাই তখনও চিন্তার বোঝা সকল জীবন চাপিয়া বসে নাই।

সহসা একদিন দুপুর বেলা স্বামী আমার আসিয়া হাজির হইলেন। জামাই আসিয়াছেন সকলে ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি অন্যত্র আহারাদি করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া আর আয়োজন করিতে দিলেন না। পর দিন আমাকে লইয়া যাইবেন জানাইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। রাত্রিতে তাঁহার খাওয়ার আয়োজন যথেষ্ট হইল। সন্ধ্যা হইতে দিদি আমাকে কত রকমে সাজাইলেন। আমিও মনে মনে কবিত্ব আঁকিয়াছিলাম কি ঠিক মনে

নাই। কিন্তু সব আয়োজনই সাঙ্গ হইল। দিদি আমাকে লইয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত বসিয়াছিলেন। তার পর তিনি ঢুলিতে ঢুলিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন, বাবাও অনেকক্ষণ ঘর বার করিলেন। তার পর মা আসিয়া দিদিকে ডাকিয়া দিয়া আমাকে ঘুমাইতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি দিদির খোকাকে কোলে করিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। ভাবনাগুলির মধ্যে বোধ হয় একটা অস্বস্তি ছিল। অন্তরে বোধ হয় একটা উদ্বেগ ছিল। তিনি আসিলে কি সুখী হইতাম জানি না কিন্তু যাঁহার আসিবার অপেক্ষায় বাড়ী শুদ্ধ সকলেই ব্যস্ত, বোধ হয় তিনি আসিলে প্রাণে তৃপ্তি পাইব বলিয়া আশা হইয়াছিল। তবে ভাবনা অনেকটা এলোমেলো, সকল রকমের সঙ্গতি তাহাতে ছিল না। আশা-আকাঙ্খা, আগ্রহ-আবেশ সকলগুলি মিলাইতে মিলাইতে সমস্ত ভুলিয়া কখন যেন ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকালে তিনি আসিলেন। শুনিলাম কোন বন্ধু গৃহে রাত্রে নিমন্ত্রণ খাইয়া সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। তার পর, দিন দেখা নাই, যেন একটু রাগের ভাবেই সেইদিনই দ্বিপ্রহরে আমাকে লইয়া রওনা হইলেন। পিতামাতা অসন্তুষ্ট হইলেন, অনেক নিষেধ করিলেন। তার পর, স্বামীর সহিত যাইব তাহাতে আবার দোষ কি? তাই শুছাইয়া দুর্গা নাম করিয়া আমাকে রওনা করিয়া দিলেন! আমি চলিলাম। কোথায় চলিলাম?

ষ্টীমারে আসিয়া যেখানে নামিলাম, সেখান হইতে শ্বশুরবাড়ী নৌকাযোগে যাইতে হয়। সেদিন সন্ধ্যার সময় আর সেখান হইতে রওনা না হইয়া আমার শ্বশুরের মাতুলালয়ে যাইয়া উঠিলাম। স্বামী আমার বাড়ীর ভিতর পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন তাহা জানি না। সে রাত্রে তাঁহাকে আর দেখিলাম না। আমাকে আদর করিয়া ঘরে তুলিলেন—বৃদ্ধা দিদি-শাশুড়ী। দাদা মহাশয় আসিয়া স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কোথায় গিয়াছেন কেহ বলিতে না পারায় তিনি একটু অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করিলেন। তাহাতে আমি ঠিক তখনও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সে দিন রাত্রে আনন্দে দিদিমার কোলে ঘুমাইয়াছিলাম।

পরদিন রওনা হইবার সময় দাদামহাশয় আমার গলার হার ছড়া ও হাতের বালা দুগাছি খুলিয়া রাখিলেন। সন্ধ্যার পর শ্বশুর বাড়ী পৌঁছিলাম। দেখিলাম সেখানে কেহই আমাদের আসিবার খবর জানিতেন না। শাশুড়ী আমাকে নিরাভরণা দেখিয়া সহসার খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। দাদা-মহাশয় রাখিয়া দিয়াছেন শুনিয়া একটু হাসিলেন, বিশেষ কিছু বলিলেন না।

শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছি। খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে, আমার বড়ুয়া আমাকে এক ঘরে একা রাখিয়া গেলেন। স্বামীর আমার তখন পর্য্যন্ত কোন খবর পাইলাম না। আমি পতিদর্শন আকাঙ্খায় শয্যার উপর অনেক রাত্র পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিলাম। প্রথমে ভাবিলাম হয়ত কোন বন্ধু গৃহে খেলাধুলা করিতেছেন। তার পর কত কি ভাবিতে লাগিলাম আজ তাহা ভাবিয়া বলিতে পারি না। বসিয়া থাকিতে থাকিতে তন্দ্রা বোধ হইতে লাগিল। তবুও আশায় আশায় ঘুমকে দূরে রাখিতে লাগিলাম। ঘুমাইয়া পড়িবার ভয়ে বসিয়াই থাকিলাম। বোধ হয় দুপুর রাত্র অতীত হইয়া গেলে, স্বামী আমার ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার প্রথম সম্ভাষণে আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল। কথাটা কেমন যেন একটু জড়ান। কি একটা প্রথমে বলিলেন—তাহা আমি ভাল করিয়া শুনিতে পাই নাই। শব্দটা কানে গিয়াছে, কথাগুলি পরিষ্কার ধরিতে পারি নাই। কিন্তু ঘুম পরিষ্কার কাটিয়া গেলে কাণে গেল 'তোমার কাছে টাকা আছে না?'—এই আমার জীবনের প্রথম স্বামী-সম্ভাষণ। ইহাকেই কি প্রেম-সম্ভাষণ বলে?—

আমি উত্তর দিতে পারিলাম না। একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ নীচু করিলাম। তাঁহার চেহারায় কি যেন একটা দেখিলাম। আমারও ভাল লাগিল না। তিনি আবার বলিলেন, 'উত্তর দিচ্ছ না যে?' তবুও আমি বিছানার দিকে চাহিয়া থাকিলাম। তিনি আমাকে একটা ঝাঁকি দিলেন। আমি আর একবার তাঁহার দিকে চাহিলাম। আমার যেন কেমন ভয় করিতে লাগিল। আস্তে আস্তে বলিলাম, "এত রাত্রে টাকা দিয়ে কি হবে?" "কি হবে এখনও বোঝ নি—মদ খাবো?" আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। মাথা নীচু করিয়া দুই হাতে বিছানার উপর দিয়া বসিয়া থাকিলাম। আমি মাতালের পত্নী! আর কতদূর—তাহা জানি না! কিন্তু দারুণ মাতাল, তাহা ত চোখে দেখিলাম। পৃথিবীর সমস্ত সুখ আশা আমার এই পর্য্যন্ত। চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। বিছানাতেও দুই এক ফোঁটা জল পড়িল। হাত উঠাইয়া মুছিতেও পারিলাম না। আমার সংসার প্রবেশের মুখেই এই যে আমার সকল জীবনের শেষ তা এই চোখের জলে পরিষ্কার হইল। আমার এ মনুষ্য-জীবনের চরম কল্পনা কেহ দেখে নাই। একটা সান্ত্বনার কথা বলিবার সেখানে কাহাকে পাই নাই। আমার চোখ মুখ দিয়া আগুন ছুটিয়া আসিতে লাগিল। তিনি আবার বলিলেন—'কি গো, আর কত রাগ করবে?' একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িলাম। যেন একটা জোর বোধ হইল। বিছানা ছাড়িয়া চোখ মুছিলাম। তিনি বলিলেন, 'ও সব মুখ কান্না এখন রাখ। ভাল মানুষটীর মত গোটাকয়েক টাকা বের কর।' আমি আস্তে আস্তে উত্তর দিলাম, 'বাক্স ত ও ঘরে।' 'বেশ! গয়না দিয়ে এলে দাদা মশাইকে। আর বাক্স রেখে এলে ও ঘরে। তবে তোমারই বা এ ঘরে আসার দরকার ছিল কি?' অবশ্য কিছুই না। তবে উত্তর দিলাম না। তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন 'বেরোও, বাক্স নিয়ে এস!' আমি যেমন বসিয়াছিলাম তেমনিই থাকিলাম। কিন্তু তাঁহার গর্জ্জন শুনিয়া অপর ঘর হইতে শাশুড়ী উত্তর করিলেন, "ওরে সুবোধ কি হয়েছে রে?" "ওর বাক্সটা ও ঘরে রেখেছে কেন?" "এত রাত্রে তুই বাক্স দিয়ে কি কর্‌বি?" আমার যা খুসি তাই করব।" "এখন বাক্স পাবিনে। রাত অনেক হয়েছে, এখন ঘুমো।"

একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, "আচ্ছা, দেখা যাবে।" বলিয়া তিনি রাগে গর গর করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। যেন একটা স্বস্তি বোধ করিলাম। কিন্তু ঘুম তখন সে রাত্রের মতন বিদায় লইয়াছে। জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আকাশে একটু খানি এক্‌খানা চাঁদ একটু একটু আলো দিতেছিল। আর একটু একটু ঝির ঝির করে বাতাস আসিয়া আমাকে তখনকার মত বাহ্যিক শান্তি দিল। বুকের পাঁজর ভাঙ্গা একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস সেই বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া গেল। জানি না কে সেই বিধাতা পুরুষ? জানি না তাঁর কাছে এ ব্যথার বাতাস যাইয়া পৌঁছে কি না।

সেই খোলা জানালায় মাথা রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। অতি ধীরে দরজা খুলিয়া কে যেন ঘরে ঢুকিল। স্বামী কি? ফিরিয়া চাহিলাম না। একটু পরে কে যেন আমার ঘাড়ে হাত রাখিল। চাহিয়া দেখি—পিছনে আমার বড়জা। আমি তাঁহার মুখের দিকে দুই চোখ চাহিয়া তাকাইয়া থাকিলাম। দেখিলাম তিনি মাতৃ-স্বরূপিনী। অন্তরের ভিতর গোলমাল হইয়া গেল। আবার চোখ ভিজিয়া আসিল। মুখ নীচু করিয়া দুই হাত দিয়া কাপড়ে মুখ ঢাকিলাম। তিনি বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। আমার যেন বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া রাখিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ তিনিও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনিও কি কাঁদিতেছিলেন? বড় আর্দ্র স্বরে বলিলেন, "ছোট

বই, চল আমার কাছে ঘুমোবি।" ঘুম! অমের মত কি ঘুমের শেষ হয়নি? কিন্তু কথাত বলিতে কখনও শিখি নাই। তিনি আমার হাত ধরিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

কষ্ট যদি শুধু মানসিক হয়, তাহা হইলে সহানুভূতিপূর্ণ স্নেহ-পরশে অনেক সান্ত্বনা পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে কষ্ট অনেকটা শারীরিক যাতনার উপর নির্ভর করে, সেখানে শুধু নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি বিশেষ কার্য্যকরী নয়। আমার বড়জায়ের মধুর স্বভাবের পাশে বসিয়া কাঁদিবার অবসর পাইতাম। কিন্তু নিত্য যে উৎপীড়ন সহ্য করিতাম তিনি তাহার কিছুই করিতে পারিতেন না। তাঁহার কাছে যাহা শুনিতাম, এবং তাহা হইতে যাহা বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য ভয় বড় বাড়িয়া গেল। স্বামী আমাকে গালাগালি দিতেন, কোন কোন দিন লাথি কিল দিয়াছেন। আমি তাহা নীরবে সহ্য করিয়াছি। কান্নার দলা বুকে ধরিয়া চাপিয়া রাখিয়াছি। তাঁহারই বিকট চীৎকারে শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, বড়জা দৌড়াইয়া আসিয়াছেন। কোন দিন তিনি রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কোন দিন তাঁহারা আমাকে অপর ঘরে লইয়া গিয়াছেন। স্বামী আমাকে বিবাহ করেন নাই। আমাকে বিবাহ করিবার তাঁহার দরকারও ছিল না। ছেলে বেলা হইতে সজ্ঞোগে যতদূর হইবার দুর্বৃত্ত দুশ্চরিত্র হইয়াছেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই। রোগে ভুগিয়া মরিবার সৌভাগ্য তাহার হয় নাই। নিজ হাতে সে তাহার ইহকালের ব্যবস্থা শেষ করিয়া লইয়াছে। আর আমি আসিয়াছি আজ তাহার বাকী বোঝাটুকু বহিবার জন্য। শ্বশুর মহাশয় পুত্রকে একবার বিবাহ দিয়া তৃপ্ত হন নাই। বয়স্থা সুন্দরী পত্নী পাইলে পুত্রের চরিত্র সারিয়া যাইবে বলিয়া, আমাকে দিয়া দ্বিতীয় পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন। একবারে তাঁহার শিক্ষা হয় নাই। মানুষ এত ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া এমন করিয়া অন্ধ হয় কেন? এদিকে তাহার পুত্রটী পত্নী হইলেই একটা দুগ্ধবতী গাভী পাওয়া যাইবে ভাবিয়া আহ্লাদে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে। বিবাহের পর চরিত্রের গুণ তাঁহার অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। মদের পয়সা সব সময় জোটে না; তাই অধিক সময় গাঁজায় শিব হইয়া থাকেন। বাড়ীর ধারে অবশ্য খুব কমই আসেন। ভাসুর ঠাকুর খুব গালাগালি করেন। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় তাহাতে অসন্তুষ্ট। তাঁহার মতে উঁহাকে কেহ কিছু বলিলে আরও বিগড়াইয়া যাইবেন। 'বউমা যদি প্রকৃত সতী লক্ষ্মী হন, তাহা-হইলে অবশ্যই সুবোধ ফিরিবে। বউমা যেন স্বামীর প্রতি কখন কোন দুর্ব্যবহার না করেন। মারুক ধরুক মোটেই কথা বলিবেন না।' ধন্য সতীত্বের মহিমা,—ধন্য সতীত্বের ধারণা, আর ধন্য আমাদের সামাজিক আদর্শ। যদি কখনও আমাদের এ পোড়াদেশ মুক্তি পায়, তাহা হইলে মুক্ত হইবে কাহারা?—জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে এদেশের লোক অন্তরের কোন আদর্শ লইয়া জীবন-যাপন করে, আর কাহাকে কোন আদর্শ প্রতিপালন করিয়া থাকে! ব্যক্তিগত স্বার্থ কল্পনার উপর স্বর্গ শান্তির আদর্শ ও ধার্ম্মিক নির্ব্বাণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যাখ্যা করিয়া যে সমাজ, সেখানে প্রকৃত পক্ষে মনুষ্যত্বের আদর্শের কি অতি পাশবিক ব্যভিচার হইতেছে না?

জীবন নাকি দুঃখময়! সেই কথা প্রমাণ করিতে নাকি অনেক বড় বড় দার্শনিকের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। পুঁথি লইয়া হাঁ করিয়া পাত্রাধার তৈল কি তৈলাধার পাত্র বিচার করিতে না বসিয়া একটু ঘরের ভিতরে চাহিয়া দেখিলেই এ কথার অতি সহজ মীমাংসা তাঁহারা পাইতেন। বিশেষ শাস্ত্রকারগণ যে সুন্দর সমাজ-বিধি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুসমাজে ত এ প্রশ্নের সমা-

ধানের জন্ত বিন্দুমাত্র চিন্তার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। আর আমার কথা, এখানে ত ও প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। দুঃখই আমার জীবন। সেই সার দুঃখ প্রতি মুহূর্তে ভোগ করিতে করিতে কয়েক মাস শ্বশুর ঘর করিলাম। তারপর একদিন হঠাৎ শুনিলাম স্বামী মহাশয় বাঙ্গালী পল্টনে নাম লিখাইয়া আসিয়াছেন। বড়ই দুঃসংবাদ, বাড়ীতে কান্না পড়িয়া গেল। শ্বশুর মহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরাইবার চেষ্টায় কলিকাতায় রওনা হইলেন। শ্বশুর মহাশয় যেন আমার উপর আরও বীতশ্রদ্ধ হইয়া গেলেন। হায়, হায়, তাঁহাদের আদরের ধন যাহাই করুক, এতদিন তবু ঘরে ছিল। আর আমি হতভাগিনী আসিয়াই তাহাকে ঘর ছাড়া করিলাম। একজন নাকি প্রাণ দিয়া কাহাকেও ভালবাসিলে সেও তাহাকে ভাল না বাসিয়া পারে না। একথা কেহ ভাবিয়া দেখে না যে ভালবাসিব কখন? যাহার সহিত দিবারাত্র দেখা পাইব না, আর যদি পাই তবে যে মুহূর্ত্তে তিনি আসেন তাহাতে শারীরিক মানসিক সমস্ত অণু-পরমাণু হইতে বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তাহাকে কি করিয়া ভালবাসিব? সাধু সন্ন্যাসী জঙ্গলে বসিয়া তাহার কল্পনারাজ্যের ধ্যানে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতে পারে। ক্রুর হিংস বাঘ্রকে 'হরি' বলিয়া জড়াইয়া ধরিতে পারে। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তলে চারিদিকে চারিটী আগুন জ্বালিয়া যোগের সকল কষ্ট সকল যাতনা অঙ্গের ভূষণ করিয়া লওয়াও সম্ভব। জানি না কোন ধ্যানী যোগী পুরুষ, কোন ভগবানের অবতার এমন স্বামীকে শুধু প্রেমের বর্ম্মে আপন অঙ্কে টানিয়া আনিতে পারেন? শ্রীচৈতন্ত জগাই মাধাইয়ের হাতে মার খাইয়াও তাহাদিগকে হরিপ্রেম বিলাইছিলেন। আমি ত নিত্য মার খাই, নিত্য পায় ধরিয়া তাঁহার কার্য্যের দোষ নিজের ঘাড়ে চাপাইয়া লইয়া তাঁহারই পদে ক্ষমা চাই। ভাগ্যবশে যে বিষের মালা গলায় ঝুলাইয়াছি, তাহাতে আমাকেই পুড়াইয়া শেষ করুক। কত কাতর প্রার্থনা করিয়াছি তাহার কীণ শিখাটুকুও জগতের লোকের চোখে যেন না পড়ে। যীশুখৃষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থায় তাঁহার উৎপীড়নকারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে সরল মহত্ত্বের অভিমান আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগের গরিমা, সমস্ত আকাঙ্খা কখনও হৃদয়ে স্থান পায় নাই,—তাহার জন্য বিন্দুমাত্র ব্যস্তও নাই। আমি নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া আমারই জীবনের শান্তির আশায় অনন্ত শারীরিক যাতনার হাত হইতে কিছুদিনের জন্যও উদ্ধার পাইতে চাই। হিন্দু রমণীর গর্ব্বভরা আদর্শের কল্পনায় মুগ্ধ হিন্দু-সমাজে আমার দুঃখের কথা কেহ বুঝিবে কি? এ সহজ কথা কে ভাবিয়া দেখিবে যে তিনি ত আমাকে বিবাহ করেন নাই, আমিই তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছি,—অথবা আমার বিবাহ হইয়াছে তাঁহার সাথে? চিন্তা আমার জন্য—তাঁহার নয়, তাঁহার জন্য আমার নয়, শুধু আমারই জন্য আমার চিন্তা। ভাবিতে ভাবিতে এক এক সময় ভয় হয় বুঝি মরিলেও ইহার শেষ হইবে না।

মৃত্যুর নিয়ম বড় ভাল। একবার নাম লিখাইলে শারীরিক অসমর্থতা ভিন্ন অন্য কোন কারণে আর ফিরবার যো নাই। শ্বশুর মহাশয় কত বড় বড় লোককে ধরিয়া কত অর্থ ব্যয় করিয়া, ব্যর্থ হইয়া গৃহে ফিরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কান্নাটা বোধ হয় সংক্রামক। তাহা না হইলে স্বামীর গৃহত্যাগে আমি একটু স্বস্তি বোধ করিলেও শ্বশুর মহাশয়ের কান্না শুনিয়া ঘরের কোণে বসিয়া চোখের জল ফেলিলাম কেন? বড়জা আসিয়া পাশে বসিলেন। চোখের জল মুছিয়া তাঁহার ছোট ছেলেটিকে কোলে লইলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিলেন, আমি তাঁহার পায়ের ধূলা লইলাম। তিনি বলিলেন—কাঁদছিস কেন, কাঁদ, কি বলে আর সান্ত্বনা দিব।' আমার যেন

একটু হাসি পাইল। খোকাকে আদর করিতে করিতে বলিলাম, 'দিদি টুকে ত সকলের বিপদ হচ্চে। অনেকে ত কত সন্তান পেয়ে ফিরে আসে। অন্ততঃ সেই আশাটুকু করে কিছুদিন সুখ-বোধ করতে পারবো। আসুন না একটু দেশ বিদেশ ঘুরে?' 'তোর খুব বুদ্ধি। তোকে যে কি বলবো ভেবে পাইলাম না।' একদিন ভাসুর ঠাকুরকে বলিতে শুনিলাম, 'সেখানে গিয়ে ত মদ খাবারই তার আরো সুবিধে হবে। আরও দুর্দ্দান্ত হয়ে না আসে।' ইহাতে আমার অনেক আশা দমিয়া গেল। তবুও আশা মরে না!

খবর পাইয়া বাবা আসিলেন। আসিয়া বড় কান্নাটা কাঁদিলেন। তার পর আমাকে বাড়ী লইয়া গেলেন। মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া একবার অবাধে কাঁদিয়া উঠিলাম। যে অমঙ্গল অঙ্গে মাখিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম তাহাতে যেখানে যাই সেই-খানেই আগুন জ্বালাইয়া ছাড়ি। বাড়ী আসিবার কিছুদিন পরেই সন্ন্যাস রোগে পিতার মৃত্যু দেখি-লাম। আমার মত হতভাগিনীর একমাত্র আশ্রয় স্থল—শ্মশানের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। দেখিলাম আমি অকূল সাগরে ক্ষুদ্র বটপত্রে ভাসি-তেছি।

(আগামী মাসে সমাপ্য)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

[গত ২২শে আষাঢ় মঙ্গলবার রামমোহন লাইব্রেরীর হলে কবি-সম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ করিবার জন্য বিরাট সভার আয়োজন হয়। সেই শোক-সভায় বিশ্ব-কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় যে অপূর্ব্ব কবিতা পাঠ করেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।]

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তা'রে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরী গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি'
বিধবার বেশ কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলিপরে?
আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে;
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুভ্র রাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টীকা; কবি, আজ হ'তে সে কি
বারে বারে আসি' তব শূন্যকক্ষে, তোমারে না দেখি'
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরব-সঙ্গীত তব দ্বারে?

জানি তুমি প্রাণ খুলি'
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সঙ্গীতের হারে।
অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্ম্মল, নির্ম্মম,
করুণ কোমল। তুমি বঙ্গ-ভারতীর তন্ত্রী-পরে
একটি অপূর্ব্ব সুর এসেছিলে পরাবার তরে।
সে সুর হয়েছে বাঁধা; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মধুর গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষা বসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে;
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়

আলিম্পন ; কোকিলের কুহুরবে, নিখীর কেকায়
দিয়ে গেলে তোমার সঙ্গীত ; কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রিদল রুদ্ধদ্বার-রাত্রি অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নব জীবনের অভিযানে
নব নব সঙ্কটের পথে পথে, তাহাদের লাগি'
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি'
জয়মালা বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি' ; অনাগত যুগের পাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি !

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে' গেলে দান
দূরকালে। কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমার
অনুক্ষণ, তারা যা হারাল তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা ? বন্ধু-মিলনের দিনে বারম্বার
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হ'তে, হায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হ'তে, হায়,
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আস নাই বলে', অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি' দিবে সন্তাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রহর গভীর অশ্রুজলে।
আজিকে একেলা বসি' শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি যাথা কি গো ঘুচিল চোখের,
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দন-লোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়-শৈলের তলে আজি
নবসূর্য্যবন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে ? সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর
প্রভাত আলোকে আজি ; আছে তাহে
সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গল-বারতা ;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্চ্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চ্চনা।

যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা ; কতবার তারি সারি-গানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে যাথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক, সূর্য্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুন আজ তার সাথে দেখা
মেঘে ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি,
ঝরে'-পড়া কদম্বের কেশর-সুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে কবে আমি, ওই খেয়াপরে করি' ভর,
না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরায় শুভ্ররাতে ;
দক্ষিণের দোলা-জাগা পাখী-জাগা বসন্ত-প্রভাতে,
নব মল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণ-দিনে ; শ্রাবণের
ঝিল্লিমন্দ্র সঘন সন্ধ্যায় ; মুখরিত প্রাবনের
অশান্ত নিশীথ রাত্রে ; হেমন্তের দিনান্ত বেলায়
কুহেলি-গুণ্ঠনতলে ?

ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন মনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে,
মুক্ত মনে দীপ্ত তেজে, তারুণ্যের বরমাল্য মাথে।
আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল ঘুচি', সর্ব্ব আবরণ করি' লীন
চিরন্তন হ'লে তুমি, মর্ত্ত্য কবি মুহূর্ত্তের মাঝে।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুপ্তীর মাঝে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্য্যে তারায় তারায়।
দেখা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়,
পাব তবে দেখা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়

কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে ? যেমনি অপূর্ণ
হোক নাকো,
তবু আশা করি যেন মনের একটি কোণে রাখো
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুখে সুখে
বিজড়িত,—আশা করি, মর্ত্যজন্মে ছিল তব মুখে
যে বিনম্র মিষ্ট হাস, যে স্বচ্ছ সহজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্ত্যলোকের দ্বারে,—ব্যর্থ নাহি হোক এ কামনা।

বিনিময়

(শ্রীমনোলেখা দাসী)

একদিন রাণী এসে বল্লেন, "মহারাজ, আর কত-দিন এমনভাবে নীরব হয়ে থাকবেন ; রাজকুমারীর যা' হোক একটা ঠিক কোরে ফেলুন। দিন দিন যে সোনার কমল শুকিয়ে শুকিয়ে উঠ্‌ছে ?" এই বলিয়া তিনি রাজার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

মহারাজা দুগ্ধ-ফেন-নিভ তাকিয়ার ঠেস্ দিয়ে বল্লেন, "তাইত ভাট পাঠাবো সহরে সহরে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে পল্লীতে।"

ভাল দিনক্ষণ দেখে ভাট বাহির হইল পাত্রের জন্য। কত নগর-নগরী, পাহাড় পর্ব্বত, সাগর-নদী, পুষ্করিণী-পল্বল অতিক্রম করে ভাট চল্‌ল, তবুও পথের বিরাম নেই—শেষ নেই। কতকটা পথ বন্ধুর, কতকটাও বা বন্ধুর এবং কতকটাও উন্নত। ক্রমশঃ চল্‌তে চল্‌তে উপস্থিত হোল—বিদেহ রাজার দেশে।

বহু অনুসন্ধান করে জান্‌ল, রাজার কন্দর্পের তুল্য এক অলোকসামান্য রূপবান রাজকুমার আছে।

ভাট অনেক কষ্টে উপস্থিত হোল রাজ-সভায়। হঠাৎ ভাটের আগমন শুনে, রাজা বিস্ময়ে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে বল্লেন, "কি সংবাদ ভাট ?"

ভাট সবিনয়ে বলে, "রাজন্, কত ভয়-সঙ্কুল পথ পেরিয়ে তবে আপনার সুবিশাল রাজ্যে প্রবেশ করেছি।"

"তারপর।"

"আমি মদ্রদেশাধিপতির আদেশে বাহির হয়েছি —রাজকুমারীর পাত্রের জন্য। শুন্‌লাম আপনার এক রূপবান গুণবান পুত্র আছে—তাই…"

মহারাজা কিছুকাল নীরব থেকে কহিলেন, "হাঁ, কিন্তু মদ্ররাজকুমারীর সহিত বিবাহ বিদেহ রাজ-কুমারের—এ অসম্ভব, কিছুতেই হতে পারে না।"

সভাস্থ সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠ্‌লো রাজার কথায়।

হঠাৎ রাজগুরু এসে উপস্থিত হোলেন—রাজ-সভায়। মহারাজা সসম্ভ্রমে গুরুর পদধূলি নিয়ে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাজগুরু বল্লেন, "রাজন্, রাজকুমারের বিবাহের কতদূর আয়োজন ?"

রাজা বিষণ্ণভাবে বল্লেন, "এখন ও উপস্থিত কিছুই হয় নাই—আপনার আদেশ পেলেই যথাযোগ্য আয়োজন করি।"

"উত্তম।"

* * *

ভাটের আগমন শুনে নগরবাসী উৎফুল্ল ও

চকিত হোয়ে উঠ্‌লো—না জানি কি শু-খবর সে দিবে। রাজ-তোরণে নহবৎ বেজে উঠ্‌লো, রাজপথ আনন্দ-কোলাহলে মুখর হোয়ে উঠ্‌লো, প্রাসাদ-চূড়া বিবিধ বর্ণের পতাকায় বিভূষিত হোয়ে উঠ্‌লো এবং রাজ-প্রাকার আলোক-মালায় খচিত হোল।

রাজসভার নীরবতা ভেঙ্গে ভাট বল্লে, "মহারাজ, কত রাজার রাজা পার হোয়ে, কত নগর নগরী অতিক্রম কোরে; তবে বিদেহ-রাজ্যে উপস্থিত হোলাম। খবর পেলাম—বিদেহরাজের এক সুকান্ত রাজকুমার আছে। বিবাহের প্রস্তাব করাতে, উত্তরে বিদেহাধিপতি বল্লেন, "অসম্ভব ?"

ভাটের কথা শুনে সভার সকলের প্রফুল্ল মুখ বিবর্ণ ও শ্রীহীন হয়ে উঠ্‌লো, দৌবারিকের চমকিত অসি স্বপাৎ করে ভূতল স্পর্শ কর্‌ল, বিশাল রাজ-সভা সাগরোর্ম্মির ন্যায় বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌লো।

এই কথা শুনে মহারাজার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। সেনাপতিকে আদেশ দিলেন—অনতি-বিলম্বে সৈন্য-সামন্ত সজ্জিত কোরে বিদেহ রাজ্য আক্রমণ কর।

আনন্দের পরিবর্ত্তে রণযাত্রার আয়োজন দেখে বঙ্গদেশবাসী চমকিত হোয়ে উঠ্‌লো। রাজপথ দিয়ে দলে দলে পদাতিক, অশ্বারোহি সৈনিকগণ গম্ গম্ কোরে চল্‌তে লাগ্‌লো। সারা নগর অশ্বের হ্রেষারবে মুখর হোয়ে উঠ্‌লো, আকাশ-পথ ধূলি-পটলে সমাচ্ছন্ন হোয়ে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারিদিকে কান্নার করুণ রোল উত্থিত হোল।

* *

একদিন মহারাজা নিরালায় নিজ শিবিরে বসে আছেন, এমন সময় এক সুন্দর সুকান্ত যুবক নত-জানু হোয়ে রাজাকে অভিবাদন কোরে বল্লে "জান্, আর যুদ্ধের প্রয়োজন কি ?"

রাজা বিস্মিত নেত্রে সেই অনিন্দ্য-সুন্দর যুবককে দেখ্‌তে লাগলেন।

হঠাৎ রাজকুমারী এসে বল্লে, "মহারাজ, একার বলক্ষয়ের প্রয়োজন কি ?" এই বলিয়া কুমারের দিকে অগ্রসর হোয়ে তার একহাত ধোরে বল্ল, "কুমার, এস, আমি যে তোমার জন্যই এতদিন ধোরে প্রতীক্ষা করেছি।" এই বলে রাজকুমারের হাত ধরে বেরিয়ে গেল।

রাজা হতবুদ্ধির মতন বসে রইলেন।

দীক্ষা

(শ্রীমহারাজকুমার যোগীন্দ্রনাথ রায়)

তুমি মোরে দিয়েছ বারতা,
হে বন্ধু জীবন-ধন, ভুলিনি সে কথা।
জীবনের ক্ষুধাতুর তৃষাতুর দিনে,
শুষ্কায়িত হিয়া যবে মরমিয়া বিনে—
সেইক্ষণে তুমি মোরে দিয়েছ বারতা—
ভুলি নাই বন্ধু মোর গোপন সে কথা।

প্রশান্ত প্রভাত যাবে নানা বর্ণে সাজে,
বিচিত্র বাসনা যবে দিকে দিকে রাজে,
অনন্ত আবেগ-ভরে ; ধরণীর হিয়া,
অভিনব পত্রে-পুষ্পে উঠে মুঞ্জরিয়া।
মনে হয়, জীবনের যত মৌন-আশা
মুহূর্ত্তের পরে বুঝি পাবে দৈব-ভাষা

দেবতার শুভ-বরে ; নিরানন্দ যত,
ক্ষণিকের অন্তরালে হবে মূর্চ্ছাহত !
সেই ক্ষণে তুমি মোরে দিয়েছ বারতা,
বুঝায়েছ নিরানন্দে নহে মিথ্যা কথা।
বুঝায়েছ জীবনের যত দুঃখভার
নিষ্ঠুর পীড়ন নহে—সুতোর সম্ভার।
দণ্ডে-দণ্ডে, পলে পলে, ধরণীর পরে,
বেদনার যেই বন্যা উচ্ছ্বসিয়া পড়ে
সহস্র নির্ঝর স্রোতে—মিথ্যা তাহা নহে।
তারি সাথে দেবতার আশীর্ব্বাদ বহে।
দুঃখ সাথে দীক্ষা লভে জগতের প্রাণী,
তুমি মোরে শুনায়েছ সত্য সেই বাণী !
উচ্ছ্বসিত হৃদি যবে প্রিয়জন পাশে
প্রেমের বিপুল গর্ব্বে ; কাণে নাহি আসে
কোন বাণী ধরণীর। পরিপূর্ণ হিয়া,
সোহাগের পূর্ণ সুরে উঠে শিহরিয়া
অবাক্ স্পন্দনে যবে মনে হয় যাহা
আছে, চিরকাল ধরি বুঝি রবে তাহা—
উদ্ভাসিয়া হৃদয়ের শান্ত নিকেতন ;
প্রেমের বারতা লিখা বিজয়-কেতন,
চিরকাল ধরি বুঝি হৃদয়-গগন
পরে প্রচারিবে আপনার সুলগন

বাণী।

সেইক্ষণে বন্ধু মোর ধীরে ধীরে
আসি, বেদনার পরশনে, আঁখি-নীরে
ভাসি, বলে গেছ কাণে মোর—দেবতার
দান, একা শুধু সুখে নহে ; বেদনার
বোঝা বহে নাই যেইজন সঙ্গীহীন
অন্ধরাতে, দুর্দ্দিনের দুঃখভারে দীন
করে নাই যারে, শিখায়েনি অন্তর্যামী
দুঃখরূপীদেবতার, চির কল্যাণী
হৃদয়ের দীপ-শিখা, আরতির ছলে,
জ্বলে নাই যার চিতে প্রতি দণ্ডে, পলে।
দেবতার পরশন ঘটে নাই তার—
সেই কথা ব'লে গেছ মোরে বারবার।
দুঃখ-বিনা দীক্ষা লাভ—স্বপনের বাণী ;
স্বপ্ন, সে যে অভিনব, অপরূপ—মানি ;
কিন্তু তাহা সত্য নহে। অন্তরের সুধা
লুকানো নাহি তো তাহে ; সে যে মায়াফাঁদ,
অতীতের ইচ্ছা শুধু—শূন্য চিরকাল !
দেবতার আশীর্ব্বাদ নাহি আছে তায়,
ক্ষণিকের প্রাণ শুধু ক্ষণিকে মিলায় !

এই তো তোমার বাণী, এই বাণী লাগি,
কতদিন কত রাত্রি নিদ্রাহারা জাগি,
নিরানন্দে বরিয়াছি, হৃদয়ের পুরে—
চির-পরিচিত সম, চিরাগত-সুরে।
এই বাণী লাগি প্রিয়, তুমি সে আমার,
কতবার কাঁদাইয়া মুছাইলে ধার।
কতবার ছিন্ন মাঝে সুধা সঞ্চারিলে,
চিরশূন্য প্রাণ মোর পূর্ণ করি দিলে !

এই বাণী লাগি ভাঙ্গি পাষাণের কারা —
সহস্র স্রোতের মুখে ছুটে নদী-ধারা ;
প্রতি গিরি, প্রতি গুহা, প্রতি শিলা-তটে —
দুঃখ বিনা দীক্ষা নাই—এই কথা রটে।
দুঃখ বিনা দীক্ষা নাই গাইছে সাগর,
বসুন্ধরা আকুলিত কাঁপে থর-থর।
সূর্য্য শশী গ্রহ তারা উপগ্রহ আদি,
কত কল্প কল্প ধরি ঘুরিতেছে কাঁদি
পরম-প্রণয় লাগি ; সেই সে বারতা
তুমি মোরে শুনায়েছ—ভুলিনি সে কথা।

ভুলি নাই জীবনের প্রথম প্রভাতে,
দুঃখ সাথে তুমি আসি স্নিগ্ধ-আঁখি-পাতে,
দেখাইলে ধরণীর দীর্ণ হিয়া মাঝে
দেবতার সিংহাসন যেথায় বিরাজে—
লেখা আছে জীবনের জয়-যাত্রা-গান
ব্যথিতের শোকানলে চির-দীপ্তমান।

প্রত্যেক অক্ষরে তার জ্বলিতেছে হায়—
লক্ষ কোটি সূর্য্য সম দৃপ্ত পরিমাণ।
সেই গান মোর প্রাণ লইল যে টানি,
জীবন-দয়িত মোর, ভুলিনি সে বাণী।
ভুলি নাই, তুমি মোরে দিয়েছ বারতা,
থামায়েছ অর্থহীন শত মুখরতা!

ভাগের পূজা

লেখক—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম, এ।

পূর্ব্ব পূজারীগণ :—১। শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, (২) শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার, (৩) শ্রীমতী সরসীবালাবসু।

প্রসাদের আ'রো কথা

আমার নামে ছেলেবেলা থেকেই এই একটা মস্ত বড় অপবাদ আজ পর্য্যন্ত সমান ভাবে চলে আসছে যে আমি নাকি যখন তখন এবং যাকে তাকে একটু তাতেই বিশ্বাস করে বসি, এবং আমার দয়ামায়াটা নাকি পাত্রাপাত্র বিচার না করেই বিনা কারণে হঠাৎ উথলে ওঠে। হবেও বা! কিন্তু একথাও বলি যে, দাতাটা দুনিয়ায় এই যে লোকগুলো, এদের না বিশ্বাস করে পুরুষরা হয়ত বা থাকতে পারে—কিন্তু আমরা পারি না। আমরা যে স্ত্রীলোক; আমরা যে অনেক কষ্টে, অনেক সহ্য করে, অনেক দরদ দিয়ে তাদের একটু একটু করে গড়ে তুলেছি—আমরা যে তাদের মায়ের জাত। পুরুষরা ঠাট্টা করে বলে বটে যে আমরা একটু তাতেই গলে যাই—একটু তাতেই খপ্ করে মানুষকে বিশ্বাস করে বসি; তা'ত করিই, কিন্তু কেন যে করি সেটা ও আর তারা ভেবে দেখে না। আমরা কি নিজেরাই বুঝি না এমনি করে দুনিয়ায় অনেক সময় আমাদের ঠকতে হয়?—তা খুব বুঝি আমরা—কিন্তু নাচার! পুরুষ মানুষরা কাজে বেরিয়ে গেলে, দুপুর বেলায় তিলক সেবা ক'রে বোষ্টমের দল যখন এসে, "ভিক্ষে দাও মা," বলে চৌকাঠের ধারে দাঁড়ায়, তখন কি আমরা কিছু বুঝতে পারি না মনে কর! সব বুঝি, কিন্তু ঐ যে বল্লুম,—আমরা যে মায়ের জাত, আর তারা যে এসে দাঁড়ায় আর কিছু না কেবল মা বলেই; তাই ঐ জায়গাটাতে যখনি ঘা পড়ে, অমনি সেই দশমাস দশ দিনের তিল তিল করে আপনাকে ভুলে যাওয়ার দরদটুকু বুকের ভাণ্ডারখানে একবারে টন্ টন্ করে ওঠে। ওরে নাড়ীর টান! বিধাতার নিজের হাতে গড়া জিনিষ। ওর হাত থেকে কি ছাড়ান পাবার যো আছে—সে তাই পাবো!

প্রসাদ প্রায়ই আমাকে খোঁটা দেয়, নির্ম্মল নাকি আমাকে যা বলে ফাঁকি দিয়ে দিব্যি নিজের দলে টেনে নিয়েছে। হবেও বা! কিন্তু একথাও বলি, যারা মনে করে, শুধু একবার মা বলে ডেকে নির্ম্মল সন্তার আমার অন্তঃকরণটা জয় করে ফেলেছে তারা জিনিষটা পুরোপুরি ঠিক বুঝতেই পারে নি। তারা শুধু কান দিয়ে শুনলে কমল ডাকলে, "মা" —বাস্ এই পর্য্যন্ত। কিন্তু আমি ত শুধু এটুকুই লক্ষ্য করিনি, আমি যে সেই সঙ্গে দেখে ফেলেছি, তার সুন্দর চোখ দুটি কেমন করে আস্তে আস্তে সজল হয়ে উঠলো।

প্রসাদ বলে, কমল ছেলেটি বড় সোজা নয়, কিন্তু বিশেষ বাঁকা বলেও ত তাকে মনে হয় না।

গয়লা বৌ কিরে এসে যা বল্লে তা থেকে-ও ত কমলের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন দোষের কথা খুঁজে পাওয়া গেল না। তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "হ্যাঁ গয়লা বৌ, এই যে এতদিন কমলদের বাগানে আটক ছিলে, তা সে কোনদিন গিয়ে তোমাকে জ্বালাতন করে নি ত?"

সে বল্লে, "না মা, তেনাকে ত কোনদিন দেখি নি।"

আবার জিজ্ঞেস করলাম, "ছোট খুড়োকে কোনদিন দেখ নি?"

গয়লাবৌ ঘাড় হেঁট করে বল্লে, "আজ্ঞে তিনি মাঝে মাঝেই যেতেন আর নানান কথা বল্‌তেন।

গয়লাবৌয়ের মুখ থেকে সব কথা শুনে যতদূর বোঝা গেল, তা থেকে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, ছোট খুড়োই তাকে বাগানে আটক করে রেখেছিল এবং এই আটক করে রাখবার উদ্দেশ্য হচ্ছে আর কিছুই না, তাকে কোন ধনী লম্পটের হাতে তুলে দেওয়া। তাতে করে সেও বেশ দিব্যি রাজরাণীর হালে থাকতে পারে আর ছোট খুড়োও বুড়ো বয়সে কিঞ্চিৎ শুছিয়ে নিতে পারেন;—রাগে ঘৃণায় সর্ব্ব-শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো—কিন্তু থাক্ এখন সে কথা!

প্রসাদকে ডেকে সব কথা বল্লুম,—সে বল্লে, "এখনো তোমার সন্দেহ আসছে না মা?—বলিহারি তোমাকে যাহোক্!"

আমি বল্লুম, "কখনই না—কমল এর মধ্যে কিছু-তেই নেই। ছোটখুড়ো নিশ্চয়ই অন্য কোন বড় লোকের হয়ে এ কাজ করেছে। তা যদি না হোতো তা হলে কমল নিজে কখোনো গয়লাবৌকে ছেড়ে দিতো না।"

প্রসাদ মুখভঙ্গী করে উঠলো—"ছাকা ছেলে আর কি! তারই বাগানে এতদিন আটক রইল, আর তিনি কিছুই টের পেলেন না কচি খোকা আমার!

আমি বল্লুম, "কিন্তু শেষকালে সেই ত গয়লা-বৌকে বার করে দিলে। আর, তার পরামর্শেই ত বাগান বাড়ীতে খোঁজ করা হোলো,—তা না হলে কে আর সেখানে খোঁজ করতে যেত? সে নিজেই যদি গয়লাবৌকে লুকিয়ে রাখবে—তবে নিজেই আবার ধরিয়ে দিতে গেল কেন শুনি?"

এ কথার জবাবে প্রসাদ বিশেষ কোন উত্তর দিতে পারলে না বটে, কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে বেশ স্পষ্ট বুঝলুম, তার বুকের ভিতরকার অবিশ্বাসের জমাট কালো মেঘটা এতখানি বর্ষণ করেও একটুও হাল্কা হ'তে চাইছে না। কিন্তু এযে নেহাতই বাড়াবাড়ি!

কমল সেদিন সন্ধ্যার সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, বল্লুম, "গয়লাবৌকে যে খুঁজে পাওয়া গেছে—এ কেবল তোমারি চেষ্টায় বাবা, তোমার কাছে আমরা যে কি পর্য্যন্ত ঋণী তা আর কি বলবো কমল।"

সে কথার কোন জবাব দিলে না, এবং কথাটাকে হঠাৎ মাঝপথে চাপা দিয়ে বলে উঠলো —"আমাদের বাড়ী একদিন বেড়াতে যাবেনা মা?"

আমি বল্লুম, "কেন যাবো না বাবা?—নিশ্চয়ই যাবো! তোমাদের বাড়ী বেড়াতে যাবো, এর কথা কি বাবা!"

পরদিন কমলদের বাড়ী বেড়াতে গেছলুম। আহা বাছার মাথার ওপর কেউ নেই! দূর-সম্পর্কীয়া কে এক পিসীকে এনে সংসারে রেখে দিয়েছে;—আমার ত তাকে একটুও ভাল লাগলো না; কমলও যে তার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট নয়, তা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল।

জিজ্ঞেস করলুম, "এখন পর্য্যন্ত বিয়ে কর নি কেন কমল?

সে ঘাড় হেঁট করে একটু হেসে উত্তর দিলে, "কে দেবে মা?"

"কেন তোমার পিসী রয়েছেন ত!"

সে কোন কথা বল্লে না—কেবল একটু হাসলে। কিছুই বুঝতে পারলুম না।—এর উপর আর খোঁচা দিয়ে ভিতরের সমস্ত খুঁটি নাটি ব্যাপার জেনে নেবার প্রবৃত্তি আমার আদবেই ছিল না। কেন না, তার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে এমন একটা জিনিষ তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যার উত্তরে শুধু কেবল একটুখানি হেসে ক্ষান্ত হওয়া ছাড়া তার আর গত্যন্তর নেই।

কেন কে জানে এই সুন্দর মাতৃহীন, অনাথ ছেলেটির যতই কাছাকাছি আস্‌ছি, ততই যেন স্নেহ, মমতা, করুণায় বুকটা আমার একবারে ভরে ভরে উঠ্‌ছে। করুণ—বড্ড করুণ তার ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস-টুকু। এর উপর প্রসাদ কি করে যে রাগ করে থাকতে পারে তা আমিও বুঝতে পারি না - নির্ম্মল-ও না।

কমলেশের কথা

গয়লা বৌকে শেষকালে ছেড়ে দিতে হোলো। কিন্তু তাই বলে একথা আমার মন কোন দিন স্বীকার করবে না যে এর মধ্যে একটুও ভীরুতা আছে। প্রসাদ যতই কেন সাউথুড়ি করে বেড়াক না, তাকে আমি একতিলও ভয় করি না। সে একা কি করতে পারে? আমার দলে লাঠিয়ালের ত অভাব নেই।

গয়লা বৌকে যে ছেড়ে দিলুম এর মধ্যে অনেক কারণ আছে। সত্যি বলতে কি, তার রূপে যে আমি কোন দিন মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলুম একথা স্বীকার করতে আমি কোন দিনই রাজি নই। তবু যে তাকে এত কাণ্ড করে আটক করেছিলুম, সেটা একটা কোঁক ছাড়া আর কিছুই নয়।

এটা আমার একটা বরাবরের ধারণা,. সেই ছেলেবেলা থেকে, যে, আমার মত সুপুরুষ দুনিয়ায় আর দুটি নেই। এর মূলে যে একেবারে কোন সত্য নেই, বিনয়ের খাতিরেও এত বড় মিথ্যে কথাটা বলতে পারবো না। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আস্‌ছি, আমি নাকি ভারি সুন্দর;—হবেও বা! কিন্তু এই "হবেও বা," বলে চুপ করে বসে থাকবার যে বয়স, সেটা কবে একদিন তার একরাশ ছেলে মানুষী আর গায়েখেয়ালে খেলা ধুলোর বিক্ষিপ্ত ভাঙ্গাচুরো টুকরাগুলো এক জায়গায় জড় করে, একটা মস্ত বড় খলের পুরে পিঠে ঝুলিয়ে চটাৎ বলা কওয়া নেই কোথায় যে সরে পড়লো, তার আর দিশে পাওয়া গেল না। সেইদিন থেকে নিজের রূপের ব্যাখ্যানা শুনে শুধু কেবল "হবেও বা," বলে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম না। তার পর আরও কয়েক বৎসর কেটে গেল—১৯ বৎসরে পা দিলুম। মাথার উপর কেউ নেই—বাপ মা ত নয়ই—আত্মীয় স্বজনও নয়।

আমার মনে হয়, যৌবন যদি কিছু চায় ত সে বিনয় গর্ব্ব। সকলের মনের অবস্থা আজ ঠিক জানি না, তবে আমার মধ্যে যৌবন যে বেশে দেখা দিয়েছে—তা থেকে তাকে বিনয়-বীর ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না।

সে আজ বেশী দিনের কথা নয়, বর্ষাকাল; দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়া সেরে বাইরের ঘরে, বাগানের দিকের জানালাটার ধারে, একটা সোফার ওপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পড়ে আছি জানালার সামনেই পুকুর, ঝুপ্ ঝুপ্ করে একঘেয়ে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ঝরে ঝরে পড়ছিল। জানালার ধারে চুপটি করে বসে আছি, এমন সময় কাঁকালে কলসী নিয়ে একটি স্ত্রীলোক ভিজতে ভিজতে ঘাটে এসে হাজির হোলো। ঠাওরে দেখলুম—গয়লা বৌ।

আমি যেমন বসেছিলুম তেমনিই বসে রইলুম—ঠিক যে তাকে দেখবার জন্যে তা নয়- এমনি শুধু শুধু। গয়লা বৌ জলে নামছিল, হঠাৎ তার নজর পড়ে গেল আমার দিকে। সে এমন অবজ্ঞার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিলে—যেন আমি একটা মানুষই নই

এবং আমার অস্তিত্বটাকে সে স্বীকারই করতে চায় না—এতেই অপমান বোধ হোলো। কি করব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে কে আমার পিঠে হাত দিলে—ফিরে দেখি, খুড়ো মশাই।

পিঠ চাবড়ে খুড়ো বলে উঠলেন, "ব্যাপার কি বাবাজী?"

আমি কোন কথা বল্‌লুম না—যেমন চুপ করে বসেছিলুম তেমনিই বসে রইলুম।

খুড়ো জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে একবার উঁকি মেরে বল্লে—"গাধলো নাকি?"

আমি তবুও চুপ করে রইলুম। খুড়ো আবার আরম্ভ করলে, "পড়ন পেটন নেহাত মন্দ নয় হে; ছোট লোকের মেয়ে হলে হবে কি, অনেক বামুন কায়েতের ঘরেও অমন একখানা যুবলে কিনা—।"

অধিকাংশ স্থলেই দেখেছি, স্ত্রীলোক যেখানে আপনা হতে দু বলতেই এসে হাজির হয়, সেখানে মানুষের যৌবনটা কিছুক্ষণের জন্যে একবার চন্ চন্ করে ওঠে বটে কিন্তু সে বেশীক্ষণের জন্যে নয়। আমার খুব বিশ্বাস, যৌবন বলে যে রসিক জীবটি আমাদের বুকের মাঝখানে বাসা বেঁধে থাকেন—তিনি বিলক্ষণ কল্পনাপ্রিয় এবং কবিত্ব বলে জিনিষটা তাঁর মধ্যে বেশ দস্তুর মতই আছে। তাই দেখতে পাই, যাকে চাইলেই পাওয়া যায়, অর্থাৎ যাকে চাইবার পর না-চাওয়ার অবকাশটুকুকে কল্পনায় সুন্দর করে তোলবার কোন রকম ব্যবস্থা বা সুবিধা নেই, সেখানে যৌবন বড্ড শীগ্‌গিরই নেতিয়ে পড়ে। এ বিষয়ে ত আর কোন ভুল নেই যে, দুনিয়ার যত কেন সৌন্দর্য্য থাক্ না, কল্পনার কাছে তা হার মানবেই—কেন না কল্পনা যে সৃষ্টির চাইতে অনেক বড়। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, যাকে চাইবামাত্রই হাতের গোড়ায় পেলুম, তার সৌন্দর্য্য যতই কেন বেশী হোক না, তার একটা সীমা আছে, কেন না, তাকে দেখছি যে চোখ দিয়ে। কিন্তু যাকে চেয়েও পেলুম না—তাকে চোখ দিয়েই শুধু দেখলুম না ত—মন দিয়েও যে তাকে দেখতে চেষ্টা করলুম, আর ঐ মনের দেখা যে সত্যিকারের দেখার চেয়ে অনেক বেশী জিনিষ দেখিয়ে দেয়, যা হয়ত আমাদের ঐ চোখে দেখা জিনিষটার মধ্যে আদবেই নেই।

সে আজ অনেক দিন আগেকার কথা, তবু কিন্তু বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে। বয়স তখন ১৬ কি ১৭; ছেলেবেলাকার সহপাঠী বন্ধু দুলালদের বাড়ীতে গেছি তার ভগ্নীর বিবাহে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, বর তখন পর্য্যন্ত আসে নি। আমরা বাইরের ঘরে উন্মুখ প্রতীক্ষায় বসে আছি। দুলালের একটি ছোট্ট ভাগ্নী, বয়স হবে ৫ কি ৬—দিব্যি ফুট ফুটে মেয়েটি—সেজে গুজে এসে দুলালের কাকাকে জিজ্ঞেস করলে—"বর কখন আসবে দাদা মশাই?"

লোকটি ছিলেন কিঞ্চিৎ রসিক প্রকৃতির—তিনি তখন বড়াক্ বড়াক্ করে তামাক টানছিলেন—হুঁকাটাকে নামিয়ে রেখে, একটু হেসে বল্লেন—"তোর বর ত মজুদ রয়েছে ভাই—মালা বদল করলেই হয়।"

মেয়েটি বলিল, "ধ্যাৎ!"

বৃদ্ধ আবার বলিল, "ধ্যাৎ কি বল্—আমি যে তোর বর হইরে।"

মেয়েটি আবার বলিল—"ধ্যাৎ।"

বৃদ্ধ বলিল, "কেন, আমাকে পছন্দ হয় না বুঝি?"

"না হয় না," বলে ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিল, খপ্ করে তার হাতটা ধরে ফেলে, কাছে বসিয়ে দুলালের কাকা বল্লেন, "আমাকে ত তোর পছন্দ হোলো না—আচ্ছা দেখি তোর পছন্দর দৌড় কত দূর,—এই ত একঘর লোক রয়েছে, বল দেখি তুই কাকে বিয়ে করবি?"

মেয়েটি পূর্ব্ববৎ বলে উঠলো—"ধ্যাৎ!"

শেষকালে অনেক সেধাসেধি করাতে সে ঘরের চারিদিকে একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিল,

তারপর তাঁর দাদা মশায়ের কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে কি বলে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোথায় যে পালিয়ে গেল—তার আর তল্লাসই পাওয়া গেল না।

হো হো করে হেসে উঠে, তুলালের কাকা বলে উঠলেন, "তা যাই বলো, নাতনীর আমার পছন্দকে তারিফ করতেই হবে!" সকলে সকৌতুকে বলে উঠলো—"কাকে পছন্দ করলে শুনি?"

আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে তুলালের কাকা বল্লেন, "কমলকে।" আমার সেদিন খুব লজ্জা হয়েছিল, কিন্তু তার চেয়ে বেশী হয়েছিল আনন্দ।

সেইদিন প্রথম টের পেলুম—রূপটা বড় কম জিনিষ নয়। সেদিন একটা প্রকাণ্ড বিজয়-গর্ব্বে বুকখানা সাত হাত হয়ে উঠেছিল এবং বুকের ভিতর কার সমস্ত অলি গলি প্রতিধ্বনিত করে তুলে, মাথা চাড়া দিয়ে উঠে নবীন যৌবন তাল ঠুকে দাঁড়া দিয়েছিল,—"হাম হ্যায়!" সেই সময় আবার পড়ছিলুম, দুর্গেশনন্দিনী; তিলোত্তমা কি করে অন্তর্দ্ধান হয়ে ঘাঃময় লিখে বেড়াচ্ছে—কুমার জগৎসিংহ আর কুমার জগৎসিংহ। আমি কল্পনায় দেখতে লাগলুম—সেই ফুটে ফুটে মেয়েটি তার পাঠশালে যাবার সেলেট-খানিতে আঙ্ক আঙ্ক লিখতে গিয়ে লিখে ফেলছে রাত দিনই কেবল আমার নাম, আর চোখের জলে তার বুক ভেসে যাচ্ছে।

এমনি ধারাটা যখন মনের অবস্থা সেই সময় হঠাৎ একদিন কোথা থেকে এসে জুটলেন—খুড়ো মশাই। এক শ্রেণীর লোক আছে, এই দুনিয়ায় যারা জন্মেছে পরের মাথায় হাত বুলোবার জন্যে। কিন্তু এই পর বলে জীবটি সব সময়েই যে ঠিক তাঁরি সমবয়স্ক বা সমধর্ম্মী হবে এমন ত আর কোন লেখা পড়া নেই—কাজেই এই সব লোককে বয়স্কপী সেজে বেড়াতে হয়—তা না হলে এঁদের ব্যবসা চলবে না যে। ছোট খুড়ো যেদিন সত্যি সত্যিই আমার স্কন্ধে এসে ভর করে বসলেন—সেদিনও আমার বয়স কুড়ি পার হয় নি, আর তাঁর বয়স তখন ৪৬ কি ৪৭ অথবা তার চেয়ে কিছু বেশীও হবে বা। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখলুম এই একটা, যে, আমার সঙ্গে মিশতে তাঁর একটুও বাধলো না—না বয়সে—না স্বভাবে।

দেখতে দেখতে খুড়ো আমার এমনি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন যে তাঁর কাছে প্রাণের কোন কথাই লুকোবার আর দরকারই রইলো না। তার পরই খুড়োর সঙ্গে মাঝে মাঝেই কলকাতায় যাওয়া দরকার হয়ে পড়তে লাগলো—কেন তা আর বলে কায নেই।

তাই ত বলি, গয়লা বৌ কি আর এমন সুন্দরী যে তার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠবো!—দু দশ টাকা ছাড়লে খুড়োর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে অমন ঢের স্ত্রীলোক গলে চলে আসে। কিন্তু তবু কেমন একটা ঝোঁক হোলো তাকে নিজের আয়ত্বের মধ্যে আনতেই হবে—তার কারণও ছিল একটু।

একটু আগেই বলেছি, আমার বরাবর ধারণা ছিল আমার মত সুপুরুষ আর দুটি নেই; এবং এ ধারণাটাও এমনি হয়েছিল যে, আমাকে দেখে মরে না এমন স্ত্রীলোক দুনিয়ায় খুব কমই আছে। প্রমাণও ঢের পেয়েছি। কিন্তু প্রথম এবং মারাত্মক ধাক্কা খেলুম এই গয়লা বৌয়ের কাছ থেকে।

সে সত্যিকারের চেয়ে অনেক বেশী জিনিষ আমার বুকের মধ্যে এনে দিলে সেই মুহূর্ত্তে, যে মুহূর্ত্তে সে আমাকে জানিয়ে দিলে যে, তাকে পাওয়া বড় সহজ নয়! সে যদি সেদিন আমাকে দেখে অমন করে চোখ ফিরিয়ে না নিত,—তাহলে হয়ত তার পিছনে পিছনে কিছুদূর পর্য্যন্ত আমার চোখ দুটিই ধাওয়া করতো,—মনটা নয়। কিন্তু সে যে আমার চোখের চেয়ে মনটাকেই কেড়ে নিয়ে গেল বেশী ক'রে—সেই ত হোলো মুস্কিল!

খুড়োকে বল্লুম—"খুড়ো, গয়লাবৌকে কিন্তু চাই-ই চাই।" খুড়ো বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে

বলে, "বড় শক্ত কাজ বাবাজী—মা'র বড্ড গুমোর আর বাইও বড় কম নয়।"

আমি বলুম বাইয়ের জন্যে ভাববেন না,—যত লাগে দিতে রাজী আছি—আপনাকে কেবল ওর গুমোরটা ভাঙতে হবে বুঝলেন?"

তার পর গয়লাবৌকে ত বন্দী করা গেলো। খুড়োকে বল্লুম—"পাড়ার লোকে টের পেলে কি বলবে?"

খুড়ো অম্লানবদনে বল্লে, "তখন আমার নামে দোষ দিলেই সব গোল চুকে যাবে এখন—তুমি তখন ডাহা ভান মাচরট সেজে বলবে—বুঝলে?"

খুড়ো অনেকবার ঠিক এমনি করেই নিজের ঘাড়ে সমস্ত কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে নিয়ে, আমাকে নির্বিঘ্নে ফাঁকতালে রেহাই দিয়েছে এবং বেশ দেখতে পাই, এই ধরণের কাজ পেলে খুড়ো একেবারে উৎসাহে মেতে ওঠে। এর কারণও আছে বিস্তর!

খুড়ো চায় আমাকে দেখাতে সে যে আমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে—যদিও আসলে তিনি ভালবাসেন আমার লোহার সিন্দুক, আর কাঁচা মাথাটাকেই—সব চেয়ে বেশী।

যাক্, এখন কথা হচ্ছে, আমাকে যে খুড়ো প্রাণের চেয়েও ভালবাসেন এটা ত প্রমাণ করতে হবে—তা না হলে চলবে কেন! আর এটাও খুড়ো জানেন যে, আমাকে তিনি যতই ঋণজালে জড়াতে পারবেন, ততই তাঁর পক্ষে সুবিধে, কেন না তাঁর ঋণ শোধ হবে যেদিন, সেদিন সুধ, তত্তসুধ, নাদ সুধের চৌদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে। তাই আমার ঋণের মাত্রা যতই বাড়তে থাকে, ততই তাঁর উৎসাহ পরদায় পরদায় চড়তে আরম্ভ করে! এই হোলো খুড়োর পরোপকারের ভিতরকার আসল চেহারাখানা। খুড়ো চায় পরোপকার করতে, কেন না খুড়ো সকলের চেয়ে এটা বেশী জানে যে, জীবন নাট্যের যে দৃশ্যটিতে পরলোকান্তের অভিনয় হবে, তার পরের দৃশ্যটি নিশ্চয়ই প্রত্যুপকারের একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমাকে শেষ করবে! তাই যখনি বলেছি—"খুড়ো এর পরে লোকে যে আমাকে একবারে"—খুড়ো তাড়াতাড়ি আমার মুখ চাপা দিয়ে বলে উঠেছেন—"আহা সে জন্যে অত ভাবো-কেন—আমি রয়েছি ত—আমার ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ো না হে!"

যাক্, এমনি করে গয়লাবৌকে ত আবদ্ধের মধ্যে এনে ফেলা হোলো, কিন্তু গোল বাধিয়ে বসল—প্রসাদ আর তার মামা নির্ম্মল।

সেদিন বৈঠকখানায় বসে আছি—হঠাৎ খবর পেলুম, খুড়োকে নাকি একলা পেয়ে প্রসাদ আর নির্ম্মল ভয়ানক রকম অপমান করছে। তখনি ত ছুটে গেলুম দেখতে, ব্যাপারখানা কি। গিয়ে মাথা মুণ্ডু কি যে দেখলুম তা বলতে পারি না, কিন্তু একটি জিনিষ বেশ ভালকরেই দেখলুম যা জীবনে কখনো ভুলতে পারবো না—দেখলুম সেই গোলদাস এবং হট্টগোলের মাঝখানে স্তব্ধ, স্থির, শান্ত, অবিচল ভাবে দাঁড়িয়ে এক নারী মূর্ত্তি। কি প্রশান্ত নির্ম্মল সে মূর্ত্তি! মাথা যেন আপনা হতে হেঁট হয়ে যায়। গেলুম প্রসাদ এবং নির্ম্মলকে একটু শিক্ষা দিতে কিন্তু হঠাৎ কি করে জানি না মনটা একেবারে ভারী বেমালুম বদল হয়ে গেল। স্ত্রীলোক চিরকাল আমাকে উত্তেজিতই করে এসেছে, আজ এই প্রথম মানুষ পেলুম, স্ত্রীলোক মানুষকে শান্ত করতেও জানে,—তার চিত্তবৃত্তিকে সংযত করতেও পারে। তখন নিজের অজ্ঞাতসারে ডেকে ফেললুম—"মা!" প্রাণটা সত্যি সত্যি সেদিন যেন কূলে কূলে ছাপিয়ে উঠলো—জীবনের অনেকগুলো ফাঁক মুহূর্ত্তে কে যেন ভরে দিয়ে গেল।

প্রসাদের বাড়ী থেকে ফিরে বাইয়ের ঘরে বসে কত কথাই ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ খুড়ো এসে

বল্লে—"গয়লাবৌয়ের সঙ্গে একবার না ?"

বল্লুম—"না, মনে করছি কালই তাকে ছেড়ে দেবো।" "সে কি।" খুড়ো এ-কথায় যেন আকাশ থেকে পড়লো। বিরক্তভাবে বল্লুম, "বাজে বকবেন না মশাই, আমার এখন ও সব কিছু ভাল লাগছে না—যান এখান থেকে।"

খুড়ো চলে যেতে মনে মনে ভাবলুম—গয়লাবৌকে নিয়েই বা আমি কি করবো ? তার দেহটাকে ত আর আমি ভালবাসি নি, যে জোর করে সেটাকে নিজের ভোগে লাগাবো। আমি যে ভালবেসে ফেলেছি তার ভিতরটাকে—যার উপর কোন জোর জবরদস্তিই খাটে না। তাকে আটক রেখে আমি কি করবো ?—কিছু না কিছু না—কিছু না !—কান্না থেমে গেল। স্ত্রীলোক যেখানে স্ত্রী বা মা বা বোন সেখানে তাকে জোর করে পাওয়া যায় না, জোর করে পাওয়া যায় কেবল সেইখানে যেখানে সে ভোগের সামগ্রী, যেখানে সে একটা মাটির ঢেলা মাত্র। গয়লা বৌকে ছেড়ে দোবো—নিশ্চয়ই ছেড়ে দোবো। কিন্তু এর মধ্যেও একটা কথা আছে।

পরদিন সকালে গয়লা-বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। আমাকে দেখেই সে মাটীতে লুটিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল, "আমাকে ছেড়ে দিন—আমি আপনার ছোট বোন হই, বোঁহাই আপনার।"

পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত চন্ চন্ ক'রে উঠল—বল্লুম, "তুমি কেঁদ না, এখনি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি; কিন্তু একটি উপকার করতে হবে, ছাড়া পেয়ে তুমি কারোর কাছে বোলো না, আমার সঙ্গে তোমার কোনদিন দেখা হয়েছে। অর্থাৎ আমি যে এর ভেতর আছি একথা ঘুণাক্ষরেও যেন কেউ টের না পায়।"

সে চোখের জল মুছতে মুছতে বল্লে, "আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি ভগবানের নাম নিয়ে বলছি—এ কথা আমার মুখ দিয়ে কোনদিন বেরুবে না।"

ভাবলুম এখুনি ছেড়েদি, কিন্তু একটু ভেবে দেখলুম, এখুনি না ছেড়ে নির্ম্মলকে সঙ্গে কোরে এনে তার সুমুখে ছেড়ে দিলেই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল হবে। কাজেও তাই করা গেল, নির্ম্মল ত অবাক ! সে আমার হাত দুটো ধরে বলে উঠল, "কিছু মনে কোরো না ভাই—তোমাকে আমরা আগাগোড়াই ভুল বুঝে এসেছি।" লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হোয়ে গেল। কি ভয়ানক প্রতারণা !—কিন্তু তা ছাড়া উপায়ও যে নেই। *

* ভাদ্র মাসের পূজায় আর পড়িল শ্রীমতী হাজরাবালা ব সুরউপর।

সঙ্কলন

পরাজিত জার্ম্মাণি

[অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্-এ]

(১)

জার্ম্মাণিকে এখনো তাহার পুরানা শত্রুরা বিশ্বাস করিতেছেন না। অনেক সময়েই ইহারা খোলাখুলি সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন যে, জার্ম্মাণরা ভার্সাই সন্ধির সর্ত্ত মানিয়া চলিতেছে না।

ভার্সাইয়ের বিধানে জার্ম্মাণিকে যুদ্ধ-সামগ্রী এবং লড়াইয়ের সাজসরঞ্জাম তৈয়ারী করিবার কারখানাগুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। সেই হুকুম না কি জার্ম্মাণরা আজও পুরাপুরি তামিল করে নাই। এমন কি শুনা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণরা অস্ত্রশস্ত্রের ফ্যাক্টরিগুলাকে কৌশলে এক সহর হইতে আর এক সহরে সরাইয়া ফেলিতেছে। অধিক

অনেক মামুলি ফ্যাক্টরিতে না কি আজকাল লড়াইয়ের যন্ত্রপাতিই তৈয়ারি হইতেছে।

ওয়াশিংটনের বিশ্ব-মেলায় ফরাসী মন্ত্রী ব্রিয়াঁ স্পষ্ট ভাষেই এই সকল সন্দেহ রটাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, রাসিনের কাগজে-কাগজে পড়িতেছি, ইংরেজ ও ফরাসী সমর-বিভাগের কর্ত্তারা আজ জার্ম্মাণির অমুক সহরের অমুক কারখানায় খানাতল্লাসি করিল; তার আর এক সহরে যাইয়া ফ্যাক্টরির উপর হুমারক দেখাইল ইত্যাদি।

খানাতল্লাসির কায়দাও বিচিত্র। কোনো ফ্যাক্টরির দেওয়াল ভাঙিয়া দেখা হইতেছে, তাহার ভিতর কোনো মাল লুকানো আছে কি না। ফ্রান্সের লোকের কোনো ফ্যাক্টরিতে প্রবেশ করিয়া জার্ম্মাণির ইংরেজ প্রভুরা বিনা বাক্যব্যয়ে কতক-গুলা বড়-বড় কাচের আলোক-ঘর হাতুড়ি পিটাইয়া চুরমার করিয়া দিতেছে। কর্ত্তাদের মতঃ—"এই সকল বৃহদাকার আসবাব বড়-বড় মালোদ্ধারি জাহাজে কাজে লাগে। জার্ম্মাণির ও আজকাল দরকারী নাই। এই যন্ত্রগুলা জার্ম্মাণিতে আজও রহিয়াছে কেন?"

এই ধরণের সরকারী খানাতল্লাসি চলিতেছে হরদম। মিউনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টকে একবার অবাধদিহি হইতে হইয়াছে। তাঁহার আফিসে আসিয়া উপস্থিত ইংরেজ-ফরাসী কর্ম্মচারীর কৈফিয়ৎ তলবঃ—"তোমার অধীনস্থ কলেজের ছাত্রেরা আজকাল অত্যধিক অনুশীলন-সমিতি গড়িয়া তুলিতেছে কেন? ব্যাভেরিয়ার লোকেরা গোপনে পল্টন তৈয়ারি করিতেছে বুঝি?" বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খাতা-পত্র, ছাত্রদের নাম-ধাম ইত্যাদি লইয়া তোলপাড় চলিতেছে। ছোকরাদের ক্লাবের উপর বিজেতাদের নজর কড়া।

(২)

সরকারী খানাতল্লাসীর উপদ্রবে বাতিব্যস্ত হইয়া জার্ম্মাণ মজুরেরা আত্মরক্ষার এক নূতন পথ ধরিয়াছে। কিছুদিন হইল সুইটজারল্যাণ্ডের জেনেভা নগরে আন্তর্জ্জাতিক মজুর-কংগ্রেস বসিয়াছিল। জার্ম্মাণি হইতেও প্রতিনিধি গিয়াছিল। তাহাদের অনুরোধে ইংলণ্ড-আমেরিকার মজুর প্রতিনিধিরা জার্ম্মাণির ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করিতে আসিয়াছে।

ব্যাভেরিয়ার বিভিন্ন সহরে এই সকল বিদেশী মজুরেরা কারখানা দেখিয়া বেড়াইতেছে। কলকব্জা লোহা-লক্কর ইত্যাদির পরীক্ষা চলিতেছে। যুদ্ধের সময়ে যে সকল কারখানায় লড়াইয়ের আসবাব তৈয়ারি হইত, সেই সকল কারখানাই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

পরীক্ষক মহাশয়েরা বুঝিতেছেন,—অথবা তাহা-দিগকে বুঝানো হইতেছে যে, ভার্সাই সন্ধির সর্ত্ত সকল ক্ষেত্রেই মানিয়া চলা হইতেছে। পুরান লড়াইয়ের ফ্যাক্টরিগুলাকে ভাঙিয়া শান্তির কার-খানায় পরিণত করা হইয়াছে। আর, এই পুনর্গঠিত ফ্যাক্টরিতে লড়াইয়ের মাল একরত্তিও তৈয়ারি হয় না।

বিদেশী মজুরেরা দেখিয়া-শুনিয়া খুশী। জার্ম্মাণ মজুরেরা বলিতেছে :—"আমাদের ফ্যাক্টরিগুলা ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য ফরাসী ও ইংরেজ সমর-নায়কেরা এত লালায়িত কেন জান তারা? শিল্প-বাণিজ্যের বাজারে জার্ম্মাণিকে ঠুঁটা করিয়া রাখি-বার উদ্দেশ্যেই বিজেতেরা এই বে-আইনি চালাই-তেছে। ইহারা জানে যে, জার্ম্মাণিতে লড়াইয়ের মাল আজকাল একরত্তি তৈয়ারি হয় না। তথাপি গায়ের জোরে একটা সন্দেহ রটাইয়া—একটা ধো-কা আছিলা দেখাইয়া, ইহারা আমাদের শিল্প কেন্দ্র-গুলাকে গুঁড়া করিয়া দিতে চায়।"

(৩)

বোলশেভিকদের ধন-সাম্য মত জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে কবে, তাহা কেহই জানে না। কিন্তু জার্ম্মাণির মজুর-সম্প্রদায় এখনই, অর্থাৎ

"বুর্জোআ" ধনী মহাজনদের আমলেই—অনেক আর্থিক অধিকার ভোগ করিতেছে।

১৯১৮ সালের ১৫ই নবেম্বর তারিখে সমগ্র জার্ম্মাণির মজুর ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় একত্র মিলিয়া এক পরিষৎ গঠন করিয়াছেন। সেই পরিষৎ পরিশ্রম-সম্পর্কীয় সকল নিয়ম জারি করিয়া থাকেন।

এই পরিশ্রম-পরিষদের বিধানে শ্রমীদের একুতিয়ার ধনীদের একুতিয়ারেরই সমান। প্রত্যেক ফ্যাক্টরির কাজ এক-একটা সমিতির অধীনে পরিচালিত হয়। সেই সকল সমিতিতে মজুর এবং ধনী উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকে;—হুপ্‌তিতে তাহারা সমানও বটে। মজুরের ভোট-সংখ্যা ধনীদের ভোট-সংখ্যারই সমান। কাজেই হয়ত বাহিতে পারে,—পরাজিত জার্ম্মাণির আবহাওয়ায় ইতোমধ্যেই "মজুর-স্বরাজ" অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

পরিশ্রম-পরিষদের প্রবর্ত্তিত মজুর-স্বরাজগুলা জার্ম্মাণ রিপাব্লিক কর্ত্তৃক আইন-সঙ্গত প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সমগ্র জার্ম্মাণির জন্য এক বিপুল পরিষৎ স্থাপিত হইল। এই "ফেডারাল" বা সর্ব্ব-জার্ম্মাণ পরিষদেও মজুরের ক্ষমতা ধনীদের ক্ষমতার সমান। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য,—আর্থিক জীবনের কোনো বিভাগই এই ফেডারাল পরিশ্রম-স্বরাজ হইতে বাদ পড়ে নাই।

(৪)

জার্ম্মাণির সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই কেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ দেখিতেছি। ছোট-ছোট দল একত্র হইয়া বড়-বড় দল গড়িতেছে। পল্লী-স্বাতন্ত্র্যের স্থানে "ফেডারাল" বা সর্ব্ব-জার্ম্মাণ ঐক্য প্রবর্ত্তিত হইতেছে। লড়াইয়ে হারিবার পর জার্ম্মাণরা এই-দিকে সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছে।

জার্ম্মাণিতে যতগুলা বড়-বড় শিল্প-কারখানা আছে, সবগুলি মিলিয়া এক বিশাল "কার্ট্যাল" (verband) গড়িয়াছে। এই কার্ট্যালের কর্ত্তা বা সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলে, জার্ম্মাণির কোন্ কারখানায় কত খরচে কোন্ মাল তৈয়ারি হয়, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। সমগ্র জার্ম্মাণির শিল্প-শক্তি এক্ষণে এক তাঁবে, এক মাথিয়ে পরিচালিত হইতেছে। "রাইখ্‌স্ ভার্বাণ্ড ডার ডাইচেন ইণ্ডুষ্ট্রী" (Reichs verband der deutschen Industrie) প্রতিষ্ঠানটাকে এক শিল্প-সাম্রাজ্য বিবেচনা করা চলে।

এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ফোগলার সাহেব সেদিন বলিতেছিলেন:—"ইংল্যাণ্ড জার্ম্মাণিতে বিলাতী মাল বেচিবার সুযোগ চুঁড়িতেছেন। এই জন্যই জার্ম্মাণদের সঙ্গে হাম-দর্দ্দি দেখাইতে ইংরেজেরা এত লালায়িত।"

মজুরদলের কেন্দ্রীকরণ জার্ম্মাণ-সমাজে খুব প্রবল। জার্ম্মাণিতে যতগুলি "ইউনিয়ন" বা মজুর-সমিতি আছে, অত নাই দুনিয়ার আর কোনো দেশে। সকলগুলি এক নিয়মের অধীন কাজ করেও।

কেন্দ্রীকরণ দেখিতেছি ছাপাখানার শিল্পে। জার্ম্মাণির ভিন্ন-ভিন্ন সহরে ছাপাখানার কলকব্জা যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিবার জন্য বহু জগৎ-প্রসিদ্ধ ফ্যাক্টরি আছে। সেই সকল ফ্যাক্টরি এক সঙ্গে মিলিয়া বৎসর খানেক হইল এক বিপুলায়তন অ্যাসোসিয়েশন গঠন করিয়াছে। পরস্পর আড়া-আড়ি অনেকটা কমিতেছে,—বিদেশে ছাপাখানার বাজারে বিলাতি ও মার্কিণ মালের সঙ্গে টক্কর দিবার পক্ষে এইরূপ কেন্দ্রীকরণে জার্ম্মাণির অনেক লাভ হইতেছে।

জার্ম্মাণির অনেক বড়-বড় গ্রন্থ-প্রকাশক এবং পুস্তক-বিক্রেতা আজকাল ঐক্যবদ্ধ "ট্রাষ্ট" গড়িবার দিকে ঝুঁকিয়াছে। এমন কি, বৈজ্ঞানিক পরিষৎ, সাহিত্য-সভা ইত্যাদি বিদ্যার কর্ম্মক্ষেত্রেও দেখিতেছি, অনেকগুলা পরস্পর স্বাধীন ছোটখাটো সঙ্ঘের স্থানে নিখিল-জার্ম্মাণীব্যাপী বিরাট পরিষৎ গড়িয়া উঠি-

তেছে। জার্ম্মাণির "প্রাচ্যতত্ত্ব"বিদেরাও এই বিড়িকে গোটা জার্ম্মাণির সম্প্রদায়কে একসূত্রে গাঁথিয়াছেন।

(৫)

জার্ম্মাণিতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা কথা আলোচিত হইতেছে। সোস্যালিষ্টমহলে "গান্ধি আন্দোলন" লইয়া বক্তৃতাদি চলিতেছে। ভারতীয় বক্তার ডাক পড়িয়াছে।

জার্ম্মাণ ভাষায় বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা দুই-একজন ভারতবাসীর আছে দেখিতেছি। ত্রিবাঙ্কুরের চম্পক রাম পিল্লে জার্ম্মাণ মহলে সুপরিচিত ভারতীয় জার্ম্মাণ বক্তা। অহর বৈরি এবং সত্তর বৈরি নায়ক এই ভারতীয় মুসলমান যুবক বার্লিনের "প্রাচ্য বক্তৃতাভবনে" মুসলমান মহিলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার সার-মর্ম্ম টাগেব্লাট কাগজে বাহির হইয়াছে।

বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "প্রিভাট ডোযেন্ট" (Privatdozent) অর্থাৎ সহকারী অধ্যাপক—জার্ম্মাণ যুবা—কোন্ গ্লাজেনাস "ডায়চে আল্‌গেমায়নেৎসাইটুঙ্" দৈনিকে বর্ত্তমান ভারত সম্বন্ধে মাঝে-মাঝে লম্বা প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। ভারতীয় নারীমজুরদের মহলে ধর্ম্মঘট ও হরতাল কেমন চলিতেছে, সেই সম্বন্ধেও এই কাগজে এক বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইয়াছে। লেখিকা এক জার্ম্মাণ মহিলা।

জার্ম্মাণির কোথাও নৈরাশ্য বা দুর্ব্বলতা দেখিতে পাই না। আগামী জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯২২) পুরাণা শত্রুদিগকে অর্ব্বুদ-অর্ব্বুদ সোনার মার্ক লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণ বাবদ বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাহাতেও জার্ম্মাণ মহাজনেরা অথবা গবর্মেণ্ট কিছুমাত্র ভীত নন। বরং সর্ব্বত্রই শিল্প-কারখানার মালিকেরা এই রাষ্ট্রীয় দেনা শোধ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

ক্রোড়পতি হিউগো স্টিনেস্ এবং ষ্ট্রাণ্টার রাটেনাও,—এই দুইজনে জার্ম্মাণিকে বিজেতাদের বাজারে-বাজারে হাজির করিয়া বেড়াইতেছেন। "রাইখ্‌স্‌ভার্ব্যাণ্ড" সভাপতি বিশ্বের বিদেশী ব্যবসায়ী মহলে জার্ম্মাণির সপক্ষে সহানুভূতি টানিয়া আনিতেছেন। রিপাব্লিকের মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক নামজাদা লোকই হাটে-বাজারে গলা ফাটাইয়া বক্তৃতা করিতেছেন :—

"ওগো পৃথিবীর নরনারী, শোনো-শোনো তোমরা সকলে। জার্ম্মাণি লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণের সকল টাকাই সুদে-আসলে সমঝাইয়া দিতে প্রস্তুত আছে। আমাদের প্রতিজ্ঞায় অবিশ্বাস করিও না।"

(৬)

ন্যাশন্যালিষ্ট অর্থাৎ সমরপন্থী (এবং কাইজার-ভক্ত অথবা রাজতন্ত্রী) জার্ম্মাণরা অবশ্য প্রাণে-প্রাণে বর্ত্তমান ছিট্‌স্ গবর্মেণ্টকে ঘৃণা করেন। ছিট্‌স্ গবর্মেণ্টের দুর্ব্বলতায় ইঁহারা যারপরনাই মর্ম্মাহত। ইঁহারা এত সহজে ইংলাণ্ডের আর ফ্রান্সের সকল আবদারেই "যো হুকুম" বলিতে রাজি নন।

রাইখ্‌স্টাগের (পার্লামেণ্টের) বক্তৃতায় ন্যাশন্যালিষ্ট দলের উপর মেজাজ গরম করিয়া ছিট্‌স্ বলিতেছেন :—"জার্ম্মাণির কোনো কোনো ন্যাশন্যালিষ্ট কাগজে দেশের আর্থিক দুরবস্থার কথার প্রচার করা হইতেছে। ইহা নেহাৎ ভুল। আমাদের অবস্থা কিছু কাহিল বটে; কিন্তু বিচলিত অথবা হতাশ হইবার কোনো কারণ নাই। লণ্ডনের ব্যাঙ্কার মহলে জার্ম্মাণির জন্য টাকা ধার লইবার আয়োজন চলিতেছে।" লণ্ডনের টাকার বাজার যাচাই করিবার জন্য ষ্টিনেস্ বাহাল আছেন।

প্যারিসের লিম্যানিতে বোল্‌শেভিকপন্থী কমিউনিষ্ট দলের কাগজ। জার্ম্মাণির তারিফ করিয়া সম্পাদক লিখিতেছেন,—"ফরাসিরা বেকুব। জার্ম্মাণিকে লড়াইয়ে হারাইয়া ফ্রান্স ভাবিয়াছিল জার্ম্মাণির বাজারগুলা তাহার দখলে আসিবে।

অথচ ফল হইল উল্টা। ফ্রান্সেই আজকাল ক্যাক্টরির ছুয়ার বন্ধ। কিন্তু জার্ম্মাণি নব তেজে স্বদেশী আন্দোলন চালাইতেছে। ইতালী, স্পেন, দক্ষিণ আমেরিকা এবং বল্কান অঞ্চলে জার্ম্মাণ মাল ছদ্ম করিয়া প্রবেশ করিতেছে। এমন কি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম এবং ইংল্যাণ্ডের বাজারেও জার্ম্মাণ মালই বিক্রী হইতেছে।"

এই অবস্থার আলোচনা করিয়া "লিম্যানিতে" বলিতেছেন :—"জার্ম্মাণরা এত ভুলিয়া উঠিল কি করিয়া? জার্ম্মাণ মার্ক সেহাৎ সস্তা। এই জন্য বিদেশীরা জার্ম্মাণিতে সওদা করিতে ঝুঁকিয়াছে। এ কথা সত্য। কিন্তু ইহাই জার্ম্মাণির রপ্তানি বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয়। পোল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রীয়ার লোকেরা শিল্পে ও বাণিজ্যে জার্ম্মাণদের সমান অগ্রসর নয়। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, জগতে মাথা তুলিতে হইলে নানা সদ্‌গুণ থাকা আবশ্যক। সেই সকল সদ্‌গুণের প্রভাবে জার্ম্মাণরা লড়াইয়ের পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডের ও ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সেই সকল সদ্‌গুণের জোরেই আজ জার্ম্মাণি লড়াইয়ে হারিয়াও বিজেতাদিগকে হঠাইতে চলিল।"

ভারতবর্ষ—শ্রাবণ।

ইংরাজী শেখা

[বীরবল]

যা মনে ভেবেছিলুম, তাই হয়েছে। স্কুলে বাঙলার চল হ'লে, বাঙালীরা আর যে ইংরেজি শিখবে না, এ কথা আবার উঠেছে। জন কতক উকিল কৌঁসুলি ও কাউন্সিলারকে এ নিয়ে গুজ্‌-গুজ্‌ করতে আমি স্বকর্ণে শুনেছি। অতএব তাঁদের ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করা যাক।

ইংরেজি যে আমাদের শেখা আবশ্যক এবং অতি আবশ্যক,—শুধু কর্ম্ম-মার্গে নয়, জ্ঞান-মার্গেও সে ভাষার যে আমাদের নিত্য-নিয়মিত প্রয়োজন আছে, সে কথা আমি সম্পূর্ণ মানি।

তবে জান্‌তে চাই যে, ইংরাজি শেখার মানে কি? ও ভাষা পড়তে শেখা, না বল্‌তে শেখা, না লিখ্‌তে শেখা?

যে লোক নিজের ভাষা ভাল করে জানে, আর যার মন কতকটা সাহেবী হয়েছে, অর্থাৎ যার মনে শিক্ষা লাভ করবার শক্তি জন্মেছে, সে যে-কোনও আর্য্য ভাষা বছর খানেকে এতটা আয়ত্ত কর্‌তে পারে যে,তাতে তার বই পড়ার কাজ মোটামুটি চ'লে যায়।

বিশেষ করে আর্য্য ভাষার নাম করবার কারণ এই যে, আর্য্য জাতীয় সকল ভাষারই গড়ন এক। বাঙলা ইংরাজি—ফরাসী জার্ম্মাণ এ সকল ভাষার ব্যাকরণের গোড়ার মিল আছে। আসল তফাৎ অভিধানে।

তার পর, আমার বিশ্বাস যে চীনে জাপানি ভাষাও দরকার হ'লে এক বছরে না হোক দুবছরে অনেকটা রপ্ত করা যায়। অন্ততঃ এ কথা ঠিক যে চীনে শেখবার জন্য বাঙলা ভোলা আবশ্যক নয়।

সুতরাং ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বভাষা শিখলে, আমাদের ছেলেরা আঠারো বছর বয়সে যে ইংরেজি শিখ্‌তে পারবে না, এ ভয়ে সেই সব বৃদ্ধের কথা, যাঁরা মনে বালক।

তার পর ইউনিভার্সিটি ত ইংরেজিকে স্কুল থেকে একেবারে বার করে দিচ্ছে না, তার বাধ্যতা ও পরীক্ষাই শুধু বজায় হবে। এটা বড় বেশী বয়স নয়।

আমাদের মত বাঙলা নবিশদের দাবী অবশ্য এর চাইতে ঢের বেশী। আমরা চাই—ইতিহাস ভূগোল গণিত, ইত্যাদি সবই বাঙলার পুরো দখলে আসে; আর ইংরেজী শুধু স্কুলে দ্বিতীয় ভাষারূপে বিরাজ করে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলাকে যেটুকু অধিকার দিয়েছেন, তাই যে আমরা হালের মতন শিরোধার্য্য করছি, তার কারণ, আমরা জানি যে, বাঙলা ওখানে ছুঁচ হয়ে ঢুকলেও, ফাল হয়ে বেরুবে। ও হচ্ছে আমাদের মনের বেনো জল।

(২)

যে যেটুকু ইংরেজি আমাদের পেটের দায়ে বলা দরকার, সেটুকু কাযের করতে মানুষের বড় বেশী সময় লাগে না। এ দেশে যে সম্প্রদায় কথা বেচে খান, অর্থাৎ উকিল সম্প্রদায়—তাঁদের অবশ্য ইংরাজি ভাষাটা মুখস্থ থাকা চাই। ওকালতির কাঁজ কিন্তু তাঁরা চোরা ইংরাজিতে দিব্যি চলে যায়। আদালতে আইন ব্যবসায়ীদের বাহাদুরের দিকে একটু মন দিলেই দেখা যায় যে, তাঁদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনের ইংরাজি একদম বে-পরোয়া,—সে ভাষা ইংরাজের ব্যাকরণও মানে না, অভিধানও মানে না। অথচ সেই ইংরাজির কৃপায় বহুলোক বহু অর্থ উপার্জ্জন করেছেন। আসল কথা কি জানেন, আদালতে খাঁটি ইংরাজি বলবার প্রয়োজন নেই; খাঁটি আইন বললেই টাকা করা যায়। তার পর ইংরেজের আদালতে ঐ আইন বলাও অতি সোজা; কেন না সে ক্ষেত্রে নিজে কিছু বলতে হয় না, শুধু বই খুলে reading পড়তে হয়, কেন না ইংরেজের আইন হচ্ছে নজির। তাদের আদালতে যে ভাষা বলতে হয়, সে ভাষা কেউ স্কুল-কলেজে শেখে না,—শেখে ঐ আদালতেই। আইনের ভাষাও একটী পরিভাষা। তাই এ ভয় নেই যে, স্কুলে বাঙলা ঢুকলে, বাঙালী আদালতে ঢুকতে পারবে না। আর তা ছাড়া কালের গতিকে বাঙলা একদিন আদালতেরও ভাষা হতে পারে।

(৩)

বাকী থাকুল আমাদের সব পলিটিক্যাল সভা-সমিতি। ইংরাজরা ভয় পেয়েছেন যে, বাঙলার দৌরাত্ম্যে সেটা কংগ্রেস না মারা যায়। আর কংগ্রেস যদি মারা যায় ত আমাদের এত সাধের স্বরাজের কি হবে? যাঁরা কস্মিন কালে কংগ্রেসের ছায়া মাড়ান নি, এমন সব বাঙালীরও দেখতে পাচ্ছি বাঙলার ভয়ে কংগ্রেসের উপর হঠাৎ মায়া পড়ে গিয়েছে। তাঁদের আশ্বস্ত করবার জন্য বলছি যে, বাঙলার ইতিমধ্যে, এক বস্তা-বস্তা ইংরাজি বিদ্যে বাঙালীর মনে ওষামজাত করা হয়েছে যে ইংরাজি পড়া এ দেশে একদম বন্ধ হয়ে গেলেও, আরও তিরিশ বৎসর কংগ্রেসে বক্তৃতা করবার জন্য বাঙালী-বক্তার অভাব হবে না। আশা করি তিরিশ বৎসর পরে আমরা স্বরাজ পাব —তখন অবশ্য কংগ্রেস বজায় রাখবার আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না। আর স্বরাজ যদি তখনও না পাই, ত সবাই বুঝবে যে ইংরেজি বকে আর কোন ফল নেই; আর তা বুঝিবামাত্র দেশী লোকে স্বভাষাতেই স্বরাজের কথা কইবে।

(৪)

ইংরাজি লিখতে হয় এক সরকারী কর্ম্মচারীদের আর এক সংবাদপত্রের সম্পাদকদের।

নিম্ন কর্ম্মচারীদের অর্থাৎ কেরাণীদের ত ইংরেজি নিজে লিখতে হয় না, পরের লেখা নকল করতে হয়। ও বেচারারা ত এক রকম রক্ত-মাংসের typ· writing machine। কেরাণী-গিরির জন্য ইংরাজিভাষায় পারদর্শী হবার প্রয়োজন নেই—ও ভাষার অক্ষর-পরিচয় থাকলেই নকলের কাজ ছাপাখানার মত অবলীলাক্রমে চলে যায়।

তার পর, দেশী হাকিমদের ভিতর এমন লোকের অভাব নেই, যাঁরা নির্ভুল ইংরাজিতে দু'পাতা চিঠি লিখতে পারেন না; কিন্তু বিশ পাতা রায় কিম্বা দু'শ পাতা রিপোর্ট অক্লেশে লেখেন। কারণ ঐ রায় রিপোর্টেরও জন্য স্বতন্ত্র ভাষা আছে,—যা স্কুল কলেজে কেউ শেখে না, সকলেই ঐ কর্ম্মক্ষেত্রেই শেখে। সুতরাং স্কুলের প্রশ্ন-পত্রের ইংরাজিতে জবাব না লিখলে আমাদের ছেলেরা যে সওদাগরের ও সরকারের চাকরী করতে পারবে না,—সে ভয় কারও পাবার দরকার নেই।

তার পর, ইংরাজি ভাষায় সংবাদপত্র লেখা জন্যও আশৈশব ও-ভাষায় কলম চালাবার দরকার।

নেই। এই কলকাতা সহরে বাঙালীর লেখা তিন-খানা দৈনিক কাগজ আছে; আর সে সব কাগজে যা কিছু মূল্য আছে, সে তাদের ভাষার খাতিরে নয়। Bengalee লেখেন ইংরাজির বাঁধিগৎ আর মুখস্থবুলি। আর Servant যে কেন ইংরাজি লেখেন তা Servantই জানেন। বাকী থাকল এক "অমৃত-বাজার"। কাগজখানি যে এতকাল এত সুপাঠ্য ছিল, তার একমাত্র কারণ, অমৃতবাজার কস্মিনকালেও ইংরাজের ইংরাজি লিখতে চেষ্টা করে নি,—চিরদিনই খাঁটি বাঙলার কথায় কথায় ইংরাজি অনুবাদ করে গেছে।

অতএব স্কুলে বাঙলা চোকার ফলে, ভবিষ্যতে আমাদের ওকালতিও মারা যাবে না, সরকারী চাকরীও মারা যাবে না, এডিটারিও মারা যাবে না।

আর ইংরাজি না জেনেও, ইংরাজি ভাষায় যে কি রকম চমৎকার কবিতা লেখা যায় তার প্রমাণ, বিখ্যাত বরানগর poetএর Englishman কাগজে প্রকাশিত কবিতাবলী। অতএব এটা নিশ্চিত, ভবিষ্যতে আমাদের হাত থেকে ইংরাজি কাব্যও বেরবে। ইংরাজি ভাষা শিক্ষার নামই যে শিক্ষা, তার চিরজীবন পরের ভাষা কণ্ঠস্থ করাই যে আমা-দের পক্ষে পরম পুরুষার্থ, যাদের এ মত, তাদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, এবার ঘরে তাঁরা যেন বিলাতে জন্মগ্রহণ করেন। —শর্ম

বীরবলের পত্র

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হলুম যে, ইউনিভারসিটির পয়-মায়ু ফুরিয়েছে। ও ব্যাপার আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে, টাকার অভাবে।

ইউনিভারসিটির ব্যয় না কি বেশীর ভাগ অপ-ব্যয়। তাই আমাদের Education Minister ইউনিভারসিটিকে টাকা আর জলে ফেলতে দেবেন না। আর যদি কিছু কিঞ্চিৎ দেন ও সে টাকার কানদেগে (ear-marked) করে দেবেন। ইউ-নিভারসিটি ও কানমলা টাকা নেবেন না। আর টাকা না হলে গভর্মেণ্টও চলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যও চলে না, কংগ্রেসও চলে না, কিছুই চলে না, সুতরাং ইউনিভারসিটিও চলবে না।

আমাদের Education Minister ইউনিভার-সিটির উপর কোনরূপ violent হস্তক্ষেপ করতে চান না, শুধু non-co-operation করতে চান। হাতে মারা প্রহার, কিন্তু ভাতে মারা আহার, এ মত দেবর্ষি উপরে উঠে গিয়েছে।

অবশ্য ইউনিভারসিটি চুপ করে নেই। তার কথা এই—

"আমার খরচ ব্যয় কি অপব্যয়, তা তুমি বুঝবে কি? ব্যয় ও অপব্যয়ের প্রভেদ এত সূক্ষ্ম যে, স্থূল-দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না। তার পর একের মতে যা ব্যয়, অন্যের মতে তা অপব্যয় হতে পারে। আমার মতে ministerদের যে মাইনে দেওয়া হয়, তার ষোল আনাই অপব্যয়। সে যাই হোক্, আমার কোন্ ব্যয়টা সদ্ব্যয় আর কোন্‌টি অপব্যয়, সে কৈফি-য়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে বাধ্য নই। আমি যে রকম ভাল বুঝি, সেই রকম খরচ করবার অধি-কার আইনতঃ আমার কাছে। হিসেব তুমি দেখতে পারো, কিন্তু তার উপর হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা তোমার নেই—ইউনিভারসিটি বলছে 'খবরদার'।

এর উত্তরে Minister মহাশয় বলেন:—

"তোমার স্বরাজ্য আমার সাম্রাজ্যের ভিতর; আর তা যদি না মানতে চাও ত মনে রেখো,—একটি পয়সাও পাবে না। রাখো তোমার আইন। আমার হাতে টাকার থলি, আর তোমার হাতে ভিক্ষের ঝুলি; অতএব কে কার অধীন, তা সবাই জানে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা-সচিবের এ লড়াই হচ্ছে ধনের সঙ্গে ধনের লড়াই। অতএব ধনেরই জয় হবে। ইউনিভারসিটি হচ্ছে দরিদ্র ব্রাহ্মণ,—বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের কাছে ভিক্ষা না পেলে, তার কপালে উপবাস ঘটবে; আর তার ফল মৃত্যু।

অতএব এটা নিশ্চিত যে, রিফরম কাউন্সিলের এখন এবং প্রধান কীর্ত্তি হবে, ইউনিভার্সিটী ভাঙ্গা। লোকমত এ কার্য্যের সহায় হবে; কেন না, এ হচ্ছে ভাঙ্গার যুগ,—তাই একটা বাড়ী ভাঙ্গতে দেখলেই, লোকে খুসি হবে। এ বিদ্যালয় বন্ধ করবার পর, তার লোকসমূহ দ্বারা অন্যান্য সম্পত্তি নিয়ে কি করা যায়, সেটাই হচ্ছে আপাততঃ আলোচনার কথা।

আমি এ বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব করছি, আশা করি বাড়ীবার বিদ্বজ্জন সমাজ আমার আবেদন বিনা বিচারে ডিস্‌মিস্ করবেন না। এ সব প্রস্তাব অনেক ভেবে চিন্তে করা হয়েছে।

(২)

(১) ইউনিভার্সিটি বন্ধ হলে অধ্যাপকের কি গতি হবে? আমার পরামর্শ যদি নেন ত, গণিতের অধ্যাপকেরা বড়বাজারে চলে যান মাড়োয়ারীর খাতা লিখতে; কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপকেরা পেটেন্ট ঔষধ বানান—এতে দু-পয়সা আছে; Physicsএর অধ্যাপকেরা বিহলী বাঁধেন, বিহলী পাখার মিস্ত্রী হোন; আর সাহিত্যের অধ্যাপকেরা আট আনা সিরিজের বই লিখুন; আর তাও যদি না পারে ত শ্বশুরের কাগজ লিখুন। বাকী পাকল এক দর্শনের অধ্যাপক। তাঁরা সকল কর্ম্মের বার; অতএব তাঁরা চরকা নিয়ে বসে যান—তাহ'লে তাঁদের হাতে ঐ চরকার ভিতর থেকে বেদান্ত-সূত্র বেরবে।

(২) ছাত্রদের পথ সব দিকেই খোলা! তাদের কতক পাঠানো হোক টোলে, কতক জেলে, কতক পাঠশালায়, কতক পশুশালায়, কতক হোটে, আর কতক মাঠে। হাটে গোল করবার জন্য, আর মাঠে গুলি-ডাণ্ডা খেলবার জন্য।

(৩) লাবরেটারির যন্ত্রপাতি সব যাদুঘরে পাঠান হোক। মৃত বিজ্ঞানের কঙ্কাল স্বরূপ সেখানে সে সব কাঁচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখা হবে। এতে দুদলের উপকার হবে—এক জনগণের আর এক প্রত্নতাত্ত্বিকদের। জনগণ ঐসব বিভঙ্গ বিহঙ্গ অরূপ বস্তু হাঁ করে দেখে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দরসে আপ্লুত হবে। তারা চিন্তে পারবে যে, ও সব হচ্ছে রূপকথার দেশের রাজকন্যার খাটুর এক-তন্ত, আর উইই ভিতর মানুষের শিওন-কাঠী মাপন কাঠী দুই লুকোনো আছে। অপর পক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ঐ সব কঙ্কালের ভিতর থেকে, বৈজ্ঞানিক যুগের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সব উদ্ধার করবেন, এবং তার জন্য সরকারের কাছ থেকে মোটা মাইনে পাবেন।

(৪) বইগুলো নিয়েই পড়েছি মুস্কিলে। ও অনাসৃষ্টির কোথাও চারগা হবে না,—এমন কি পাগলা গারদেও নয়। অতএব পুরাকালে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীর যেরূপ সৎকার করা হয়েছিল, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীর ও তদ্রূপ হওয়া উচিত। তবে আমি ব্রাহ্মণ সন্তান বলে পাঁজিপুথির অগ্নি-সৎকারের বিরুদ্ধে আমার একটা নৈসর্গিক কু-সংস্কার আছে। তাই ও প্রস্তাব আমি মুখে আনব না। তবে তা করবার লোকের অভাব হবে না। বিজ্ঞাপনের মুসাবিদাকরণ দেখে ঠের মিলবে।

(৫) Senate Houseকে মাধবদাসুর বাজারের অন্তর্ভুক্ত করা হোক্। ইউনিভার্সিটি উক্ত বাজারকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল। তাতে সরকারের অগাধ টাকা ব্যয় হত, অথচ এক পয়সাও আয় হত না। আর আমার প্রস্তাব মঞ্জুর হলে, সরকারের এক পয়সাও ব্যয় হবে না, উল্টে ঢের আয় হবে। আমার বিশ্বাস, ও ঘরের যে ভাড়া পাওয়া যাবে তার থেকে একটি নূতন minister অর্থাৎ fish market ministerএর মাইনা দেওয়া যাবে।

(৬) আমার শেষ প্রস্তাব এই যে ইউনিভার্সিটি কলেজে একটি নূতন পুলিসকোর্ট বসানো হোক্ এ বিষয়ে নজীর আছে। ডফ্ সাহেবের কলেজ ইতিপূর্ব্বে মোড়াবাগান পুলিশ কোর্টে পরিণত হয়েছে। এই নজীর অনুসারে, ইউনিভার্সিটি কলেজকে গোলদীঘির পুলিস কোর্টে রূপান্তরিত করা হোক। গোলদীঘির ধারে যে একটা পুলিস-কোর্ট থাকা দরকার, এ কথা বোধ হয় কোন মিনিষ্টারই অস্বীকার করবেন না।

আশা করি, Reform Council আমার উক্ত প্রস্তাব সব গ্রাহ্য করিবেন। ইতি। —হিজলী

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and Published by P. N. Pal, 26-3 Scott Lane, Calcutta.

যমুনা

ভাবে মুগ্ধা।

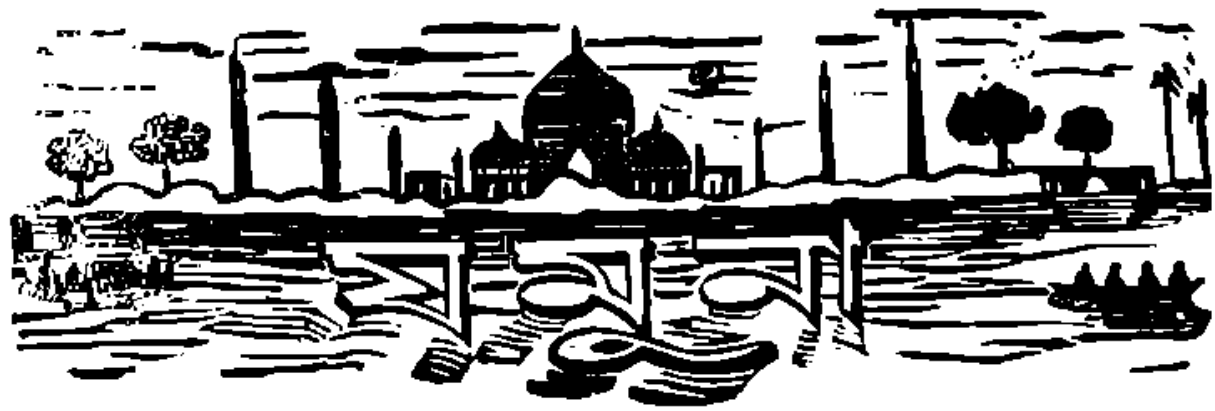

১২শ বর্ষ | ভাদ্র ১৩২৯ | ৫ম সংখ্যা

প্রেমোন্মাদ পুরুরবা

(শ্রীলীলা দেবী)

১

এ কি এ বিরাট সেই নিশাচর হরিয়া রমণী বিমান রথে !
শরাসনে বাণ জুড়েছে পামর আঁধার ছাইল গগন পথে !
তার মাঝে ঐ রূপের ছটায় ভেদিয়া তিমির কাঁদিছে বসি'
অনুপমা রমা দিব্যাঙ্গনা চির অতুলনা সে উর্ব্বশী !
শেষ আজি তার জীবন এ কথা এখনো জানে না দানব তারি
ইন্দ্র সভার উজ্জ্বল শোভা পুরুরবা নারী ল'য়েছে হরি !
হে দেবী দয়িতে ! হে সুর প্রেয়সী ! পারিজাতও যেথা বেদনা দেয়
সেই বরতনু অসুর পীড়ন এখনো কেমনে সহিয়া নেয় ?

২

ওহো ! এ যে ভ্রম ! আমি উন্মাদ ! নহে নিশাচর নীরদ নয় !
নহে শরাসন ইন্দ্রধনু যে শ্রাবণ ছেয়েছে অসীম নভ !
নহে বাণ এযে ঝরে অবিরাম বরষার ধারা নূতন কালো
নহে উর্ব্বশী চমকে চপলা কালোর কোলেতে ঝলিছে আলো

এত অভিমান ভালো নয় প্রিয়ে, এত নির্দয় কেমনে হ'লে ?
পলক ফেলিতে নিমেষ গণিতে কোথায় লুকালে গেলে না ব'লে
অমর লোকের চির ঈপ্সিত অনিন্দ্যনিধি হে অপ্সরী !
স্বেচ্ছায় ছাড়ি স্বরগের সুখ এ হতভাগো সইলে ধরি !—

৩

যার তরে সাধে ত্রিদিবের সুখ ত্যজি অনায়াসে এ মর-লোকে
সে পুরুরবায় ছাড়িয়া কেমনে আছ প্রাণাধিকে বিরহ শোকে ?
এমন তুমি তো ছিলে নাক সখী মুহূর্ত্তেকের অদর্শন—
সহিত না তব, ও মৃণাল ভুজে বাঁধিয়া রেখেছো অনুক্ষণ
দেখো, দেখো, দেখো, বরষার জাত রাজ উপচারে ভূষিত আজি
"কুমার অটবী" বুঝেছে তাহার অতিথি আজিকে ভুবন স্বামী
ক্ষণপ্রভার খচিত নবীন জলদ হ'য়েছে চন্দ্রাতপ !
নিচুল বিটপী চামর, বন্দী বিহগ করিছে স্তুতির জপ !

৪

কি কাজ এ ছার ভূষণ গরিমা যাউক অতলে সিংহাসন
চির প্রাণারাম নয়নাভিরাম, উর্ব্বশী বিনা যাইব বন
এই যে কলাপী নর্ত্তন করে শুধাই ইহারে প্রিয়ার কথা
হে নীলকণ্ঠ ! হে শ্রেষ্ঠবরণ ! বিচরিছ বনে বলো সে কোথা ?
তুমি কি দেখেছ সে মুখচন্দ্র ধরা ক'রে মোরে বলিয়া যাও
শুনিলে না কথা কিসের কারণ ? কেন বা বিমুখ চলিয়া যাও ?
বুঝেছি তোমার মন ভালো নয় দ্বেষের পাত্র তোমার সে যে
তাহার নিবিড় কুন্তল ভারে পরাজিত শিখী কলাপ নিজে

৫

ওরে আর কিছু শুধাবোনা এই কোকিলে এবার শুধায়ে দেখি
হে মধুভাষিণী ! তুমি কি দেখেছ অমৃতস্বরা সখীরে সে কি ?
হে রাজহংস ক'রনা গোপন বল না সত্য কোথা সে সতী ?
ধ্রুব নিশ্চয় তারি কাছে তুমি শিখেছ মোহন মরাল-গতি !
এই যে সরসে যুগল মিথুন বসিয়া রয়েছে চক্রবাক্
তোমরা দেখেছ সে মদিরাক্ষি, যার নখে শোভে চন্দ্র লাখ ?
ওহে ষট্‌পদ, সে মুখ-কমল কভুও তুমি কি ক'রেছ ঘ্রাণ ?
করনি কভুও করিলে সরোজে হ'ত নাক রতি, কুসুমে আন্ ।

৬

ওহে গজরাজ ! শুধাই তোমায় তুমি কি দেখেছ সে নব বেণ ?
মন্দার মালে জড়িত যে বেণী সুবাসিত যার কবরী কেশ ?

ওহে যূথপতে ! হে মদমত্ত ! দেখেছ কি তুমি সে প্রিয়তমা ?
স্থির যৌবনা, সুর বিলাসিনী, মোহিনী কামিনী সুদর্শনা !
হে ভূধর রাজ ! তোমার শিখর মনোহর অতি পুষ্পময়
সুমধুর স্বরে কিন্নরগণ গাহিছে তথায় স্বরণা বয়
তুমি কি দেখেছ আমারে আমার কামের ললনা হ'তেও রূপ
কেন কথা নাহি কহিছ তোমরা কেন আছ শুধু করিয়া চুপ ?

৭

এইবার দেখি নদীরে শুধাই হেন মনে লয় প্রেয়সী বুঝি
নদী রূপে আজ পরিণত তাই পাইনা তাঁহারে কোথাও খুঁজি
কারণ নিরখি ভ্রূভঙ্গি তাঁর লহরী লীলায় বারংবার
নদীর মতই কুটীলগামিনী বিহঙ্গের শ্রেণী মেখলা তাঁর
কেন পুলকেতে বসন হ'য়েছে কোপ বশে যেন শিথিল মত
অপরাধ মম সহিতে না পারি নদীরূপে আজ সে পরিণত
হে নদীরূপিনী উর্ব্বশী সখী হে নন্দনের অপরাজিতা !
পয়োরাশের, নীলকান্তের, চন্দ্রকান্তে হে সুশোভিতা !

৮

হও প্রসন্না হে মধু-হাসিনী প্রণাম চরণে করিছে দাস
ক্ষম অপরাধ হে দয়ারূপিনী, বিশ্বমোহিনী, ত্রিদিব হাস !
হে মানিনি ! মোর তোমাতেই রতি তোমারে তুষিতে পটু যে ও;
প্রণয় ভঙ্গে বিমুখ সতত তবে কেন মোরে ত্যজিলে বধূ ?
সুখের শয়নে নিবিড় মিলনে বাহুর বাঁধন শিথিল হ'লে
বিলাস শ্রমেতে সুপ্তি আসিলে ভাবিতে গিয়াছি প্রবাসে চ'লে
সে পুরুষবার ছাড়িয়া কেমনে রয়েছে। এখনো হে প্রাণাধিকে
পৃথিবীর পতি ভ্রমিছে গহনে উন্মাদ হ'য়ে চতুর্দ্দিকে !

বংশের কলঙ্ক

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(উপন্যাস)

(শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কলঙ্ক রটনা

কি হে পার, নামে কলঙ্ক কেমন করিয়া রটে ? বস্তুতঃ যখন কলঙ্ক রটে, তখন এক মুখ হইতে শত মুখে রটিয়া থাকে। বড় লোক, বড় আলাতন, বড় মর্ম্মপীড়াদায়ক জনরবের লেলিহান রসনা। যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ, নিষ্পাপ, তাহারও নামে কলঙ্ক

রটিতে বাধা থাকে না। সতী-শিরোমণি মা জানকীর কলঙ্ক-রটনা ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। যে রামহৃদয়বিহারিণী সীতা মনে কখনও পাপ-চিন্তা করে নাই, যিনি আজীবন বিশুদ্ধ স্বভাবা, যিনি পতিগতপ্রাণা, সেই সতী সাধ্বীর কলঙ্ক কেমন করিয়া রটিয়াছিল?

এই রটনার মূলে যে মানুষের প্রধান রিপুগুলি বিদ্যমান, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া, লোভ মানুষকে সর্ব্বদা মানুষের শত্রুতাসাধন করিতে প্ররোচিত করিতেছে। আমি সকল অংশেই তোমা হইতে নিকৃষ্ট, অথচ আমি তোমা অপেক্ষা জগতে উন্নতিলাভ করিতেছি, এটা তোমার সহ্য হয় না। আমার যতবার দেখ ততবারই তোমার গা জ্বলিয়া উঠে। তুমি আমার নামে কলঙ্ক রটাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি যে দ্রব্যে লোভ করিতেছি, বিনা আয়াসে সেই দ্রব্য তোমার হস্তগত হইল, আমার প্রতিহত বাসনার আগুনে তুমি জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইবে না ত' হইবে কে? তোমায় পাঁচজনে ভালবাসে, যশে প্রশংসা করে, পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন সকল-কার্য্যে তোমার পরামর্শ গ্রহণ করে, আমি যদি মনে করি আমার প্রাপ্যে আমায় বঞ্চিত করিতেছ, তাহা হইলে আমি একটা অস্বাভাবিক কাজ করি না। মনের মাঝে এসকল ভাবের উদয় হইলেই মানুষ কেবল চেষ্টা করে কিসে মানুষকে পাঁচ জনের কাছে খাট করিতে পারে। জগতের বহু কলঙ্কের মূল খুঁজিলে এইরূপ একটা না একটা কারণ পাওয়া যায়।

আবার আর একটা বড় মজার কারণ আছে, সে কারণের মূলে এই সব রিপুর প্রাবল্য নাই। সে কারণটা হইতেছে মানুষের স্বভাব। লোকের নামে কলঙ্ক শুনিতে আগ্রহ স্বতঃই যেন মানুষের মনে সঞ্জাত হইয়া থাকে। অবশ্য সাধারণ মানুষের সম্বন্ধেই এই কথা বলিতেছি, সাধু সন্ন্যাসী বা মুনি ঋষির সম্বন্ধে বলিতেছি না। কি জানি কেন, লোকের কোনও গুণের কথা উল্লেখ করিয়া সুখ্যাতি করিলে মানুষ ততটা আগ্রহের সহিত শুনে না, যতটা আগ্রহের সহিত শুনে কোনও চরিত্রবানের চরিত্রস্খলনের কথা বা গুপ্ত অবৈধপ্রণয়ের কথা। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় গোপনে অজস্র দান করিতেন বলিলে লোকে যতটা আগ্রহের সহিত শুনিবে, বোধ হয় যদি মিথ্যা করিয়া বলি যে তিনি গোপনে বেশ্যালয়ে মদ্যপান করিতেন, তাহা হইলে লোকে সেটা ততোধিক আগ্রহের সহিত শুনিবে। যে দিনের সংবাদপত্রে কোন বড় লোকের কুৎসা কলঙ্ক অথবা কোন বলাৎকার বা অবৈধ স্ত্রীপুরুষ মিলনের কথা প্রকাশিত হয়, সেই দিনের সংবাদপত্র বাজারে যত বিক্রয় হয়, বোধ হয় কোনও বিখ্যাত ধর্ম্মবক্তার প্রাণস্পর্শিনী বক্তৃতা প্রকাশিত হইলে তত হয় না। ইহা অতিরঞ্জিত নহে, ভূয়োদর্শনের ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। কেন এমন হয় বলা সহজ নহে, তবে এটা যে হয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

অরুণকুমারের অদৃষ্টেও বিধাতা এইরূপ কলঙ্ক-রটনা লিখিয়াছিলেন। অরুণের শুভ অদৃষ্ট, তাহার উপর বিধাতার প্রায় সকল শুভ আশীর্ব্বাদই বর্ষিত হইয়াছিল, কেবল এই একটা অশুভ অভিশাপ তাহার মাথায় অজ্ঞানতঃ পতিত হইল। কোথা হইতে কি হইল, কে প্রথমে এই কলঙ্কের কথা রটাইল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে যদি তোমরা মেস্ বাড়ীর রমেশের পেটের কথা টানিয়া বাহির করিতে পার, তাহা হইতে খুব সম্ভবতঃ সবই জানিতে পারিবে। অথচ আশ্চর্য্য, রমেশ যে ইহার সহিত কোনও রূপে সম্পর্কিত, তাহা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিবার কারণ নাই; বরং অরুণের বিপক্ষে এই কলঙ্কের সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিলেই সে সতেজে তাহার প্রতিবাদ করিত।

যেমন ইলেক্‌ট্রিক সুইচ টিপিলে বৈদ্যুতিক

আলোক জ্বলিয়া উঠে অথবা পাখা ঘুরিয়া থাকে, আবার বিপরীত দিকে টিপিলে দুই কার্য্যই বন্ধ হইয়া যায়, তেমনই এই কলঙ্কের কথা রমেশের অঙ্গুলি সঙ্কেতে সুযোগমত ছড়াইয়া পড়িত সঙ্কেতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। রমেশ এই কলঙ্কস্রোত প্রবাহিত করিবার উপযুক্ত খাত কি তাহা বিলক্ষণ জানিত, তাই সে মুড়ি-ওলী ও বাবাজীর সাহায্য লইয়াছিল। মুড়ি মুড়কি খই বাতাসা লইতে দোকানে আসিত না, এমন কি চাকর সে পাড়াতেই ছিল না। আর বাবাজী নাম গাইয়া ভিক্ষা করিতে যাইত না, এমন পাড়াই ছিল না এবং হাত হইতে ছিলিম দিয়া তাহাকে একটান তামাক খাওয়াইত না, এমন খানসামা গোছের সহিস কোচমান বা চাকর দরোয়ানও ছিল না। আবার এই সব খাত দিয়া যে স্রোত বহিয়া থাকে, তাহার গতি কতদূর, তাহা বোধ হয় বুদ্ধিমান পাঠককে বুঝাইতে হইবে না।

প্রথমে ফাপাঘুষা পরে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর, শেষে প্রকাশ্যে চোখঠারাঠারি ইসারা ইঙ্গিত, মুচকি হাসি, গল্প-গুজব। কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ করিয়া এত কাণ্ড হইতেছে, সে তাহার বিন্দু বিসর্গও জানে না। সে যেমন বরাবর মাথা উন্নত করিয়া এ পাড়া ও পাড়া বেড়াইয়াছে, ঠিক সেইরূপই বেড়াইতে লাগিল। কলঙ্ক সহস্র জিহ্বা বাহির করিয়া বলিল, "ওঃ কি বেহায়া! বড় মানুষের ছেলে কি না, তাই ভয় নেই, লজ্জাও নেই!"

মেসের বাবুদের মধ্যে কথা হইল। একজন বলিল, "কি হে, শুনছি কি? আমাদের "ক্রিপস অব ওয়েলস্" যে খুব মেতেছে হে।"

আর একজন বলিল, "তা ডুব্‌লি ডুব্‌লি, এমন পানা পুকুরে কেন? গয়লার ত' অভাব নেই।"

তৃতীয় বাবু বলিলেন, "কি না একটা খোলার ঘরের মুড়ি-ওলীর মেয়ে! ছ্যাঃ!"

প্রথম বলিলেন, "বারে! মুড়ী-ওলীর মেয়ে হতে যাবে কেন? ওকে ত' প্রিন্সই এনে রাখে রেখেছে। কেন জানিস? হুঁ, হুঁ।"

পাঁচ সাত জনে তখন তাঁহাকে বিষম আগ্রহের সহিত চাপিয়া ধরিল, "কেন নিতাই দা, কি হয়েছে নিতাই দা, বলনা নিতাই দা," ইত্যাদি। নিতাই দা একটী গেজেটিয়ার বিশেষ। তিনি উইকলি পাষণ্ড (প্যালেজার, মেসের বাবুরা তামাসা করিয়া পরস্পর এই নাম বাহির করিয়াছিলেন) তিনি রসা ইঞ্জিনিয়ারিং আপিসে কাজ করিতেন এবং প্রতি শনিবারে কালীঘাট রেল-ষ্টেশনে গাড়ী চাপিয়া বাড়ী যাইতেন। ঐ শনিবার দিন তিনি তরিতরকারি মাছ মিষ্টান্নের সহিত এক ঝুড়ি সহরে কেলেঙ্কারি খবর দেশে লইয়া যাইতেন। এবং দেশের বাঁধা-কুলক্ষণায় অথবা কোনও প্রতিবেশী গৃহস্থের দাওয়ায় বসিয়া দা-কাটা তামাকে দম মারিতে মারিতে দীর্ঘাঙ্গনাধিতে ভুগিয়া মোরব্বা-বিশেষ পল্লিবাসী-দিগকে গরম গরম টাটকা তাজা নানা মসলাদার চানাচুর বিশেষ সহরের কলঙ্ক কুৎসা ভক্ষণ করাইতেন। তাঁহাদের বড় সাহেবের ভাইপো এই সবে মাস তিনেক বিলেত থেকে এসেছে এখানে আপিসের কাজ শিখতে—একবারে ছোঁড়া—ইংরিজি ছাড়া কিছু জানে না—তাঁরই কাছে ব'সে কাজ শেখে, সে তাঁকে কাণে কাণে বলেছে যে বিলেতে মেম সাহেবদের মধ্যে একটীও ভাল নেই; তাঁদের আপিসের দরোয়ানের এক বন্ধু গল্প করেছে, তাদের আপিসের ছোট সাহেব রোজ রাত্রি বারোটার সময়ে একটী ক'রে মেম নিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ে আপিসে আসে; চালসটীর লক্ষপতি মোকানদার রামরাম ভেড়ের রোজপক্ষের স্ত্রী দশ হাজার গহনা নিয়ে বাসার রসুয়ে বামুনের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে; ঘুঁটে-চোপার জমিদারের তিনটে বাঁধা মেয়েমানুষ আছে, একটা ইহুদী, সেটার কাছে তার বড় ছেলেটাও লুকিয়ে লুকিয়ে যায়। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে পনেরো আনা গুজব নিতাইদার নিজের

যাইত। নিতাইদা আবার যখন সোমবারে দেশ হইতে সহরে ফিরিতেন, তখনও আগামী শনিবারের হাটবাজারের হর্ষের সহিত দেশের এক মুড়ি কুৎসা লইয়া আসিতেন।

এ হেন নিতাইদা যখন পাড়ার বড়লোকের ঘরের একটু কুৎসার সন্ধান পাইয়াছেন, তখন আর রক্ষা আছে কি! আসরটী বেশ জমকাইয়া লইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আরে, তোরা শুনিসনি, বাজারময় যে চি চি পড়ে গেছে। ছুঁড়িটার যে আট মাস!"

"এ্যাঁ, বল কি নিতাই দা, বল কি?"—দুই চারিটী বাবু এক সঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিলেন।

নিতাইদার মহা আনন্দ। মাছ যেমন জল পাইলে আনন্দিত হয়, স্কুলের ছেলে ছুটি পাইলে যেমন আনন্দিত হয়, পেটুক যেমন নিমন্ত্রণের পত্র পাইলে আনন্দিত হয়, নিতাইদাও তেমনই আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আরে, তাই ত' ছোঁড়া এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছে। গেরস্থর মেয়ে কিনা, পাছে হাঙ্গাম হুজ্জুত হয়?"

একজন বলিলেন, "মুড়িওলী রাখলে যে বড়?"

নিতাই দা চোখ মুখের অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ ও মধ্যমাঙ্গুলি ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন, "বাবা রজতকাঞ্চন, বাবা রজতকাঞ্চন! কাঠের পুতুলে কথা কয়, রাজী হবে না! হাজার হাজার খানি চাক্কি মুখের কথা কিনা!"

আশু সার্কেল এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া কেচ্ছা শুনিতেছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "বাবা, তোমাদের সব কথাই শুনলুম, কিন্তু একটা কথা মনে লাগছে না। তোমরা বলছ, ছুঁড়িটা মুড়ি-ওলীর বাড়ী গাড়ী চলার পর হতে এসেছে; কিন্তু আমি ওকে তার আগে দেখেছি।"

কি রকম?—পাঁচ সাতজনে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আশু সার্কেলকে চাপিয়া ধরিল। সার্কেল মৃদু হাসিয়া বলিল, "বাবা, রমেশের ঘর থেকে সরু গলির জানালা খুলে দেখেছি।"

নিতাই দা বলিলেন, "বটে, বটে, ডুবে ডুবে জল খাও, সার্কেল খুড়ো! আমরা বলি, খুড়ো ভাঙ খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে। বাবা, তোমার পেটে পেটে বুদ্ধি!"

"রস, রস, বাবা, মাথায় চাঁটি মেরো না অমন ক'রে, মৌজ ছুটে যাবে। বাবা, রমেশের ঘরে কি সাধ ক'রে গিয়েছিলুম একখানা খামের দরকার হ'ল, বাসায় কেউ নেই, কেবল আমি আর রমেশ। তখন সবাই আপিসে বা স্কুল কালেজে। আমার পেটে অসুখ ছিল বলে বাসায় ছিলুম, আর রমেশ তখন পায়খানায়, তাই ঘর খুলে রেখে গিয়েছিল, নইলে ওর ঘর ও না থাকলে রাতদিন চাবিবন্ধ, ঘরে আছে মনে করে আমি ঢুকে দেখি কেউ নেই। টেবিলের টানায় খাম দেখতে গিয়ে শুনতে পেলুম, মুড়ি-ওলীর বাড়ীর অন্দরে দুই মেয়ে মানুষে খুব চেঁচামেচি হচ্ছে। বাবা, ওখানে মেয়ে মানুষ ত' ঐ মুড়ি-ওলী একা, তবে কাছাখোলা বাবাজীকে যদি মেয়ে মানুষ বল, তা হলে আলাদা কথা। গলা খানাও কাঁচা ঠেকলো। কে এল কাঁচা মেয়ে মানুষ মুড়িওলীর বাড়ী মেয়ে ঝগড়া করতে জানতে বেজায় পেট ফেঁপে উঠলো। আর থাকতে পারলুম না, খুট ক'রে ঐ সরু গলীর দিকের জানালাটা খুলে একটু ফাঁক করলুম। ভাবলুম ওটা রাত দিন বন্ধ থাকে ব'লে খুব আঁট আছে, কিন্তু টানতেই সহজে খুলে গেল। বাবা, ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখি খোলার বাড়ীর কলতলায় দাঁড়িয়ে খাসা—"

"আরে, সে কোনও জানা মেয়েমানুষ মুড়ী-ওলীর সঙ্গে হয়ত' একদিন দেখা করতে এসেছিল। ওরকম আমরাও ত' কতদিন খোলার বাড়ীতে মেয়ে মানুষের গলার আওয়াজ পেয়েছি।"

"আরে না না, আমি কি কচি খোকা? বাইরের মেয়ে মানুষের ত' দোকান-ঘর পর্য্যন্ত দৌড়, তারা ভিতরে কলতলায় গিয়ে ভিজে গামছা পরে সাবান মাখতে মাখতে—"

এইবারে সত্যসত্যই আশু সার্কেলের মাথায় চারিদিক হইতে চাঁদা করিয়া চাটি পড়িতে লাগিল। সার্কেল কোনও রূপে মাথা বাঁচাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আরে, বাবা, মারিস কেন! কেয়া খুবসুরৎ চেহারা! প্রিন্সকে বাবা যতই দোষ দাও, কিন্তু পছন্দটা তার খুব ভাল।"

"চুপ, চুপ," হঠাৎ সকলের মুখেই রব উঠিল। রমেশ ঠিক সেই সময়ে তথায় উপস্থিত হইল। সে কখন নিঃশব্দে সিড়ি বাহিয়া উঠিয়াছে, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। রমেশ আসিয়াই উপস্থিত সভ্যগণের প্রতি কটমট চাহিয়া বলিল, "দেখ সার্কেল খুড়ো তোমরা অরুণের কথা নিয়ে যখন তখন তোলাপাড়া কর, এ তোমাদের ভাল নয় বলে দিচ্ছি।"

ভয়ে মেসের বাবুদের প্রাণ উড়িয়া গেল। তাঁহারা অরুণকুমারকে ভালই চিনিতেন। রমেশ তাহার "বন্ধু" সে যদি এই সব জল্পনা কল্পনার কথা অরুণের কাণে তোলে, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ, তাহাদের পাড়ার বাস উঠিয়া যাইবে। জলে বাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে কলহ! যদিও মাথায় রাজ-মুকুট নাই তথাপি অরুণ বকুলবাগানের রাজা। তাহার নিকট উপকার প্রাপ্ত হয় নাই, উপকারের প্রত্যাশা রাখে না অথবা তাহাকে ভাল বাসে না, ভয় করে না, ভক্তি শ্রদ্ধা করে না, এই ভবানীপুর অঞ্চলে এমন লোক বিরল।

নিতাইদা হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, "তা ঠিক কথাই বলেছে রমেশ। আশু খুড়োর যেমন বুদ্ধি, অরুণবাবুর নাম নিয়ে তামাসা মস্করা না করলেই নয়। জানিস ত' বাবু, হাতে পাঁজী মঙ্গলবার, অরুণবাবু আমাদের এই মেসের তিন তিনটে ছেলের স্কুলের মাইনে দিচ্ছে, বই যোগাচ্ছে।"

মেসের তাবৎ লোকই অবাক, আশুখুড়োর ত' কথাই নাই। ধরিতে গেলে প্রথমে নিতাইদাই অরুণের কথা তুলেন, অথচ এখন তিনি অরুণের পক্ষ লইয়া আশুখুড়োর শ্রাদ্ধের যোগাড়ে আছেন!

সার্কেল মহাশয় চোখ বুজিয়া মজা উপভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু মেসের দুই একটী বাবুর ইহা একেবারে সহ্য হইল না। একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বাবু বলিয়া উঠিলেন, "এশ নিতাইদা, নিজে নাটের গুরু হ'য়ে এখন সার্কেল খুড়োর ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ! বেশ যা হোক!"

নিতাইদা দুই চক্ষু যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "আমি? আমি নাটের গুরু? কলির ধর্ম্মই এইরকম! আমি হলুম নাটের গুরু? বেশ, তাই তাই। এই মুখ বুজুলেন শর্ম্মা, আর কোন শালা তোদের সঙ্গে কথা কয়।"

সার্কেল খুড়ো হাসিয়া বলিলেন, "থাক, তাই হোক, তুমি আর স্পিক টী নট (কথাটী কোয়েনা) নিতাইদা। তাহ'লে বাঙ্গলা হ'তে মিথ্যেদেবীর তিন ভাগের একভাগ অন্তর্দ্ধান করবেন।"

সকলে হো: হো: হাসিয়া উঠিলেন। নিতাইদা চটিয়া আগুন। চীৎকার করিয়া বলিলেন, "খুব করব। মিথ্যে কথা বলব, কারুর বেরে ত' বলি নি—"

"আহা, চট কেন নিতাইদা, চট কেন—"

"কে চটেছে? আমিই মিথ্যে একচেটে করে রেখেছি, না? আর সবাই সতী লক্ষ্মী ধর্ম্ম পুত্তুর যুধিষ্ঠির।

না, না, কে তোমায় মিথ্যেবাদী বলে? ও খুড়ো তোমায় তামাসা করছে বৈ ত' নয়।"

"সাতেও নেই পাঁচেও নেই বাবা, নিজের ধন্দা নিয়েই আছি বাবা, তাও সহ্য হ'ল না। আমি মিথ্যেবাদী! আর খুড়ো যখন রমেশের ঘরে ঢুকে আমায় ফাঁক ক'রে মেয়েছাপুষ দেখে, তার বেলা দোষ হয় না, না?"

সকলের মুখ শুকাইল। রমেশ ভ্রূকুটী করিয়া সার্কেলের দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "কি রকম?"

সার্কেল খুড়ো চোখ বুলিয়া স্থির করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "আরে, তুমিও যেমন রমেশ, ওসব কথা শোন কেন। যত হচ্ছে চেঙড়া ছোঁড়া।"

নিতাই দা রাগিয়া বলিলেন, "কি রকম চেঙড়া কি রকম? তুমি ছুঁড়িটাকে উঁকি মেরে দেখছ, এই মাত্র বলছিলে না? বাবা, এই না তুমি সত্যবাদী!"

সার্কেল খুড়ো এইবার একটু ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন, "সত্যি যদি বলতে তা সবটাই বলে ফেল নিতাই দা। সেই ছুঁড়ির সঙ্গে অরুণ বাবুর লটঘট হ'তে আরম্ভ ক'রে আট মাস পর্য্যন্ত যা যা বলছো, সবটা বল। শুধু আমার উঁকি মারার কথা বললে হবে কেন।"

রমেশ যেন ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইবার ভাণ করিয়া বলিল, "এ সব কথা কোত্থেকে রটে তা ত' জানিনা। অরুণ যে ও ছুঁড়ির কাছে যায়, তা তোমারা দেখেছ? আবার বলছ আট মাস। তা হলে বল অরুণই তার দাদী?"

রমেশের মুখ চোখের ভাব দেখিয়া সকলেই ভীত হইল, এমন কি সার্কেল খুড়াও কোন জবাব দিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু অমূল্য নামক একটী যুবক কথা কহিল। সে সহরে এক সওদাগরী আপিসে কাজ করিত। সে বলিল, "আট মাস কি ক'মাস, তা জানিনি বটে, তবে সত্যি কথা যদি বলতে বল তা হলে আমি জানি অরুণবাবুর মুড়িওলীর বাড়ী রাতে যাতায়াত আছে।"

রমেশ মহা গরম হইয়া বলিল, "দেখ, পরের নামে মিথ্যে ক'রে যা তা বোলো না, অরুণ যাবে মুড়ি-ওলীর বাড়ী! হতেই পারে না। তুমি নিজের চোখে দেখেছ?"

অমূল্য বলিল, "হাঁ দেখেছি। আমার আপিসের এখন ক্রোসিয়েের সময়। আমার বাসায় ফিরতে রোজই প্রায় নটা সাড়ে নটা হয়। আমি ঐ সময়ে অরুণবাবুকে দুই একদিন মুড়ি-ওলীর বাড়ী থেকে বেরুতে দেখেছি।"

আরও দুইজন মেম্বর সাহস পাইয়া সাক্ষ্য দিল যে তাহারাও ঐরূপ দেখিয়াছে। কেহ কেহ বলিল যে, তাহারা দিনের বেলাও অরুণকে নিঃসঙ্কোচে মুড়ি-ওলীর বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছে।

রমেশ তখন মহা গম্ভীর হইয়া কণেক নীরবে থাকিয়া বলিল, "তোমরা যখন এতজনে বলেছ, তখন আর কি বলব। তবে আমার একটা অনুরোধ তোমরা ভাল করে না জেনে শুনে এ সম্বন্ধে কানা ঘুষো কোরো না। জান ত' কত বড় লোকের ছেলে! তোমরা যদি একদিন আমাকে হাতে নাতে দেখাতে পার, তবেই বিশ্বাস করব, না হলে নয়।

এতক্ষণে একটা কথার মত কথা পাইয়া নিতাই দা লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "আলবৎ দেখাব। শুধু তোমার কেন এপাড়ের লোককে দেখাব।"

সার্কেল খুড়ো বলিলেন, "তা দেখিয়ো। কিন্তু মনে থাকে যেন, তোমার ভাইপোর কালেজে পড়ার খরচাটা কে দিচ্ছে।"

নিতাই দা কুৎসার গন্ধ পাইয়াছেন, এখন আর তাঁহাকে পায় কে? দূর তোর ভাইপোর লেখাপড়া। একটা আধমুনে কাতনা প্রেফতার হবে, এসময়ে কি ষড়যন্ত্রের জাল গুটান যায়। পাগল আর কি। এহতে নিতাইদার গলায় ছুরি দাও না কেন?

নিতাই দা একান্তে বলিলেন, "তা কি করব, তা ব'লে ত' আর অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতে পারি নি। সত্যি কথা বলব, এতে জান যাক আর থাক।"

রমেশ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, তা হ'লে কবে দেখাচ্ছ নিতাই দা? মনে থাকে যেন, এ ছেলে খেলা নয়।"

নিতাই দা বলিলেন, "কি দেখান ত'? আজই

দেখাতে পারি, তার ভাবনা কি? আমার ঘরে সন্ধ্যার পরে বসে থেকো, বাসায় সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো।"

একজন বাসাড়ে বাবু বলিলেন, "সন্ধ্যেও ত, হয়ে এলো "

নিতাই দা বলিলেন, "বেশ, আমি ঘরে গিয়ে সন্ধ্যেটা সেরে নিই, তার পর ডাকলে সবাই যেয়ো, কেমন?"

বাবুরা একে একে খোলা একতালার ছাদ হইতে নিজের নিজের ঘরে গেলেন, রমেশও নিজের ঘরের তালা খুলিয়া ঢুকিল। রমেশ তিনটী সিটের ভাড়া দিয়া দোতালার একটী ঘর নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল। কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া রমেশ একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বড় গলীর দিকের জানালার ধারে বসিল। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের পানে তাকাইয়া রমেশ কি একটা বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিল। বিষয়টা যে গুরুতর, তাহা তাহার দুই আঙুলে ধরা আধ-মোড়া সিগারেটের নির্ব্বাপিত অগ্নি দেখিয়াই স্পষ্টই অনুমিত হয়।

রমেশ ভাবিতেছিল অরুণের কথা। অরুণটা কি বোকা! তার মত নিরেট গাধা দু-ভারতে আছে কিনা সন্দেহ। কি অসন্দিগ্ধ মন তার! লোকে তাকে সরল বিশ্বাসী অরুণটে ব'লে কত সুখ্যাতি করে। আরে এটা সুখ্যাতি না অখ্যাতি? যাদের মাথা নেই, বুদ্ধি নেই, যারা সংসারের ঘোর পেঁচ একটুও বোঝে না, পদে পদেই তাদের ফাঁদে ফেলা যায়। অসুরের মত শরীর তার, গায়ে মত হস্তীর বল তার, মনে সদাই স্ফূর্ত্তিতে উৎসাহ উদ্যম তার, জগতের যত আমোদ যত খেলা ধূলোর উপভোগ শক্তি তার, প্রথম যৌবনের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ তার। ভেবে চিন্তে কাজ করতে তার উন্মুক্ত বালকের প্রাণ তাকে অবসর দেয় না, সে যা করে সবই প্রবৃত্তি বশে। একটু দুঃখ কষ্ট দেখলেই তার প্রাণটা গ'লে যায়, একটু উপকার পেলেই সে একবারে উপকারীর কেনা গোলাম হয়ে পড়ে। এ সব লোকের দ্বারা জগতের কি উপকার হয়েছে? রাগলেও রাগ দেখাবে না, কিন্তু মনে মনে সেই রাগ দুঃখের আগুনের মত পুষে রেখে যে সুযোগ ও সুবিধার প্রতীক্ষা করে; মনে আনন্দ রাজোৎসাহ হ'লে ছেলেরা দৌড়ার মত মুখে চোখে তা না দেখিয়ে যে সেই আনন্দ বা উৎসাহের ফল মনে মনে উপভোগ করে, দুঃখ কষ্ট দেখলে যে একবার নেতিয়ে না পড়ে, কিসে নিজের ভাগ্যের বা উন্নতির অবনতি হবে এটা যে সর্ব্বদা চোখের সামনে আদর্শ রেখে কাজ করে যায়, সেই ত' মানুষ তারই বলি মাথা আছে, বুদ্ধি আছে। জগতে যত বড় বড় লোক জন্মেছে, তাদের জীবন-কথা পাঠ করলেই দেখতে পাওয়া যায় যে, এই অরুণটার মত বেদা-মারা, যন্তা গণ্ডায় বড়লোক হ'তে পারি নি, আমার মত বুদ্ধিমান বিবেচক লোকেই হয়েছে। আরব অক এসেছটা যদি যন্তা গন্তা না হয়ে চালাক চতুর হ-ত, তা হ'লে তাকে রাণী এলিজাবেথের বাহুবন্ধন থেকে মাথা সরিয়ে নিয়ে অহলাদের খাঁড়ার নীচে দিতে হ'ত না।

ওঃ ভগবানের কি অবিচার? কালীশঙ্করের কোটি কোটী টাকা এই মাথা মোটা বোকাটার জন্যে খুইয়ে রেখেছেন! এই মস্তিষ্ক হীন মহা মূর্খ এই অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পদ নিয়ে কি করবে? এই অগাধ ধনের মালিক হয়ে এই অগাধ ধন কি করে ব্যবহার করতে হয়,তা কি বোকা জানে? ঐশ্বর্য্যের কি ক্ষমতা, তা কি এই বস্তাবার্ক বোঝে? ও এই ঐশ্বর্য্য নিয়ে বড় জোর গাড়ী ছুটি হাঁকাবে, কনসার্ট করবে,—বস, ঐ পর্য্যন্ত! আর আমি? আমি আমার এই বুদ্ধি, এই মাথা, এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পরের মন জুগিয়ে চাকুরী করে অজানা দরিদ্র থেকেই ইহজীবনটা কাটিয়ে যাব। হা রে বিচার।

আমার এই টাকা থাকলে আমি কি হ'তে পারতুম, আমার এই টাকা থাকলে এদেশে যশের

কাছে কত বড় একটা ক্ষমতাশালী লোক হতে পারতুম, এ টাকার মালিক হলে লোকের ভালমন্দ করবার আমার কত ক্ষমতা হত, এইটাকার জোরে রাজদরবারে আমার কত স্থান সম্ভ্রম হ'ত! এমন ভাবনা মনটাকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে!

ছেলে বেলায় বাবাকে বলতে শুনেছি যে, এই জীবনটা দাবা খেলার মত, সংসারের নর নারী দাবার ছকে সাজান এক একটী বল; যে খেলতে জানে, সে এই সব নর-নারীকে চাল দিয়ে যথাস্থানে সাজিয়ে ইহকালের বাজী মাৎ করতে পারে। আমিই বা পারবো না কেন? আমার সামনে ত' ছক সাজান রয়েছে। ছই রাজা কালীশঙ্কর আর রামসদয়, সরোজ, অমিলা, অমিয়, অরুণ,—এই কটী প্রধান বল; তারপর ঘুঁটেরো বল হচ্ছে,—বাবাজী, মুড়িওলী, গিন্নিবালা, মেসের বাবুরা, পাড়ার লোকেরা, খানসামা কিয়েরা। এখন ভেবে চিন্তে ভাল চাল দিতে পারলেই হ'ল। পয়লা নম্বর চাল যা দিয়েছি তার ভাল সামলাতেই বাছাধনকে আর বোধ হয় উঠে ধানে পথ্যি করতে হবে না। খেলায় নেমেছি, দেখি কে জেতে কে হারে!

মস মস করিয়া সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল, রমেশের চিন্তায় বাধা পড়িল, রমেশ উৎকর্ণ হইয়া শুনিল কে আসিতেছে। সে ভাবিল, হয়ত' নিতাই দা এইবার তাহাকে ডাকিতে আসিতেছেন। কিন্তু ক্ষণপরেই তাহার সে ভ্রম দূর হইল, আগন্তুক ঘরে প্রবেশ করিয়াই বালকের ন্যায় মধুর কোমল কণ্ঠে বলিল, "এই যে রমা! ঘরে আছিস? আজ ক'দিন ধ'রে একটা কথা ব'লব ব'লে তোকে গরু খোঁজা কচ্ছি। বেশ লোক যাহ'ক কোথায় ডুব মেরেছিলি বল দিকি?

যে কথা কহিল, সে অরুণ কুমার। সে কথা বলিতে বলিতেই জুতা সমেত রমেশের বিছানার উপর চৌদ্দপোয়া হইয়া শুইয়া বেশ নিশ্চিন্ত প্রফুল্ল মনে সিগারেটের ধূম উদ্গিরণ করিতে লাগিল।

যাহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছে, সেই অরুণ কুমার স্বয়ং অতর্কিতভাবে উপস্থিত হওয়াতে রমেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল- তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু অন্ধকারে অরুণ কিছুই দেখিতে পাইল না। ইহার মধ্যে রমেশও সামলাইয়া লইয়াছিল, সে ব্যঙ্গের সুরে বলিল, "গোরু খুঁজছিলি গরুই পাবি, আমায় পাবি কেন?" এটা রমেশের মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া গেল, এমন ভাবে মেজাজ ঠিক না রাখা তাহার স্বভাব ছিল না। যাহা হউক, সে তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া লইয়া গোলমালের ভাবে বলিল, "যাক্, এমন অসময়ে প্রিন্স এখানে যে? অধমের এ কি সৌভাগ্য?"

অরুণ হো হো রবে হাসিয়া বলিল, "তোর 'প্রিন্স' বুলী এখনও গেল না? কখনও বলিস 'কাপ্তেন' কখনও বলিস্ 'প্রিন্স'। আমি কোন্‌টা ঠিক করে বলত?"

"তোর কি নামের অন্ত আছে, তুই যে অনন্ত! ভাই, যে দিন তুই আমায় মাধু কাকার গ্রাসত্ব থেকে মুক্ত ক'রে তোর রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলি, সেদিন থেকেই তোকে ত' প্রিন্স বলেই জানি। তুই যদি প্রিন্স না—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ করেছিস। তোকে যদি আমি জোর ক'রে টেনে নিয়ে না আসতুম, তা হলে 'রাজপ্রাসাদের' সাতখানা সোণার রথ পাঠালেও তুই আসতিস্ নি। তোকে ত' আমি জানি।"

"তা ঠিক। আমাদের মত গরীবের ধন দৌলৎ নেই বটে, তবে মনের স্বাধীনতাটুকু আছে, ঐটেই আমাদের সম্বল। এই দৌলতের গর্ব্ব করতে পারি বটে, আর ওতে আঘাত লাগলে প্রাণে আঘাত লাগার চেয়ে বেশী লাগে।"

"তাই ত' আমার পায়ে ধরে সেধে কাঁদাটাও ঠেলে ফেলে মেসে এসে উঠলি।"

"ভাই, দিন কতক রাজভক্তে বসে ভুলে গিয়েছিলুম আমি কে। আমার যা ছিলুম তাই হয়েছি—

"দেখ্ রমা, ও সব কথা বলিস নি বলছি আমি তোকে ভায়ের মত আপনার বলে জানি, তুই আমায় পরের মত দেখিস কেন বল দেখি? তুই কি ভাবিস আমি তোকে চিরদিন চাকুরী করতে দেব? দিন দুই সখ হয়েছে করে নে। আমার যদি ভাই থাকতো, তাকে কি করতুম বল দিকি? তোর যদি ঐ স্বাধীনতার অহঙ্কারটুকু না থাকত।"

"তুই আমায় ভালবাসিস্ ব'লে ও সব কথা বলছিস্, কিন্তু আমি যা বলছি যথার্থ কিনা বল দিকি? আমি গরীবের ছেলে ব'লে, আর ছেলেবেলা থেকে দারিদ্র্যের স্কুলে পড়েছি ব'লে, ধনে আমার লোভ নেই। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই ব'লে রাজভোগে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। তা ব'লে ভাবিসনি যে, অহঙ্কারের জন্ত তোর উপরোধ রাখি নি। কিন্তু তোর কথা স্বতন্ত্র, তোর জন্তে কেমন সহজ সরল জীবনের পথ প'ড়ে রয়েছে।"

ভুল, রমেশ, ভুল। ওটা তোদের ভুল বিশ্বাস। মানুষের বাসনা কখনও পূর্ণ হয়? তুমি একটা জিনিষ কামনা কর, আমি হয় ত' সেটা পেয়েছি কিন্তু অন্ত একটা জিনিষ কামনা করি, অথচ শত চেষ্টাতেও সেটা পাই না যদি এমন হয়, তা হ'লেও কি বল, আমার জন্ত পৃথিবীর পথ সরল হয়ে রয়েছে?" অরুণ এই কথা বলিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

রমেশ অপাঙ্গে কটাক্ষপাত করিয়া অরুণের দিকে চাহিল। যদি অরুণ সে সময়ে রমেশের মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত তাহার মুখে হিংসা কুটিলতার কি ভীষণ ভাবাভিনয় হইতেছে। রমেশ ভাবিতেছিল, "হুঁ, তোমার কি কামনা, বাসনা, তোমার কিসের অভাব, তা আমার জানতে বাকি নেই। চোখ থাকতেও তুমি অন্ধ, তাই জান না, তোমার সেই বাসনার জিনিষটী তোমারই মুখ চেয়ে প্রাণধারণ করছে। কিন্তু তাকে তোমার হতে দেব না, এই আমার প্রতিজ্ঞা। তার যোগাড়ও সব করে রাখছি। হাড়ি কাঠে যখন একবার মাথা দিয়েছ, তখন কোপের জন্তও প্রস্তুত হয়ে থাক।"

অরুণ তাহাকে নীরব দেখিয়া বলিল, "হাসছ রমেশ? হাঃ হাঃ হাঃ। তোমার কোন অভাব আছে বিশ্বাস করি নি। আমারও যে কোনও জিনিষের অভাব বোধ হয়, তাও বলতে পারি নি। তবে একটা অভাবের কথা মনে ওঠে বটে, কিন্তু তার কোনকালে পূরণ হবে না ব'লে মনেই মিলিয়ে যায়।"

"কি অভাব, রমা -"

"পয়সার। আমার নিজের জন্ত নয়, পরের জন্তে। যখন জগতের চারিদিকে দুঃখ কষ্ট দেখি, তখন সেই দুঃখীদের দুঃখ কষ্ট ঘোচাবার বাসনা মনে বড় প্রবল হয়ে ওঠে, কিন্তু পয়সার অভাবে সে বাসনা মনেই লোপ পেয়ে যায়।"

অরুণ সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "এই কথা? ভাই রমা, তোর যখন যার দুঃখ কষ্ট ঘোচাবার বাসনা হবে, তুই আমায় বলিস্ নি কেন? ভাইয়ের কাছে চাইতে যদি লজ্জা হয়, তা হলে জানব তুই যথার্থ আমায় ভালবাসিস্ নি। এই দেখ্, আমার যখন যা দরকার হয়, আমি ত' তোর বা সরোজের কাছে চাইতে কখনও দ্বিধা করি নি। বল্, এবার থেকে আমায় যখন যা দরকার বল্‌বি?"

অরুণ আগ্রহাতিশয্য বশে রমেশের হাত দুখানা চাপিয়া ধরিল রমেশ একটু মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। ভাল পাগল যা হোক।"

অরুণ এইবার এক গাল হাসিয়া রমেশের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "Thats like a good dear (এইবার ঠিক ভাল ছেলেরই মতই বলেছ)। এই দেখ্ না, আমি এখনই তোর কাছে একটা জিনিষ চাচ্ছি। চাইবার জন্তেই এসেছি, কথায় কথায় আগে বলবার সময় হয় নি। তোকে পর মনে করলে আগে তোর কাছে আসবো কেন?"

রমেশ কৃত্রিম আনন্দের সহিত তাহার করমর্দ্দন

করিয়া বলিল, "বেশ করেছিস্, এইছিস। এখন কি জিনিষ চাচ্ছিস্ বল দিকি।"

"বল্‌ছি, বোস্। জানিস্, আস্‌ছে সপ্তাহে আমি আসাম যাব। কিন্তু আমার উপর এমন একটা গুরু ভার পড়েছে যে, সেটা ফেলেও যেতে পাচ্ছি না, অথচ না গেলেও নয়। সেই কাজটার ভার তোর উপরেই দিয়ে যেতে চাই।"

"আমার উপরে? কি কাজ? অবশ্যই ক'রব।"

"কাজটা একটা স্ত্রীলোককে নিয়ে। একথা কাউকে এতদিন বলিনি, এমনকি সরোজকেও না। কথাটা কি জানিস, আজ দিন কতক আগে এই গলিতেই ঐ স্ত্রীলোকটীকে গাড়ী চাপা দিয়েছিলুম। জানিস ত,' গাড়ী জোরে হাঁকাই ব'লে বাবা বড় অসন্তুষ্ট হন, অথচ কেমন বদ স্বভাব, আস্তে হাঁকতে পারি নি। দুই এক দিন চেষ্টা করে ছিলুম, আবার ভুলে যাই।"

"তার পর।"

"তার পর সেদিন বিষ্টিতে ভিজছিলুম বলে, একটু জোরে গাড়ী হাঁকিয়ে যাচ্ছিলুম, রাস্তাটাও আঁধার ছিল। হঠাৎ ঐ স্ত্রীলোকটা অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হতে গেল, খুব জোরে ব্রাশ ধরেও তাকে বাঁচাতে পারলুম না, সে গাড়ী চাপা পড়ল। মুড়ি-ওলীর দোকান খোলা ছিল তখানে তাকে নিয়ে গেলুম। তখানে একটা বাবাজী এসেছে,সেই ডাক্তার ওষুধ টষুধ এনে দিলে। ডাক্তার বল্‌লে, ব্রেন, একেই (মস্তিষ্ক বিঘড়ে গেছে) করেছে। শিগ্‌গির চেতনা হবে না। আজও সেই অবস্থায় রয়েছে।"

"এই মুড়ি-ওলীর বাড়ীতে রয়েছে? বাঃ এত কাণ্ড হয়ে গেল, আমরা কিছু জানিতে পারলুম না?"

"কি করে জানবি? ব্যাপারটা হৈ হট্টগোল না হয়, তার ব্যবস্থা করেছি কি না। সেরে উঠলেই ওর ঠিকানা জেনে বাড়ী পাঠিয়ে দেব। ডাক্তার বলছে, আরও অনেক দিন লাগবে।"

"হাঁসপাতালে দিলি না কেন? সব গোল চুকে যেত।"

"না ভাই, বাবাজী বারণ করলে, আর মুড়িওলী সব ভার নিলে, তাই হাঁসপাতালে দিলুম না। আর হাসপাতালে দিলেই ত' কাগজে ঢাক পিটুত!

"তা বেশ করেছিস। এখন কি করতে হবে?"

"যাবার সময় টাকা দিয়ে যাব, তুই ওরে দেখবি শুনবি, ওর জন্যে যা লাগবে মুড়ি-ওলীর হাতে দিবি। তার পর যদি টাকা ফুরিয়ে যায়, আমায় জানালেই আসাম থেকে তোর নামে টাকা পাঠিয়ে দেব। কল কথা পয়সার অভাবে স্ত্রীলোকটির যেন কোন কষ্ট না হয়। আহা, অবলা রমণী! আমারই দোষে তার এই শাস্তি হয়েছে!"

"এই কথা! এর জন্যে এত উপরোধ অনুরোধ। এত ভদ্রলোকমাত্রেরই ডিউটী (কর্ত্তব্য)।"

"যাক, সরোজকে বল্‌বে!"

"দরকার? তাকে কেবল ভাবিয়ে তোলা। আর এই হ'তে হ'তে পাঁচ কান হয়ে পড়বে। তখন মুড়ি-ওলীর বাড়ীটা একটা সো-রুম (দেখবার জায়গা) হয়ে পড়বে। তার মেসের পাশে বসেই তার খবর নেবার সুবিধা হবে, সরোজের ত' তা হবে না।"

হায়! তখন যদি অরুণ সরোজকে বলিত! বিধাতার ধাপা-ধোকা ব্যবস্থার তাহা হইলে যে ওলট-পালট হইয়া যাইত।

রমেশের মুখে উৎকট আনন্দ ও সন্তোষের রেখা ফুটিয়া উঠিল। সেই রেখার সঙ্গে সঙ্গে কি অরুণের অলক্ষ্যে দারুণ হিংসা কৌটিল্যের চিহ্ন প্রকট হইয়াছিল? কে জানে।

কিন্তু রমেশ প্রকাশ্যে বলিল, "বেশ, তাই হবে। তোর এই স্ত্রীলোকটির জন্যে যা করতে হয় করব, টাকার দরকার হলেই চেয়ে পাঠাব।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই একজন লোক নিঃশব্দে রমেশের ঘরে প্রবেশ করিল। তিনিনিতাই

দা এই মাত্র আহ্নিক সারিয়া নরপদেহ রমেশকে ডাকিতে আসিয়াছেন। অরুণ তখন দ্বারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া টেবিলে পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল, কাজেই সে নিতাইদার গৃহ-প্রবেশ-ব্যাপার দেখিতে পায় নাই; দ্বারের বাহিরেরে মেসের আরও কয়জন মেম্বর দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহাও সে লক্ষ্য করে নাই, এমনই ভান করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, "তুমি একটা ভার দিয়ে যাবে, আমি আর তা করব না? বিশেষতঃ অবলা রমণী, তুমি খরচ দিয়ে রাখছ, আমি তোমার হ'য়ে খরচপত্র ক'রব, দেখা শুনা করব এটা কি একটা বেশী কথা হ'ল। তা হলে আর বন্ধুত্ব কিসের? আর একথা কাকে বকেও টের পাবে না, চুপি চুপিই হবে। এঁ্যা, কে নিতাই দা, তোমরা কতক্ষণ এলে, চল যাচ্ছি।"

অরুণ মেসের বাবুদিগকে দেখিয়া টেবিল হইতে নামিয়া রমেশের কাঁধে একটা হাত রাখিয়া বলিল "তা হলে ঐ কথা রইল। আমাকে চিঠি লিখে জানাস কেমন থাকে। আমার মনটা বড় ব্যস্ত হয়ে থাকবে। বুঝিলি? এর মধ্যে আর একদিন এসে টাকা দিয়ে যাব। এখন যাই। কি মশায়েরা আপনারা সব ভাল আছেন?"

নিতাই দা সে মানুষ নাই, একবারে মাখনের মত হইয়া গিয়াছেন। হাত কচলাইতে কচলাইতে কাতরতা আকুতা করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, গরীব দুঃখী লোক আমরা, আমাদের আর থাকাথাকি কি? কি বাবুনাকি আসাযে যাচ্ছেন? কেন যাচ্ছেন? কেন বাবু রাজার ছেলের আবার বন জঙ্গলে যাওয়া কেন?"

রমেশ বলিল, কেন নিতাই দা, রাজার ছেলেরা কি মৃগয়ায় যায় না?" অরুণ হাসিয়া বলিল, "আমিও যেমন রাজপুত্তুর, তেমনি আমার মৃগয়ায় যাওয়া।"

নিতাই দা দুই পাটী দন্ত বিকসিত করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ বাবুর সঙ্গে কথায় পেরে উঠবে কে? হাঁ বাবু, বলছিলুম কি, আমার ঐ ভাইপোটার আর দুটী ক'রে টাকা বাড়িয়ে দিন না, গরীবের বড় উপকার হবে।"

অরুণ তখনও হাসিতেছিল, সে বলিল, রমেশকে বললেই ত' পারতেন। এ মাস থেকে পাবেন। হাঁ, আপনাদের গাঁয়ের সেই যে কামারদের ছেলেটী ভুগ্‌ছিল, সে সেরে উঠেছে?

নিতাই দা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কোন কামারের ছেলে?"

রমেশ বলিল, "বাঃ সেই যার চিকিৎসা পথ্যের জন্য দশটা টাকা নিলে, মনে নেই?"

নিতাইদা মুহূর্ত্তেই সপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "ও হোঃ হোঃ, বটে, বটে, কেমন বিস্মরণ হয়েছিলুম। হাজার হোক বয়স হয়েছে কি না! ঐ হারাণ কামারের ছেলেটা গো, পেটপোরা পিলে, জ্বর, কাশি, রক্ত আমাশা, ভেদ বমি! আহা ছেলেটার কিছু ছিল কি? ভাগ্যে বাবুর ঐ দশটী—"

অরুণ বাধা দিয়া বলিল, "থাক্ টাকা রমেশের কাছেই পাবেন। এখন চললুম। রমা, ভাই, বড় উপকার করলি, ঘাড়ের উপর থেকে খুব একটা ভাবনার বোঝা নামিয়ে নিলি।"

অরুণকুমার এই কথা বলিয়া এক এক লাফে দুই তিনটা সিঁড়ি নামিয়া প্রফুল্লমনে সিস দিতে দিতে চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে মেসের বাবুদের মধ্যে ঘোঁট চলিল। সে ঘোঁটের কথা পরে জানিতে পারিবেন। (ক্রমশঃ)

মাতাল

(চিত্র)

(শ্রীমনোলেখা রায়ী)

তখন শীতকাল।

সেদিন রাত্রে খোস্ খেয়ালে বাহাল তবিয়তে মদ খেয়ে বাড়ী ফিরছিলাম রাস্তা দিয়া একলা। কোন দিকে বড় একটা খেয়ালিই ছিল না।

বোধ হয় সেদিন পূর্ণিমা, সারা সহরে বিরাট বুকের উপর জ্যোৎস্না নিশাড় ঘোরে পড়েছিল। এমন কি তাহার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন পর্য্যন্তও ছিল না। ঐ রকমের ঘুমন্ত জ্যোৎস্না অনেককাল দেখিনি—তাই প্রাণভরে কতক্ষণ যে দেখেছিলুম তা বলতে পারি না। আমার মত মাতালের মধ্যে এত কবিত্ব কেন? জ্যোৎস্নার মধ্যে কি কিছু মাদকতা আছে?

হঠাৎ কাণে এল এক ধ্বনি, তা প্রাণে গিয়ে ভীষণ জোরে বিঁধ্‌ল। সে কত স্বরের মধ্যে এখনও অস্ অস্ কোরছে—মরলেও বুঝি যাবে না!

নিকটে গিয়ে দেখি—এক অভাগিনী। মলিন ও আর্দ্রবসনে সমস্ত শরীরকে ঢেকে নিয়ে ঝুকরে কাঁদছে।

কাছে গিয়ে বল্‌লুম, "তুমি কাঁদছ কেন?"

কেঁদে বল্লে, "আজ আমাদের দু'দিন খাওয়া হয়নি বাবুজি?" এই বলে সে কাতর-দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। এমন করুণ ও মিনতি ভরা দৃষ্টি কখনও চোখে পড়েনি। আমাকে বিহ্বল কোরে তুল্‌ল।

কোঁচার খোঁটে হাত দিয়ে দেখি যে টাকা ছিল—তাহা নাই বরং সে স্থান কাটা।

প্রাণটা অধীর হোয়ে উঠ্‌লো কি কোরব ভেবে না পেয়ে চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইলুম—তার পাশে।

কিছুক্ষণ কেটে গেলে সেই অভাগিনী আবার বল্লে, "বাবা, কিছু খেতে দাও বাছা যে দুদিন কিছু খায়নি!"

তাহার পাশে যে ছেলেটি অঘোরে ঘুমোচ্ছিল, সে ক্ষিদের জ্বালায় চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। আর সে স্থানে দাঁড়ান অসহ্য মনে কোরে যেমন এক পা বাড়াব, অমনি সে বল্লে, "বাবা, কিছু দিলে না?" বলে কেঁদে উঠ্‌লো।

দুঃখিনীর এই কথা প্রাণে তীব্র ভাবে বিঁধ্‌লো। স্থির থাকতে না পেরে যেমন বালকটিকে কোলে তুলে নিতে যাব, অমনি দুঃখিনী এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো যে সে স্থানটি শিউরে চকিত হোয়ে উঠ্‌লো। সে চিৎকারে চারিদিকে অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লাম পায়ের তলা যেন সরে সরে যেতে লাগলো।

সভয়ে বল্লুম, "আমি তোমার ছেলে নিয়ে পালাচ্ছি না—গায়ে গরম কাপড়টা ভাল কোরে জড়িয়ে দিচ্ছি—যে রকমের ঠাণ্ডা।"

সে তাহাতে বিশ্বাস করিল না বরং আমার দিকে সন্দিগ্ধ—দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তাহার সে দৃষ্টি এখনও আমি চোখের সাম্‌নে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। সে কি ভুষিত দৃষ্টি!

* * *

রোজই মদ খেয়ে হৃষ্টচিত্তে গভীর রাত্রে বাড়ীতে ফিরি কিন্তু সে পথ দিয়ে কখনও যেতাম না; কি জানি পাছে আবার কি শুন্‌বো।

একদিন কয়েকজন বন্ধু মিলে কতই না জানি খেয়েছিলাম—তা ঠিক এখন বোল্‌তে পারি না; তবে সেদিনের নেশাটা অন্য দিন হতে গভীর হোয়ে।

যে যার মতন গাড়ী কোরে বাড়ী চলে গেল।

হেঁটে যখন অতরাত্রে বাড়ীতে ফিরতেই হবে, তখন টল্‌তে টল্‌তে রাস্তা দিয়ে আপন মনে ফির্‌ছিলাম। রাজপথ জনমানব শূন্য—যেন মরুভূমির মত বোধ হোচ্ছিল। সেদিনে আবার তেমনি কোরে অফুরন্ত জ্যোৎস্না গলিত রজত ধারায় প্রবাহিত হোচ্ছিল।

রাস্তারা কি যায় আসে জানে? আমি যতবার সেদিকে যাবনা ভাবছিলাম ততই যেন সেদিকে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লাম—কিসের টানে।

গিয়া দেখি কি যেন এক অসাড় হোয়ে পড়ে আছে রাস্তার পাশে। মনটা যেন কিসের ভারে ন্যুয়ে গেল। তখন সেই বালকটির কথা মনে পড়লো। আরও নিকটে গিয়ে দেখি—সেই বালকই। বিস্ময়ে অভিভূত হোয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম—অলক্ষ্যে এক দীর্ঘ-শ্বাস বেরিয়ে গেল।

যে রকম কোরে সেদিন আমি বালকটিকে গরম কাপড় দিয়ে জড়িয়ে দিয়েছিলাম—ঠিকই তেমনি নিসাড় ও নিথর অবস্থায় একা রাস্তার পাশে পোড়ে আছে। তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে দেখি—প্রাণে স্পন্দন নেই। গোলাপ পাপড়ির মতন ঠোঁট দু'খানি বিবর্ণও শ্রীহীন।

মাতাল হোলে কি হয়—আমি সেই বিবর্ণও শুষ্ক ওষ্ঠপুটে গাঢ়ভাবে চুম্বন রেখা মুদ্রিত কোরে দিলাম। আমার সেই মাতালের নেশা এক নিমিষে উধাও হোয়ে কোথায় ছুটে গেল।

হা'র-মানা-হার

(কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম)

তোরা কোথা হ'তে কেমনে এসে মণি-মালার মত আমার কণ্ঠে জড়ালি?
আমার পথিক জীবন এমন ক'রে ঘরের দ্বারায় মুগ্ধ ক'রে বাঁধন পরালি॥
আমায় বাঁধ্‌তে যারা এসেছিল গরব ক'রে হেসে
তারা হা'র মেনে হায় বিদায় নিল কেঁদে,
তোরা কেমন ক'রে ছোট্ট বুকের একটু ভালোবেসে
ঐ কচি বাহুর রেশমী ডোরে কেল্‌লি আমায় বেঁধে!
আহা চল্‌তে গেলে পায়ে জড়াস,
'না' 'না' ব'লে ঘাড়টি নড়াস,
ঘর-ছাড়াকে এমন ক'রে ঘরের সুধা স্নেহের সুধা মনে পড়ালি॥
ওরে চোখে তোদের জল আসেনা—
চম্‌কে' ওঠে আকাশ তোদের চোখের মুখের চপল হাসিতে
ঐ হাসিই ত মোর ফাঁসি হ'ল,
ওকে ছিঁড়তে গেলে বুকে লাগে, কাতর কাঁদন ছাপা যে ও হাসির রাশিতে।
আমি চাইলে বিদায় বলিস, উহুঁ ছাড়বনাক মোরা,
ঐ একটু সুখের ছোট্ট মানাই এড়িয়ে যেতে নারি,
কত দেশ বিদেশের কান্নাহাসির বাঁধন ছেঁড়ার দাগ যে বুকে পোরা
তোরা বস্‌লিরে সেই বুক জুড়ে আজ, চিরঅয়ীর রথটি নিলি কাড়ি'।
ওরে দরদীরা! তোদের দরদ
শীতের বুকে আন্‌লে শরৎ,
তোরা ঈষৎ ছোঁয়ায় পাথরকে আজ কাতর করে অশ্রু ভরা ব্যথায় ভরালি॥

স্বামী ভাগ্য

(বড় গল্প)

(শ্রীসুধীন্দ্র নাথ বসু বি, এল)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দূরে সাগর পারে কোথায় ইউরোপ তাহা জানি না। ইংলণ্ড কেমন, ইংরাজ জাতি কেমন, কি ভাবে তাহারা জীবন ধারণ করে তাহার কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। জানি না কেন ইংরাজ জার্ম্মাণের ভিতর এত বড় কাল সমর বাধিয়াছিল। রক্তের বন্যায় পৃথিবী ধুইয়া গেলে কাহার লাভ হয়? ইউরোপের কথা ত কিছুই জানি না। ভারতের কথাও ত কিছুই জানি না। এ যুদ্ধে ভারতের কি সম্পর্ক? ভারতের ছেলেরাই বা দলে দলে এ আগুনে ঝাপ দিতে গিয়াছিল কেন? কে জানে আমার ভাগ্য পরীক্ষার একটা গুঢ় তত্ত্ব ইহার মূল কারণের সহিত জড়িত ছিল কিনা। অন্তরের ভিতর কখনও যাতনায় অস্থির হইয়া স্বামী বিচ্ছেদ প্রার্থনা করিয়াছিলাম কি? স্বামী কি তাহা জানি নাই। স্বামী আমার স্বামীর মত হইয়া আমায় গ্রহণ করুন। পৃথিবীর সকল যাতনার মধ্যেও আমি তাঁহাকে মৃত্যুর দুয়ারে অগ্নি পরীক্ষায় উপস্থিত দেখিতে পারিব না। সাময়িক স্বস্তিবোধে যে সান্ত্বনা পাইয়াছিলাম তাহাও দুদিনেই কাটিয়া গেল। আমি তাঁহাকে মানুষের মত করিয়া পাইতে চাই। কিন্তু তাহা অসম্ভব হইলে তাঁহাকে মরিতে পাঠাইবার মত অন্তরের ভিতর কোন ভাব আমার নাই। তিনি ফিরিয়া আসুন। কপালে যাই থাকুক, নিরন্ন ভ্রাতার গৃহে গলগ্রহ স্বরূপে বাস করিতে একটা নূতন যাতনা বোধ হইতে লাগিল। এটী আমার নিজের মনের ভাব মাত্র। আমার প্রতি কাহারও স্নেহের হ্রাস দেখি নাই। বোধ হয় বিধি দত্ত মিলন আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। যখন শারীরিক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছিলাম তখন সে সুখ চিন্তা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। আজ অলস শরীর মন আমার একটা দারুণ অভাবে যেন আকুল হইয়া উঠিল। যে কষ্ট ভোগ করিয়া একটা বিজাতীয় বিতৃষ্ণা বক্ষে চাপিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম তাহা যেন ক্রমে ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম। এক বৎসরের অধিক কাটিয়া গেল, শরীরের যাতনা ত বসিয়া থাকে না। এ দিকে মনের যাতনা যেন কেমন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সব সময় বুকের ভিতর কি যেন খালি পড়িয়া গিয়াছে। আমার শরীরের সকল রক্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াও যেন তাহা পূরণ করিতে পারিতেছে না। যৌবন উন্মেষে যখন জীবনী শক্তি সমস্ত বিশ্বের ব্যাপকতা নিজের ভিতর অনুভব করে, আমি তখন কাহার অপরাধে বিশ্ব কল্পনার বাহিরে যাইয়া পড়িতেছি? যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিস্ফোরক পদার্থ আগের শিরির শক্তি দান করিয়া থাকে যদি তাহাই না পাইলাম তবে কেন সৃষ্ট হইয়াছিলাম। আমি পাইয়াছিলাম, অথচ তাহা আমার পক্ষে না পাওয়ার অধিক। অথবা আমি কি শুধু সাগরের কূলে বসিয়া তাহার ঢেউ গণিতে গণিতে সেই সাগরের জলে মিশিয়া যাইব? এস তুমি ফিরে এস, আমার সর্ব্ব রিক্ততার সার, আমার সকল চকল লাবণ্যময় উন্মাদ শান্তি, এস আমরা সৃষ্টির করুণা বিকাশে ধন্য হই।

স্বামী বিচ্ছেদে একটা সুখ আছে। অতৃপ্তির তাড়নায় আশার আবেগে একটা স্বপ্ন সুখের কল্পনায় জীবনের মোহাবেশে একটা শান্তি আছে। কল্পনায় কেহ দুঃখের ছবি আঁকে না। দুঃখময় বাস্তব যখন নাই তখন ভবিষ্যৎ বড় তৃপ্তিকর করিয়া আঁকিয়া

আপনার ভাবে আপনি বিভোর হওয়া যায়। এ কল্পনার তন্ময়তা আছে। ইহাতে মানুষকে অনেক রকমের যাতনা অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আনিয়া দেয়। তাই আশা পূরণ নিকটবর্ত্তী হইলে আনন্দে উন্মত্ত হইতে হয়। শ্বশুর গৃহে আসিলেন। স্বামী আমার ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমার আশা পূর্ণ হইবে কি? আমি আর একবার আনন্দে শ্বশুর বাড়ী আসিলাম।

মানুষে গড়ে, ভগবান ভাঙ্গেন। আমার সুখের আশা পূর্ণ হইল না। আমি যাহা রাখিয়া গিয়াছিলাম, আসিয়া তদপেক্ষাধিক কিছুই পাইলাম না। যুদ্ধের গল্পে, নিজের বীরত্বের বড়াইতে, বাড়ী দিন কয়েক খুব সরগরম থাকিল। কিন্তু তা ত চিরদিন চলে না। দুই চারিদিনেই তাঁহার সকল গল্প ফুরাইয়া গেল। তারপর দিন কয়েক আরম্ভ হইল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কি একটা লাট বেলাট করিয়া দিবে, তাহারই জন্য ঘোরা ফেরা। নানা রকম আমোদ প্রমোদ করিয়া মদ খাইয়া কোথায় পড়িয়া থাকিতেন। একদিন কোথায় বিষম মার খাইলেন। ভাসুর ঠাকুর যখন লোকজন দিয়া ধরাধরি করিয়া বাড়ী আনিলেন, তখন তিনি অজ্ঞান। মাথার কয়েক যায়গা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চেহারা দেখিয়া আমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া গেল। লজ্জা সরমগুলিয়া ঘোড়াইয়া গিয়া তাঁহার পাশে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। মাথার জল চালিতে চালিতে ক্রমে জ্ঞান হইল। ডাক্তার আসিয়া কত স্থান বাঁধিয়া দিল।

ক্রমে যখন একটু সুস্থ বোধ করিলেন, আমি উঠিয়া আসিয়া নীরবে নির্জ্জনে চোখের জল ছাড়িয়া দিলাম। আমার মাথা কাটা গেল। এ নিদারুণ অপমান কাহিনী দেশে দেশে জাহির হইবে, আমি কি করিয়া মুখ দেখাইব, কি করিয়া এ দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিব। কার কি সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছি যে আমার সকল দুয়ার বন্ধ করিয়া ঠাকুর দেবতার ব্যবস্থা তৈয়ার হইতেছে। মা গো, তুমি কোথায় গিয়াছ? এ অভাগিনীকে সঙ্গে লও,—আমি সংসারের সকল যন্ত্রণার হাত থেকে বেঁচে যাই।

স্বামী আমার কিছুদিন শয্যাশায়ী হইয়া থাকিলেন। সত্য কথা বলিব, আমি তাহাতে সন্তুষ্টই হইয়াছিলাম। আমি প্রাণপণ শক্তিতে তাঁহার শুশ্রূষা করিতাম। এ কয়দিন আর মনের প্রতিপত্তি নাই। তিনিও আমার প্রতি আমার সুখ কল্পনার আশা বাড়াইয়া দিয়া একটু সহজ সরল চোখে চাহিতেন। আমি মনের যাতনায় মুখ ফিরাইয়া চোখের জল মুছিয়া লইতাম। কোন সময় বা আঘাতের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কত কাতর ভাবে তাঁহার কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতেন, প্রায়শ্চিত্ত করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন তাঁহার সমস্ত অত্যাচার উৎপীড়নের কাহিনী আমার অন্তঃকরণ হইতে ধুইয়া মুছিয়া যাইত। তাঁহাকে প্রতি সান্ত্বনা দিবার জন্য আমার বুকের ভিতর সমস্ত রক্তকণা যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। গলার ভিতর যেন সমস্ত অশ্রুজল জমিয়া দলা বাঁধিয়া যাইত। কথা বাহির হইতে দিত না। আমি মনের আনন্দে অশ্রুজলে ভাসিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতাম যে স্বামীর কার্য্যের বিচার স্ত্রীতে করে না। তারপর মুখ নীচু করিয়া সযত্নে নয়নের জল ঢাকিবার চেষ্টা করিতাম। তিনি একদিন বলিয়া বসিলেন 'কাঁদছ কাঁদ! আমার মত লোকের হাতে পড়ে তোমার কান্নাই ত সার হবে।' আমি বুক জোর করিয়া বলিয়া ফেলিলাম 'জান না, আমার চোখের জলে আমি কি শান্তি পাই।'

নিতান্ত ভরসাহীনার ন্যায় ভগবানের কাছে কত প্রার্থনা করিয়াছি তাঁহার অসুখ যেন কোনদিনই একেবারেই না যায়। নির্দ্দয় সুখ আশা কি তৃপ্ত হয়? তিনি সারিয়া উঠিলেন। যাহা ছিলেন তাহাই ফিরাইয়া পাইলাম। কেবল দুই চারদিন ফুলশয্যা

উদ্বেলিত ধারায় দুকূল ভাসাইয়া সমস্ত আকুল করিয়া তুলিয়া আমার সে শান্তি বারি কোথায় লুকাইল? আমি বালির চড়ায় বসিয়া মরুভূমির নির্মমতায় আবার পুড়িতে আরম্ভ করিলাম।

কিন্তু এই যে ক্ষণিক সুখটুকু পাইয়াছিলাম তাহাতে আমার অশান্তি বোধ আরও বাড়াইয়া দিয়া গেল। তিনি সারিয়া উঠিয়া আবার সেই রকম মদ গাঁজা চালাইতে লাগিলেন। কোথায় পড়িয়া থাকিতেন খোঁজ পাওয়া যাইত না। আমি শূন্য শয্যায় বসিয়া এখন আর বড় কাঁদিতাম না। প্রাণের ভিতর হইতে একটা বিষের জ্বালা অনুভব হইতে লাগিল। আমার ঘৃণা, রাগ আসিয়া সমস্ত অন্তর জুড়িয়া বসিতে লাগিল। কখন অর্দ্ধ রাত্রে ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া যা তা বকিতে আরম্ভ করিতেন। আমিও মাঝে মাঝে উত্তর করিতাম। মাঝে মাঝে তাঁহার অসুস্থ কালের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিতাম। তিনি নির্লজ্জ বিকট হাসি হাসিয়া বুঝাইয়া দিতেন যে সেটা একটা চালবাজি। নইলে তখন যে আমার কাছে সেবা শুশ্রূষা পাইতেন না। বুঝিলাম বিশ্বে আমার কিছুই নাই। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির নির্ম্মল বিকাশ, শান্তির মনোরম শোভা, ইহাতে আমার কোনই অধিকার নাই। মাতা বসুন্ধরার কোলে আমার ঠাঁই নাই। বুঝিলাম না আমিই বা এত কাঁদি কেন। কান্না আমার শুকাইয়া আসিতে লাগিল। বড় যায়ের কথাগুলিতে অনেক সময় আত্মহারা হইয়া পড়িতাম। সেটুকু না থাকিলে বোধ হয় অনেক আগেই সকল যাতনার অবসান করিয়া বসিতাম। শ্বশুর শাশুড়ীর গঞ্জনা, চারিদিকের কেমন একটা বিদ্রূপ ভাব, পাড়ার লোকের কেমন একটা আত্মম্ভরিতা পূর্ণ দাম্ভিক সহানুভূতি, কাহারও বা স্নেহ, আমার শিরায় যেন বিদ্রোহ জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। কোন দিন শুনিলাম স্বামী আমার এক আবগারি দোকানে চুরি করিতে যাইয়া ধরা পড়িয়াছেন। শুনিয়া সকলের সামনে হাসিয়া ফেলিলাম। তবুও কেমন যেন মন বসিয়া যাইতে লাগিল। হাত পায় খিল ধরিয়া আসিতে লাগিল। তারপরে যখন শুনিলাম তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে তখনও হাসিয়া ফেলিলাম। শ্বশুর মহাশয় আমাকে অতি নীচ ভাষায় গালাগালি দিলেন। ভারি বয়ে গেল আমার! যে গালাগালি আমার অঙ্গের ভূষণ করিয়া চিরতরে বহিতে দিয়াছেন, তার চাইতে আর বেশী গালাগালি কি হইতে পারে? আমি তাহাতেই ভরপুর আছি, আর কিছু কাণে পৌঁছিবে না। বড় যা বলিলেন 'ছোট বৌ, তুই কি পাগল হলি?' আমি বলিলাম 'দিদি, আশীর্ব্বাদ কর যেন তাই হতে পারি!' 'ও কি কথা, ছি!—'তিনি আমাকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। মুহূর্ত্তের তরে যেন আমার সকল যাতনার আগুন শীতল প্রেম ধারায় নিবিয়া যাইতে লাগিল।

তারপর যা আরম্ভ হইল তা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। যখনই বাড়ী আসিতেন তখনই অতি অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিয়া গালাগালি করিতেন। আমার মত স্ত্রীলোককে যে মাটিতে পুতিয়া কুকুর দিয়া খাওয়ান পরম ধর্ম্ম তাহা চুলের মুঠা ধরিয়া পদাঘাতে বুঝাইয়া দিয়া যাইতেন। সব দিন সহ্য করিতে পারিতাম না। এক একদিন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতাম। শ্বশুর ভাসুর দুই জনেই বাহির হইয়া আসিতেন। স্বামী ঘর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিতেন। আর এদিকে শ্বশুর ভাসুরে তর্ক বাধিয়া যাইত। শ্বশুর মহাশয়ের আদেশ খুন করিয়া ফেলিলেও চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। ভাসুর ঠাকুর বলিতেন 'যা নিজে সহ্য করতে পারা যায় না, তা অন্যকে করতে বলা অতি নীচ স্বার্থ পরতা।' শ্বশুর মহাশয় তাঁহাকে গালাগালি করিতেন। ছোট ভাইকে ফাঁকি দিয়া সম্পত্তি ভোগ করিবেন ভাবিয়াছেন, ইত্যাদি নীচ ভাষা প্রয়োগ করিতেন। ভাসুর ঠাকুর তখন নীরবে সরিয়া যা

তেন। খাওড়ি নীরবে গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিতেন। বড় যা সারাদিন গৃহ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়া সন্ধ্যা বেলা আমার পোড়া চুলের গোছা লইয়া বসিতেন। চুল বাঁধিবার কোন সখ ছিল না। কিন্তু তিনি নিজে আগ্রহ করিয়া আসিয়া বাঁধিতে বসিতেন, আমার সকল শরীর যেন আনন্দে মাতাইয়া তুলিতেন।

সেদিন দুপুর বেলা বাইরের উঠানে স্বামী মহাশয় নিজের বড় ভাইকে আমার নাম জড়াইয়া যে কদর্য্য ভাষায় গালাগালি দিলেন তাহা সহসা আমার কানে যাইয়া আহার মাথা ঘুরাইয়া দিল। ভাত খাইতে বসিয়াছিলাম। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বড় যা হাত ধরিয়া বসাইলেন। বসিলাম, কিন্তু ভাতের গ্রাস আর মুখে তুলিতে পারিলাম না। বড় যা কিছু বলিলেন না। দেখিলাম তাঁহারও চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। তিনিও বোধ হয় কাঁপিতেছিলেন। খাওয়া তাঁহারও হইল না। হাত মুখ ধুইয়া, আমার চোখে মুখে অনেকটা জলের ঝাপটা দিয়া দিলেন। তারপর আমাকে কোলের ভিতর ধরিয়া ঘরে আসিয়া ভাসুর ঠাকুরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভাসুর ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়াই আমাকে দেখিয়া সরিয়া যাইতেছিলেন। বড় যা বলিলেন 'দাঁড়াও, একটা কথা আছে।' 'কি আর বলবে? সবই ত বুঝ্‌ছি।' 'না, আমি দেখ্‌ছি, তোমরা কিছুই বুঝছ না। তোমরা সবাই মিলে কি এই কচি মেয়েটাকে খুন করবার পরামর্শ করেছ? বাবা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেন। তুমি ধর্ম্ম ধর্ম্ম কর। বাড়ীতে পূজা আচ্চায় যাগযজ্ঞ কর। কিন্তু এ অত্যাচার উৎপীড়ন কি ধর্ম্মে সইবে? এ বংশে কি কোন মঙ্গল হবে? ভাসুর ঠাকুর যেন অবাক। বাস্তবিক আমার বড়যার মত শান্ত মেয়ে যে এত কথা হঠাৎ বলিতে পারিবেন তা আমি কখনও ভাবিতে পারি নাই। আমি যেমন ছিলাম তেমনিই ঘোমটা দিয়া বসিয়া থাকিলাম। ভাসুর ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন 'কি ক'রবো বল? উপায় ত কিছু ভেবে পাই না।' 'কেন?—ঠাকুরপোকে বাড়ীতে আসতে দাও কেন?—যাক্ যেখানে সেখানে ঘুরে ফিরে আসুক। দেখে আসুক তার নিজের মুরদই বা কি, আর কেই বা তাকে কতটুকু করে! সহসা দেখি দরজার সামনে শ্বশুর ঠাকুর। সেখানে তখন সহস্র বজ্রাঘাত হইলেও কেহ এতদধিক স্তম্ভিত হইত না। কেহ উঠিয়া দাঁড়াইল না, কেহ কথা বলিল না, সকলেই যেন পুতুল। অতি কঠোর কর্কশ স্বরে শ্বশুর মহাশয় বলিলেন 'কি গো বড়বৌ, সকলে মিলে পরামর্শ করে ছোট ছেলেটাকে খুন করবার ব্যবস্থা হচ্ছে!—বেশ, বেশ, আমার সংসারে আগুন লাগিয়ে দাও। এই নাও, ঘাড় নীচু করে দিচ্ছি, মাথায় লাথি মার, মাথা ভেঙ্গে দাও।' বড়যা উঠিয়া মাটিতে প্রণাম করিলেন। আমিও করিলাম। তার পর মাথার ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া অগ্রসর হইয়া শ্বশুর মহাশয়ের পা ধরিলাম। কি যেন বলিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুতেই মাড়ি খুলিতে পারিলাম না। বাহিরে রৌদ্র যেন তখন নাচিতে নাচিতে গাছ পালা পৃথিবী ঘুরাইয়া দিল। তার পর এইটুকু মনে পড়ে, দিদি যেন 'জল' বলিয়া চীৎকার করিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

আচ্ছা, মেয়েদের বিবাহ না দিলে কি এমন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যায়! হিন্দু সমাজে ছেলের ইচ্ছা করিলে বিবাহ না করিয়া থাকিতে পারে, তাহাতে জাত যায় না। যত দোষ মেয়ের বেলায়! বালিকা বয়সে তাহাকে বিবাহ দিয়া বাপ মায়ের কোল হইতে ছুড়িয়া জঙ্গলে ফেলিয়া দিয়া না আসিলে কি বেদ মিথ্যা হয়? যদি শুভ সম্মিলন সম্ভব হয় তবেই বিবাহ দিব, নতুবা তাহাকে আর পাঁচজনের মত জীবন ধারণ করিতে কেন দিব না। হিন্দুর ঘরের মেয়েদের ভিতর এর অন্য কোন আন্দোলন হওয়া সম্ভব না। কারণ তাহারা কিছু বুঝিবার পূর্ব্বেই শ্বশুর ঘরে স্বামীর যন্ত্রনা সহ্য করিতে চলিয়া যায়। অবশ্য সবলের ভাগ্য যে একরূপ সে

কথা বলি না। তবে সেটা নিতান্ত ভাগ্য। আর যাহারা বিবাহিত, তাহারা ত ঘরের কোণের তৈজস পত্র, তাহাদের ত নিজেদের অস্তিত্ব আর কিছুই নাই। তবুও তাহাদের একটু সজাগ হওয়া দরকার নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া এবার নিজেদের সন্তান-গুলির প্রতি একটু মমত্ব বোধ তাদের প্রাণে আনা উচিত। তাহা হইলে কত হতভাগিনী চিরদিন প্রাণের ভিতর চিতার আগুনে পুড়িয়া মরিবার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। যাঁহারা দেশ ও সমাজের মঙ্গল কামনা করেন তাঁহারা একথাটা একবার ঘরে ঘরে প্রচার করিবেন কি? একবার বাঙ্গলায় রমণী বিদ্রোহের সূত্রপাত দেখিতে পাইব কি? কল্পনার আঁকি ভবিষ্যৎ বাঙ্গলার পারিবারিক জীবনের স্বর্গীয় মূর্ত্তী। তাহার পুত সৌরভে মনে মনে মাতাইয়া তুলি সমগ্র জগৎ। সেখানে মেয়ের বিয়ে বাধ্যতামূলক নহে। সেখানে বধূ নির্য্যাতনের বর্ব্বরতা কেহ কানেও শুনিতে পায় না। আমার বড় যাদের মত রমণী সেখানে উপযুক্ত পূজা পাইয়া সমাজকে আরও পবিত্র করিয়া তুলিতে পারে।

কি বলিতেছিলাম। রাত্রিও অনেক হইয়া গিয়াছে। এত দুঃখের ভিতর কি করিয়া একটা কাল্পনিক সোতা নয়নের কোনে ভাসিয়া গেল। সে সমাজ হইল বা না হইল তাতে আমার কি? আমি আর তো ভোগ করিতে পাইব না। বাকী জীবন কি এই জানালার গরাদে মাথা রাখিয়া আকাশের তারা গণিতে গণিতে মাতালের অপেক্ষায় রাত কাটাইব। শ্রীহরের রাতের এই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ঐ যে বনের মধ্যে একটা পাখী থাকিয়া থাকিয়া একটা করুণ ডাক ছাড়িয়া বাতাস কাঁপাইয়া একটা আতঙ্কের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যাইতেছে, ও কি চায়? স্বাধীন বনের পশু পাখী গুলাও মানুষের মত হৃদয়ের বেদনা অনুভব করে, তারাও কি এমনি করে চোখের জলে রাত্রি কাটাইয়া দেয়? এক একটা বাতাস আসে, শরীরে তার হিমতা অনুভব করি। প্রাকৃতিক নিয়মের বশে সে ঘুরিয়া চলিয়া যায়। আমি কেন নিরাশায় ছিন্ন হয়ে চিন্তায় কাতর হইতে থাকি? এবার কোথায় যাব? সব ত শেষ। অথচ বন্ধনীর যাত্রা শীঘ্রই বাড়িবার সম্ভাবনা। যদি দাদার কাছে যাইয়া থাকি, নিজের হাতে পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করিবার ব্যবস্থা করিয়া লই, তাহাতে ভাংটা জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিব না? বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ের গায় খাটিয়া নিজের অন্নের ব্যবস্থা করিবারও অধিকার নাই। তবুও আর ত কিছু ভাবিয়া পাই না। এ সংসারে আমার বাস চলিবে না তাহা স্থির বুঝিয়াছি। বড় যা প্রাণের যাতনা আমার কাছে গোপন করেন। ভাসুর ঠাকুর নিত্য অপমান ভোগ করেন। আর এক দিকে শশুর। স্বজনা জেন, স্বামী পদাঘাত করেন। আমার একমাত্র উপায়, ইহাদিগকে এ নিদারুণ অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র পন্থা, এখান হইতে চলিয়া যাওয়া, অথবা দড়ি ও কলসী। সেই বোধ হয় সব চাইতে ভাল। আর একপ্রকার হইতে পারে, ঘরে কেরোসিন তেল আছে। সেই বা মন্দ কি? কে বলে আত্ম-হত্যা পাপ! তা যদি হয় তবে যাহারা আত্মহত্যার দিকে মানুষকে ঠেলিয়া পাঠায় তাহাদের কি অপরাধ হয়?—

কি গো বৈরিনী, খোলা জানলায় বসে কি হচ্ছে? ও পাড়ার ছনু বউ যে রাস্তা দিয়ে গেল তাকি আমি দেখিনি? চেয়ে দেখি স্বামী মহাশয় ঘরে ঢুকিয়াছেন। রাগে, অভিমানে, ঘৃণায় আমি কাঁপিয়া উঠিলাম। চোখের সামনে তারকা মালা ঘুরিয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম 'নিজের চরিত্রের দিকে নজর করে পরকে বলতে হয়!' 'কি হারামজাদি, আমার উপর ঠেশ দিয়ে কথা! প্রচণ্ড বেগে আমার কোমরে লাথি মারি

লেন। ঝুল সামলাইতে পারিলাম না। ধেড়াসে মাথা ঠুকিয়া পড়িয়া গেলাম। পড়িয়া যাইবার সময় বোধ হয় একটা চীৎকার করিয়াছিলাম।

কয়দিন পরে জ্ঞান হয় তাহা মনে নাই। আমার তখন খুব জ্বর। মাথা নাড়িবার শক্তি নাই। ক্রমে আরও বুঝিলাম আমার গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হয়ত তাহাকে বুকে করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে কিছু শান্তি পাইতে পারিতাম ভগবান সে আশায় আমাকে বঞ্চিত করিলেন। বোধ হয় ভালই করিলেন। যাঁহার সন্তান তিনি নিজ হাতেই শেষ করিলেন। কে জানে সে জগতে আসিলে কি যাতনা, কি অপমান, কি ঘৃণিত জীবন বহন করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি গেলাম না যেন? তাহা হইলেই ত সকল গোল যাইত। আবার কেন জ্ঞান হইল? জ্ঞান হইয়াই প্রথমেই দেখিলাম আমার বড় মা মাথার কাছে, মাথায় জল দিতেছেন আর পাখার বাতাস করিতেছেন। বোধ হইল যেন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। বাহিরে গাছের পাতা গুলা যেন স্থির স্থির করিয়া একটু বাতাস দিল, আমার গায় কাঁটা দিয়া উঠিল। আমি গায়ের কাপড় খানি টানিয়া লই বার চেষ্টা করিলাম। বড় মা আমাকে চোখ মিলিয়া হাত বাড়াইয়া দেখিয়া বলিলেন 'ও ছোট বৌ, কেমন আছিস! আমি উত্তর দিবার চেষ্টা করিলাম। কথা যেন বাধিয়া আসিল। অনেক কষ্টে আস্তে আস্তে বলিলাম 'ভাল আছি।' এই টুকু বলিতেই যেন চোখ দিয়া জল আসিল। পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিলাম। কোমরে বিষম ব্যাথা। বড় মা বলিলেন 'নড়িস না, যেমন আছিস তেমনি শুয়ে থাক।' তখন ব্যাপারটা একটু বুঝিলাম। আমার জ্ঞান হইয়াছে সে কথা বড় মা উঠিয়া জানাইয়া আসিলেন। তারপর ডাক্তার কবিরাজ কত আসিল। আমি বুঝিলাম তখনও আমার জীবনের আশা সম্পূর্ণরূপে করিতে পারিতেছে না। তখন কত ভাবিলাম - হা ভগবান, যেন তাই হয়। এরপর ত আর বেঁচে থাকা মজার বাড়া গালাগালি।

কিন্তু তবুও বাঁচিয়া উঠিতে হইল। সেও বোধ হয় ঐ পোড়া কপালী বড় মায়ের জন্য। সংসারে অনেক লোক আছেন যাঁহারা আন্তরিক ভাবে পরের উপকার করিয়া প্রকৃত পক্ষে তাহাদের অপকার করিয়া বসেন। আমার বড় মা একজন সেই শ্রেণীর লোক। সংসারে সকল কাজ কর্ম্ম এক হাতে করিয়া, সেই সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তে আমার জন্য ঔষধ নিজ হাতে খাওয়াইয়া, সারাদিন সারারাত ঘুমকে একেবারে বিদায় দিয়া আমার শুশ্রূষা করিতেন। আমি ভাবিয়া পাইতাম না বড় মায়ের হাত পা মুখখানা করিয়া না একশ খানা করিয়া। তিনি সহজ স্নেহ বশে বুঝিতে পারেন যে আমাকে বাঁচাইয়া তুলিলে আমার কোন উপকার করা হইবে না। আমি বিছানায় শুইয়া তাঁহার গালাগালি খাইয়াও প্রতিদিন পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিতাম। সংসারে এতবড় মহত্বের পুরস্কার এই অন্তঃকরণ টুকুই।

যে কয়দিন বিছানায় শুইয়া যাতনায় ছটফট করিয়াছি সে কয়দিন তাঁহার দেখাও পাই নাই, কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসাও করি নাই। অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিলে শুনিলাম সেই হইতে তাঁহাকে আর কেহ বাড়ীতে দেখে নাই। এ ব্যবহারে আমি অনেকটা তৃপ্তিই বোধ করিলাম। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম যে পৃথিবীতে আমার আর কাহারও সহিত সম্পর্ক নাই। পৃথিবীতে আমি নিতান্ত একা। আমার জীবন মরণে কাহারও কিছু আসে যায় না। বাঁচিয়া থাকিয়া আমার লাভ? যে জীবন শুধু দুঃখময় সে জীবনে কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। শারীরিক মানসিক সকলপ্রকার যাতনাই এ জীবনের সার হইয়াছে। ভগবান, এখন স্থির ভাবে তুলিতে পারিলেই মঙ্গল। আমাকে কেহ চায় না। আমি কাহাকে চাই, তাহাও ত আর ঠিক করিয়া

বলিতে পারি না। আমি জীবনের অঞ্জলি পুরিয়া দান করিলে তাহা কেহ গ্রহণ করিবে না। তবে সে অঞ্জলি আর এ অতৃপ্তির বোঝায় পুরিয়া দাঁড়াইয়া থাকি কেন। এতদিন এত যন্ত্রনা সহ্য করিবার যে ক্ষমতা ছিল, সেই ক্ষমতাতেই যেন সকল যাতনার অবসান করিতে পারি। নদীতে কত জল,—আমার সকল যাতনা কি তাহাতে ধুইয়া মুছিয়া যাইবে না?—আগুনে কত জিনিষ পোড়ে, আমার এ জীবনের সকল ব্যথা পুড়িয়া ছাই হইবে না?

আমার অসুখের কথা শুনিয়া দাদা আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন। আমাকে সুস্থ দেখিয়া আমাকে কিছুদিনের জন্য বাড়ী লইয়া যাওয়া স্থির করিলেন। বাড়ী যাহা যাইব তাহা আমিই জানি। এখানে সে প্রস্তাবে কেহই আপত্তি করিল না। আর দুই একদিন দেখিয়া আমার যাওয়ার ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

স্বামীর সহিত আর দেখা হইল না। ভালই হইল। একবার বলিবার ইচ্ছা ছিল 'তুমি উন্মাদ হয়ে আপন ভাবে বিভোর হ'তে পেরেছ। আমি উন্মাদ হ'তে পারি নাই। তাই .. চললাম।' কোথায় যাই! গন্তব্য স্থানের হিসাব করিবার দরকার নাই, বোধ হয় অধিকার নাই। সকলেই চলিয়াছে, কাহারও বসিয়া থাকিবার যো নাই। কোথায় যাইতেছে তাহাও কেহই জানে না। গ্রীষ্মের রাত যেন মাঝখানেই শেষ হইল। একটু ঠাণ্ডা বাতাস বেশ ঝির ঝির করে আসে। রাত্রের চমক ডাকা পাখীটা তখনও থামিয়া উঠিতে পারে নাই। আকাশের তারাগুলা চট করে নিবে যায়। বড় মা উঠিলেন। তোরে কিছু রাঁধিয়া দিবেন আমরা সকালেই রাওনা হব। আমি তাঁহার খোকাকে কোলে করিয়া রাখিলাম। তিনি কাজে চলিয়া গেলেন। খোকাকে বুকের মধ্যে করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলাম। তার পরে উঠিলাম। আমার হার ছড়া বাহির করিয়া তাহাকে পরাইয়া দিলাম। সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি চোখ ফিরাইয়া চোখটা মুছিয়ালইলাম। খুকী আসিল। তাহার কানে দুল দুটী পরাইয়া দিলাম। ভাল পার্শী* শাড়ি খানা বাহির করিয়া দিলাম। দরজার কাছে বেখি বড় মা যেন অবাক হইয়া চাহিয়া আছেন। 'ও ছোট বউ, ও কচ্ছিস কি? 'না দিদি আমার বড় ইচ্ছে করে। তুমি মানা কর না!' 'তোর কথার ভাব যেন কেমন? 'আর কেমন হবে? সকল সাধ ত মিটেছে কপালে আরও কি আছে তা কে জানে! আমার শেষ সাধ—' 'ছোট বউ, চুপ চুপ! অকল্যাণের কথা মুখে আনিস না।' 'দিদি, আমার আবার অকল্যাণ কি? আমি পৃথিবীর বাহিরে গিয়াছি। আমার বড় তৃপ্তি বোধ হচ্ছে। দেখ দিদি, খুকী কত সুন্দর! কি সুন্দর মানিয়াছে!—' ছোট বউ, তোর ত কথা ভাল না! তোকে ত আমি যেতে দেব না।—' 'দিদি, তুমি সকল কথায় এমন করে ওঠ কেন? আমার নিজের ভাল মন্দ কি আমি বুঝি না? 'তোর বুদ্ধি কত! তুই এমন করে আমাকে ভয় দিস কেন? ঠাকুরপোর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, আবার সেরে যাবে। তোর ভাসুরকে ওর জন্যে ভাল করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বলবো। এ কথাটা কেউ ভেবে দেখেনি। আমার আজ কদিন ধ'রে মনে হচ্ছে। বৃথা সান্ত্বনা। তবে বাধা দিলাম না। কারণ এই মিষ্ট কথা গুলি আমার বড় ভাল লাগে। আমি জানি আর আসিব না। এই মিষ্ট কথা গুলি আমার প্রাণে গাঁথা থাক।—আমার শেষের 'হরিনাম' আর হরিনাম। ঐত বেলা বেড়ে যায়। আবার সন্ধ্যা হবে আবার রাত হবে। জগতের দিন রাত তেমনই চলিবে।

সকলকে প্রণাম করিয়া রাওনা হইয়াছি। উঠানে নাবিয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। আবার বড় মায়ের পায়ের ধুলা লইলাম। আমার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন 'আবার শিগ্‌গির আসিস।' এ কথার

আর উত্তর দিতে পারিলাম না। এ সময়ে তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে কিছুতেই প্রাণ সরিল না।

দাদা ডাকিলেন 'ওরে বেলা হয়ে গেল!' মাঝিরা বলিল 'শিগ্‌গির করুণ জোয়ার এসেছে!' খাড়ি দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিলাম তাঁহার গাম্ভীর্য্য তেমনই। বড় ঘাটের পথ বাহিয়া দুই ফোঁটা চোখের জল ঝরিয়া পড়িল। তাঁহার খোকা মুখ ভার করিয়া তাহা চাহিয়া দেখিল। বাহিরে সাদা পথটির শেষেরদীতীর উপর ঢেউয়ে ঢেউয়ে প্রকাশের অমল রৌদ্র ঝিক মিক করিতেছে। তাহারই উপর আমাদের ছোট নৌকাখানি তর তর করিয়া কাঁপিতেছে। এই সাজান জগৎ, এ শুধু সাজানই থাকিবে। আমার ঠাঁই এখানে নাই। আমি চলিলাম।

নির্য্যাতিতা

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)

বাংলার কবি একদিন গাহিয়াছিলেন 'মা জাগিলে যত ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না—জাগে না।' কত যুগ অতিবাহিত হইয়া গেল, বাংলার কবি বাংলার নারীদিগের দুর্দ্দশা দর্শনে ব্যথিত চিত্তে মরমোত্থিত এই ভাবোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার পর কত যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে—কবির এই করুণ সঙ্গীত গাহিবার পূর্ব্বেও নারী দুর্দ্দশার কত করুণ কাহিনী এই বাংলায় অভিনীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নারীদিগের এ দুঃখ দুর্দ্দশার প্রশমন হয় নাই।

নারীদিগের অবস্থা বাংলার পূর্ব্বেও যেমন ছিল আজও তেমনি রহিয়াছে—বরঞ্চ অবস্থা পূর্ব্বের অপেক্ষাও ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলার কত স্নেহলতা পুড়িয়া মরিল—কত বধূ নির্য্যাতনের ভীষণ কাহিনী বাঙ্গালার পুরুষ ও নারী সমাজ নিত্য শুনিতেছে, কত কন্যার বিবাহ দিতে বাঙ্গালী পিতা মাতা নিত্য সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, কিন্তু—কই বাঙ্গালার নারীর এ ভীষণ অবস্থা দর্শনেও নারী সমাজ জাগিল কই?

বাংলার পুরুষ সমাজের—বাঙ্গালীর মাতা; ভগিনী ও কন্যার এই দুঃখ দর্শনে প্রাণ একবারও কাঁদিয়া উঠিতেছে না। তাহারা দিব্য আরামে মাতা, ভগিনী ও কন্যার এই বেদনা ও অশ্রুজল উপভোগ করিয়া শান্তচিত্তে শান্তি উপভোগ করিতেছে।

বাংলার পুরুষ দিগের দ্বারা সহস্র ভাবে নির্য্যাতিত নারী। আমরাই বাঙ্গালী পুরুষ প্রবরেরা মাতা—ভগিনী ও জায়া সঙ্গিনীরূপে আহ্বান করিয়া আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। তাহাদিগের নিকট হইতে যতটুকু সুখ সুবিধা ও সম্ভোগ আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহা আদায় করিয়া লইতে বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য প্রকাশ করেন না। কিন্তু এ আদায়ের মধ্যে এ সম্ভোগ, সুখ সুবিধার মধ্যে সত্য প্রাণস্পন্দনের বিচিত্র ক্রীড়া বিলাস কিছু মাত্র নাই। বাংলার নারী সমাজ শুধু বাংলার পুরুষ সমাজের লালসার ক্ষুধা মিটাইবার, সুখ সম্ভোগ পরিতৃপ্তির একটা ভোগ উপাদান মাত্র,—তাহাদের জীবনের অপর কোনরূপ প্রয়োজনীয়তা বা অস্ত

কোন মহৎ কার্য্যের কল্পনা বাংলার হীনমতি পুরুষেরা করিতে পারে না।

আজ বাংলার ঘরে ঘরে সজীব, প্রাণ সম্পন্ন কাঠের পুতুল নারীদের ক্রন্দন রোল উঠিতেছে; পুরুষের অমানুষীয় নির্য্যাতনে নারীরা আজ নিজ দেহ কেরোসিনে সিক্ত করিয়া অনল স্পর্শে তিল তিল করিয়া দগ্ধ হইয়া মরিতেছেন তবু বাংলার নারীরা তাহাদের পরম ধর্ম্ম ও নীতি বুক ফাঁটেত মুখ ফোটে না' বাক্যের সার্থকতা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া নারী জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন।

বাংলার নারীদিগের এই সহন নীতির প্রশংসা যদিও বাংলার ভাবুক পুরুষেরা নানা ভাবে করিয়াছেন, আমরা কিন্তু নারীদিগের এই সহন-ক্ষমতার প্রশংসা মোটেই করিতে পারি না। সদ্‌গুণে শক্তির অপব্যবহার না হইলে সেই সদ্‌গুণই মহৎ ও শোভন হয়; কিন্তু যে সদ্‌গুণে শক্তির অপব্যবহার হয় সে সদ্‌গুণ মোটেই শোভন ও মহান্ নহে।

আজ বাংলার নারীদিগের এই প্রাণবিহীন সহন ক্ষমতা হইতে জাতীয় দৌর্ব্বল্য এমন ভাবে বাংলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে যাহাতে বাঙ্গালী জাতি ধ্বংসের সীমা রেখায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ বাঙ্গালী নারীরা আর সুপুত্র প্রসব করিতে পারিতেছেন না — সুভ্রাতা সুপতি লইয়া তাঁহারা আর সুখের সংসার গঠন করিতে পারিতেছেন না।

শক্তিময়ী নারীরা আজ তাহাদের শক্তির অপব্যবহার জনিত পাপের ফলে সমগ্র দেশটাকে ডুবাইয়া দিতে বসিয়াছেন। নারীর আজ যদি তাহাদের প্রাণ হীন দেহে একবার প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, যদি একবার তাঁহাদের দেহে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিতে পারেন তবে বাংলার পুরুষ সমাজের এই ঘৃণ্য অত্যাচার সভয়ে দূরে পলায়ন করিবার পথ খুঁজিয়া পাইবে না, —নারীর অনুগ্রহে বাংলার পুরুষ নামের কলঙ্ক পুরুষেরা আবার সত্য পুরুষ হইতে পারিবে। দায়ে পড়িয়া আবার তাহারা মানুষ হইবার চেষ্টা করিবে—মাতা, ভগিনী, পত্নী ও কন্যার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখিবে।

নারীদের নারীত্ব বোধ সজাগ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের হারান গৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে। তাই আজ এই জাগরণের যুগে নারীদিগের প্রাণ-শক্তির বিকাশ দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি। আজ এই দেশ জাগরণের যুগে নারীরা কবি বাক্য সার্থক করিয়া একবার তাহাদের প্রাণের পরিচয় দিন, —একবার শক্তিময়ী রূপে জাগিয়া উঠিয়া দেশের শক্তির বিকাশ করুন। নতুবা এ দেশের মঙ্গলের আশা সুদূর পরাহত।

অত্যাচারীর অত্যাচার প্রশমনের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ না করিলে এ অত্যাচারের কলঙ্ক দেশ হইতে দূর হইবে না। ভীরু পুরুষত্বহীন বাঙ্গালী-পুরুষের কাছে কর্ত্তব্যের মোহাই নিষ্প্রয়োজন ব্যবহার পাইবার আশা করা যাইতে পারে না —দেশের নারী সমাজ তাহা পায় নাই—কোন দিন পাইবেও না। আজ নারী নির্য্যাতনের এ কলঙ্ক অপনোদনের ভার, তাই নারীকেই নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে হইবে—নারীকে নারীত্বের গৌরব মহিমায় মহিমান্বিত হইতে হইবে।

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য-প্রতিভা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(কালিদাস মিত্র, এম্-এ)

'বিবাদে'র নায়ক অযোধ্যাধিপতি অলর্ক অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব প্রেমের জন্য লালায়িত। রাজ-কার্য্যে তিনি আদৌ মনোযোগী ন'ন। রাজরাণীর দিকে তিনি ফিরিয়াও চান না। পতি-সোহাগ-বঞ্চিতা মূর্ত্তিমতী রাজরাণী সরস্বতী বিষাদ দেবী পতিকে পাইবার জন্য সাধারণ উপবনে রাজবয়স্য মাধবের নিকট ভিক্ষা চাইতেছেন—'দিনান্তে বারেক দরশন'-প্রার্থী হইয়া কাতরে অনুনয় করিতেছেন। অচল অটল মাধব তাহাতে বাদী। তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না, দেখিয়া সতী সাধ্বীর চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল; তিনি অভিশাপ দিলেন,—

'ভিক্ষা অন্নে কর তবে জীবন যাপন!
তরুতলে কর বাস! হোক বংশ নাশ
• • • •
কেঁদে কেঁদে কর দিনপাত!
মম সম শেল যেন বাজে তব বুকে!'

রাজার প্রেমানলে ইন্ধন জোগাইত এই রাজ-বয়স্য মাধব। সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী মাধব রাজাকে শিক্ষা দিবার জন্য—ভোগতৃষ্ণার হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ গুলি যে অনিত্য তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য—যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা যে ভ্রান্তপথ, জীবনের শেষদিনে মাধব তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কবি যেরূপসুন্দর ভাবে এই পথের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই মনোরম। অস্থিমাংস মজ্জাগত লালসার নামান্তর যে মানবীয় প্রেম, তাহার ভিতর দিয়াও যে ভগবানের প্রেম পাওয়া যায়, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না; কিন্তু এই পিচ্ছিল পথ দিয়া চলা বড় সহজ নয়। সর্ব্বত্যাগী মাধব বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার ও তাঁহার অন্য তিন ভ্রাতার মত, কনিষ্ঠ ভ্রাতা অলর্ক-কেও তিনি সংসারের ঘাত-ঘাত হইতে শাশ্বত অমৃতের সন্ধান দেখাইয়া দিবেন; কিন্তু মধুর কলনীতে পতিত মধুমক্ষিকার ন্যায়, অলর্ক সংসারের মিথ্যা প্রলোভনরূপ আপাতমধুর মধুর কলনী হইতে উঠিতে পারিতেছিলেন না। ভোগের পরিণতিতে বিতৃষ্ণা আসে সত্য, কিন্তু তাহা সময়সাপেক্ষ। অগ্নির দাহিকাশক্তি বুঝিবার জন্য তাহার ভিতর অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া দিয়া যে বুঝিতে হইবে, এমন কিছু কথা নাই। অপরের দেখিয়া-ঠেকিয়াও শিক্ষালাভ করা যায়। কবি গিরিশচন্দ্র 'বিবাদে' এই কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মাধবের ভ্রান্তমতের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। আর প্রকৃত প্রেমের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অনবদ্য সুন্দর হইয়াছে। আমরা সে চিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব। প্রথম অঙ্কে প্রথম গর্ভাঙ্কেই আমরা মাধব ও কবিরগণের মুখে যে গীত শুনিতে পাই, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারি প্রেমের বিরহে মানবের কতরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয়,—

'আমরা চার রকমের চার বিরহিনী,
বিচ্ছেদ মনের খেদে ঘুরি দিবা যামিনী।
কারুর বুকে হায় পিরীতের দমা ধরেছে,
কেউ পিরীতের কলসীতে প্রাণে মরেছে,
কারুর লজ্জা সরম্ ধরম্ সকল হরেছে,
কেউ পিরীতে উঠ্ পড়ি,
তবু পিরীতে ছাড়ি নি,

প্রেম করে কেউ আড়নয়নে চায়,
কেউ ধূলো মাখে গায়
পিরীত তোরে বলিহারি যাই!
কেউ নয়ন জলে গাঁথি মালা,
কেউ বা প্রেমে মানিনী!'

বাস্তবিক প্রেমের স্রোত মানবের দিকেই ছুটুক, আর ভগবানের অভিমুখেই প্রবাহিত হউক, ত্রিতাপ-নাশিনী কলুষহারিণী ভাগীরথীর ন্যায় সে 'লজ্জা সরম বরম করং'-রূপ ঐরাবত সকলকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। অনন্ত-শরণ না হইলে—আত্মত্যাগ না করিলে, প্রেমের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় না—আপনাকে বিলাইয়া আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থকে বলি না দিতে পারিলে, প্রেমের সন্ধান পাওয়া যায় না। "লজ্জা মান ভয় তিন থাকতে নয়," কথাটা খুব সত্য। কেহ দুরু দুরু বুকে প্রেমিকার দিকে আড়নয়নে চায় —ভয় পাছে প্রেম-কলি নয়নের আগুনে শুকাইয়া যায়—ভয় পাছে আর কেহ দেখে উপাস্য দেবীর মূর্ত্তি! প্রাণের নিভৃত মন্দিরে গোপনে যাঁহার পূজা করিয়া পূজারী আপনি ধন্য হ'ন, লোক-লোচনের সমক্ষে পূজা করিবার সাহস তাহার কুলায় না —আবার কেহ প্রেমে পাগল হইয়া ধূলা মাখিতেছে —কেহ বা ব্রজের ধূলা মাখিয়া নন্দদুলালের প্রেমে পাগল। আবার কেহ নয়ন জলে মালা গাঁথিয়া প্রেমাস্পদের চরণে উপহার দিবার জন্য ব্যগ্র। সত্য কথা বলিতে কি, একটী গানের ভিতর দিয়া প্রেমের সকল দিকের চিত্র এমন সুন্দরভাবে অল্প কথায় আর কেহ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন কি না জানি না।

দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম গর্ভাঙ্কে 'আমোদ' ও 'আনন্দের' প্রভেদ, গিরিশচন্দ্র যে দুইচারি কথায় বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহা চারিত্র (Ethics-) সম্বন্ধীয় পুস্তকে লিখিত pleasure ও happiness এর পার্থক্য স্মরণ করাইয়া দেয়। কথাটা এই :—

মাধব। সুখ দুঃখ বাহ্য অবস্থা বৈ ত নয়? লোকে দেখ্‌ছে সুখ, লোকে দেখ্‌ছে দুঃখ। আমোদ প্রাণে, এ আমোদের নিরবচ্ছিন্ন নাম আনন্দ।

বাস্তবিক রূপজ কামজ ইন্দ্রিয়জ ক্ষণিক সুখই আমোদ, আনন্দ শাশ্বত সামগ্রী—আমাদের একী-করণ (unification of pleasure)। আনন্দ আমোদের সমষ্টি নয়—একত্ব। আমোদ অনুভূতি-সাপেক্ষ। যতক্ষণ অনুভূতিটুকু থাকে, ততক্ষণ আমোদের স্থিতি। অনুভূতির তিরোধানের সহিত আমোদের বিসর্জ্জন, আর আনন্দ সর্ব্বসময়ে পাওয়া যায়। প্রেমিক ভিন্ন কেহ এই আনন্দের অধিকারী হইতে পারে না। যে মানবের প্রাণে কখন ব্যথা দেয় না, যে মানবকে শ্রীভগবানের বিগ্রহ বলিয়া নরনারায়ণ বলিয়া প্রকৃতরূপে অনুভব করে— সেই-ই প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হইতে পারে। এই আনন্দ ব্যাপক। ক্ষুদ্র মানবীয় প্রেমের সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর ইহা থাকিতে পারে না। ক্ষুদ্র বট ফলের ভিতর যে অন্তর্নিহিত শক্তি বিরাজ করে, তাহা যেমন তাহার ভিতরেই আবদ্ধ থাকিতে পারে না, আপনাকে স্বপ্রকাশ করিয়া বিশালত্বের পরিচয় দিয়া থাকে, প্রকৃত মানবীয় প্রেমও সেইরূপ সংকীর্ণ ভালবাসার গণ্ডী ছাড়াইয়া—দেহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্তের দিকে—বিরাট্ পুরুষের দিকে—মহতো মহীয়ানের দিকে ছুটিতে ব্যগ্র। এই প্রেমই রস অনুভব করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকে।

মানবীয় প্রেম সম্বন্ধে কবি 'ভ্রান্তিতে' যে কথা ইঙ্গিতে বলিয়াছেন 'বিষাদে' সেই কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—'দুজনের মন মিলে এক হ'লে প্রেম বলে; যখন এক প্রাণ হ'ল, তখন আপনার প্রাণ কাঁদ্‌লেই বুঝ্‌তে পারে যে তার প্রাণ কাঁদ্‌ছে।'

মাধব যখন অলর্ককে উচ্ছন্না নারী বেশ্যার নিকট শিক্ষা দিবার জন্য রাখিয়া আসিল, রাজ্য ধন-মান সব ভুলিবার একমাত্র উপায় ভাবিয়া যখন তাহাকেই ভালবাসায় কেন্দ্র বলিয়া স্থির বুঝাইয়া

দিল, তখন অলর্ক উজ্জ্বলার নিকট ভালবাসা কি এবং ভালবাসলে কি হয়, তাহাই জানিতে চাহিল। কবি একছত্রে বুঝাইয়া দিলেন, ভালবাসিলে, 'তাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে—তার সঙ্গে বাস কর্‌তে ইচ্ছা করে—না দেখ্‌লে প্রাণ কাঁদে।' আর বিষাদের মুখ দিয়া একটী গানে গিরিশচন্দ্র প্রেমের যে লক্ষণ দিয়াছেন, তাহা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"প্রেমের এই মানা না হ'লে প্রেম ত রবে না।
প্রিয়া বিনে কারুর পানে চাইতে পারে না॥
প্রেমে সদাই অভিমান, প্রেম চায় ষোল আনা প্রাণ,
সরলা কথার টান, প্রেম সরু-সুতায় বাঁধাবাঁধি বাতাসে
ত ভর সবে না॥"

কিন্তু সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াও যখন অলর্ক উজ্জ্বলার মন পাইলেন না, তখন মাধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমিও ত সর্ব্বস্ব অর্পণ করেছি। তবে কেন আনন্দ পাই না, অমৃত পাই না, তার স্থলে কেন পাই বিষ!

মাধব। মহারাজ! সর্ব্বস্ব অর্পণ এরে বলে না। ধন, মান, জীবন, যৌবন—সমস্ত অর্পণ কর্‌লে তবে প্রেমলাভ হয়। আপনার এখনও রাজ্য আছে মান আছে, সকলই আছে। আপনি সর্ব্বস্ব অর্পণ করেছেন কেমন করে?

মাধবের কথায় বিরাগী মনকে অলর্ক আবার ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিল—উজ্জ্বলা যাহা চায়, তাহাই করিতে স্থির করিল। মাধবকে বলিল —'বেশ আমি সর্ব্বত্যাগী হব; মাধব! তুমি উজ্জ্বলাকে ডাক।'

এদিকে রাজরাণী বালক-বেশ ধারণ করিয়া উজ্জ্বলার গৃহে ভৃত্যের কার্য্য করিতে উপস্থিত হইয়াছেন—অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া কেন তিনি এই নরকের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা কি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে। গিরিশ-চন্দ্র সরস্বতীর মুখেই স্বয়ং বলিয়াছেন,—

'মন্ত্রি! তুমি নাহি জান বিবরণ,
হেন ঘৃণ্য বারনারী নহে কদাচন।
পাপ সহচরী কেমনে তাহারে কহ?
যারে মম স্বামী সমাদরে,
তার সম পুণ্যবতী কে আছে ভারতে?
আমি ঘৃণ্য—কভু নহি দাসী যোগ্য তার!
মন্ত্রি! রাখ প্রাণ, রাখহ বচন—
দেখাও সে রমণী রতন,
যার প্রেমে মাতি দিবারাতি
পতি মম ফেরে সাথে সাথে!
সত্য কহি, দাসী হ'ব তাঁর—
দিবানিশি সেবিব তাঁহার পদ!
আমি অপবিত্রা—পতি ঠেলেছেন পায়!
যেই জন তাঁর আদরিণী, মম ঠাকুরাণী!
পবিত্র হইব তাঁর চরণ পরশে।'

বারবনিতার চরণ-পরশে পবিত্র হইবার মানসে, দেবগৃহ ভাবিয়া বালকবেশে রাজরাণী তাহার কর্ম্ম লইয়াছেন। উজ্জ্বলা যখন রাজাকে বিতাড়িত করিয়া দিল, তখন বালক আর থাকিতে পারিল না—স্বভাব-কোমল নারীর প্রাণে ব্যথা লাগিল। তাহাকে বুঝাইয়া রাজাকে ফিরিয়া আনিতে সম্মত করাইল। তারপর যখন মাধব উজ্জ্বলাকে লইয়া আসিতে গেল, তখন বিষাদ সেস্থলে উপস্থিত হইয়া জানাইল যে, সে মহারাজকে ডাকিতে আসিয়াছে। বিস্মিত মহারাজ বলিলেন :—

কিছু লাঞ্ছনা কম হয়েছে না কি!

বিষাদ। ছি ছি মহারাজ!
লাঞ্ছনায় যদি তব ভয়,
দিও নাক প্রেমিক পরিচয়।
লাঞ্ছনা গঞ্জনা—প্রেমিকের আভরণ।
ফণির মাথায় মণি যেইজন চায়
দংশনের ভয় সে কি করে?
করি' ভয় মধুমক্ষিকায়
মধু কে হরিতে পারে?

প্রেম-সুধা সে ত নাহি পায়
লাঞ্ছনার ভয়ে সেবা!

বিষাদের কথা শুনিয়া রাজা বুঝিলেন, বালক প্রেমের কিছু বোধ হয় ধার ধারে, তাই মধুচক্রে একটু খোঁচা মারিয়া দেখিলেন মধু ক্ষরে কি না। তখন তিনি বলিলেন,—

'শুন প্রাণহীন উজ্জ্বলা নিশ্চয়—
নহে কেন প্রাণের বেদনা নাহি বুঝে
আমি প্রাণপণে যত্ন করি তারে,
সে আমারে করে অবহেলা।
বিশ্বাস প্রেমের মূল—নাহি তার মনে
তার সনে ক্ষণেক আমার দেখা,
কণ্টক ফুটিল—কুসুম না হইল চয়ন,
ভুজঙ্গ দংশিল—মণি না মিলিল—
গরল অনিল প্রাণে।'

ইহার উত্তরে বিষাদ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত—

'ভাল মন্দ করে যে বিচার,
প্রেম কোথা তার?
প্রেম—বিমল গগন বারি,
সুস্থান কুস্থান নাহি জান,
সমভাবে হয় বরিষণ।
ভালবাসা স্বভাব যাহার,
ভালবাসে, ভালমন্দ গণনা না ক'রে।'

হিসাব করিয়া—গণনা করিয়া—লাভ খতিয়ান করিয়া ভালবাসা হয় না। বিনিময়ে পাইবার আশা করিলে ভালবাসা হয় না।

এই পুস্তকে বেজার চাতুরী ও তাহার কুতকর্ম্মের প্রতিফল সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। আর প্রকৃত প্রেমের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সুচতুর কলাবিৎ অনঙ্গ ও বিষাদের মিলন সংঘটন করিয়াছেন যখন রাজরাণী মৃত্যুর তোরণ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত।

"মনের মতনেও" গিরিশচন্দ্র প্রকৃত প্রেমিকের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বড়ই সুন্দর। 'ভ্রান্তি' ও 'বিবাদের' বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, প্রেমিকের ধারণা গিরিশচন্দ্রের কত উচ্চাঙ্গের ছিল। এই নাটকেও তিনি প্রেম ও সতীত্বের যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার একটু আভাষ দিবার চেষ্টা করিব। যুদ্ধ-বিশারদ সেনাপতি কাউলেফ জীবনে কোন রমণীর সহিত প্রেমালাপ করেন নাই; কিন্তু তিনি সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উপাসক ছিলেন। 'সৌন্দর্য্যের ধ্যানে জীবন অতিবাহিত করিতেন'; কিন্তু 'ধ্যানের মূর্ত্তি কখনও দেখেন নাই'। তন্ময় হইয়া ধ্যান করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ করিলেন। সত্যসত্যই একদিন তাহার উপাস্য দেবী তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তাহার প্রাণের কামনা শুনিয়া বোধ হয় দেখা দিলেন। সেই ধ্যানের মূর্ত্তি সজীব হইয়া 'দেলদারা'রূপে দেখা দিল। ধ্যানের মূর্ত্তিকে পাইয়া, সাধক যেমন তৃপ্তিলাভ করে—আনন্দে মনপ্রাণ হইয়া যায়, কাউলেফও তদ্রূপ হইলেন। মূর্ত্তি ও দেখিলেন—আত্মসমর্পণ করিলেন, কিন্তু ঘটনাবশে সম্রাটের বিষ-নয়নে পড়িয়া সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। সম্রাট্ ও তাঁহার সতীশিরোমণি পত্নী গোলান্দামের মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হইল, তাহা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সন্দেহের বিষ-বীজ একবার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, শীঘ্রই তাহা বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়। 'সংসার প্রেমের বন্ধনে স্থাপিত' এ কথাটা সত্য কি না যাচাই করিবার জন্য, শিক্ষার্থী ভাবে সংসার ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া প্রিয়তমা পত্নী গোলেন্দামকে বলিলেন,—'যদি সন্দেহের বিষ-বেদন হ'তে ত্রাণ পাই, তা হ'লেই ফিরবো—নচেৎ তোমার সঙ্গে আমার এই দেখা।' বিনা মেঘে বজ্রাঘাত পড়িলে পথিকের যেরূপ অবস্থা হয়, গোলেন্দামের অবস্থাও তদ্রূপ হইল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ

থাকিয়া, সতীত্বের বলে বলীয়ান হইয়া মৃত্যু সিংহিনীর ন্যায় বলিলেন,—'আমি তোমার অর্দ্ধ অঙ্গ। আমায় ফেলে যাবে, তোমার শিক্ষা পূর্ণ হবে না।'··· 'তুমি আমায় ত্যাগ করে যাবে—মনে করো না। তোমার বিরহে আমি মর্ব্বো। তা'হলে তুমি আমায় যে শাস্তি দেবে মনে করেছ, তা তো পূর্ণ হ'বে না। তুমি সংসার-সাগরে ভাস্‌বে আমি ঘরে নিশ্চিন্ত হ'ব—এ' কল্পনা আমার স্বপ্নে উপস্থিত হবে না।' 'যদি মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, আমি তারে সকাতরে বল্‌বো, যে আমার স্বামীকে তুমি এনে দাও, আমি তাঁরে দেখে তোমার সঙ্গে যাব। তোমার সমক্ষে, ঈশ্বরের নামে শপথ কচ্চি যে, তোমার মন হ'তে সন্দেহ দূর করে, যতদিন না "গোলেন্দাম বলে আদর করে আমায় আলিঙ্গন কর,—ততদিন অন্নে অনলে, গরলে, ব্যাধি-তাড়নে, দৈব-বিড়ম্বনায় আমার মৃত্যু নাই। বাদ্‌শা, তুমি শিক্ষার্থী হয়ে সংসারে ভাস্‌বে—সে শিক্ষা সতী নারীর নিকট নিয়ে চলে যাও। তুমি প্রেম দেখ নাই,—প্রেমের প্রভাব দেখে চলে যাও। তুমি সন্দেহ-গরলে জর্জ্জরীভূত,—সন্দেহ দূর করে যাও। তোমার নিকট অস্ত্র আছে, আমায় বধ কর। আমার মৃত মুখ দর্শনে সতী কি তা জান্‌বে। প্রেম-বন্ধনে সংসার চলে, তা জান্‌বে, তোমার অন্তরে সন্দেহ থাক্‌বে না।' অনুনয় নাই—বিনয় নাই—কাতর ক্রন্দন নাই, অধিনীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও না বলিয়া অনুযোগ ইহাতে নাই—আছে প্রকৃত প্রেমের স্বর্গীয় দ্যুতিতে আলোকিত হৃদয়—আছে প্রাণভরা বিশ্বাস; কোথায় যাইবে—তুমি যে আমার, আমি যে তোমার—আমার কাছে ফিরিয়া আসিতেই হইবে। তুমি আমি একাত্মা হইলে যে পূর্ণাবয়ব হইবে না। তাই গোলেন্দাম বলিতে পারিলেন, আমার কাছে মৃত্যু আসিতে পারে না—সতীর নিকট ততদিন মৃত্যু আসিতে পারে না, যতদিন না সতীর প্রাণপতির সহিত মিলন হয়—সন্দেহের কাল মেঘ কাটিয়া প্রেমের পূর্ণচন্দ্র সতীর হৃদয়াকাশে উদয় হয়। তুমি স্বহস্তে আমাকে বধ কর, তবের একটী রেখাও মুখে দেখিতে পাইবে না—আনন্দে সে মরণকে বরণ করিয়া লইয়া জগৎকে দেখাইব প্রেমের মহাত্ম্য—তখন বুঝিবে সতীর কি? সতীর অঞ্চলের ধনকে কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। আবার আমি তোমাকে পাইব এ ধারণা আমার আছে। তাই সতী কুললক্ষ্মী বলিতে পারিয়াছিলেন,—

'একটী কথা বল—আশা দাও—সেই আশা ধ'রে আমি জীবিত থাকি। সতী পতিকে পায়—এ শাস্ত্রের কথা,—লোকের কথা, এই ধারণায় সংসার চল্‌চে। আমি সতী, আমার পতিকে কি জন্মের মত বিদায় দিব? বল আবার দেখা হবে?'

নির্জ্জান। তুমি যদি সতী হও,—শাস্ত্রের মর্ম্ম যদি সত্য হয়, সতী পতিতে যদি বিচ্ছেদ না হয়, তুমি তোমার সতীত্বের উপর নির্ভর করে আশা কর। আমি চল্লেম,—কোথায় যাচ্ছি জানি নে। আমি নিরাশ সাগরে ভেসেছি—তোমায় আশা দেব কেমন ক'রে! গোলেন্দাম বিদায়।

সতীত্বের এ চিত্র জগতের সাহিত্যে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুণ্যস্থান ভারতবর্ষের নারীর পক্ষেই এই উচ্চ আদর্শ সম্ভবপর। বিরহ-বিচ্ছেদ সহ্য করিবার শক্তি ভারতীয় নারীর যতটা আছে, ততটা অন্য কোন দেশের রমণীর আছে কি না জানি না। হিন্দুরমণী আবার এ জীবনে মিলনের সম্ভাবনা না থাকিলেও, পর-জীবনে মিলিত হইবেন এই আশায় জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। বঙ্গ ভারতের পুণ্য-শ্লোকা রমণী—তুমি মূর্ত্তিমতী সংযম ও ত্যাগ। তাই গোলেন্দাম মৃত্যুর আশা করেন নাই—স্থির বিশ্বাস তাঁহার ছিল যে, আজ না হয় দুদিন পরে স্বামীর ভুল ধারণা ঘুচিয়া যাইবে, আবার তাঁহাদের সুখের দিন আসিবে। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন,—

'মৃত্যু !—ম'লেই তো ফুরোয়। মরবো না। আশা করো না কেন? নির্জ্ঞানের সঙ্গে কে আমার বিচ্ছেদ ঘটাবে? নির্জ্ঞান কোথায় আছে, কেমন আছে, রোজ আমার মনকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বো। আমার নির্ম্মল মন অসত্য কখনো জানে না, সত্য উত্তর দেবে।' কতটা মনের জোর থাকিলে একথা বলিতে পারা যায়! পতির সংবাদ ত প্রত্যহই আনি মনের নিকট হইতে পাইব, তবে আর চিন্তা কি! তাই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন,—'নির্জ্ঞানকে পাব—নিশ্চয়ই পাব।' এই বিশ্বাসের মূলে কেহই কুঠারাঘাত করিতে পারে না। সতীর প্রাণের উদগ্র কামনা ব্যর্থ হইবার নয়। তারপর সতী শিরোমণি গোলেবাস ভাবিলেন, স্বামী ত তাঁহার তত্ত্ব লইতে তাহাকে নিষেধ করেন নাই। স্বামী দেবতা। দেবতার আদেশ লঙ্ঘন করিবার তাঁহার শক্তি নাই। তবে তিনি তাঁহার অনুসরণ করিবেন স্থির করিয়া, সখি পরিয়াকে লইয়া পুরুষ-বেশে নবাবের অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন।

ইহার পরেই দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম-গর্ভাঙ্কে গিরিশচন্দ্র নগর প্রান্তরে এক ফকিরের আস্তানা দেখাইয়া দিলেন। ফকিরের মুখ দিয়া যে সকল জ্ঞানগর্ভ কথা বলাইলেন, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কত উচ্চাঙ্গের ছিল—সুখ দুঃখের পার্থক্য কোথায়? ভারতীয় দুঃখ-বাদের উপরই যে সুখ প্রতিষ্ঠিত তাহা কত সহজ ভাবে তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন—আর বুঝাইয়া দিয়াছেন, সংসারত্যাগী ফকিরেরা আত্মসুখপরায়ণ ন'ন—ফকিরের কার্য্য, কবির কথায় বলি,—'আত্মত্যাগে মানব-কষ্ট দূর করাই ফকিরের কার্য্য, এই সাধনাই ঈশ্বরের কার্য্য। সাধনা দুঃখময়—সাধনা শান্তিময়।' অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, মানব সন্তাপ দূর করা ফকিরের সাধন।' এই গর্ভাঙ্কের দার্শনিকত্ব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার সামগ্রী। এই ফকিরের আদর্শ-জীবনচরিত হিন্দু মুসলমান সাধু সন্ন্যাসীদের অনুকরণীয়। সাধু ফকিরেরা কেবল মাত্র নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকেন না—কেবল মাত্র সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া আত্মোন্নতি করেন না—তাঁহাদের পর-দুঃখ-কাতর প্রাণ, সংসারের দুঃখ দৈন্য জ্বালা দেখিয়া শান্তির অমৃতবারি সেচনের জন্য সততই উন্মুখ। এই হিতৈষণা-প্রেরণায় তাঁহারা জগতের মঙ্গলকামী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন।

সংসার-বিতৃষ্ণা আসিয়া যখন কাউলেফ আত্ম-হত্যা করিতে উদ্যত, তখন তাহার মনে হইল সর্ব্ব-শক্তিমান ফকিরের নিকট একবার গিয়া জিজ্ঞাসা করি, 'আত্মহত্যায় পাপ আছে কি?' উত্তরে ফকির বলিয়াছেন,—'আমি পাপ পুণ্যের সীমা স্থির করিতে পারি নাই। তবে কতকটা আমার অনুভূতি হয়েছে যে, পুণ্য কার্য্যের করনা ও অনুষ্ঠানে আত্ম-প্রসাদ, আর পাপ সর্ব্বদাই সন্দেহ জড়িত। • • আত্মহত্যা পাপ কি না, সে কথা সন্দেহই তোমায় ব'লে দেবে, আমার জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন।' কি সহজ সরল সত্য! বাস্তবিক অবিশ্বাসের বিষ-বীজ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, কত নর-নারীর পারিবারিক জীবন একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার কি সংখ্যা করা যায়!

কাউলফের অশান্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিবার জন্য ফকির বলিতে লাগিলেন,—'দুঃখের সংসারে দুঃখ পেয়েছ, ফকিরকে অধিক পরিচয় কি দেবে? আগুনে হাত পোড়ে নি যদি এ সংবাদ দিতে পারতে, তবে নূতন সংবাদ বটে—নয়তো আগুনে হাত দিয়ে হাত পুড়েছ,—এ সংবাদ আর আমায় কি জানাবে? • • জলে ঝাঁপ দিলেই মরতে পারবে না। যে কাজ করলে আর ফিরবে না—একটু বিচার ক'রো। কাজ করে ফেলেই হয়, কিন্তু যে কার্য্যের পরিণাম ভাবে, সে পাপ করে না—এই আমার ধারণা।'

এত জ্ঞানার্ভ কথা শুনিয়াও যখন কাউলফের

অশান্ত চিত্ত কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেছিল না, তখন সে কাতরভাবে ফকিরের চরণে আশ্রয় চাহিয়া বলিল, 'ফকির, আমি ভুলেও ভুলতে পাচ্ছি নি • •—আমি বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি—আমায় রক্ষা কর।'

ফকির। যন্ত্রণার হাত হ'তে নিস্তার পেতে চাও—তা হলে মানব জন্ম ধারণ করেছ কেন? প্রস্তর হ'তে পারতে,—তা হ'লে কোন যন্ত্রণাই উপভোগ করতে হতো না। মানব জীবনে যন্ত্রণাই বন্ধু। দুঃখকে আদর ক'রে, যদি সুখকে প্রত্যাখান করতে পার,—তাহ'লে দেখতে পাবে যাকে তুমি সুখ বল সে বাঈজীর মত তোমার পেছনে পেছনে ঘুরছে। আর দুঃখই তোমায় নিত্যানন্দ ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যাচ্ছে।' এই সুখ-দুঃখের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান চণ্ডীদাসের সুখ-দুঃখ বিষয়ক অমর গীতিগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়। অন্যত্র পরিষার মুখে গিরিশচন্দ্র বলাইয়াছেন,—'পরকে দিয়ে সুখ, পরের সুখে সুখ। আপনার সুখের প্রত্যাশা করলে, অনেক দুঃখ পেতে হয়।'—বাস্তবিকই সুখের অন্বেষণ করিলে 'আগেই দুঃখ যায় তার ঠাঁই।' স্বার্থত্যাগে যে সুখ—যে শান্তি, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। সুখ দুঃখের আশা ছাড়িয়া কার্য্য করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

তারপর ফকির বলিতে লাগিলেন,—'বোধ হয়, তোমার হৃদয়ে প্রেমের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছে, বিরহ জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছ। কোন রমণীর ছবি তোমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত—তারে তুমি ত্যাগ করতে পাচ্ছ না। তোমার চঞ্চল হৃদয়—যাহা কখনও এক বস্তুতে স্থির হয় নাই, সামান্য একটি রমণীর ছবি ধারণ করে একাগ্র হয়েছে। একাগ্রতা অনেক সাধনের ফল। ভাগ্যক্রমে তুমি পেয়েছ, দুঃখ বিবেচনা করো না। সোনা তাতে গলে তবে গড়ন হয়। যদি মনকে গড়তে চাও, তাপকে ভয় করো না।' কাউলেফ দুঃখকে বরণ করিয়া লইলেন, বলিলেন,—'দুঃখ আমার জীবনের সাথী, ছেলেরা আমার জীবনের সাথী, ছেলেরাকে নিয়ে থাকবো—দুঃখ নিয়ে থাকবো! ফকির সেলাম।' কাউলেফ চলিয়া যাইতে না যাইতেই গোলেস্থান আসিয়া ফকিরকে প্রশ্ন করিলেন,—

গো। ফকির, সতীকে কি পতি বিরহ অনুভব ক'রতে হয়? পতি ছাড়া, যে জীবন ধারণ করতে পারে,—সে কি সতী? যাই হোক আমি কুলাচার ত্যাগ কর্ব্বো। ফকির কুলাচার ত্যাগিনীর প্রায়শ্চিত্ত কি,—আমি তোমার কাছে জানতে এসেছি।

ফকির। অনলতাপিত ভ্রমরী কাঞ্চনের ন্যায় সতীত্ব। সে বিশুদ্ধ কাঞ্চনে মলা স্পর্শ করে না, প্রায়শ্চিত্তের নাম মাত্র গ্রহণ করা। উত্তাপিত ভ্রমরী কাঞ্চনে আর অধিক তাপ কি প্রবেশ কর্ব্বে? সতীর পরমন্ত্র যার আছে, মা—তার আর পাপ নাই।'

সতী যে পাপ পুণ্যের অতীত এত বড় সত্যটা আমাদের সমক্ষে ধরিয়া গিরিশচন্দ্র আমাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত করিয়া দিয়াছেন। পাপ পুণ্যের স্থান মনে। সতীর মনে অন্য কাহারও স্থান ত নাই!—সে সমগ্র স্থান ব্যাপিয়া তাহার স্বামীর মূর্ত্তি যে রহিয়াছে। সতী জগতে স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষকে, পুরুষ বলিয়া দেখেন না—যেমন তাহারই নারী অবলা। সতীর ইন্দ্রিয়গ্রামগুলি স্বামীর বচন-সুধা পান করিবার জন্য সতত ব্যগ্র। ফকিরের কথায় সতীর গোলেস্থানের চমক ভাঙ্গিল। মনে মনে বলিলেন,—পাপ পুণ্যের বিচারের জন্য ফকিরের কাছে এসেছি কেন? পাপ হয়, পুণ্য হয়—আমি স্বামীর অনুগামিনী, ফকিরকে সেলাম করিয়া তিনি গন্তব্য পথে চলিলেন।

অনন্তর সন্তপ্ত-হৃদয়ে মির্জ্জান আসিয়া ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ফকির সংসার ভাল কি ফকিরী ভাল?' ফকির উত্তরে বলিলেন, 'সংসার কি—কেমন? তা কখনো দেখি নি। তার ভাল মন্দও জানি নে। তুমিও যখন জিজ্ঞাসা কচ্ছ,—"সংসার ভাল না ফকিরী ভাল?" তাতে বোধ

হচ্ছে, তুমিও দুটোর একটাও জান না। দেখে শেখে, ঠেকে শেখে। জান্‌বার ইচ্ছা থাকে, চল সংসার দেখি গে। দেখেই শিখি বা ঠেকেই শিখি। যদি শিক্ষা হয়—পরমলাভ। শিক্ষার্থী হয়ে জীবন যায় হানি নাই। তোমার কি দেখ্‌বার সাধ ফকিরী না সংসার? আমার ধারণা,একটা দেখ্‌লেই দুটা দেখা হয়। চল না কেন সংসার দেখে আসি।' এই গর্ভাঙ্ক সমস্ত নাটকের মধ্যে দীপ্তিমান মণিমণির ন্যায় উজ্জ্বল।

ফকির, মির্জ্জানকে লইয়া প্রেমের পবিত্র চিত্র সকল দেখাইলেন—তাঁহার অশান্ত মনকে শান্ত করিয়া দিলেন—অশান্তির যে বীজ তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতেছিল, তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিলেন। মিলনের মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল—প্রণয়-প্রণয়িণীর মিলন হইল। ফকির বুঝাইয়া দিলেন,—'মানবের হিতসাধন ফকিরও সংসারী উভয়েরই কার্য্য। সংসার সুখের করা যায়। হৃদয়ে সন্দেহ না থাক্‌লে, ভগবানের সংসার প্রেমের সংসার স্বরূপ জ্ঞান হ'লে, কার্য্যের নিমিত্ত কার্য্য করে—পরহিত সাধন ক'রে ফকির আর বাদ্‌সাহ দুইই সমান।' পুস্তকের ফলশ্রুতি দুইটি। পূর্ব্বেও বলিয়াছি আবার বলি, সংসারে 'বাতিকগ্রস্ত' এমন পুরুষ ও নারী অনেক আছেন যাহারা আপনাপন স্ত্রী বা স্বামীকে অকারণে বা সামান্য কারণে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়া আপনাদের জীবন ও পারিবারিক জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলেন। গিরিশচন্দ্র অন্যত্র বলিয়াছেন, 'মন যার আর অবিশ্বাসী, সে ত নয় প্রেম পিয়াসী।' একটা বড় সত্য গিরিশচন্দ্র আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, 'সংসারে সুখ দুঃখ উভয়ই আছে। কেবা দুঃখের ভয় পাওয়া হীনতার পরিচয়।'

আরও একটা আশ্বাসের বাণী তিনি দিয়াছেন,

'যে মনের মতন চায়,
কল্পলে মতন মনের মতন পায়,
না পেলে মতন কেন ডুব্‌বে ধরিয়ায়;
যে চেয়েছে, যে সেধেছে—সে পেয়েছে,
পায়, সরল প্রাণে যে জন খোঁজে,
মনের কথা যে মানে।"

যত্ন কর—সঙ্কল্প কর, প্রাণের উদগ্র কামনা লইয়া চাও—বিবেকের বাণী শুনিয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর হও—পাইবেই পাইবে।

এই কথা গিরিশচন্দ্র পরিষার মুখেও বলাইয়াছেন,—'যেজন যারে চায়, সেই ত' তারে পায়।'

এইবার আমরা প্রেম সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র এই নাটকে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিব।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে মঠের অভ্যন্তরে কাউলেফ-প্রণয়িণী দেলেরার সহিত সম্রাট্-পত্নী গোলন্দোমের সাক্ষাৎ পাই। দেলেরার চিত্র অনবদ্য সুন্দর—নিখুঁৎ। প্রেমের ধারণা তাঁহার কত উচ্চ একবার দেখুন! কাউলফকে ইনি মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, অন্যের অঙ্কশায়িনী কি করিয়া হইবেন? তাই গোলেন্দাম যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাঁহারের পিতার ধনলোভে যদি তোমায় সঙ্গে বিবাহ দেয় তখন তুমি কি কর্ব্বে?' দেলেরা উত্তরে বলিলেন,—'সেদিন আমি প্রাণত্যাগ কর্ব্বো। এখন প্রাণ রেখেছি কাউলফকে পাবার আশায়। আমার মনে হয়,—আমি যেমন তার জন্যে ব্যাকুলা,—সেও আমার জন্য এইরূপ ব্যাকুল। আমার মনে ধারণা, সে আমা ছাড়া জানে না। যদি তারে না পাই, তার উদ্দেশে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে অনুতাপ অবসান কর্ব্বো। আমি তার আশায় জীবিত আছি।' এই অনন্য-শরণতা প্রেমের প্রধান লক্ষণ। আশা-মুগ্ধার কি অনন্ত বিশ্বাস, কি অটল ধ্রুব বিশ্বাস। তাই গোলেন্দাম যখন তাহাকে প্রশ্ন করিল, 'আর সে যদি তোমায় না চায়?' স্বপনে স্বপনে ধ্যানের উপাস্য দেবতার শ্রীমুখ দেখিয়া যিনি সততই আনন্দ উপভোগ করেন, সেই 'ধ্যান-পরায়ণা দেলেরা কি

উত্তর দিয়াছিলেন, একবার শুনুন,—'চায় না? আমি চক্ষের উপর দেখ্‌ছি সে আমায় চায়। আমি অন্তরে অন্তরে বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কোথাও নির্জ্জনে সে আমার ধ্যান কর্‌ছে। সে আমার জীবন সর্ব্বস্ব—আমি তার জীবন সর্ব্বস্ব। এ যদি মিথ্যা হয়, তা হ'লে জান্‌বো সংসারে খোদার কোপ দৃষ্টি পড়েছে। সংসারে প্রেমের বন্ধন নাই, সংসার ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছে, সংসার প্রেমশূন্য।' এই বিশ্বাসের মূলটা একটু নাড়িয়া দিবার চেষ্টা করিয়া গোলেম্‌ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার কি বিশ্বাস, তোমার আশা পূর্ণ হ'বে?'

উত্তরে দেলেরা বলিলেন,—'অবিশ্বাস কেন কর্ব্বো? অবিশ্বাসের নাম মৃত্যু,—অবিশ্বাসের অর্থও আর আমার নিকট অপর কিছুই নাই। কে জীবন ছাড়্‌তে প্রস্তুত বল? আমি আশা কর্ব্বো না?—আশা আমার প্রাণ। নচেৎ মনেও আমার অনুতাপানলে পরিত্রাণ নাই—মৃত্যুতেও যন্ত্রণা দূর হ'বে না। তারে পেলেও না, এ বেদনা আমার যাবে না।'

গো। তুমি তারে পাবার কি উপায় করেছ? এ কথায় দেলেরার প্রাণভরা বিশ্বাস তাহাকে বলাইল, 'উপায় আপনিই হবে। আমি উপায়ে তারে দেখি নি—সে দেখা দিয়াছিল। আমি তারে কোন উপায়ে ভালবাসি নি—ভালবেসেছি। সে আমার—উপায় করে আনি নি—জেনেছি। যা হবার হয়েছে—যা হবার হ'বে। ভালবাসা—ভালবাসা পায়। কোন উপায়ে বুঝি না—বুঝেছি। উপায় আপনি হবে। আমি উপায় কর্‌তে পার্‌লে এতদিন কর্‌তেম, কিন্তু আমার উপায় নাই। আমি পরাধীনা—পরবাসে পরের স্বেচ্ছাধীনা।'

বাস্তবিকই উপায় তিনিই করিয়া দিবেন, যিনি জগৎকে চালাইতেছেন। একথাটা ভুলিলে ত চলিবে না যে, 'পুতুল বাজীর পুতুল আমরা যেমন নাচান তেম্‌নি নাচি'। উপায় তাঁহার হাতে। স্বাধীন ইচ্ছার বলে কোন্ কার্য্য আমরা করিতে পারি? তবে দেলেরার মন যে কথা বলিতেছে, সে দৃঢ়কণ্ঠে তাহা বলিল,—'ভালবাসা—ভালবাসা পায়, যে যারে চায়, সে তারে পায়, একথা ধ্রুব সত্য। যদি না পাইবে তবে সাধনার আবশ্যকতা কি? আর একটা বড় কথা গিরিশচন্দ্র দেলেরার মুখ দিয়া বলিয়াছেন, 'আশা-হারা হ'লে প্রাণ ধর্‌তে পারা যায় না। আশায় জগৎ জীবিত। আশা-হারা হ'য়ে দেহকে মাটি করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়।'

প্রকৃত প্রেমিকের অবস্থা গিরিশচন্দ্র কাউলফের চিত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। কাউলাফ চেষ্টা করিতে ছেন দেলাগাকে ভুলিতে, কিন্তু পারিতেছিলেন না। কাউলাফের স্বগতঃ উক্তি একটু শুনুন;—'না—ভোলবার কিছুতেই যো নেই—ভুল্‌তে চাইনে,—ভুল্‌বো কেমন করে? জগতে চাই—অশুচি! পাতার শব্দে মনে হয় সে আস্‌চে, পবন বইলে মনে হয় সে আস্‌চে, চোকের উপর সেই ছবি। কানে তার মধুর স্বর পালাব কোথায়? আপনার কাছ থেকে কোথায় পালাব! সে আমার অন্তরে অন্তরে, কবরে, ভুল্‌বো কি—না জানি নে!' প্রকৃত প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে ভুল্‌তে পারে না—সে যে সর্ব্বক্ষণ তন্ময় হইয়া প্রেমাস্পদে ডুবিয়া থাকে। এই সত্য কথাটা গিরিশচন্দ্র আর এক স্থানে কাউলাফের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,—'না—না কেন ছাড়্‌বো? আমার যে সুখ আছে, সে যে জানেছে সেই জানে। তারে ভেবে সুখ, তার কথা কয়ে সুখ, তার আশায় সুখ, সে সুখ অন্তরে আঁকা, একে ছাড়্‌বো? কেন ছাড়্‌বো, এ আশাই যে তার জীবন!'

'মনের মতনে' তাহাদের শুকরজনক প্রেমের চিত্র, এই সকল প্রকৃত প্রেমিকদিগের চিত্রের পার্শ্বে এমন বীভৎস ভাবে স্থাপিত হইয়াছে যে, দেখিলেই ঘৃণার উদ্রেক হয়। কলাকুশলী শিল্পী বৈপরীত্য আনয়ন করিয়া আর্টের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

মণ্ডল বাগান

(গল্প)

(শ্রীমাশুতোষ সান্যাল)

(১)

জ্ঞানপতি দাস গ্রামের মধ্যে একজন বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ। তাহিতে সদ্‌গোপ হ'লেও তার আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণ কায়স্থ অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না। অশেষ গুণের অধিকারী হয়েও জ্ঞানপতি একটা দৌর্ব্বল্যের জন্য অনেক সময় নিজের কাছে, সংসারের কাছে ও দেশের কাছে ও দশের কাছে বড়ই লজ্জিত ছিল। নিজের এই মানসিক দুর্ব্বলতার প্রতিকারের চেষ্টাও সে যে না করেছিল তা নয় কিন্তু দুর্ভাগ্য—যে তার বয়স যখন পঞ্চাশ পার হ'তে চল্‌ল তবুও ঠিক একভাবেই চলেছে।

জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনায় গ্রামের প্রায় সবার সহানুভূতি তার কথায় ওঠে বসে। ইতর ভদ্র এমন খুব কম লোকই ছিল যার কিছু উপকার সে না করেছে; কিন্তু দুটা রিপুর পাঁচটা সে খাতির সহিত জয় করিলেও—ক্রোধ রিপুটাকে সে কিছুতেই পেরে উঠে না। এই রিপুটা সময় সময় তার খ্যাতি ও সম্মানের উচ্চ মস্তকে এমনি প্রচণ্ড আঘাত করত' যে পাহাড়ের মত তার সুদৃঢ় মাথাটাকে জোর করে পথের ধূলায় লুটিয়ে দিত। মানুষ তাকে চিন্‌লেও—হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয়—কাজেই, থাকে মাঝে দু একজন তার রাগের ঝাঁঝ সাম্‌লাতে না পেরে, তাকে বেশ একটু নাড়া দিয়ে দিত; আর সেই ঝাঁকুনিগুলো এমনই বেদনাভরা যে তার সারা প্রাণটা টন্ টন্ করে উঠ্‌ত। সে ব্যথার আরাম করতে তাকে ছ দশ দিন অনাহারে অনিদ্রায় কাটাতে হত।

জ্ঞানপতির পরিবারটিও নেহাৎ ছোট ছিল না। ছেলে, পিলে, বৌ কি নিয়ে প্রতি বেলায় কম করে কুড়ি পঁচিশ খানা পাতা পড়ত। দয়া, মায়া, স্নেহ ভালবাসা প্রচুর পরিমাণে সংসারের প্রত্যেক লোকটার উপর অকাতরে ঢেলে দিয়েও তাদের চক্ষে সে বিভীষিকার মত ছিল, তার সামান্য একটা কাশির শব্দেও তারা শঙ্কিত হত। এক এক সময় এই ব্যাপারটা জ্ঞানপতির প্রাণে এমন আঘাত করত, যে সব ছেড়ে তার বিবাগী হয়ে চলে যেতে ইচ্ছা হত, কিন্তু মায়াদয়ের এমনই খেলা যে চোরা বালীর মত মায়া রাক্ষসী তার পা টিপে সেই ছেড়ে যেতে চাওয়ার গভীর খাদে চুবিয়ে ধরত। তাই, সহ্য করার চেষ্টা করে, সহ্য করার সঙ্কল্প করেও সে একটা দিনের জন্য একটা তীর্থ স্থানে যেতে পারে নি। ছোট ছোট নাতী নাতনী গুলার মুখ পানে চেয়ে সে সব ভুলে যেত। তবে রাগটা—তা সে কি করবে বল, ভূতের মত সেটা তার ঘাড়ে এমনি চেপে বসেছিল যে তাকে দূর করা কোন রোজার সাধ্য ছিল না। তাই সে চিরদিন মানুষের ভাল মন্দ দেখে, স্বজাতির শুভাশুভের চিন্তা করে সংসারের সুখ দুঃখের সমান ভাগ নিয়ে জীবনের গোনা দিনগুলা একই ভাবে কাটিয়ে যাচ্ছিল। যখন রাগ হয় তখন চুপ করে ঘরে বসে তামাক খায়—আর আপন মনে গজ গজ ক'রে ব'কে, রাগের তেজটা আপনার সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে দেয়; তারপর রাগ পড়ে গেলে—আবার বাইরে এসে নির্দ্দিষ্ট কাজ কর্ম্ম নীরবে সম্পন্ন করে।

(২)

জ্ঞানপতির গ্রামের জমিদার রাজীব লোচন রায়

—রাজা বললেও অত্যুক্তি হয় না, যাঁর প্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়। গ্রামের আশ পাশের আট দশখানা গ্রামের তিনিই জমিদার প্রতিদ্বন্দ্বি বলতে আর কেহই ছিল না। পল্লীগ্রামের জমিদার—যাঁর হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি আছে, চালচলনে তিনি সহরের একজন রাজারাজরাড়ার সমান, তবে সাধারণতঃ তাঁদের নাম অত্যাচার অবিচারের মধ্যে দিয়েই রাষ্ট্র হয়। রাজীবলোচন রায় কিন্তু স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে কোন দিনই তিনি বিচলিত হতেন না। নির্দ্দোষ হীরকের মত স্বচ্ছ ও তেজপূর্ণ চরিত্রের বলে তিনি সমস্ত জমিদারি এমন সুশাসনে রেখেছিলেন যে প্রজারা তাঁকে ভয় করলেও সেই ভয়ের ভিতর ভক্তির বন্যা ছিল। লোকে তাঁকে মা'নত, মা'নত,—ভালবা'সত। তিনিও লোকের এই ভক্তি ভালবাসার ঋণ কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। তাঁরই অর্থ ও চেষ্টায় গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয় জেলার ভিতর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিল, তাঁরই কল্যাণে গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয় আদর্শ চিকিৎসালয়ে পরিণত। তা ছাড়া গ্রামের যারা ভবিষ্যৎ আশা ভরসা সেই সব যুবক ও বালকদের তিনি এমনই কঠোর অথচ কোমল শাসনের বেষ্টনিতে বেঁধে রেখেছিলেন যে তারা তাঁকেই আদর্শ করে আপনাপন ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করে তুলছিল। আর জমিদারের মহৎ অন্তঃকরণের গুণে গ্রামে শান্তি ছিল, সম্পদ ছিল—সম্ভ্রম ছিল।

(২)

রাজীব লোচন রায়ের অন্যান্য সৌভাগ্য সম্পদের মতন পুত্র-ভাগ্যের রাশিটা তেমন সবল ছিল না। অনেক যাগ, যজ্ঞ, হোম ক'রে, সহস্র ঠাকুরের দোরে মাথা কুটে, অসংখ্য মাদুলী কবচ ধারণ ক'রে জমিদার গৃহিনী জীবনের অর্দ্ধেক দিন মনোকষ্টে কাটিয়ে একমাত্র বংশধর—জীবনধনকে লাভ করেছিলেন। কাজেই অমন সাধনার ধন, পিতৃ পিতামহদিগের একমাত্র পিণ্ডদানের অধিকারীকে সকলেই একটু বেশী আদর দিয়ে ফেলেছিল, এমন কি রাজীব লোচন রায়ও পুত্রের প্রতি স্নেহাধিক্যে—তার শিক্ষা দীক্ষার বিষয় শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেন, তাই চোদ্দ পনের বছরেও জীবন তার চরিত্র গঠনের অবসর পায় নি।

চাণক্য পণ্ডিত বালিকাদের ভবিষ্যত জীবনে দৃষ্টিপাত করেই তাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শাসন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন, তিনি লোক বেঁধে এ উপদেশ দেন নাই—কারণ তিনি জানতেন 'সব আগুনেই হাত পোড়ে'। অপরিচিত পথিককে কোন কারণেই দোষ দেওয়া চলে না—যদি সে পথ নির্দ্দেশকের নির্দ্দিষ্ট পথে চ'লে পথভ্রষ্ট হয়।

রাজীবলোচন অতবড় বুদ্ধিমান হয়েও পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে এই সুদীর্ঘকাল তাকে শিশুর মতন লালন পালন করে এসেছেন। অতিরিক্ত আদর বালকদের উশৃঙ্খল পথে টেনে নিয়ে যায়,—জমিদার পুত্রও পিতা মাতা আত্মীয়স্বজন সকলের কাছে সমান আদর যত্ন পেয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাজীবলোচন যখন পুত্রের অত্যাচারের আঘাতে সজাগ হলেন তখন সে তাঁর শাসন গণ্ডী পার হয়ে—অনেক দূরে সরে দাঁড়িয়েছিল এবং চতুর বালক পিতার সজাগ দৃষ্টি দেখে মাতার স্নেহাঞ্চলের বর্ম্মে আপনাকে যেন সুদৃঢ় ভাবে আবরিত করেছিল—রাজীবলোচন রায় ইচ্ছা সত্ত্বেও পুত্রের সংশোধনে সক্ষম হলেন না।

লোকের কাছে ষোল আনা সম্মান আদায় করতে এবং রাজা প্রজার প্রভেদ সম্বন্ধ, জীবন ধনকে কারো কাছে শিখতে হয় নি, বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সে নিজের অধিকার নিজেই বেশ বুঝে নিয়েছিল। দু' বছর বয়সের সময় সে পঞ্চাশ বছরের আমলা মুহুরীকে ধমক দিয়ে হুকুম করতে একটুও ইতস্তত করত না। ছেলে মানুষ জানে—মা বাপের

একমাত্র আদরের দুলালের সে ব্যবহারে লোকে পূর্ব্বে আমোদ অনুভব করত বটে কিন্তু হিংস্র শাবক যখন তার নখ দন্তের তীক্ষ্ণতা দেখে তার শক্তির পরীক্ষা করতে নিরীহ প্রাণীকে ক্ষত বিক্ষত করতে লাগল তখন বেদনার ভেতর দিয়ে তারা নিজেদের অবস্থা বুঝতে পেরে সতর্ক হ'ল। আমলা মুহুরীরা জমিদার পুত্রের যে ব্যবহারে এতদিন আনন্দ অনুভব করেছে এখন তার তীব্রতায়—অস্থির। জীবনধনও মানুষের দুর্ব্বলতা দেখে স্বেচ্ছাচারের কঠোরতায় নিজেকে বেশ দৃঢ় করে তুলেছিল। চোদ্দ পনের বছরের বালকের ব্যবহারে অতিবৃদ্ধও স্তম্ভিত হত। গ্রামবাসী জীবনের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে অনেকবার প্রকারান্তরে জমিদারের কর্ণে এ সকল কথা পৌঁছাইয়াছিল কিন্তু তাঁর প্রতিকারের চেষ্টা বাধা-প্রাপ্ত স্রোতের মত তার উদ্দামতাকে আরও সতেজ করে তুলেছিল।

(৪)

জ্ঞান গতির বাড়ীর পশ্চাতে জমিদারের এক কলমের বাগান ছিল। ঐ বাগান পূর্ব্বে জ্ঞান-গতিরই তত্ত্বাবধানে ছিল। তার নিজের ও পুত্রদের অনেক শ্রমজলে সিক্ত হয়ে এখন তাহা ফলবান। ইদানিং কয়েক বৎসর হতে রাজীবলোচন বাগানটীকে নিজের তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। জমীদারের এই কলমের বাগানের ফল সে অঞ্চলে বিখ্যাত ছিল। জ্ঞানগতির পুত্র পৌত্রেরা চিরদিন এই ফলের আস্বাদন পেয়ে এসেছে, কাজেই বয়স্কেরা লোভ সম্বরণে সক্ষম হলেও বালকেরা জ্ঞানগতির আগোচরে এখনও বাগানের আশে পাশে ঘুরে ফল সংগ্রহের চেষ্টা করে। বাগানের মালীরা সকলেই বিদেশী;—বিশেষতঃ জমিদারের চাকর মনিব ব্যতীত অপর কাহাকে সম্মান করবার আবশ্যকতা দেখে না। তাই, লোকে বাগানের দিকে তাকালেও—সভয়ে তাকায়,—কারণ মালীরা নাকি চোরের চক্ষু চিনতে পারে, আর তারা যদি একবার কাহাকে সন্দেহ করে তবে জমিদার পুত্রের কাছে তার লাঞ্ছনার অবধি থাকে না, লোকে ফলের মিষ্টতার বাসনা মনে করবার পূর্ব্বে চামুকের আস্বাদন স্মরণ করে শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌ত।

জ্যৈষ্ঠ মাস, সকালে জ্ঞানগতি ও ছেলেরা সকলে মাঠে গিয়াছিল। জ্ঞানগতির পৌত্রেরা ও পাড়ার জনকতক বালক জমিদারের বাগানের সুমুখে যেখানে একটা আধগাছ পাঁচিলের ওপর দিয়ে অনেকখানি রাস্তার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, সেখানে গাছতলার ছাওয়ায় রাস্তার ওপর খেলা করছিল। যখন ছেলেরা খেলায় মত্ত তখন সেই ছেলে পড়া গাছটা থেকে একটা পাকা আম হাওয়া লেগে টুপ্ করে রাস্তায় পড়ল। অন্য ছেলেরা গোলমাল করে ছুটে আসবার আগেই জ্ঞানগতির ছোট পাঁচ ছ' বছরের পৌত্রটি সেটা কুড়িয়ে মহানন্দে খেতে লাগল—ছেলেরা আবার খেলায় মন দিল। বাগানের একটা মালী ছেলেদের গোলমাল শুনে বাইরে এসে দেখল একটা ছেলে ঘাসের উপর বসে আম খাচ্ছে। মনিবের এত বড় একটা লোকসান দেখে প্রভুভক্ত ভৃত্য একটু গরম হয়ে ছেলেটাকে ধমক দিয়ে বলল "এই ছোঁড়া—আম পেড়েছিস্ কেন?" মালীর কথায় ছেলেদের দল থেকে একজন বলে উঠ্‌ল "বেশ করেছি উড়ে ম্যাড়া"—অত বড় বুদ্ধিমানকে একটা সামান্য বালক পশু শ্রেণীভুক্ত করায় মালী চটে লাল হয়ে—তাদের দুকথা শোনাতে গেল, কিন্তু চারিদিক থেকে ছেলেদের উপহাসের তীব্রতায় শীঘ্রই মনে ভঙ্গ দিয়ে বাগানের ভেতর পালিয়ে গেল।

মালী চলে যাওয়ার মিনিট দশেক পরেই জমিদার পুত্র বাগানের ফটকের কাছে বেত হাতে ক'রে দেখা দিল। তাকে দেখেই ছেলের দল যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল, ছোট ছেলেটা যে আম খাচ্ছিল সে পালাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। জীবনধন হাতের বেত গাছটা উঁচু করে

ছেলেদের পেছনে খানিক দৌড়ে যখন তাদের কাউকেও ধরতে না পেরে অভদ্র গালি দিতে দিতে ফিরে আসছিল তখন তার সুমুখে পড়ে গেল আম শুদ্ধ জ্ঞানগতির ছোট পৌত্রটি; ছেলেদের ওপর সঞ্চিত ক্রোধটা তখনও জমিদার পুত্রের বুকের ভেতর গর্জ্জন করছিল; হিংস্র জন্তুর মত আহার্য্যের দুর্ব্বলতা বিচার না করে সে সেই অসহায়া ছোট ছেলেটার পিঠে সপাং সপাং করে তার সেই কঠিন বেত গাছটার ঘা কতক বসিয়ে দিল। যন্ত্রনায় বালক রাস্তার উপর পড়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। কিছু দূরে দাঁড়িয়ে মালিটা তার অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ হয়েছে দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল।

ঠিক এমনি সময় জ্ঞানগতি মাঠ থেকে ভেতে পুড়ে ফিরে আসছিল। জমিদার পুত্রের নির্দ্দয় ব্যবহার দেখে সে বালককে রক্ষা করতে ছুটে আসছিল, দূর থেকে সে চিন্‌তে পারে নি যে, যে বালক বেতের আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছিল, সে তারই সব চেয়ে আদরের পৌত্র—পাঁচুলাল। কাছে এসে পাঁচুকে সেই অবস্থায় দেখে, যাও বা একটু ধৈর্য্য সে অনেক কষ্টে ধরেছিল—তাও মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে তার সর্ব্বশরীর থর থর করে কেঁপে উঠ্‌ল। জমিদার—জমিদার পুত্র—নিজের অস্তিত্ব সব ভুলে সে বজ্র গম্ভীর স্বরে বল্‌ল "তুমি এই ছেলেটাকে এমন নির্দ্দয় ভাবে মেরেছ—এ তোমার এমন কি অপরাধ করেছে?" জমিদার পুত্র একজন প্রজার মুখে কেকিয়ৎ তলব শুনে উচ্চ স্বরে বলে উঠ্‌ল "মেরেছি আমার খুসি—তোরও যদি মার খেতে ইচ্ছা না থাকে তবে এখনি মুখ বুজে চলে যা—নইলে এই বেত দেখছিস্?"

"কি এত বড় স্পর্দ্ধা—আমাকে বেত দেখাস্"—জ্ঞানগতি আর নিজেকে সাম্‌লাতে পারল না, যে ক্রোধের প্রবল শক্তির কাছে চিরদিন সে পরাজিত সেই ক্রোধবহ্নি তার মনের ভেতর দাবানলের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌ল; মুহূর্ত্তে সে আত্ম বিস্মৃত হয়ে—জীবনধনের গলা টিপে ধরে তার দু'গণ্ডে বজ্রহস্তের কয়েকটি চপেটাঘাত করে, পৌত্রকে বুকে তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে চলে গেল। জীবনধন হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে—ধীরে ধীরে বাগানের ভেতর প্রবেশ করল। মালী উর্দ্ধশ্বাসে জীবনধন বাড়ী পৌঁছিবার আগেই জমিদার বাড়ী গিয়া সংবাদ দিল যে জমিদার পুত্রকে জ্ঞানগতি ঘাড় ধরে রাস্তায় মুখ গুঁজে দিয়ে লাথি, কিল, চড় মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছেন; অনেক কষ্টে সেবা শুশ্রূষা করে তবে সে খোকা বাবুকে বাঁচিয়ে তুলেছে।

সংবাদ পৌঁছান মাত্র জমিদার বাড়ীতে একটা হুলুস্থুল পড়ে গেল। জীবন ধন বাড়ী ফিরে এসে মায়ের কাছে কেঁদে কেঁদে বলল "এ অপমানের প্রতিশোধ না নিলে সে আত্মহত্যা করিবে।"

পুত্রের চরিত্র রাজীবলোচন রায় বিশেষভাবেই অবগত ছিলেন, তাই দারোয়ান পাইকদের উপর তাঁর কড়া হুকুম ছিল—তাঁর বিনা হুকুমে কেউ কোনও প্রজার উপর কোন জুলুম না করে। জীবন ধনের অপমানের কথা যখন তাঁর কর্ণ গোচর হল তখন তিনি আহ্নিক করতে ঠাকুর ঘরে ঢুকেছিলেন। অকস্মাৎ এই সংবাদ তাঁকেও একটু চিন্তিত করে দিল; তিনি সকলকে তাঁর আহ্নিক সমাপ্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে জ্ঞানগতিকে ডাকতে লোক পাঠালেন। পাইক দারোয়ান সব উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। নির্ব্বিবাদী গ্রামবাসীরা গৃহদ্বার রুদ্ধ করে কম্পিত বক্ষে ফলাফলের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে আহ্নিক সম্পাদন করে রাজীবলোচন রায় যখন বাইরে এলেন, তখন লক্ষ্য করলেন যে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা সারা বাড়ী খানাকে একটা আসন্ন বিপদের অন্ধকারে ছেয়ে ফেলেছে।

পুত্রের অবস্থানস্থান জমিদার গৃহিণী ক্রোধোন্মত্তা—পুত্রের চক্ষু এখনও অশ্রুসিক্ত—চাকর দাসী দারোয়ান পাইক সব চঞ্চল। ব্যাপার যে অনেকদূর অগ্রসর তা তাঁর বুঝতে একটু বাকী রইল না। তিনি ধীর ভাবে সকলকে বল্‌লেন "আমি এখনই এর ন্যায় বিচার করে তবে জলগ্রহণ করব।"

(৫)

সদর বাড়ী গিয়া রাজীবলোচন রায় দেখলেন জ্ঞানগতি তাঁর আদেশের অপেক্ষায় – বসে আছে। তাকে দেখে জ্ঞানগতি উঠে দাঁড়িয়ে জোড় হাতে প্রণাম করল। রাজীবলোচন লক্ষ্য করলেন জ্ঞানগতির মুখমণ্ডল দৃঢ়তা পূর্ণ—গম্ভীর। ঘরের বাইরে ও ভিতরে অনেক লোক বিচার দেখতে উদ্‌গ্রীব আগ্রহে দাঁড়িয়েছিল। যারা জ্ঞানগতির সৌভাগ্যে হিংসা করত' তারা তার দুর্দ্দশা দেখতে না পেয়েপেয়ে সেই দুপুরবেলা জমিদার বাড়ী ছুটে এসেছিল, আর যারা তাকে জানত,—তারা উৎকণ্ঠায় ম্রিয়মাণ হয়েছিল। রাজীবলোচন কাছারী ঘরে প্রবেশ করে জ্ঞানগতিকে ভেতরে ডেকে ফরাসের উপর বসতে বল্‌লেন। জ্ঞানগতি আসন গ্রহণ করলে, রাজীবলোচন পুত্রের ও মালীর নালিশ শুন্‌লেন। জীবনধন অবশ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ঘটনা বর্ণণা করল এবং মালীও প্রভুর কথাই সমর্থন করল। তাদের কথা শেষ হলে রাজীবলোচন বল্‌লেন "জ্ঞানগতি, তোমার নিকট আমি এই ব্যাপারের আদ্যোপান্ত শুন্‌তে ইচ্ছা করি।" জমিদারের কথার উত্তরে জ্ঞানগতি অকপটে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে সর্ব্বশেষে বিনীত স্বরে বল্‌ল "হুজুর আপনি জমিদার —পিতার স্বরূপ আপনাকে মিথ্যা বলব না। যদিও জমিদার পুত্রকে মারা আমার ঠিক হয় নি, তথাপি ন্যায়ের হিসাবে আমি সে সময় না মেরে থাকতে পারি নি; অবশ্য ক্রোধই আমাকে এ গর্হিত কার্য্য করিয়ে ছিল—কিন্তু অতটুকু ছেলেকে বিনা অপরাধে নির্দ্দয় প্রহার করা স্বচক্ষে দেখে, আমার রক্ত মাংসের শরীর—জমিদারের ছেলে বলেও ক্ষমা করতে পারি নি। আমার বুদ্ধি, বিবেচনা হিসাবে আমি যা করেছি তবে নিজের হাতে শাস্তির ভারটা না নিলেও পারতাম কিন্তু ক্রোধই আমার সর্ব্বনাশ করেছে, কারণ এই চণ্ডাল ক্রোধটা আমার সারা জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা শত্রু—শাস্তি দিয়ে যদি আমার এই আক্রোশের দুর্ব্বলতাটাকে সংশোধন করতে পারেন তবে আমি যে কোনও শাস্তি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, আর সে শাস্তিতে আমার উপকারই করবেন"—বলতে বলতে প্রবল উচ্ছ্বাসে জ্ঞানগতির কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল—চক্ষু অশ্রুধারাক্রান্ত হয়ে উঠ্‌ল। জ্ঞানগতির নির্ভীকতা দেখে তার সরল সত্যবাদীতায় রাজীবলোচন রায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মানুষ নিজের দৌর্ব্বল্যের কথা এমন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতে পারে, এ তিনি এই প্রথম দেখলেন। পুত্রের দুর্ব্ব্যবহারের কথা স্মরণ করে তিনি ব্যথিত হলেন। পুত্রের মুখের পানে চেয়ে দেখলেন—মুখ বিবর্ণ। কতখানি সত্য পুত্রের অভিযোগের নীচে নিহিত আছে তা পূর্ব্বেই তিনি অনুমান করেছিলেন, শুধু সকলের মনস্তুষ্টির জন্যই তাঁকে বিচার করতে বসতে হয়েছিল। তিনি পুত্রকে সম্বোধন করে বল্‌লেন "তুমি কি বল্‌তে চাও—জ্ঞানগতি মিথ্যা কথা বল্‌ছে।"

সত্যের সাড়া পেয়ে বিবেক যখন মানুষের অনাচারি মনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে তখন বাত্যাবিধিছিন্ন শরতের মেঘে ঢাকা সূর্য্য কিরণের মত অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলি উজ্জ্বল হয়ে এক মুহূর্ত্তে তার প্রাণের সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত করে একটা যুগান্তের পরিবর্ত্তন এনে দেয়। জ্ঞানগতির স্পষ্টবাদিতায় স্তম্ভিত জীবনধন নিজের সঙ্গে জ্ঞানগতির তুলনা করতে গিয়ে, নিজেকে তার ম্লান—শক্তিহীন মনে হল। এত বড় একটা সত্যের প্রতিবাদ করতে তার জিহ্বা আড়ষ্ট লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল—সে কোন উত্তর করতে পারল না। পুত্রকে

নীরব দেখে রাজীবলোচন বল্‌লেন "জীবন ! আমি বুঝতে পেরেছি, এই মিথ্যা অভিযোগের অনুশোচনায় তোমার মনে ধিক্কার এসেছে—সত্য গোপন ক'র না—বল—তোমার কি বলবার আছে !" এত লোকের সম্মুখে সত্য কথা বলে নিজেকে হীন প্রমাণ করতে গর্বিত জমিদার পুত্রের মাথা নীচু হয়ে পড়ল ; সমস্ত শক্তি একত্রিত করে সে জ্ঞানগতির কথার প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করল—কিন্তু বিবেককে ঠেলে আজ সে তার স্বেচ্ছাচারী মনের যুক্তি তর্কের খেই খুঁজে পেল না—মন্ত্রমুগ্ধের মত সে বলল "জ্ঞানগতির—কথাই—সত্য"—পুত্রের সত্যবাদীতায় রাজীবলোচন এত আনন্দিত হয়ে উঠ্‌লেন যে পুত্রলাভের প্রথম সংবাদেও তিনি এত প্রফুল্ল হন নাই ; পুত্রকে বক্ষে টেনে নিয়ে তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠ্‌লেন "এমনই নির্ভীকতা—এমনই সত্যবাদীতা তোমার পিতৃ পিতামহের বংশ উজ্জ্বল করে রাখবে। রুদ্ধ অশ্রু গুরুজন ছাড়িয়ে আশীষ ধারায় পুত্রের মস্তকে ঝরে পড়ল। পিতার স্নেহ স্পর্শে পুত্রের চক্ষে জল দেখা দিল। এমনি সময় সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে জ্ঞানগতি বল্‌ল "হুজুর—আমার প্রতি হুকুম।" রাজীবলোচন আত্ম সম্বরণ করে বলে উঠ্‌লেন "হাঁ—তোমার কথা আমি ভুলিনি জ্ঞানগতি, তোমার কার্য্যের ভার বিচারই করব। যে ক্রোধ রিপুর উত্তেজনায় তুমি জমিদারের ছেলের গায়েও হাত তুলতে দ্বিধা করনি সেটার বিচার আবশ্যক ! অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই রকম নিরপেক্ষ ক্রোধ তোমার নিজের শত্রু হলেও—দশের মিত্র ; তোমার এই নিরপেক্ষতা আমার জমিদারি শাসনে সাহায্য করবে। তোমার মতন প্রজা জমিদারের গৌরব। তোমাকে লোকের চেনা দরকার—তাই সবাইকে চিনিয়ে দিতে চাই। জ্ঞানগতি আজ হতে তুমি জ্ঞানপতি মণ্ডল—এই বিশাল পুর গ্রামের 'মোড়ল'। রাজীবলোচন রায় পরে পুত্রের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন জীবন, তোমার অন্যায়ের জন্য জ্ঞানগতির কাছে ক্ষমা চাও—আর তার কাছে জীবনের একটা আদর্শ শিখে নাও," পিতার আদেশ পালনোত্তর জীবনকে বুকে জড়িয়ে ধরে জ্ঞানগতি বলে উঠ্‌ল "হুজুর—হুজুর—আমায় অপরাধী করবেন না—আমি চাকর"—তার কথায় বাধা দিয়ে রাজীবলোচন বল্‌লেন "না জ্ঞান—তুমি এই রায় বংশের আত্মীয় ! আর যে কলমের বাগান আজ গ্রামের প্রকৃত মানুষ চিনিয়ে দিল—আজ হতে সে বাগান—বংশানুক্রমে তোমার। এ জমিদারের দান প্রত্যাখান ক'রনা।" জমিদারের কৃপায় মুগ্ধ কৃতজ্ঞ জ্ঞানগতি বল্‌ল—"আপনি জমিদার পিতার স্বরূপ আপনার দান মাথা পেতে নিলাম। তবে হুজুর আজ যখন এই দীন প্রজাকে আত্মীয় বলে সম্বোধন করেছেন তখন সেই সাহসে আমার ভবিষ্যত জমিদার—খোকাবাবুকে বাগান খানি আমি নজর দিলাম। খোকাবাবু এই গরীব প্রজার সামান্য সেলামী গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব। জ্ঞানগতির কথায় বিস্মিত জমিদার পুত্র পিতার মুখের পানে দৃষ্টিপাত করতে রাজীবলোচন রায় বল্‌লেন "জ্ঞানগতি, আমি জমিদার হলেও তোমার এই মহত্বের কাছে আজ আমার মাথা নত হল—এ মহত্বের অনাদর করবার ক্ষমতা আমার নেই। খোকাবাবু তোমার এই স্নেহের দান সাদরে গ্রহণ করুন। তবে তোমার এই মহানুভবতার সঙ্গে ঐ বাগানের চির সম্বন্ধ স্থাপিত করতে আজ থেকে ঐ বাগান 'মণ্ডল বাগান' নামে পরিচিত হবে।"

সমাপ্ত

বনমল্লী।

(শ্রীকালিদাস রায় বি, এ, কবিশেখর)

কানাড়া কাওয়ালী

ওরে বনমল্লিকা বন দুলালী
বন বুলালি।

গোলাপ চুঁড়িতে গিয়া বৃথা ভ্রমিয়া
গেছি তোর রূপ পিয়া দেখা পাইয়া
হেরিবারে তোর হাসি আমি হয় বনবাসী
ছল-ছল আঁখে মোর বন ভুলালি॥

বন চুলালি।

ভাগের পূজা

লেখিকা শ্রীমতী চারু বালা বসু

[৪]

পূর্ব্ব পুরস্কারীগণের—(১) শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া (২) শ্রীযুত বিজয়রত্ন মজুমদার (৩) শ্রীমতী সরযূ বালা বসু (৪) শ্রীযুত বিষ্ণপতি চৌধুরী।

প্রসাদের মার কথা

সরলা বৌকে পাবার পর কয়েকটা দিন বেশ নিশ্চিন্ত আরামে কাটিয়া গেল। এখানে আসার পর হইতে যে বিষাক্ত ঘুণোটায় ঘুণিপাকে, নিজের সমস্ত প্রাণটাই হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল, ছেলে দুটো-কেও অস্থির করিয়াছিল হঠাৎ কোথা থেকে যেন একটা দমকা বাতাস আসিয়া কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যাওয়ার মত মনের সমস্ত আবর্জ্জনাটাকেই, মুহূর্ত্তে উড়াইয়া দিয়া সেই অন্তরের শূন্য স্থানটা পূর্ণ করিয়া দিল, সে একটা মস্ত নীরব শান্তি। সমস্ত গ্রামটার মধ্যেও যেন এই ভাবটা বহিয়া চলিয়াছিল। সারা গ্রামটার মুখেও যেন আমারই মনের অনুরূপ একটা স্তব্ধ শান্তি বিরাজ করিতেছিল; এত দিনের উদ্বিগ্নতা কাটিয়া গিয়া একটা প্রসন্ন হাওয়ার সুধাতান যেন চারদিক দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। ভাবটা এই যে যেন মস্ত বড় শনি গ্রহটাই কেটে গেছে তাদের, তাও আমারই কৃপায়, তাদের কৃতজ্ঞ দৃষ্টির মধ্যে এও যেন স্পষ্টই আমি দেখতে পাই। যখন এই ভেবে নিজের মনে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলাম, তখন কেবল মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়ে সমস্ত বলটা আমার ব্যথিত করে তুলছিল প্রসাদ, ক্ষণিক তার যুক্তি তর্কের মাঝে নিজের যুক্তি তর্কের সূত্র হারিয়ে ফেলে মাঝে মাঝে বিব্রান্ত হয়ে পড়-ছিলাম।

কদিন ঘোর অশান্তিতে কাটাবার পর এই বিপুল শান্তির মাঝে লাভে হতে তার ক্ষতিপূরণ শুদ্ধ পেয়ে গেলাম পুত্র হয় কমলকে। কেন কে জানে প্রথম দর্শনেই, এই নবম—কান্তিময় সুন্দর ছেলেটিকে দেখেই, আমার সমস্ত অন্তরটা বৃভুক্ষের মতই, আকুল আগ্রহে তার দিকে টেনে নিয়েছিলো। তার করুণ দৃষ্টিটার মধ্যে কি দেখেছিলাম জানি না—সেইদিন থেকেই, সমস্ত অন্তরটা-আমার মাতৃত্ব রসে স্নিগ্ধ হইয়া কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে, দুলে দুলে উঠ্‌ছিল, আরও যতই তাকে নিকটে পাচ্ছি, ততই মাতৃত্বের বিপুল গৌরবে সমস্ত প্রাণটা আমার ভরে ভরে উঠছিল।

আজ ও তার কথাই ভাবছি, দুপুরের খাওয়া খাওয়ার হাঙ্গামা চুকিয়ে নিজের ঘরে চরকাটাকে নিয়ে বসেছি, বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশটা আজ পরিষ্কার হইয়া নির্মেঘ আকাশে সূর্য্যদেব এখন মধ্য গগনে চড়িয়া বসিয়াছেন। তাঁহার খর রশ্মি, মেঘের উপরেই জানালা দিয়া খানিকটা আসিয়া পড়িয়াছিল, খানিক পরে তীব্র রোদটায় চোখ দুটো টনটন করিতে লাগিল বলিয়া—অপ্রসন্ন চিত্তে উঠিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া বসিলাম, ঘুরে বসিয়া টেবিলটার উপর ঝুঁকিয়া নির্মল বি এ, র পড়াটাই মুখস্থ করিতে ছিল, মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসিল—বাঃ রে—অন্ধকার করে দিলে কেন?

আমি আজ উত্তপ্ত রোদটার জন্য প্রকৃতির উপর একটু দোষারোপ করিয়া জানালা বন্ধের ইতিহাসটুকু বিবৃত করিতেই, নির্মল হাসিয়া বলিল—এই তো হচ্ছে মানুষের দোষ, নিজের কর্ম্মভোগ টুকু আর এক জনের ঘাড়ে না চাপিয়ে মানুষ কিছুতেই স্বস্তি বোধ করে না। অর্থাৎ ঈশ্বরের কোন দানটাই, মানুষ মনে প্রাণে সন্তুষ্ট চিত্তে কিছুতেই গ্রহণ করতে চায় না তার কারণ আর কিছুই নয় মানুষ নিজেই নিজে অসুখী, নিজের মনে নিজেই একটা অতৃপ্তি টেনে এনে অসুস্থতা ভোগ করে।

আমি জিজ্ঞাসিলাম "তার মানে?" নির্মল বলিল মানে আর কি? মানুষের অন্তরস্থতার কথা বলছি, সে তোমার বলে বলছি নে, দিদি, শুধু তুমি আমি বলে নয়, সকলকার কথা বলেই বলছি, এই ধরো যেমন এই ভীষণ বর্ষার দিন, কটা কেউই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারিনি—কেন? তার অপরাধ কিসে, অবিরত তার ধারায় বৃষ্টি হয়ে মানুষকে চলতে ফিরতে কষ্ট দিচ্ছে, তোমার সাংসারিক বিষয়েও কত কি! আবার যেই একটু রোদ ফুটে উঠেছে, অমনি তার ভীষণ তাপ মানুষের অসহ্য হয়ে উঠছে, তোমার চোখ টন টন করছে, এমনি আরও কত মনের কত কি হচ্ছে! তাই—সেই কথাই বলছিলাম।

নির্মলের যুক্তির খেইটা কোথা দিয়ে কোথা গিয়ে ঠেকে ছিল, সে অঙ্কের কাছে কষ ও সমস্যার মত ঠেকিলেও আমি বুঝিলাম, ঐ টুকু কথার সূত্র ধরিয়া এতখানি দীর্ঘ বক্তৃতা দিবার ছেলে সে নয়; মানুষের অকৃতজ্ঞতাতে মাথা ঘামাবার প্রয়োজনও তার থাকে না। সে যাকে উদ্দেশ করে কথাটা বলেছিল বুঝিলাম, সে প্রসাদ। নির্মলের ছেলেবেলা থেকেই ঐ স্বভাবটা নিজের মনে অন্যের উপর হলেও রাগ অভিমান টুকু কারণে অকারণে যে সময়েই হোক, বর্ষণ করে ফেলিত, আমার উপর সেটা আবার এমনি ভাবেই করিত যে সে সময় সে আসল সূত্রের খেইটা হারিয়েই ফেলে এমন দিক দিয়ে যেত যে সেটা কাহারো বোধ গম্যই হইত না।

অবশ্য তার রাগটা যখন স্বাভাবিক বরাবর আমার উপর দিয়াই যেত। প্রসাদ কদিনই, আপন মনে নিজের ঘরটার মধ্যে একলা থাকে, কি একটা নাকি ছবি আঁকিতেছে, কি ছবি সেই জানে। চির দিনই, ওর একটা ঐ স্বভাব যখন যে-টা খেয়াল ধরে তখন সেটা পূরণ করতে বড় দেরী করে না—আবার এমনিই খেয়ালের ঝোঁক সেটা, শেষ করতে

ও কোন দিন দেখিনে। তাই, তার কোন কাজের কৈফিয়ৎ ও কোন দিন যেমন চাইনি, কৌতূহল দৃষ্টি নিয়েও সে কি করছে না করছে দেখিনে।

আজও সে নিজের ঘরেই বসিয়া ছিল ক'দিনই, আমি লক্ষ্য করে আসছি আমাদের সান্নিধ্য থেকে প্রসাদ ঘুরে সরে থাকতে চায়। তারও হেতু কমল যতই আমাদের নিকট সরিয়া আসিতেছে প্রসাদ ততই নির্জ্জন নিরালায় নিজেকে লুকাইতে চায়। কেন কে জানে প্রথম দিন থেকেই প্রসাদ নিজের সন্দেহ পূর্ণ দৃষ্টিটা নিজের প্রচেষ্টাতেও সরাইতে পারে নাই! এমন কি তাহার সেই দৃষ্টিটা কমলেরও কাছে ও ধরা পড়েছিলো! এ আমি চকেই দেখে এসেছি; দেখে খুবই লজ্জিত হয়ে উঠে ছিলাম; অপ্রস্তুত মুখে কমলের দিকে চাহিতেই, কমল তার সরলতা মাখা মুখটি লুকিয়ে ফেলে ছিলো। সে কোন দিনই ঘুণাক্ষরেও তার মনের ভাবটা আমাদের জানতে দেয়নি। কিন্তু সেইদিন থেকে অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে উঠল—প্রসাদ।

এতটা বাড়া-বাড়ি আমার আমার কোন দিনই বরদাস্ত হয় না। দুদিন হলো কমল আর আসেনি কেন কে জানে বাড়ীতে ও তার কতবার খোঁজ নিয়েছে নির্ম্মল, দেখা পায় নাই। কোথাও গেছে, কিনা তাহাও কেহই বলতে পারে না, হঠাৎ তার এমন অদৃশ্য হবার কারণ কি? এই সব কথাই এতক্ষণ বসে ভাবছিলাম, নির্ম্মল দুদিন তার খোঁজ না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠে ছিলো এবং সেই দিকটা ভেবেই বোধ হয় তার মন প্রসাদের উপর এত বিরক্ত হয়ে গেছিল।

নির্ম্মলের কথায় বাঁকে কয়েক মুহূর্ত্ত আমার ও অন্তরটা সেই দিকে ঝুঁকে পড়ল, হয় ত হবে ও বা। মানুষের অন্তরের কথা সব সময় কে বুঝতে পারে। প্রসাদের বিরক্তিতেই যে সে ক্ষুব্ধ হয়ে সরে পড়েছে—তার বা আশ্চর্য্য কি।

কথাটা ভাবিতেই, অমনি সমস্ত অন্তরটা আমার মাতৃত্বে আঘাত করিয়া, টন্ টন করিয়া একটা ব্যথা এই বুকের মাঝেই বাজিয়া উঠিল। জানি না কোন্ অনির্দ্দিষ্ট দেশ থেকে কোন অসীম শক্তি নিয়ে ঐ মাতৃহীন ছেলেটী কখন মুর্ত্তিতে অন্তরটা আমার ভরাট করে দিয়ে ছিলো। যেন নিশ্চিন্ত নির্ভরেই তাকে এই বুকের মধ্যেই আঁকড়ে নিয়ে সুপ্ত হয়ে পড়েছিলাম। কোন দিন যে হারাতে পারি, এ ধারণাটা মনের অগোচরেই বাস করছিল অর্থাৎ সুপ্ত মনটা একটা খোঁচায় জাগিয়ে দিয়ে—বিরাট হাহাকারে ডুবিয়ে দিলে। আজ বুকের পর সেই যে একান্ত নির্ভরশীল শিশুটিকে আঁকড়ে ধরে ছিলাম কে যেন সবলে কেড়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তাকে কোন দিন পাবার উদ্দেশ টুকুও বুঝি কোন অজ্ঞাত অজানার পথেই দিয়ে গিয়েছে।

আমি ব্যথিত দৃষ্টিটা নির্ম্মলের মুখের পর তুলতেই নির্ম্মল করুণ উদাস স্বরে বললে—"কমলটা বড় ভাবিয়ে তুলে দিদি!"

আমার দৃষ্টিটা তারই দৃষ্টি অনুসরণ করে মৌন ভাষায় তার কথারই সমর্থন করিলাম। তখন বুঝি কথা বলিবার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলাম। কেন কে জানে ঐ মায়াবী ছেলেটা যেন এক দণ্ড আমাদের ছেড়ে থাকতে চাইত না, আমার ও সমস্ত অন্তরটা দিয়ে কাণ দুটো খাড়া হয়ে থাকে তার মা ডাকের আশায়, প্রতীক্ষায়। হায় রে দুর্ব্বল! এই যে নারী চিত্তের মাতৃত্ব; এখানে রাগ, অভিমানের কোন খেলা কিছুই যে খাটে না, এখানে সকল দোষ সকল গর্ব্ব অহঙ্কার চূর্ণ করে ভাসিয়ে দিয়ে জেগে থাকে শুধু মায়ের মাতৃত্বটা! একবার বুঝি, মা বলে ডাকলে তার হৃদয়ের সমস্ত সন্তাপ, সমস্ত দুঃখটা, মিলিয়ে কখন যে কোথায় লুকাইয়া পড়ে তার তল্লাস, বুঝি সে নিজেই আর খুঁজে পায় না।

তাই মাঝে মাঝে যখন প্রসাদের ঐ সন্দেহ পূর্ণ

ইচ্ছে মনের মধ্যে এক একবার উঁকি মারিত, তার যা হয় ত হবেও বা! মানুষের প্রবৃত্তি কখন কো .দিকে থাকে, প্রসাদের কূট যুক্তির তর্কের মাঝে তাহার নজির গুলোতে হারি মানিয়া নির্ম্মল যখন একদম তার কথার উত্তর না দিয়ে চুপ চাপ হয়ে যেত তখন বিরক্ত চিত্তে আমি ও মনটা অন্যদিকে ফিরাইয়া লইতাম, শুনে শুনে মনের মধ্যে ঐ ভাবের সন্দেহ থাকিলেও কোন দিনই আমি, কমলকে অপমান করতাম না; আসলে যখন তাকে আমার ভালোই লেগেছিল, তখন যে দুর্ব্বল নারী চিত্তের মাতৃত্ব টাই, ফুটে উঠত, প্রসাদ ছেলে মানুষ তার কি বুঝবে!

কতক্ষণ কেটে ছিল জানিনা হঠাৎ জুতার শব্দে চোখ মেলতেই, দেখি সম্মুখে কমল! রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়া সমস্ত মুখ খানা তার আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, ঘামে সমস্ত দেহটাই সিক্ত।

হঠাৎ এমন ভাবে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া একটা সম্ভাষণেও সম্ভাষিত করিতে পারিলাম না! বিস্মিত দৃষ্টিটা তুলিয়া চাহিয়াছি, সে স্বেদসিক্ত মুখখানা রুমালে মুছিতে মুছিতে বলিল—এখানে ছিলুম না মা, এই আসিছি-এলেই একবারে এখানে, আপনাকে প্রণাম করতে এলুম, বলিয়া পায়ের কাছে মাথা নত করিল।

একান্ত মনে তাহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া বলিলাম—ক দিন না দেখে বড়ই ভাবিলাম যে ছেলে আমার মা বলা না কওয়া হঠাৎ গেল কোথা?

কমল তার শুষ্ক মুখে খানিকটা হাসি টানিয়া আমার পায়ের গোড়ায় টিপ করিয়া আর একটা প্রণাম করিয়া সিক্ত কণ্ঠে কহিল, ছিলুম না মা!

নির্ম্মল বলিল—কোথা গেছলে হে? বিদেশ নাকি?

কমল তখন আমার খোতামগুলা খুলিয়া দিয়া রুমাল শুদ্ধ হাতখানা ঘুরাইয়া দেহের নানা স্থানে মুছিতেছিল বলিল—না বিদেশে নয়, এই কলকাতা।

বলিলাম—জামাটা খুলে ফেলনা বাবা। গামছা দিয়ে গা-টা বেশ করে মুছিয়ে দিই।

না মা আর দরকার নেই।—বলিয়া সে একটু খানি হাসিয়া রুমালটা পকেট পুরিতে পুরিতে বলিল—কলকাতা জায়গাটা বেশ……

নির্ম্মল কৃত্রিম আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল—সত্যি?

কমল হাসিয়া বলিল—নিশ্চয় সত্যি। কেবল একটু বেশী ভিড় এই যা। তা হোক্, তবু এইত কদিন কাটিয়ে এলাম, বেশ সুখে কেটে গেল।.. সে এক মুহূর্ত্ত থামিয়া আবার বলিল—এখানে প্রাণটা হাঁফিয়ে উঠেছিল, আর দু'দিন থাকলে ক্ষেপে যেতাম—বলিয়া হাসিতে লাগিল।

নির্ম্মল গম্ভীরভাবে বলিল—তা হলে তোমার মতে এই দাঁড়ায় যে, যারা এখানে বাস করে আছে এবং ক্ষেপে নি তারা ঢের তোমার চেয়ে বেশী মানুষ। কি বল?

কমল এক গাল হাসিয়া বলিল—তা আর বলতে। আমি ত ক'দিন শুধু এই কথাই ভেবেছি যে মা'র আমার কি অসাধারণ ধৈর্য্য! এত সয়েও মা ঠিক আছেন! সত্যি বলছি মা, এ ভারি আশ্চর্য্যের কথা……

কি আশ্চর্য্য কমল?

এই আপনার কথাই বলছি মা।

এই সব বিশ্রী কাণ্ডের মাঝখানে কি করে যে আপনি আছেন তা ত আমি ভেবেই পাইনে। কিন্তু মা, এও আমি বলে দিচ্ছি, বাস এখানে করা চলতে পারে না; বেশী দিন থাকা আপনার উচিত নয়! এক ত নিজের ধর্ম্ম কর্ম্ম পূজো আর্চ্চা এ সব কিছুই নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'বার আশা নেই, তার উপর আবার এই সব কদর্য্য আলোচনায় থেকে থেকে মন প্রাণ দুইই কলুষিত করা! না মা আপনি এখান থেকে চলে যান।

যে সংস্কারটা কদিন হইতেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশের

ফাঁক দিয়া বিদ্যুৎ প্রকাশের মত আমার মনের মাঝে উঁকি মারিতেছিল, কমলের কথা শেষ না হইতেই আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা একেবারে পাখীরই সমর্থন করিয়া বসিল; কিন্তু নির্ম্মল উত্তরটা শুনিবার আশায় উদগ্রীব হইয়া মুখের পানে চাহিয়া আছে জানিয়াই আমার মনে পড়িয়া গেল এ প্রস্তাবটাই তার কাছে বাধার, বেদনার! নির্ম্মল এই পল্লীটির প্রতি স্নায়ুতন্তুর সঙ্গে এমনই নিবিড় করিয়া আপনাকে মিলাইয়া দিবার একটা প্রচণ্ড চেষ্টা করিতেছিল যে এ স্থান ত্যাগ করিবার কথা উঠি-লেই তাহার মনটি ভার ভার এবং মুখটি অপ্রসন্ন হইয়া যাইত বলিয়াই আমি কমলের কথার উত্তরটা শুনিতে পারিলাম না। কয় মুহূর্ত্ত পরে বলি-লাম—যেতে ত চাই বাবা, কিন্তু এই অভাগাদের ছেড়ে যেতে সত্যিই কষ্ট হয় কমল! এদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কতদিনের জান ত?

কমল উত্তর দিল না দেখিয়া, আমিই বলিলাম এদের মধ্যে অনেকেই আমার সেই ছোটবেলাকার সঙ্গী, কমল!

তা বটে মা! কিন্তু কি করে এত অনাচার, অত্যাচার, কুৎসা, গ্লানি সয়ে থাকতে পারবেন, তাও ত বুঝি নে মা!

ঠিক যে কথাটা আমার মনের মধ্যে উদিত হইয়াছিল, শুনিলাম, নির্ম্মল সেই কথাই বলিল। বলিল—ওহে কমল। তোমাকে যখন পেয়েছি, আর কিছুই চাবি নে। এই তোমাকে আমি ভবিষ্যবাণী করে দিচ্ছি শোন—অতঃপর এখানে আর কোন কাল সেই দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার ঘটবে না। বুড়োটি আমার এখন হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন যে জমিদারের চোখ খুলে গেছে, আর তার নাম নিয়ে, তাকে ভুলিয়ে তাঁর অসাধ্য সাধন করা চলছে না। ছোট খুড়োই যখন বিদ্বান নাগরাজ হ'য়ে পড়লেন, তখন আর কিসের ভাবনা?

এবারে কমলের মুখ আরো শুষ্ক হইয়া গেল; নত মুখে সে ধীরে ধীরে বলিল—কিন্তু আমি ত আর এখানে থাকতে পারছি না।

সস্নেহে জিজ্ঞাসিলাম, সে কি কমল?

কমল বলিল—না মা, আমারও আর এখানে থাকা হবে না। কলকাতায় থাকব স্থির করেছি।

একেবারে স্থির হয়ে গেছে?

তা স্থির বৈ কি! বাড়ীর ভাড়াটে উচ্ছেদ করে' সাজাবার গোজাবার যখন ব্যবস্থা করে—তবে এসেছি তখন স্থির না বলি কেমন করে?

কমল চুপ করিল। নির্ম্মল অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিল। সে ও কথা কহিল না, আমিই বলি-লাম—তাইত বাবা তোমার ভরসাতেই এই যমপুরিতে থাকা। তুমিই যদি না রইলে আমরা আর কার ভরসাইতেই বা থাকি? কিন্তু .....

কার ভরসাতেই বা এসেছিল মা?

ফিরিয়া দেখি প্রসাদ।

প্রসাদ দ্বারে বাহিরে বসিয়া ছুরীর সাহায্যে একটা শুষ্ক কঞ্চি ছুলিতেছিল। কথা কয়টি বলিয়া সে আপন মনে কাজ করিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসিলাম—কি বলছিস্ প্রসাদ?

প্রসাদের চক্ষু লজ্জা বলিয়া কোন একটা জিনিষ ছিল না। অথচ সেটার দরকার যে মাঝে মাঝে সংসারে বাস করিতে গেলে প্রায়ই হইয়া থাকে, এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কেন যে সেদিকে নজর দিতনা, জানি না। চট্ করিয়া বলিয়া বসিল—যখন এখানে এসেছিলে তখন ত কেবল আপনাদেরই ভরসা করে এসেছিলে। তখন ত এখান কার কাউকে চিনেও না।

এই 'কাউকে' যে কে বুঝিতে আমার বাকী ছিল না। দৃষ্টিটাকে যতদূর সম্ভব বিরক্তিপূর্ণ ও রুক্ষ করিয়া চাহিতেই দেখি কমলের অমন রক্তাভ সুন্দর মুখখানি একেবারে শ্বেত বিবর্ণ হইয়া গেছে। কিঞ্চিৎক্ষণ স্তব্ধে সে নীরবে বসিয়া।

প্রণামের দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু ভৎর্সনার স্বরে কহিলাম—তোদের কি বল্! অর্দ্ধেক দিন তো তোরা থাকিস্-ই না। এই সব অত্যাচার অনাচার হবে—আমাকে শুনতে হ'বে, দেখতে হ'বে—আমার পরকালের কাজ কর্ম্ম চুলোয় যাক্—আমি ঐ করি!

প্রণাম আর একটি কথাও বলিল না। তবে সে যে আমার মৃদু ভৎর্সনাতেই উদ্যত রসনা সংযত করিয়া ফেলিয়াছে বুঝিয়া মনের মধ্যে আরাম অনুভূত হইতে লাগিল। বলিলাম, তুমি ঠিক বলেছ বাবা কমল! জমিদার শূন্য গ্রামে বাস করার চেয়ে অধর্ম্ম আর নেই। কিন্তু এ-বে ভাবতেও আমার বুক ফেটে যাচ্ছে বাবা যে এই সামান্য ক'দিনের শান্তির পরই আবার গ্রামটা অরাজক হ'য়ে উঠ্‌বে। আবার অসহায়ের আর্ত্তনাদ, বিধবার ক্রন্দন, আবার সেই সব……

কমল কথাগুলায় বোধ করি বড়ই ব্যথা পাইল, বলিয়া উঠিল—আমি কি করতে পারি বলুন বা!

পুত্র না হইয়াও যে গর্ভজাত সন্তানের মতই মায়ের কাছে কর্ত্তব্য জানিতে চাহিল, তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার মত ভাষা আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। মনে মনে কেবল জগৎ পিতার নিকট তাহার দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিয়া কহিলাম, বাবা, তোমার কর্ত্তব্য—তুমি করবে। এরা ত তোমার সন্তান, এদের মঙ্গল অমঙ্গল ত তোমাকেই দেখতে হ'বে, এরা যাতে সুখী হয়, এদের যাতে দুঃখ কষ্ট ঘোচে—সবই তোমায় করতে হ'বে। তুমি যদি সহরে গিয়ে এদের প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য তা ভুলে যাও, সেত মহা অন্যায় হ'বে বাবা। তাই আমি বলি কি, তোমার উচিত, এমন একজন লোক রেখে যাওয়া যে ঠিক তোমার মতন করেই তোমার প্রজাদের পিতার মত হ'য়ে জমিদারী চালায়—এমন একজন লোক থাকলে…

তেমন লোক যে পাওয়া যায় না। আমি অনেক চেষ্টা দেখেছি।…আজ্ঞা, আমি তা হ'লে এখন উঠি—আপনারা একটু তে যেন। তবে আমার মনে হয় এ গ্রামে বাস করা আর কোন ভদ্র লোকেরই উচিত নয়। দিন দিন যা হ'য়ে উঠছে ছিঃ ছিঃ—সঙ্কুচিত মুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কমল ছড়িটা বার দুই মাটিতে ঠুকিয়া পুনশ্চ কহিল—ক'টা দিন ছিলাম না, তারই মধ্যে কত কাণ্ড হ'য়ে গেল!

আবার কি?—নির্ম্মল জিজ্ঞাসিল। আমরা তিন জনেই কমলের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

কমল কুণ্ঠিতস্বরে কহিল—ঐ রমণ নাপতের একটা বৌ-ছিল, জানেন কি? ক'দিন থেকে তা'কে আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

নির্ম্মল চীৎকার করিয়া বলিল—কমল ছোট খুড়ো…

এখন কিছুই বলতে পারিনে। ষ্টেশনে নেমেই শুনলাম শুধু! শুধু তাই নয়, হরি রক্ষিতের আই বুড়ো মেয়েটা…

আমি আর পারিলাম না। মানুষের সহ্য করিবার ক্ষমতার একটা সীমা থাকে, অনেক দিন হইতেই নানাবিধ অত্যাচারের কাহিনীগুলি আমার সীমার রেখা স্পর্শ করিয়াই ছিল, আজ এই মুহূর্ত্তে এই কথায় একেবারে ধৈর্য্য হারা হইয়া পড়িয়া বলিলাম কমল! তবু তুমি এখান থেকে চলে যেতে চাও?

কণ্ঠস্বরটা যে অত্যন্ত রুক্ষ কর্কশ হইয়া গিয়াছিল পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারি নাই। কমলকে নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সেটা বেশ বুঝিতে পারিলাম। বুঝিতে পারিয়াই মাতৃ হৃদয় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল কিন্তু তার চেয়েও এই অভাগা দেশের দুঃস্থ দুর্ভাগ্য পীড়িতদের ব্যথা বুকের মধ্যে উষ্ণ রক্তের মত টস্‌বস্ করিয়া ফুটিতেছিল, কমলকে সেই জানাইবার কোন সুযোগ মিলিল না। তবে স্বর অপেক্ষাকৃত মৃদু করিয়া বলিলাম—তোমার উচিৎ নয় বাবা…

কমল ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল—আমি জানি না। কিন্তু আর আমি পারছি নে। বলিয়া সে ওদিকে মুখ ফিরাইল।

তাহার দুঃসহ ক্লিষ্ট হতাশার স্বরটি এত বেশী করিয়াই আমার বুকে বাজিয়াছিল যে আমি আর অনেকক্ষণ একটি কথাও উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। আমার মনে হইতেছিল এই যে থাকিতে পারিবে না এবং এই যে অত্যাচার অনাচার বাড়িয়া যাইবে ইহা কল্পনা করিয়া এই ছেলেটি সুখী নয়, তাই সে আমাদের হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল।

নির্ম্মল বলিল—সত্যি তা হ'লে যাচ্ছ কমল?

কমল এ দিকে না চাহিয়াই বলিল হাঁ যাচ্ছি।

নির্ম্মল আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—দিদি···

তাহার কথা শেষ না হইতেই আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তাইত ভাই, আর ত কোন ভরসাই দেখিনে।

প্রসাদ বাহিরেই ছিল, বলিয়া উঠিল মামা, তোমাদের যেতে ইচ্ছে হয় যেতে পার, আমি যাচ্ছিনে সে নিশ্চয় জেনো। বলিয়া সে থামিল। একবার তীব্র দৃষ্টিতে সকলের পানে চাহিয়া লইয়া আবার বলিল—এই ভেবে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই মামা, যে ঠিক যে সময়টিতে মানুষের একটা কাজ করবার সুযোগ এসে পড়ে, ঠিক সেই সময়ই সে পিছিয়ে যায়। অথচ কাজ কাজ কাজ করব করব করে বুক চাপড়ানী, সে সাজ সজাই বা কত!··· ধিক্।

প্রসাদ বাহির হইয়া যাইতেই কমল নির্ম্মলকে বলিল—আমি হয়ত কালই চলে যাব। যদি পার একবার দেখা করো। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নির্ম্মলও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বলিল—করব।

আমার পায়ের কাছে মাথাটা একবার ঠুকিয়া ঠুকিয়া কমল কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। নির্ম্মল বোধ হয় তাহাকে খানিক দূর আগাইয়া দিতেই তাহার সঙ্গেই বাহির হইয়া গেল। একাকিনী বসিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম কোন ধরি? কোন চিন্তা করিবার আগে আগে হৃদয় আমার তীব্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া দিল, প্রসাদ যাহা বলিয়াছে তাহাই একমাত্র পথ। সেইখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব অপেক্ষা করিয়া আছে এবং সে ছাড়া যে নাই।—অপথ আছে।

প্রসাদের কথা

আমি যাব না, যাব না, যাব না। এদের ছেড়ে, এদের ফেলে কোথাও যাব না, যেতে পারব না। মা যান, মামা যান, আমি থেকেই যাব। আমার যাওয়া হ'বে না। আমার কেমন মনে হয় হঠাৎ আমাদের গ্রাম ছাড়া কর্ব্বার এই যে বিরাট চেষ্টা কমলের মনে জেগে উঠেছে, তার নিশ্চয়ই এমন কোন গূঢ় কারণ আছে যা সাধারণ লোকে কেউ-ই ভেবে পাচ্ছে না। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি সে যে দেশ ছেড়ে কলকাতায় এমন সব মজাদার আমোদ প্রমোদ ছেড়ে সহরে গিয়ে উঠবে এ হতেই পারেনা। এটি একটি চাল আর হয়ত সেই সব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই এই রকম একটা চালের প্রয়োজন তার হ'য়েছে। কি যে চাল এবং কি উদ্দেশ্যেই যে সেটার অভিনয় করা হচ্ছে তা আমি জানি নে—কিন্তু একদিন তা প্রকাশ হ'য়ে পড়বে বলেই আমার ধ্রুব ধারণা।

আজ সকালে মা'কে বলে দিয়েছে, যেতে হয় তাঁরা যান, আমি যাব না, যেতে পারব না। কেন পারব না তা বলিনি, বলতে পারিনি—কারণটা তখন পর্য্যন্ত নিজেই জানি নি। মানুষের মনের মধ্যেও এমন কতকগুলো গোপন বৃত্তান্ত থাকে যে মানুষ অনেক সময়ে নিজেই তা জান্তে পারে না। আমিও জানতাম না। তাঁর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি দেখেই যে আমার মনটা এ-রকম হ'য়ে গিয়েছিল

তা নয়! কিন্তু সে যে সেই বার দুই বিহ্বল দৃষ্টিটা ফেলে যে তার বিপদের সময় তারই হিতচেষ্টার অনেকখানি করেছে তাকে লক্ষ্য করেছিল বলেই আমার মনটা এমন হ'য়ে উঠেছিল তাও নয়। তবে হ'য়েছিল। কি হ'য়েছিল জানিনে, কেন হয়েছিল বলতে পারি নে, তবে প্রাণের মধ্যে কষ্ট অনুভব করেছিলাম। আর এ ক'দিন ধরে যখনই মনে পড়েছে যে তার আত্মীয়জন তাকে ত্যাগ করেছে, কদিনই সে সেই গোয়াল ঘরখানার এক কোণে না খাওয়া না দাওয়া পড়ে পড়ে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে তখনই আমার চক্ষের উপর ভেসে উঠেছে সেই করুণ চোখ দু'টি, সেই অসহায়, আর্ত্তের ব্যথা-ক্ষুব্ধ মুখখানি! আর জলে দু'টি চক্ষু ভরে গেছে।

আজ যদি আমার আঁকা এই ছবিটা গয়না বৌ দেখতে পায় সে চমকে যাবে তখন আমি তাকে এমন ক'রে ধাঁড় করিয়ে এই প্রতিকৃতি তার তুলে নিয়েছি! সে হয় ত বুঝবে না যে আমার বুকের মাঝখানে বেদনার রঙে, ব্যথার তুলিতে যে ছবিটা আমার মন তুলে নিতে পেরেছিল সেই এক মুহূর্ত্তে—এটা তারই নকল মাত্র। *

(ক্রমশঃ)

যুবক সম্মিলনীতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা

এখন খদ্দর-প্রচার-কার্য্যে আমি বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আমি এখন যাহা বুঝিতে পারি, তাহা হয় তো অনেকেই পারেন না। আমাদের দেশের বাস্তবিকই বড় দুর্দ্দিন আসিয়াছে। (আমি অবশ্য এ সভায় রাজনীতি সম্পর্কে কোন কথাই বলিব না) আর আমাদের দেশের যুবকবৃন্দ শুধু গোলদীঘির সভায় গিয়া হাততালি দিয়া দেশের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করেন। দেশের সেবা এত সোজা কাজ নয়। আমি আজ বৃদ্ধ হইয়াও এই রবিবার সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত লেবরেটারীর মধ্যে কাজ করিয়া আসিলাম। আমাদের দেশে এই এত বড় একটা বিজ্ঞান কলেজ রহিয়াছে—দেশের দুইজন মহৎ ব্যক্তি (রাসবিহারী ঘোষ ও তারকনাথ পালিত) এই কলেজের জন্য তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া গিয়াছেন—আজ বিজ্ঞান কলেজের জন্য মোট আঠ লক্ষ (৮০ হাজার) টাকা রহিয়াছে কিন্তু এখানে কাজ করিবার জন্য তেমন লোক পাওয়া যায় না। সকলেই এম, এস্, সি পরীক্ষা পাশ করার পর চাকুরী সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত। কোন রকমে একটা চাকুরী জোগাড় করিয়া লইতে পারিলেই তারা নিজেদের জীবন সার্থক মনে করে। দেশের লোক কোন রকম কাজে অগ্রসর হয় না নহিলে কি আজ আমাকে রসায়নাগার ছাড়িয়া দেশের জন্য কাজে নামিতে হইত। সারা জীবন রসায়ণ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আজ বৃদ্ধ বয়সে কোথায় ছাত্র সমাজের নিকট রসায়নের কথা বলিব, না আজ অন্ন সমস্যা—কাল সমাজ-সমস্যা, পরশ্ব বস্ত্র-সমস্যা এই সকল লইয়া ছাত্রদের মধ্যে আন্দোলন জাগাইয়া তুলিতে হইতেছে। এ দ্বারা কি প্রমাণ হয় না যে, দেশ আজ একেবারে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। এ পথ হইতে দেশকে আজ ফিরাইয়া আনিতে হইলে তোমাদিগকে কর্ত্তব্য পালনে যত্নবান হইতে হইবে। তোমাদের কিছু করিতে বলিলেই তোমরা বলিবে—"আমরা কি করিব?" তোমাদের করিবার কি কিছু নাই? আমি সারা জীবন ছাত্রগণের সঙ্গে যাপন করিয়াছি। এখন পর্য্যন্ত আমি একজন ছাত্র। ছাত্রগণ কি ভাবে কাটায়, তাহা জানিবার জন্য আমি সি, আই, ডি নিযুক্ত করিয়া থাকি।

এবার ১৯ হাজার ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে। কলেজেও পড়িয়া থাকে প্রায়

---

* আশ্বিন মাসের পূজার পালা—শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সেন মহাশয়ের।—যমুনা সম্পাদক।

২৬ হাজার ছাত্র। কলেজের ছাত্রদের বৎসরের প্রায় ৬ মাস করিয়া ছুটী থাকে। এই মহামূল্য সময় ছাত্রগণ কি ভাবে কাটাইয়া থাকে? এই সময় ছাত্রগণের পক্ষে কিরূপ মহামূল্য তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই সময় তাহারা শুধু আড্ডা মারা, পাশা, দাবা, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলিয়া ও দিবা নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া থাকে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম, এ ক্লাসের ছাত্রগণকে বৎসরে মোট মাত্র ১৪০ দিন কলেজে যাইতে হয়। সকলেই পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট বই ছাড়া আর অন্য কিছুই পড়িবে না। বাজে বই পড়ার অভ্যাস এখন ছাত্র সমাজে নাই বলিলেই চলে। অনেক বি, এ, এম, এ, পাশ ছেলেকে আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাহারা দুনিয়ার কোন খবর রাখে না—কোন সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের খবর রাখে না। বড় মজাই হইয়াছে। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি আর ছাত্রগণকে পড়িতে হয় না। তাহারা ইতিহাস বা খগোলের কোন খবরের ধার ধারে না।

এখনকার ছাত্রগণ মনে করে যে কোন প্রকারে সকল বিষয়ে সকলকে একেবারে ফাঁকি দিয়া চালাইব।

এদিকে বাঙ্গালা দেশ যে অবাঙ্গালীতে একেবারে পূর্ণ হইয়া গেল, সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। কলিকাতা সহরে সকলেই অন্ন সংগ্রহ করিতেছে—শুধু বাঙ্গালী যুবকগণ হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা চাকুরী ছাড়া আর অন্য উপায়ে অন্ন সংগ্রহ করিতে জানে না। ইংরেজ, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, গুজরাটী প্রভৃতির দল ব্যবসায় বাজার একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। ৪।৫ হাজার পাঞ্জাবী কলিকাতায় মোটর চালকের কাজ করে। উড়িয়াগণ দ্বারবান ও পাচকের কাজ করিতেছে। চীনে মিস্ত্রীরা একে একে কাঠের গোলাগুলি আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে—চাপাতলায় দেখি সব কাঠের গোলাগুলিই চীনা-দের। ওদিকে আসাম, বেহার ও উড়িষ্যা বা যুক্ত-প্রদেশের লোকেরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, তাহারা নিজের প্রদেশে ভিন্নপ্রদেশবাসীদিগকে আধিপত্য করিতে দিবে না—কাজেই সে সকল স্থানের প্রবাসী বাঙ্গালীগণ ক্রমে ক্রমে অসুবিধায় পড়িতেছেন—কিন্তু নিজেদের বাঙ্গালাদেশ যে, দশজনে অধিকার করিয়া লইল—সে বিষয়ে কেহ কিছুই প্রতীকার করিতেছেন না, ক্রমে দেখি-তেছি বাঙ্গালাদেশ বাঙ্গালী ছাড়া অন্য সকল প্রদেশ-বাসীর বাসস্থান হইয়া দাঁড়াইবে।

এখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে খুব বেশী সংখ্যায় মেকী ছেলে বাহির হইতেছে। তাহারা ছাত্রাবস্থায় কলেজের বই ছাড়া অন্য কিছুই পড়ে না। আমি ছাত্রাবস্থায় কলেজের পাঠ্যপুস্তকের দশগুণ বাজে বই পড়িয়াছিলাম। বিলাতের বিখ্যাত পণ্ডিত জন্‌সন্ ছাত্রাবস্থায় তাঁহার বাপের পুস্তকাগারের সমস্ত বইগুলি পড়ে ফেলেছিলেন। আমাদের দেশে এত অধিক গ্রাজুয়েট হইল বা না হইল তাহাতে কিছুই যায় আসে না, এখন শুধু কাজের লোক দরকার। ইংলণ্ডে সকল বিভাগের ছাত্র পাওয়া যায়—তাহারা প্রথম হইতেই একটি বিষয় ঠিক করিয়া লইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে পড়া শুনা করে—কেহ রাজনীতি পড়ে, কেহ অর্থনীতি শিক্ষা করে, কেহ সাহিত্য চর্চ্চা করে, কেহ বিজ্ঞান, কেহ দর্শন, ৬৪ কলার মধ্যে যে কোন একটিকে ঠিক করিয়া লয়। আমাদের দেশের ছাত্রদের চিন্তা করা উচিত আমরা কোথায় পড়িয়াছি। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জাপান দেশ অসভ্য ছিল। তখন সেখান-কার লোকেরা তীর ধনুক লইয়া আমেরিকা বাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।

কিন্তু এখন সভ্যতায় জাপান সকলকে ছাড়িয়াই উঠিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ সেখানে শিক্ষা বিস্তার। আমাদের দেশেও এখন শিক্ষা বিস্তার করা দরকার। যে সকল দেশ সভ্যতার অভিমানী, তাহাদের দেশের শতকরা ৯৫ জন লেখা পড়া জানে—আমাদের দেশে শতকরা ৯৫ জন লোক কিছুই জানে না। মাত্র ৫ জন লোক লিখিতে পড়িতে জানে—তারা সকলেই যে গ্রাজুয়েট তা নয়।

(ক্রমশঃ)

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and Publisho by P. N. Pal, 26-3 Scott Lane, Calcutta.

ಕಾಡಿನ ದೃಶ್ಯ

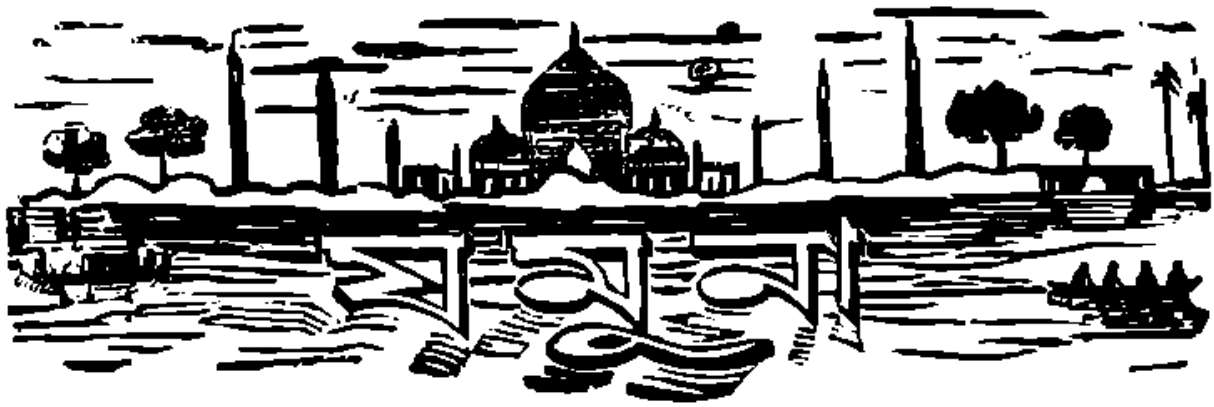

১২শ বর্ষ | আশ্বিন ১৩২৯ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বাঙ্গালীর নিজস্ব সাধনা

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু এম, এ]

"আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি"

হরপ্রসাদ

বাঙ্গালীর নিজস্ব বলিয়া একটা জিনিষ আছে, —সেটী তাহার পারিবারিক জীবন। বাঙ্গালীর সমস্ত প্রাণ মন তাহার সহিত এক সুরে বাঁধা আছে। জীবনের সহস্র শিক্ষা দীক্ষা, সহস্র ভাব-বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া বাঙ্গালী তাহার পারিবারিক বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়াছে।—ইহাই জগতের সকল জাতির মধ্যে বাঙ্গালীকে একটা স্বাতন্ত্র্য দিয়াছে। তাহার জাতি বল, তাহার ধর্ম্ম বল, তাহার জ্ঞান কর্ম্ম সমস্তই তাহার স্বতঃপ্রণোদিত প্রেরণাবশে উৎফুল্ল হইয়া তাহার পারিবারিক জীবনটীকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ জগৎকে "ভারতের বাণী" শুনাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। ভারতের বাণী কি তাহা জানি না। তবে বাঙ্গালার বাণী শুনিয়াছি। আমরা সকলেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি কি না জানি না। কিন্তু জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, আমরা আমাদের পারিবারিক জীবন এবং তাহার ভিতর দিয়া যে পবিত্রতা ও শান্তি লাভ করা যাইতে পারে, তাহা গড়িয়া তুলিতেছি। বহু দর্শনের জটীল ব্যাখ্যায় একদিন ভারতের পল্লী-কানন উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু বৌদ্ধ সকল ধর্ম্ম শিক্ষাই একদিন মানুষকে সমাজ ছাড়িয়া শান্তির জন্য অরণ্য আশ্রয় করিতে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টার ত্রুটী করে নাই। তার পর ধর্ম্ম ও দর্শন একত্র মিলিয়া ইহ জীবনের সকল সুখশান্তি

অকিঞ্চিৎকর ও তাজ্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। তান্ত্রিক কঠোর সাধনা অমানুষিক পূজা পদ্ধতি একদিন হৃদয়ের কুসুমকোমল প্রবৃত্তি নিচয়ে বড় কঠোর নির্দ্দয় আঘাত করিয়া গিয়াছে। জানি না বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের কোন অবস্থায় এই সকল কতদূর কঠোর আঘাত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু এ কথা সত্য যে এই সকল বিভিন্ন ধরণের ভাবধারার ভিতর দিয়া বাঙ্গালী তাহার পরিবার রচনা করিয়া তুলিতে সামর্থ হইয়াছে।

ইংরাজী শিক্ষার প্রবল সংঘাতেও বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বরং পাশ্চাত্য স্বাধীনতার ধারা ও মনুষ্যত্বের সম্মান বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিয়া তাহার পারিবারিক শান্তি পবিত্রতর করিয়া তুলিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। তাহার সামাজিক জীবনের জটীল দার্শনিক ব্যাখ্যাসম্ভূত বহু নিষ্ঠুরতা বর্ব্বরতা তুলিয়া দিয়া তাহার পারিবারিক জীবন প্রসূন কোমল করিয়া তুলিবার অবসর করিয়া দিয়াছে। মানুষের অন্তঃকরণের স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিলে মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে পারে কি পশুত্বের চরমে উঠিতে পারে তাহা জানি না। তাহাতে সেই দার্শনিক ব্যাখ্যা সম্পন্ন কল্পিত পরজীবনে কতটুকু শান্তি লাভ ঘটিতে পারে তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু ইহজীবনের সুখ শান্তি যে সেই স্নেহমমতার সহিত ওতপ্রোতভাবে প্রতি অণু পরমাণুর সহিত সর্ব্বথা বিজড়িত তাহা প্রত্যক্ষ। বাঙ্গালী পরস্পর বিসম্বাদী বহু ভাবের বিলোড়নে স্নেহমমতার বিস্তকারী যে সমস্ত ধারা পোষণ করিয়া আসিতেছিল তাহা এই নূতন শিক্ষাস্রোতের মুখে ভাসাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার নিরাবিল পবিত্র শান্তির অমল ধারায় জগতের বর্ত্তমান যুগের বহু সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে, ইহা নিতান্ত দুরাশা নহে। ইউরোপের বিজ্ঞানের দুরাশা হইতে উৎপন্ন অর্থের অত্যাচার ও শ্রমিক বিপ্লব, সোসিয়ালিজমের আকাঙ্খিত সাম্যবাদ, এবং সমতন্ত্রের কল্পিত চরম ব্যক্তিত্ব,—মনুষ্যত্বের যে বিশিষ্টতা বাঙ্গালীর ঘরে পারিবারিক স্নেহমমতার ভিতর ফুটিয়া উঠিতে পারে, তাহাতেই সে সমস্ত মিলিবে, তাহার অন্য পন্থা নাই।

ইউরোপে বিরাট কারখানা প্রতিষ্ঠায় মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উন্মেষ বিশেষ বাধা পাইয়াছে। ক্রোপটকিন প্রমুখ সোসিয়ালিষ্টগণ তাহার বিলোপ সাধন করিয়া যে কুটীরাশ্রম রচনা করিতে চান একমাত্র বাঙ্গালাদেশেই তাহার সম্যক নিদর্শন দেখাইতে পারে। বাঙ্গালীর পরিবার তাহার সব। বাঙ্গালী যে জগতের অনেক কাজে অগ্রণী হইতে পারে নাই, তাহার প্রধান কারণ, সে সব তাহার পারিবারিক সাধনার বিসম্বাদী হইয়া পড়ে। পরিবার তাহার নিজস্ব,—তাহার জীবনের সকল সাধনার বস্তুর অন্বেষণ সেইখানেই সে পায়। সেটী রক্ষা না করিয়া সে অন্য কাজে হাত দিতে পারে না। সাময়িক আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া সে এক একবার পরিবার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কল্পনা করিতে পারে। কিন্তু পরিবারের বিপুল আনন্দ তাহাকে ফিরাইয়া আনিবেই। তাহার স্বদেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি সমস্তই সম্ভব হইবে সেই দিন, যে দিন সেগুলি তাহার পারিবারিক জীবনের সহিত এক সুরে বাঁধা হইয়া, যেদিন সেগুলি তাহার পারিবারিক জীবনের বিরুদ্ধে না দাঁড়াইয়া, তাহারই পরিপন্থী তাহারই সহায় হইবে। অথবা যেদিন তাহার পারিবারিক শান্তি ও পবিত্রতার বিপুল বিকাশে স্বদেশ ও বিশ্ব ভাসাইয়া লইয়া যাইবে।

মানব হৃদয়ের মধুর ভাবগুলি বাঙ্গালাদেশে যেরূপ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে ব্যক্তির আপনার প্রাণপ্রিয়দিগকে লইয়া বেড়িয়া রহিয়াছে। তাহার ভগবদ্ভক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সাংসারিক জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটী তাহার পারিবারিক জীবনের সহিত বিজড়িত। মানুষ সংসার রচনা

করিয়া পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, ভ্রাতা ভগিনীদের লইয়া বাস করে। তাহাদের সুখশান্তির চিন্তায় নিজের অন্তঃকরণে স্নেহের যে বিকাশ লাভ করে তাহা পবিত্র শান্তিদায়ক, তাহা সংসারের সকল দুঃখ যাতনার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র আশ্রয় স্থল। হিন্দুর ঘরে ভগবান তাই রাজা নন,—হিন্দু ভগবানের কল্পনা করিয়াছে পিতামাতারূপে। সে বিশ্বনিয়ন্তাকে তাহার পারিবারিক জীবনের মধ্যে আপনার করিয়া লইয়া যেন বাপমায়ের কাছে আব্দারের আবেগে তন্ময় হইয়াছে। শৈশবে মানুষ পুতুল গড়াইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের খেলা খেলে। বাঙ্গালী পুতুল গড়াইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বালকের ন্যায় 'মা মা, বলিয়া ডাকিয়াছে, কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়াছে। তাহার জীবনের সার, পারিবারিক কল্পনার মাধুর্য্য, তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, তাহার জীবন পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে।

স্নেহকে চিরদিন তরল পদার্থের ন্যায় নিম্নগামী বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বয়ঃকনিষ্ঠের পর স্নেহের তীব্রতা সমধিক প্রবল। স্নেহের আকর্ষণই মানুষকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুগ্ধ করে। সন্তানের প্রতি স্নেহের প্রাবল্য স্বতঃপ্রণোদিত, অতি তীব্র। মানুষের অন্তঃকরণের সেই স্নেহের মূর্ত্ত অবস্থাই বোধ হয় সন্তান। সন্তানের বিরহ তাই তাহার অন্তঃকরণ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। পারিবারিক জীবনে অনুপ্রাণিত বাঙ্গালীর জীবনে এ স্নেহ অমূল্য। তাই বাঙ্গালী সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার শক্তিকে স্নেহের সলিলে ধৌত করিয়া তাঁহার আরাধ্যা দেবীকে কন্যার আসনে বসাইয়াছেন। দুর্গা পূজা বাঙ্গালীর পূজা,—খাঁটী বাঙ্গালীর ঘরের পূজা। বাঙ্গালী তাহার জীবনের সর্ব্বকল্পনা নিত্যনৈমিত্তিক সকল আশা আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত্তি দিয়া, প্রাণের সকল আবেগে স্নেহ মমতার সর্ব্বোচ্চ বিকাশভরে দুর্গাপূজা করিয়া থাকে। ইহাতে জাতিহিতা কি জানি না,—স্বদেশ স্বধর্ম্ম হিসাবে ইহাতে লাভ লোকসান কি আছে তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের পূত সৌরভে ইহা উন্মত্ত। ইহা বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্বের এক অভিনব মূর্ত্তি। বাঙ্গালা দেশে প্রকৃতির সরস মাধুর্য্যের পূর্ণ মূর্ত্তি শরৎ সমাগমে বাঙ্গালী উৎফুল্ল হৃদয়ে সাধনার আনন্দে মত্ত হইয়া জীবনে শান্তির পবিত্র আস্বাদন অনুভব করে।

বৎসরান্তে আজ আবার সেই আনন্দ উৎসবের বাদ্য বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বাজিয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালী তাহার জীবন সাধনার বহু বিঘ্নের ভিতর দিয়া অগ্রসর। তাহার স্বাতন্ত্র্য কত সময় নিতান্ত অসহ্য হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালী নিজেকে চিনিতে শিখুক। তাহার বাণী জগতে প্রচারিত হউক। বাঙ্গালীর সাধনার ধন বাঙ্গালীর জীবন সাধনার পূর্ণ বিকাশ সাধন করুক।

কৃপণের দুর্গাপূজা

(গল্প)

[শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন]

(১)

সে ছিল হাড়ে হাড়ে কৃপণ। তাহার একটি পয়সা এদিক ওদিক হ'বার যো ছিল না। এমনি কোরেই সে টাকা জমিয়ে জমিয়ে আস্‌ছে।

যে গ্রামে নিতাইএর বাস—সে গ্রামের মধ্যে বড় একটা পূজা হইত না; সেই জন্য পাড়ার সকলে তাহাকে চাপিয়া ধরিল যে সে এবার মাকে আনে। এই কথা শুনিয়া নিতাই মোড়ল হতবুদ্ধি হইয়া

গেল, কোন কিছু কথা না বলিয়া মূকের মতন তাহাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার মুখের হাবভাব দেখিয়া সকলে ভাবিল—এ ব্যাটার কাছ থেকে মার পূজা আদায় হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার।

কোন প্রকারের আশা ভরসা না পাইয়া সকলে যে যাহার গৃহে সেদিনকার মতন চলিয়া গেল।

নিতাই বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া স্ত্রীকে সাম্‌নে পাইয়া বলিল, "দেখ পাড়ার সবাই চেপে ধরেছে আমাকে পূজা করতে হবে। একি আমার দ্বারা সম্ভব? মাকি আমার মতন গরীবের ঘরে আস্‌বেন—না, আমি কি এত শক্তিমান পুরুষ যে তাঁকে আন্‌ব? তুমিই বলনা কেন—আমি কি পারি?" এই বলিয়া সে স্ত্রীর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল উত্তরের আশায়।

নিতাইএর স্ত্রীর ধর্ম্ম কর্ম্মের দিকে একটু মন ছিল। স্বামীর দ্বারা কোন কিছু হইবার আশা নাই দেখিয়া, নিতাইএর স্ত্রী আনন্দের সহিতই বলিল, "মাকে আনা এ ত তোমার পরম সৌভাগ্য। মা কি আর যার তার বাড়ীতে আসেন—না যে সে মন করলেই আনতে পারে? এই গ্রামের মধ্যে তুমি ছাড়া আমি দ্বিতীয় মানুষকে ত দেখি না যে মাকে আন্‌তে পারে। পাড়ার লোকের আর দোষ কি—তারা ত ঠিক মানুষই চিনেছে—তাই তোমাকে এসে ধরেছে। তারা ত আর বোকা লোকা মানুষ নয় যে যাকে তাকে গিয়ে ধরবে?" এই বলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

স্ত্রীর এবম্বিধ কথা শুনিয়া নিতাই বড় চিন্তার মধ্যে পড়িল। মনে মনে ভাবিল—আমি কি এক-মাত্র লোক এই গ্রামে? কেন—গ্রামে অনেক লোক আছে, তারা পারে না কেন—আর সকলে আমার কাছে আসে কেন? এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন তাৎপর্য্য আছে। এই চিন্তা করিতে করিতে সে বাহিরে চলিয়া আসিল।

(২)

পূজার আর বেশীদিন বাকী নাই; অথচ নিতাইএর বাড়ীতে প্রতিমা প্রস্তুতের কোন চিহ্ন-মাত্র নাই।

একদিন রাত্রে নিতাইএর স্ত্রী স্বামীকে বলিল, "হ্যাগো পুজো যে এগিয়ে এল, মাকে আনবার যা'হোক একটা ব্যবস্থা কর। মাকে আনা কি তাড়াতাড়ির কাজ যে, একদিনেই সব যোগাড় হ'য়ে যাবে? যদি একদিনে সব হোত তা'হলে সকলেই দিনে দশবার কোরে মাকে আন্‌ত। আর দেখ, কাল রাত্রে আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেছি—মা আমার কাণে কাণে বল্লেন—ওরে তোরা আমায় এবার ডাক, ভাল করে পুজো দে, তোদের অনেক টাকা কড়ি হবে—তোদের অনেক হবে, অনেক হবে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিতাইএর স্ত্রী চুপ করিলে, নিতাই টাকা কড়ি অনেক হ'বে শুনিয়া উৎসুক মনে কহিল, "তারপর, তারপর?"

কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিবার পর নিতাইএর স্ত্রী সদ্‌গদ্‌কণ্ঠে কহিল, "মা আমায় বল্লেন, এ গ্রামে যখন সকলেই আমাকে আনবার জন্য উৎসুক হয়েছে—তখন তোরাই আমাকে নিয়ে এসে পুজো কর—তোদের খুব ভাল হ'বে। যাবার সময় মা আরও বল্লেন, তোদের ঘরে আসবার আমার অনেক দিনের সাধ, এবার তোরা আমার সে সাধ পূরণ কর।"—এই বলিয়া মা চলিয়া গেলেন, তারপর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল—দেখি ভোরের পাখী ডাকছে।

এই কথা শুনিয়া নিতাই কহিল, "আচ্ছা গিন্নী, ভেবে চিন্তে দেখি, মাকে আন্‌তে পারি কি না। আমি ত তাঁর অনাথ সন্তান আমি আর কি দিয়ে তাঁকে পূজা কোরব? মা যদি খুসে সন্তুষ্ট হ'ন, তাহলে না হয় দেখতে পারি নচেৎ—

নিতাইএর স্ত্রী তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিল, "ও কথা বোল না—বোল না। মার অনুগ্রহ কি

আর যে সে পায়? আচ্ছা আমি একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এত পয়সা তোমার কার? কে? না আছে ছেলে, না আছে মেয়ে, কার জন্যে তুমি এত পয়সা কড়ি আগলে বসে আছ? এই বয়সে যদি ধর্ম্ম কর্ম্ম না কোর্‌বে তবে কোর্‌বে কবে—বুড়ো হোলে, তখন ত আর এক পাও নড়্‌তে পারবে না?" এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তারপর কহিল, "আমার মতন বয়সের স্ত্রীলোকে কত তীর্থধর্ম্ম কোরে এল, আর আমি তোমার সঙ্গে থেকেও আমার ভাগ্যে কিছুই হোল্ না।" বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

নিতাই স্ত্রীর এই কথা শুনিয়া কহিল, "আমাদের এমন কি বয়স হোয়েছে যে এর মধ্যেই ধর্ম্মকর্ম্ম সব কোর্‌তে হবে? আগে টাকা গিন্নী—তারপর অন্য সব।" "তুমি গেলে কি টাকা তোমার সঙ্গে যাবে—তাই বল দিকি একবার?" বলিয়া মৌন হইয়া রহিল।

নিতাই দেখিল আর স্ত্রীকে ঘাঁটান ঠিক নয়, সে অন্য কথা উত্থাপন করিল।

(৩)

পাড়ার সকলে এক জোট হইয়া এই স্থির করিল যে যখন উহার দ্বারা কিছুই হইবে না, তখন পূজার রাত্রিতে একখানি প্রতিমা গড়াইয়া উহার আটচালায় রাখিয়া আসা—তা হলে ও কৃপণ ব্যাটা আচ্ছা জব্দ হবে। এই স্থির করিয়া সকলেই পূজার দিনের জন্য আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে পূজা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। আজ বাদে কাল সপ্তমী পূজা; সেইজন্য গোপনে প্রতিমা প্রস্তুতের কাজ দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। একে একে চালচিত্র পর্য্যন্ত রঙ্গীন হয়ে উঠ্‌লো। মায় সর্ব্বাঙ্গ বিবিধ বর্ণের অলঙ্কারে খচিত হোয়ে উঠ্‌লো।

রাত্রে শুইয়া নিতাই এক স্বপ্ন দেখিল, মা যেন স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—কেবল মাত্র তাহার আয়োজনের অপেক্ষায়।

হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—চাহিয়া দেখিল রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। প্রভাতের পাখীরা পল্লীটিকে তাহাদের বিচিত্র কলরবে মুখর করিয়া তুলিল। দূরদূরান্তরের গ্রাম হইতে পূজাবাড়ীর সানাইএর মন মাতান সুর কাণে আসিয়া তাহাকে ধাক্কা দিল। তখনি তাহার মনের মধ্যে স্বপ্নের ছায়া ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল, "দেখ, মাকে আজ যে রকমেই হোক না কেন আন্‌তেই হবে। মা আজ স্বপ্নে আমাকে বলেছেন—তোকেই আন্‌তে হবে, অন্যে আন্‌লে আমি আসব না।" এই বলিয়া পাগলের মতন স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল।

স্বামীর যে হঠাৎ এমন সৎবুদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া, তাহার মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। অমনি বাহিরে গিয়া বাক্স হইতে তাড়াতাড়ি একখানি পট্টবস্ত্র বাহির করিয়া তাহা পরিয়া আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে নিতাইকে প্রণাম করিল এবং অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে কহিল, "তুমিই আজ ধন্য—যে এমন স্বপন পায়।" বলিয়া কাঁদিয়া স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

স্ত্রীর এই প্রকারের অবস্থা দেখিয়া, নিতাই চমকিত হইয়া গেল, আনন্দের আতিশয্যে কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল মূকের মতন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পূজার আনন্দ কোলাহলে সারা পল্লীটি যেমন মুখর হইয়া উঠিবে, সেই সময়ে তাড়াতাড়ি নিতাই বাহিরে আসিয়া দেখিল—আটচালা আলোকিত করিয়া বিবিধ বর্ণের রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া, কে যেন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মিষ্ট মধুর হাসিতেছেন। নিকটে গিয়া যাহা দেখিল—তখন নিতাইএর মনের অবস্থা অবর্ণনীয়।

এইরূপ অবস্থায় মাকে দেখিতে পাইয়া নিতাই দৌড়িয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল,

"শীগ্‌গির দেখ্‌বে এস, দেখ্‌বে এস, আজ আমাদের বড় শুভদিন। মা আমার বাড়ীতে এসেছেন—এসেছেন।" এই বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া বাহিরে চলিয়া আসিল।

হঠাৎ স্বামীর এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া, নিতাই-এর স্ত্রী কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়া গেল।

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া গেল। তখন তাহার চক্ষু দিয়া দরদরধারে জল ধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

তখন স্বামী স্ত্রীতে এক সঙ্গে সেই সমুজ্জ্বোদ্ভিতা, দশপ্রহর ধারিণী দিব্যালঙ্কার ভূষণা প্রতিমাকে কর-জোড়ে বন্দনা করিল।

বড় বাবু

[গল্প]

(শ্রীপতিমোহন ঘোষ)

আমি যে বড় বাবু হ'তেই জন্মেছিলুম এ কথাটা নিজে যেমন জানতুম আমার পারিষদেরাও তেমনি জেনেছিল তবু কেন যে একটা অপবাদ সর্ব্বদা আমায় ঘিরে থাকতো তার কারণ নির্দ্দেশ করতে পারিনে, আমার শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্কীয়েরা বলতেন চাঁদ মেঘে ঢাকা থাকলে চাঁদের কি, তাতে তার শোভা বাড়ে বই কমে না।

আসল কথা দেশেই কি বিদেশেই কি নিজের বলে পথ হেঁটে চল্‌লে পাঁচজনের তাতে হিংসা হয় দ্বেষ হয়, আমিও সে ভ্রূকুটি হেলায় দলে চলতে পারতুম—যদি মাঝে মাঝে কতকগুলা কিন্তু না এসে জমতো—

শত্রু পক্ষীয়েরা বলে আমিও সাধারণের মত একদাকালে মাহিমারা কেরাণী দলভুক্ত ছিলুম, তার-পর সাহেবের সঙ্গে শলাপরামর্শ ক'রে আসল বড় বাবুটির মাথা খেয়ে নিজেই বড় বাবু হ'য়ে পড়ি—অথচ ভূতপূর্ব্ব বড় বাবুটিই নাকি আমার চাকরী ক'রে দিয়েছিলেন। এসব কথার উত্তর দিতে গেলে আমার সংযম রক্ষা করা চলে না—বরং বলেই যেতে হয়—কাজেই চুপ ক'রে থাকাই বুদ্ধি-মানের কার্য্য, কিন্তু চুপ ক'রে থাকলেও আজকাল-কার দিনে পাঁচ জনে টিপে মারবার উপক্রম করে।

দ্বিতীয়তঃ আমি নাকি ঘোর সাহেব ভক্ত, সাহেবদের কথায় আমি নিজের জাতি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারি—এমন কি আমার অবগুণ্ঠন-বতী স্ত্রীটিকে পর্য্যন্ত নিয়ে সাহেবদের ডিনার খেয়ে এসেছি; সত্য মিথ্যার খবর আমি দেব না তবে নিমকহারামী না করলে যদি অমর স্বর্গলাভ হয় সে স্বর্গের অধিকারী আমি, তা আমি মুক্ত কণ্ঠেই বলবো! আজকাল ইয়ং বেঙ্গলের দল হো হো ক'রে হৈ চৈএ মাতো—সাহেবেরা রাজার জাতি একথাটা তোমরা ভুলে ব'সো……কিন্তু আমরা পোর থেকে। লোক, ভালই জানি, ওদের কাছে শুদ্ধ সেলাম দিয়ে যা আদায় হয়—চোখ রাঙিয়ে তার এক আনা আদায় হয় কিনা সন্দেহ, তবুও যদি তোমরা তর্ক করো আমি নাচার,—

যাই হোক আমি আমার চাকরী উপরি পাওনা আর কুলীর মর্য্যাদের দল এই নিয়ে সুখেই ছিলুম, সহসা কি জন্যে যে গান্ধীমহারাজের নাম শোনার এই ছাতা শীতল পাটের দলের দেশেও

প্রবেশ করল, সেই অবধি প্রত্যহ প্রায় হরতাল লেগেই আছে, আর উপরি উপায়টাও যায় যায় প্রায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ; আগে আমাদের সপ্তাহে উপরি বাবদ কুলীর সর্দ্দারের কাছেই কত পাওয়া যেতো, এখন তার জায়গায় থাকার খরচ চলাই সমস্যার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ; আগে রাস্তা দিয়ে এরা দেখা হলেই তটস্থ হয়ে সরে দাঁড়াত, আর কত যে সেলাম দিত তার লেখা জোখা নাই। এখন তার সামনাসামনি হলেও মাথা ঝাড়া উঁচু ক'রে চ'লে যায়, অথচ একটি কথা বলবার উপায় নাই, আগে কতদিন শ্রেফ নিজেদের প্রভুত্ব দেখাবার জন্যই কলকাতায় বন্ধু-বান্ধবদের কত নিমন্ত্রণ করেছি, আর আজ যদি তাঁরা আসেন কি দেখবেন—"

আমাদের চাইতেও শোচনীয় অবস্থায় পড়েছে ঐ শুঁড়িওয়ালা গুলি—আগে যেখানে তাদের শত শত দোকান দিবারাত্র মাতাল কুলীদের পবিত্র গোলমালে মুখরিত থাকতো এখন সেখানে একখানা দোকান তারও নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়েছে।

আমার গঙ্গার ধারে যে একটা বাগান বাড়ী তৈরী হচ্ছিল সেটির কাজ সম্প্রতি বন্ধ রেখে দিয়েছি, আবার যদি কোন দিন উপরি আয়ের রাস্তা খুলে যায় তবেই মনের কথা কইব।

সেদিন সহসা সাহেব আমায় ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবু তোমার দেশকে তুমি কেমন ভাল বাসো খোলাখুলি ব'লতে হবে।

আমি ত অবাক, কেমন ক্যাঁ ক'রে মুখের উপরি এসে গেল বলুম, সাহেব যদি খোলা খুলি শুনতে চান তবে শুনুন, শত্রু যেমন তার শত্রুকে ভাল বাসে তেমনি—

সাহেব বিস্মিত হ'য়ে বলেন,—কেন ?

আমি আমার ছেলে বেলার কাহিনী তুলে বলুম, সাহেব যখন আমার বাবা কিঞ্চিত ধন আর একটি ভগ্নী রেখে মারা যান, তখন দেশের লোক আমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার ক'রেছিল তা এজীবনে ভুলতে পারবো না। সামান্য টাকার পৈতৃক জোতজমা যে ক বিঘে ছিল, চলে গেল—তাও ডাকলো আমার আপন জ্যাঠা—মশাই, যাঁর ধন-দৌলতের সীমা পরিসীমা ছিল না,—আর—আর আত্মীয় স্বজন যাদের সঙ্গে আমার কোন কালে শত্রুতা ছিল না, তারাও শুদ্ধ শত্রুতা সাধতে বাদ বুঝে কোমর বেঁধে লেগেগেল। আপনারা সম্ভব পচা গোরস্থান দেখে থাকবেন, সেখানে যেমন হয়া জানোয়ারকে নিয়ে শকুনির দল মাতে, আমাকে নিয়ে আমার দেশের লোক তেমনি মেতেছিল। অবশেষে আমার জমি জায়গা পৈতৃক ভিটা সব গেল তখনও তারা রেহাই দিলে না, পুরোহিত ঠাকুর রোজ তিন বেলা ক'রে এসে আমার ভগ্নিটি অবিবাহিত রাখার ফলে চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হবার ভয় দেখিয়ে যেতে লাগলেন। আমি বিশে হারা পেটের ভাতের যোগাড় করব না ভগ্নীর বিবাহের চেষ্টা দেখবো, অবশেষে একদিন মা ভগ্নীটির গলায় কলসী বেঁধে গঙ্গার জলে ঝাঁপ খেলেন, আমিও বাঁচলুম তাঁরাও বাঁচলেন, তারপর ঠাকুরের দয়ায় বড় সাহেবকে পেয়ে গেলুম, সে সময়ে বড় সাহেবকে না পেলে—সাহেব, ঠিক আমায় আত্ম হত্যা করতে হতো, আমারও তাই সঙ্কল্প আছে যদি জীবনে কিছু করতে হয় সাহেবদের জন্যই করবো, দেশের লোকের জন্য নয়—"

সাহেব কি ভেবে আমার হাতে হাত দিয়া বলেন, অল্ রাইট বাবু, এখন সাহেবদের বিপদ কালে একটু দেখো, ভবিষ্যতে তোমারও ভালো হবে, কেবল লক্ষ্য রাখবে কে ভবঘুরে কুলী বাড়ীতে আসে, আর কি লেকচার ঝাড়ে।—"

আমি বলুম "হুজুর এ আর বেশী কথা কি—এতো আমার কর্ত্তব্য, আমার অনুগত সাতকড়ি আদিকে হুঁসিয়ার থাকতে বলুম, তারাও দু'পয়সা পেতো, তাদেরও সেটা বন্ধ হয়ে গেছে, কাজেই

আমাদের সঙ্গে পুরো হপ্তার যোগ দেবে বলে জানিয়ে গেল।"

সে দিন গৃহিনীর কি একটা ব্রত উদ্‌যাপনের দিবস। দিনের বেলায় ব্রাহ্মণ ভোজন করান হ'য়ে গেছে, অপরাহ্নের দিকেও লোক জনের আনা-গোনার বিরাম নাই, সহসা সন্ধ্যার দিকে সাতকড়ি এসে খবর দিলে একটা গাড়ীর ভেলা পাওয়া গেছে, লোকটা কুলী বাড়ীতে দাঁড়িয়ে সেকড়ার দিচ্ছে, আমি তাকে পুলিশ ডাকতে বলে এদিকে এসে হাজির হলুম, দেখি বুড়ো বটগাছটার তলায় সভা ব'সে গেছে, আর একটা বড় চৌকীর উপরে দাঁড়িয়ে কে একজন দীর্ঘ দেহি হিন্দীতে লেকচার দিচ্ছে।

বুকলুম ইনিই ভেলা, মাথে একটা আলখেল্লার মত, তা যে কোন কাপড়ের লোক অতি জীর্ণ, গলায় একটা বেশী খদ্দরের চাদর, আর পায়ে একটা ছাকড়ার জুতা, যেমন স্রোতাগুলির বেশ, তেমনি বেশ তত্তোধিক শৈল্প জড়িত, সম্ভব দীর্ঘদেহী লোকটি ভদ্রঘরের ছেলেই হ'বে—কিন্তু সাহস ক'রে বিশ্বাস করা যায় না, আমার মনে বড়ই ধোঁয়া উঠতে লাগল যে ভদ্রঘরের ছেলেদের এ প্রবৃত্তি কেমন ক'রে জন্মাতে পারে? যাদের আচার নেই বিচার নেই কোন ধর্মই নেই, এই সব চট্-কলে খাটা খোটা তাড়িখোর মদখোর এদের মানুষের কোটায় তুলে এদের কি লাভ হবে? যাদের সমস্ত জীবনটাই আঁস্তাকুঁড়ে পড়ে থাকবার জন্য তৈরী, তাদের মনুষ্যত্বের আহ্বানবাণী শোনান হচ্ছে—আর ঐ হতভাগোর দল আগে যারা মদের দোকানে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে পরস্পরের স্ত্রী পুরুষের নাম ধরে পৃথিবীতে যে শ্লীলতা নাই তারই সত্যিত জোর গলায় প্রমাণ করতো, তারাই কিনা নিজেদের অভাব অভিযোগ শিক্ষা দীক্ষা—এই নিয়ে মেতেছে, তারাও যে চিরস্থিতে অনাদৃষ্টি নয়—এটা পরিষ্কার বলছে, আর এই কুলী জীবনের যে আনন্দ স্বাস্থ্য নীতি এ সবের প্রয়োজন আছে তা ঐ বক্তাটীর সঙ্গে এক গলায় বলে যাচ্ছে। এতদিন এসব লেকচার শোনবার অবসর হয় নি, আজ ডিটেকটিভ বুদ্ধিতে চাকুষ স্বরূপ উপলব্ধি হলো।

ইতিমধ্যে সাতকড়ি এসে উপস্থিত হলো—সে এসে বলে পুলীসের জমাদার আসতে রাজী হলেন না, তিনি জানিয়েছেন ঐ উগ্রপন্থী জনতার মাঝখানে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে সেটা গ্রেপ্তার করবার সাধ তাঁর নেই বা উপরিওয়ালারও সে হুকুম নাই।

কথাটা আমাকেও ভাবিয়ে দিল বটে, কিন্তু বাইরোক হ'য়ে যাবার পাত্র আমি নই, সাতকড়িকে দিয়ে দুজন সর্দারকে ডেকে পাঠালুম, সর্দাররা এসে আমায় সেলাম দিলে, আমি তাদের বল্লুম, তোমাদের নেতাটিকে চাই, ওর নাম ধামে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

অগত্যা সর্দার আবার এসে বল্লে ওঁর নাম আর কি নেবেন বড়বাবু, উনি আমাদের সাবেক বড়বাবুরই একটি ভাই, নাম অজয়চন্দ্র, আজকাল লেকচার দিয়ে বেড়ানই ওঁর কাজ—"

"অজয়চন্দ্র" আমি ত অবাক হ'য়ে পড়লুম, ততবড় বাবুটা এমন ধারা কুলীলেজে কুলীর দলে ভিড়তে পারবে তা আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল। যাই-হোক অজয়ের সঙ্গে আমার একটা বন্ধুত্বেরও সম্পর্ক আছে, আমি সেই সাহসে ভর ক'রে সভার মধ্যেই প্রবেশ ক'রে বল্লুম "অজয়চন্দ্র তোমার এই কাজ?"

অজয় খানিক আমার মুখের দিকে চেয়ে তারপর ঈষৎ একটু হেসে বল্লে—হাঁ ভাই আমার এই কাজ, আজকাল আমি একজন ভলান্টিয়ার, ভলান্টিয়ারের ডিউটিই আজ পালন করতে এসেছি।"

এরপর আর অল্পক্ষণই বক্তৃতা চল্লে, আমি আর একবার তার আপাদমস্তক চেয়ে নিলুম, বড় বড় চোখ দুটাতে তেমনি উজ্জ্বলদীপ্তি বিকীর্ণ করছে, আর সমস্ত দেহ মনে এমন একটা দুর্জ্জয় প্রচণ্ডতার আভাষ জেগে রয়েছে যেটাকে দমিয়ে দেবার সাধ্য

কারও নাই।

হবে।

সে সভা ছেড়ে কলকাতা না কোথা যেতে হবে বলে, আমি সনির্ব্বন্ধে আজকের রাত্রিটার মত আমার বাড়ীতেই অতিথি হয়ে থাকতে বললুম, দেখলুম অল্পেই সে রাজী হলো, আমি সাতকড়িকে সেই রাত্রিতেই মাছ আর বামুনের জন্য বাজারে পাঠিয়ে দিলুম।

অজয় বলে, বামুনের কি প্রয়োজন? আমি বলুম, তুমি বামুন, রাত্রে দুটি রান্না-বান্নাও ত প্রয়োজন হতে পারে।

অজয় তার কাবলীদের ধরণে কোটের উপরি ঝোলান থলিটাকে দেখিয়ে বলে, "এর ভিতরে রাত্রি বেলাকার আহারেরও জোগাড় আছে নিতাইবাবু।"

আমি তথাপি এই রাত্রিটার মধ্যে একটা ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে তার জন্য ফলটা হ'তে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারলুম না—বিশেষ প্রভাতেই যখন তাঁকে জেলে ঠেলে দেওয়া হবে।

আমার নতুন তৈরী বৈঠকখানা ঘরের সব আলোগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া করালুম, বড় বড় আয়নাগুলোরও ঢাকা খুলে দেওয়ালুম, কেন যে একটা পথের ভিখারীকে এই ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখাবার হঠাৎ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, তার কোন একটা কারণ তখন ঠাহর ক'রে উঠতে পারিনি, কিন্তু মনের ভিতরে ভারি একটা আরাম পাওয়া যাচ্ছিল—

সন্ন্যাসীটি কিন্তু একবার ভুলেও জিজ্ঞাসা করলেন না—এ ঘর-বাড়ী কাহার, আমিই বরং শেষে নিজেকে জাহির করবার জন্য বললুম এই কুঁড়েটুকু বানিয়েছি ভাই।

অজয় এ সবের একটা কথা গায়েও মাখলে না। টেবিলের উপর একখানা রেলের টাইম-টেবল পড়েছিল; খানিক সেইখানার পাতা উল্টিয়ে গেল—তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে, নিতাই বাবু তোমার লাইব্রেরীতে কোনপ্রকার বই-টই নেই।

যেন আজকালকের দিনে ভদ্রলোকের ঘরে লাইব্রেরী রাখতেই হয়, এম্নিভাবেই কথাটা আমায় জিজ্ঞাসা করে গেল; আমিও দমে যাবার পাত্র নই, বলুম,—বাজে নবেল কিনে আলমারী বোঝাই করবার মত যে প্রবৃত্তি আমার কোন কালে হয় নাই অজয় বাবু!

অজয় দ্বিরুক্তি না ক'রে তাঁর ঝোলা হ'তে একখানা বই বার ক'রে পড়তে লেগে গেল। বইখানার টাইটেল পাতার দিকে দেখা রয়েছে। "দার্কাস ক্যাপিটাল"। এ বইএর নাম পর্য্যন্ত আমি কোনদিন শুনিনি; নিশ্চয়ই এটা একটা কোন বিপ্লববাদের বই।

ইত্যবসরে সাতকড়ি এসে খবর দিলে, বামুন পায় নাই, তবে মাছ যথেষ্ট পাওয়া গেছে।

আমি ও গৃহিণী দুজনেই চিন্তিত হয়ে পড়লুম, অবশেষে স্থির করা গেল, চন্দু লজ্জার মাথা খেয়ে অজয়কেই পাকশালায় ডেকে আনা যাবে, উনানে ডাল চড়িয়ে তাতে চাল দিয়ে অজয়কে এসে ডাক দিলুম, অজয়! সে বই হ'তে মুখ না তুলেই বলে, কেন তোমার স্ত্রীর কি অসুখ?

আমি মিথ্যা ক'রে বলুম—হাঁ অসুখই বটে।

আচ্ছা, বলে বইখানা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, সহসা কাছে সাতকড়িকে দেখতে পেয়ে বলে—এই যে সাতকড়ি রয়েছো, যাওত তোমাদের বাবু কি বলছে, ভাত কটা নামিয়ে দাওগে, আমি ততক্ষণ বইটা শেষ করে ফেলি;"

আমি ত অবাক; সাতকড়িও অবাক যে না হয়েছিল তা নয়, কিন্তু সে তার স্বভাব জানতো। আমায় বাহিরে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি বলে—কি বলবো বাবু আমি ত যাই হোক হিন্দুর ঘরে বাগ্দীর ছেলে, কিন্তু শুনেছি, হুমীর মোহান মায়ের হাতে অনেকবার খেয়েছেন। তাতে ওঁর একটু বিরাগ দেখা যায় নি।

আমার অত্যন্ত রাগ হতে লাগল—কিন্তু কাউকে

বাড়ীতে ডেকে নিয়ে এনে অপমান করাটা বেশ ভদ্রতা-সঙ্গত নয় বলে ঠেলে গিয়ে বল্লুম—সে বাইরে যা করো অজয়, আমাদের এখানে এ সব ন্যাকপনা চলবে না—তোমাকে এখানে বামুনের মতই চলতে হবে।

অজয় খানিক তার বড় বড় চোখ দুটীকে তুলে আমার দিকে কেমন অসহায় ভাবে চেয়ে রইল; তার পর আস্তে আস্তে বল্লে—ও বুঝেছি—তোমারই কি দোষ বল—পরের দোষই দেখে চলা যে আমাদের জাতিটারই স্বভাব। এ শোচনীয় দাসত্ব ঘোচাতে খুব বড় বীরের প্রয়োজন। আরও কত কি যে বিড় বিড় করে বলতে লাগলো, আমার তা সব মনে নাই!

কোন গতিকে যাত্রা-পর্ব্ব শেষ হয়ে গেল। আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে, এরকম স্নেহ্ময় স্বামী নিয়ে ব্রাহ্মণীর কি ক'রে দিন কাটে কিছু শুনেছ? আমারও কৌতূহল হল। আহার শেষে বাইরের ঘরটায় যেখানে স্বামী অভয়ানন্দ পান বাঁধানো হুকটায় পড়ে হাওয়া খাচ্ছিল, সেইখানে এসে উপস্থিত হয়ে বল্লুম—কি অজয়চন্দ্র এখন তোমার শেষে পদসেবার জন্ত ব্রাহ্মণীকে মনে পড়ছে নাকি?

অজয় নির্ব্বিকারভাবে উত্তর দিল—"প্রেম্ বিভোর জন্ত, কোন প্রকার সুখ-সুবিধার কামনা মন হতে চিরতরে মুছে ফেলে দিয়েছি।"

আমি বল্লুম—"ব্রাহ্মণীটিকে পর্য্যন্ত নাকি?" অজয় বল্লে—আমি যদিও ব্রাহ্মণীকে ত্যাগ করিনি, কিন্তু তাঁরই আর পোষালো না। তার ভাইরা বড় বড় চাকরী করে, তাদের সংসারে সে বেশ সুখে আছে; লোকের কাছে এমনও শুনেছি—এখন সে স্বামীর সম্পর্কটাও চোকাতে পারে বাঁচে। তবে বিষয় হতে টাকাটা আসছে, তাই সম্ভব সম্পর্ক ছিন্ন করবার এত তাড়াতাড়ি দরকার হ'য়ে পড়েনি। তার জন্ত আমারও মনে যে কোন প্রকার দুঃখ আছে, তাও মনে করবেন না, আমার চিত্তবৃত্তির অনুসারিনী সে যদি নাই হতে পারে, তাই বলে তাকে দোষ দেব? কেন? তার শিক্ষা, তার আবহাওয়ার সংস্কার হয়ত তার প্রতিকূলে—সে কি করবে? আসল কথা সে স্ত্রী, তাকে পায়ের বেড়ী করে রাখতে চাইনে, সেটা আমাদের (principle) প্রিন্সিপলের বিরুদ্ধে—এই মানুষের মন নিত্যমুক্ত, সেই নিত্যমুক্ত মনেরই মুক্তি কামনা করে আমরা বেরিয়ে পড়েছি।

আমি দেখলুম লোকটা বদ্ধ পাগল, একে আর পুলীশের গহ্বরে দিয়েই বা লাভ কি? তা ছাড়া জেলকে, মৃত্যু-ভয়কে যার সমানই তুচ্ছ জ্ঞান...না, এ রকম লোকের বিরুদ্ধে শক্তির অপব্যবহার করতে চাইনে।

(২)

যাঁরা ভাবেন, বড়বাবুর পোষ্টটা মোটেই অসাধারণত্ব পূর্ণ নয়, যে কোন লোক ঐ পোষ্টে বসতে পারে, এখন তাহাদিকে ডেকে দেখাতে ইচ্ছে করে। সাহেবের কাছে প্রত্যেক দিন কত যে বিষয়ের রিপোর্ট দিতে হয়, তা আমিই জানি। আজকাল কি দিনকালই পড়েছে। সাহেব যেন সর্ব্বদা তেরিয়া হ'য়েই আছেন, এত করে দুবেলা দুশো সেলাম দেই—একটু মন পাইনে। সাহেব সেদিন স্পষ্টই বল্লে—"কই বাবু, এদ্দিনের মধ্যে একটা লোককেও জেলে দিতে পারলে না; কি কাজ করচো বুঝতে পারিনে?"

আমি সাহেবকে স্পষ্টই বল্লুম—"সাহেব, ওদের জেলে দিলে হবে কি—ওরা যে রক্তবীজের বংশ। অজয়ের আশাপথ বন্ধ করলুম; দেখি আর একদিন আর একজন এসে লেকচার ঝাড়চে, তার লেকচারে আবার একটু নতুনত্ব আছে। সে কতকগুলো জোয়ান কুলী ছোঁড়াদের নিয়ে পড়েছে;—তাদের বলছে, এ বয়সে তোমাদের একটা ঝুটলেই ওরি বিয়ে করলেই কর্ত্তব্য শেষ হবে না, কারণ কুলীর বংশবৃদ্ধি দেশে অনেক হয়েছে, এখন তার অপেক্ষা বড় কাজের জন্ত নিজেদের সুখ সৌভাগ্য ও ভবিষ্যৎ বলি দিতে

হবে। কেবল মনে মনে জপ করতে হবে, "ভারত-বর্ষের উনত্রিশ কোটী কাঙাল আমার ভাই; তাদের জন্য নিজেদের আহুতি দিতে হবে।"

সাহেবও শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, কিন্তু তাদের পথ বন্ধ করবার একটা উপায় কি আমাদের সাহেবের হাতে নাই?

সাহেব আবার আমায় উৎসাহ দিয়ে বল্লেন, তার জন্য ভেবনা বড়বাবু। যদি ভাল রকম উন্নতির আশা করতে চাও, ভাল রকম ষ্টেপ নাও।

আর কি ষ্টেপ নেব? আমি আমার মাড়োয়ারী বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে, এই সব ভবঘুরেদের ঘুস খাওয়ার মনে করলুম। অন্ততঃ তারা আমাদের মত বড়বাবুদের লাহস-সুদুস ভুঁড়ির দিকে চেয়ে, নিজেদেরও সেটা পেতে, যদি সাহেব ভজতে চেষ্টা করে—তা হলেই বা সেটা মন্দ হবে কি?.. অন্ততঃ বড় রকম একটা কিছু করতে না পারলে, আমার চাকরীতেও ভদ্রস্থ নাই।

আমার মাড়োয়ারী-বন্ধু কলকাতা হতে একটা যুক্তি পরামর্শের জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। রেলের কারবারে তাঁর সঙ্গে আমার বিশিষ্ট রকম হৃদ্যতা আছে। তিনিও আমার জন্য তাঁর যথাশক্তি ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হবেন না। পাম্পুকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে উঠলুম; কখন্ বা কবে ফিরবো, সে সম্বন্ধে কারও কাছে কোন জবাবদিহি করবার কিছু ছিল না। আমার স্ত্রী অনেককাল হতে জেনেছেন মানুষে বড় বাবুর পোষ্ট পেলে, ওরকম বড়বাবুদের নীতিধর্ম্ম যদৃচ্ছাচার ও আনুষঙ্গিক চরিত্র আদি করে অনেক বিষয়ের মাথা খেতে হয়, এবং সেগুলা সব অর্থ দিয়ে ঢাকাও পড়ে যায়।

নিউ থিয়েটারের সামনে এসে দেখি, ও ফুটে দীর্ঘদেহী অজয়, এ ফুটে আমার মাড়োয়ারী বন্ধু হরিকিষণ। হরিকিষণের যেমন রূপ, তেমনি বেশ-বিন্যাস, পোষাক-পরিচ্ছদের ঘটাই বা কত, হাতে হীরার আংটিগুলো দপ্ দপ ক'রে জ্বলছে, আশে-পাশের সম-পদীয় পারিষদবর্গ তার একটি মুখের কথার অপেক্ষায় উদ্গ্রীব হয়ে ঘুরছে। হরি-কিষণ তাদের অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে। কিন্তু তাদের মধ্যাধার কাছে আমার বড় বাবুর কতটুকু? কুবেরের ঐশ্বর্য্যে তারা সারা বাঙ্লার ব্যবসাটাকে চাতের মুঠার মধ্যে রেখে দিয়েছে।

হরিকিষণ আমায় জলযোগের ঘরে নিয়ে যাবার মনস্থ করলেন। তখন কনসার্ট বাজছে, আমি বল্লুম, ব্যস্ত হবার কি প্রয়োজন আছে? বাবু সাহেবের যখন অতিথি হয়েছি তখন সাহেবের অতিথি-সৎকারটা করতেই হবে। আসল কথা, আমার দৃষ্টি তখন ও ফুটের অজয়ের পানে স্থির-নিবদ্ধ ছিল। আজ আর তার গলায় একটা ছেঁড়া নেকড়ার আলখেল্লাও নাই, হাঁটুর ওপরে ওঠা পরণে একটা খাদির কাপড়, আর গায়ে একখানি খাদির চাদর। ব্যস্, আর কিছু নাই—সবার উপরে তার বড় চোখ দুটো যেন সাঁঝের আঁধারে বাঘের চোখের মত জ্বলছে। আমি আজ ওকে জয় করবোই, জয় অর্থ দিয়ে—নয় জেলে ঠেলে দিয়ে—

হরিকিষণকে ডেকে চুপি চুপি বল্লুম—"বাবু সাহেব আমাদের কুলীবাড়ীর ঐ নাগাসন্ন্যাসী দেখুন।"

হরিকিষণ খানিক তার মুখের দিকে চেয়ে তারপর বল্লেন, "আপনাদের কেন যে ভাবনার সীমা নেই বুঝতে পারিনে; ওরা আমাদের কি করতে পারে? চলুন খেয়ে দেয়ে থিয়েটার দেখা যাক।"

সিঁড়িতে পা-টি কেবল দিয়েছি, এমন সময় গম্ভীর কণ্ঠে কে ডাকলে, "নিতাই বাবু শোন, ঠিক যা ভেবেছি, সেই হাংলা শ্মশান-কুকুরটাই বটে—"

আমি কোন উত্তর না দিয়ে, সটান উপরেই চ'লে যাবার মতলব করলুম;—না, আবার আমার পেছনটায় টান পড়ল। যথেষ্ট বিরক্ত হ'য়ে বল্লুম,—কি অসভ্যের মত নিতাই বলে ডাকছ? তোমায় কে চেনে, আর তোমার সঙ্গে সম্পর্কই বা কি?

একেবারে তখন ভুলে গিয়েছিলুম যে, ওর সঙ্গে ছেলেবেলাকার বন্ধুত্বের জোরেই আজ আমার এ বড় বাবুত্ব, সেই তার দাদাকে বলে চাকরীতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

অজয় কোনপ্রকার ভূমিকা না করে বেশ খোলসা করে বল্লে, কোন সম্পর্ক নাই, শুধু মনুষ্যত্বের সুবাদে তোমায় সাবধান করে দিতে এসেছি। তুমি যাদের সঙ্গে মিশছো, যে বিলাসিতায় ডুব দিতে চাচ্ছো, সেটা শ্রেয়ের পথ নয়—সর্ব্বনাশের পথ।

আমার মাড়োয়ারী বাবুটির ইঙ্গিতে দুটো চোপদার এসে তার সামনে রুখে দাঁড়াল, আর আমার পাশুও ইতাবসরে তালটুকে গর্জ্জে উঠল। চারিদিকে একটা হৈ হৈ প'ড়ে গেল। থিয়েটারের ম্যানেজার শুদ্ধ এসে উপস্থিত হ'লেন।

আমি বল্লুম—ওকে এক্ষুনি পুলিশে দেওয়া চাই-ই, ও শান্তি ভঙ্গকারী।

ম্যানেজার বল্লে—তা ওকে দেওয়া হবেই। অনেকবার জেল খেটে এসেছে, পুলীশও ওকে লুকে নেবে।"

ঘরের ভিতর তখন সোডা, লিমনেড, ব্রাণ্ডি, কাটলেট আদি ক'রে একপ্রস্থ সাজান শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। সন্ন্যাসী অজয় ঐ গুলোর পানে চেয়ে যা বলতে লাগল—তা আর কহতব্য নয়। বলতে লাগল, যা সব ডাকাতের ধন, গরীবের বুকের রক্ত জল করা পয়সা হতে ঐ সব রক্তের ভেলা তৈরী হ'য়েছে; রক্ত না খেলে তোদের নধর অধরে হাসি ফুটবে না! ওঃ—একদিকে রাস্তার ধারে মানুষ একবেলা একমুঠো পাচ্ছে না, আর এদের টিফিনের আহার কাটলেট-ব্রাণ্ডি। এতখানি প্রভেদ স্বর্গে আর মর্ত্ত্যে—না তারও বেশী!"

আর বেশী লেকচার দেবার তার অবসর হলো না। ইতাবসরে পুলীশ এসে তাকে শ্রীমন্দিরে টেনে নিয়ে গেল। দিনকয়েক পরে খবরের কাগজে পড়লুম ছয়টিমাস জেল-আই হ'য়ে গেছে। সাহেবকেও কাগজখানা দেখালুম,সাহেবও খুব খুসী হ'য়ে গেলেন। এর পর হ'তে আমার মেজাজ আর পাড়াগাঁর দিকে থাকতে চায় না, প্রত্যেক দিনই কলকাতা আসার সাধ করে। সবটুকু খুলে বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়; যদিও এটা ঠিক, আমি যা সম্প্রতি ভোগ কচ্চি এবং যাতে মজে আছি,সে স্বর্গলোকেরই কামনার ধন, শুধু ভাগ্যবানের আশ মেটাতে এ ধরাধামে এসে অবতীর্ণ হয়েছেন। নামটি তার বিজলী। আকাশের বিজলীর মত তার চাহনি, হাসিটুকুও কি যেন কি রহস্য দিয়ে ভরা। তাকে যতবারই দেখি, মনে হয় যেন আর এক জন্মে তারও জন্মের আগে আমার রঙীন স্বপ্নের রঙীন স্বপ্নের মাঝখানে তাকে দেখেছিলুম। কোন দিন পাব, এ আশা হয়নি; আকাশের দেশে সে এক চাঁদের মতই অনস্থিল—আর এই উষাহ বামন বাসনার আগুন নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর বড়বাবু বলে গিয়েছিলুম, এখন সেই বিজলী আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে—হাঁগা বড়বাবু আমায় চরণে রাখবে ত? আমার মাড়োয়ারী বন্ধুও তাকে দেখে তার রূপের তারিফ করে গেছে।

দেখ্‌ছি, বয়সের সঙ্গে যৌবনও ফিরে আস্‌ছে। আগে যে যৌবনকে কোন দিন হাতের কাছে পাই নি, যা কেবল অভাবের আর পীড়নের তাড়নায় অকাল বার্দ্ধক্যে টেনে আনছিল, এখন নব-জীবনের সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। আমার স্ত্রীও আমায় বলেন—তোমার পাকা চুল কালো হচ্ছে! হা রে অনাগত যৌবন! যে শুধু অতৃপ্ত কামনা, বাসনাগুলোকে নিয়ে যৌবনের উষালোকে চকিতের মত তার বিচিত্র বর্ণচ্ছটা নিয়ে উদয় হয়েছিল, বেলা শেষে আজ আবার সে মোহন ইন্দ্র জাল রচনা করতে লেগে গেল।

বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই বলতে লাগল—বড় বাবু, তুমি রোজ রোজ ছোকরা বনে যাচ্ছো কি অমৃত-আস্বাদনে বল দেখি।

আমি তাদিকে কি বলবো ভেবে পাইনে। সত্যই মনে আসেও এমন তারুণ্যের স্ফূর্তি কোনদিন অনুভব করিনি। সেই গলি, রাস্তার ধারের সাঁাতসাঁতে আধার ঘরের অতীতকে মনে পড়লে, সর্বশরীর উপস্থিত হয়। কিন্তু কেমন দৈবের গতি, বিজলীর ঘরে উঠতে যাচ্ছি—দেখি গলি রাস্তার ধারে বন্ধু করালীচরণ। তিনি তাঁর ছেলেটির হাত ধরে রাস্তায় বায়ুসেবনের জন্য বেরিয়েছেন। আমায় দেখেই বলে উঠ্‌লো—কি হে better chance পেয়ে আর যে পুরাণো বন্ধুদের মনে করো না।

আমি বাহাত্তর নম্বরের বাড়ীটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে দেখিয়ে আস্‌তে বল্লুম। সে ছেলেটাকে বাড়ীতে রেখেই আস্‌চি ,বলে চলে গেল। আমি জমাট দুধ আর জল-সাগুর আহারপুষ্ট করালীর ছেলেটীর কথা ভাবতে-ভাবতে বিজলীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। বিজলীকে বল্লুম, আজ কোন বড়-গোছ ইয়ারের আমদানী হবে,সব যোগাড়-যন্ত্র ক'রে ফ্যাল।

খানিক পরে গায়ে এক সুদীর্ঘ পাঞ্জাবী ঝুলিয়ে ইয়ার এসে উপস্থিত হলেন। বিজলী বলে উঠ্‌লো—হাঁ বড় বাবু, এই তোমার বড় গোছ ইয়ার নাকি? হায় হায়! ও অখেদোটীকে এ মহলে কে আর না চেনে বলো। বিজয় ডাক্তার থাকতে, বিজয় ডাক্তারের কাঁধে চেপে বেড়াতো। এখন ডাক্তার দেশ ছেড়ে গেছে, উনি এখন ডাক্তারের তাদের কুৎসা করে বেড়াচ্ছেন। তার কারণ বড় লোকের ছেলে ওর সঙ্গে দলে মিশে আহারাদের পথে চল্‌তে পারেনি।

করালী গম্ভীর হ'য়ে বল্লে—দেখ্ বিজলী, তোর লম্বা লেক্চার রেখে দে। তোর বাবুই অজয়কে দু'টি মাস জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

আমাকে বিজলী বলে—হাঁ বাবু, সত্যি তাই নাকি?

আমি তা না না ক'রে বল্লুম—হাঁ কতকটা তাই বৈ কি; কিন্তু কি করবো; আইনও শান্তি রক্ষার জন্য যে—

বিজলী খানিক কি ভেবে স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে, তারপর আপনার কাজে বাইরে বেরিয়ে গেল। আমি করালীকে জিজ্ঞাসা করলুম, হাঁ করালী, বিজলীও অজয়কে চিন্‌তো নাকি?

করালী বল্লে তা আর চিন্‌তো না—? সে যে বেজা-বাড়ীতেও এসে তাদের মানব-ধর্ম্ম প্রচার ক'রে যেতো।

আমি বল্লুম বল কি?

করালী বল্লে—হাঁ। আমি ভাবতে লাগলুম,—তাই ত, এ সমস্ত সমাজের পরিত্যক্তাদের পেছনেও তারা মনুষ্যত্বের আহ্বান নিয়ে ফিরতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি, আমি জিজ্ঞাসা করলুম হাঁ—করালী, তার স্ত্রীর খবর বলতে পারো?

করালী বল্লে,—কোন্ স্ত্রী আর অমন ক'রে স্বামীর ঘর করতে পারে ভাই বলো? স্ত্রী তবে বাপের বাড়ীতেই রয়ে গেছেন; এদিকে খোদ কর্ত্তার কৃপাপক্ষের স্ত্রীও একটি বেছে নিতে বিধা করেন নি। দেখ্‌তে চান দেখাবো!—

দেখ্‌ছি, ধরা আমরাই কেবল পড়িনি। যাদের বাজারে যথেষ্ট সুনাম আছে, তারাও মোহিনী নারী-চক্রের মাঝখানে আপনাদের মাথা লুটিয়ে দিয়েছেন। বুকে অনেকটা বল পাওয়া গেল। বল্লুম—কোথায় হে কোথায়? আমায় একদিন যে দেখাতে হবে। করালী বল্লে—দেখ্‌লে কিন্তু আর ভাতে রুচি হবে না,তা বলে দিচ্ছি। এক পানওয়ালী মাগী তারই মেয়ে····· থাকে কেমন ঘরে তা যদি দেখ, তোমার তাক লেগে যাবে দাদা; যেমনি মাগীর চেহারা, তেমনি তার আসবাব পত্র। আবার মাগীর ছেলে মেয়েও নাকি কি একটা আছে শোনা যায়। আবার সেই বাড়ীতে হাল ফ্যাসানের একটা চরকা স্থাপনও করা হয়েছিল। আরে বাবা, শাক দিয়ে ঢাকলে কি মাছের গন্ধ ঢাপা থাকে—? কংগ্রেসে নাম লেখালেই বা কি হবে,

খবর পরশেই বা কি চতুর্ভুজ হবে। ছাঃ—ছাঃ ছোঁড়াটার উপর অনেক আশা করা গিয়েছিল, ছোঁড়াটা তেম্‌নি বয়ে গেছে। ইতিমধ্যে অনেকক্ষণ ধরে বিজলীকে অনুপস্থিত দেখে, ঝিকে দিয়ে বিজলীকে ডাকতে পাঠালুম। বিজলী একটা স্নাতির বোতল খুলতে খুলতে বলতে লাগল—তোমরা যাই করো বাবু, আর যাই বলো বাবু, অজয়ের নিন্দে এখানে ক'রতে পারবে না।

করালী বল্লে—শুনচো বড় বাবু, ওঁরার বুক ফেটে যাচ্ছে,—

বিজলী ধীরভাবে বল্লে বুক ফাটে কি আর সাধে? বুক ফাটার কাজ করলেই আপনি কাঁদতে সাধ যায়।

আমি কতকটা মুখ টিপে বল্লুম—সে একটা পেত্নীকে নিয়ে ঘর কচ্ছে বলে বুঝি?

বিজলী তার দীর্ঘ কৃষ্ণ আঁখি-তারা দুটো বিস্ফারিত করে বললে,—মিথ্যে অপবাদ মানুষকে দিও না বড়বাবু, অজয় মানুষ নয় দেবতা। মানুষকে এতটা ভালবাসা মানুষ হ'য়ে কেউ যে পারে, তা ধারণাতেই ছিল না। পাগলীর রূপ-যৌবন কিছু ছিল না, তবু সেই তা সেই সর্ব্বস্ব হারা মেয়েটাকে কি ভাবে বুকে ক'রে তুলে এনেছিল, তা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। একটা সমাজের ছুঁড়ে-ফেলা মেয়েমানুষকে, আর তার কচি মেয়েটাকে রাস্তা হতে তুলে এনে বাঁচালে যদি অমানুষের কাজ হয়, তা অজয় করেছে। শীতে গায়ে দেবারও একখানা কাপড় ছিল না; অজয় নিজের গায়ের কাপড়খানি দিয়ে তাকে আর তার মেয়েটিকে ডেকে এনেছিল। তোমরা তেমন মানুষকে অত বড় একটা মহাপ্রাণকে ভেসে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছো। তা যাও, কিন্তু আকাশে যদি কোন দেবতা থাকে, তবে তিনি তা দেখ্‌ছেন।

আমাদের এ আনন্দ-নাট্যে দেখছি অজয়কে এনে ভাল কাজ করিনি। সব কেমন খাপ ছাড়া হ'য়ে ভেসে গেল। বন্ধু করালীচরণও ভাল রকম সুবিধে করতে পারলেন না। আমিও বারোটার ট্রেণে বাড়ী এসে হাজির হলুম।

(৩)

আমার ভিতরটাতেও কেমন একটা পরিবর্ত্তন আসতে লাগল। কিন্তু সেটা ক্ষণস্থায়ী। ঘরে এসে পত্নীর বিরস বদন দেখি; সর্ব্বদাই সে যেন কি এক অনুযোগের মিনতিভরা জিজ্ঞাসু ছবি নিয়ে উৎসুক আছে মনে হয়, সুযোগ আর তার ঘটে উঠ্‌লো না। আমি জানি, সে কি জিজ্ঞাসা করবে; বলবে—দাসী বলেই কি এতটা অবহেলা! আমিও তাহার উত্তর ঠিক ক'রে রেখে দিয়েছি। এখন কিছুকাল তোমার দাদার পেটেই থাকতে হ'চ্ছে; আমি এখন ভোগ করবো। কথাগুলো স্পষ্ট বল্লে কড়া শোনায় পাছে, তাই মনের খাতায় জমা ক'রে রেখে দিয়েছি। তা ছাড়া আমার সময়ও নেই। দিবারাত্র ঘুরতে হচ্ছে, সাহেবের কড়া হুকুম এ অঞ্চল হ'তে যেন কো আন্দোলন তাড়াতে হবে। কিন্তু তাড়া দিতে গিয়েই দেখছি, আগুনে কেবল ফুৎকারই দেওয়া হ'য়েছে। যখন দেখি গান্ধীর দলের চেলারা মদের দোকান গুলো একবারে বন্ধ ক'রে দিলে, জোরে নয় জুলুমে নয়, তখন ঐ অজয়কে মনে পড়ে। কি স্বার্থের তাড়নায় সে সংসারের সব সুখ ত্যাগ করে, এই দুর্গতির ব্রত মাথা পেতে নিয়েছে—কিছু তার উদ্দেশ্য খুঁজে পাইনে। যতই উদ্দেশ্য পাইনে, ততই তাদের উপরে ভয় হয়, ভক্তি হয়। দেশের দুঃখী মানুষ কাঁদবে, তার জন্য তাদের মাথা ব্যথা কেন? ওরা ত পদতলচারী দুঃখী, ওদের শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই। আমাদের জন্য প্রাণপাত করবে বলেই, ভগবান ওদের সৃষ্টি করেছেন। অজয়ের দল কিছুতে তা মানবে না; বলবে, মনুষ্যত্বের পথে তাদেরও জাগিয়ে তুলতে হবে। কিছু ভেবে পাইনে। রাত্রে যখন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ি, তখনও দেখি। অজয় আমার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে বলছে,—বন্ধু ফেরো; ফেরো, এ তোমার

বিজয়-যাত্রা নয়; একেবারে ধ্বংসের কিনারায় ক্রমে উপস্থিত হয়েছো। কিছুই বুঝতে পারিনে, আতঙ্কে প্রাণ শুকিয়ে ওঠে। হাজার বার নিজেকে নিজে স্মরণ করিয়ে দেই যে, সে জেলে আছে। এটা ভ্রান্তি মাত্র; তবুও বুকের কাঁপুনি থামে না।

সেদিন তন্দ্রায় তৃষার্ত্ত হ'য়ে জল চাইলুম। ওনরজনের মা জলের পরিবর্ত্তে কোথা হ'তে এক গ্লাস রক্ত এনে দিলে, আমি অবাক হ'য়ে গেলুম। নিজের দাসী স্ত্রীও কেপে উঠে কলিজে নিংড়ে রক্ত এনেছে তার স্বামীর জন্য?

পেছনে অদূরে কে অট্টহাস্য ক'রে বলতে লাগলো—মানুষের রক্ত নাকি তোমাদের বড় ভাল লাগে, খাওনা, খাও! দুদিন বেহুঁস হুলবে বটে, তারপর—তারপর আবার সেই অট্টহাসি;—এমন বিপদেও মানুষে পড়ে। তাই মদটদ্ খেলে, আর কলকাতায় থাকলে অনেকটা ভাল থাকি। এতটা আতঙ্কিত হয়ে থাকতে হয় না। কিন্তু যেখানেই যাই, ছায়ার মত অজয়ের দলের চেলা গুলো পেছনে লেগেই আছে; ওদের কি বোঝাব,—আমরা শ্রেণ্ আমাদের মুনিবের আদেশ পালন করি বৈত না।

সেদিন আবার অজয়ের সঙ্গে চোখো-চোখী দেখা। মানুষের চোখের দৃষ্টি যে এতটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হ'য়ে জলতে পারে, তা জানতুম না। কবে জেল হ'তে খালাস পেয়েছিল খবরও রাখিনি, কিন্তু বাছা আবার খাঁচার মেয়াদ সাঙ্গ করে বেরিয়েছে। জেলখানায় এত অনাচারেও এতটুকু কাহিল ক'রে ফেলতে পারেনি। লোকে বলে, ওরা নাকি আধ্যাত্মিক কি অমৃত বটি খেয়েছে, এত দিনের পর আবার আমার সর্ব্বাঙ্গও কেমন কেঁপে উঠলো; কি একটা কথা তাকে বলতে যাচ্ছিলুম বলতে পারলুম না।

অজয় আমার দুর্ব্বলতা ধরে ফেলে, অস্বাভাবিক হেসে বলে উঠলো,—বন্ধু আমায় দেখেই চমকে উঠ্‌লে যে; এই ত খাসা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছ?

আমি কতকটা লজ্জিত-স্বরেই বল্লুম,—তুমিও ত বেশ চলেছ বন্ধু! ঘাড় উঁচু ক'রে সে বল্লে— হাঁ চলেছি বটে। কিন্তু তোমার চলায় আর আমায় চলায় প্রভেদ আছে। তুমি ছুটেছ নিজের জন্য, কিসে স্ত্রী-পুত্র স্বচ্ছন্দে পায়ের উপর পা রেখে চির সুখে থাকতে থাকতে অন্তিমে তোমার নাম নিয়ে মরতে পারে। আর আমি চলেছি পরের জন্য, নিন্দা আর ভ্রুকুটি, এই হ'য়েছে আভরণ। তবুও আমায় চলতেই হবে; দেশের সহস্র অনাথ-আতুরের জন্য-যদি তারা ধ্বংস হ'তে বাঁচতে পারে তাই ছুটেছি মরণের পথে পথে, যে পথে প্রতি মুহূর্ত্তে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ চলেছে।

আমি বল্লুম,—এতে তোমার লাভ কি! সে আবার পাগলের মত হো-হো ক'রে হেসে বলে উঠলো—লাভ? স্বর্গে?—মরণের মধ্য দিয়েই অমৃতকে পাব। সত্যি যেন মরণের ভাব। আগুনের দিকে পতঙ্গের যেমন একটা একটানা গতি…তেমনি গতি …দুর্নিবার…! এক লক্ষে ছুটেছে—প্রাণটাকে যেন টাকে গুঁজে, একটু প্রাণের উপরে দুঃখ দরদও নেই। যে নৈতিক প্রাণ বাঁচলে কত লাভ, যে প্রাণ বাঁচিয়ে বাঙালী এমন রত্নময় সোণামের সম্মান কুড়িয়ে নিয়েছে, সে প্রাণের উপরেও এতটা বিরাগ; মতিচ্ছন্ন—!

সোফারকে বল্লুম,—চলো বাবা, একটু তাড়াতাড়িই ফিরতে হবে। আবার কোন্ হতভাগার সামনে যে পড়তে না হবে, তাই বা কে জানে?

বিজলী এর মধ্যে অবস্থার উন্নতিতে, গলি রাস্তা হ'তে সদর রাস্তায় উঠে এসেছে; সামনের ফুটপাথেই বিলিতি মদের দোকান, গান্ধীর দলের উৎপাতে তারও খরিদ্দার কম। তবু আমরা কজনা আপিসের বড় বাবু আছি বলে, বেহারীদের নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়নি। আমরা মুখে যদিও ভাই ভাদাদের সামনে স্বদেশী বলে চীৎকার করে থাকি, কিন্তু অন্তরে ভক্তির প্রাবল্য যে কতখানি, তার সাক্ষী এই নশ্বর

টুঃ বোঝেন। তোমরা বলচ, আমরা ভণ্ড ; তাও নই। চিরকাল চাষ ভোগ ক'রে এসে, আজ যদি সুখের স্বাদ পাই, কেন ত্যাগ করবো ? কে ত্যাগ করতে চায় ?

যখন বিজলী আর আমি এক মনে খাঁটা চালতে থাকে, সম্ভোগের রক্ত-সমুদ্রে পাড়ি জমাই, তখন মুখে বলতে কি, কিছু ভাবতে ইচ্ছা করে না ; ভাবতে মন যায় না,—মনে হয় অবিরাম এই ভোগের মধ্য দিয়া ভাবতে মন যায় না—মনে হয় অবিশ্রাম এই ভোগের মধ্য দিয়েই যদি জীবনের প্রতিটি দণ্ডের অবসান হয়, তবেই তার চরম সার্থকতা ! এর বেশী উপরের আধ্যাত্ম জগতের দিকে আমার লোভও নেই।

করালী গুণ্ডা সেদিন এসে ভারি এক তর্ক তুলে ফেলো—মদ চালতে চালতে লেকচার দিতে লাগলো, বাবা সন্ন্যাসীর দল তোমরাই বুঝি মনে করো সংসারে তোমরাই বড় জায়গাটায় বসেছো, তাদের থাকা একটুও নয়। ক্যাপিটালিষ্টদের খোসামোদ তোমাদের করতেই হবে। ওরা আছে বলেই মজুর দল খাটা, সেবার ক্লাস বলে এখনও টিকে আছে।

আরও কত কি যে আবোল তাবোল বকতে লাগল, তাতে কাণ দেবার আমার তত সময় ছিল না—আমি বিজলীর মুখের দিকে একদৃষ্টি দিয়েই চেয়ে ছিলুম।

সহসা এই রাত্রে রাস্তা হতে বহু কণ্ঠের একটা কোলাহল শুনতে পাওয়া গেল, কোলাহলটা ক্রমেই আর্ত্তস্বরে রূপান্তরিত হতে লাগল। আমাদের চাকরটা ছুটে এসে বল্লে, সর্ব্বনাশ, হুজুর দোর বন্ধ করুন, রাস্তায় একজন সার্জ্জেন মদের দোকানের কাছে একটা বাঙ্গালী বাবুকে বোধহয় একদম নিকেশ করে ফেল্লে—

বাইরের হৈ হৈ শব্দের সঙ্গে সে শব্দটা যে মিথ্যে নয়, তা পরিষ্কার বোঝা গেল, পরক্ষনেই অশরাপর দোকানীদের দরজাবন্ধেরও আওয়াজ পেলুম, আমার বীর বন্ধু করালী চরণ ঘরের মধ্যেও কেঁপে ফেঁপে স্থির হতে পারলেন না। নেশার ঝোঁকে পালঙ্গপোষের নীচেয় গিয়ে আশ্রয় নিলেন, আমাকে মিনতি করে বলতে লাগলেন, বোহাই নিতাই, গাড়ী কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে শিগ্গী একলা আছে, আমায় বাঁচিয়ো ভাই, আমি মারা গেলে কালহতে তারা পথে বসবে।

বিজলী একটা ধমক দিয়ে তাকে বল্লে, আপনি মেয়ে মানুষ কোথায় কে খুন হলো তার সংবাদ নেবার চেষ্টা করচি, উনি তক্তাপোষের নীচেও সুস্থির হতে পাচ্চেন না।

এমন সময় পাশের বাড়ীর রাণী এসে সিঁড়ি বয়ে খবর দিলে, ওদিদি, রাস্তায় অজয় খুন হয়েছে।

"অজয় খুন ?" আমরা সবাই একসঙ্গে চমকে উঠলুম। রাণী জানালাটা খুলে দিয়ে দেখতে দেখতে বলতে লাগল, অনেক লোক জমা হ'য়েছে, ঐ যে গাড়ী এসেও ফিরে গেল, আমরাও দেখলুম একটা ট্যাক্সি কতকটা লোক বোঝাই নিয়ে ভোঁ ভোঁ দৌড় দিল।

পালঙ্গপোষের নীচে হতে এতক্ষণে করালী চরণ বেরিয়ে এলো, ক্রমেই বিক্রম করতে লাগল, যেমন কর্ম্ম তার তেমনি শাস্তি। এদ্দিন খুন হয় নেই কেন তাই ভাবছিলুম, রাস্তার জাতের সঙ্গে লড়াই করা ওদ্দি যে সে কথা।

বিজলী তাকে ধমক দিয়ে বলে, তুমি আপনার বাড়ী গিয়ে ছেলে পিলে বাঁচাওগে ত, তোমার এত কথায় কাজ কি ? আর একটু মদ টানবে ?

করালী সেই মদের অপেক্ষায় সিঁড়িতে নেবেও দাঁড়িয়ে গেল, রামচরণ চাকর নীচে সিগারেট আন্‌তে গিয়েছিল, এসে বল্লে, অজয় বাবুর কোন দোষ ছিল না বাবু, মদের দোকানের সামনে মাত্র বলেছিলেন, ভাই সব বিলিতি মদটা কিনে দেশের মুখে আর চুণ কালী দিয়ো না—পয়সা দিয়ে পাপ কেনা এ কোন দেশের লোকই বরদাস্ত করতে

পারে না। দেশের মানুষকে দেশবাসীর সে পাপ হ'তে বাঁচাবার আইন সঙ্গত অধিকার আছে!

এই কথা না শুনে এমন গুঁতো দিলে যে ফিন্‌কিদিয়ে রক্ত ছুটে বেরিয়ে গেল। ঐ চাটের দোকানীটা বলছে, রক্তে বাবুর কাপড়খানি ভেসে গেছে, আশে পাশের সমস্ত গুণ্ডার দল আর দোকানীরাও ক্ষেপে উঠেছিল, অন্নদ বাবুর চাতের ইঙ্গিতে সব থামিয়ে গেছেন, আর বলে গেছেন 'এম্‌নি নিরপরাধের রক্তেই যদি পাপ মোচন হয়!' আমাদের বিজলী প্রায় কেঁদে ফেল্লে, একটা ভবঘুরের জন্য একটা বেশ্যার মেয়েরও মনের কোণে এতখানি চোখের জল সঞ্চিত থাকে তা জান্তুম না।—

আমি অট্টহাস্য করে বলে উঠলুম, তুই যে অবাক করলি বিজলী, অন্নদ তোদের কে?—

বিজলী খানিক গম্ভীরভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ব'সে রইল, তারপর চোখ মুছে বিছানায় এসে বসল।

বোধহয় সে তাদের কতখানি, তা ছুটে বলতে আমার কাছে প্রবৃত্তি হ'ল না, ভালই! একটা মদের বোতল টেনে নিয়ে এসে এক গ্লাস ঢেলে ফেল্লে, আমায় বল্লে, খাও।

আমি বল্লুম—তুমি নাও।

বিজলী বল্লে—নিচ্ছি।

কেমন যেন খাপছাড়া মনে হ'তে লাগল। এই একটু আগে মদ খেয়ো না বলতে, এক জন প্রাণ দিলে, আর আমরা এই মুহূর্তেই মদ নিয়ে বসে গেলুম। কি বিসদৃশ সৃষ্টি!

বিজলীর স্ফূর্তির জোর নাই দেখে বল্লুম, হাসপাতালে একবার যাবে, অন্নদ কেমন আছে না হয় দেখে আসবো?

প্রথমটা বোধ হয় বিজলীর সে কথায় প্রত্যয় হলো না, হারমোনিয়াটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে বেলো করতে লাগল; আমি বল্লুম, সত্যি বলছি কাল আমার ছুটি আছে, সময় ক'রে নিতে পারবো।

বিজলী হারমোনিয়মটা ছেড়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বল্লে চলো বড়বাবু, একবার ডেকে দেখে আসলেও আমাদের মত পাপী তাপীদের অনেক খানি মুক্তি। দেশের লোকের ভালর জন্য যে প্রাণ দিতে পারলে, তার শেষ সময়টায় আমরা একবার কাছেও দাঁড়াতে পারবো না? কিছুই তার করতে পারবো না জানি, তবু এক ফোঁটা চোখের জলও ত ফেলতে পারবো—

ভোর হ'তে না হ'তেই বিজলী চাকরকে দিয়ে কখন ঘটক ডাকিয়ে এনেছিল। আমরা এই আবছায়া ভোরের আঁধারে হাসপাতালের দিকে ছুটলুম। রাস্তার লোক চলাচল মাত্র কুচ্চিৎ, শুধু সারিবন্দী গ্যাস পোষ্টগুলা শেষ প্রহরের মরণ প্রতিক্ষায় কেঁপে কেঁপে জ্বলছে।

বিজলী বলতে লাগল, শুনেছ বড়বাবু, যার অন্নদ কাল জেল হ'তে খালাস পেয়েছিল, আর জেল খানা হ'তে বেরিয়েই, মদের দোকানের উপরে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করতে লেগেছিল, মরণ তাকে বেন টানছিল তুমি আমি তার কি করবো।

আমি বল্লুম—তুমি ঠিক জানো যে কাল মাত্র খালাস হয়েছিল?

বিজলী বল্লে—হাঁ। রাত্রে যখন তুমি ঘুমিয়ে, আমি পানওয়ালার কাছে গিয়েছিলুম সে যে আমাকে সব বল্লে!—কিন্তু আমাদের বৃথাই যাওয়া হচ্ছে! এতক্ষণ সম্ভব সব শেষ হ'য়ে গেছে।

কলেজ হাসপাতালে গিয়ে খবর নেওয়া হলো রুগী এখনও বেঁচে আছে, একটা পৃথক ঘরেই তাকে রাখা হ'য়েছে। কলেজের ছাত্ররা তার যথেষ্ট তদ্বির করছে।

ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখা গেল, পূবদিকের জানালাটা খুলে দিয়ে একটি তরুণী চুপ ক'রে অন্নদের মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে, তার হ'হাতে হুগাছিমাত্র লোহা, আর কোন আভরণ নাই। লাল

শাড়ির আঁচলটি ধুলায় লুটাচ্ছে। তরুণী এক স্থির একাগ্র দৃষ্টিতে অভয়ের মুখের দিকে চেয়ে আছে, যেন সে তার প্রত্যেকটি নিঃশ্বাস গণনা করে নিচ্ছে! তার মাথার চুল গুলি উস্কো খুস্কো! ঘরের মধ্যে আমরা ঢুকলুম, সে দিকে তার কোন ভ্রুক্ষেপ নাই। বিজলী বল্লে—ঐ তার স্ত্রী অনীতা!

"এই অনীতা?" উষার আকাশের লালিমায় তার ললাটের সিঁদুরের রেখা যেন শুক তারার মত জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে!

বিজলী জিজ্ঞাসা করলে, কেমন রয়েছেন এখন অভয়?

অনীতা বল্লে—ভালই! প্রাণ পাখী দেহ পিঞ্জর ছেড়ে বিদায় নিতে আর বিলম্ব নাই।

স্বামী মরণের পথে—বেশী রকম উদ্বেগের লক্ষণ দেখা গেল না। আমরা স্ত্রী হলে এতক্ষণ না জানি কত হা হুতাশে ঘর ভরিয়ে তুলতো। এর আছে মাঝে মাঝে ছোট্ট একটি ক'রে দীর্ঘশ্বাস, শুষ্ক অশ্রু গিরীর আকাশের মত। তা শুধু আকাশেই মিশিয়ে যাচ্ছে, পৃথিবী কাঁদছে না।

সহসা কয়েকবার কেঁপে উঠে অভয় চোখ মেলে চাইতে চাইলো। রক্তের দাগে চোখ জিজে গিয়েছিল, অনীতা একটা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে চোখ দুটি মুছিয়ে দিয়ে খুলে দিলে।

"চমৎকার প্রভাত!" বলে অভয় একবার উঠে বসতে চাইল। অনীতা উঠ্‌তে না দিয়ে শুইয়েই রা'খল। বিজলী ইতাবসরে এক ডাক্তারকে জিজ্ঞাস ক'রলে বেদানার রস দিতে পারা যায় কি ডাক্তার বাবু? ডাক্তার বাবু বল্লে—হাঁ। সঙ্গে বিজলী কখন আসবার সময় কাপড়ের ভিতরে বেদানা নিয়ে এসেছিল দেখিনি, এখন সে বেদানাটা ভেঙ্গে অনীতাকে বল্লে, একটু রস দাও দেখি অনীতা?

অনীতা একটা গ্লাসে ক'রে প্রায় আধ গ্লাস বেদানার রস অভয়ের মুখে ঢেলে দিলে, অভয় সব রসটুকু গিলে ফেলে কতকটা যেন বল পে'ল, বলতে লাগল সত্যি তৃষিত হ'য়ে পড়েছিলুম অনীতা! সারারাত ধরে কেবলি এক রক্ত সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছি শুধু! কত যোজন বিস্তার পরিধি! তুমি এত সাঙ্গ করতে পারবে অনীতা? কিন্তু পারা চাই ই!

আমি এতক্ষণে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলুম, বন্ধুর, হাঁ অভয় বাবু কেন আপনার উপরে এ অত্যাচার হলো, আপনি তার কিছু কারণ জানেন কি?

অভয় খানিক একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রইল, সে যেন আপনার আপনাকে বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারছিল না, এ শেষ প্রহরে হাসপাতালে আমি যেন নিতাই কি করে, আমিই তাকে জেলে গোড়ার পুরেছিলাম।

আমার দিকে চেয়ে বল্লে—অত্যাচার কে বলে নিতাইবাবু? মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করতে পারে না—

এমন সহজ অবিকৃত কণ্ঠে ব'লে যে আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম। এতখানির বিনিময়ে কি ক'রে যে এতটা ক্ষমা করতে পারছে এই মৃত্যু সময়ে পর্য্যন্ত, তা বুঝে উঠ্‌তে পারলুম না। অভয় আবার আমার দিকে চেয়ে বলতে লাগল, দেখুন নিতাই বাবু, সৃষ্ট দৃষ্টির মানুষ তারা জানে না কোথায় তাদের ভাল, কোথায় তাদের মন্দ, মানুষের এই অধোগতি দেখে, এক এক সময় আমার কান্না পায়—সত্যি কান্না পায়। কিন্তু আমার প্রাণের ঠাকুর বলেন, কাঁদিসনি, যে একুলও দেখিয়েছে, সে ওকুলও দেখাবে, দয়াল দেবতা রাবণকেও অনুগ্রহ করে, আবার রামকেও কৃপা করতে বিমুখ নন। এই ঘাত প্রতিঘাত নিয়েই তাঁর নাট্য লীলা তরঙ্গ আছে, একদিন মানুষ মানুষকে ঠিক আসল মানুষ রূপেই বুঝতে পারবে, তখন তার সব অহমিকা ভেঙ্গে যাবে।

আমি কি জিজ্ঞাসা করবো ভেবে পেলুম

না, সবটা মিলে চারিদিককার দৃশ্য পট আমার মনের কোনে গোপন গুহাপুরে কি আগুন জেগে তুলতে লাগল!—কে যেন কেবলি আমাকে আঘাত ক'রে বলতে লাগল—মূঢ়! এমন মানুষকেও তোরা জেলে পুরে শাস্তির কামনা করে ছিলি? আমি জিজ্ঞাসা করলুম—বেশ একটু ভাল বোধ হচ্ছে ত অজয়!

অজয় একবার ম্লান হাসি হাসল, তা'র কণ্ঠ চিরতরে নীরব হলো, আর কোন উত্তর দিতে পারলো না, ব্রাহ্ম মুহূর্তে সূর্য্য উদয় হলেন, আর একটা প্রাণ আলোর সাগরে কোথায় হারিয়ে গেল—"নীলপাখী চৈতন্য সাগরে কি আনন্দ গান ক'রতে উধাও হ'য়ে উড়ে গেল, কে জানে।"

"মুক্তি"

(মহারাজকুমার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়)

(১)

থাক্ কথা—কোন কাজ নাই।
সুদীর্ঘ জীবন জুড়ে যে দুরাশা ঘরে ঘুরে
আজ তাহা পুড়ে হোক্ ছাই॥

(২)

মানবের অন্তহীন, দুঃখে ভরা রাত্রিদিন—
বেদনার বোঝা—বহা শির,
ললাটের পরে লিখা আজন্ম দহন-শিখা
উচ্ছ্বসিত নয়নের নীর॥

(৩)

নয়নের দুটি আঁখি, উদাস চাহিয়া থাকি
গণিতেছে জীবনের দিন,
রজনীর কোলে বসি শরতের পূর্ণ শশী
ধীরে হয় পরমাণু ক্ষীণ॥

(৪)

দিবসের দীর্ঘকায় সন্ধ্যার ধূসর পায়
মিশিতেছে বার বার করি।
বসন্তের অন্তরালে কাহার উত্তপ্ত ভালে
নিদাঘের লেখা উঠে ভরি॥

(৫)

শ্রাবণের ঘন রাতে অনন্ত করকা-পাতে
কি যাতনা জ্বলি উঠে হায়।
শরতের সোণা মাঝে কাহার মূরতি রাজে
শেফালিকা ঝরে কার পায়॥

কূলে কূলে ভরা নদী কি লাগিয়া নিরবধি
ধেয়ে চলে চির নিশিদিন।
কাহার পরশ লাগি সাগর রয়েছে জাগি
আঁখি মেলি মহা-উদাসীন॥

(৭)

থাক্ কথা—নাহি প্রয়োজন,
জনমের হিয়া মাঝে গোপনে লুকান আছে
বিদায়ের শত আয়োজন।

(৮)

নিমেষের লাগি আসি ঘোরা সুধু ভালবাসি,
নিমেষের লাগি দীপ জ্বলে,
নিমেষের লাগি হায় সিক্ত করে বসুধায়
দিশাহীন নয়নের জলে॥

(৯)

বসন্তের ফুলবনে বসে থাকি আনমনে
স্বপনের কোন—ধন লাগি।
কোন-সে হারাণ-নিধি জুড়িয়া বসেছে হৃদি
কার লাগি নিশীথিনী জাগি॥

(১০)

কোন—সে গোপন-কথা প্রণয়ের কি-বারতা
শুনিবার তরে হিয়া কাঁদে
কাহার আঁখির ধার ভুলাইয়া গৃহ দ্বার
ছলনার শত পাকে বাঁধে ॥

(১১)

কাহার নয়ন পাতে চমকিয়া উঠি রাতে
বুকে জলে দুরাশার মণি।
মলয়ের মৃদু শ্বাসে কা'র কথা মনে আসে
দূরে বাজে মুরলীর ধ্বনি ॥

(১২)

মিলনের আয়োজনে কাঁদে হিয়া অকারণে
সব সুখ ব্যর্থ মনে হয়।
জীবনের কলতানে অফুরন্ত গন্ধগানে
কা'র কথা মনে গেঁথে রয় ॥

(১৩)

থাক্ কথা—স্মরিব না আর।
ক্ষণিকের লাগি এই নিখিলের নিয়মেই
বহি যাব বেদনার ভার ॥

(১৪)

শ্যামল ধরণীপরে, অসীম বিশ্বাস ভরে
নোঙাইব বোঝা বহা শির।
চুপি চুপি কথ, মাগো। একবার তুমি জাগো,
অর্ঘ্য লহ নয়নের নীর ॥

(১৫)

তোমার শীতল কোলে মোর সব আশা দোলে
যতদিন নাহি মুদি আঁখি।
মরণ পারের কথা, বিচ্ছেদের ভাবুকতা,
আমি তা'র খোঁজ নাহি রাখি ॥

(১৬)

আমি যে, আমারি মত দেখেছি যা লক্ষ শত,
অসহায়, নিরুপায় জন।
মুখে নাহি কোন বাণী চক্ষু ছল ছলখানি
দুখের তারেতে নিমগন ॥

তুমি জান হে জননী, তোমার নয়ন মণি
কত দীন ব্যথাতুর প্রাণ।
শোকের আঘাত সহি গাহিতেছে রহি রহি
বুক-ভাঙ্গা বেদনার গান ॥

(১৮)

জীবনের কোলে হায় জ্বলিতেছে মৃত প্রায়
দুরাশায় নিপীড়িত-হিয়া।
একান্ত বাসনা যাখা, কল্পনার ছবি আঁকা,
দেখে ক্ষুণ্ণ উঠে দরদিয়া ॥

(১৯)

অস্তাচলে চলে রবি হোমানল দীপ্ত-ছবি
অন্ধকার নেমে আসে ধীরে।
উচ্ছ্বসিত পারাবারে নিয়ে যায় কোন্ পারে,
অশ্রুরাতি কেঁদে কেঁদে ফিরে ॥

(২০)

পিছে ছায়া প'ড়ে রহে তাদের নয়নে বহে
স্মরণের-শুভ্র-পূত—বারি।
তারপরে নিশিদিন কেটে যায় উদাসীন
জেগে রয় স্মৃতি-চিহ্ন তা'রি ॥

(২১)

থাক্ কথা—কোন কাজ নাই।
বেদনার কাঁপ সুরে যে বাসনা মরে ঘুরে
আজ তাহা পুড়ে হোক্ ছাই ॥

(২২)

আজ শুধু জাগে মনে যৌবনের কল-বনে
একে-একে ফুটেছিল ফুল।
মেলেছিল আঁখি-তারা আনন্দেতে আত্ম-হারা,
নন্দনের কান্তি সমতুল ॥

(২৩)

ছুটেছিল গন্ধ-বায়ু ধন্য করি পরমায়ু
ধন্য করি দেবতার দান।
ধন্য করি ধরণীরে আনন্দের আঁখি নীরে
মন্দ-গানে মৃদু-কম্পমান ॥

(২৪)

এসেছিল পল্লী-বালা গাঁথিয়া লইতে মালা,
কণ্ঠ ভূষা সোহাগের হার।
আমি ছিনু মৌন-কবি মোর কল্পনার ছবি
মূর্ত্ত ছিল নয়নেতে তার॥

(২৫)

ধরার কম্পিত বুকে, ছিনু আমি সুখে-দুখে,
আপনারে বিলাইয়া হায়।
উৎসারিত শত-স্রোতে ছুটেছিনু শত পথে
বিকাইয়া নিখিলের পায়॥

(২৬)

বসুধার সুধারাশি, আমার অন্তরে আসি,
লভেছিল আপনার ঠাঁই।
আজ কোন্ মায়া-বলে প্রজ্বলিত হোমানলে
সব কিছু পুড়ে ছ'ল ছাই॥

বেদনার অশ্রুরাশি আনন্দের শুভ্র-হাসি
মরীচিকা পিছে পিছে ফেরা।
আজ শুধু মনে হয়, যাহা যায়, যাহা রয়,
মিথ্যার কুহক দিয়ে ঘেরা।

(২৮)

থামাও কাহিনী তব হায়।
শান্ত-মনে বারবার কর আজ নমস্কার
অনাদ্যন্ত-মহাকাল-পায়॥

ওষুধের বড়ি

(হাস্যরস)

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ,]

একটা বেশ জাঁকাল রকমের প্রবাদ বচন উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করাই প্রচলিত রীতি। তাতে শুনতেও বেশ হয়, প্রবন্ধটারও গুরুত্ব বাড়ে। তাই আজ ওষুধের বড়ির সম্বন্ধে গবেষনা করিতে বসিয়া, প্রথমেই দেখিতে হইবে, কোন প্রবন্ধ বচন খনির তিমির গর্ভ হইতে আহরণ করা যায় কিনা?

হতাশ হইবার কোন ভয় নাই;—কারন যে কোন প্রবন্ধ লিখিতে বসিলে নজিরের অভাব, কবিতার অনাটন, পৃথিবীর সাহিত্যে কখনও হয় নাই, হইবেও না। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধন বিষয়েরই একটা আধটা নজির মূলক কবিতা উত্তর পুরুষের উত্তরাধিকারিত্বের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। জার্মান ভাষায় আছে,—Pillen muss man schlingn, wicht Konen.

জ্ঞানে এবং বিজ্ঞানে এ প্রবাদ বাক্যটী যতই সমৃদ্ধ হউক না কেন, ফরাসীরা যে ভাবে এটা বলিয়াছে সেটা আরও সুন্দর আরও মধুর—Il faut avaler les pillules sansles macher. ইংরাজরাও কিছু কম যান নাই, তাহাদের আছে Pills are to be swallowed, not chewed সবগুলির অর্থ একই দাঁড়ায়, বঙ্গ ভাষায় এইরূপ বলা চলে—

চিবিয়োনা চিবিয়োনা ওষুধের বড়ি—
গালে জল দিয়ে গিলে ফেল তাড়াতাড়ি।

যে ভাষাতেই বলি না কেন, কথাগুলি কিন্তু সার সত্য—Pillen বা Pelules Pills অর্থাৎ ওষুধের বড়ি তাহাকে কি করিতে হইবে, না—Schlenyn, avaler বা swallowed অর্থাৎ গিলিতে হইবে? Kanen বা Macher বা Chewed অর্থাৎ চিবাইতে হইবে না। এই হইল ওষুধের বড়ি সম্বন্ধে আদত কথা; পরিত্রাণায় সাধুনাং এসম্বন্ধে বেশ

জোরের সঙ্গে প্রচার করা যাইতে পারে। রচনাকারী দিগের বুদ্ধি বিবেচনার উপর যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তিনি অচিরাৎ এক মাত্রা কুইনাইনের বড়ি চিবাইয়া দেখিতে পারেন।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল গ্রীক বা জার্ম্মান ভাষায় এ সম্বন্ধে কিছুই পাওয়া যায় না। শুধু ইংরাজী ভাষার বাহাদুর এবিষয়ে সকলের চেয়ে বেশী নূতন চিকিৎসা বিজ্ঞানে বড়ির প্রচলন সকলের চেয়ে বেশী এবং Burrows welcome আজ কাল ঘরে ঘরে well come বা সমাদর পাইতেছে। সংস্কৃত ভাষারও' কথাই নাই চরক শুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থের বেশীর ভাগ পাতাই যে ঔষধের গুণ কীর্ত্তনে ভরা তাহা যাহারা উক্ত গ্রন্থ গুলি পড়িয়াছে, তাহারাই বলিতে পারেন। আমার এটা অনুমান মাত্র, কারণ আমি নিজে আয়ুর্ব্বেদ পড়ি নাই এবং এই না পড়াটাই আমার প্রবন্ধ লিখিবার পক্ষে একটা মস্ত বড় সনন্দ।

ইংরাজিতে আর একটা প্রবাদ আছে Apothe —carries would not sugar their Pills unless they are bitter অর্থাৎ যাহার বাহিরে যত মিষ্ট, তার ভিতরটা ঠিক তেমনই তিক্ত। কথাটা বাস্তবিকও বটে—আধ্যাত্মিকও বটে।

সকল দেশেই আর একটা কথা প্রচলিত আছে, যে চল্লিশ উর্দ্ধে সকলে হয় ডাক্তার, না হয় বোকা বনিয়ে যায়। কথাটা মর্ম্মে এই যে চল্লিশের উপরে সকলেই 'ভুগে বদ্যি' হয়, নতুবা দারুন বোকা হয়। একজন বিখ্যাত চিকিৎসক তাঁহার এক রোগীকে এই কথা বলিয়া একটা বেশ সুন্দর জবাব পাইয়াছিলেন। রোগী বলিয়াছিল 'তাহ' হলে মশ'য়ের কোন্‌টা? আমার মনে হয়, দুই চাই।" আমাদের অধিকাংশই কিন্তু ডাক্তার না বলিয়া বোকাই বলিয়া বসি। একজন নামজাদা ব্যক্তি বলিয়াছেন চল্লিশের উপরে গিয়া মানুষ বুঝিতে আরম্ভ করে তাহার বোকামির বহর কতখানি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বুঝিয়া উঠিবার আগেই তাহার জীবনের শেষ দাঁড়ি পড়ে।

এখন একটু পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান করা যাউক। পূর্ব্বকালে ওষুধের বড়ির প্রচলন খুব বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ ওষুধের বড়ির সুবিধা লোকে যদি তখন বুঝিতে পারিত তাহা হইলে এত সব অধিষ্ট রসায়ন চূর্ণ মলম প্রভৃতির জন্ম আদবেই হইত না। তখন এই গুলির উপর লোকের অচলা ভক্তি ছিল, এই অধিষ্ট রসায়ন যত ভয়ানক হইত লোকের বিশ্বাস ও সেই মাত্রায় প্রবল হইত। ওষুধ খাইলে যদি জিহ্বা হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত বেশ একটু উত্তেজনার সঞ্চার না করিল তাহা হইলে অসুখ সারিবে কেমন করিয়া?

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য দেশে শামুক এবং শামুকের জল অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইত। বেশ বড় দেখিয়া কতকগুলি শামুক ধরিয়া উনুনের পাশে রাখা হইত, সেইখানে গরম লাগিয়া তাহাদের ভিতরকার জল ঝরিয়া পড়িত, তাহাদের মল মূত্রও সেখানে জমা হইত, এই সব একসঙ্গে করিয়া শুকাইয়া অনেক রকম মসলাপাতি ছড়াইয়া দিয়া, তিন গ্যালন উগ্র সুরার মধ্যে ১২ ঘণ্টা রাখা হইত। পরে ব্যাধির গুরুত্ব অনুসারে মাত্রার পরিমান স্থির করিয়া এই মদ চামচে করিয়া খাওয়া হইত। এমন ভয়ঙ্কর ওষুধের ফলও যে খুব ভয়ঙ্কর হইত সেবিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন কার লোকে যদি বড়ির কথা জানিতে পারিত তাহা হইলে কিরূপ সুবিধা হইত তাহা ভাবিবার বিষয়, আমাদের দেশেও শামুকের ওষুধ প্রচলিত ছিল। কবিরাজগণ প্রত্নতাত্ত্বিক না হইলেও তাঁহারা তাহা প্রমাণ করিতে পারিবেন। এখনও শামুকের ঝোল রক্ত পাশাশয়ের জন্ত ব্যবস্থিত হইয়া থাকে।

ওষুধের বড়ি গিলিয়া ফেলায় খুব একটা রোমাঞ্চ আছে, তাহা নহে। শামুকের মল মূত্র

গলাধঃকরণ করিবার সময় মস্তিষ্কের শরীরের এবং মনের যেরূপ অবস্থা হইত, ওষুধের বড়ি গিলিবার সময় যে তাহার কিছু কম হয় বলিয়া আমার ধারণা নাই, তবে সুবিধা এই যে ওষুধের বড়ি গিলিবার সময় যা কিছু উত্তেজনা সমস্তই শরীরের, গলার নীচে একবার নামিয়া গেলে আর কোন ভাবনা নাই।

অনেকে বড়ি গিলিবার সময় অনেক রকমারি করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা নিতান্ত সহজেই কার্য্য সমাধা করেন, অনেকে দেখিয়াছি বড়ি লইয়া বেশ একটু মজাদার খেলাও খেলিয়া থাকেন। বেশ করিয়া বসিয়া পড়িয়া, একটা কিছু অবলম্বন বেশ দৃঢ় করিয়া ধরিয়া, তিনি চক্ষু মুদিয়া থাকেন, অপর কেহ দয়া করিয়া পশ্চাৎ হইতে সেই উপবিষ্ট ব্যক্তির মুখ গহ্বরে বড়ি নিক্ষেপ করেন। কেহ কেহ বা বড়ি উপরের দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া, হাঁ করিয়া সেই উৎক্ষিপ্ত বড়ি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শিক্ষা নবীশ যাহারা তাহারা একটি করিয়া বড়ি হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া মুখ গহ্বরের ভিতর কোন রকমে ফেলিয়াছেন, তখন তাহার মুখের অবস্থা কেমন শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়, অনুসন্ধিৎসুর তাহা অবিদিত নাই। কিন্তু চিন্তা নাই! অভ্যাস তাহাদিগকে অচিরে পাকা বড়ি-খোর করিয়া তুলিবে। তখন এই বড়ি লইয়া তাহারা যে ব্যবহার করিবেন, বিলিয়ার্ডের বল লইয়া খেলোয়াড়েরা সেরূপ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ।

বড়ি গিলিবার পূর্ব্বে হাতে লইয়া কয়েক সেকেণ্ড তাহার দিকে তাকাইয়া থাকা যে কি ভয়ানক বিপদ, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন, যত রকমের বীভৎস কল্পনা সেই সময়ে মনের ভিতর তোল পাড় করিতে থাকে। তখন তাহার অবস্থা দেখিলে অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

বড়ি যখন গিলিতেই হইবে তখন অনায়াসে সমস্ত সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গলাধঃকরণ করা কি উচিত নয়। একজন রমণীকে অভ্যর্থনা করিবার সময় আমরা যে ভদ্রতা ও সাজ্জাত্যের পরিচয় দিয়া থাকি, ওষুধের বড়ি গিলিবার সময় কি আমাদের সেইরূপ শিষ্টতা, সেইরূপ ভদ্রতা দেখান উচিত নয়?

ইহাই যদি দাঁড়াইল তাহা হইলে ওষুধের বড়ির দিকে আমাদের ভীতিপূর্ণ নেত্রে—ঘৃণা পক্ষিল দৃষ্টিতে তাকান একেবারেই উচিত নহে।

এই ওষুধের বড়ির জন্ম কিরূপে হইল তাহা এখন দেখা যাউক। পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান অতি দুরূহ ব্যাপার। কোন্ অজ্ঞাত অতীতের তলে যে তাহার চিহ্ন নিহিত রহিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? কোন্ জ্ঞানী বিজ্ঞ চিকিৎসক যে উহা গৌরবময় আবিষ্কার করিয়া সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, ইতিহাস তাহার সংবাদ দিতে পারে না। সম্ভবতঃ প্রাচ্যদেশের কোন চতুর ব্যক্তি ইহার প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এরূপ অনুমান করিলে বোধ হয় দোষ হইবে না যে অতি প্রাচীনকালে কোন সুন্দরী কোমল-হৃদয়া রাজকন্যা অসুস্থা হইয়া পড়িয়াছিলেন, অথচ রসনায় তাহাকে ঔষধ খাওয়ান অসম্ভব। তিক্ত বা কটু দ্রব্য খাইতে তিনি অনভ্যস্ত। যেহেতু দ্রব্য রাজা ঘোষণা করিয়া দিলেন যে কোন ব্যক্তি রাজকন্যাকে ঔষধ খাওয়াইবার নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিবেন, তাহার সহিত তিনি রাজকন্যার বিবাহ দিবেন, এবং অর্দ্ধেক রাজত্ব তাকে যৌতুক স্বরূপ দান করিবেন। দেশ বিদেশে সংবাদ প্রচারিত হইল, কত লোক ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া গেলেন, পরিশেষে এক ভাগ্যবান তরুণ যুবক, ওষুধের বড়ি আবিষ্কার করিয়া রাজ কন্যাকে বিবাহ করিলেন, এবং সুখে সৌহার্দ্যে ক্রমে অর্দ্ধেক রাজত্ব ভোগ দখল করিতে রহিলেন।

তারপর ধন্বন্তরি প্রভৃতি চিকিৎসকগণ সহস্র শ্লোকে এই বড়ির গুণ-কীর্ত্তন করিলেন। পল্লীগ্রামের নিভৃত অন্তঃপুরেও এই বড়ির মহিমা কথায় কথায় প্রচারিত হইল। মৃত মহিলার সুমধুরকণ্ঠে গীত হইল—

হাঁসের ঘাম, বাঁদের পাতা,
ওষুধ বড়ি তিন সত্যি,
গলাজলে নামবে
ছেঁদা মালায় গুণবে
ঢকাস্ করে গিলবে।

প্রেমের গুণে

(শ্রীকালী দাস রায় বি এ, কবি

কুটীর কোনে ছিন্ন কাঁথায় ছিলাম পড়ে'
জাগ্‌ল তব প্রেমের স্বপন ঘুমের ঘোরে।
স্বপনগুলি পুষ্পে ফুটি পড়ল কখন বৃন্ত টুটি'
জেগে দেখি আছি কুসুম শয়ন ক্রোড়ে।

দুই মুঠা শাকান্ন আমার ছিল পুঁজি,
তোমার অধর সোহাগ সুধা জাগ্‌ল বুঝি,
রাজভোগের সব আয়োজন ফুটল স্বাদু বাহুর মতন
শতেক রসের সোহাগ দিতে পাই যে খুঁজি।

শুষ্ক নীরস পুঁথি পড়া বিদ্যাদিতে
জড়ের বোঝা বাড়ছিল সই আমার চিতে,
তোমার জীবন কাঠির পরশ কমল ভাবের জাগল সরস
গুঞ্জরিয়া উঠল তারা হাজার গীতে।

বংশ গৌরব

(গল্প)

(শ্রীআশুতোষ সান্যাল)

দৌলতপুরের জমিদার রামপ্রসন্ন চৌধুরীদের, বংশানুক্রমে প্রথা ছিল—'বাড়ী থেকে অতিথি বিমুখ হবে না'; এটা তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের আমল থেকে চলে আসছিল এবং কোনদিনই এ আদেশের কেউ অমান্য করেন নি।

রামপ্রসন্ন চৌধুরী বিদ্যাশিক্ষার জন্য বাল্যকাল হতে কলকাতায় বাস করে, দেশের রাজসম্মান অপেক্ষা কলকাতার জল বায়ু বেশী ভালবাসতেন। উদারতায় বা অন্যান্য গুণে তিনি পূর্ব্বপুরুষদের অপেক্ষা হীন না হলেও, চিরদিন কলকাতা বাসের ফলে তাঁর চালচলন একটু সহরের বড় মানুষদের মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল;—যেটাকে গ্রামবাসীরা অহঙ্কার মনে করে, তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের মত তাঁকে—স্নেহ ও ভালবাসার চক্ষে দেখতে পারত না। পিতার একমাত্র পুত্র, চিরদিন সৌভাগ্যের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হয়ে, স্বভাবতঃ মানুষ ছোট খাট দোষ গুলির প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়ে; রামপ্রসন্নও গ্রামবাসীদের তুষ্ট করতে সে সব বিষয়ে দৃষ্টি করতেন না। কাজেই, পিতার মৃত্যুর পর গ্রামের লোকের সঙ্গে বনিবনাও করে চলতে অক্ষম হওয়ায়,—স্বপরিবারে কলকাতা বাসী হয়ে পড়লেন। পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে বৎসরে দু'চার বার দেশে এসে, পৈতৃক ক্রিয়া কর্ম্মগুলি সেরে করে আবার কলকাতায় ফিরে যেতেন।

কলকাতার বাড়ীতে রামপ্রসন্ন স্ত্রী, পুত্র এবং এবং কয়েকজন আত্মীয়, আত্মীয়া নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দেই বাস করতেন। বড়লোকের যা থাকা আবশ্যক রামপ্রসন্নর সবই ছিল, এমন কি—ষ্টেউড়ীর দারোগান বুকে 'জমিদার দৌলতপুর' অক্ষয় এঁটে পাহারা দিতেও—ত্রুটী করত না। পাড়ার গরীব লোকেদের মধ্যে অনেকেই রামপ্রসন্নর বাড়ীকে 'রাজবাড়ী' বলত। এই আখ্যার প্রধান কারণ ছিল তাঁর বংশানুক্রমিক—অতিথি সৎকার। কলকাতায় এসেও রামপ্রসন্ন এই বংশগৌরবের

হানি করেন নি, বরং এই 'দরিদ্র নারায়ণ' সেবায় তিনি বড়ই আনন্দিত হতেন, বড়ই তৃপ্তি পেতেন। যখন দরিদ্রেরা —পেটভরে খেয়ে, ঝুলি ভরে নিয়ে —'রাজা বাবুর জয় হোক' ধ্বনি করে রাজপথ মুখরিত করত, তখন তিনি ভাবতেন,- তাঁর বিশাল জমিদারীর আয়ের এককণা মাত্র ব্যয় করে এ অনাবিল আনন্দ উপভোগ করায় ক্ষতি কি? পিতৃ পুরুষদের মহত্বের কথা স্মরণ করে গর্ব্বে তাঁর বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠত।

একমুহূর্ত্তে যে মানুষকে যুগ-যুগান্তরের পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে টেনে ফেলে দেয়, সেই মানুষ — চিরদিন সংসারের পঙ্কিল পথে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারে না। বিলাসীতার আবহাওয়া রামপ্রসন্ন চৌধুরীকেও পরিবর্ত্তনের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। অতিথি সেবা প্রভৃতি যা, যা তিনি পূর্ব্বে স্বয়ং তত্ত্বাবধান করতেন, বিলাস প্রমোদে গা ঢেলে দেওয়ায়—ক্রমেই তাতে শৈথিল্য দেখা দিল। পূর্ব্বে যে অর্থ ব্যয়ে শতাধিক অতিথি তৃপ্তির সহিত আহার করতে পেত, এখন কর্ম্মচারীদের তত্ত্বাবধানে সেই অর্থে—তার একচতুর্থাংশও পেট ভরে খেতে পায় না। প্রত্যহ একশো শাক —স্বয়ং ভগবানও একদিন তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু অপ্রত্যহ রাজভোগ, হীন পশুও স্পর্শ করতে ইতস্ততঃ করে। কর্ম্মচারীরা নিজেদের উদরপূরণ করে, দীন দরিদ্রের জন্য যা কিছু উচ্ছিষ্ট ফেলে দিত—তাও তাদের সভয়ে গ্রহণ করতে হত। কারণ কর্ম্মচারীরা দিন দিন লোকসংখ্যা কমাতে তাদের উপর নির্য্যাতন করতে কুণ্ঠিত হত না। পীড়নের ভয়ে ক্ষুধার্ত্ত— অতিথি আশা করে এসে, হতাশ হয়ে ফিরে যেতে লাগল। রামপ্রসন্নের সে সব দেখবার অবসর ছিল না। মজলিস, মাইফেল নিয়ে দিবারাত্র এত উন্মত্ত ছিলেন, যে তার মধ্যে যে টুকু অবসর পেতেন—তা তাঁর বিশ্রামের পক্ষেই যথেষ্ট হত না। জমিদার গৃহিণী এই সব অভিযোগের কথা কয়েকবার স্বামীকে বলেছিলেন, কিন্তু কিছু ফল হয় নি। কাজেই, অল্পদিনের মধ্যে জমিদার বাড়ীর চিরদিনের প্রথা লোপ পেতে বসল। অন্নদান ক্রমে মুষ্টিভিক্ষায় পরিণত হল, শেষে তাও ক্ষীণ হয়ে এল।

সেবার কলকাতায় ঘরে ঘরে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মত শত শত লোককে গ্রাস করে, চারদিকে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করল। সহস্র সাবধানতার বেষ্টনীর ভেতরে থেকেও রামপ্রসন্নের পুত্র —তারাপ্রসন্ন সেই দুর্দ্ধর্ষ রোগের হাত—এড়াতে পারল না। পুত্রের অসুখে রামপ্রসন্ন সহরের বড় ডাক্তার, নার্স প্রকৃতীর বন্দোবস্ত করতে একটুও ত্রুটি করলেন না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল।

পুত্রের অসুখের কদিন রামপ্রসন্ন বাড়ীর বার হতে পারেন নি। সেদিন অপরাহ্নে পুত্রকে একটু ভাল দেখে, এক বিশিষ্ট ধনী বন্ধুর গৃহে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিমন্ত্রণ রক্ষা করে, ফিরে এসে যখন বাড়ী ঢুকতে যাবেন, তখন গেটের কাছে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁর সুমুখে এসে বললেন, "তেরা ভালা হোয় বাবা। সারাদিন ভুখা হুঁয়"—একে পুত্রের অসুখে রামপ্রসন্নের মন খারাপ ছিল, তার ওপরে বন্ধু গৃহের অমন মজলিস্ ছেড়ে উঠে আসতে হয়েছে, তাই,— সন্ন্যাসীর কথায় বিরক্ত হয়ে রামপ্রসন্ন বললেন, "হট্ যাও—"

"তেরা ভালা হোয়—বেটা। কুছ খানেকো দেও—"

"যাও, নেহি—মিলেগা"—বলে, রামপ্রসন্ন অগ্রসর মুখে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। প্রাঙ্গন থেকে তিনি শুনতে পেলেন—গেটের দারোয়ান সন্ন্যাসীকে গাল দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছে। যেতে যেতে কি মনে করে পকেটে হাত দিয়ে, রামপ্রসন্ন থমকে দাঁড়িয়ে— দারোয়ানকে ডাকলেন। দারোয়ান এসে সেলাম করে দাঁড়ালে, তিনি পকেট থেকে একটা টাকা বার করে বললেন—"সাধুকো দেও!"

"সাধু ত' চলা গিয়া হুজুর" বলে, দারোয়ান

আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। পকেটে পুনরায় টাকাটা ফেলে, রামপ্রসন্ন চলে গেলেন।

ভেতরে গিয়ে জামা কাপড় ছেড়ে রামপ্রসন্ন পুত্রের কক্ষে গিয়ে দেখলেন, বাড়ীর ডাক্তারের মুখ বিমর্ষ। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলেন অসুখ বেড়েছে এবং বড় ভুল বকছে। চিন্তিত মনে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে তিনি বসে পড়লেন। সাহেব ডাক্তারকে টেলি ফোন করা হয়েছিল; ঘণ্টাখানেক পরে তিনি এসে পরীক্ষা করে বললেন "নিউমোনিয়া" —রামপ্রসন্নের মাথা ঘুরে উঠল। সাহেব ডাক্তার প্রেস্‌ক্রিপশন্ লিখে,—নার্স ও ডাক্তারকে উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন।

রাত বারটা, ডাক্তারের উপদেশ মত নার্স রোগীর শুশ্রূষা করছে। রামপ্রসন্ন সন্ধ্যা হতে একই ভাবে পুত্রের শিয়রে বসে আছেন। সকলেই নীরব, কেবল তাকের উপর ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে আপন কাজ করে চল। হঠাৎ তারাপ্রসন্ন সেই নীরবতা ভঙ্গ করে বিকারের ঘোরে বলে উঠল, "দাদা মশাই দাদা মশাই—পুত্রের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে রামপ্রসন্ন ডাকলেন,—"তারু—তারু—কি বলছ?"

পিতার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল করে চেয়ে—তারাপ্রসন্ন আবার বলল, "ঐ দাদা—দাদু—দাড়ী কামায় নি—এতবড় দাড়ী"—রামপ্রসন্ন পুত্রের মস্তক স্পর্শ করে বললেন, "কৈ তারু—দাদা মশাই কৈ?" "ঐ যে দেখতে পাচ্ছো না—মা মা দাদুকে খেতে দাও, বড় কিধে পেয়েছে"—তারাপ্রসন্ন কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে আবার বলে উঠল "এই দারোয়ান—দাদুকে মারছিস কেন? এখনি বাবাকে বলে মজা দেখিয়ে দেব।" পুত্রের অসংলগ্ন কথায় রামপ্রসন্ন হঠাৎ সেই সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়িল। অ্যাঁ! সে করেছে কি? কাকে—তাড়িয়ে দিয়েছে! অতিথি বিমুখ করেছি! তবে কি—তবে কি, তাকে কর্ত্তব্য হারা দেখে স্বর্গ থেকে পিতা সাধুর আকার ধরে, তাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছিলেন,—তাই কি তার একমাত্র পুত্র—কথা গুলো রামপ্রসন্নর বুকের ভেতর লোহার মুগুরের ঘা দিতে লাগল। পুত্রের মুখের কাছে তিনি ঝুঁকি খেয়ে পড়ে—ডাকলেন, "তারু—তারু—" একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে তারাপ্রসন্ন অতিকষ্টে—পাশ ফিরিল। ডাক্তার নাড়ী দেখে বললেন "ভয় নেই।"

রামপ্রসন্ন ঘরের ভেতর আর বসতে পারলেন না, চারদিকের দেওয়াল—চারদিকের ঐশ্বর্য্য, তাকে যেন হাঁ করে গিলতে আসছিল। সন্ন্যাসীর চিন্তা তাঁকে অতিষ্ট করে তুলল, তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে বৈঠকখানায় এসে হাজির হলেন। তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে, বিস্মিত হয়ে দারোয়ান সেলাম করে দাঁড়াল। রামপ্রসন্ন দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন "এক সাধু বাবাকো কিঁহা দেখা হ্যায়।

প্রশ্নের উত্তরে দারোয়ান বলল, "জী—হাঁ, এক সাধু অস্তবল তরফ্ সামকো গিয়া থা"—

"দেখো কাঁহা গিয়া"—বলে রামপ্রসন্ন নিচেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। চারদিক খুঁজে কোথাও আর সন্ন্যাসী ক পাওয়া গেল না।

এক এক করে এক্‌দিন কেটে গেল, তারাপ্রসন্নর একটুও উন্নতি দেখা গেল না। এমনও সে মাঝে মাঝে অসুখের ঝোঁকে "দাদা মশাই—দাদু—" প্রভৃতি ভুল বকে। রামপ্রসন্ন—এই ক'দিনে আধখানা হয়ে গিয়েছিল। আহারে রুচি নেই, চক্ষে নিদ্রা নেই, পুত্রের এবং সন্ন্যাসীর চিন্তা তাঁকে অহোরাত্রদিন কষ্ট করছিল। সন্ন্যাসীকে খুঁজতে চারদিকে লোক পাঠিয়েছেন, সদর বাড়ীতে সাধু সন্ন্যাসীর জন্য অবারিত দ্বার করে রেখেছেন; কত সাধু কত সন্ন্যাসী এল, গেল—কিন্তু সেই মহাপুরুষের আর দেখা পাওয়া গেল না। অনুশোচনায় রামপ্রসন্ন পাগলের মত হয়েছেন। পিতৃ পিতামহদের আদেশ অমান্য করে তিনি অতিথি সেবায় অবহেলা করেছেন, রূঢ়বাক্যে—ক্ষুধার্ত্ত মহাপুরুষকে ফিরিয়ে

দিয়েছেন। চৌধুরী বংশের সমুন্নত গৌরব তিনি ক্ষুণ্ণ করেছেন। এ পাপের এ অনুতাপের শান্তি নেই।

সেদিন সকাল থেকেই তারাপ্রসন্নর অবস্থা বড়ই খারাপ হয়েছিল। ডাক্তারেরা প্রাণপণ যত্ন করেও কিছু করতে পারছেন না। সম্পূর্ণ জবাব না দিলেও তাঁরা ভগবানের উপর নির্ভর করে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। এতদিন রামপ্রসন্ন সন্ন্যাসীর কথা কাউকে বলেন নি। আজ চারিদিকের বিষাদ ছায়া দেখে তিনি অধৈর্য্য হয়ে উঠ্‌লেন। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেল্‌লেন। স্বামীর অবস্থা দেখে, স্বামীর চক্ষে জল দেখে, জমিদার-গৃহিণীর পুত্রের অবস্থা জানতে বাকি রইল না। এতদিন যে শোকের প্রবল উচ্ছ্বাস তিনি বালির বাঁধ দিয়ে আটকে রেখেছিলেন, আজ—স্বামীর অশ্রুজলে তা ভেঙ্গে গেল—তিনি মেঝের ওপর আছড়ে পড়লেন। স্ত্রীর সেই অবস্থা দেখে, রামপ্রসন্ন বালকের মত কাঁদতে-কাঁদতে বললেন "আমিই—তাকে মেরে ফেললাম—ক্ষুধার্ত্ত সন্ন্যাসী আমার মঙ্গল কামনা করে হাত পেতেছিল, নিষ্ঠুর আমি তাঁকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি—উঃ—"স্বামীর মুখে সন্ন্যাসীর কথা শুনে জমিদার গৃহিণীর হঠাৎ, যেন কি স্মরণ হল, তাড়াতাড়ি উঠে বল্‌লেন "সন্ন্যাসী—কি বলছ—কদিন আগে আমার কাছেও একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন—"উত্তেজিত কণ্ঠে, রামপ্রসন্ন স্ত্রীর কথার উত্তরে বললেন "এসেছিলেন? তোমার কাছে ও তিনি এসেছিলেন—সেবা করেছিলে—না আমার মত"—"না না আমি তাঁকে পরিতোষ করে সেবা করে ছিলাম। তিনি আমার পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। আমার মুখে পুত্রের অসুখের কথা শুনে তিনি আমায় একটু ভস্ম দিয়ে তাকে তাতে মাখিয়ে দিতে বলেছিলেন—কিন্তু তোমাদের ভয়ে খাওয়াতে পারি নি—"

স্ত্রীর কথায় বাধা দিয়ে রামপ্রসন্ন বল্‌লেন "সে ভস্ম নয়—মৃত সঞ্জিবনী! কোথায় সে ভস্ম শীঘ্র নিয়ে এস।" জমিদার গৃহিণী দ্রুতপদে অন্য ঘর হতে তখুনি একটা কাগজের মোড়ক নিয়ে এসে স্বামীকে দিলেন। রামপ্রসন্ন উন্মাদের মত তারাপ্রসন্নের ঘরে ঢুকে, তাকে সেই ভস্ম খাইয়ে দিলেন। ডাক্তারের অনেক নিষেধ করলেন, ক্ষতি হতে পারে বলে ভয় দেখালেন, কিন্তু রামপ্রসন্ন কোন কথা শুনলেন না।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত ভস্মে আশ্চর্য্য ফল হল। পাঁচ ছ' দিনের মধ্যে তারাপ্রসন্ন আরোগ্য হয়ে উঠ্‌তে লাগল. ডাক্তারেরা বললেন, "আর ভয় নেই, রোগী এ যাত্রা বেঁচে গেল।"

মাসাধিক কাল পরে তারাপ্রসন্ন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করলে, ডাক্তারের উপদেশ মত রামপ্রসন্ন তাকে পশ্চিমে হাওয়া বদলাতে নিয়ে গেলেন। প্রায় এক বৎসর পশ্চিমের এখানে সেখানে বেড়িয়ে রামপ্রসন্ন স্বগ্রামে ফিরে এসে, সেইখানেই বাস করবার পাকা বন্দোবস্ত করলেন; কলকাতায় আর ফিরলেন না। দেশের লোক রামপ্রসন্নকে অন্য মূর্ত্তিতে ফিরতে দেখে, অতীত কথা ভুলে হাসি মুখেই অভ্যর্থনা করে নিল।

রামপ্রসন্ন কিন্তু সন্ন্যাসীর কথা ভোলেন নি, তাঁকে কর্ত্তব্যহারা দেখে তাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেব যে তাঁকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে, মহাপুরুষের বেশে এসেছিলেন—একথা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। নিজের কর্ত্তব্যহীনতা মনে করে এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে,—তিনি চৌধুরীবংশের চিরন্তন প্রথা বজায় রাখতে কলকাতার বাড়ীতে স্বর্গীয় পিতৃপুরুষদের নামে এক 'অতিথিশালা' স্থাপন করলেন। আর সেই বংশ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁর জমিদারীর সর্ব্বপ্রধান মহাল তিনি সেই অতিথি শালার নামে উৎসর্গ করে দিলেন।

না:, বাওয়াটা আজ চাপ হ'য়ে গেছে, কাল থেকে একটু জোর হাঁটতে হ'বে, বাবা! রোজই শালার দেরী হ'য়ে যায়!

—বাসন্তী

ছায়া

(গল্প)

[শ্রীমৃত্যুঞ্জয় (সেন) বরাট]

১)

সে ছিল দেবরাজ ইন্দ্রের সভার নর্ত্তকী।

দেবরাজ ইন্দ্র যখন বিলাসিতায় মত্ত হয়ে বিভোর হয়ে থাকতেন, তখন সে তার বিমোহিনী সুরে সুরাসুরকে আনন্দ দান কত্তো। তার কাজই ছিল ঐ। সে সময়ে অসময়ে দেবরাজকে সন্তুষ্ট ক'রতে পারেই প্রচুর পরিমাণে অর্থ পেত। তাই ছিল তার লাভ।

দেবরাজের কড়া হুকুম, যেন স্বর্গে পাপ বাসনা ঢুকতে না পায়। তাই নর্ত্তকীদের চির অবিবাহিত ভাবেই দেবরাজের মন যুগিয়ে চল্‌তে হ'ত।

সে-ই ছিল নর্ত্তকীদের সেরা। গান বাজনায় আর নাচের ভঙ্গিমায় বুঝি কেউ তার সমকক্ষ ছিল না। দেবরাজ তাকেই সব চেয়ে পছন্দ ক'রতেন। কিন্তু তবুও সে নিজের অবস্থায় তুষ্ট ছিল না। সদাই তার মনে, থেকে থেকে এক আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠ্‌তো—যেটাকে দেবরাজ পাপ-বাসনা বলে মনে ক'রতেন।

কিন্তু একদিন সে বেশ করে ভেবে দেখ্‌লে—যে এতে কোন পাপই থাকতে পারে না, কেন না এ কাজ ত নিতাই দেবরাজ নিজের রাজ্যে বসে ক'রছেন।

সে সামান্যা দুর্ব্বলা নর্ত্তকী বুঝতে পারে না, দেবতার আবার পাপ-পুণ্য কি? তাই সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে পাপ বাসনার দিকে ছুটিয়া চলিল।

(২)

রোজ সকালেই ঋষিকুমার ফুলে ভরা সাজি হাতে দেবরাজকে প্রণাম কর্ত্তে আস্তেন। সে-দিনও রোজকার মত সাজি ভরা ফুল নিয়ে দেব-রাজের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় ইন্দ্রের সভায় গিয়ে শুন্লেন —তিনি এখন বিলাস-আগারে।

শুনে ঋষিকুমার দেবরাজের সাক্ষাৎ মানসে ইন্দ্রের বিলাস আগারে চল্লেন—বাতাসে তাঁর জটা-জুট চুলগুলি ছল্ ছল্ করে উড়্তে লাগ্লো। গৈরিক বসনের উত্তরীয় পথের বাঁকে বাঁকে হেলে দুলে চল্তে লাগ্লো। চরণের স্পর্শে স্বর্গও ধন্য মনে কর্ল। ঋষিকুমার চল্লেন—দেবরাজের সাক্ষাৎ মানসে—ঠিক যেন এক দেবপুত্রের মতন।

ইন্দ্রের বিলাস আগারে উপস্থিত হয়ে ঋষিকুমার নতজানু হয়ে প্রনাম কর্লেন। আবার ঠিক তেমনি ভাবেই ধীর গতিতে চলে এলেন।

সে নর্ত্তকী এখন একাই দেবরাজের বিলাস আগারে নৃত্য গীতে মত্ত ছিল। ঋষিকুমারের আগমন সে দেখ্লে, আবার ধীর পদবিক্ষেপে চলে যেতেও দেখ্লে—। দেখ্লে সে সবই। মুহূর্ত্তে তার নৃত্যের স্পন্দন থেমে গেল; গলার সুর কে যেন চেপে ধর্লে। নিমেষের তরে সে স্থির অপলক দৃষ্টিতে ঋষিকুমারের রূপ সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হয়ে পান কর্লে। আর সঙ্গে সঙ্গে সে কল্পনায় ঠিক কর্লে—তাকে দিয়েই তার বাসনার চরিতার্থ করবার জন্যে।

মদে মত্ত দেবরাজ এর কিছুই জানতে পারেন

(৩)

নিত্যকার মতো রোজই ঋষিকুমার আসেন, যান। কোন দিকে ফিরেও তাকান না। নিজের কাজ করে আবার গহন বনে চলে যান।

সেদিন কি ইচ্ছে হল—তিনি পেছনে কার পদ-শব্দ পেয়ে ফিরে দেখ্লেন—এক রূপবতী যুবতী মৃদু মৃদু হাসির লহরী ছড়িয়ে তাঁর পেছনে পেছনে আস্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন—কে গা তুমি, কোথা যাবে, কি দরকার?

নর্ত্তকী একবার ফিক্ করে হেসে—ঋষিকুমারের দিকে বাঁকা চাউনি আরও বেঁকিয়ে শ্লোক কেটে বল্লে—

তুঁহারি তরে নগর-পর্ নগর ঢুঁড়িয়া
আভি হাম্ সম্ঝা নাথ, তুঁহি মেরা দেঁইয়া।

ছদ্মবেশী নর্ত্তকীর ধরণ ধারণ রূপমাধুর্য্য দেখে ঋষিকুমারেরও মন টলে গেল। তিনি শ্লোক কেটে তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে বল্লেন—

হামও তুঁহারি মত, কত খুঁজিনু কত দেশ,
এহসা কই কভি তুঁহারি মত নাহি ভেল—

নর্ত্তকী সঙ্গে গেল। সে সোহাগভরে ঋষি কুমারের গায়ে গড়িয়ে পড়্লো। ঋষিকুমারের মন একবার একটা অজানা পাপের সংস্পর্শে কেঁপে উঠ্লো। পরে তাঁর অবশ হাত দুটো নর্ত্তকীকে বেষ্টন করে রইলো।

(৪)

আগেকার মতো ঋষিকুমার এখনও ইন্দ্রের সভায় আসেন। কিন্তু এখন আর দেব ভক্তির প্রীতি ডালি নিয়ে আসেন না—হাতে নাম মাত্র সাজি থাকে। বুকে থাকে নর্ত্তকীর প্রতি অগাধ প্রেম-ভালবাসা; মনে থাকে তার দর্শনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা।...

এই ভাবেই ঋষিকুমার তাঁর আরাধনা কর্ত্তে লাগ্লেন। ভেতরে গুপ্ত প্রেম রইলো, তা কেউ জান্তে পারলে না। কেউ জান্লে না বটে—কিন্তু হাওয়া এ কথা চেপে রাখ্তে পারে না। পবন—সে তাদের গুপ্ত প্রেমকাহিনী গুপ্তভাবে থেকে দেখ্তো। সে-ই সব কথা ইন্দ্রকে জানালে।

পবনের কথা শুনে ইন্দ্রের চোখ দুটো জবাফুলের ম'ত লাল হয়ে উঠ্লো। তিনি অধীরভাবে বল্লেন —কি এত বড় আস্পর্দ্ধা। আমার রাজ্যে এত বড় লুকোচুরি—পাপবাসনার এত আকাঙ্ক্ষা। তিনি বজ্রহাতে উঠে দাঁড়ালেন।

সেই সময় পবন হাত ধরে রাখ না থামালে, না জানি কি হ'ত। দেবরাজ স্থির হয়ে দাঁড়ালে পবন বলতে লাগ্‌লেন—মহারাজ ক্ষমা করবেন সে নব দম্পতিকে। তাদের কাউকেও প্রাণে মারবেন না। তারা কেউ যে কারুর বিরহ একদণ্ডও সইতে পারে না। কারুর সে মিলনে যোগ দিতে বিলম্ব হলেই আমাকেই যে বিরহ বার্তা জানাত। আমি যে জানি তাদের উভয়ের কত ভালবাসাবাসি। আর আমিই ত মহারাজ এ কথা আপনাকে জানিয়েছি, তাদের প্রাণে মারে, সে পাপ যে আমারই।

দেবরাজ ইন্দ্র পবনের কথায় শান্ত হলেন। তাঁর রাগ কতকটা উপশমিত হ'লে তিনি বল্লেন—একেবারে ক্ষমা আমি তাদের করতে পারি না। কেন জান পবন? সে ঋষিকুমার প্রতিদিনই আসে আমার সাক্ষাৎ লাভে। আমার দ্বারী, প্রহরী কেউ তাতে বাধা দেয় না—তারা জানে সে আমার ভক্ত। কিন্তু কত বড় ভক্ত সে? নামে ঋষিকুমার হয়ে কত বড় পাপকে সে প্রশ্রয় দিয়েছে। তাদের সমুচিত শাস্তি আমি দেবই দেব। আমার রাজ্যে বিশৃঙ্খলা নেই। আর সে আমার প্রিয়তমা নর্ত্তকী—সে আমার নিয়মের অপমান করায় তাকেও কঠোর দণ্ড দেব। কোথায় তারা? ডাকো তাদের?—

দিকে দিকে প্রহরী ছুটলো, তাদের রাজ সভায় হাজির করতে।

তখন তারা কপোত কপোতীর মত দুটীতে মুখোমুখি বসে কত কি সুখদুঃখের কথা কইছিল। এমন সময় দেবচর গিয়ে তাদের খবর দিলে—ইন্দ্রের হুকুম—এখনি রাজ সভায় উপস্থিত হ'তে হবে।

ভয়ে দুজনেরই মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। দেবরাজের হুকুম অমান্য করবার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা ইন্দ্রের রাজ সভায় এসে উপস্থিত হ'ল।

(৫)

আগে আগে এলেন ঋষিকুমার, পেছনে পেছনে নর্ত্তকী। ঋষিকুমারের হাতে তখনও সাজি ভরা ফুল। তিনি ইন্দ্রের সভায় এসে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়ালেন। রোজই ত তিনি ইন্দ্রের সাক্ষাতে আসেন—কৈ কোন দিন ত এমন ধারা হয় না। কিন্তু আজ কেন বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করে কাঁপ্‌ছে, ফুলের সাজিটা হাত থেকে পড়ে যেতে চাচ্ছে। এ কি হ'ল! ঋষিকুমার ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কুটনাসসাপরায়ণা নর্ত্তকীটা লজ্জায় ইন্দ্রের সামনে এসে দাঁড়াতে পারে নি। তাই ঋষিকুমারের পেছনে মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপ ছিল।

দেবরাজ একবার কটাক্ষপাতে তাদের দুজনকে দেখলেন। পরে বলতে লাগলেন—ঋষিকুমার! কি মহান্ কাজে মনকে নিয়োজিত করেছিলে মনে আছে কি? আমার আজ সেই মনকেই কি গর্হিত কাজে নিয়োগ করেছ বুঝতে পারো? যাক্ যা করেছো বেশ করেছ। কিন্তু সেটা যে অপরাধ, তা জানতে,তাই আজ এখানে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছ। ভয় নেই তোমার। মনে রেখ—আমার রাজ্যে পাপীর ক্ষমা নেই। এর শাস্তি তোমায় ভোগ করতেই হবে। তোমার নিজের উপাসনার, আরাধনার ফলে যেটুকু ধর্ম্মের অধিকার করেছ তাই দিয়ে প্রতি মানুষকে পথ দেখিয়ে উপকার ক'রবে। তুমি প্রতি আলোয় মিশিয়ে পুণ্যের আলোয় আলোর তেজ করে তুলবে।

দেবরাজ ইন্দ্রের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই ঋষিকুমার আর্ত্তনাদ করে প্রতি আলোয় কণা-কণা হয়ে মিশিয়ে গেল। শুধু একবার চীৎকার ক'রে বলেছিল—আমার তার কি হবে?

দেবরাজ ইন্দ্র বল্লেন—তারও উপায় কচ্ছি আমি? যেমন সে সুন্দরী ছিল, তেম্‌নি সে কুৎসিত হবে। আকৃতি বলে কোন একটা জিনিষ তার থাকবে না।

আর সে যেমন তোমার পেছনে লুকিয়ে, আমার সামনে মুখ ঢাকা দিয়েছিল, তেমনি সে চিরকালই তোমার ভক্তি ভালবাসার সংস্পর্শে যাতে না আসতে পারে, সেজন্য সর্ব্বদাই তোমার পেছনে পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াবে। দুজনের কোন বাধা থাকবে না যে পরস্পরে দেখা করে দুটো মনের কথা কইতে পার।

তারপর অভিশপ্তা নর্ত্তকীও দেবরাজের অভিশাপ মাথা পেতে নিলে।

তাই সেই থেকে আলো যেখানে-ছায়া সর্ব্বদাই তার পেছনে। দেবরাজের অভিশাপে তার কোনই আকৃতি নেই। সে পরের আকৃতিকেই নিজের আকৃতি করে নিয়ে, আলোর পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায়। আর তার নিজের কোন বাধা নেই যে আলোর সঙ্গে হেসে খেলে দুটো কথা কয়। তাই দেবরাজের অভিশাপে তার অমন সুশ্রী গঠন, সোণার বরণ, সেই থেকে ভূতের মতো কালো হয়ে গেল।

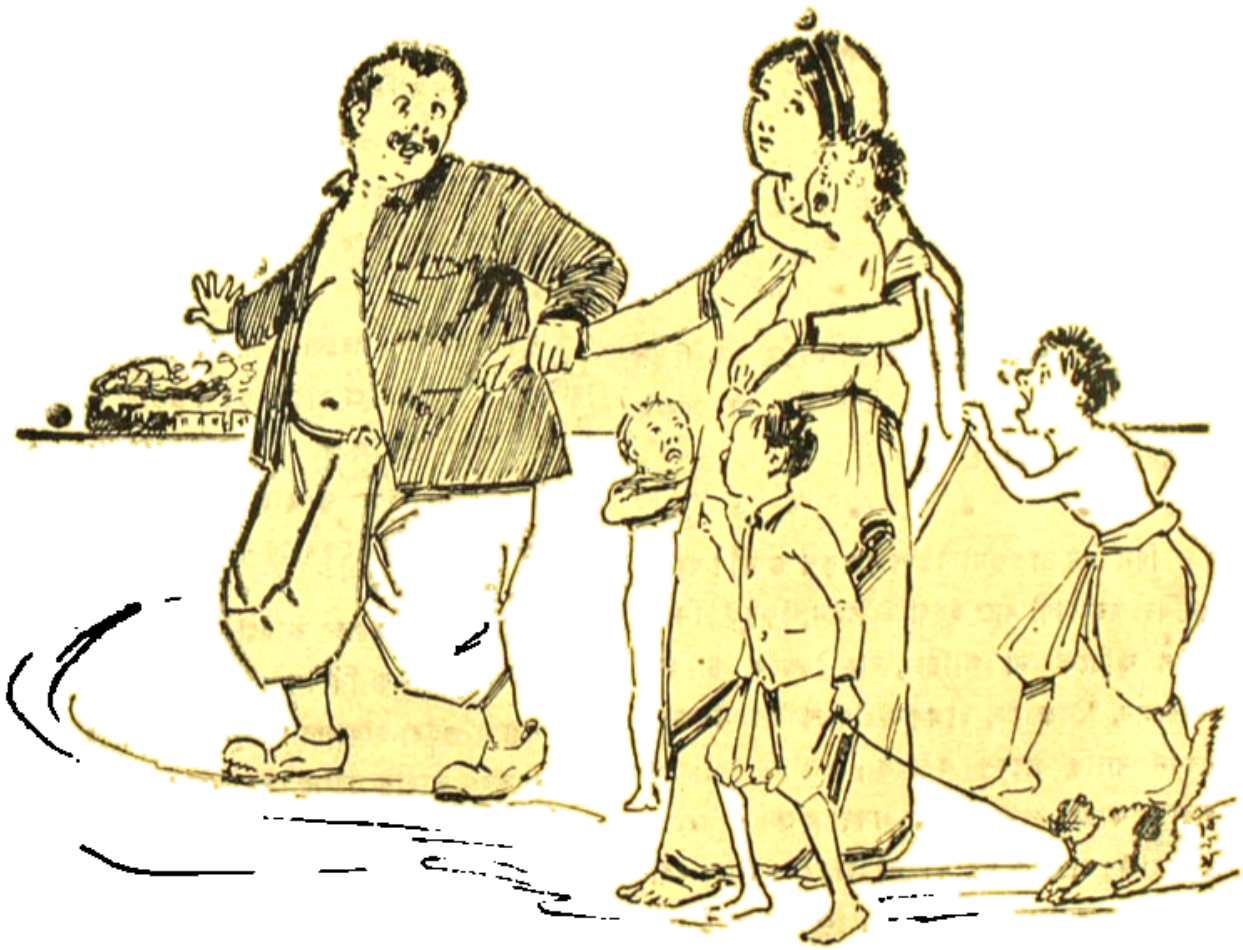

কর্ত্তা—ট্রেণ এসে পড়লো যে!···আহা ছুটে ছুটে এস···ঐ যা···কি অধর্ম্ম! কি অধর্ম্ম! বিয়ে করা কি অধর্ম্ম! একটু লজ্জা সরম ও নেই, একপাল ছেলে নিয়ে···ওঃ! উঃ, ঐ স্ত্রীলোকটার মুখ দেখলে বুক শুকিয়ে যায়—এর চেয়ে একটা···আঃ তোর নিকুচি করেছে!

—বাসন্তী

নিরুদ্দেশ

(চিত্র)

[শ্রীমনলেখা দাসী]

রাজকুমারী চিত্রলেখার মন আজ বড় ভারী। প্রভাতের রাগ অরুণের রক্তিমরাগ তাহার চক্ষে বিরাজমান—ঘর্ম-কুঞ্চিত কেশকলাপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কমলকলিকা সদৃশ মুখমণ্ডল শ্রীহীন ও বিবর্ণ।

সখি মুকুলিকা আসিয়া কহিল, "রাজকুমারী, চল আজ বাগানে বেড়াইতে যাই—আজ কি সুন্দর প্রভাত?"

রাজকুমারী চিত্রলেখা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, মৃণালবৎ দেহলতাকে ঈষৎ দোলাইয়া কহিল, "না, আজ আমার শরীর ভাল নেই।"

রাজকুমারীর শরীর ভাল নয় শুনিয়া সখী মুকুলিকা গম্ভীর হইয়া গেল—কিছু বলিল না বরং চুপ করিয়াই রহিল।

দেখিতে দেখিতে রাজ-তোরণ হইতে প্রভাতের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। একে একে রাজপুরী সজাগ ও মুখর হইয়া উঠিল।

• • • •

দিন দিন রাজকুমারীর শরীর কৃশ ও ক্ষীণ হইতে দেখিয়া মহারাণী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিছুই নিরাকরণ করিতে না পারিয়া, রাজ-বৈদ্যকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৈদ্যরাজ, রাজকুমারীর শরীরে নিশ্চয়ই কোন ব্যাধি প্রবেশ করেছে; আপনি সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া প্রতীকারের ব্যবস্থা করুন।

রাজকুমারীকে পরীক্ষা করিয়া বৈদ্যরাজ মহারাণীকে বলিলেন, "মহারাণী, রাজকুমারীকে চাঁপার বনে পাঠাতে হ'বে; সেই বনে এক রাখাল বালক এসে নিত্য-নতুন গান গেয়ে যায়। সে গান শুনলে রাজকুমারীর সব অসুখ সেরে যাবে।" এই বলিয়া বৈদ্যরাজ ঔষধাধার মধ্য হইতে তুহীন-শুভ্র কিসের একটু চূর্ণ বাহির করিয়া মহারাণীর হাতে দিয়া বলিলেন, "এই চূর্ণ প্রভাতের পাখী ডাকার পূর্ব্বে খাওয়াতে হবে।"

• • • •

সেদিন ফাল্গুন পূর্ণিমা। সারা রাত্রি জ্যোৎস্নার বিপুল ধারায় পরিপ্লাবিত। কচি কচি পাতার উপরে জ্যোৎস্নার অমল ধবল কিরণমালা পিছ্‌লে পিছ্‌লে পড়্‌ছে। রাজপুরী নীরব, নিথর, স্পন্দহীন-যেন মড়ার মতন পড়ে আছে।

ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া রাজকুমারী চিত্রলেখা প্রাণ মন ভরিয়া সেই জ্যোৎস্নাকে দেখিয়া লইল। সখী মুকুলিকাকে ডাকিয়া কহিল, "মুকুলিকে, একবার এই জ্যোৎস্নায়, সেই প্রাণকে হারিয়ে কেলার গানটা গাওত।

মুকুলিকা বীণা সহযোগে গানটী গাহিতে আরম্ভ করিল; সেই সুর প্রাসাদের চূড়ায় চূড়ায়, মিনারে-মিনারে, অলিন্দে-অলিন্দে, প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ধ্বনিত হইয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া রহিল; রাজ প্রসাদের শুভ্রতাকে একেবারে মলিন করিয়া দিল।

• • • •

রাজার অন্তঃপুর ভেদ করিয়া একটি করুণ সুর রাজার কানে গিয়া বিঁধিল। রাজা মোহাবিষ্টের ন্যায় শয্যায় শুইয়া রহিলেন। মূর্চ্ছার বেগ দূরীভূত হইলে, তবুও তাঁহার কানে সেই সুরের রেশ ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল।

সংবাদ লইয়া জানিলেন) এক রাখালবালক প্রতিদিন গভীর নিশীথে চাঁপা বনের ধারে বসে বাঁশী বাজায়। মহারাজ হুকুম দিলেন—শীঘ্র হাজির কর সেই রাখালবালককে।

হরিবসন পরিহিত এক রাখালবালক রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সভায় সকলে বিস্ময়ে

সেই রাখাল বালকের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—তাহার দেহের লাবণ্য ও মুখের দিব্য জ্যোতিঃ।

মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক, তুমিই কি রাত্রে চাঁপার বনে বাঁশী বাজাও?"

"হাঁ মহারাজ!"

"বাঁশী না বাজিয়ে কি তুমি থাকতে পার না বালক?"

"না মহারাজ!"

"তোমার সন্ধান যাবে যদি তুমি পুনরায় নিশীথে বাঁশী বাজাও?"

"আমি মরতে প্রস্তুত কিন্তু বাঁশী বাজান ছাড়ব না—বাঁশীই আমার প্রাণ ও জীবন—মহারাজ!"

মহারাজা বালকের অসীম সাহস এবং অনিন্দ্য দেহের গঠন এবং মুখের অপরূপ লাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন, কিছুই বলিলেন না কিন্তু মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সহসা প্রধান মন্ত্রী রাজসভার নীরবতা ভাঙ্গিয়া কহিলেন, "রাজন্, ও রাখালবালক নয়—ছদ্মবেশী রাজপুত্র!"

মহারাজা চমকিত হইয়া কহিলেন, "মন্ত্রী! এটা কি ঠিক?"

"হাঁ মহারাজ, এ ঠিকই।"

"কুমার, তুমি রাখালবালক নও—ছদ্মবেশী রাজপুত্র। রাজপুত্রের কি বাঁশের বাঁশী বাজান উচিৎ! আমি তোমাকে সোণার বাঁশী দেব, তুমি উহা ত্যাগ কর।"

"না মহারাজ, এই বাঁশীই আমার প্রাণ—আমার সব।"

এই বলিয়া রাখালবালক বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে রাজসভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

বালক চলিয়া গেল বটে, কিন্তু সুরের রেশ রাজসভাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিল।

যখন সকলের চমক ভাঙ্গিল—তখন দ্বিপ্রহর।

হঠাৎ দৌবারিক আসিয়া চকিতে কহিল, "মহারাজ, মহারাজ-কুমারী প্রভাত হইতে নিরুদ্দেশ।"

মহারাজা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "রাখালবালক, তুমি আমার সবই নিয়ে গেলে, কিছুই রেখে গেলে না?"

সভাস্থ সকলে বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

নিঝুম-রাণী

(শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী)

আমি রাতভিখিরী—নিত্যি ফিরি নিঝুমরাণীর দরবারে—
পাগলমনের খোস্ খেয়ালের ধরকারে;
হাত বাড়িয়ে নাইক কোন ধন চাওয়া,
মুখ ভারিয়ে নাইক কারো মন পাওয়া'—
দাবী-দাওয়া নাই কিছু সে সরকারে!

থাকে থাকুক চাঁদ আকাশে, তারার আলো—নয়ত নয়,
সন্ধ্যা থেকেই অন্ধ আকাশ হয়ত হয়;
রাত্রি-দেবীর ছত্রতলের কোন্‌টিতে
জোনাই জ্বলে শুধু পাশের বনটিতে,
রইবা একা—নাইক কোন ভাব্‌নাভয়।

আমি চলি আপন মনে রাণীর গোপন সন্ধানে,
সন্ধ্যা হলেই সে যে আমায় মন টানে ;
তার সে ডাকের নাইক ভাষা কিছুরে,
আঁধার সাথে বসে সে যে চিৎ ঘুড়ে' ;
খুঁজে' বেড়াই কোন্‌খানে রে কোন্‌খানে।

দিবালোকের বেড়ার শেষে, কোলাহলের আড়পারে,
ঠেলাঠেলির রংমহলের বা'র-দ্বারে—
শূন্যে ছাওয়া অনন্ত তার মন্দিরে
ঘুরে' বেড়াই গোলকধাঁধায় বন্দী রে—
কোথায় রাণী হাৎড়ে বেড়াই চারধারে।

ফুলের গন্ধ ইঙ্গিতে সে হঠাৎ বলে—এই খানে!
কোন্‌খানে তা মনে-মনে সেই জানে ;
তারার আলো মাথার উপর কয় হেসে—
ওখানে নয়, এই খানেতে রয় যে সে—
হাওয়া বলে—কাক কথায় নেই মানে।

দাতার দেখা নাইক তবু দানে যে তার মন ভরে,
নিতি রাতে পাই সাড়া তার অন্তরে ;
মানুষটাকে আড়াল করে' সর্ব্বদা
তৃপ্তি বিলায় কে যেন রে সর্ব্বথা—
শান্তি দিয়া নীরবতায় মন্তরে।

নিশুতরাণী চুপটি করে' হাসে মোহন ভঙ্গীতে,
নিশীথরাতের নীরব মিথুন সঙ্গীতে ;
যে সঙ্গীতে ফুল ফুটে আর চাঁদ উঠে,
যে সঙ্গীতে মলয় হাওয়ার বাঁধ টুটে—
সীমা চাহে সীমার বাঁধন লঙ্ঘিতে।

কথা-সাহিত্যের বর্ণন-ভঙ্গী

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল)

বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সাধারণ ভাবে কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। অনেকের ধারণা, জীব-জন্তু ও অতি-প্রাকৃত ঘটনা বালকদিগের যেরূপ চিত্ত-বিনোদন করিয়া থাকে, গল্প, উপন্যাস বা চিত্র সেইরূপ বয়োবৃদ্ধদিগেরও করিয়া থাকে। কথা-সাহিত্যিকেরা আমাদিগের মনে আনন্দ দিবার জন্য কাল্পনিক ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি করিয়া, আপনাদিগের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানগর্ভ বচনগুলি সৃষ্ট চরিত্রের মুখ দিয়া বাহির করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বর্ণন-ভঙ্গী অধিকাংশ স্থলে হৃদয়গ্রাহ্য হয় বলিয়া পাঠকেরা বাস্তবিকই আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। এক কথায় বলিতে গেলে, ইঁহাদের মতে চরিত্র-সমালোচনাই কথা-সাহিত্যিকের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেবল মাত্র আখ্যান-ভাগ বিস্তারিত করিয়া বলিবার উদ্দেশ্যে ইঁহারা আপনাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া থাকেন—সুন্দর চরিত্র-সৃষ্টি ইঁহারা করিয়া থাকেন ;—অভিজ্ঞতালব্ধ সাংসারিক জ্ঞানের কথা ইঁহাদের লেখায় প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় ; প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম করিয়া বর্ণন করিতে ইঁহারা সিদ্ধহস্ত ; মনোবিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে অনুভূতির বিশ্লেষণও ইঁহারা করিতে পারেন ; কিন্তু মনোজ্ঞ ভাবে বর্ণন করিতে পারেন না বলিয়া, অনেক সময় সফলতা লাভ বা পাঠকদের চিত্ত-বিনোদন ও করিতে পারেন না।

কথা-সাহিত্যের উদ্দেশ্য, মানব-জীবনের সত্য-গুলিকে কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনার ভিতর দিয়া পরিস্ফুট করা। প্রকৃত কথা-সাহিত্যিকেরা কেবল মাত্র আমাদের চিত্ত-বিনোদন করেন না -আমা-দিগকে শিক্ষাও দিয়া থাকেন। সমাজবদ্ধ মানব-সমষ্টির জন্য যে সমস্ত সমস্যা উঠিয়া থাকে, তাহাদের সমাধান কথা-সাহিত্যিকেরাই করিয়া দেন। আমাদের এই শিক্ষকদিগের পদ্ধতিটা কিন্তু প্রবন্ধ-লেখকদিগের পদ্ধতির মত নয়। প্রবন্ধকারেরা সংক্ষিপ্ত ভাবে কেবল মাত্র গুণ-বর্ণন করিয়া (abstractly) যাহা বলিতে চান, কথা-সাহিত্যিকেরা তাহাই গুণময় করিয়া, রক্তমাংস-গঠিত শরীরের ভিতর দিয়া ও বেষ্টনীর মধ্যে তাহাদিগকে উপস্থাপিত করিয়া মূর্ত্তিভাবে (concretely) তাহাই বলিতে চান। প্রভেদ এইমাত্র। ফলশ্রুতিতে কিন্তু পার্থক্য বিশেষ ভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবন্ধ-লেখকের বক্তব্য সাধারণ পাঠকের "কাণের ভিতর দিয়া অধিকাংশ স্থলেই মরমে পশে না।" abstract বা নিরবচ্ছিন্ন সত্যের ধারণা করা সহজ নয়। মনের ভিতরও তাহা শীঘ্র মুদ্রিত হইয়া যায় না ; কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও চরিত্রের ভিতর দিয়া যে সত্য পরিস্ফুট হয়, তাহা হৃদয়গ্রাহী ও যেমন হয়, মনের ভিতর তেমনি একটা স্থায়ী চিহ্নও রাখিয়া যায়। কোনও কোন পাঠকের ধারণা, কথা-সাহিত্যিকেরা কাল্পনিক জগৎ লইয়া থাকেন—সত্য তাঁহাদের বিষয়ীভূত নয়। কথাটা কিন্তু আদৌ ঠিক নয়। কাল্পনিক বা প্রতিভাসিক জগৎ আর সত্য ঠিক বিপরীতার্থক শব্দ নয়। কল্পনার বিপরীতাত্মক শব্দ হইতেছে, 'ঘটনা'। ইংরাজেরাও fact ও fiction এই দুইটী শব্দে এই পার্থক্যই বুঝাইয়া থাকেন। 'ঘটনা' সত্যের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কথা-

সাহিত্যিকেরা কেবলমাত্র বাস্তব ঘটনা লইয়া ব্যস্ত থাকেন না বলিয়া সত্য যে তাঁহাদের বিষয়ীভূত নয়, এ কথা বলা যায় না। বাস্তব ঘটনা ছাড়িয়া সত্যকে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলিবার জন্য ভাবুকতার (Idealism) বা আদর্শবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। Clayton Hamilton তাঁহার Materials and Methods of Fiction নামক পুস্তকে সত্যই বলিয়াছেন,—'The novelist forsakes the realism of fact, in order that he may better tell the truth, and lures the reader away from actualities in order to present him with realities.' প্রকৃত কথা হইতেছে, মানব-জীবনের ঘটনাই কথা সাহিত্যিকের ক্ষেত্র। তাঁহারা মানব-জীবনের সত্য অনুভূতিগুলি বর্ণন করিয়া থাকেন। কথা সাহিত্যিক একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও কলাবিৎ। মানব-জীবনের পরীক্ষিত সত্যগুলি পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিতে হইলে, কেবল পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করিলে চলে না। সেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। সাংসারিক অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনফলে মানব-চরিত্রের নানা দিক দেখিয়া, কথা-সাহিত্যিক যে সকল সত্যে উপনীত হন, সেগুলির যথাযথ বর্ণন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য; সত্য-নির্দ্ধারণের জন্য তাঁহাকে বিজ্ঞানের আশ্রয় লইতে হয়। এই সকল সত্যের উপর তাঁহাকে কল্পনাবলেগৃহ-নির্ম্মাণ করিতে হয়। এই গৃহের পরিকল্পনা তাঁহারই মস্তিষ্ক-প্রসূত। এখানে তিনি দার্শনিক। আবার গৃহকে সুসজ্জিত ও নয়নাভিরাম না দেখিলে, পাঠক তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না; তাই তাঁহাকে কলাবিদের ন্যায় গৃহকে সুসজ্জিত করিতে হয়। এখানে তিনি আর্টিষ্ট বা কলাবিৎ। আখ্যান-ভাগ মনোমোহকর ভাষায় বলিবার ভঙ্গীতে বা বর্ণনে আর্ট বা কলার বিশেষ প্রয়োজন। কথা-সাহিত্যিককে আমরা একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও কলাবিৎ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছি; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, এই গুণত্রয়ের সম্যক্ সমন্বয় খুব কম লেখকের লেখায় দেখিতে পাওয়া যায়। Emile Zola বা Jane Austenএর লেখায় বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সত্য-নির্দ্ধারণের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়; George Eliot বা টলষ্টয়ের লেখায় দার্শনিক সত্যের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, বলিতে পারা যায়, বাস্তববাদীদের লেখায় প্রথমোক্ত, ও আদর্শবাদীদের লেখায় দ্বিতীয় প্রকার সত্যের নিদর্শন ফুটিয়া উঠে। 'দার্শনিক সত্য' অর্থে বুঝিতে হইবে, দার্শনিক চিন্তা-প্রসূত সত্য। আদর্শ-বাদীরা প্রথমে মানব-জীবনের কোন একটা সত্য অবতারণা করিয়া, ঘটনা বা চরিত্রের সাহায্যে তাহাই পরিস্ফুট করেন। ইহাকে অবরোহ-পদ্ধতি বা Inductive Method, আর বাস্তব-বাদীদের প্রথাকে আরোহ-পদ্ধতি বা Deductive Method বলা যাইতে পারে। এই দুই শ্রেণীর লেখকদিগের ভিতর কেবলমাত্র পদ্ধতির পার্থক্য দৃষ্ট হয়। Washington Irving কলাবিৎ কথা-সাহিত্যিক। বর্ণন-ভঙ্গীর গুণে তিনি আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। হ্যামিলটন সাহেব তাঁহার পুস্তকে কথা-সাহিত্যিকের এই গুণত্রয়ের বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

এক্ষণে, সত্য ও মিথ্যা সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিলে, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সত্য-মিথ্যার ধারণা সাধারণতঃ আমরা সহজাত-জ্ঞান-বশে (instinct) করিয়া থাকি। এই ধারণাকে আমরা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা যাচাই করিয়া লই। যদি কথা-সাহিত্যিকের সৃষ্ট চরিত্র মনস্তত্ত্ববিদের নিয়মানুসারী হয়, তাহা হইলে আমরা তাহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লই; তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রে আমরা আস্থাবান হই। ঘটনা সম্বন্ধে ও এই কথা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। নিজের মনো-

বড় ঘটনা সৃষ্টি করিলে চলিবে না। যে অবস্থায় পড়িলে মানব যে ভাবে আপনার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, সেই অবস্থায়, সেই ভাবের কথা না বলাইলে তাঁহার ঘটনায় কেহ আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। মিথ্যার আশ্রয় লইয়া কোন দেশের কোন কথা-সাহিত্যিক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। পাঠকদিগের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া, মিথ্যাকাল্পনিক চরিত্র বা অস্বাভাবিক ঘটনা সৃষ্টি করিয়া, দুই দিন লোকের নিকট প্রশংসা লাভ করিতে পারা যায়; কিন্তু স্থায়ী যশঃ অর্জ্জন করা যায় না। তাই যে সকল কথা-সাহিত্যিক জগতের সাহিত্যে বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেহই মিথ্যার সাহায্য লন নাই। তাঁহারা সত্যের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কোনও কোন কথা-সাহিত্যিক কোন একটা সত্যের অপ্রভূতরূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, আবার কেহ-কেহ সত্যকে নূতন আকারে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর লেখকের সংখ্যাই অধিক। ইঁহারা বর্ণনভঙ্গী-গুণে সনাতন সত্যগুলিকে নূতন আকারে আমাদের সম্মুখে আনয়ন করেন। নূতন সত্যের প্রচার সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়। জগৎ বহুদিনের পুরাতন। মানবীয় ভাব সকল বহুদিন হইতে গল্পচ্ছলে নানা ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। গল্পের আখ্যান-ভাগও নানা দেশে, নানা ভাষায়, নানা আকারে ব্যক্ত হইয়াছে। নূতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায় প্রচারের বাণীতে—ভাষার ভঙ্গীতে। লেখকের চারিত্র্য-মাধুর্য্যে ও বর্ণন-ভঙ্গীতে-পুরাতন সত্য নূতন ভাবে প্রচারিত হইয়া আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়া থাকে। সন ১৯২১ সালের Teacher's World পত্রিকায় ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের সংখ্যায় এক পৃষ্ঠাব্যাপী 'On Telling a Story' নামক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহাতে লেখক মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন,—"The greatest story-tellers in the world have not even troubled to invent their own stories, but have simply repeated the tales told by others before them, clothing each tale with the graces of their own personality." দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেক্সপীয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া ডিকেন্স পর্য্যন্ত লেখক মহাশয়েরা কে কাহার নিকট কতটা ঋণী, তাহা তিনি বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতে চাহি না—আমরা চাই, গল্প লেখকের সাহিত্য বর্ণিত হইয়াছে কি না দেখিতে—দেখিতে চাই, মনের মধ্যে কোন একটা সত্যের জীবন্ত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না।

একণে দেখিতে হইবে, কিরূপ ভাবে আখ্যায়িকা বর্ণন করিলে, মানবের মনোরঞ্জন ও শিক্ষা একাধারে হইতে পারে। কলাবিৎ কথা-সাহিত্যিক এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া লেখনী চালনা করিয়া থাকেন।

অনেকেরই ধারণা, উপন্যাস বা ছোট গল্পে চরিত্রগুলি লেখকের আত্ম-চরিত্রের অনুরূপ হইলে, অধিকতর প্রীতিপ্রদ হয়। পুরাতন লেখকেরা এই পদ্ধতিকে প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া ধরিতেন। ইংরাজী লেখকেরা ইহাকে Autobiographical Method বলিয়া থাকেন। তিনিই প্রকৃত কথা-সাহিত্যিক, যিনি আপনার ভাব ও অনুভূতি দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিতে পারেন; এবং এগুলি যে সত্য, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহই হইতে পারে না, কেন না লেখক মহাশয় উহা স্বয়ং অনুভব করিয়াছেন। আত্মানুভূতি অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কোথায় পাওয়া যাইতে পারে? মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও বলিয়া থাকেন, Self-consciousness is the direct test of proof. কিন্তু একথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে, প্রত্যেক আখ্যায়িকাকারের সৃষ্ট চরিত্র সম্বন্ধেও ঐ কথা বলিতে পারা যায়। তাহা হইলে, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য থাকে না। কথা-সাহিত্যিক ডিকেন্সের

সম্বন্ধে এ কথা বলবার শ্রুত হইয়াছে যে, প্রত্যেক গল্প লিখিবার পর, তিনি দুর্বল হইয়া পড়িতেন, কারণ তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রাণ দিয়া লিখিতে হইত। প্রাণের অনেকখানি শক্তি, ঐ চরিত্র সৃষ্টি কার্য্যে ব্যয়িত হইত—সেগুলি তাঁহার আত্মানুভূতির প্রতীক মাত্র ছিল। ('Dickens grew perceptibly older and weaker with every tale he wrote; for the great story-teller pours a part of his own life into each of his works') আর এই কারণে তাঁহার লেখায় অনেকে তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। শক্তিধর লেখকের হস্তে এই পদ্ধতি-অনুসারী অঙ্কিত চিত্র পাঠকের মনে অনুরূপ ভাব উদ্রেক করিবার অমোঘ অস্ত্র। কৌশলী, কলাবিৎ লেখকের বর্ণন ভঙ্গীগুণে ভাব ও অনুভূতি-গুলি পাঠ করিবামাত্র পাঠকের মনে এরূপ ভাবে মুদ্রিত হইয়া যায় যে, তাহা কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারা যায় না। আর অক্ষম লেখকেরা এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া, পাঠকদিগের নিকট 'অহংজ্ঞানে'র—আত্মানুভূতির উৎকট চিত্র অঙ্কিত করিয়া আপনাদের অক্ষমতার পরিচয় দেন ও পাঠকদিগের মনে বিরক্তির ভাব উদ্রেক করিয়া থাকেন। লেখকদের মনে রাখা উচিত, পাঠকদের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে – তাঁহারা কেবলমাত্র লেখকদিগের তথাকথিত আত্মানুভূতির চিত্র দেখিতে চান না—তাঁহারা চান, ঐগুলি যাহাতে মনস্তত্ত্বের অনুকূল হয়। কথা-সাহিত্যে আত্মানুভূতিরও স্থান প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়; কিন্তু সেগুলি যেন কোন রূপে মনস্তত্ত্বের নিয়ম সকলের বিরুদ্ধে না যায়। আর লেখক মহাশয়-দিগকেও এ ক্ষেত্রে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, তাঁহারা যেন আপনাদিগকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখিতে পারেন। কোনরূপে যেন ধরা না দেন যে, তাঁহারা আপনাদের ভাব ও অনুভূতির বিবৃতি করিতেছেন। পাঠকেরা যেন বুঝেন যে, তিনি মানবতার আদর্শ চিত্র বা যথাযথ বাস্তব চিত্রই অঙ্কিত করিতেছেন। আর এই কারণেই ইংরাজের 'The Golden Ass, Gil Blas, Robinson Crusoe, David Copperfield প্রভৃতি পুস্তকগুলি আজিও আনন্দের সহিত অধীত হইয়া থাকে।

কথা-সাহিত্যিকেরা সময় সময় অন্য এক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। কাল ও পাত্রের, দূরত্বের ও ব্যবধানের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া বায়স্কোপের চিত্রের ন্যায় লেখক মহাশয়েরা আমাদের নয়ন সম্মুখে চিত্রগুলি উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন। একত্বের দিকেও ইঁহাদের লক্ষ্য থাকে না। কেবল মাত্র বর্ণিতব্য বিষয়ের দিকেই ইঁহারা অবহিত হন। এই পদ্ধতিকে ইংরাজীতে Cinematographical Method বলা হয়। অবশ্য ইঁহারা গল্পের জন্য চরিত্র বা ঘটনার সৃষ্টি করেন। ইঁহারা অথবা কতক-গুলি দৃশ্যের অবতারণা করিয়া কাল ও স্থানের এক-ত্বকে দূর করিতে চান ('The Cinematograph Story proceedss by a series of scenes which often transgress all the unities of time and place') চিত্র দেখিতে অনেকেই ভাল-বাসেন; প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেকেরই মনে আনন্দের লহর ও সৌন্দর্য্যানুভূতির উদ্রেক করে বলিয়া এই শ্রেণীর কথা-সাহিত্য পড়িতে অনেকেই ভালবাসেন। দুঃখের সহিত কিন্তু বলিতে হয় যে, এই শ্রেণীর লেখকেরা অধিকাংশ স্থলে অতিপ্রাকৃত বা অপ্রাকৃত দৃশ্য উপস্থাপিত করিয়া বিচক্ষণ পাঠকের নিকট উপহাসাস্পদ হন।

আমাদের মনে হয়, উপরোক্ত দুইটী পদ্ধতির গুণগুলি একত্র করিয়া কথা-সাহিত্য লিখিত হইলে ভাল হয়। কথা সাহিত্যে মানবীয় ভাবের ও অনু-ভূতির চিত্র থাকা উচিত, কিন্তু কোনও ব্যক্তি-বিশেষের বা লেখক মহাশয়ের বিশেষ কো-অনুভূতির চিত্র না থাকাই উচিত। সাধা-মানবের ভাব ও অনুভূতি থাকা প্রয়োজন; ক-

ব্যক্তি-বিশেষের ভাব তাঁহার নিজস্ব, eccentric হইতে পারে—উহা তাঁহার বিকৃত-মস্তিষ্ক-প্রণোদিত হইতে পারে। ঘটনা ও চরিত্র প্রাকৃতিক বেষ্টনীর ভিতর দিয়া ফুটিয়া থাকে। এই বেষ্টনীর চিত্র যতটা সজীব ও স্বাভাবিক হয়, ততটাই ভাল। কিন্তু চিত্র দিবার অনুহাতে মনঃকল্পিত অপ্রাকৃত চিত্রকে প্রাকৃত চিত্র বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করা কোনমতেই উচিত নয়।

গল্পের বর্ণন-ভঙ্গী বহমানা স্রোতস্বতীর ন্যায় প্রবাহিত হওয়া উচিত। অস্বাভাবিক উপায়ে এই প্রবাহের গতি যেন কিছুতেই রুদ্ধ না হইয়া যায়। সরল, সতেজ লীলাভঙ্গে গল্প আপনার পথে চলিবে। গল্পের ভিতর এমন কোন অবান্তর কথা আনা উচিত নয়, যাহাতে পাঠকের মন প্রকৃত ঘটনা হইতে ঘুরে সরিয়া যায়। অনেক লেখক শিক্ষা দিবার ছলে অবান্তর কথা আনিয়া পাঠকের মনে বীতির সঞ্চার করিয়া দেন। গল্পের বর্ণন ও শিক্ষা যুগপৎ না দিতে পারিলে, কোনও কথা-সাহিত্যিকই সফলকাম হইতে পারেন না।

এইবার আমরা কথাসাহিত্যে নব-প্রচলিত 'কথোপকথন পদ্ধতি' সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। দৃশ্য বা ঘটনার বর্ণন না করিয়া, কেবলমাত্র চরিত্রদিগের কথা বার্ত্তার ভিতর দিয়া বক্তব্য বিষয় ও দৃশ্য ও ঘটনার যথাযথ বর্ণন এই পদ্ধতিতে অনুসৃত হইয়া থাকে। অবশ্য এ পদ্ধতিতে কৃতকার্য্য হওয়া বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কথা-সাহিত্যের অনেক বাঙ্গালী পাঠককে বর্ণনার অংশ বাদ দিয়া, কেবল মাত্র কথোপকথন অংশ পাঠ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি,—জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছি, —বর্ণনা আমরা চাই না—উহা পাঠ করিবার সময়ও আমাদের হয় নাই, বুঝিবার ক্ষমতাও যে আমাদের আছে, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। আমরা চাই, ঘটনার বিবৃতি। ইহাদের কাছে কথা-সাহিত্য ঘটনার ফিরিস্তি মাত্র। বোধ হয় এইরূপ ভাবে ভাবিত পাঠক ইংরাজদিগের মধ্যেও অনেকে আছেন। তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই বোধ হয় কথোপকথন ছলে প্রাকৃতিক দৃশ্য-বর্ণন ও চরিত্র-সৃষ্টি এই নবোদ্ভাবিত পদ্ধতি দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। অমর বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী'তে এই পদ্ধতি প্রথমে প্রবর্ত্তিত করেন; এবং ইহার ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন যে, "উপাখ্যানের অংশ বিশেষ, নায়ক বা নায়িকা বিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা, প্রচলিত রচনা-প্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নূতন নহে। উইল্‌কি কলিন্স কৃত "Woman in white" নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়।' ঠিক বলিতে পারি না, কি কারণে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রথায় আর কোন উপন্যাস লেখেন নাই। আমাদের বোধ হয়, লেখকের বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া বলিবার ইহাতে সুবিধা হয় না ভাবিয়া বঙ্কিমবাবু এ পদ্ধতি ত্যাগ করেন। কিন্তু অধুনা এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শক্তিশালিনী লেখিকা Elizabeth Robins তাঁহার Magnetic North পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রাকৃতিক বর্ণনে এক অক্ষরও না লিখিয়া, কেবলমাত্র সৃষ্টচরিত্রদের কথোপকথনের সাহায্যে উত্তর মেরুর নয়নাভিরাম দৃশ্য-সমূহ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ফরাসী কথা-সাহিত্যিক ভূষা এই পথ অবলম্বন করিয়া চরিত্র ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণন সুন্দরভাবে করিয়াছেন। বাঙ্গালা-সাহিত্যে এখনও এ পদ্ধতি অনুসৃত হয় নাই বলিলেও চলে; আমার যতদূর স্মরণ হইতেছে তাহাতে বলিতে পারি, প্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার অনবদ্য সুন্দর "চার-ইয়ারী কথা"য় এই পদ্ধতি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহার পরে প্রাচীন সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'সীমন্তিনী'তেও ইহার অবতারণা করেন মহাশয় 'পাগল' উপন্যাসেও এই

পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন। এই পদ্ধতি-অনুসৃত কথা-সাহিত্যে সত্য ও মিথ্যার—সঙ্গতি অসঙ্গতির পার্থক্য ভাল করিয়া দেখা উচিত। কথাবার্ত্তায় লেখক মহাশয়ও সত্য পথ হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন। অনেক সময় যে প্রকৃতির লোকের মুখ হইতে বিভিন্ন ভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমরাও সে সময় ইবসেনের Assessor Brack-এর সহিত বলিয়া উঠি, "People don't do such things"—মানুষে এ অবস্থায় পড়িলে এরূপ ভাবে কাজ করে না, বা এরূপ কথা বলিতে পারে না।

মনুষ্য-চরিত্রেও যদি আমরা হঠাৎ কোনও পরিবর্ত্তন দেখি, এবং উহার যদি আমরা যুক্তিযুক্ত কোন কারণ দেখিতে না পাই; তাহা হইলে উহাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। সেক্সপীয়ার "As you like-it" এ দুষ্টুর অলিভারের চরিত্র যখন পরিবর্ত্তিত করিয়া, তাহাকে সিলিয়ার ভালবাসা লাভ করাইলেন দেখি তখন আমরা বিস্মিত হই, মানব চরিত্রাভিজ্ঞ সেক্সপীয়ার এত বড় মিথ্যাটার কি করিয়া প্রশ্রয় দিলেন। অবশ্য একথা চারিত্রিকেরাও বলিয়া থাকেন, 'মানব চরিত্র কখনও একথাতে প্রবাহিত হয় না'—এবং আমরাও জীবনে কখনও কখন সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখিয়াছি; কিন্তু 'স্বভাব' (habit) ও যে 'মূর্ত্তিমি বর্ত্ততে' —'স্বভাব যায়না মলে'—তাহা ভুলিলে ত চলিবে না।

ঘটনা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। জর্জ্জ এলিয়ট যখন তাঁহার Mill on the Floss-এর পরিসমাপ্তি করিতে পারিতেছেন না দেখিলেন, তখন নায়ক-নায়িকা Tom ও Maggie Fullivertকে বন্যায় ডুবাইয়া মারেন। এক্ষেত্রেও আমরা তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। উদাহরণ কয়টীই Clayton Hamilton-এর পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অধুনা ইংরাজী সাহিত্যে আর এক নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। এ পদ্ধতিতে সমুদায় ঘটনা বক্তার ভাবানুভূতি দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রাগুক্ত 'On Telling a Story'র লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন,—'The method by which all the incidents of the tale are told, through the consciousness of the narrator.' Miss Dorothy Richardson এই প্রথায় লিখিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এ পদ্ধতির দোষ হইতেছে যে, অঙ্কিত চরিত্র লেখক মহাশয়ের অনুভূতি-লব্ধ জ্ঞানের দ্যোতক হইবে; কিন্তু এক ব্যক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ফলে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ অনুভূতি লেখকের হাতে একই ছাঁচে গড়িয়া উঠে।

এক্ষণে ভাষা সম্বন্ধে দু একটা কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। মনোজ্ঞ ভাষায় কথা-সাহিত্য লিখিত হওয়া উচিত। লেখ্য-ভাষায় বা সাধু ভাষায় লিখিত হউক বা কথ্য-ভাষায় লিখিত হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু 'গুরু চণ্ডালী দোষ' যাহাতে না থাকে, সেদিকে লেখকদিগের অবহিত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। কথোপকথনের ভাষা কথ্য চলিত ভাষা হওয়া উচিত। যে সমাজের বা যে শ্রেণীর লোক যে ভাষায় কথা কহিয়া মনের ভাব প্রকাশ করে, সেই ভাষায় ভাব প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি।

"পাবো"

(শ্রীলীলা দেবী)

যেদিন আমি সকল ছেড়ে
পথের মাঝে যাবো
সেদিন আমি আমায় ভুলে
তোমায় প্রাণে পাবো,
সকল দেহ আঘাত ক্ষত
যখন আমি ধরার মত
পায়ের তলায় অবিরত
নীরব প'ড়ে রব,
আকাশ যেমন বুকে ধ'রে
আছে নিবিড় স্নেহের ভ'রে
যেদিন আমি তেমনি ক'রে
সবারে বুকে চাবো
সেদিন তোমায় পাবো !

বাঁশীর সুর

(গল্প)

(শ্রীনিশিকান্ত সেন)

রাজকন্যা কল্পলতার শুইবার ঘরের পূর্বদিকের যে ফুলবাগান, তার ও-পাশ থেকে একটা বাঁশী বাজিয়া উঠিত—জ্যোৎস্নাটা একটু ঘোরাল হইলে, হাওয়ার গতিটা ফুলের গন্ধে একটু মন্থর হইলে, কল্পলতা জানালায় মাথা রাখিয়া ভাবিতেন, বুঝি অমনি একটা বাঁশী যমুনাকূলে বাজিত, অমনি একটা বাঁশীর সুরে যমুনার জল উজানে বহিত, গোপীরা কূলে জলাঞ্জলি দিত, অমন মধুর বাঁশী যে বাজায় না-জানি সে কত সুন্দর !

ওদিকে কল্পলতার রূপলাবণ্য কিন্তু মন্ত্রিপুত্র বীরভদ্রের প্রাণে সত্য সত্যই মোহনবাঁশী বাজাইতেছিল। এ জগতের নিয়মই হইতেছে এই যে, যে যাহাকে চায়, সে তাহাকে পায় না। বীরভদ্রের দিক হইতে সম্বন্ধের কথা উঠিলে অবশ্য আর কাহারও আপত্তি হইল না, আপত্তি হইল, শুধু যাঁহার বিবাহ তাঁহার। তিনি মুখ বাঁকাইলেন। বীরভদ্রের প্রস্তাব সুতরাং মুকুলেই ঝরিয়া পড়িবার মতো হইল।

মন্ত্রিপুত্র বীরভদ্র যদিও বীর ছিলেন না, কিন্তু তিনি ভদ্র ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার বুদ্ধি ছিল ক্ষুরাগ্র। তিনি কল্পলতার পেয়ারের দাসীকে হাত করিয়া তাঁহার মনের গতি জানিয়া লইলেন। ফলে, দিন কতকের মধ্যেই, সেই যে বাগানের ও-পাশের বাঁশী-বাজিয়ে, সেই হইল তাঁহার ওস্তাদ—তিনি তাহার কাছে যথারীতি বাঁশীর সাকরেদী আরম্ভ করিয়া দিলেন। শিক্ষা শেষ হইলে বীরভদ্র ওস্তাদকে হাজার টাকা বকশিস্ দিয়া বলিলেন, "তোমাকে এখনি এরাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে, নইলে তোমার মঙ্গল নেই।"

ওস্তাদ অবাক্ হইয়া একবার বীরভদ্রের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর আর কথাটি না কহিয়া আসন ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বকশিস্—যাহার

বকশিস তাঁহার পায়ের কাছেই পড়িয়া রহিল।

বহু দিন পরে আবার বাগানের ও পাশে বাঁশী বাজিল। রাজকন্যার মনে হইল, যেন সেই বাঁশী। দাসী কহিল, "একবার তো দেখে এসে হয় রাজকন্যা, কে বাজায়।" কল্পনার আপত্তি হইল না, তা বলা বাহুল্য। বেড়াইবার ছলে বাহির হইয়া তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, বাঁশী-বাজিয়ে আর কেউ নয়—স্বয়ং মন্ত্রিপুত্র বীরভদ্র।

যে মন্ত্রিপুত্রকে একদিন কল্পনতা দু চক্ষে দেখিতে পারিতেন না, আর একদিন সেই মন্ত্রিপুত্র তাঁহার চোখে রূপের চমক লাগাইলেন। তারপর যথাসময়ে বে'র বাঁশী আকাশে বাতাসে চকিত করিয়া দিগ্বিদিকে তাঁহাদের মিলনবার্তা ঘোষণা করিয়া দিল।

* * *

জোৎস্না মূর্চ্ছিত হইয়া চলিয়া পড়ে, বাতাস উদাস হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, ফোটা ফুল অবশপ্রাণে দুলায় লুটায়।

রাজকন্যা বলেন, "বাঁশী বাজাও—যেমন করে আগে বাজাতে, ঐ ফুল বাগানের ও-পাশ থেকে।"

বীরভদ্র বাঁশীতে ফুঁ দেয়, সেথা সুর বাঁশীতে প্রাণপণে বাজাইয়া তুলিতে চান। কিন্তু কল্পনতার প্রাণের তারে ঘা লাগে না, আনন্দের শিহরণ জাগিয়া উঠে না। তিনি বাগানের শেষ প্রান্তে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, আর স্তব্ধ হইয়া ভাবেন, ফাঁকি, ফাঁকি—দুনিয়াটাই একটা মস্তবড় ফাঁকির কারসাজি। চোখে তাঁর জল দেখা দেয়।

ছায়া

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ)

তোমরা থাক আলোক লয়ে
আমরা ছায়ার পক্ষপাতী
আয়গো ছায়া, আয়গো মায়া,
করুণ কোমল বক্ষ পাতি।
আয়গো ছায়া তাপ নিবারি
আয় গো ছায়া শান্তি বারি,
আয় গো ধূলি মলিন করে
লক্ষ দিবার কক্ষ ভাতি।

২

ফুটুক আলোর নিমন্ত্রণে
ঢিল্ চাঙকে তূর্য আনি,
ফুটুক দিবার ফটিক পুরে
সূর্য্যমুখীর পূর্ণ হাসি।
ধরার বুকের পিক পাপিয়া
জন্মুক চাকে ছায়ায় গিয়া,
ফুলের বনে ছায়াই আনে
অস্ফুটদের পৌর্ণমাসী।

৩

ছায়ার মোদের জীবন ঘেরা
ছায়ার ঘেরা ভবনখানি
কত বুকের প্রতিচ্ছায়ায়
ভরলো জীবন, কজন জানি?
তোমরা বাসা বাঁধিতে চাহে
অরূপ বরণ সরোজ ছায়ে
ছায়াই ছেয়ে দেয় যে এ বুক
সমাগমের যৌবন খানি।

স্মরণ

[গল্প]

(শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অজিত রাশিকৃত কাগজপত্র ছড়াইয়া, তাহারই মধ্যে মাথা গুঁজিয়া কি করিতেছিল, সুষমা ধীরপদ-ক্ষেপে ঘরে ঢুকিয়া স্বামীর স্কন্ধোপরি বাহু রাখিয়া বলিল—আজ কি আর চান টান্ করতে হ'বে না?

অজিতের গম্ভীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সে হাসি মুখে বলিল—এই যে উঠি!

এই যে নয়—ওঠ। বারোটা বেজে গেছে।

ঃ—বারোটা। আর একটু খানি সুষমা! এই-টা শেষ করে নি, বেশী দেরী হবে না।

সুষমা আর কিছু না বলিয়া পার্শ্বের চেয়ার খানি টানিয়া বসিয়া পড়িল। অজিত একবার সস্নেহ দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া, আবার কি লিখিতে প্রবৃত্ত হইল।

সুষমা কাগজখানার দিকে চক্ষু রাখিয়া অনুযোগের স্বরে বলিল—তা' হলে তোমরা দু'জনেই আর নতুন কিছু লিখ্‌বে না বল—ঝগড়াই চল্‌তে থাক্‌বে?

অজিত বলিল—আমি ত ঝগড়া করতে চাই নে সুষমা। তুমি ত জান, প্রথম দু'চার বার অত গালাগাল খেয়েও আমি চুপ করেই ছিলাম, কিন্তু যখন আমাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে লাগল, আমার ঘরোয়া কথা নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আরম্ভ করলে তখন চুপ করে থাকা কি সম্ভব, না পারে কেউ? আর আজ পর্য্যন্ত আমি তার লেখারই সমালোচনা করছি, তার মত নীচ হয়ে কখনও ব্যক্তিগত একটি কথাও বলি নি,—তুমি ত সব দেখেছ, সব জান।

সুষমা কোন কথা কহিল না, কিন্তু তাহার মুখখানি বিষাদে ভরিয়া রহিল। অজিত তাহা দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত দুঃখ বোধ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল—ঝগড়া করা আমার স্বভাব নয় সুষমা, ঝগড়া করতে আমি পারি নে, চাই ও নে, কিন্তু সে যখন ক্রমাগত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুল্‌লে, তখনই না আমি তার বিরুদ্ধে কলম ধরেছি।

সুষমা নীরব।

অজিত লেখনী তুলিয়া লইয়া, আস্তে আস্তে লেখাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল—সাহিত্য সম্মেলনের গল্প ত তোমাকে আগেই বলেছি। সেখানে আমি নিজের চোখে দেখেছি, সাহিত্য শাখার সভাপতি রমেন্দ্র বাবু আমাকে নিয়ে লেখিয়েছেন, আমাকেই গালাগালি দিয়ে প্রবন্ধ লিখে নিয়ে গেছল, সভায় পড়বে বলে। সভাপতি অনেক বলে ক'য়ে সেটি পড়া বন্ধ করতে পেরেছিলেন! দেখ্‌ছ না, এ মাসের 'বিশ্ববাণীতে' সেইটাই ছাপিয়েছে।

সুষমা বলিল—দেখেছি।

অজিত সোৎসাহে কহিল—দেখেছ ত?—বেশ। এখন তুমিই বল আমি যদি তার একটা পালটা জবাব দিই, অন্যায় কি আমার হ'বে?

সুষমা সে কথার কোন উত্তর না দিয়াই বলিল—আমি ভাবছি কি অশুভক্ষণেই তোমরা দু'টি বন্ধুতে কলম ধরেছিলে! এত বন্ধুত্ব, এত মাখা-মাখি, এত মিল, কোথায় ভেসে গেল! এখন একে আরে মুখ দেখাদেখিও বন্ধ!

অজিত দুঃখক্লিষ্টস্বরে কহিল—সে দিন হঠাৎ ট্রামে দেখা। আমি যেখানটায় বসে ছিলাম, সেও

সেই খানেই ঢুক্‌ছিল, আমাকে দেখেই ও দিকের একটা বেঞ্চে গিয়ে বসে পড়ল!

সুষমা নতমুখে বলিল—একজন থাম্‌লেই কিন্তু সব ঠিক হ'য়ে যায়, আবার আগের মত।

না সুষমা, আগের মত আর হয় না। আর তা হ'য়েও দরকার নেই। আমার উপন্যাসের সমালোচনা করতে গিয়ে যে আমাকে নীচ, কাপুরুষ, যা-তা বলে গালাগাল দেয়, তেমন বন্ধু থাকার চেয়ে আমার যাওয়াই ভালো—অজিত থামিল। কিন্তু কথা কয়টি বলিতে বলিতে সে যে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, সুষমাও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে অনেকক্ষণ আর কিছুই বলিল না। একদৃষ্টে খোলা জানালার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অজিত বলিল—তুমি যাও সুষমা। আমি এটা শেষ করে এখনি উঠ্‌ছি।—সে লিখিতে লাগিল।

সুষমা উঠিল না, কাগজ চাপাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল—তোমার "কামনা" বেরুতেই বিবাদ সুরু হয়—না?

তোমার মনে আছে সুষমা! আচ্ছা বল, আমার দোষ কি। "কামনার" প্লট-টি আমরা দু'জনেই রমেন্দ্র বাবুর মুখে শুনেছিলাম। এক সঙ্গে সব মেদিনীপুর যাওয়া হ'চ্ছে, রমেন্দ্র বাবু ট্রেণেতেই গল্পটা বলেছিলেন। তখন যদি সমর বলত যে সে ওটি লিখ্‌বে, আমি নিশ্চয়ই লিখি নে, ও তা বলে নি। আমি বইটা লিখে ছাপিয়ে সবার আগে তা'কেই এক খানা দিয়ে এলুম, যেমন অঙ্গীকারও দিয়েছি; তার দিন কত পরেই 'বিশ্ববাণী' বেরুতে দেখি আমার "কামনার" সমালোচনা বেরিয়েছে, একেবারে গালাগাল। আমি চোর, আমি.....

বাধা দিয়া সুষমা বলিল—সমর বাবুরও ঐ গল্প "মোহ" নাম নিয়ে "বিশ্ববাণীতে" তখন বেরুচ্ছিল না?

হ্যাঁ বেরুচ্ছিল, তিন সংখ্যায় বেরিয়েছিল, কিন্তু আমি দেখিনি। দেখ্‌লে কখনই আমি "কামনা" ছাপাতাম না।

তুমি কেন সে কথা সমর বাবুকে বল্লে না?

বল্‌তেই গেছলাম। ঠিক দুপুরবেলা বাড়ীতে থেকেও চাকর দিয়ে সে আমাকে বলে পাঠালে, দেখা হ'বে না।

সমর বাবু বাড়ীতে ছিলেন?

ছিলেন। আমি ফটকে ঢুক্‌তি, সে গাড়ী থেকে নেমে উপরে উঠ্‌ল, আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম।

সুষমা অল্পক্ষণ পরে কহিল—এতে রাগের ত কোন কারণ আমি দেখি না। হলেই বা এক প্লট, দেখা ত ভিন্ন, এমন কি "কামনার" সঙ্গে "মোহের" শেষটাও অন্য রকম, তাই থেকেই যে তোমাদের মধ্যে এমনটা হ'বে—তার কারণ ত বুঝতে পারি নে।

অজিত মৃদুস্বরে বলিল—কারণ একটু রয়েছিল। "বিশ্ববাণীর" সঙ্গে "উদাসী"র সদ্ভাব কেমন, জানই ত! "উদাসীতে" কে একজন অকর্ণা নাম দিয়ে ওর ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসেরই আলোচনা করে বস্‌লো; বল্লে প্লট পুরাতন! "উদাসীর" সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক অজিত বাবুর কামনা উপন্যাসেরই অনুকরণ! এই হ'ল ওর রাগ! ও "বিশ্ববাণীতে" "কাক" নাম নিয়ে আমার বহির সমালোচনা করলে। আমি যে ওর তিন সংখ্যা "বিশ্ববাণীর" "মোহ" পড়েই গল্পটি লিখে, মাসিকে না ছাপিয়ে একেবারে বহি বার করে দিয়েছি—এই রাগেই সে না যা-তা বল্লে! আমাদের বন্ধুত্বের বরখাস্তিতেই সেই ত আগুন ধরিয়ে দিলে।

ঢং করিয়া ঘড়িতে একটা বাজিয়া গেল। সুষমা ঘড়ির দিকে চাহিয়া, চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—উঠ্‌বে না-কি?

অজিত বাম হস্তে সুষমাকে বেষ্টন করিয়া কাছে টানিতে টানিতে বলিল—উঠ্‌ছি সুষমা, আর একটু খানি।

না। একটুও না, ওঠ! খেয়ে দেয়ে পার তখন যা হয় করো; চল। বিকেল হ'তে চল্ল—ওঠ!

অজিত অনিচ্ছা ভরে কাগজপত্র চাপা দিয়া উঠিয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। অজিত বৈঠক খানায় বসিয়া একখানি সান্ধ্য সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল আর মুহুর্মুহু ঘড়ির দিকে চাহিতেছিল। তাহার জ্ঞাতি ভ্রাতা নির্ম্মলকে সে শিয়ালদহ ষ্টেশনে দার্জ্জিলিঙ মেলে রিজার্ভ পাওয়া যাইবে কি না তাহারই সন্ধানে পাঠাইয়াছে, সুষমাকে লইয়া পূজার সময় কিছু দিন দার্জ্জিলিঙ বাস করিয়া আসিতে ইচ্ছা আছে। নির্ম্মল তিনটার সময় গিয়াছে, ৭টা বাজিয়া গেল, এখনও দেখা নাই—অজিত ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল।

আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। সদর দ্বারে কাহার যেন কণ্ঠ শ্রুত হইল, অজিত কাগজখানা টেবিলের'পরে ফেলিয়া দ্বারটি খুলিয়া দাঁড়াইল। যে আসিল, সে নির্ম্মল নহে, হেমেন্দ্র। হেমেন্দ্র একটা বিখ্যাত ব্লক কোম্পানীর আফিসে কাজ করে।

হেমেন্দ্র নিকটে আসিয়াই বলিল—বেরুচ্ছ না-কি?

না, এস। কি খবর বে?

খবর আছে, বোস।

অজিত বলিল—বটে, কিন্তু তাহার উৎকণ্ঠা কমে নাই, সে কেবলই ঘড়ির দিকে চাহিতেছিল।

হেমেন্দ্র জিজ্ঞাসিল—কি ব্যাপার?

অজিত বলিল—নির্ম্মলকে জান ত। ছোকরাকে একবার শিয়ালদহ পাঠাইলাম দার্জ্জিলিঙ মেলের একটা খবর আন্তে, তারা সেই যে গেলেন, ফেরবার আর নাম নেই।

দার্জ্জিলিঙ মেলের আবার খবর কি?

পূজার সময়টা দার্জ্জিলিঙ্ যাব সুষমাকে নিয়ে।

হেমেন্দ্র পকেট হইতে সিগারেটের কৌটা ও দেশলাই বাক্স বাহির করিতে করিতে বলিল—দার্জ্জিলিঙ যাবে?

হাঁ।

কবে?

এই পরশু তরশু।

হেমেন্দ্র সিগারেট ধরাইয়া, এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—তা ত যাক্, এদিকে ব্যাপার কিন্তু গুরুতর।

কি?

"বিশ্ববাণীতে" এবার তোমার সব কার্টুন বেরুচ্ছে যে পূজার সংখ্যায়?

আমার কার্টুন? তুমি জান্‌লে কি করে?

হেমেন্দ্র তর্জ্জনী আঘাতে সিগারেটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল—আমাদেরই আফিসে ব্লক কাটা হ'য়েছিল। আজই চপুর বেলা ব্লকের প্রুফ তুলে আমার কাছে পাশ করাতে এল। ব্লক দেখেই ত আমার চক্ষু স্থির। ৯ খানা!

অজিত রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—৯ খানা?

হেমেন্দ্র আবার এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িলেন, ঘাড়টি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—ন'খানা।··· ন'খানা—কি কি জান?

অজিত সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

একখানায় তুমি অন্ত কোন গ্রন্থকারের পাণ্ডুলিপি থেকে বেমালুম টুকছ, ঘরের দোর জানালা বন্ধ করে, বাতী জেলে; আর একখানায় প্রেসের ম্যানেজারের পা ধরে বলছ "মশাই, অমুকের বইটা বেরুবার আগেই এ'টি বার করে দিতেই হ'বে আপনার এই একশ' টাকা, বাকী যেদিন বই বেরুবে সেদিন দেব!" আর একখানায় যা এঁকেছে—চমৎকার!

অজিত জিজ্ঞাসিল—কি?

হেমেন্দ্র বলিতে লাগিলেন—একটা ধাড়োয়ান গোছের লোকের পায়ের তলায় বসে পড়ে তুমি

না-কি বলছ—দরওয়ান দাদা, দরওয়ান দাদা, পয়সা নেব না, কড়ি নেব না, ঘড়ি নেব না, আংটি নেব না, শুধু একটিবার বাবুর উপন্যাসের ন'এর পরিচ্ছেদটা চোখ বুলিয়ে চলে যাব—তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে, কিছু নিই আমার কাণ ধরে তিন চড় দিও!" আর একখানায়.....

অজিত বলিল- লেখাগুলো ব্লকের মধ্যেই আছে?

হ্যাঁগো, নইলে আর আমি জানব কোত্থেকে বল?

আর একখানায় বুঝলে.....

থাক্ আর দরকার নেই। হেম, তোমার সঙ্গে কোন আর্টিষ্টের পরিচয় আছে?

আছে বৈ কি। আমাদের সতীশ বাবু রয়েছেন লাইন ডিভাইনে, কার্টুনে তাঁর মত হাত ত দেখিনে আজকের বাজারে।

কোন সতীশ হে?

আরে, সতীশকে তুমি জান ত? মস্ত চিত্রকর হে! তোমাদের "উদাসীতে" সেই যে "দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণে দুর্য্যোধনের উল্লাস" বেরিয়েছিল...

অজিত মহোল্লাসে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আর বলতে হ'বে না, বুঝেছি। পাওয়া যাবে?

এখনি।

চার্জ্জ কি রকম?

কি রকম আবার। যা দেবে—তা'তেই সন্তুষ্ট।

তবু...

আর তবু নেই। একবার আলাপ হ'লে জানতে পারবে।

অজিত ব্যগ্রভাবে বলিল—কোথায় দেখা পাব?

হেমেন্দ্র বলিল তাঁর বাড়ীতে। কবে চাই তোমার?

কবে কি বলছ হেম! আজই, আজই। পূজার সংখ্যা বেরুতে ত আর দেরী বড় বেশী নেই। "বিশ্ববাণী" ১লা বেরোয়, আমরা আশের মাসের ২৭এ আটাশে বের করি।...আজ দেখা হ'তে পারে?

খুব পারে, চল-না, বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু প্লট ঠিক করতে হ'বে ত?

প্লট ঠিকই আছে। তুমি যাবে এখনই?

যাব। কে?

আমি নির্ম্মল। সিটরিজার্ভের ব্যবস্থা ত করে এসেছি, দাদা। টিকিটগুলো কালই কিন্‌তে হ'বে কিন্তু।

অজিত নির্ম্মলের মুখের দিকে না চাহিয়াই, কি একটা লিখিতে-লিখিতে বলিল—টিকিট আর কিন্তে হবে না—ভাই!

নির্ম্মল সবিস্ময়ে বলিল—কেন গো? পাশ টাশ পাবে না-কি? পাশ কিন্তু মেলে চলবে না।

অজিত লেখাটা শেষ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, বলিল—পাশ নয় ভাই। দার্জ্জিলিং যাওয়া আর এ বছরও হ'য়ে উঠল না!

কবি ও লেখকদিগের মতির উপর নির্ম্মলের কোন দিনই আস্থা ছিল না; তাহারা কল্পনা করে বড় বড়, কথা কহে অপর্য্যাপ্ত, কিন্তু কাজের সময় দেখা যায় কল্পনা কল্পনাই থাকে এবং কথাগুলা পথে পড়িয়া কান্নাকাটি করে। সে ঈষৎ রাগতস্বরে বলিল—মিছিমিছি আমার ভোগান্তিটা করালে। পূজার সময় রিজার্ভ কি দেয়? আমাদের একটি বন্ধু তার বিপিনের ভাই-পো সে 'এ টি এস্' হয়েছে, তার রেকমেণ্ডেসান নিয়ে অসুখ বসুখ বলে তবে ত করাতে পারলুম।

অজিত নির্ম্মলের পিঠে গোটা দুই চাপড় মারিয়া বলিল—হ'ল না ভাই হ'ল না, মিথ্যে তোমাকে কষ্ট দিলুম।

নির্ম্মলের নিজের কোন স্বার্থই ছিল না, তাই সে ইহার পরে আর তর্ক করিল না, শুধু 'যাই বৌ-দিকে খবরটা দিয়ে ক্লাবে যাই—বলিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, অজিত তাহার হাতটা ধরিয়া

ফেলিয়া বলিল—আহা হা, অমন কাযটি কোর না ভাই! হঠাৎ কি স্ত্রীলোককে দুঃসংবাদ দিতে আছে? খুব সামলে সুমলে, আট ঘাট বেঁধে তবে দিতে হয় শাস্ত্রে আছে দশহাত কাপড়ে তারা উলঙ্গিনী জানই ত?

শান্তের সঙ্গে নির্ম্মলের কোনরূপ পরিচয়ই ছিল না, তবে দশহাত ন্যাপড়ের রসিকতাটা ইতিপূর্ব্বে সে অনেকবার শুনিয়াছে এখানে তাহার প্রয়োগের সম্যক অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া, আর একবার কবি ও লেখকদিগের প্রতি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, চলুন—বলিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

অজিত ডাকিয়া বলিল—তোমার বৌদিদি বাড়ীতে নেই নির্ম্মল, নেমন্তন্ন গেছেন।

আচ্ছা—বলিয়া হাসিয়া নির্ম্মলচন্দ্র অদৃশ্য হইল।

হেমেন্দ্র বলিল—তাহ'লে আর দেরী নয়, পৌনে ন'টা হ'ল—চল, বেরিয়ে পড়ি।

উভয়ে রাজপথে পড়িয়া একখানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া প্রথমে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে "উদাসী" আফিসে চলিল। "উদাসীর" সম্পাদক বিশ্বনাথ প্রকাণ্ড এক জোড়া চশমা পরিয়া উদাসীর চারএর কর্ম্মার প্রুফ দেখিতেছিলেন, ইহাদের দেখিয়া চেয়ার হইতে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ দেহোত্তলন পূর্ব্বক 'আসুন আসুন' বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

অজিত জিজ্ঞাসিল—বিশ্বনাথ বাবু উদাসী এবার ক'ফর্ম্মা করছেন?

বিশ্বনাথ বাবু একটি হাই তুলিয়া, মনে মনে বোধ করি আর একবার হিসাব (হিসাব মাসের আগেই তাঁহারা করা থাকে) করিয়া লইয়া বলিলেন—এই সাড়ে তেরো, চোদ্দ!

অজিত বলিল—বেশ। আমার জন্যে কিন্তু একটা ফর্ম্মা পুরো মার্জ্জিনে ছেড়ে রাখবেন।

বিশ্বনাথ চশমা জোড়া টানিয়া ললাটে আটকাইয়া ফেলিলেন, বলিলেন—তা রাখব। কিন্তু পুজোর সংখ্যা বুঝতেই ত পারছেন বক্সের আগে বেরুনো চাই ই।

তাই হবে। আমি আজই যাচ্ছি, ছবি করাতে যা দেরী, ছবি হ'লেই ব্লক করতে ত দেরী হবে না, একদিন, বড় জোর দু'দিন···

বিশ্বনাথ বাবু হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—ঠিক উল্টো বল্লেন অজিত বাবু, ছবি করতে দেরী হয় না, ব্লক কাটাতেই যা দেরী। এক দিন বলে এক মাস ওদেরই বুঝতে হয়।

অজিত হাসিয়া বলিল—আমার তা হ'বে না। সাহেব বাড়ীর ম্যানেজার আমার হাতের মধ্যে।

ও-মশাই! সাহেব বাড়ী কি বল্ছেন? সেখানে ঘেঁসা আমাদের সাধ্যি! কেস্ যারব যে!

না, না—ভয় নেই। বিশ্বনাথ বাবু, আপনার সঙ্গে আমার এই বন্ধুটির আলাপ করিয়ে দিই, এঁর নাম হেমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ইনি পার্কার কোম্পানীর বড় বাবু।

আলাপ পরিচয়াদির পর, বিশ্বনাথ বাবু অজিতকে জিজ্ঞাসিলেন, কি লিখ্ছেন অজিত বাবু?

এখনও লিখিনি কিছু, আগে কার্টুন ক'টা আঁকিয়ে নিই—লিখতে বেশী সময় লাগবে না।

বিশ্বনাথ বাবু বলিলেন—কার্টুন? কার্টুন কিসের?

অজিত হেমেন্দ্রকে দেখাইয়া বলিল—"বিশ্ববাণী" পুজোর সংখ্যায় কি করছে শুনুন-না একবার?

বিশ্বনাথ বাবু সপ্রশ্নদৃষ্টিতে হেমেন্দ্র বাবুর দিকে চাহিতেই, হেমেন্দ্র কহিলেন—অজিতকে নিয়ে খুব ভাঙাচ্ছে—এবার। সেই "কামনা" নিয়েই যত কাণ্ড।—তিনি সমস্তই বিবৃত করিলেন।

বটে?

হ্যাঁ। সত্যি কথা বল্তে গেলে, দোষ সময় বাবুরও নয়, অজিত বাবুরও নয়, দোষ "বিশ্ববাণীর।" অজিত বাবুর "কামনা" বেরুবার পর সময় বাবুর "মোহ" কিছুদিন "বিশ্ববাণী"তে ছাপা বন্ধ

হ'য়ে গেল না? সেই থেকেই ত রাগ। অবশ্য পরে ছাপা হ'ল, কিন্তু লোকে আর পড়লে না, সবাই বল্লে "কামনার" চুরি! দুটি বয়ের প্লট কি আর এক রকম হ'তে নেই, না, হয় না?" বিশ্ববাণীই ত খুঁচিয়ে ঘা করলে!

সকলেই এ কথায় সায় দিলেন।

অজিত-হেমেন্দ্র যখন সতীশ বাবু চিত্রকরের গৃহে পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়ে গিয়াছে। সতীশ বাবু বা পরিবীত বুঝি, ততক্ষণে শয্যা লইয়াছিলেন, হেমেন্দ্রের সাড়া পাইয়া নামিয়া আসিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাহিত্যালোচনা জীবনের মূলমন্ত্র হইলেও, অজিতবাবুর কাছে তাঁহার পত্নীর আদর ছিল প্রাণের চেয়েও বেশী। সে রাত্রে থিয়েটার উত্তীর্ণ করিয়া অজিত যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন মনে মনে প্রিয়তমার ম্লান মুখখানি কল্পনা করিয়া আসিলেও এতটা যে দেখিতে হইবে তাহা তিনি আদৌ ভাবেন নাই। গৃহে ফিরিয়া শয়নকক্ষে ঢুকিয়া সুষমার গম্ভীর মুখ দেখিয়া অজিত কোথায় এবং কেমন করিয়া এত রাত্রি হইল তাহারই একটা মোটামুটি বিবরণ দিয়া সুষমাকে নিকটে টানিতে গিয়া দেখেন, তাহার মুখখানি আরো গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। সুষমা হাতটি ছাড়াইয়া অল্প দূরে গিয়া বসিল।

অজিত বলিল—কি ব্যাপার বল? এক যায়গায় গিয়ে পড়লুম, তার উপর কাজের কথা কইতে একটু সময় লাগে-ই, দেরী হ'য়ে গেল।

সুষমা নির্ব্বাক।

অজিত বলিল—কাজটা ভীষণ জরুরী, আজ না হ'লে আর হ'ত না। ভাগ্যে আজ সতীশ বাবুর বাড়ী গিয়ে পড়া গেছল, আজকের রাত প্রভাত হ'লে আর সতীশ বাবুর সঙ্গে দেখাই হত না,—কাল তিনি স্ত্রীকে তাঁর দেশের বাড়ীতে চলে যেতেন।

অজিতের কথাগুলি যে সুষমার কর্ণগোচর হইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া অজিত বাবুর তাহা মনে হইল না। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, সেই দার্জ্জিলিঙের কথাটা সুষমার কাণে যায় নাই ত? হাঁ, তাহা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাই বা কিরূপে হইবে? নির্ম্মল যখন আসে, সুষমা ত তখন নিম্নতলে গিয়াছিল। কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য কিছুই অজিতের মনে আসিল না।

ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বলিল—সুষমা, আমাদের দার্জ্জিলিঙ যাওয়াটা কিছুদিন পেছিয়েই গেল বোধ হয়।

সুষমা বলিল—তুমি যাবে না?

অজিত সাগ্রহে বলিল—ওঃ—এখানেই আনিয়ে রেখেছ যে—যাঃ! দাঁড়াও, হাত মুখ ধুয়ে আসি।

আহারে বসিয়া অজিত বলিল—আমরা কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি বেরুতে পারব—বুঝলে। তখন দিনে পূজার সংখ্যা "উদাসী" ও বেরিয়ে যাবে—

"উদাসী" বেরুনোর সঙ্গে আমাদের দার্জ্জিলিঙ যাবার সম্বন্ধটা কি আছে শুনি?

আছে বৈ-কি—শোন বলছি! নৈলে আজ আমার এত দেরী হ'ল কেন আস্‌তে! সময় পূজার সংখ্যা বিশ্ববাণীতে আমাকে ছোট বলে……

আমি জানি।

অজিত হাঁ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—জানো! কি বল্‌ছ সুষমা?

তুমি কি বল্‌ছিলে?

আমি! বল্‌ছি। তুমি জানি কি বল্‌ছো—বল।—অজিতের হাত আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

সুষমা বলিল—তুমি বুঝি তার 'উত্তোর' গাইবার যোগাড়ে গেছ্‌লে?

হ্যাঁ। কিন্তু…

মেজ মাসীমার বাড়ীতে হঠাৎ মলিনার সঙ্গে দেখা।

মলিনা। সময়েয়…

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। মাসীমার বড় মেয়ে ঘুমঘী—সেদিন যার বিয়ে হোল,—তার কি রকম ননদ হয় মলিনা। তারও নেমন্তন্ন হ'য়েছিল, সেই আমাকে বল্লে।

অজিতের গলার মধ্যে লুচির টুকরা আটকাইয়া গিয়াছিল, সে জলের গেলাস্ তুলিতে তুলিতে বলিল —তারপর ?

তারপর আর কি ! কত দুঃখ করতে লাগ্‌ল। এই তোমাদের দু'জনের ঝগড়া নিয়ে কতদিন স্বামী স্ত্রীতে কত মনান্তর হয়—সব বল্লে। আমাকে বল্লে, দিদি, তুমি ত বুদ্ধিমতী, তুমি কেন থামিয়ে দাও-না, তাহ'লে ত আর কোন হাঙ্গামা থাকে না। অজিতবাবু···

দোষটা বুঝি অজিতবাবুরই ?—ক্রোধে তাহার গণ্ডদ্বয় অরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল।

সুষমা বলিল—দোষের কথা হয় নি কিছু··· সে বল্লে, অজিতবাবু বড়, সব বিষয়েই বড়, লেখক হিসাবে তাঁর নামও বেশী, বয়সেও তিনি কিছু বড়, তিনি যদি মাপ করেন, ইনিও অগত্যা অরণ্যে রোদন করা ছেড়ে চুপচাপ বসে যান।

অজিত বলিল - যুক্তি মন্দ নয়। তিনি হ'লেন সব বিষয়েই ছোট, অতএব তাঁর গোঁ বজায় থাক্‌বেই, আমাকে অনুশোচনা করতে হ'বে, বেশ যুক্তি দেখ্‌ছি।

সুষমা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিতে লাগিল—মলিনা সত্যি কথাই বলেছে, আমাদের হ'য়েছে তাব রাখি না ঢুল রাখি। রাগ করে যে দিন কতক বাপের বাড়ী চলে যাব তারও যো নেই, অমনি দু'টি বেলা হাঁটাহাঁটি সুরু করে দেবেন ; অথচ ভালো পরামর্শ দু'টো দিতে এ'লেই তুমি এঁ্যা। এ-সবের মোক্ষ কি ! মেয়ে মানুষ, অল্পবুদ্ধি—এ ত উঠ্‌তে বস্‌তে !

অজিত বলিল—আমি বলেছি কোনদিন তোমাকে ও-রকম কথা ?

তোমার কথা হ'চ্ছে না। মলিনা যা বল্লে তাই বল্‌ছি। পোড়ামুখী দশক্ষণ ছিল আঁচল ধরে ধরেই রইল। অন্য সে কার সঙ্গে দু'টো কথা কইব, গল্প করব তার সময়ই পেলুম না।—সুষমা এক মুহূর্ত থামিয়া ম্লান-করুণ কণ্ঠে পুনশ্চ বলিতে লাগিল —তাই' বা দোষ দেব কি ! বিয়ের পর তিনটি বছর দু'জনে দিন-রাত একসঙ্গে ওঠা বসা, খাওয়া দাওয়া, গল্প গুজব ! সে ত আর সেলফ নয়, যে লেখার চাপে পড়ে বন্ধুত্বতার প্রাণ হারাবে! গাড়ীতে উঠ্‌ছি গলা জড়িয়ে ধরে -সে কি কান্না। বলে দিদি একটি দিন আমাদের বাড়ী এস, তোমাকে দেখ্‌লে হয়ত ওঁর মনে আবার পূর্ব্বের ভাব জেগে উঠ্‌বে, একটি দিন এসো দিদি ! বল আসবে ? বল !—যত বলি দেখ্‌ব রে ! বলে দেখ্‌ব বল্লে শুনব না, বল 'আসব' তবে ছাড়ব। আ !, আচ্ছা—বলে তবে ছাড়ান পাই।

অজিত জিজ্ঞাসিল—যাবে না কি ?

তুমি কি বল ?

আমি--আমি কিছু বলি না।

সুষমা বলিতে লাগিল—একটি ছেলে হ'য়ে মারা গেছে—বল্লে। তিন মাসের হ'য়েছিল।— বলিতে বলিতে সুষমার চক্ষু দুইটি বাষ্পপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অজিত আহার শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল, জল পান করিয়া বলিল—ইচ্ছে হয় একদিন যেতে পার, আমার আপত্তি নেই। তবে সময় যদি ভালো ব্যবহার না করে—অপমানের শেষ থাক্‌বে না কিন্তু। শুধু তাই নয়, তার স্ত্রীর আহ্বানে যে তুমি গেছ—এ কথা সে বিশ্বাস করবে না, চাই কি ঐ নিয়ে আবার একটা কার্টুন করে' বস্‌বে। "বিশ্ব-বাণীতে' ছাপিয়া আমার মুখে একেবারে চুণ কালী লেপবে !

হ্যাঁ—লেপেছে!

বিশ্বাস করছ না ? আচ্ছা, যাও একদিন, ঘুরে

এল, তারপর দেখ্‌তে পাবে আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে ?

আমি দেখ্‌তে চাই নে। সমরবাবুকে আমিও ত তিন চার বছর দেখেছি, তুমি তাঁকে যতটা ছোট মনে কর, তিনি কিন্তু তা নন্।

কথাটা অজিতের বুকে গিয়া আঘাত করিল। সে সমরকে ছোট মনে করে! আর এ কথা বলিল সে, যে তাহার মনের অতি গোপন কথাটিও জানে। তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত যাহার কাছে স্বচ্ছ কাচখণ্ডের মত প্রতিবিম্বিত! অজিত অনেকক্ষণ কথা কহিল না, শেষে দুঃখ ক্লিষ্টস্বরে কহিল—আমি তাকে ছোট মনে করিনে সুষমা। বরং চিরদিন তা'কে মার পেটের ভাইয়ের মতই দেখে এসেছি; যে ঘরে বসে তোমার-আমার আজ কথা হ'চ্ছে এই ঘরটাতেই দু'জনে খেয়েছি শুয়েছি। সমরের ছেলেবেলার অবস্থা তুমি জানা-না, তুমি কেন অনেকেই জানে-না, এমন কি বাবা বেঁচে থাকতে সমরদা ত আমাদের বাড়ীতেই থাকত;—তার মা মারা গেলেন, তখনও সমর এখানে। এণ্ট্রেন্স পাশ করলে—সেই থেকে ওর কে মামী না কে ওকে পুষ্যিপুত্র নিলেন, ঐ বাড়ীতে চলে গেল। সুষমা, আমি ওকে কোনদিনই ছোট মনে করিনে, তা যদি করতাম, তবে এ-সব কথা এতদিন বুকে চেপে রাখ্‌তাম না। ও ত কত রকমেই আমাকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমি কি বলেছি এসব কথা কারুর কাছে? পাছে তার সম্মানে এতটুকু আঘাত লাগে, আমার বিয়ের পর তিন চার বছর ত তোমার সঙ্গে ওর যথেষ্ট আলাপ হ'য়েছিল, ওর কত কথাই ত তোমাকে বলেছিলাম কিন্তু এ-কথা আজকের আগে শুনেছিলে কি?—কিন্তু ও আমার কোন মর্য্যাদাই রাখেনি, সুষমা, বার বার আমাকে লাঞ্ছিতই করেছে।

অজিত উঠিয়া পড়িল। সুষমা থালাখানি তুলিয়া পাশের একটা ঘরে গিয়া খাইতে বসিল, কিন্তু আহারে তাহার আদৌ রুচি ছিল না, দুই মিনিটের মধ্যেই খাওয়া শেষ করিয়া এ ঘরে আসিয়া দেখিল, অজিতও পাশ ফিরিয়া চুপচাপ শুইয়া পড়িয়াছে। সুষমা অজিতের আহারের স্থান পরিষ্কার করিল, শব্দ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল, কুঁজা হইতে ঢক্ ঢক্ করিয়া জল ঢালিয়া খাইল, অজিত নিঃশব্দ, নির্ব্বাক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক সমর বাবু তাঁহার তিনজন প্রিয় শিষ্যকে লইয়া "বিশ্ববাণী" কার্য্যালয়ে ঢুকিতেই বিশ্ববাণী সম্পাদক মৃগেন্দ্রলাল বাবু ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—ওরে ভজা, পাঁচ কাপ্ আনিস। ভৃত্য দ্বারপার্শ্ব হইতে একবার আগন্তুকদের দেখিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মৃগেন্দ্রলাল সমস্ত দিন সহরে ছিলেন না, এইমাত্র গৃহে ফিরিয়া, রাশিকৃত পত্র পাঠ করিতে বসিয়া গিয়াছেন, সমর বাবু কহিল—এত চিঠি কিসের মশাই?

বিশ্ববাণীরই—আর কিসের বলুন। বেশীর ভাগই তাগাদা···

তাগাদা?

হাঁ, গল্প আর কবিতালেখকদের। এই দেখুন না, পড়ে খানকতক।

ঐ-সমস্ত?

প্রায়। মৃগেন্দ্রবাবু হাসিয়া পুনরায় পত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

সমর বলিল—আপনি তাই অত পড়ছেন! আমি হ'লে তাগিদ পত্র ছুঁতামও না।

তা হ'লে কি চলে মশাই? ওদের ভেতর থেকেই যে মাঝে মাঝে অনেক জিনিষ বেরিয়ে পড়ে। না ছুঁয়ে পারি নে, তবে খাটুনি যত হয়—মুহুরী-পোষাই না। বেশীর ভাগ বাজে। তাও সহ্য করতে রাজী

আছি, মশাই, যদি তাগাদার মাত্রাটা একটু কমায়, তা কমাবে না। অনেক নূতন লেখকের আবার সন্দেহ আছে যে মাসিক পত্র সম্পাদক, প্রকাশক-এরা সব চুরী করে খেনোমে তা'দের অনুমা সম্পত্তি-গুলি মেরে দেয়—এই জন্যেই ক্রমাগত তাগিদ পাঠায়। এই দেখুন না রিমাইণ্ডার নম্বর ১২ (লাল কালিতে লেখা) ; অনেকে আবার কার (car-bon) বন কপি করে চিঠি পাঠায়।

বলেন কি মশাই ?

আবার খান দুই উকীলের চিঠিও গতমাসে পেয়েছিলুম।

সত্যি ?

সত্যি, পনোর দিনের সময় ছিল, লেখা ফেরৎ দেবার—আমি একমাস পরে ফেরৎ পাঠালুম বলিয়া মৃগেন্দ্র বাবু হাসা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মাথার মধ্যস্থলে টেরী সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে, পায়ে বার্নিশ করা ডনলপের কোর্ট শু, হাতে মলাক্কা বেতের ছড়ি—একটি যুবক কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ইনিই বিশ্ববাণীর সহঃ সম্পাদক, নাম গজেন্দ্র বাবু, মৃগেন্দ্র বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র।

মৃগেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসিলেন—৯এর ফর্ম্মার অর্ডার দিয়েছ ?

সমর জিজ্ঞাসিল—আমারটা বুঝি ১১র ফর্ম্মার যাচ্ছে মৃগেন বাবু।

হাঁ।—এগারোয়।

পুরো এক ফর্ম্মাই লাগবে, কি বলেন ?

কিছু বেশীও লাগতে পারে—১২য় ফর্ম্মাও ঐ জন্যে বাদ দিয়ে রেখেছি।

সমর বলিল—ছবিতেই ত যায়গা নিচ্ছে কিনা, লেখাত বেশী নেই এবার। দাঁড়ান না, আসছে মাসে একটা ভারি বাসির Sketch (নক্সা) করছি—বাহাদুরকর্ণনিয়ে।

গজেন্দ্র বাবু কোন সাড়া দিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখভাব কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

গজেন্দ্রবাবু বলিলেন—ওসব বিষয়ে আমরা আর কিছু ছাপাব না, ঠিক করেছি।

সমর সবিস্ময়ে একবার এই অর্ব্বাচীন যুবকের ও একবার তাহার গম্ভীর মুখ পুরতাতের পানে চাহিয়া লইয়া বলিল—কি ছাপবেন না গজেন বাবু ?

ঐ সব বাজে কাঁটি, মশাই। আমাদের কাগজের ওতে অনেক ক্ষতি হ'চ্ছে। গ্রাহক ছাড়ছে।

গ্রাহক ছাড়ছে ?

মৃগেন্দ্র বাবু এতক্ষণে কথা কহিলেন, বলিলেন—বাস্তবিক আমাদের অনেক গ্রাহক গ্রাহিকা ঐরকম চিঠি লিখেছেন। আর তাঁদেরই বা দোষ কি বলুন, আপত্তিত ত হবারই কথা। শুধু তাই নয়, আজ রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় প্ল্যাকার্ডই ত দেখেছেন, "মনীষা"—নূতন মাসিকপত্র বেরুচ্ছে। আবার, প্রবন্ধ সম্ভারে চিত্র গৌরবে—অতুলনীয়। দেখেন নি ? আকারে, ভারে অদ্ভুত সম্ভব হইবে।

সমর গম্ভীর হইয়া বলিল—যত বাজে ! লেখক পাবে কোথা ? অত বড় কাগজ বেরুচ্ছে, কৈ আমরা ত একটু খবরও পেলাম না। আসমান থেকে লেখা আসবে ?

মৃগেন্দ্র বাবু বলিলেন—তা বলতে পারি নে, মশাই, তবে আমাদের একটু শঙ্কিত হ'তে হয়েছে। আমার কর্ম্মচারী খাঁ বাবু বলছিলেন, আমাদের সঙ্গেই না-কি Competition প্রতিদ্বন্দ্বিতা ! কাজেই এসব গ্রাহকদের চটাতে পারি নে, আমাকে বাধ্য হ'য়ে এই সংখ্যায় লিখে দিতে হ'ল…

কি লিখলেন ?

লিখলুম যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কোন কথাই "বিশ্ববাণী"তে অতঃপর স্থান পাইবে না। কাক নাম টাম করি নি।

সমর উত্তেজিত হইয়া বলিল—নাম না করলেও লোকের বুঝতে বাকী থাকবে না, মৃগেন বাবু।

কি করব বলুন। আমি নিরুপায়। মাপ করবেন। বলিয়া তিনি [illegible]। কথা মত টেবে

পাঁচ কাপ চা সাজাইয়া ঘরে ঢুকিল, মৃগেন্দ্র বাবু একটা তুলিয়া লইয়া টেবিলের পরে রাখিয়া দিয়া, বলিলেন—গজেন, "মনীষার" নূতন খবর কিছু পেলে?

না। শুধু মিঃ চৌধুরী সম্পাদক হ'য়েছেন, গৌরাঙ্গ প্রেসে ছাপা আরম্ভ হয়ে গেছে—এই শুনলুম।

৪৲ টাকাই ত দাম?

হাঁ।

মৃগেন্দ্র বাবু সমরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন কাগজ একখানা কেন, দশখানা বেরুক না, ভালই ত! তবে এখনো সে 'থিঙ্ক' হয় নি বাংলা দেশে। আরো পঞ্চাশ বছর অন্ততঃ দরকার।

সমর নিঃশব্দে চা-পান শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার বন্ধুরাও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইলেন। মৃগেন্দ্র বাবু সমরের বাহুতে একটি মৃদু আকর্ষণ করিয়া বলিলেন—একটা কথা বলি শুনুন।

পার্শ্বের একটা ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন—দেখুন যদিও স্থান পাবে না লিখে দিলুম আপাততঃ, এ বছরের প্রথম দু'চার মাস কেটে গেলে আরম্ভ করতেই বা ক্ষতি কি! অবশ্য বেশী না হ'লেই হল—কি বলেন?

না—বেশী হ'বে না।

দেখুন, ঐ "মনীষা" কাগজটার জন্য বাস্তবিক আমি একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি। রাস্তায় যে রকম হৈ চৈ পড়ে গেছে তাতে এ বছরে আমাদের গ্রাহক কিছু কমবেই, বেশী না যায় তবেই মঙ্গল।

কোন্ চৌধুরী সম্পাদক?

ঐযে ব্যারিষ্টার—চৌধুরী।

আহা, চৌধুরী ব্যারিষ্টার ত পাঁচ সাতজন আছে, কোন্‌টি?

তা কিছু লেখে নি। বিজ্ঞাপনে শুধু "মিঃ চৌধুরী, টেম্পল চেম্বার্স"- এই ঠিকানাই লিখেছে।

কবে বেরুচ্ছে?

প্রথম সংখ্যা বৈশাখে বেরুবে, আমাদের আগেই।

দেখা যাক্—কি হয়! সম্ভবতঃ যাচ্ছেই হবে—বলিয়া সমর হাত তুলিয়া নমস্কার করিল এবং বাহিরে আসিয়া বন্ধুদের সহিত মিলিত হইল।

তাহার বন্ধুরা গলির মোড়ে আসিয়া একটা বিষয় গণ্ডগোল বাঁধাইয়াছিল, সমরকে দেখিতেই একজন বলিল—আসিয়াছে সমরই বলুক।

অপর জন বলিল—সমর, আমরা যদি একখানা মাসিক বের করি, চলে না? ধর—তুমি তার সম্পাদক, আমার বাড়ীতেই অফিস, আর আমরা হব তিনজন কার্য্যাধ্যক্ষ, চলে না?

সমর জিজ্ঞাসিল—টাকা?

টাকা, এই তিনচার জনের।

চলে না। অনেক সখ্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়।

আচ্ছা, আমিই যদি ধর টাকাটা···

চলে।

বন্ধুটি সোৎসাহে কহিল—বেশ, চল, সেই পরামর্শই করা যাক্। আমি কিন্তু ভাই, টাকা দিতেই থাকলাম, সব ভার, যার তোমার। লেখক যোগাড়, গ্রাহক করা—সব। হবে ত?

হওয়াই ত সম্ভব।

আর একজন বলিল—হোক না হোক্, চুটিয়ে লিখে নেওয়া যাবে, শালারা.....ওঃ····· তিনি নিজেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তাহারা হাসিতে হাসিতে সমরেরই গৃহের দিকে চলিল।

(৫)

যাহারাই প্রকাশ করুক, "মনীষা" কাগজখানির প্রকাশকগণ যে অর্থ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিজ্ঞাপনে সহর ছাইয়া ফেলিয়াছে, গলিতে গলিতে "মনীষা" আর "মনীষা"। অনেকে বলিতেছে হাজার পাঁচেক গ্রাহক লইয়াই "মনীষা" আসরে নামিতেছে, অনেক বলিতেছে, হাঁ! পাঁচহাজার, না পঁচিশ হাজার। হাজার অনেক হইত বটেই। আবার অনেকে এমন কথাও বলিতেছেন যে, ঘর ঘর, একেবারে ছেলে মানুষী। আজ পর্য্যন্ত একজন গ্রাহক হয় নাই। কয়েকজন টাকা দিতে চৌধুরী সাহেবের কাছে গিয়াছিল, প্রথম সংখ্যা কাগজ বাহির করিয়া তবে টাকা লইবেন বলিয়া তাহাদের ফেরত দিয়াছেন। বলেন, আমরা ঠকাইতে চাহি না। অনুষ্ঠান পত্রটত্র বুঝি না, একেবারে একসংখ্যা কাগজ বাহির করিয়া দেশের লোকের মনোরঞ্জন করিয়া, তবে গ্রাহক লইব। দস্তরমত ছেলে মানুষী!

সেদিন মধ্যাহ্নে অজিত তাহার শয়নকক্ষে শুইয়া একখানি দৈনিক সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছে, ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল একজন লোক দেখা করিতে চায়।

কে লোক রে ? কি নাম ?

ভৃত্য নীরবে ফিরিয়া গেল, দুই মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"মনীষা"র এজেন্ট। নাম নরহরি দাস।

"মনীষার" এজেন্ট ! "মনীষা" কাগজের ?

ভৃত্য আবার ফিরিয়া যাইতেছিল, অজিত হাসিয়া বলিল—যে লোক এখানেই নিয়ে আয়।

আজ দশ পনেরো দিন হইল, সুষমা পিত্রালয়ে গিয়াছে, অজিত ছাড়া বাড়ীতে অন্য কোন লোকই নাই। অজিত সুষমাকে একদিন অন্তর প্রায়ই আসিবার অনুরোধ করিয়া পত্রলেখে, সুষমা প্রথমটা অনেকদিন পরে আসিয়াছি, দিন কতক থাকিয়া যাইব, এইরূপ লিখিত, পত্র কলা জানাইয়াছে, দুই চারি দিনের মধ্যেই যাইতেছি। অজিত এইমাত্র ডাকে উত্তর পাঠাইল, সে আসিলেই দার্জ্জিলিং যাইবার বন্দোবস্ত করা হইবে।

ভৃত্য প্রকাণ্ড এক পোর্টমাণ্টোকে লইয়া ঘরে ঢুকিল, লোকটি পোঁটলা নামাইয়া, দু'হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—আজ্ঞে, একখানা মনীষা দেখবেন ? নতুন বেরিয়েছে, মিঃ চৌধুরী এডিটার। এত ছবি, এমন গল্প বাংলা দেশের আর কোন কাগজেই নেই ; একখানা দেখবেন কি একবার ?—বলিয়া নর হরি পোঁটলা খুলিতে লাগিল।

একখানি ডবল ক্রাউন আট পেজী সাইজের মাসিক পত্র বাহির করিয়া অজিতের হাতে দিয়া বলিল—তিনখানা তিন রঙা ছবি, বাইশখানা এক রঙা—এত ছবি, এমন কাগজ আর কোন মাসিকই দিতে পারে না মশাই, বুঝলেন ?

অজিত বহুবর্ণ মুদ্রিত প্রচ্ছদ পট-টির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—বার্ষিক মূল্য কত হে ?

আজ্ঞে—পাঁচটি টাকা মাত্র। দাম পাঁচ টাকা বটে, এক এক সংখ্যা কাগজ ছাপাইতে ওর অনেক বেশী পড়ে যায়—বুঝলেন ?

প্রতি সংখ্যার দাম কত ?

আজ্ঞে আট-আনা। দেখুন ও, আট-আনায় এমন একখানা কাগজ এ দেশে...

অজিত ভৃত্যের উদ্দেশে বলিল—ওরে একটা আধুলী দে ত এনে।

নরহরি দাস কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল—মশাই, খুচরো বিক্রী আমরা এখন করছিনে। আমরা এখন বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে গ্রাহক সংগ্রহ করছি। হাউস পারসেণ্ট কমিশন...

অজিত সহাস্যে কহিল—বেশ ত কি মাসেই আমাকে একখানা করে দিয়ে যেও তুমিই ! তা' হ'লে তোমার হাইত পারসেণ্টের কোন ক্ষতিই হ'বে না।

আজ্ঞে—আমি বলছি কি, একখণ্ড আপনি ইন্‌স্পেকশনে রেখে দিন, দেখে শুনে পছন্দ হয়, দু'চার দিন পরে আমি এসে পাঁচটি টাকা নিয়ে যাব।

পছন্দ না হ'লে কাগজ ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ত ?

আজ্ঞে তাই।—বলিয়া নরহরি কোটের বুক-পকেট হইতে মার্কেল কাগজে বাঁধানো পকেট বুক পেন্সিল বাহির করিয়া অজিতের মুখের পানে চাহিয়া বলিল—মহাশয়ের নাম ঠিকানাটি !

অজিত নাম ও ঠিকানাটি বলিয়া—তুমি বাপু এই সংখ্যার দাম নিয়ে গেলেই পারতে ;

আজ্ঞে দেখুন-না আপনি ! দেখে সন্তুষ্ট হ'ন, হাইত পারসেণ্ট আমার ত আছেই।—সে আবার বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অজিত সংবাদ পত্রখানি একপার্শ্বে ঠেলিয়া রাখিয়া "মনীষা"র পাতা উল্টাইতে লাগিল। জবা-কুসুম, কেশরঞ্জন, বেঙ্গলার পাচন, বহুবিধ দ্রব্যের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠার পর দ্বি-বর্ণে মুদ্রিত সূচীপত্র পাইয়া তাহাতেই মনঃসংযোগ করিল। সূচীপত্রের বিষয় ও পৃষ্ঠা এক কালীতে, লেখক ও লেখিকাগণের নাম অন্য কালীতে ছাপা !

কোন পরিচিত বা খ্যাত গ্রন্থকারের নাম খুঁজিয়া পাইল না। লেখকগণের মধ্যে বেশীর ভাগই ব্যবহার জীবি, দু'একজনের নামের পূর্ব্বে প্রোফেসার সংযুক্ত রহিয়াছে দেখা গেল। সূচী পাঠ শেষ করিতেছে, হঠাৎ "বাংলাদেশের সাহিত্যিকের দুর্ভাগ্য" শীর্ষক প্রবন্ধটি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা দেখিয়া প্রবন্ধটি বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিল।

পাঠ করিতে করিতে অজিতের নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। অতি কষ্টে যে যখন প্রবন্ধ পড়া শেষ করিল তখন প্রবন্ধে বর্ণিত লেখকগণের দুর্ভাগ্যের চিন্তায় মনটি তাহার বেদনাপ্লুত হইয়া উঠিল।

অজিত আর একবার প্রবন্ধটি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে পড়িতে লাগিল :—

• • • •

বোধ করি নিদারুণ পত্নী শোক না পাইলে কোন সাহিত্যিকেরই প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হইতে পাইত না। বিধাতার কি ইচ্ছা তিনিই বলিতে পারেন, কিন্তু আমরা এমন একজনও প্রতিভাসম্পন্ন মনীষিব অস্তিত্ব জানি না, যিনি সংসারের শ্রেষ্ঠ সুখে সুখী হইয়া সরস্বতীর আরাধনা করিতে পারিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস, পত্নী শোকের প্রবল অগ্নিতে লেখকদিগের মনঃলা-টুক পুড়িয়া যায়, যেটুকু থাকে তাহা খাঁটি সোনা।

• • •

"নিম্নের তালিকা হইতে পাঠকগণ বুঝিবেন আমাদের কথা কতদূর সত্য।"

বঙ্কিমচন্দ্র বিপত্নীক। (দ্বিতীয় পক্ষ -পরে হইয়াছিল)

রবীন্দ্রনাথ··· ঐ

দ্বিজেন্দ্রলাল··· ঐ

মাইকেল মধুসূদন ঐ

শরৎচন্দ্র··· ঐ (যেহেতু দার পরিগ্রহ করেন নাই)

প্রভাতকুমার··· ঐ

গিরিশচন্দ্র ঐ

উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম প্রণেতা চন্দ্রশেখর বাবুর কথা বলাই বাহুল্য, উদভ্রান্ত প্রেমই নমুনা (অবশ্য পরে উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম ছাপা বন্ধ করা তাঁহার উচিত ছিল।)

জলধর...হিমালয় গিয়াছিলেন,—কেন?

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়...সেদিনও তাঁহাকে বর বেশে দেখা গেছে।

অক্ষয় বড়াল—"এষা" প্রিয়তমা পত্নীর শোকো-চ্ছ্বাস।

এই ত গেল জীবিত ও মৃত খ্যাতনামা লোক দিগের কথা। নবীন ও উদীয়মান লেখক-সম্প্রদায়ে এই পত্নী বিয়োগ মহামারী (epidemic) দেখা গিয়াছে। আমরা নিঃসঙ্কোচে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতে পারি। যথা, সুপ্রসিদ্ধ চারু বন্দ্যো, সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (কবি), সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ ডিটেকটিভ-লেখক শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন দত্ত মহাশয়ের পত্নীর পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে, খবর পাওয়া গেল, সম্ভবতঃ আগামি সংখ্যায় গোবর্দ্ধন বাবুকেও তালিকা ভুক্ত করিতে পারিব। গোবর্দ্ধন বাবুর সাহিত্যিক ভায়রা ভাই, সুপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক পণ্ডিত হলধর তর্কচঞ্চু মহাশয়ের সহ-ধর্ম্মিণীকে গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছে—এ সংবাদ আমাদের দপ্তরী মোবারক মিঞা বিল আদায় করিতে গিয়া শুনিয়া আসিয়াছে। হা কঠিন, নির্ম্মম বিধাতঃ! তুমি ত সাহিত্যিকদিগের ধন স্থান শূন্য করিয়াই রাখিয়াছ, তাহারা যে অর্থহীন, সম্বলহীন গৃহে প্রিয়তমা দয়িতার অধর রসে ও পুষ্ট হুষ্ট হইবে—তাহাতেও তুমি বাদ সাধিলে?

স্বর্গীয় মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল বড় দুঃখে, বড় কষ্টেই গাহিয়াছিলেন—

হায় মা! যাহারা কি গো তোমার ভক্ত তারাই কি মা নিঃস্ব অত!

আমরা স্বর্গীয় কবির গানটির সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করিয়া গাহিতেছি—

হায় মা! যাহারা কি গো তোমার ভক্ত, তাদেরই কি মা পত্নী হত!"

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অজিত আর মাথা তুলিতে পারিল না। এবং তাহার মাথার মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া কেমন যেন দপ্ দপ্ শব্দে কি একটা উঠিতে ও পড়িতেছিল। অজিত দু'হাতে কপাল টিপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, সত্য, সত্য, অতি সত্য! কোন লেখকই এই দুর্ভাগ্যের পীড়ন হইতে পরিত্রাণ পান নাই? সকলকেই পরাস্ত মানিতে হইয়াছে? ভাবিতে ভাবিতে সে সংজ্ঞাশূন্যের মত বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

তবে কি—তাহার অদৃষ্টেও বিধাতা ঐ দুঃখই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন? তবে কি—তাহার সুষমা, বড় আদরের সুষমা পলায়ন করিবে? সুষমা হারা হইয়া তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে?···ঘড়ি-ঘড়িই সে সুষমা-বিহীন নিজের জীবনটাকে কল্পনা করিতে গেল, কিসের এক অনির্ব্বচনীয় বেদনায়, যন্ত্রনায় তাহার বক্ষ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, সে ধপাস করিয়া শুইয়া পড়িল।

শুইয়া শুইয়া সে কেবল ভাবিতে লাগিল, সাহিত্য বড়, না সুষমা বড়। সাহিত্যই বড়—যত দিন সুষমা আছে। তারপর—সব মিথ্যা। সাহিত্য মিথ্যা, সংসার মিথ্যা—সব মিথ্যা!

ভাবিতে ভাবিতে অজিত অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ঘণ্টাখানেক বিছানায় পড়িয়া ছট-

ফট করিয়া ভৃত্যকে ডাক দিল। তাহাকে তৎক্ষণাৎ গাড়ী করিয়া সুষমাকে আনিতে পাঠাইয়া সে'ও নগ্নদেহে উত্তরীয় চাপাইয়া মুহূর্ত্তে টাঙ্গী ডাকিয়া "উদাসী" আফিসে হাজির হইল।

উদাসী-সম্পাদক তখন আফিস-কামরায় ছিলেন না, অজিত সংবাদ লইয়া জানিল, নামিতে তাঁহার ঘণ্টা দুই দেরী আছে। সে আরও জানিয়া লইল যে কার্টুন তখনও ব্লক হইয়া আসে নাই। এক টুকরা কাগজে সম্পাদক মহাশয়কে তাহার আশা না রাখিয়াই "পূজার সংখ্যা" সম্পূর্ণ করিতে লিখিয়া, সে পার্কারের বাড়ী গিয়া বন্ধুকে ব্লক কাটিতে নিষেধ করিয়া আসিল।

অতঃপর সে স্থির করিল সাহিত্য চর্চ্চাই আর করিবে না।

ষষ্ঠপরিচ্ছেদ

সুষমা আসিয়াই জিজ্ঞাসিল—কবে যাওয়া হচ্ছে?

অজিত ক্ষিপ্রহস্তে দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিয়া সস্নেহে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—তার এখনো দেরী আছে।—কথাটা বলিয়াও সে সুষমাকে মুক্তি দিল না। যেন সুষমাকে সে হারাইতে বসিয়াছিল, এখনই ফিরিয়া পাইয়াছে।

সুষমা বলিল- আমিও আর দু'এক দিনের মধ্যেই চলে আসতুম।

অজিত অভিমান ভরে বলিল—যাও! দিব্যি পনেরো দিন কাটিয়ে এলে!

কি করি বল, গিয়ে পড়েছি।...."উদাসী" বেরুল?

কি-জানি।

সুষমা অবাক্ হইয়া বলিল—তার মানে?

অজিত বলিল—বেরোয় নি বোধ হয়। আমি ঠিক খবর জানি নে।

তোমার লেখা নেই পূজোর মাসে?

না।

তা মাঝে মাঝে এক আধ মাস না বেরুলেই ভালো—কি, বল? বেশ একটু জিরিয়ে নেওয়া যায়, না?

অজিত বলি-বলি করিয়াও আসল কথাটি তখন বলিল না। ভাবিল, এখন না, রাত্রে, সুনির্জ্জনে বলিতে হইবে।

আচ্ছা, এখন খাবার দাবার করি গে যাই—বলিয়া সুষমা বাহির হইয়া গেল।

বারান্দায় চীনা-মাটির টবে কয়েকটি জীর্ণশীর্ণ ফুলগাছ ছিল, অজিত ঝারিটি তুলিয়া লইয়া মুকমুখে জল দিতেছে সিঁড়ির কাছ হইতে কে ডাকিল—অজিত?

কে?

তৎক্ষণাৎ যে মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়িল অজিত কল্পনাতেও কোনদিন তাহার আগমন আশা করে নাই। সবিস্ময়ে কহিল—সমর!

সমর ধূলার উপর বসিয়া পড়িয়া অপরাধীর মত নতমুখে বলিল—ভাই অজিত! আমাকে ক্ষমা কর।

অজিত কিছুই বুঝিতে পারিল না, ঝারিটি নামাইয়া রাখিয়া বলিল—এস, ঘরে, এস। কি ব্যাপার বল ত?—বলিয়া অজিত সমরের হাত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইল।

সমর গদগদ কণ্ঠে কহিল—ভাই কৃষ্ণকে কলঙ্ক ধরে ছিলুম! বন্ধু বিচ্ছেদ ত হ'য়েইছিল, আবার বুঝিয়া সর্ব্বস্বই হারাতে বসেছিলুম।

অজিত সাশ্চর্য্য কহিল—কি হয়েছিল, সমর?

সমর ম্লানমুখে কহিল সকাল থেকে মলিনার এমনই ফিট হ'য়েছিল যে পাঁচ ছ' ঘণ্টা একেবারে চৈতন্য হ'ল না। ডাক্তাররাও ভয় পেয়ে গেছল।

এখন একটু সেরেছে ত?

হ্যাঁ—এখন একটু আছে ভাল।

অজিত একমিনিট পরে বলিল—মলিনার শরীর কি আজ কাল ভালো নেই সমর?

ভালোই ত ছিল ভাই। তবে ঐ একটা ছেলে না, কি হ'য়ে মারা যায়, তাই থেকেই কেমন একটু ভেঙে' পড়া গোছের হ'য়েই ছিল, কিন্তু ফিট্ টিট্ কোন দিনই হয় নি। আজ হঠাৎ...সে থামিল।

অজিত বলিল—কি বলছিল?

আজ হঠাৎ, আমি ঐ পূজোর "বিশ্ববাণীর" প্রুফ দেখছি সে'ও আমার পাশে বসে...."মনীষা" দেখেছ?

দেখেছি, তার পর?

সে'ও আমার পাশে বসেই—কতকগুলো কার্টুন—"মনীষার" সাহিত্যিকের দুর্ভাগ্য দেখেছ?

দেখেছি।

সমর হঠাৎ অজিতের হাত দু'টি টানিয়া লইয়া বলিল—আমি আর কখনও কিছু লিখব না।

অজিত কোন কথা কহিল না, সমর বলিতে

লাগিল—বলিনার মূর্চ্ছাভঙ্গে চেয়ে দেখি, বিশ্ববাণীর প্রেফগুলো বরফের জলে কোথায় ভেসে গেছে। এখনি খাকিলে তাদের আমার প্রবন্ধ যাবে না বলে দিয়ে তোমার এখানে ছুটে আস্‌ছি। অজিত দা, তুমি আমাকে মাপ কর ভাই! তোমাকে অনেক কটু বলেছি, অনেক অন্যায় করেছি তবু তুমি দাদা, আমাকে মাপ কর ভাই মেশার মুখে যা-তা বলেছি···

অজিত তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—সমর, আমিও কসম খ্যাপ্ত করেছি।

তুমিও!!!

হাঁ। আমিও সুষমাকে কম ভালবাসিনে, সমর!—তাহার চক্ষে অশ্রু যেন টলমল করিতেছিল।

এই সময়েই গুথামা রেকাবিতে নানাবিধ খাবার সাজাইয়া সুষমা হাসিমুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—এস ঠাকুরপো, বোস। দেখ দেখি, ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল বুঝি ত!

অজিত বলিল—সমর এসেছে তুমি জান্‌লে কি করে?

সুষমা টেবিলটার'পরে রেকাবি দু'খানি নামাইয়া বলিল—ঠাকুরপো যে আসেন না, তাইত আস্‌তে যাচ্ছই জান্তে পারলুম। বর্ষাকালে অনেক দিনের মেঘের পরচন্দ্র উঠ্‌লে সবাই তখনি জান্তে পারে ও-কি ঠাকুরপো, অমন করে বসে রইলে কেন? এস, খাবার অমনিই হয়ত জুড়িয়ে গেছে, নিয়ে দশ মিনিট দরজার ধারে দাঁড়িয়ে, বাবুদের কথা আর ফুরোয় না।

অজিত জিজ্ঞাসিল—সব শুনেছ না-কি?

শুনলুম বৈকি! কি করি, কাণে ত আর তুলো দিতে পারি নি, তা সে এক রকম ভালোই হ'য়েছে, দু'জনেই ছেড়েছে। কিন্তু ঠাকুরপো, আমার ভাই বিশ্বাস হয় না·····

সমর সগর্ব্বে কহিল—কি বলেন বৌদি, পুরুষের প্রতিজ্ঞা·····

অজিত বলিল—এ নারীর প্রতিজ্ঞা নয়...

বেশ গো বেশ—বলিয়া সুষমা হাসিয়া উঠিল। বলিল—তা চলে এক কাজ কর। "মনীষার" একটা বিল আছে শেষেন্ট করে দাও।

বিল!—উভয়েই মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট পরে সুষমা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—দু'শ টাকা খরচ, আমার ভাগে দু'শপড়ে'ছে—বাকি আমার দুই দাদার—বলিয়া সে একখানি ছাপা কাগজ টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

অজিত বাম হস্তে সে'টি ধরিয়া বলিল—এ কি! এ-যে মনীষার বিল্! তা—তুমি—তুমি কেন?

সমর জিজ্ঞাসিল—ওটা কে লিখ্‌লে?

কোন্-টা?

ঐ যে দুর্ভাগা···

কেন ভুল হ'য়েছে?

সমর বলিল—না, না ভুলের জন্যে বলি নি। খুব সংগ্রহ ও তাঁর! আমরা ত সাহিত্যিক ছিলুম, আমরাই এত খবর রাখতুম না।

সুষমা বলিল—লেখক যখন নাম দেন্‌নি, বলাটা কি আমার উচিত হ'বে? তোমরা ত সাহিত্যিক, সাহিত্যের আইন ত জান?

সমর হাসিয়া বলিল—আমরা আর সাহিত্যিক নই, আপনি বলুন বৌ-দি! নামটে জান্তে পারলে, তাঁকে নমস্কার করে আসব।

সুষমা দ্বারের কাছে সরিয়া গিয়া বলিল—ঐ থেন থেকেই নমস্কার কর—হা হ'লে! আর কি বল্‌বে তাও বলে কেন—বলিয়া সে মুখে কাপড় গুঁজিতে লাগিল।

অজিত সমরের দিকে চাহিয়া বলিল—কি বল?

সমর বলিল—আর বলা বলিতে কাজ নেই। বৌ-দি আপনার বিলটি আমিই পে-মেণ্ট করে আসব 'খন—বলিয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিল।

কয়েক দিন পরে সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক জ্ঞানেন্দ্র বাবু জানি না কি প্রকারে এই মুখরোচক সংবাদটি শুনিলেন, সেই দিনই বঙ্গ সাহিত্য-সাগর মন্থন করিয়া এক জ্বালাময়ী, অগ্নিময়ী, বজ্রময়ী প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলেন। সেই প্রবন্ধে বলিলেন, এই সব সাহিত্যের আগাছাগুলিকে.....ভৈরব কাপুরুষগুলিকে...

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and Publishe by P. N. Pal. 26-3 Scott Lane, Calcutta.

যমুনা

যতীন্দ্র নাথ পাল

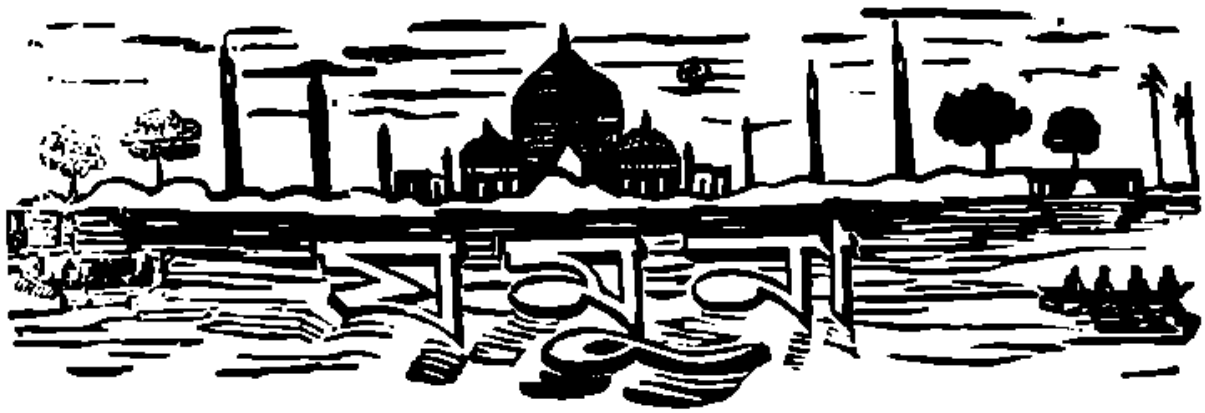

১২শ বর্ষ | কার্ত্তিক ১৩২৯ | ৭ম সংখ্যা

ভাই ফোঁটা

শ্রীলীলা দেবী

শুভ কাজ সমারোহে হর্ষ কোলাহল
কুসুম চন্দন মাল্য গন্ধ নিরমল
স্মিত মুখে কত সুখে যত পুর নারী—
উতলা ; প্রবাস পথে লোচন প্রসারি,
কখন আসিবে প্রাণ প্রিয় সহোদর,
দিবে ফোঁটা কত সাধে ললাট উপর।
ভ্রাতৃহীনা অতি দীনা সে ছিল নীরবে,
এমনি সবার মত সে কবে বা দিবে
তাদের কপালে ফোঁটা এমনি আদরে
ভাবি তার দুটা আঁখি ছল্ ছল্ করে!
কুসুম কল্লার ফোঁটা পথলের ধারে
কাশ ফুলে ছাওয়া মাঠ ছিল পর পারে।
সোনালী ধানের শীষ তার গায়ে আঁকা
শেফালী ঝরান সেই পথ ছিল বাঁকা
গাভী আর একদল বালক আভীর
বেণু হাতে যেতে যেতে দেখে কিশোরীর
জল ভরা চোখ আর মধুর আনন
বলে—"আজ ভাই ফোঁটা কাঁদ কেন বোন?
আমরা যে ভাই তোর আছি অগনন
গরীবের ছেলে ব'লে পাব না কি মন?"
সুপাকুল বালিকার কথা নাহি আসে
অশ্রু চন্দনের ফোঁটা দিল সে উল্লাসে!

নারীর মান

(শ্রীসরসীবালা বসু)

(গল্প)

(১)

স্বামীর আহ্বানে সুপর্ণা জানলা হইতে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "কি বলছ ?" পরেশ কহিলেন, "ডাকছি একবার এদিকে এসো না। বাথরুমে ক'টা আলমারী পালিশে রেখিয়ে দাও, মিস্ত্রী কাজ কামাই করে বসে আছে, এরপর তোমারি আবার অসুবিধে হবে।"

পাশের বাড়ী হইতে করুণ আর্ত্তনাদ আর এক বার বাতাস কাঁপাইয়া আকাশ পথে ছুটিল, সুপর্ণা শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আগে একবার যাও না, গিয়ে দেখনা ওরা কি করছে বউ টা অতো চেঁচায় কেন ?" পরেশ বিরক্ত হইয়া কহিলেন ঐ সব দিকে কাণ দেবার সময় আমার নেই, নিজের ঘরের কাজ ফেলে হা করে ওখানে দাঁড়িয়ে লাভ কি ? তুমি কি তাকে রক্ষা করতে পারবে ? যাদের বউ তারা যদি মারে তোমার তাতে কি ?

সুপর্ণা মুখ খানাকে বিকৃত করিয়া কহিলেন, আমার এই—যে আমি মানুষ, তাই ঐ কান্না আমার বুকে কাঁটার মত বিঁধছে ; সত্যি বলচি তুমি গিয়ে একবার ধমক দাও না।"

পরেশ হাসিয়া কহিলেন —

"বেশ বলেচ, এমন না হ'লে মেয়ে-বুদ্ধি, ওদের বউ ওরা মারছে ধরে,আমি কোথাকার কে যে গিয়ে ধমক দেবো ? যখন বলবে এসে, তুমি কোথাকার কে হে, তখন মুখটি আমার কোথা থাকবে ? এসো এখন এ দিকে, মিস্ত্রী বসে আছে। আচ্ছা মানুষ বটে।"

সুপর্ণা স্বামীর কথার উত্তরে প্রতিবাদ না করিয়া নীরবে অগ্রসর হইলেন। নূতন বাড়ীতে কাল মাত্র আসিয়াছেন এখনো চারিদিকে কাজ চলিতেছে। গৃহস্বামী গৃহিণীর মনোমত করিয়া বাড়ী খানি গড়িয়া তুলিতে চাহেন, যাহাতে পত্নী ভবিষ্যতে কোনদিন কোনো অভিযোগ না করিতে পারেন।

মিস্ত্রীকে কাজ দেখাইয়া দিয়া সুপর্ণা যখন রান্না ঘরের দালানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহাদের দেশের ঝির সহিত এদেশের নব নিযুক্ত ভৃত্য নান্‌কুর বিষম বিবাদ চলিতেছিল। সুপর্ণাকে দেখিয়া ক্ষেমদা কণ্ঠস্বর পঞ্চমে চড়াইয়া হাঁকিল, "দেখছ বউ দি, চাকর ছোঁড়ার আস্পর্দ্ধা যার বয়সী আমি, আমার সঙ্গে ঠাট্টা ! একি ওর ধর্ম্ম সইবে, যাবে পোড়ার মুখো জাহান্নমে—" অদূরে নান্‌কু দাঁড়াইয়া নিজের স্বাভাবিক দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছিল। বাংলা সে কিছু কিছু বুঝিতে পারে এবং বলিতে অভ্যস্ত হইতেছে, তাই কহিল "হামি জাহান্নমে একলা না যাবে, তুমি ভী সঙ্গে যাবে।"

ক্ষেমদা স্বর দ্বিগুণ উচ্চে তুলিয়া কহিল —শুনলে বউ দি, তেজের কথা—" বাধা দিয়া রুক্ষ কণ্ঠে সুপর্ণা কহিলেন "হয়েছে কি শুনি, রাত দিন তোদের কচ্‌কচিতে বাড়ীতে তেষ্টান যে দায় হয়ে উঠ্‌ল।"

ক্ষেমদা কহিল, "তুমি বল্‌লে ফুটনো ফুটে যাও তাতেই তোমার খোটা ভুতকে উচ্ছে আন্‌তে বাজার যেতে বল্‌লাম, তা হেলেই অস্থির বলে কি, উচ্ছে কি বাজারে বিক্রী হয় ? তার পর

এই দেখ ওর খাইনী না দিতে খাবার কোটো করে গোটাকতক ছার পোকা ধরে এনে বলছে "নে, ক্ষেমা।"

সুপর্ণার মনটা অপ্রসন্ন থাকিলে ও ব্যাপার দেখিয়া তিনি আর না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। বুঝিলেন, ক্ষেমদার হিন্দী বলিবার দোষেই ব্যাপারটি এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। সরল স্বভাব নানকুও অবসর বুঝিয়া ব্যাপারটীতে হাস্য রস জমা ইয়া তুলিয়াছে। এদিকে ক্ষেমদার কথার পিঠে নানকু বলিয়া উঠিল, বোলছে, দো'পয়সা কে উড়ীস্ আনবি। উড়ীস্ কি বাজারমে বিকছে মাঈ যে হামি কিন্ আনবে। দাই তা নাহী শুনছে, ওহী সে হামী আমার খাটিয়ামে লাঠি পিটায়া চার পাঁচটি উড়ীস্ ধরতী যে পড়ে যে কী হামী বিহ আনিয়েছে ইস্‌মে তী দাই গুসা করছে।"

ক্ষেমদা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—মর্ খোট্টা ভূত, দাই দাই করিস্ কিসের লেগে? আমি কি তোর আতুড়ে নাড়ী কাটতে গেছনু যে তুই দাই বল্‌বি? পয়লার মেয়ে আমি পোড়া কপাল তাই পরের দুয়ারে গতর খাটাতে এসেছি; নইলে আমার বাবা ভায়ের চার পাঁচটা গাই, দু'টো মোষ দু'বেলা কেঁড়ে পোরা দুধ—অঘোর বলে কি না দাই! হাড়ীর মেয়ে আমি যে আমায় দাই বলিস?" সুপর্ণা বেগতিক দেখিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন—তুমি চুপ কর ক্ষেমদা। হিন্দি তুমি বোঝ না তাতেই বত মুস্কিল। এ দেশে ঝিকেই ওরা দাই বলে আর তুমি যদি উড়ীস্ কে উড়ীস্ বলো তা ওর দোষ কি নইলে তোমাকে ওর ঠাট্টা করবার দরকার কি? বাজারে যখন যা আনতে বল্‌বার হ'বে, তা ওকে আমিই বলে দেবো, তুমি আর হিন্দী বলতে যেয়ো না।"

ক্ষেমদা এ মিমাংসায় মোটেই সন্তুষ্ট হইল না। তাহার উপর নানকুর চকিতকটাক্ষ তাহার পৃষ্ঠে হানিল, কাঁদুনীর সুরে বলিয়া উঠিল, "এ খেই মেই হাবুতাতে দেশে আমি আর থাকবুনি বউ দি, তুমি আমার দেশেতে পাঠিয়ে দাও, কোন দিন তোমার খোট্টা ভূতকে আর কোন দিন কিছু আন্‌তে বললে বাঘ, বিছে, সাপ এনে হাজির করবে, ওর পেটে পেটে যে দুষ্টামি—আমি সে খুব বুঝি।"

সুপর্ণা নানকুকে ভাল রকমেই চিনিতেন, ক্ষেমদা সত্য সত্যই ছারপোকা কিনিয়া আনিতে বলে নাই, বেচারী হিন্দী বলিতে গিয়া নামটা ভুল করিয়া নিজেই উড়ীশ শব্দটিকে "উড়ীস" প্রযোগন দিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছে, নানকু তাহা বেশ বুঝিয়াছিল। কিন্তু ক্ষেমদা যখন অল্পতেই রাগিয়া বসে তখন এ ক্ষেত্রে তাহাকে রাখাইবার প্রলোভন ত্যাগ করে কোন বুদ্ধিতে।—সুপর্ণা নানকুর যখন রঙ্গপ্রিয় স্বভাব বেশ চিনিয়া লইয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে সেবে দুষ্টামির পরিচয় দিয়াছে তাহা বুঝিয়া তিরস্কার করিয়া কহিলেন—আচ্ছা নানকু তুই এদিকে এতো সব কথা বুঝিস্ তোর বুদ্ধিতে এটা এলো যে বাজারে তরকারীর সঙ্গে কখন ও কি তোকে উড়ীশ কিনে আনতে বলে? না তাই দিয়ে রান্না হয়, দুষ্টবুদ্ধির ঘাড়ী,—যা এখান থেকে, এখুনি বাজারের যা-যা তরকারী আনতে দেওয়া হবে সব কিনে আনগে; বেলা ৯টা বাজল রান্না কখন চাপাবে! নানকু মৃদু হাসিয়া ক্ষেমদার দিকে দৃষ্টি হানিয়া সুপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে উড়ীশ না উচ্ছে তী আনবে মাইজী?" সুপর্ণা ধমক দিয়া বলিলেন, "আবার দুষ্টামী! বেরো এখন থেকে।"

ক্ষেমদার চীৎকারে রাজমিস্ত্রীর অনুচর দুটা ছোকরা কুলীও কাজ ফেলিয়া আসিয়া এদিকে দাঁড়াইয়াছিল, সুপর্ণা তাহাদিগকেও ধমক দিয়া কহিলেন কাজ ছোড়কে হিঁয়া কি তামাসা দেখনে আয়া, যাও কাম পর।" তখন তাহারা নিজেদের কাজে ফিরিয়া গেল কিন্তু যাইবার সময় ক্ষেমদাকে লক্ষ্য করিয়া একটি ছড়া কাটিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না

"কাত্তোলন বেটিয়া,
কলকাত্তামে যায় কে বেচে তামাকুল টিকিয়া"

সুপর্ণার সাত বছরের মেয়ে সুমতি সেই সময় পিঠের উপর এলোচুল নাচাইতে নাচাইতে কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিল। ছড়ার আবৃত্তি শুনিয়া সেও তার পাল্টা জবাবে নূতন শেখা পদটি আবৃত্তি করিল—

"হিন্দুস্থানী ভূত,
খাটিয়া পর শুত,
খাটিয়াসে আগি লাগল ধড়ফড়ায় কেউর।"

ক্ষেমদা খুসী হইয়া বলিয়া উঠিল "যা বলেচিস্ খুকী হিন্দুস্থানী ভূতই বটে যেমনি কটমট্ চেহারা তেমনি খট্‌মট্ বুলি—"

সুপর্ণা বাধা দিয়া কহিলেন, "আর বোকানা ক্ষেমদা ছুঁড়ীটা জ্বালা দিয়ে কুটনো টা কুটে ফেলো, আর বামুনকে ডেকে দাও রান্না চাপিয়ে দিবে।

যথেষ্ট বেলা হয়েছে সুমতি এদিকে আয়, পড়া মুখস্থর সঙ্গে নাম নেই ছড়া মুখস্থ খুব হয়েচে তো, কে শেখালে এ ছড়াটা?

সুমতি ভয়ে ভয়ে কহিল "ওদের বাড়ীর খুকী, দেখ মা ওদের বাড়ী কেবল একটী ছোট ছেলে আছে খুব সুন্দর, খুকীর মা দুপুর বেলা বেড়াতে আসতে বলেছে।

সুমতির কথায় কাণ দিবার পূর্ব্বেই সুপর্ণার কাণে আর একবার সেই পূর্ব্বশ্রুত অসহায় আকুল ক্রন্দন বাজিয়া উঠিল। তাঁর মনে হইল সে মর্ম্মভেদী কান্না যেন তাঁর বুকের অস্থি পঞ্জর পর্য্যন্ত সূচীর মতো বিঁধিতে চাহিতেছে, মনে তাঁর সেই কাতর আর্ত্তনাদকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে চাহিলেও গৃহের বধূ তিনি বধূত্বের যে সম্মান বাঁচাইয়া নীরবে মনের বেগ সম্বরণ করিলেন।

(২)

বেলা তখন মধ্যাহ্ন। নিদাঘের খর রশ্মিজ্বালা চারিদিকে এক উদাস মায়া বিছাইয়া দিয়া, নিঝুম ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, রৌদ্রের তপ্ত মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়া সমস্ত পৃথিবী মূর্চ্ছাহতের ন্যায় নিস্পন্দ। পাহাড়ীয়া দেশের অসহ্য উত্তাপে গৃহবাসী সকলেই যেন ছট্ ফট্ করিতেছে, আহারে তৃপ্তি নাই, নিদ্রায় শান্তি নাই। একজন কুলীকে পাখা টানিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া গৃহস্বামী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছেন, আর সুপর্ণা সেই তপ্ত রৌদ্রের জ্বালা মাথায় লইয়া, স্বামীর আদেশ না মানিয়া পাশের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন আগের দিন চপলা নিজে গিয়া সুপর্ণার সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছিল। সুপর্ণা পরদিন চপলার বাড়ীতে যাইতে চাওয়ায়, পরেশ কহিয়াছিলেন—"কোথাকার কে জানা শোনা নেই, নাই বা গেলে তার বাড়ী?"

সুপর্ণা কহিয়াছিলেন—"বিদেশে কে আর কার পরিচয় জানে বল, একে গেলেই আলাপ হয়ে যায়; উনি এসেছিলেন আর আমি যেতে পারি না?"

অবজ্ঞার স্বরে পরেশ কহিয়াছিলেন, "ওতে তোমাতে ঢের তফাৎ, তুমি একজন জমিদারের স্ত্রী আর উনি একজন বাজে লোকের পরিবার। ঘর দুয়ারের অবস্থা দেখচ না, কঙ্কাল সার; ভেতরের খবরও তার চাইতে ভাল হবে না।" "ভেতরের খবর জানবার দরকার নেই" বলিয়া সুপর্ণা স্বামীর অনিচ্ছাতেই ক্ষেমদাকে সঙ্গে লইয়া চপলাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিলেন। চপলা তখন ঘরের দালানে বসিয়া কোলের শিশুকে দুধ খাওয়াইতেছিল। ধনীর গৃহিনীকে দেখিয়া সে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, "আসুন দিদি।" তার পর হাসিয়া কহিল,"বড় ঠাকুর কি, বেরিয়ে এলো না ভাই।" ভ্রাতৃজায়ার আহ্বানে একটি কিশোরী বাহির হইয়া আসিয়া সুপর্ণাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, "আসুন, ঘরের মধ্যে বসবেন চলুন, দালানে যে রৌদ্দুরের তেজ……"সুপর্ণা চপলাকে কহিলেন, "আপনিও ঘরে চলুন, এখানে এই রোদের ঝাঁঝে বসে কেন দুধ খাওয়াচ্ছেন?"

চপলা কহিল, "দুরন্ত ছেলে অন্ধকার ঘরে দুধ খেতে চায় না! চলুন আপনি, আমার হয়ে গেছে।

সকালে আপনার খুকী এসেছিল, কি মিষ্টি কথা, আমার খুকীর সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে।"

সকলে মিলিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া বসিলেন। ধনী গৃহিনীর প্রাসাদোপম বাড়ী চপলা নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, নিজের ঘর প্রায় সাজ সজ্জা হীন, আসবাব শূন্য কুটীর খানির কথা ভাবিয়া সে সুপর্ণার নিকট বড়ই দৈন্য অনুভব করিতেছিল। সেই ঘরের চারিদিকে চাহিয়া যখন ক্ষেমদা আবার বলিয়া উঠিল, "ঘর না, যেন পায়রার খোপ এই ঘরে কেমন করে তোমরা থাক গো?" চপলার ললাটের কালো ছায়া তখন লজ্জার বেদনায় নিবিড়তর হইয়া উঠিল। সুপর্ণা বলিয়া উঠিলেন "তুই চুপ কর্ পায়রারই খোপ হোক আর মানুষেরই খোপ হোক মাথা রাখবার ঠাঁই তো বটে? এই বা ক'জনার থাকে?" তার পর ঘর সংসারের কথা পাড়িয়া সুপর্ণা চপলার পরিচয় একে একে জানিয়া লইতে মন দিলেন। স্বামীর কর্ম্মস্থান বলিয়া সে এই তিন বৎসর দেশে আসিয়া আছে, দেশের বাড়ী ও ঠাকুর দেবতা ফেলিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ী এই অজানার দেশে মরিতে আসিতে রাজী নহেন সেইজন্য একলাই তাহাকে ছেলেমেয়েদের লইয়া থাকিতে হয়। সম্প্রতি ননদটি শ্বশুর-বাড়ী হইতে দাদার কাছে বেড়াইতে আসিয়াছে। কথায় কথায় সুপর্ণা পাড়ার সেই বধূটির পরিচয় জানিতে চাহিলে চপলা কহিল—"ঐ মুসলমানদের কথা বলছেন? ও বউ টা ভারী দুষ্টু, সেই জন্যে ওকে সবাই অমন করে মারে ধরে, তাতেও যদি বউ টার লজ্জা থাকে দিদি। যখন তখন এখানে সেখানে পালিয়ে যায়, ওরা খুঁজে খুঁজে ধরে আনে, মার ধোর ক'রে, ঘরে তালা বন্ধ করে রাখে, তখন দু পাঁচ দিন চুপচাপ থাকে, দিন কতক পরে আবার পালায়, লজ্জা কিছুতেই নেই।"

ক্ষেমদা কহিল "তাই বুঝি দুঁড়ী আবার পালিয়েছিল তাই এরা ধরে এনে চোরের পেহার দিচ্ছে—বোকা দুঁড়ী পালায় তো এমন জায়গায় পালায় না কেন যে কেউ উদ্দেশ না পায়?" চপলা কহিল, "সেটা কি বউ মানুষের কাজ? তাই জন্যেই অতো লাঞ্ছনা করছে, না পালালেতো দুর্গতি করত না।"

সুপর্ণা কহিল "পালায় কেন তা শুনেছ?"

চপলা কহিল "তা শুনেছি বইকি! তিন বছর আছি সবই দেখছি। ওর স্বামীটা যখন তখন ওকে মার ধোর করে, এতদিন ছেলে মানুষ ছিল, মার ধোর খেয়েও চুপচাপ কোয়ে কাজ কর্ম্ম করত; এই ছ'মাস থেকে কার পরামর্শে না কি বুদ্ধি বিগড়ে গেছে; তাই এখানে ওখানে যখন তখন পালিয়ে যায়, আর ওরা ধরে আনে। সেবারে ধরে এনে এমন মার মেরেছিল যে দু'মাস কোমর নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি, তবু কি লজ্জা আছে? যেমন ভাঙ্গা কোমর সোজা হয়েছে অমনি পালিয়েছে। পরশু দিন ধরে এনে আবার মার ধোর করেছে কাল গরম চিমটে দিয়ে সমস্ত পিঠে আর কোমরে সেঁকে দিয়েছে।

সুপর্ণা শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন "সত্যি? তা এমন শাস্তি দেবার ওরা কে, ওদের হাতে তো কথায় কথায় তালাক দেওয়া আছে, তাই দিয়ে বৌটাকে ছেড়ে দিক্ না কেন; আবার নতুন বৌ এনে ঘর কন্না করুক। ওরাও জুড়োয়, বউটাও নিশ্বাস ফেলে বাঁচে।"

চপলা কহিল, "আমি ওর শাশুড়ীকে ডেকে তাই বলেছিলাম। শাশুড়ী বলে, "ছেলের বিয়েতে মেয়ে কিনতে ওদের অনেক টাকা লাগে। ঐ মেয়েটাকে ওরা ছোট বেলায় ওর বাপ মার কাছে থেকে পনেরো টাকায় কিনেছিলেন; এখন ওকে সে পনেরো টাকা কে দায়? বাপ মা মরে গেছে, এখন ওর আপনার জন কেউ নেই যে ঐ পনেরো টাকা দিয়ে দুঁড়ীকে ছাড়িয়ে নেয়।" ক্ষেমদা বলিয়া উঠিল, "তাই দুঁড়ীকে মেরে মেরে বুঝি

পনেরো টাকা ওদের আদায় হবে!" চপলা কহিল, "ছোট লোকের যেমন বুদ্ধি তেম্‌নি ভাব! মেয়েটারও তো আস্পর্দ্ধা কম নয়। মেয়ে দেয় নিয়েছিল যখন, তখন লাথি, ঝাঁটা, কীল হজম করে চলাই ভালো—" বাধা দিয়া ক্ষেমঙ্করী কহিল, "তা যদি বল—তবে ছোট লোকের ঘরে বলেই ঐ কথা না, ভদ্দর লোকের ঘরেও অমন কত হয়। সেই যে বউদি তোমায় বলেছিনু তুমি পিত্যয় করলে না। বামুনদের শাশুড়ী তার বউকে হাত পুড়িয়ে পুড়িয়ে তার মুখে ছেঁকা দিয়ে ঘা করে দিয়েছিল, বউ ছিল ভারি সুন্দর., পুকুরে জল আন্‌তে গেলে পাড়ার ছুঁড়ি ছোঁড়ারা দল জোপ-ঝাপের আড়ালে বউ দেখবে বলে লুকিয়ে থাকত। বউএর পুরুষের তাতে ভয় হলো. সে তার মাকে বললে, পেরেত ঘরে মেয়ে ছেলের অতো রূপ ভালো না মা..." বাধা দিয়া সুপর্ণা বলিয়া উঠিলেন, "তাই তারা ছেলেমানুষেতে ঠাট্টা করে খোঁপার ওপর খোঁপাকারী করবার জন্যে বউটার মুখে ছ্যাঁকা দিয়ে দিল,—বাপে বোকো না ক্ষেমঙ্করী থেমে থাক। ক্ষেমঙ্করী রাগ ভরে কহিল, "বললে তো পিত্যয় যাও না, তা,তেই তোমায় ঠেই কোন কথা বলি না, এই মিছে কথা বলচি তো আমার জিভটে খসে যাবু, আমার নিজের কপালে কি তাই দেখ না, পরলা ঘরের মেয়ে অমন ঘর দুয়ার খেত খামার খাবার পরবার কিছু ভাবনা ছিল না। খালি সোয়ামী আর তার পিসী ছিল—তাদের ঝাঁটা লাথি সইতে না পেরে ত পালিয়ে এনু। এখন এই পরের দুয়ারে পোড়া পেটের লেগে গতর খাটাতে লেগেছি। পিসী রাগী কন্নে পুড়িয়ে পিঠে আমার চেপে ধরেছিল কেন না আমি বড় ঘুম কাতুরে ছিলুম, কিছুতেই ঘুম ভাঙত না, তাতেই এই শাস্তি।" অর্দ্ধ বিশ্বাস অর্দ্ধ অবিশ্বাসে সুপর্ণার স্নেহ পরায়ণ নারীচিত্ত দুলিয়া উঠিল। দুষ্ট হউক, অবাধ্য হউক, ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতে যে কেন তার অপরাধের জন্য যে এমন নিষ্ঠুর ভাবে নির্য্যাতন সহ্য করিবে, সুপর্ণা ইহা মানিতে পারিল না। আর মানিতে পারিল না বেশী করিয়া সেই কথাটি যে মানুষ হইয়া—বিশেষ করিয়া সংসারে সন্তানের পিতা মাতা হইয়া অপর কোন মনুষ্য সন্তানের উপর এমন ভাবে পীড়ন কেহ করিতে পারে?

(৩)

দিন দুই কাটিয়া গিয়াছে, সুপর্ণা ও চপলার সহিত এ দুইদিন আর সাক্ষাৎ হয় নাই। আজ সুপর্ণা দ্বিপ্রহরের সময় চপলাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিলেন। বারান্দাতেই চপলা ও তাহার ননদ সত্যবালা দাঁড়াইয়া কি বলাবলি করিতেছিল; সুপর্ণাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "বউটাকে দেখতে যাবেন? এই আমাদের খিড়কির দুয়ার খুললেই দেখতে পাওয়া যাবে, ঐখানে ওদের গোয়াল ঘরে বউটাকে বন্ধ করে রেখেছে আমি এখুনি দেখে এসে বউদিকে বল্‌লাম, তা বউদিও দেখতে যাচ্ছে—"

সুপর্ণা এ দুইদিন বউটার সম্বন্ধে আর কোন কথা শোনেন নাই এবং শুনিবার জন্য আগ্রহটাকে তিনি প্রাণপণে এড়াইয়াই চলিয়াছিলেন; যেহেতু ঐ অপরিচিতা হতভাগিনীর নির্য্যাতন কাহিনী "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" হইলেও তিনি তার স্নেহার্দ্র হৃদয় লইয়া কিছুতেই ও মন্তব্যে সায় দিয়া উঠিতে পারেন নাই; অথচ তাঁর এই সহানুভূতিতে সেই নির্য্যাতিতার এতোটুকু উত্তেজনার সম্ভাবনা না থাকিলেও সুপর্ণার নিজের অপকার ছিল ঢের বেশী। গৃহকাজের সময়ে কেবলি উন্মনা হইয়া উঠিতেছিলেন, আর আঁতারে বিঁধারে কেবলি একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়া অথবা পীড়িত হইতেছিলেন। সে যাহা হউক এখন সত্যবালার আহ্বান শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের অনুসরণ করিলেন। সকলে যখন গোয়াল ঘরের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বাঙ্গালী মায়ীজীদের দেখিয়া সেখানে বেশ একটি—বউ ঝিদের ছোটো খাটো ভীড় জমিয়া গেল।

সুপর্ণা দেখিলেন গোয়াল ঘরের পাশ বাঁধিবার খুঁটিতে বউটির কোমরে দড়ি বাঁধিয়া আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। তার উপর তার দুইপায়ে শিকল লাগাইয়াছে, যাহাতে সে আর না কোথাও পলাইতে পারে। অভাগিনী মাটীতে বসিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া আছে, মাথার চুলগুলি সব মুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সব দেখিবামাত্র সুপর্ণার চক্ষে—অশ্রু নয়, বেদনার অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। চপলা বধূর শাশুড়ীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "হ্যাগা রহিমের মা, বউ কাঁদচে বুঝি?" রহিমের মা কহিল, "চুল কেটে দেওয়া হয়েছে বলে কান্না হচ্ছে—আর একজন স্ত্রীলোক বলিল, নালিত দেখে বউটার মা কান্না, বলচে আমার চুল কেটো না, তোমাদের পা ছুঁয়ে বলচি আর আমি কোথাও পালিয়ে যাব না। তা ওর তো লজ্জা নেই, যখুনি মার খায়, তখুনি ঐ রকম বলে তার পর আবার যে কে সেই।"

সুপর্ণা ও সকল কথায় কাণ না দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "মানুষ কিছু না তাই ছাগল গরু নয় যে দড়ি দিয়ে শেকল দিয়ে তোমরা বেঁধে রেখেছ; আর এমন করে চুল মুড়িয়ে দিয়েছ, থানায় যদি খবর যায়, তা'হলে কি হয়? রহিমের মা হাসিয়া কহিল,—"থানায় কে খবর দেবে গো মাঠীজী, বহু বেটি সবকো খরমে হ্যায়, এই না হুরত না করলে সে কেইসে হোগা, আজ হামার ঘরকা বাৎ, কাল দুসরা কোভী হো সকে।"

একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক আগু হইয়া আসিয়া সুপর্ণাকে কহিল, "আমি কাহারের মেয়ে আছি, মাঠীজী বিশবছর বাঙালী বাড়ী কাম করকে মাথার চুল পাকিয়েছি, বহু বেটি দুই হোনে পে এমনি করকে সাজা দিলে হবে সিধা হো যাবে। এক বাঙালী বাবু বাড়ী আমি কাজ করিয়ে ছিলাম মাঠীজী, ঐ বাড়ীর বহু কাজ কাম না করবে কেবল চুল বাঁধত আউর কি কি সাজ করত, তো বাড়ীর মাঠীজী আপন হাতে কাঁচীসে একদিন বহুকে সব চুল কাটিয়ে দিলে, তা কি থানা পুলিশ হোলো? থানা পুলিসকে নাম না করবে মাঠীজী টোনাসে হাম সব জেন্‌সে আছি একার ঘর কা বাৎ আজ হামি নিকাল দেবো তো কাল হামার ঘর কা বাত কইলে ছিপাবে। তুমিতো, বড়া আদ্‌মী আছ মাঠীজী সব বুঝচ তো।" সুপর্ণা আর কোন কথা না বলিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কি ভদ্র, কি ইতর, সবার গৃহেই এই নির্য্যাতন ব্যাপার জয় পতাকা উড়াইয়া চলে? সকলেই ইহাকে সমর্থন করে, তবে কি সংসারে মনুষ্যত্ব নামে কোনো পদার্থের অস্তিত্ব নাই, বর্ব্বরতারই একাধিপত্য এখানে? সুপর্ণার বয়স মাত্র চব্বিশ বৎসর, নিজের বধূজীবন সে ধনীগৃহের অন্তঃপুরে বেশ আদরের সহিতই কাটিয়া উঠিয়াছে; বাহিরের সহিত পরিচয় মোটেই ছিল না, যেহেতু তাঁহাদের পরিবারে বধূদের বাহিরের কাহারও সহিত আলাপ পরিচয় করা নিষেধ ছিল। তাহার উপর শাশুড়ী শ্বশুরের মৃত্যুতে সম্প্রতি সে গৃহিণী পদে উন্নীত হইয়া বাহিরের সংসারের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে, কিন্তু এই কি বাহিরের পরিচয়, ক্ষুব্ধমনে সুপর্ণা যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন সন্ত নিদ্রাভঙ্গে পরেশ বারেন্দায় বসিয়া চোখে মুখে জল দিতেছিলেন, স্ত্রীকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন—"দুপুরের সময় একটু ঘুমিয়ে বিশ্রাম করবে, তা' না যায় তার বাড়ী বেড়াতে যাওয়া সুরু করেচ। তার পর বলবে "মাথা ধরেচে, গা কেমন করচে" ইচ্ছে করে এই সব অসুখ জোটাবে। সুপর্ণার অসুস্থতার জন্য পরেশ সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন এবং স্ত্রীর শরীরের প্রতি এতোটুকু অবহেলা দেখিলেই যখন তখনই টিক্ টিক্ করিতেন। স্বামীর প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় জানিয়া সুপর্ণা এ সব অনুযোগকে স্নেহের চক্ষেই চিরকাল দেখিয়া আসিতেন আজ কিন্তু সে ভাবকে উপেক্ষা করিয়া কহিলেন, "ওই লোকগুলো কি পাজী, আর কী নিষ্ঠুর।

এখুনি আমি নিজের চক্ষে দেখে এলাম বউটাকে কোমরে দড়ি বেঁধে আর পায়ে শেকল লাগিয়ে একটা গোয়াল ঘরে গরু বাঁধার খোঁটাতে বেঁধে রেখেছে। দেখলে চোখ ফেটে জল আসে।" মুখ চোখ ধুইয়া তোয়ালাতে মুখ মুছিতে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া পরেশ কহিলেন "রাতে তোমারি বা কি আর আমারি বা কি। দুষ্টুমী করেছে তাই সাজা পাচ্ছে।" সুপর্ণা কহিলেন, "দুষ্টুমি করবে না কেন, এ যে দশু দোষে গুরু দণ্ড। মানুষ হয়ে মানুষকে এমন করে কষ্ট দেওয়া, কি নিষ্ঠুর কাণ্ড গো চুল-গুলো সব মুড়িয়ে দিয়েছে, ছিঃ ছিঃ ছিঃ।"

পরেশ কহিলেন—"পরের ব্যাপার নিয়ে অত মাথা ঘামাও কেন তা বুঝি না। নিজের ঘরে আছে—খাচ্ছে দাচ্ছে, তাই থাক; কে কোথায় মারছে ধরছে ওদিকে তোমার চোখদিয়ে দেখবার দরকার কি তা তো বুঝি না?" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুপর্ণা কহিলেন, "মানুষ হয়ে—আর সমাজে বসে বাস কোরলেই সে তার চারদিকে চোখ না ফিরিয়ে থাকতে পারে না, বরং সেভাবে না দেখাটাই অন্যায় ওরা অমন ভাবে একটা অসহায়া স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করবে আর আমরা তাই চোখের ওপর দেখ্‌ব?"

স্ত্রীর প্রশ্নের খোঁচায় বিরক্ত হইয়া পরেশ কহিলেন, "কী বলতে চাও তুমি এখন তাই শুনি, ওকে রক্ষা করবার ক্ষমতা আছে আমাদের?"

সুপর্ণা কহিল, "আমাদের না থাক রাজার তো আছে। রাজার শক্তির কাছে আশ্রয় নাও থানায় গিয়ে এ ব্যাপারের কথা জানিয়ে দাও, পুলিশ এসে মেয়েটাকে উদ্ধার করুক।"

পরেশ কহিলেন, "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, শাস্ত্রের কথা কি মিথ্যে হয়? যাক্ ও সব বাজে কথা এখন যা বলচি শোন, নতুন বাড়ী হোলো, তবেশ বাবু, দামোদর বাবু কাল তাই 'টুকছিলেন আজ ওদের রাতে খেতে বলেছি তারই একটু জোগাড় দেখ।"

সুপর্ণা আর কোন কথা না বলিয়া যখন গৃহ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, পরেশ বুঝিলেন যে তাঁহার উপদেশ সুপর্ণার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে; সেজন্য একটু কোমল স্বরে বলিলেন "একে তোমার শরীর অসুস্থ, তার ওপর নিজের সংসারে এতোদিন যা ছিলেন, কোনো কিছুর ভার বইতে হয় নি, এখন তা বইতে হচ্ছে, আমার এর ওপর কি পরের ভাবনা ভাবতে আছে?"

পরেশ বাহিরের ঘরে চলিয়া গেলেন। সুপর্ণা একখানা কাগজে কি লিখিয়া নানুকে ডাকিয়া বলিলেন, "খানা চিনিস্ নানু?"

নানু একগাল হাসিয়া কহিল,- "খুব চিনি মাঠাজী, হিঁয়াসে থোড়া আগাড়ী আছে। দারোগা বাবুকে ঘরমে হামি পরশাদ কাহে তা করিয়েসে।"

সুপর্ণা কহিলেন —"এই কাগজখানা দারোগা বাবুর হাতে দিয়ে বলবি "বাবু ভেজ দিয়া" আমার নাম করবার দরকার নেই—বুঝলি?"

"খুব বুঝিয়েছে মাঠাজী" বলিয়া প্রভু পত্নীর নিকট হইতে কাগজ খানি লইয়া উৎসাহী নানু অবিলম্বে থানার অভিমুখে দৌড়িয়া চলিল।

(৪)

বেলা চারিটার সময় পরেশ যখন শীতল পানিয় আকণ্ঠ পান করিয়া পরিতৃপ্তির সহিত উদ্গার তুলিতেছেন, সেই সময় দারোগা সদলবলে আসিয়া তাঁহার গৃহে অতিথি হইলেন। বলা বাহুল্য তিনি অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। অবশ্য অন্যান্য বন্ধুদের প্রীতি ভোজনের জন্য আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন বটে।

দারোগাটি বাঙ্গালী পরেশ বাবু তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া একখানি কাগজ হাতে যখন বাড়ীর মধ্যে স্ত্রীর সন্ধানে আসিলেন, সুপর্ণা তখন তাঁহার ঘরের ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত, স্ত্রীর চোখের সম্মুখে কাগজখানি মেলিয়া ধরিয়া পরেশ প্রশ্ন করিলেন, একটু সিতে হইবে যে।

"এ কার লেখা ?"

"আমার।"

"নাম সই কে করেছে ?"

"আমি।"

"নিজের নাম সই করলেই পারতে, আমার নাম সই করবার কোনো দরকার ছিল না, আমি যদি এ সই অস্বীকার করি ; তোমার শাস্তি হতে পারে তা জান ?"

সুপর্ণা একটুও অপ্রতিভ না হইয়া কহিলেন, "তোমারি বাড়ীর কাছে এতোবড় জঘন্য একটা একটা ব্যাপার হোচ্ছে, সেটার সংবাদ তুমি উপস্থিত থাকতে আমি দিচ্ছি সেটা ভাল দেখায় না বলেই তোমার নাম সই করেছি—"

বাধা দিয়া রুক্ষ-কণ্ঠে পরেশ কহিলেন, "আই যে বাড়ীর পাশে আর একজনরা রয়েছে তারা ওতো এই তিনবছর ধরে এই সব কাণ্ড দেখ্‌ছে, তারাতো কই এ সব নিয়ে ঘোঁট পাকাতে যায় নি, তুমি দু'দিন এসেই তার দিকে চেয়ে দেখতে সুরু করেচ ? এখন এই জঘন্য ব্যাপার নিয়ে থানা পুলিশ তার সাক্ষী, সাবুদ, এ কি কম হাঙ্গামা, নিজের ঘরের কথা ত। এই জন্যে আমায় বলতেই হলো যে এ চিঠি আমি পাঠিয়েছি। এমন সময় হাস্য-বিকসিত মুখে নান্‌কু আসিয়া তৎপর তার সহিত খবর দিল, "দারোগা বাবু সব আসামীকে পাকড়াচ্ছে বাবু, সবকো খুব ধমক লাগাচ্ছে।"

পরেশ কঠোর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "চুপরও উল্লুকা বাচ্চা ; কিস্‌কা হুকুমে তুম্ থানামে চিঠি লেগিয়া, তুম্ কৌস্‌কা নোকর হ্যায়, হামরা কী মাফী জী কা ?" ভয়ে থতমত খাইয়া নান্‌কু প্রভুর প্রশ্নের উত্তর মোটেই দিতে পারিল না, পাংশু মুখে সুপর্ণা বলিয়া উঠিলেন, "চুপ কর তুমি, তোমার পায়ে পড়ি, যা শাস্তি দেবার আমাকে দাও, ওকে কিছু বলো না। নান্‌কু তুই যা এখান থেকে ?" নান্‌কু তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পলাইয়া বাঁচিল। সুপর্ণা বলিতে লাগিলেন, "আজ আমি আমার যথার্থ স্বরূপের পরিচয় পেলাম, আমি গৃহিণী নই, মা নই, আমি শুধু তোমার মুসলমান গৃহসজ্জারই একটি অঙ্গ বিশেষ।" স্ত্রীর রুদ্ধকণ্ঠে চকিত হইয়া পরেশ কণ্ঠস্বর কিছু নামাইয়া কহিলেন, "নিজেই যদি নিজেকে ছোটো করে ফেলো তা আমি আর কি করি ? তোমার সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্যে আমি যতটা প্রাণপণ চেষ্টা করি, অতোটা বোধ হয় খুব কম স্বামীতেই করে থাকে, তাতেও যদি সন্তোষ না হয়, সে তোমার নারীধর্ম জানে, কিন্তু স্বামীর অমতে এই সব কাণ্ড এগুলো মোটেই ভাল কাজ নয়।"

অশ্রুপূর্ণ চোখে সুপর্ণা কহিলেন, "হতে পারে আমি নারীত্বের সীমা উল্লঙ্ঘন করেছি, কিন্তু সত্যিই আমার অসহ্যবোধ হচ্ছিল। ঐ হতভাগিনীর নির্য্যাতন যেমন করে আমায় পীড়া দিচ্ছিল, তোমায় যদি তা দিত তুমি কখনই স্থির থাকতে পারতে না ! আমায় তুমি সুখে রেখেছ, সম্মান দিয়েছ জানি তা—তোমার পায়ে পড়ি তোমার সেই সব দান আজ তুমি ফিরিয়ে নাও। আমার মনুষ্যত্বকে, আমার অন্তরের অনুভবকে পিষে ফেলে, শুধু সাজ পোষাকের জীব বলে আমায় তুমি ভাববে, সে ভাবনা হতে রেহাই দাও তুমি—এই আমার প্রার্থনা। বাহির হইতে দারোগা হাঁকিলেন, "পরেশ বাবু, এদিকে আসবেন একবার।" পরেশবাবু বাহিরে আসিলেন। দারোগা নম্রকণ্ঠে কহিলেন, "অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, যে খবরটা জানিয়ে দিয়েছেন, আর দু'দিন এ ভাবে থাকলে মেয়েটা মারা পড়ত, এই গরমে মশাই শুনছেন কি তেষ্টার জল চাইলে গরম দাড় দিয়েছে খেতে ? এরা মানুষ না কসাই ! আপনি মানুষের মতো একটা লোক, তাই খবরটা দিয়ে দিয়েছেন। ভূপতিবাবুকে এতদিন থেকে চিনি, উনি এই পাড়ায় এতকাল রয়েছেন ; উনি সব দেখ্‌ছেন অথচ মুখের কথা একদিন একটু খুলে বলেন নি। আমার সঙ্গে তো দুবেলা দেখা।"

আমতা আমতা করিয়া পরেশ সৌজন্য প্রকাশ করিয়া দারোগাকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। এ দিকে সব কাজ কর্ম্মের বাহিরে উদাস ভাবে বসিয়া সুপর্ণা যে ভাবনা ভাবিতেছিলেন তাহা জানিতে পারিলে পরেশ মোটেই খুসী হইতেন না। স্ত্রীকে তিনি চিরটাকাল ধরিয়া যে মূল্যবান বসন-ভূষণ যোগাইয়াছেন, অশন বাসনে পরিতুষ্ট করিয়াছেন—সুপর্ণা ভাবিতেছে সে সবই স্বামীত্বের অভিমানে পূর্ণ—তাহা ছাড়া আর কিছুই নয়, আজ প্রবল দমকা হাওয়ায় উপরের আবরণ উড়িয়া যাওয়ায় অভিমানের অহমিকা পূর্ণ সেই নগ্ন ছবি বাহির হইয়া পড়িয়াছে—উপরে যার ছিল বিচিত্র আভরণ। নিজের নারী মহিমার এই শোচনীয় অবস্থার কথা ভাবিয়া সুপর্ণার অবাধ্য মন আবার দুঃসহ বেদনে পীড়িত হইয়া উঠিল। এই যেমনই না শাস্ত্রকার উচ্চকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন—

"নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে তত্র রমন্তে দেবতে।"

সে কি শুধু নারীর বিলাসিনী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া।

সা ———

ধিক যৌবন

(শ্রীকালিদাস রায় বি, এ, কবিশেখর)

ধিক যৌবন তোর ধিক যৌবন,
মরছিস্ অভিমানে চাখনে বঁধুর পানে
মিছে তোর সাজরূপ ওলো বৌ শোন।
বেণীরচা তোর ভুল এত চারু ঠাম ভুল
মিছে তোর আল্‌তা ও অধরের তাম্বুল,
অলিরে কিরাবি যদি অভিমানে নিরবধি
তবে মিছে ভুলে ভুলে মৌ-মৌ বন।

মিছে তোর অঞ্চলে আতরের সৌরভ
মিছে তোর একশত গতরের গৌরব,
ফেলে যে' গলার হার রেখেছিস্ কেন আর?
ও যে তার দত্তগাত উপঢৌকন।
মিছে হেম যৌবত মিছে রূপ লৌলুষ,
তোর মান এত বড়? এত হীন পৌরুষ?
যৌবন বৈশোর রঙ ভরা যৌ-ঘর,
গলে যাবে, নিভে যাবে তন-রৌশন।

বংশের কলঙ্ক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(উপন্যাস)

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অনিলাবালা পড়িবার ঘর হইতে একবারে নিজের শয়নকক্ষে উপস্থিত হইল। তখনও তাহার নয়ন-পল্লব অশ্রুসিক্ত, তখনও তাহার আরক্তিম গণ্ড দুটী শিশির স্নাত সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় দেখাইতেছিল। কক্ষে প্রবেশ করিয়াই অনিলা দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল এবং ইলেকট্রিক লাইটের সুইচ টিপিয়া ঘর অন্ধকার করিয়া দিল। হিঃ হিঃ হিঃ! সারা জগতের লোকে তাকে দেখে হাসছে! সরোজ দা, সরোজ দা, তাদের সরোজ দা। ছেলে-বেলা হতে তারা যার কত কোলে পিঠে চড়েছে, যার সঙ্গে তারা কতবার একপাতে খেয়েছে, যে নিজে খেতে খেতে কতবারই তাদের মুখে খাবার তুলে দিয়েছে, যার বুকের উপর শুয়ে সাত ভাই চম্পার গল্প শুনতে শুনতে তারা কতবার ঘুমিয়ে পড়েছে, যার কাছে তারা কত আবদার অভিমান করেছে, যে তাদের কান্না দেখতে না পেয়ে কতবার বুকে তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে, চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছে, বড় হ'লে যে তাদের শুকর মত জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলন করে দিয়েছে, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে যে তাদের সহোদর ভায়ের চেয়েও আপনার হতে আপনার,—সেই তাদের সরোজদার আজ এ কি অতিচ্ছন্ন ঘটলো! ধীর স্থির শান্ত সুশীল বিদ্বান বুদ্ধিমান সরোজ দা! তার এমন ভাব সে ত' কখনও দেখে নি। তবে কি মুহূর্ত্তের জন্য সরোজ দা উন্মাদ হয়েছিলো? তাই যেন হয়,

ভগবান তাই যেন করেন, না হলে এর পর সে আর কি ক'রে সরোজদার কাছে যাবে, সরোজদার মুখ পানে তাকিয়ে কথা কইবে!

সরোজ দা কি সব পাগলের মত আবোল তাবোল বকলে? সে না কি আমার স্বর্গের দেবী! কি যে বলে, তার মাথা মুণ্ডু নেই। আচ্ছা, সরোজ দা যখন ঐ সব কি ছাই ভস্ম বলছিল, তখন তার মনের ভিতরটা দারুণ বিরক্ত হয়ে উঠছিলো কেন, তার রাগ হচ্ছিল কেন, কান্না পাচ্ছিল কেন? নিশ্চয়ই সরোজদা তাদের সেই সরোজদা ব'লে। আচ্ছা, আর কেউ যদি অমনি করে বলত, তা হলে কি এমনই রাগ হ'ত, ঘেন্না করত, কান্না পেত? নিশ্চয়ই! জগতের যে কেউ বলত, তার রাগ হ'ত।

"জগতের যে কেউ?"—এই কথাটা মনে উদয় হইবামাত্র অনিলা হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল, তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। আঁধারে বসিয়াও অনিলা স্পষ্টই দেখিল, তাহার দুই গণ্ড একেবারে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে, জগতের লোকে তাহাকে দেখিয়া হাসিতেছে। সে লজ্জায় শয্যার উপরে দুই হাত রাখিয়া তাহাতে মুখ লুকাইল।

কিন্তু মুখ লুকাইলে কি হইবে, সে যতই চেষ্টা করে ঐ কথাটা ভুলিয়া যাইতে, ততই যেন ঐ কথাটা তাহার কর্ণকুহরে অবিরত ধ্বনিত হইতে থাকে, আর দারুণ লজ্জা তাহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরিয়া ধরে। কি জ্বালা! "জগতের যে কেউ"—এই কথাটা তাহাকে এত লজ্জা দেয় কেন?

"যে কেউ," কথাটা ভাবিতে সেই—সেই—সেই একজনকে কেবল মনে পড়ে কেন? সেই যে তার মনের কোণে অতি গোপনে সেই—সেই—সেই যে তার মূর্ত্তটী আঁকা রয়েছে, সে যদি—সে যদি—আজ তাকে এমনই সব কথা ব'লত? তা হলেও কি তার মন রাগে ঘৃণায় ভরে উঠত, তার কেবল কান্না পেত?

স্বপ্নে শোনা বাঁশীর গানের মত মিষ্ট মধুর একটা সুর যেন আকাশে ভাসিয়া আসিতে লাগিল, সেই সুর যেন অনিলার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল। বহু দূরে—বহু সুদূরান্তরে নহে, একদিন এই বাড়ী বাগানেই এই সুর তাহার মরমে পশিয়াছিল, আর এই সুরেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিয়াছিল। আজিও অনিলার কাণে সেই সুর বাজিতেছে, আজিও সেই সুরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভরপুর হইয়া রহিয়াছে, জীবনান্তেও সেই সুর তাহাকে ছাড়িবে কি?

"কি করেছি আমি, নিলা!"—সেই কাতর করুণ আবেদন এখনও তাহার কাণে বাজিতেছে, সেই ছলছল অভিমানাহত চক্ষু এখনও তাহার দৃষ্টি ছাইয়া রহিয়াছে। সে এত চেষ্টা করে, কেন ভুলিতে পারে না!

ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জা! লোকে হয় ত' তার মনের কথা জানতে পাচ্ছে। তা হ'লে, তা হ'লে? সে ত' আর কারও সামনে বেরুতে পারবে না।

অনিলা আবার শয্যায় মুখ লুকাইল। একটা দারুণ লজ্জা ও ভয়ে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। অথচ একটা অজানা অননুভূত অনাস্বাদিত সুখাবেশে তাহার শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। কেন যে মোটরের গতির মত তাহার এই দ্রুত বক্ষস্পন্দন হইতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। কেন যে একটা নূতন ভাবে তাহার হৃদয় ভরপুর হইয়া উঠিতেছে, সে তাহাও বুঝিতে পারিল না। কেন যে সে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইবামাত্র লজ্জা ও ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, অথচ একটা অনির্ব্বচনীয় সুখ ও আনন্দে তাহার ক্ষুদ্র জীবনটী পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহাও সে বুঝতে পারিল না। সরলা বালিকা, সে ত' বুঝিতেছিল না যে সরোজনাথের সদ্ভাষণের ফলে তাহার মনের গুপ্ত রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার চোখের সম্মুখে সেই অতি গোপনে লুকায়িত মনের রহিয়া-

আজ স্পষ্ট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ক্ষুদ্র বালিকা সে, সে ত' জানে না, এতদিন সে সংসারের ছেলে-খেলা লইয়া জীবন কাটাইয়াছে, এখন যে নারী-জীবনের গভীরতম সমস্যাসাধনের পথে সে প্রথম পদার্পণ করিতেছে। পাখী যেমন ব্যাধের ধীরে ও গোপনে সঞ্চারিত সন্তর্পিত পদার্পণ প্রথম অনুভব করিয়া পাখা ছট্‌ফট্ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করে, অনিলাবালার মনটীও তেমনি প্রেমের দেবতার গোপন আবির্ভাবের সাড়া পাইয়া ভীত ত্রস্ত হইয়া আপনার মধ্যেই আপনি লুকাইয়া লজ্জা রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল, বালিকা তাহা তখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না।

অনিলার মনটা কি এক অজানা অব্যক্ত ভয়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রেম-দেবতার ওঠা-নামার খেলা—আশীর্ব্বাদ অভিসম্পাতের টানা-পোড়েন—তাঁহার নবীন ভক্তের জীবন-উষার আলোকে একটা ছায়াপাত করে কি? এ দেবতার অনুরক্ত ভক্তের ভাগ্যের পরীক্ষা বড় কঠিন, বড় ভীষণ,—সে পরীক্ষা কখনও হাসায়, কখনও কাঁদায়; কিন্তু ভক্তের চক্ষুতে সেই হাসি-কান্না কত মধুর, কত স্বর্গীয়! তাই সে দেবতার এই দান মাথা পাতিয়া লইয়া থাকে। বড় মিষ্ট সেই দান বটে, কিন্তু তাহাতে লজ্জা, ভয়, অভিমান, আশঙ্কা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা সঙ্গের সাথী হইয়া থাকে। তবে অনিলা! সরলা অনাঘ্রাতপুষ্পা বিশুদ্ধচিত্তা অনিলা! সাধ করিয়া এই আগুনে ঝাঁপ দিয়া পরীক্ষার পার হইতে যাইতেছ কেন? কোন জ্বালা ত' তোমার ছিল না, কেমন সরল শিশুর মত হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া গাহিয়া মনের আনন্দে বেড়াইয়াছ। আজ সাধ করিয়া যে দেবতার ভজনা করিতে যাইতেছ, সেই দেবতার ভক্ত হইতে কত জ্বালা, কত যন্ত্রণা সহিতে হইবে, তাহা কিছুই জান না, অথচ সেই দেবতার ভক্ত আশীর্ব্বাদের সুখের কল্পনার আবেশে বিভোর হইতেছ।

অমর কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন,—

"কেবা নিরমল প্রেম সরোবর
নিরমল তার জল।
দুখের মকর কিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল॥"

বড় অনাবিল পবিত্র বালিকার হৃদয়ের এই প্রথম প্রেম; ইহজগতে এত আনন্দদায়ক আর কিছুই নাই; কিন্তু লোকলজ্জা, আশঙ্কা, উদ্বেগরূপ ভীষণ মকর কুম্ভীর সেই হৃদয়-প্রেমসাগরে সদাই ভয় দেখাইয়া থাকে, তাই এত জ্বালা। চণ্ডীদাস তাই বলিয়াছেন যে, প্রেমে সুখের মাঝারেও দুঃখ জাগিয়া থাকে:—

"কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখদুখ দুটী ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তার ঠাঁই॥"

বালিকা কোন দুঃখ জানে না, কেমন আনন্দে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে খেলিয়া বেড়াইতেছে। চোরের মত প্রেম-দেবতাটী অজ্ঞাতে নিঃশব্দপদ-সঞ্চারে ওটী ওটী মনের মন্দিরে ঢুকিলেন, আর তাহার মনের শান্তি কোথায় উপিয়া গেল! "যেমন চোরাই হরণ করিল, মানসে কাটল সাঁধ,"—অমনই সঙ্গে সঙ্গে সেই সাঁধ-দেওয়া মনের ঘরে প্রবেশের সুবিধা পাইয়া যত রাজ্যের অশান্তি আসিয়া ঢুকিয়া পড়িল। জগতের গতিই এই। এতে প্রেমময়ী রমণীর সমস্ত অন্তরটা ছেয়ে থাকে, এটা তাদের অস্থিমজ্জাগত। এর হাত থেকে তার নিস্তার নেই, নিস্তার পেলেও সে সেই নিস্তার চায় না। এতে যত সুখ, তত জ্বালা; অথচ সেই জ্বালা সে হাসিতে হাসিতে গায় মাখিয়া লয়।

এ প্রেমে কত সুখ! লুকিয়ে দেখবো, লুকিয়ে পূজো করবো, কিন্তু কেউ জানবে না, কেউ দেখবে না, কেউ শুনবে না, তা হলেই লজ্জায় মরে যাব। দুঃখ কি, জ্বালা কি? জ্বালা?—সে, সে, সে, কোথায়

কোন্ অজানা অচেনা অমঙ্গলের বেশে আছে, তার দেখানে যত্ন হবে না, বিপদে আপদে দেখবার কেউ থাকবে না। একদিন সে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল শুনে বুক ধড়ফড় ক'রে উঠেছিল কেন? আর একদিন পাখীর কামড়ে তার হাত কেটে রক্ত ঝুঁজিয়ে পড়েছিল ব'লে চারিদিক আঁধার দেখেছিল কেন? এত ভাবনা, এত জ্বালা এতে, তবু এর ভাবনা এত মিষ্টি লাগে কেন?

আচ্ছা, আসামে যাবে কেন? কাজ শিখতে। এখানে কি কাজ শেখা হয় না? আসাম? আসামের নাম মনে পড়িবামাত্র অনিলা চমকিয়া উঠিল। আসামের মানচিত্র সে না পড়বার ঘরে খুলে রেখে এসেছে? সর্ব্বনাশ? তাতেই ত' সেই—সেই ছবিখানা পাতা-চাপা দেওয়া রয়েছে!

অনিলা উঠিয়া দাঁড়াইল, উঠিয়াই ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বালাইয়া দিল। সে ঘরে ত' দরোজাও ছিল, হাঁ—যদি—দরোজা—না, না, তা হ'লে সে সত্যই লজ্জায় মরে যাবে। একবার অনিলা ভয়ে ভয়ে দর্পণের দিকে চাহিল, দেখিল সত্য সত্যই তাহার মুখ-চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। চোখমুখ ধুইয়া ফেলিয়া সে ঘরের বাহির হইল।

তাহার মনটা ঝড়ের বেগে পড়িবার ঘরের দিকে ছুটিলেও, তাহার চরণদুটী ভীতীভরা অগ্রসর হইল। ঘরের বাহির হইতে অতি সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া দেখিল, কেহ নাই; তখন তাহার শুরু শুরু বক্ষের স্পন্দন শুরু হইল। সে দ্রুতগতি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, টেবিলের উপরে কিছুই নাই, সেই মানচিত্রও নাই, সেই ছবিও নাই! কি সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে সরোজ যা কি—

না, না। অনিলা টেবিলের আশ পাশ ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু কিছুই পাইল না। একজন খানসামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, এই খানিক আগে "দাদাবাবু" কাপড়-চোপড় পরিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন। তবে—তবে—ছবি কি হইল? মানচিত্র কি হইল?

দারুণ আশঙ্কা ও উদ্বেগে অনিলার মুখ শুকাইয়া গেল। অকস্মাৎ অনিলার চিন্তারাশি কোথায় উড়িয়া গেল, অরুণকুমারের হাতের আঙুল ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে দুষ্ট অমিয় সরল উচ্চ হাসির রোলে ঘর দ্বার কাঁপাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল, আসিয়াই বলিল, "এই দেখ দিদি, কাপ্তেন দাদা বাবুর্চিখানা থেকে এসে না খেয়ে পালাচ্ছিল। কেমন ধরে এনেছি? হাঃ হাঃ হাঃ! এইবার দিদির কাছ থেকে পালাও দিকি?

অরুণ হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওরে দুষ্টু, ছেড়ে দে। কাল তখন খেয়ে যাব। আজ এখনই যেতে হবে, কেনেডি সাহেব হয় ত' এতক্ষণ বকুলবাগানের বাড়ীতে এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

অমিয় ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "সাহেব বুঝি আমাদের চেয়ে তোমার আপনার লোক হ'ল? হুঁ! কেমন না খেয়ে যাও দিকি? ও দিদি, বলনা কাপ্তেনদাকে, দেখনা পালিয়ে যাচ্ছে।"

অনিলা এতক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া বসনাঞ্চল লইয়া খুঁটিতেছিল, তাহার চোখের পাতাও দুটিটীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল; সুতরাং তাহার মনের ভাব কি, কিছুই বুঝা গেল না, কথা ও' সে কহিলই না।

অরুণ মহা ফাঁপরে পড়িয়া অনিলাকেই আবেদন করিল, "নিলা, আজকার মত আমায় ছুটি করিয়ে দাও না, আমি কাল নিশ্চয় আসবো।"

অনিলা মুখ না তুলিয়াই অমিয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিল, ছেড়ে দে অমি, কাজ আগে না খাওয়া আগে? সেদিন জেঠামনিও ত' খাব ব'লে খেয়ে গেলেন না।"

অরুণ একটু আশ্বাস পাইয়া বলিল, "এই দেখ।

রাগ ক'রলে নিলা ? কি যে আমি করেছি, আজ কাল আমার উপর কথায় কথায় তোমরা রাগ কর। বড় কাকা ভাল করে কথা কন না, তোমায় ত দেখাই পাই না। দেখা পেলেও কথা কও না, মুখ ভার করে থাক। কেন কি দোষ করেছি আমি নিলা ?"

আবার সেই স্বর,—করুণ, কাতর ! অন্ধ অরুণ, তোমার দোষ ? কার কাছে—অনিলার ? হায় রে, লোক যদি অন্ধের মনের ভিতরটা দেখিতে পাইত !

অনিলার অন্তরে কি হইতেছিল সে এক অন্তর্যামী ভিন্ন কেহ জানিল না, মুখে সে কোন জবাব দিল না ; কিন্তু তাহার শরীর প্রতিহত নদীস্রোতোমুখে দণ্ডায়মান বেত্রবৎ কাঁপিতেছিল। অরুণ কুমার অন্যমনস্ক না হইলে তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাইত।

কক্ষের নীরবতা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। এই সময় অমিয় হঠাৎ বলিল, "এই দেখ ত' কাপ্তেন দা, তুমি খেতে চাও না, দিদির কথা শোন না, তাইতে দিদি রাগ করে। তুমি যদি আগের মত দিদিকে ভাল বাসতে, দিদির সঙ্গে খেলা করতে—"

অনিলা মহা অপ্রতিভ ও বিব্রত হইয়া অমিয়র প্রতি কপট কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার মুখে থাবা দিয়া বলিল, "আঃ তুই থাম্, অমি ! তারি কথা শিখেছে, দুষ্ট কোথাকার !"

অরুণ উদ্বিগ্নচিত্তে কাতরস্বরে বলিল, "সত্যই কি তাই' নিলা ? অমি যা বলেছে, তাই কি সত্যি ? এই জন্যে আমার উপর রাগ করেছ ? আমি আগেকার মত ভালবাসিনা ? ওঃ মনটা যদি খুলে দেখাবার হত !"

অনিলা যেন সে কথা শুনে নাই, এমনই ভাব করিয়া অমিয় কুমারের মাথায় হাত দিয়া বলিল, "চল্ অমি, যাবি চল্।" অনিলা যাইবার কথা বলিল বটে, কিন্তু তাহার পা চলিল না, সে মুখ খানি অবনত করিয়া অমিয় কুমারের কুঞ্চিত কেশদামের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিল।

অরুণের মনের মধ্যে ভাব-সাগরের তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছিল। সে দেখিল, অনিলা সাধ্যমত তাহার সহিত কথা না কহিতে চেষ্টা করিতেছে। তবে কি তাহার নামে নানা কথা শুনিয়া সে তাহাকে ঘৃণা করিতে শিখিতেছে ? কিন্তু সে দোষী কিসে ? মিথ্যা কলঙ্কে অনিলা বিশ্বাস করে কেন ? একটা দুর্জ্জয় অভিমান আসিয়া অরুণের সরল মনটাকে আচ্ছন্ন করিয়া বসিল। সে অভিমানাহত ম্লান স্বরে বলিল, "কথার জবাবটাও দেবে না ? তাতেও ঘৃণা ? বেশ, চলে যাচ্ছি, পরন্তু একবারেই যাব, আর আমার সঙ্গে কথা কবার দরকারও হবে না।"

অরুণ এই কথা বলিয়া ছড়িটা তুলিয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া একবারে কক্ষদ্বারের নিকটে উপস্থিত হইল। বস্তুতঃ তাহার মনটায় বড় আঘাত লাগিয়াছিল। সে কোন দোষ করে নাই, এক দোষের মধ্যে সে খেলাধূলা লইয়া থাকে ; কিন্তু তাহা বলিয়া কি সে একেবারে ঘৃণার পাত্র !

অনিলার প্রাণের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। এই যে অভিমান ভরে যাইতেছে বিদেশে, এই হয় ত' শেষ দেখা। এ সময়ে লজ্জা ? দূর হউক লজ্জা ! কিন্তু কথা কহিতে গেলে পেটের মধ্যে জীভ টানিয়া ধরে কেন ? অনিলা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "কেন যাচ্ছেন ? খেয়ে যাবেন না ?"

অরুণ ফিরিয়া দাঁড়াইল, তাহার গম্ভীর মুখে হাসি ফুটিল। সে আবার দুই তিন পাদবিক্ষেপে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকাতরে বলিল, "নিলা, কেন আমায় ঘৃণা কর ? লোকের মুখে যা শোন, বিশ্বাস করো না, বল বিশ্বাস করবে না ?"

অনিলা পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে বলিল, "আমি কিছুই বিশ্বাস করিনি।" অরুণের মুখে চোখে এবার হাসি খেলিয়া গেল। বালক যেমন খেলার পুতুল পাইলে আনন্দিত হয়, অরুণ তেমনই আনন্দিত হইয়া বলিল, "আমি মুখ্যু, আসলে কাজের লোক নয়। আচ্ছা

নিলা তুমিই বল ত,' কাজে না দিলে কি ক'রে কাজের লোক হই? জলে না নামলে সাতার কাটতে শেখে কি কেউ? বলত?" অরুণ এমনই বালকের মত আবদার করিয়া ঐ কথাটা বলিল যে, অনিলা ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। অমিয় তাহার দিদির হাসি দেখিয়া হো হো হাসিয়া উঠিল।

অরুণ কিন্তু গম্ভীর হইয়া বলিল, "তা বেশ, তোমরা হাসবেই ত। আমার কিন্তু মোটেই হাসি পাচ্ছে না। তোমাদের যদি এমনই করে আপনার লোক জনকে ছেড়ে যেতে হ'ত, তা হলে দেখতুম কেমন হাসতে। তোমাদের সব ছেড়ে যেতে আমার মনে কি হচ্ছে, তা ত' বোঝাতে পারবো না। যাক্, রাত হ'ল, যাই, সাহেব বসে থাকবেন।"

অনিলা অতি মৃদুস্বরে বলিল, "কেন যাচ্ছেন?"

অরুণ বলিল, "যাচ্ছি কাজ শিখতে। বড় কাকা বলেছেন, অজেজো, অলস, আমি বাড়ীর আরামের মধ্যে থাকলে মানুষ হতে পারব না। তাই দূরদেশে যাচ্ছি।"

অনিলা তখনও মুখ না তুলিয়া বলিল, "জঙ্গলে"

অমিয় বলিল, "হাঁ দিদি, আসামের জঙ্গলে। সরোজদা বলেছে, সেখানকার জঙ্গলে মস্ত মস্ত সাপে হরিণ গিলে খায়, বাঘ, খেপা হাতী—

অরুণ হাসিয়া অমিয়কে দুই হাতে শূন্যে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "হাঁ হাঁ, গো মশাই, তোমার সব জানা আছে দেখছি। এখন যা দিকি দুই পেয়ালা একটা আইসক্রিম সোডা নিয়ে আয় দিকি, খেয়ে যাই।"

অমিয় ফুদারের পাদ দ্বয় ভূমি স্পর্শ করিল কি না সন্দেহ, সে এত দ্রুত ছুটিয়া গেল। অনিল মহা ফাঁপরে পড়িল, আজকাল অরুণের সামনে একলা থাকা তাহার পক্ষে যে কত বড় বিপদের কথা, তাহা আজও সে বেশ অনুভব করিল। সেও "চল আমি খাবার দিইগে" বলিয়া ঘরের বাহির হইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু অরুণ পথ আগুলিয়া হঠাৎ তাহার হাত দুটি ধরিয়া ফেলিল। অনিলার সর্ব্ব শরীরের মধ্য দিয়া একটা তড়িৎ প্রবাহ বহিয়া গেল। সরোজ দা হাত ধরিলে এমন ত' হয় না। এই স্পর্শে কি একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবে সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠে কেন?

মুহূর্ত্তের জন্য অনিলা একবার মুখ তুলিয়া অরুণের দিকে চাহিল। মুহূর্ত্তের জন্য চারি চক্ষুর মিলন হইল; মুহূর্ত্ত মধ্যেই অনিলা অরুণের চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া নিজের দৃষ্টি নামাইয়া লইল।

অরুণ আকুল চিত্তে বলিল, "নিলা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, কতদিন থাকবো জানিনি, আর ফিরে আসবো কিনা তাও জানিনি। ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তা জানবো কি ক'রে? তাই যাবার আগে একটা কথা বলে যাব। দেশে ফিরে আসবার সম্ভাবনা নাও থাকতে পারে, তাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করে যাব।"

অনিলা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সে অরুণের হাত হইতে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়াছিল। সে মুখ নিচু রাখিয়াই গম্ভীর ভাবে বলিল, "কি বলুন।"

অরুণ তাহার সমস্ত প্রাণটা কথার মধ্য দিয়া বলিল, "নিলা যদি কাজের লোক হয়ে দেশে ফিরতে পারি, বল তখন ঘৃণা করবে না, আবার আগে যেমন ভালবাসতে তেমনই বাসবে? কেবল এই আশাতেই যাচ্ছি।"

অনিলা কোনও উত্তর না দিয়া কেবল একবার তাহার মুখপানে তাকাইল। অনিলার সমস্ত প্রাণ সেই দৃষ্টিতে নিহিত ছিল, সেই দৃষ্টিতে তাহার রমণী-হৃদয়ের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিল। অরুণ চক্ষুষ্মান হইলে তাহা দেখিতে পারিত, বুঝিতে পারিত। কিন্তু প্রণয়ীর প্রাণ সদাই শঙ্কিত, ত্রস্ত, ভীত, সদাই অমঙ্গল ও নৈরাশ্যের চিন্তায় চিন্তিত। তাই অরুণ দেখিয়াও দেখিল না। সে ব্যাকুল ভাবে বলিল, "বল, আশা বিফল হবে না?"

এবারও অনিলা কোন জবাব দিল না। অরুণ ক্ষুব্ধ অভিমানাহত চিত্তে বলিল, "স্বীকার করছি, আমি অকর্ম্মণ্য। কিন্তু তাই ব'লে চিরকাল তা থাকবো না। একবার কাজে আমায় দিয়ে—"

"কে কাজে ঢুকবে, অরুণ তুমি?" এই কথা বলিতে বলিতে রামসদয় বাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার সঙ্গে কালীশঙ্করবাবু এবং পশ্চাতে অনিল! অরুণ ও অনিলা চমকিত হইয়াছিল, হঠাৎ অপরের গলার আওয়াজ শুনিয়া উভয়ে চমকিয়া উঠিল। সকলে উপবেশন করিলে পর রামসদয়বাবু রঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি কাজের লোক হবে বটে অরুণ। সাড়ে আটটায় সাহেবের সঙ্গে এনগেজমেণ্ট (সাক্ষাতের কথা), রাত্তির সাড়ে নটা হয় তোমার দেখা নেই। সাহেব বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন। আমরাও বসে বসে শেষে বিরক্ত হয়ে এখানে তোমার খোঁজ করতে এলুম। এমন না হ'লে আর কাজের লোক?"

অরুণ অপ্রতিভ হইয়া নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় দিনভির স্বরে বলিল, "সাহেব চলে গেছেন? আমি এখনই তাঁর হোটেলে যাচ্ছি।" অরুণ ব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহির হইতেছিল; কালীশঙ্করবাবু নিষেধ করিয়া বলিলেন, "থাক, আজ আর যেতে হবে না, গেলেও তাঁর দেখা পাবে না, কাল সকালে যেও। ছিঃ ছিঃ পরশু তুমি আগাম যাত্রা ক'রবে আজ দেখা করবার কত আবশ্যক ছিল বল দিকি?" অনিলা আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে ঐ কথা শুনিবামাত্র মৃদু ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে অরুণের দিকে চাহিল, অরুণের হৃদয়ে সেই দৃষ্টি শেলসম বিদ্ধ হইল।

রামসদয়বাবু উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, "কোথায় যাক, কি করে বেড়াও, তা আর জানতে বাকি নেই। টাকাও বাজে উড়িয়ে দিচ্ছ কেমন, তাও শুনতে পাচ্ছি। তুমি আবার কাজের লোক হবে।"

অরুণ স্বভাবতঃই ঠাণ্ডা প্রকৃতির, কিন্তু অন্যায় বা মিথ্যা সে সহ্য করিতে পারিত না। অন্যায় দেখিলেই তাহার মাথা বিগড়াইয়া যাইত, সে ক্রোধে একবারে জ্ঞান-হারা হইত। আজি কালি প্রায় রামসদয়বাবু ঐ ভাবের ঠেস দিয়া তাহার নানা দোষ অপরাধের কথার ইঙ্গিত করিতেন। কোনও অপরাধে অপরাধী নয় সে, অথচ তাহার চলা ফিরা অর্থব্যয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া অযথা নিন্দা করা হইল। অরুণের বহুদিনের প্রচ্ছন্ন ক্রোধ-বহ্নি ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তথাপি তিনি অনিলার পিতা বলিয়া সে বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "দেখুন বড়কাকা, আপনি আমায় যত অপরাধী বলেই বিশ্বাস করুন, আমি তা নই। স্বীকার করছি আমি অকর্ম্মণ্য, কিন্তু তা ব'লে মনেও ভাববেন না যে, আমি বাপ সঙ্গে বেড়াচ্ছি বা টাকার অপব্যবহার করছি।"

রামসদয় বাবুও সমান ওজনে বলিলেন, "করছো না? মনে করছি, চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা শিবের বাবাও টের পান না? তুমি বংশের কলঙ্ক।"

কালীশঙ্করবাবু চমকিত হইলেন, অনিলার মুখখানি ম্লান হইল, অরুণের মুখচক্ষু রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কণকালের নিমিত্ত কক্ষ মধ্যে একটা বিকট নীরবতা বিরাজ করিল। রামসদয়বাবু কিন্তু কণামাত্রও বিচলিত হইলেন না, তিনি পুর্ব্বের ন্যায় কঠোর ও গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন।

অনিলা একবার মাত্র চকিতে অরুণের মুখের দিকে চাহিল। সেই শক্তিতে দীপ্যমান সরল নির্ভীক দৃষ্টির সহিত দোষ বা পাপের কোনও সংস্রব থাকিতে পারে না। মুহূর্ত্ত পরেই অনিলা কালীশঙ্করবাবুর মুখপানে তাকাইল। তাঁহার চোখে-মুখে একটা দারুণ কাতরতা ও যাতনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অনিলা বুঝিল, পুত্রস্নেহে পিতার প্রাণে তাহার পিতার ঐ নিষ্ঠুর কথাটা কি ব্যথা

দিয়াছে। তাহার স্নেহপ্রবণ কোমল অন্তঃকরণটী সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল। সে দুইহাতে তাঁহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া তাহার কুসুম-কোমল কপোল তাঁহার সিতশুভ্র শিরোপরে স্থাপন করিল।

অরুণ ক্ষণকাল মাত্র বিচলিত হইয়াছিল। দারুণ ক্রোধে, ক্ষোভে ও অভিমানে তাহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মাত্র। সে বুঝিল, সে যখন নিজে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তখন কাহারও মিথ্যা অভিযোগে অনুযোগে তাহার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আজ হয়ত' কোন অজ্ঞাত কারণে তাহার সম্বন্ধে অনিলার পিতার এইরূপ ধারণা হইয়াছে; আবার যখন সত্য প্রকাশ পাইবে, যখন তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিবেন, তখন তিনিই প্রথমে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। ভুল কি মানুষের হয় না?

অরুণ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "কি জন্য আপনার এমন ধারণা, তা জানি না। তবে এক দিন আপনার এ ধারণা দূর হবেই, কেন না সত্যকে যতই চাপা দিন না, সে আত্মপ্রকাশ করবেই করবে।"

রামসদয় বাবুর প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। এই বালকের মত সরল উদার নিষ্পাপ মুখে মিথ্যা কখনও উচ্চারিত হইতে পারে না। তবে কি তাঁহার ধারণা ভ্রান্ত? না, না, তিনি যে সব প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহা ত' অকাট্য। এ জগতে মানুষ চেনা বড় কঠিন; শান্ত সুন্দর মুখের অন্তরালে কপট কঠোর কালকূটে ভরা অন্তর থাকা কিছু আশ্চর্য্য নহে। তথাপি অরুণ যখন দুই দিনেই বিদেশ যাত্রা করিতেছে, তখন তাহাকে বিদেশ সম্বন্ধে উৎসাহিত করা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া রামসদয় বাবু প্রকাশ্যে বলিলেন, "বেশ, তাই হোক, তোমার কথাই যেন সত্য হয়। কায়মনে আশীর্ব্বাদ করি, যেন বিদেশে গিয়ে তোমার পিতার মুখ—তোমাদের পবিত্র বংশের মুখ উজ্জ্বল কর।

অরুণ তাঁহার উপর ধীর গম্ভীর প্রশান্ত দৃষ্টি স্থাপন করিল। তাহার আকর্ণ বিস্তৃত উজ্জ্বল নয়ন-দুটী কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে জ্বলিতেছিল। সে দৃঢ় অবিকম্পিত স্বরে বলিল, "ভগবানের দয়ায় যেন তাই করতে পারি। আজ আপনি আমাকে বংশের কলঙ্ক বলেছেন। এর চেয়ে কঠোর অন্যায় কথা আর বোধ হয় কিছু বলা যায় না। কিন্তু দেখবেন, এই বংশের কলঙ্ক তার বংশের সুনাম রক্ষা করতে সমর্থ হয় কি না। অহঙ্কার ক'রে বলছি না, যথার্থ আমার মনের মধ্যে কে যেন এসে বলছে, এই মনে দুর্জ্জয় শক্তি নিহিত রয়েছে। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সেই শক্তির সদ্ব্যবহার করতে পারি। যদি সফল হই, তখন আপনার কাছে এসে একটী ভিক্ষা চাইব, তখন যেন অমূল্য ব'লে তা দিতে অসম্মত হবেন না।"

অরুণ এই কথা বলিয়া একবার মাত্র অনিলার পানে তাকাইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। কালীসদয় ও রামসদয় বাবুর দৃষ্টিও কি জানি কেন ঐ "ভিক্ষা" কথাটা উচ্চারিত হইবার পরেই অনিলার উপর নিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু অনিলার মুখখানি কেহ দেখিতে পাইলেন না। সেও সেই "ভিক্ষা" কথাটা শুনিয়া অবধি মুখখানি একবারে রাঙ্গা করিয়া তাহার জেঠামণির পাকা চুলের মধ্যে লুকাইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

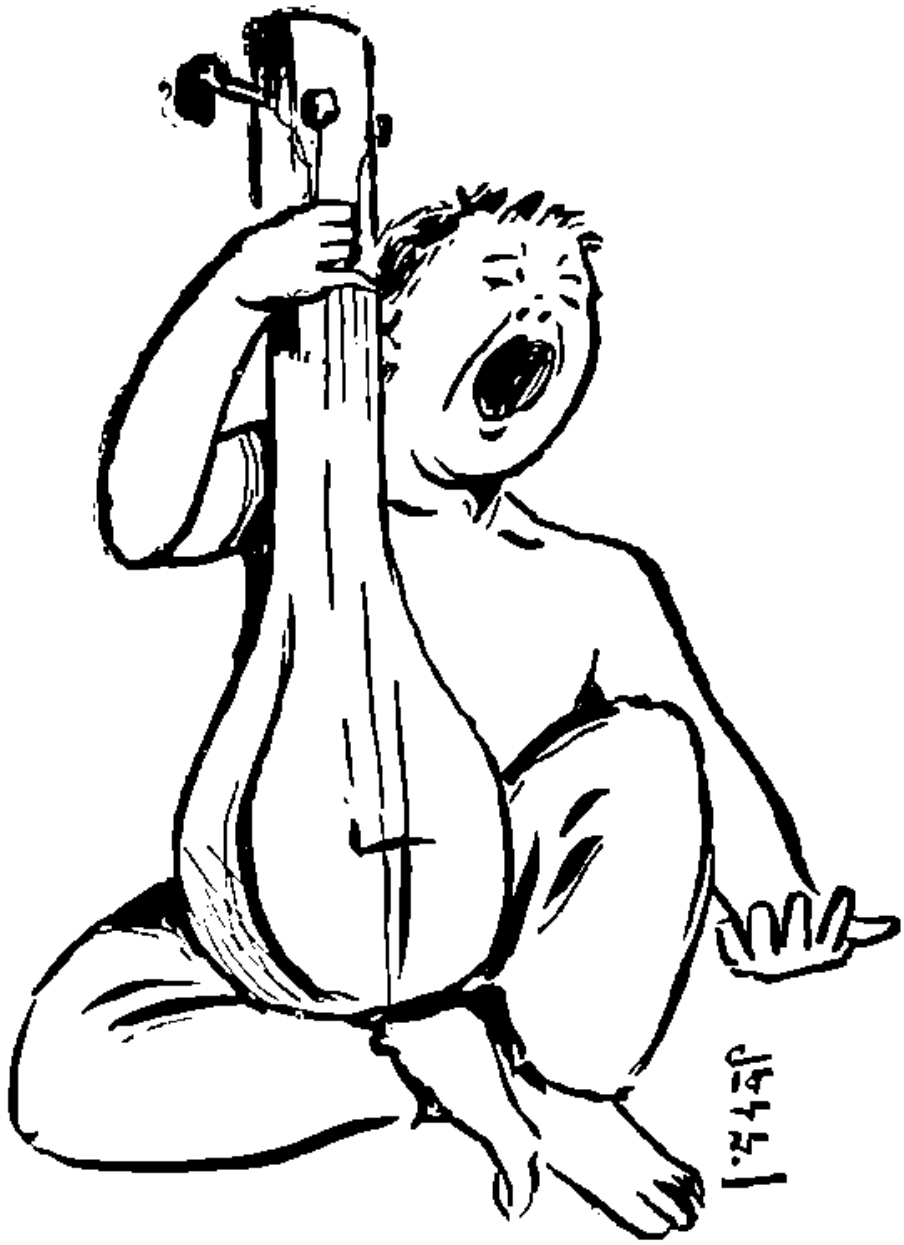

৫—

মরণ

(শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী)

মরিয়াছি—কহে সবে, এ যদি মরণ, তবে
বাঁচিতে না চাই—
এ মরণে মৃত্যু-রাজ দণ্ড ধরি' রোষ-নেত্রে
দাঁড়িয়ে তো নাই।

অন্ধকার স্তরে-স্তরে ঘনায়ে আসে না হেথা
নিদ্রার আবেশে,
কণ্ঠ চাপি' বাক্য-রোধ করে না রাক্ষস আসি'
জীবনের শেষে।

মরিয়াছি, অর্থ তার, ভালবাসিয়াছি তোমা
অন্তর মাঝার,
মনে হয়, লজ্জা পায় শুভ্র-হাসি চন্দ্রমার
হাসিতে তোমার,
মনে হয়, হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার যায় খুলে'
তোমার পরশে,
সুধি-সুধা পান করি' চলিয়া পড়ে যে তনু
আবেগে লালসে।
তোমার কথায় মোর হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে
বেজে' ওঠে গান,
তুমি যাও চলি', সাথে অন্তরের চলিবার
পাই যে আহ্বান।
ঘুড়িয়া হাওয়ার মত তুমি যে আমার সাথে
ঘুঁড়িয়াছ খেলা,—
এ যদি মরণ তবে লাগে যেন মোর ঘাটে
মরণের ভেলা।

মরণ ?—মরণ বটে, যদি তব আঁখি দু'টি
সহ ফিরাইয়া,
যদি ক্ষণিকের তরে অভিমান-ভরে রহ
কথা না কহিয়া,
যদি গঙ্গা-প্রবাহের কলকণ্ঠে নাহি হাস
তরঙ্গিত হাসি,
যদি তমালের তলে বৃথা শুধু লুকাইয়া
বাজে মোর বাঁশি।

সেদিন মরণ আসে জগৎ ঘুড়িয়া, অন্ধ
নয়নের আগে,
সেদিন তারকা-চক্র নভ হ'তে যায় খসি'
প্রলয়ের ডাকে,
সেদিন বাসুকি ফেলে মন্থনের শেষ শ্বাস
মলয়-পবনে,
সেদিন হৃদয়ে বাজে নরকের দণ্ডাঘাত
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

লোকে কহে, মরিয়াছি, এ মরণে মরিয়াছি
আপনারি হাতে,
এ মরণে বাঁচিবারে জীবনেরে ভরে' তুলি
শুধু শূন্যতাতে।
কত জনে কহে মম এড়াতে মরণ-জ্বালা—
তবু মাগি তাই,
যদি তব আঁখি দু'টি ক্ষণিক হাসিয়া ওঠে,
কিছু নাহি চাই।

মালা বদল

(গল্প)

[শ্রীলীলা দেবী]

(১)

নবাবের খাসমহলের বেগম জুলেখা বিবির খাস বাঁদী জিন্নাকে দেখলে মানুষের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও দুঃখের সৃষ্টি না হ'য়ে ছাড়তো না। কেন যে তার এই ভরা যৌবনের রূপের তুফান ক্রীত দাসীর বিষাদময় জীবনে ব্যর্থ হ'তে চ'লেছে, তা কেউ জানতো না।

জিন্নার ভাসা ভাসা টানা টানা নীল পদ্মের মত সুরমা আঁকা চোখ, দুই ফুলের পাপড়ীর মত পাতলা ঠোঁট দু'খানি পাহলের মত রাঙা, তাতে একটুখানি হাসির চেউ মাধবী রাতের স্নিগ্ধ মাধুর্য্যটা নিয়ে মুক্তার মালার মত এক সারি দাঁত। মিশমিশে কালো চুলের লম্বা বেনী, জিন্নার ওড়নার উপর দিয়ে লীলায়িত ছন্দময় কটীতটের অনেকটা নীচে অবধি দোদুল্যমান, বেগমের উপহৃত হীরার ঝুমকে তাতে গ্রথিত। তার সুচিত্রিত ক্রম উর্দ্ধে কুঞ্চিত

কুন্তল গুচ্ছ। আরক্ত কপোলে চূর্ণ অলকাবলীর শোভা মদির ভরা উন্মাদনা নিয়ে বাদসা জাদাদের অন্তরে কুলশয়ের তাঁক্ষ বান বিঁধে দেয়, তারা গোলাপের ফোয়ারায়, পদ্মের শয্যায়, মর্ম্মরের ঘর্ম্মে শত শত রূপসীর সুধা শীতল মুখামৃতেও সে জ্বালা ভুলতে পারেন না। জিন্নার ঘোর নীল অম্বরেরার উপর ফিরোজা রঙের ওড়না, আর মতি বসান কিংকে গোলাপী রঙের পেশোয়াজের নিচে মখমলের জরিদার জুতা, তার ভিতর তার ছোট্ট মেহেদী পাতায় রাঙা চুণীর নূপুর পরা এক জোড়া রক্ত কোকনদের মত পা, নিঃশব্দে ধীর ও মন্থর গতিতে সাতমহল নবাব পুরীর অন্তঃপুরে অবিরাম বেগমের হুকুম পালনে তৎপর। তার সুললিত শুভ্র মণিবন্ধে রত্নবলয়; বাহুযুগে পান্নার বাজুবন্ধ, কণ্ঠের নিম্নে স্বর্গের সুষমা বিনিন্দিত ঝক্‌ঝকে বড় বড় চুণীর মালা ও পান্নার সাতনল। এই নবাব পুরীতে তার শুভাগমন মাত্র একমাস কিন্তু ইতি মধ্যে সে এত গুলি বহু মূল্য রত্নাভরণ বেগমের প্রিয় বাঁদীর নিদর্শন স্বরূপেই পাইয়াছে। তাহার কর্ম্ম দক্ষতা বেশ ভূষা রচনার নিপুণতা ও বেগমের মনোরঞ্জনে অসাধারণ পটুতাই এর কারণ। তথাপি এ সব সত্বেও জিন্না যে বাঁদী সেই বাঁদী! এই আঠারো উনিশ বছরের বেহস্তের পরীকে যার সমস্ত অন্তর বাহির জ্যোৎস্নার মাধুরী, পুষ্পের মনোজ্ঞতা, সঙ্গীতের মনোহারীত্ব ও নৃত্যের নয়নাভিরাম ছন্দ দিয়ে গঠিত হ'য়েছে, তাকে তার স্বামী যে কি ক'রে দশ সহস্র আশরফির লোভে অনায়াসে বিক্রী ক'রতে পারলে তা মানুষে বিশ্বাস ক'রতে পারতো না। দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে স্বামী কি তার জিন্নার মত আর একটিও কিনতে পারে কখন? তা যখন পারবে না তখন কি ক'রে ঐ সামান্য অর্থের মোহে এমন স্ত্রীর বিনিময় ক'রলে? জিন্নাকে যখন এ কথা জিজ্ঞাসা করা হ'ত, তখন তার সেই চুণীর মত রাঙা অধর বেয়ে একটুখানি হাসি ফুটে উঠ্‌তো, আয়ত চক্ষু দুটীর ঈষৎ বক্রতা আরো সুস্পষ্ট ক'রে ঘন কৃষ্ণ চক্ষু পল্লব আপনিই নত হ'য়ে যেতো। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত বিকশিত কলেবর ঈষৎ সঙ্কুচিত ক'রে ওড়নার অঞ্চল বা প্রকোষ্ঠের বলয় খুঁটতে খুঁটতে সে ব'লত—"আমার স্বামীর তো কোন দোষ নেই, আমি ইচ্ছে ক'রেই তাঁকে দিয়ে এ কাজ করিয়েছি।"

(২)

বেগমের সন্ধ্যাবিহার আজ গোলাপ বাগের নাচঘরে। হীরা মতির ঝলক হেনে অমন শত শত নর্ত্তকী কত ছন্দে কত তালে কত নব নব রাগিণীর রূপ, অঙ্গের ভঙ্গীমায়, নৃত্যের লীলায়, দেখিয়ে গেল। সে ঘরের গোলাপে পাঁপড়ী আঁকা স্বচ্ছ রত্নময় দেওয়ালে দেওয়ালে তাদের প্রতিচ্ছবি, কত রঙ্গিমায় ফুটে উঠ্‌লো। মুক্তার ঝোয়ারার উপর হীরার মযূর তাই দেখে কৃত্রিম নর্ত্তন সুরু করে দিলে, তার নিচে পান্নার সরোবরে প্রবাল দিয়ে গড়া পদ্মের হাজার দলগুলি আপনি খুলে গিয়ে সৌরভ মাদকতায় বেগমদের অন্তর উত্তেজিত ও নয়ন বিলোল কটাক্ষে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ছিল। সিরাজীর স্রোত, মধুময় হাসির তুফান, সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস, নৃত্যের উদ্দাম লহর তুলে মণি ঝরকতের খনি স্বরূপ সেই ঘরখানা যেন একটা নূতন স্বর্গ রচনা ক'রেছিল। কিন্তু এত আমোদ প্রমোদ সত্বেও ফুলেখা বিবির সহস্র মণিখচিত শ্বেত-পারাবত-চিত্রিত আসনে-মাস্ত, অতি সুন্দর সুললিত তনুখানি আনন্দে কম্পিত হ'য়ে উঠ্‌লো না। অবসাদ ভরা শ্রান্তস্বরে জিন্নাকে ডেকে ব'ল্লেন,—"তুই একবার নাচ্ জিন্না—এদের নাচ্ আমার আর ভাল লাগ্‌ছে না।"

নত জানু হ'য়ে বেগমের সম্মুখে তিনবার কুর্ণিশ ক'রে জিন্না নাচ্‌তে আরম্ভ ক'র্‌ল। তার নৃত্যের অভিনয়ে যে ভাবের অভিব্যক্তি ফুটে উঠ্‌লো তার অর্থ—"বসন্ত প্রভাতের স্নিগ্ধ উষালোকে কোরক পুষ্পদাম মলয় হিল্লোলে বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌লো;

তার শোভায়, গন্ধে মুগ্ধ অলিকুল গুণ্ গুণ্ গুঞ্জনে ফুটন্ত ফুলের চতুর্দ্দিকে ব্যাকুল হ'য়ে যেন তাহাদের তৃষিত প্রাণের নিবেদন জানালে, তাদের কাতর মিনতি ব্যর্থ হ'ল না। মধুপানে বিভোর মধুপ-দলের গুঞ্জনধ্বনি ক্রমশঃ বন্ধ হ'য়ে গেল। তার পরে সমস্ত মধু নিঃশেষে পান ক'রে; তারা অন্য ফুলের সন্ধানে চ'লে গেল। তখন ভোগ মলিন পুষ্পদল কোনো মতে পল্লবের অন্তরালে শাখার নির্জ্জনে আত্মপ্রকাশ ক'রছিল বটে কিন্তু তাদের সেই বিকচ যৌবন অম্লান শোভা, তখন আর নেই। আনত দলগুলি তখন সারাদিনের রৌদ্র তাপে মধুকরবৃন্দের আলিঙ্গন নিপীড়নে বিশুষ্কবিনত। তখন সন্ধ্যার মৃদুমন্দ মরুৎ হিল্লোলে তরুলির সকল কম্পিত; পুষ্প সৌরভে বনপথ আবেশ সমাকুল, দিকে দিকে নবস্নাত বিটপী লতার মধু-রজনীর আগমন-সূচিত পুলক-কম্পন। সেই সময় সেই প্রাণ-নিঃশেষ প্রাণ কুসুমদল ধীরে ধীরে তরুতলে ঝ'রে প'ড়্ল। ঝরাদলগুলি তাদের কি স্বর্গীয় সুখঘাতেই বিছিয়ে রইল ভূমিতে, স্বার্থ-হীন জীবনের শেষ নিশানা দিয়ে।

নাচ শেষ হ'য়ে গেল; শত শত প্রশংসা-সূচক শব্দের ভিতর দিয়ে ঠিক তেমনিই ধীরভাবে ঈষৎ হাস্য-মাখা মুখে জিন্না এসে আবার নতজানু হ'য়ে বেগমের সম্মুখে কুর্ণিশ করবার মাত্র, ফুলেখা বিবি সাদরে বাঁদীর গলায় নিজের গলার জড়োয়ার হার খুলে পরিয়ে দিলেন। সেই সময় বেগমের পশ্চাতে শ্বেত-মর্ম্মর-রচিত জালক্রী বাতায়নের ফাঁকে কার উত্তেজিত-বিস্ফুরিত-দৃষ্টি-পূর্ণ চক্ষুর ধীরে ধীরে অপসৃত হ'ল। জিন্নার হঠাৎ সেই দিকে নজর প'ড়ে যাওয়াতে সে বুঝতে পারলে ঐ গবাক্ষের অন্তরাল থেকে যাঁর চক্ষু এই মাত্র অন্তর্হিত হ'ল নিশ্চয়ই তিনি এতক্ষণ তার নাচ দেখেছেন। কিন্তু এই অন্তঃপুরের কড়া পাহারা এড়িয়ে ভীষণ-মূর্ত্তি খোজা প্রহরীদের ব্যাঘ্রের মত আগুন জ্বালা দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে, তিনি কি ক'রে এলেন এখানে? ভাব্তে জিন্নার মাথাটা কেমন ক'রে উঠ্লো।

প্রহরী এসে খবর দিলে শাহানশা বাদশা আস্ছেন। ফুলেখা বিবির হুকুমে নর্ত্তক বাঁদী, সঙ্গী ও নর্ত্তকীবৃন্দ যে যার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিশ্রামের জন্য চলে গেল। ফুলেখা তাড়াতাড়ি জিন্নাকে ডেকে ব'ল্লেন,—"তোর এখন ছুটি জিন্না, তুই চ'লে যা এখন। আবার কাল সকালে এসে তুই আমায় ঘুম ভাঙাবি। অন্য বাঁদীরা যেন আমার ঘুম ভাঙার আগে ঘরে না চ'কে।" সসম্ভ্রমে কুর্ণিশ ক'রে স্মিত-মুখে জিন্না গোলাপ বাগের উদ্যান পথ দিয়ে প্রাসাদের বাঁদী মহলে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রাসাদ সীমায় পা দেবার আগেই কে তার দু'খানি হাত নিজের হাতের মধ্যে ধ'রে ফেলে তার পথ অবরোধ করে দাঁড়াল।

(৩)

উদ্যানের যেখানটায় তারা দুজনে দাঁড়িয়েছিল সেখানে মর্ম্মরের সেতুর নীচে স্বল্প কটিক সরোবরের জল তাতে চাঁদের প্রতিবিম্ব ঝক্ ঝক্ ক'রছিল, আর তার উপর মুদিত-কমলজাল ও বিকশিত কুমুদ কহ্লার দক্ষিণা বাতাসের স্নিগ্ধ তাড়নে কেঁপে উঠে শাখাজালার তরুণ মনকে এমন এক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল, যেখানে সংসারের সমস্ত কোলাহল থেমে গেছে—যেখানে আছে শুধু উদ্দাম যৌবনের অফুরন্ত নেশা ও পিয়াসা।

ভয়-চকিত-স্বরে জিন্না ব'লে উঠ্লো,—"বাদশা-জাদা! আপনার প্রাণে কি ভয় নেই?" বাদশা-জাদার নব দেবদারু তুল্য দেহখানি তখন আরো চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, তাঁর শুভ্র ললাটের রত্ন কিরীট চন্দ্র কিরণে ঝক্মক্ ক'রে উঠ্ল। সুন্দর মুখে অনুরাগের রক্তরাগ খেলিয়ে জিন্নার হাতখানি আরো জোরে চে'প ধ'রে তিনি ব'ল্লেন—না জিন্না, ভয় কিসের? যদি সম্রাটের অসন্তোষে ম'রতে হয় মরবো।

তবু এ প্রলোভন ছাড়তে পারবো না—এ অধমকে শুধু তোমার দাসত্বের অধিকার টুকু দাও জিন্না!"

—"তা হয় না জাঁহাপনা! আমি বাঁদী আর আপনি যে ভারতের ভাবী অধিশ্বর—একথা ভুলে যান্ কেন জাঁহাপনা?"

—"ভারতের অধীশ্বরের পদ তো তুচ্ছ! তোমায় ছেড়ে স্বর্গও চাইনে জিন্না!"

—"তা হয় না শাহাজাদা!"

—"কেন হয় না?"

—"আমি বিবাহিতা!"

সম্রাট পুত্রের সুন্দী মুখে একটু তীব্র হাসি ফুটে উঠ্‌লো, তিনি ব'ল্লেন—"যে তোমায় দশ হাজার আশরফির বদলে অনায়াসে সম্রাটের দরবারে বিক্রী ক'রে গেছে, তাকে তুমি এখনো স্বামী ব'লে মানো?"

—"হ্যাঁ নবাবজাদা! মানি বই কি!"

—"আশ্চর্য্য জিন্না!"

"—কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয় জাঁহাপনা! যে আমায় বিক্রী ক'রে গিয়েছে সে আমার স্বামী নয় সে আমার বাল্য ও কৈশোরের সঙ্গী, যৌবনের প্রণয়ী এবং চির-জীবনের একমাত্র দেবতা! তবে শুনুন্ জাঁহাপনা,—যখন পারস্যের ভাবল উপত্যকায় নদীসৈকতের স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে, আনারের সুমিষ্ট গন্ধে বিভোর হ'য়ে, আমরা দুজনে পরস্পরের রূপ-গুণে মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে থাকতুম, তখন একদিনের জন্যও ভাবিনি যে ভারতের নবাবপুরীতে আমার এই যন্ত্র বিহঙ্গীর মত লীলা-চঞ্চল স্বাধীন-প্রাণের আজীবন নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা বিধাতা লিখে রেখে-ছেন। হঠাৎ আমাদের সুনীল মিলনাকাশে বিচ্ছে-দের কালো মেঘ ঘনিয়ে এলো, তুমুল ঝড়-ঝঞ্ঝার আয়োজনে জীবন-প্রকৃতি তখন উদ্যত! আমার দেবতা, আমার স্বর্গস্থ আমায় কাছে ডেকে সেদিন ব'ল্লেন—"জিন্না, ওমরাহ নজিরুদ্দিন আজ আমায় ডেকেছিলেন আমার গান শুনতে। গান শুনে তিনি সুখী হ'য়ে তাঁর বেগমের জন্যে তৈরী একছড়া জহরতের মালা আমায় দিলেন। আমি সেটী তোমার গলায় পরাব বলে আনন্দে বিভোর হ'য়ে আমার ক্ষুদ্র কুটিরে শুয়ে শুয়ে প্রভাতের প্রতীক্ষা ক'রছি, কিন্তু সেই রাত্রেই পেয়ারা এসে জানিয়ে দিলে—"ওমরাহ ভুল ক'রে ও মালা আপনাকে দিয়েছেন, ও অমূল্য সম্পদ তাঁর বেগমের জন্য প্রস্তুত হ'য়েছিল। বেগম জান্‌তে পেরে অভিমানে ধরা শয্যা নিয়েছেন। শীঘ্র সে মালা ফিরিয়ে দিন, তার বদলে আপনাকে অন্য পুরস্কার দেওয়া হবে।" জিন্না—জিন্না—আমি তা ফিরিয়ে দিতে পারিনি, তোমার এই দরিদ্র প্রণয়ী বড় আশার জহরতের মালাখানি বুকে চেপে রেখে দিয়েছিল, তোমায় পরিয়ে দিয়ে নিজেকে সার্থক মনে ক'রবে ব'লে। তাই পেয়ারাকে ব'লে দিলুম,—বলো গিয়ে সে অমূল্য মালা ছড়া আমি হারিয়ে ফেলেছি। হায় তখন ভাবিনি যে এইটুকু মিথ্যা বলার জন্য এত বড় শাস্তি ভোগের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। পাইক ফিরে গেল, আমি উন্মাদের মত হ'য়ে তোমারই অপরূপ মুখখানি ভাব্‌তে লাগ্‌লাম—কতক্ষণে আমি তোমার গলায় এ মালা পরিয়ে দেবো!

বেশীক্ষণ সে সুখাচন্তার অবসর পেলুম না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দশ বারো জন প্রহরী এসে উপ-স্থিত হল। সমস্ত ঘর দোর তল্লাস ক'রতে আরম্ভ ক'রল। বেশীক্ষণ খুঁজতে হ'ল না। আমার বুকের ভিতরের পকেট থেকে শীঘ্রই তারা সে মালা ছড়া পেয়ে গেল। মিথ্যা বলার অপরাধে আমার তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের বিচার হবে এমনি শুন্‌লাম। এখন যদি প্রহরীদের বশ ক'রতে পারি তাহলে এ যাত্রা এক রকম ক'রে কাটান যায়। এই কথা শুনে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর বুকের উপর প'ড়ে আমি ব'ল্লুম—"কি ক'রে কাটান যায় হুজুর্!" হুজুর্ ব'ল্লেন—"যদি দশ হাজার আশ-রফি যোগাড় ক'রতে পারি তাহ'লে প্রহরীদের

বশ করা কঠিন হবে না।" আমি কেঁদে ব'ল্লুম,—"আমাকে বিক্রী ক'রেও যদি তা ক'রতে হয় তবু তাই ভালো, কিন্তু তুমি ফেলে গেলে আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচবো না।" তখন আমারই অনুরোধে আমাকেই বাঁচাবার জন্যে তিনি আমায় বিক্রী ক'রে গেলেন। আমাকে বিক্রী ক'রতে তাঁর যে কি কষ্ট হ'য়েছিল তা' আপনি বুঝবেন না জাঁহাপনা। নিজের কলিজা ছিঁড়ে দিতেও বুঝি মানুষের এত কষ্ট হয় না। তারপরে তিনি বিদায় নেবার সময় ব'ল্লেন,—এ নবাব পুরীতো আগুনের সমান। এর মধ্যে বাস করে তুমি কি আমার সেই জিন্নাই থাকবে জিন্না? তুমি আর আমার থাকবে না—এটা কেমন করে সহ্য করি। আমি নিজের দুঃখ বাঁচাতে গিয়ে আজ তোমাকে হারালুম। এর চেয়ে ফেলে যাওয়া যে শতগুণে ভালো ছিল জিন্না!"

"না দুলাক এটা তোমার ভুল! আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়েও যে প্রাণ বাঁচাতে পারে তারই পুণ্য আছে বলতে হবে, যদি আগুনে পুড়েই মরি তবে প্রেমের অবিনশ্বরতা থাকে না যে! নবাবপুরী আগুন বটে কিন্তু এর মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়েও আমার প্রেম, আমার সতীত্ব ঠিকই বজায় থাকবে—দুলাক তুমি ভয় পেয়োনা।" তারপরে তিনি ব'ল্লেন—"তাহলে ৬ মাসের মধ্যে আবার আমি তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবো জিন্না! আর হিন্দুস্থানেরই কোনো এক নিভৃত পল্লীতে আমাদের সংসার পাতবো। তুমি ৬ মাস শুধু অপেক্ষা করো।"

শাহাজাদা! ছ'মাস তো কেটে গেল, এখন বাকী চার মাস, এর পরেই আমার দুলাক এসে আমায় নিয়ে যাবেন।"

শাহজাদার মুখে ব্যঙ্গের তীব্র হাসি আবার ফুটে উঠ্‌লো। তিনি হেসে বল্লেন, "তুমি কি ভাবছ তোমার উপর তোমার প্রণয়ীর আর তোমো... অধিকার আছে? সে কি নিতে এলেই তোমায় নিয়ে যেতে পারবে? এক বার যাকে সে ক্রীতদাসী রূপে বিক্রী ক'রে গেছে তার উপর আর কোনো অধিকারই, তার থাকতে পারে না।"

সজল-চক্ষে জিন্না ব'ল্লে,—"আর আপনাদের যদি আমার উপর বিন্দুমাত্র স্নেহ থাকে, তাহলে অনধিকার সত্ত্বেও আমার সুখের জন্যে, আপনারা আমাকে ইচ্ছে করেই আমার ভাবী স্বামীর হাতে আমায় স'পে দেবেন না কি?"

নবাবজাদার স্বর্ণ-খচিত খোলার উপর উজ্জ্বল চন্দ্রালোক প'ড়ে তা' ঝল্ ঝল্ ক'রে উঠ্‌লো। তাঁর তরুণ সুন্দর ভোগপুষ্ট মুখের উপর নিপতিত চূর্ণ-কুন্তলের তীব্র-সুগন্ধ সুরভি-যুক্ত বাতাসের সহিত মিশিয়া জিন্নার মনকে ক্ষণিকের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে ফেল্ল। সে জোরে সম্রাটপুত্রের হাত ছেড়ে দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো,—"আপনার অম্লান রূপ, উদ্দাম যৌবন, অতুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে আপনি থাকুন জাঁহাপনা, কিন্তু আমার দারিদ্র ভিখারী প্রণয়ীকে আমার মন থেকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা ক'রবেন না আর!"

(৪)

৬ মাস ত কেটে গেল, বৎসরও প্রায় ঘুরে এলো কিন্তু জিন্নার চির প্রত্যাশিত নাহেরুকপটী এখনও উপস্থিত হ'ল না। দুলাক তার কথা মত জিন্নাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলো না। কেন এলো না? সবেমাত্র আঁধার কাটা উষার বক্ষ চিরে যখন গগনের পূর্ব্বকোণে তরুণ রবির রক্তাভা মুদিত-কমল-দলের ঘুম ভাঙায়, তখন থেকে আর যখন কামিনী ফুলে ভরা মাধবী যামিনীর দ্বিগ্ধ-জ্যোৎস্নার কারুকার্য্য-খোদিত শিলাতলে স্বর্ণ চাঁপার তীব্র গন্ধে বেগমরা নিশীথ বিহারের প্রসাধন শেষ করেন, যখন দর্পণময় মাণিকাগারের মধ্যাপ্লুত স্বচ্ছ সরসীর গভীর জল শ্বেতপ্রস্তরের সোপানে সোপানে উচ্ছসিত হ'য়ে রূপসীদের অলক্তময় পদ-চিহ্ন নিজের বুকে এঁকে নেয়।

যখন স্বর্ণ-মণ্ডিত যূথিকা ও করবী পুষ্পের কুন্তির কেশর আতরের পিচ্‌কারী ছড়িয়ে সুন্দরীদের সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, তখন পর্য্যন্ত নির্জ্জন লতাকুঞ্জে চামেলির কোমল শাখা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে জিন্না ভাবে—কেন সে এলো না? ওরে ফুল! তোরা বলে দে আমায় -আমার দুলাক্‌—আমার প্রাণের দুলাক্‌—কেন এল না?

আকাশ ভরা তারার দিকে চেয়ে চেয়ে জিন্না তাদের প্রশ্ন করে কেন সে এলোনা? তবে কি—তবে কি সে নেই? জিন্না আর ভাবতে পারে না—তখন নন্দন-নিকেতন-তুল্য নবাবপুরী তার কাছে যেন একটা ভীষণ দৈত্যের বিকট চেহারার মত বোধ হোল। ফুলের গন্ধ, চাঁদের আলো, মলয়ের বাতাস, যেন নরকের যন্ত্রণায় তার সারা অন্তর ভরিয়ে তোলে, হীরা-মণি-মরকতে ছড়ান প্রাসাদ-তলের রত্নময় সুরম্য শোভা বিলাস সম্পদের চরম উপভোগ সকল তার কাছে যেন কুলিশাঘাতের মতই দারুণ বেদনাদায়ক হ'য়ে ওঠে। তখন সে জোর ক'রে মনকে প্রবোধ দিয়ে বলে—না সে বেঁচে আছেই আছে। এদিকে বাদশা আমার হুকুম তামিল না ক'রেই বা উপায় কি? যদি দুলাক্‌ আর তাকে নিতে নাই আসে, হয়তো সে অন্য কোন সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে ক'রে সুখেই আছে। তা যদি হয় তা'হলে জিন্নাই বা কেন চিরজীবন বাঁদী বৃত্তি নিয়ে সকলের হেয় হয়ে এতবড় সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়?

সেদিন ভোরে ঘুম ভেঙেই জিন্না হাঁটু গেড়ে ব'সে নমাজ ক'রে যেমনি উঠে দাঁড়িয়েছে, দেখে নবাবজাদার একাগ্রদৃষ্টি তারই উপর নিবদ্ধ। তার নমাজ শেষ হয়েছে দেখে নবাবজাদা ব'ল্লেন—"জিন্না আর কত দিন অপেক্ষা ক'রতে বল আমায়? এ কষ্ট যে আর সহ্য হয় না দেবী!"

একটু হেসে জিন্না ব'লে, "আজ আমার কাছে যেমন ক'রে প্রেম ভিক্ষা চাইছেন, তেমনি ক'রে আপনার আরো দশটি বেগমের কাছে তাদের স্বামী করবার আগে এমনি ভিক্ষা চাইতে ছিলেন জাঁহাপনা, তাই আপনার এ কথায় আমার একটুও সমবেদনা নেই, এটা ঠিক্ জান্‌বেন।"

বিষণ্ণমুখে জাঁহাপনা ব'ল্লেন,—"তবে কি আমাকে স্বামী ব'লে গ্রহণ ক'রবে না জিন্না?"

জিন্নার চোখ দিয়ে অকারণ অশ্রু ঝ'রে পড়ল। সে তখন ভাব্‌ছিল কোথায় দুলাকের আন্তরিক স্বর্গীয় প্রেমের একাধিপত্য, আর কোথায় নবাব জাদার যৌবনের তৃষ্ণা মিটাইবার দশ মাত্র—দশ জন বেগমের মধ্যে একজন হওয়া! স্বর্গের সুধা আর মর্ত্তের কদাহল! এ দুয়ের যেমন বিভিন্নতা, দুলাক্‌ আর বাদ্‌শাজাদার মধ্যে তার চেয়েও বেশী পার্থক্য আছে যে! কিন্তু নিজেকে একটা আশ্রয়ে বেঁধে রাখবার জন্যে, গভীরতম পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে, চিরজীবনের অন্ন বস্ত্রের অভাব সম্মানের মধ্যে থেকে ঘোচাবার জন্যে, সে আর নবাবজাদাকে প্রত্যাখান ক'রতে সাহস পেলে না। জিন্নার পা দু'খানি জড়িয়ে ধ'রে নবাবজাদা ব'লে উঠ্‌লেন,—জিন্না আর আমায় ফিরিয়ে দিও না।"

গম্ভীরমুখে তাঁর হাত ধ'রে পায়ের উপর থেকে তুলে জিন্না ব'লে, "না ফিরিয়ে আর দেবো না—জাঁহাপনা! কিন্তু আমার একটা কথা আছে, তাতে যদি আপনি রাজী হন্, তবেই আমি আপনার বেগম হ'তে পারি।"

—কি কথা জিন্না ব'লে ফেলো?

—"খোদাকে সাক্ষী রেখে আমি কোন মিথ্যা আচরণ ক'রব না জাঁহাপনা। তাই ব'লে রাখ্‌ছি আমার অন্তরের অন্তরে দুলাক্‌ই আমার স্বামী রইল—লোক চক্ষে আপনিই আমার স্বামী হ'লেন।

—"তাই জিন্না—তাই হবে, এতে আমার অরাজীর কি আছে?"

এতদিনের আকাঙ্খার ধন পাওয়ার আনন্দে

ক্ষুধিত তৃষিত পশুর মত লালসাময় প্রপোত্রার সম্রাট পুত্র বিপ্রাকে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে বিদ্রোহে নিজের সর্ব্বাপহন্তা ওষ্ঠে রাখলেন। তাঁর সুদৃঢ় বাহু কম্পনের কঠিন নিষ্পেষণে, ভিপ্রার মনে হ'ল তার সমস্ত নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে মাথাটা ঘুরে পৃথিবী অন্ধকার হ'য়ে আসছে।'

উত্তেজনার প্রথম মুহূর্ত্ত কেটে গেলে বাদশাজাদা দেখলেন—বসন্ত-নিশান্তের শিথিল-বৃন্ত পুষ্পমঞ্জরীর মত—তাঁর বুকের উপর বিপ্রার কুসুম সুকুমার তনুখানি এলিয়ে প'ড়েছে—সে মূর্চ্ছিতা!

(৫)

শাহান্‌শা বাদশার পরলোক গমনে সাম্রাজ্যময় কিছুদিনের জন্য ঐ সমস্ত উৎসব লীলা থেমে গিয়েছিল। যুবরাজের অভিষেক আনন্দে আবার তা মেঘছেঁড়া সূর্য্যালোকের মত হেসে উঠেছে। সেই উৎসব সজ্জার মাঝখানে, শুষ্ক মুখ, শীর্ণ দেহ এক মুসলমান ভিক্ষুক এসে দাঁড়াল। দিকে দিকে হাওয়ায় দোলা জয়কেতনের বিচিত্রতা, কুসুম ছড়ান রাজপথ গন্ধে ও শোভায় মনোরম! এই পথ দিয়েই নূতন সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী নগর পরিদর্শনে যো'বেন? ধূলি মলিন শ্রীহীন পদতল পথের উপর ফেলতে ভিক্ষুকের সঙ্কোচ ও শঙ্কার সীমা ছিল না—পথের শোভা যেমন পুষ্পদল যদি পায়ের চাপে হীন-শ্রী হয়? কৃত্রিম উৎসের সুগন্ধ বারি নাগরিকদের পথ চলার শ্রান্তি জুড়িয়ে দিয়ে অভিষেকের আনন্দ বার্ত্তা মনে আসিয়ে দিচ্ছিল। বিষাদময় মুখ দরিদ্র ভিখারীর ছিন্ন বস্ত্রে, সুবাসিত গোলাপ জলের বিলাস স্নান এমন একটা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি ক'রলে, যা দেখে রাজপথের সুন্দর সুসজ্জিত পথিকরা অবাক্ হ'য়ে তার দিকে চেয়ে রইল। যে নগর আজ দারিদ্র্য, দুঃখ, শোক, বিষাদ শূন্য, যে নগরের প্রত্যেক লোক আজ নূতন সম্রাটের প্রাসাদে বহু মূল্য ভূষণে ভূষিত, পূর্ণাভিলাষ ও আনন্দিত, সেখানে কখন ক'রে কোথা থেকে মলমল-ক্লিষ্ট শীর্ণ-দেহ অর্দ্ধেক নগ্ন প্রায় এই ভিক্ষুক এসেছে? সবাই অবাক্ হ'য়ে তার দিকে চেয়ে ভাব্‌লে, নিশ্চয়ই এ অন্য দেশের মানুষ, এ দেশে নূতন এসেছে।

ভিক্ষুক আর বেশীক্ষণ চ'লতে পারলে না, পথের ধারে একটা দোকানের পাশে ব'সে প'ড়ল। দোকানদার দয়া ক'রে তাকে কিছু খেতে দিল। দু'দিন বাদে আহার পেয়ে ভিক্ষুকের চোখ ঘুমে ঢুলে এল। হঠাৎ নহবতের মিঠা আওয়াজ কাণে গিয়ে তাহার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার পরেই নাগরীকদের জয়োল্লাস ও মঙ্গলবাদ্য-নিনাদে, বিস্ময়ে উঠে বসে ভিখারী দেখলে, বাদশা বেগমের নীলার মুকুর পদ্মী হীরার পেখম তুলে শোভা যাত্রার মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে—এমন অপূর্ব্ব শোভা জীবনে আর কখনও দেখেনি—বাদশার নবীন মুখে রত্ন কিরীটের ছটা ঠিক্‌রে প'ড়ছে। চামর বাজনে চূর্ণ কুন্তল তাঁর মহত্বময় প্রশস্ত ললাটে বিকীর্ণ, তাঁর তরুণ সুন্দর দেহাবয়ব চুণী বসান শুভ্র রেশমের সজ্জায় মোড়া। এক হাত তাঁর মখমলের ঠেসানে ন্যস্ত, অপর হাত বেগমের রত্নভূষিত করতলে আবদ্ধ।

আর বেগম? বেগমের অবর্ণনীয় রূপমাধুর্য্যে সারাপথ উজ্জ্বল, আর তার উপর অপরূপ সজ্জায়, অমূল্য মণি মাণিক্যে তাঁর সৌন্দর্য্য অসাধারণ পরিমাণে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল—স্বর্গের অপ্সরী, ইন্দ্রের শচী—কি এর চেয়ে সুন্দর? জনাকীর্ণ পথের অসংখ্য চাহনি বেগমের রূপসুধা পানে উন্মত্ত হ'য়ে উঠ্‌লো—একবাক্যে সকলেই ব'লে উঠলো—"নইলে কি বাদ্‌শাজাদার মনে ধ'রে? হুঁহু বাঁদী...এ বাঁদী সম্রাজ্ঞী হবারই উপযুক্ত বটে।" ভিক্ষুক অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌ছিল—এত রূপ সে কখনো দেখেনি বটে—কিন্তু পারস্যের নিভৃত উপত্যকায়, শান্ত গ্রামের ঘিঞ্চ নীড়ে, এমনি একখানি অসামান্য সুন্দর মুখের একমাত্র অধিকারী সেও কি একদিন ছিল না? যদিও তার গায়ে

মণিমুক্তার ঝলক খেলে যেতো না, জরীর পেশোয়াজ কিংখাপের আংরাখার বদলে সামান্য বস্ত্রের পেশোয়াজ ও ওড়না তার অতি সুন্দর দেহখানি ঘিরে থাকতো। আজ যে বেণী মুক্তামালায় গ্রথিত, সেদিন ঐ বেণী ফুলের মালায় জড়িত হ'য়ে পিঠের উপর দুলতো কলীকে লজ্জা দিয়ে—সেই বেশে তাকে কি এর চেয়ে কম সুন্দর দেখাতো? না—না—কখনই না—বেগমের যেখানে হীরার সিঁথির চুনীর ঝুকঝুকি জ্বল্ জ্বল্ ক'রছে, ঠিক্ ঐখানে ভিক্ষুক নিজে হাতে, তাকে কতদিন বেল ফুলের সিঁথি গেঁথে, ভালিম ফুলের ঝুকঝুকি দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে—এমনি সুন্দর, এমনি মনোরম এমনি নয়নাভিরাম ছিলনি ভিক্ষুকেরও ছিল একদিন—হায় কোথায় সে আজ? নিশ্চয়ই মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রাম পেয়েছে!

ভাবতে ভাবতে ভিখারীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো—চক্ষের সম্মুখের দৃশ্য সব ঝাপসা হ'য়ে এলো—ঠিক্ সেই সময় বাদশা-বেগমের ময়ূর পঙ্খী ভিক্ষুকের চক্ষের সাম্নে—একেবারে কাছে! একি! একি! এ যে তারই জিন্না! ঐ যে জিন্নার ঠোঁটে কেঁপে অনুচ্চস্বরে "দুলাফ্, দুলাফ!" শব্দ বেরিয়ে এলো, ভিক্ষুকের মাথা ঘুরে গেল, আর সে কিছুই দেখতে পেলে না।

(৬)

বাদশার স্নেহ-পীড়ন-কারী হাতখানা রূঢ়ভাবে ঠেলে দিয়ে মখ্‌মলের গদির উপর বুক দিয়ে ঝুঁকতেই বেগমের হীরার মুকুট সূর্য্য কিরণে সহস্রদ্যুতি ঠিক্‌রে মাটীতে প'ড়ে গেল। সেদিকে কিন্তু বেগমের কোনো লক্ষ্যই ছিল না—ভিক্ষুকের দিকে হাতবাড়িয়ে তেমনিই ঝুঁকে প'ড়ে বেগম ব'লে উঠ্‌লো—"দুলাফ্—দুলাফ—দুলাফ্ আমার!" অপমানাহত বাদশা অনুচ্চস্বরে জিন্নাকে লোক ডাকতে বারণ ক'রলেন। জিন্না সে কথা কর্ণেও নিলে না। তখন ক্রোধান্ধ বাদশা নিষ্ঠুর আঘাতে ময়ূর পঙ্খী থেকে জিন্নাকে ঠেলে ফেলে দিলেন! সে সাম্রাজ্ঞী হবার, তাঁর পাশে বসবার যোগ্য নয়—তাঁকে ফেলে যে ভিখারীর মত কদর্য্যতাকেই বরণ ক'রেছে—সে কিছুতেই ভারতের ময়ূর সিংহাসনের অধীশ্বর সম্রাটের অর্দ্ধাঙ্গিনী হ'তে পারে না। সমস্ত জনসঙ্ঘ বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

ভিখারীর অচৈতন্য দেহ কোলে নিয়ে জিন্না কাতর-স্বরে ডাক্‌লে, "দুলাফ্—দুলাফ্—চোখ চাও ভাই!"

একটু পরে দুলাফের হৃত-চেতন সংজ্ঞা আবার ফিরে এলো, সে ব'ল্লে, "জিন্না! একি—সত্যি, না—স্বপ্ন?"

"দুলাফ্! এত দেরী ক'রে এলে কেন?"

—"কি ক'রব জিন্না, আমি যে দরিদ্র, তাকার জোগাড় ক'রতে পারিনি, তা ব'লে তুমি—তুমি কি ক'রে অন্যের হ'লে জিন্না?"

"কি ক'রব দুলাফ, আমি যে নিরুপায়, বাঁদীর শক্তি কি শাহান্‌শা বাদ্‌শার ইচ্ছাকে রোধ ক'রতে পারে তখন? বুক ভেঙ্গে গেছে দুলাফ—অন্যকে—!"

জিন্না আর ব'লতে পারলে না। দুলাফ তখন ব'ল্লে, "তা যখন হ'য়ে গেছে তখন আবার কেন এ গরীবের কাছে ফিরে এলে জিন্না? এই মলিনতা তোমাতেই সাজে—কি সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে! ময়ূর সিংহাসন ছেড়ে ভারতের সাম্রাজ্ঞী ভিক্ষুকের পাশে ধূলায় ব'সে কেন? এত তোমায় সাজে না জিন্না?"

—"আর কষ্ট দিওনা দুলাফ! আর অভিমান ক'রনা তুমি! তুচ্ছ এই সম্রাজ্ঞীর পদ, তুচ্ছ এই অলঙ্কার! তোমার মত মলিন বেশে আমায় সাজিয়ে দিয়ে আমায় ভিখারিণী ক'রে নাও দুলাফ!"

—"না জিন্না, তুমি সুখী হও এই আমি চাই—তুমি বাদ্‌শাকে ছেড়ে"—জিন্না আর ব'লতে দিলে

না—ললাটের ঘর্ম হাত দিয়ে চেপে ধরে ব'লে উঠ্‌লো—"দেহটাই কি সব চলাফেরা—প্রাণটা কি কিছুই নয়? একবার প্রাণের ভিতরটা দে'খে তার পরেও যদি তুমি ক্ষমা ক'রতে না পারো, তখন এ প্রাণ আর রাখ্‌বোনা না হয়!"

"আমার অভিমান ক্ষমা করো আর তোমায় কষ্ট দেবোনা এবার বুঝেছি—

"তুম্ সে হাম্ সে দিল্ মিলা হায় দুনিয়া মে
কোন্ হাম্,
তুম্ হামারি হাম্ তুঁহারি তুলুক্ চীজ্ন কিসাম্"

অনশন-ক্লিষ্ট ক্ষীণ ভিখারীর কণ্ঠ প্রিয় সম্মিলনের আনন্দে আবার মধুর ধ্বনিত উচ্চ সুরে গান ধরিল—

"আস্‌মান্ যাহাসে রাখ্‌তে হৈ হিজাবে চাঁদকো
অরোধ।
যাইসে শোভত হুকত কো দিল্‌মে খোদা আল্লা নাম
এ সে দিল্‌মে তুম্ বিরহগা পিয়ারী মেরা জান্"

* * * * * *

বাদ্‌শার অমোঘ আজ্ঞা প্রচার হ'য়ে গেছে—ভিক্ষুক ও জিন্নার ফাঁসীর হুকুম সাব্যস্ত! ভিক্ষুকের হাত ধ'রে জিন্না গিয়ে দরবারে দাঁড়াল—তাকে দেখে সম্রাট অন্তরে অন্তরে বিচলিত হ'য়ে উঠেছিলেন। যে জিন্না একদিন তাঁরই বক্ষে শোভা পেত, সেই অত ভালবাসার অত আদরের জিনিষ কেমন ক'রে চিরদিনের মত তিনি বিদায় ক'রবেন? ফাঁসীর হুকুম কি রদ করা যায় না?

বাদ্‌শার চক্ষু সজল হ'য়ে উঠ্‌লো—ক্রোধ-কঠোর মুখশ্রী মুহূর্তের মধ্যে হ'য়ে উঠ্‌লো কত কোমল-ভাব! বিস্তৃত দরবার কক্ষের সংস্থ ভাবগণ থেকে আর দেহরক্ষী সৈন্য সভাসদ্ প্রহরী পরিষদরা পর্যন্ত সম্রাটের এই মনোভাবের প্রভেদটুকু লক্ষ্য ক'রলে।

শান্তভাবে সম্রাটের দিকে চেয়ে জিন্না ব'লে,—"শাহান্‌শা সম্রাটের শ্রীচরণে নিবেদন, ফাঁসীর আগে যে- আমাদের মাপা এদের জন্য এক দণ্ড সময় দেওয়া হয়—তার তারপরে এক সঙ্গেই যেন দু'জনে ম'রতে পারি; এই আদেশটুকু দয়া করে দিতে হবে জাঁহাপনা!

শাহান্‌শার কণ্ঠস্বর তখন এত ক্ষীণ যে অতিকষ্টে সকলে বুঝিল ইহাতে সম্রাটের অনুমোদন আছে। সসম্ভ্রমে কুর্নিশ ক'রে জিন্না ব'লে, "আপনার এতটা দয়ার জন্যে চিরকৃতজ্ঞ রইলুম; আপনি যে আমাকে ভালবেসেছিলেন তা যথার্থ—নইলে এতটা দয়া ক'রতে পারতেন না। কারণ আমাকে দুজনের সঙ্গে ম'রতে দেওয়াতে যে সুখ, তাতেও আপনার হিংসা হ'ত! মৃত্যুতে আজ কষ্ট নেই জাঁহাপনা। এক সঙ্গে মরা—স্বর্গ সুখও তার কাছে তুচ্ছ!

(৩৩৮ ও ৩৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

গা নয়,—এই গাঁ...

(বাসন্তীর সৌজন্যে)

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য-প্রতিভা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(কালিদাস মিত্র, এম-এ)

"মুকুলমুঞ্জরা"তেও প্রেমের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। পাতারানাধিপতি বীরসেনের প্রথমা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র মুকুল বিরলবুদ্ধি সংসারানভিজ্ঞ অজ্ঞান যুবক। যোধ-শক্তি তাহার সুপ্তাবস্থায় ছিল। লোকে তাহাকে 'পাগল' বলিয়াই জানিত। কোরোলির রাজকন্যা মুঞ্জরার সহিত প্রথম সন্দর্শনে হৃদয়ে তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল--ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে সতীশিরোমণি অহল্যার

পাষাণও যেরূপ গলিয়া গিয়াছিল, মুকুলের প্রথম চাহনিতেও সেইরূপ মুকুলের আবাল্য জড়তার তিরোধান হইয়া গেল। তাঁহার সে অবস্থার বর্ণন গিরিশচন্দ্র অচ্যুতানন্দ স্বামীজীর মুখে এইরূপে বলাইয়াছেন :—

'প্রেমে বিকশিত হত কুঞ্চিত হৃদয়
সুবাস বিস্তার করে যথা কুসুমী মোদিনী,
শুভক্ষণে দরশন রাজপুত্রী সনে।
বিদ্ধিল যুগল-হৃদি হানি পঞ্চশর,
কোমল বন্ধনে রতি বাঁধিল অন্তর।
প্রেমশশী উদিল তিমির হ'ল নাশ,
সৌরভে গৌরবে হৃদি হইল বিকাশ।'

এই কুঞ্চিত-হৃদয়ের বিকাশ কবিবর কলাকুশলীর ন্যায় যেরূপ ভাবে দেখাইয়াছেন, মনস্তত্ত্বের যেরূপ সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়। বনবাসী মুকুল অলক্ষ্যে থাকিয়া মুরলার মুখে 'বেশ ফুল ফুটে রয়েছে' শুনিয়া অনেকগুলি ফুল তুলিয়া লইয়া মুরলার নিকট অর্ঘ্য লইয়া আসিল। সমাজের রীতিনীতি না জানিয়া, আদব-কায়দার কিছুমাত্র ধার না ধারিয়া, একেবারে যুবতীর সম্মুখে আসিয়া কোনরূপ বাগাড়ম্বর না করিয়া সহজ সরল ভাবে, 'তুমি ফুল চাচ্ছিলে, এই নাও' বলিয়া দাঁড়াইল। মুরলার সখী চামেলী অপরিচিত যুবককে দেখিয়া বিস্মিতভাবে বলিল :—'তুমি কে? আমরা ত ফুল চাই নি?'

মু। চাও নি; তুমি ব'লছিলে বেশ ফুল ফুটে রয়েছে। তাই ফুল তুলে এনেছি, আমি তখন সেই লতার বনে বসে ছিলেম।

মুরলা। সে তো চামেলী, বলছিলেম বটে।

জগতে এমন কোন দেবতা আছেন যে প্রাণের ঐকান্তিক পূজা—ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ না করেন? প্রাণের এই দান স্বহস্তে উপাস্য দেবতা গ্রহণ না করিলে সাধকের মনে শান্তি আসে না। তাই মুকুল বলিল :—

'তুমি নেবে না, তুমি প'র্‌বে বলে এনেছি।'

মুরলা। আমি নেব, তুমি কে?

দেবী স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন, কিন্তু উপাসকের পরিচয় চাহিলেন। আশু-ভোলা মুকুল সে কথার উত্তর দিতে ভুলিয়া গিয়া মনের আনন্দে বলিয়া উঠিলেন,—'আচ্ছা পর এখন'; তার-পর চামেলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'পর্‌লে তুমি দেখ্‌বে ফুলগুলি কেমন দেখাবে এখন, বেশ দেখাবে —বেশ দেখাবে, হি হি হি হি!' দেবীর অঙ্গস্পর্শ লাভ করিলে ফুলের সৌন্দর্য্য যে কত বাড়িয়া যায় তাহা ভাবুক ও প্রেমিকদিগকে কি আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে! মুরলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াও যখন কোনরূপ সদুত্তর পাইলেন না, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কিছু বাল্যকালের কথা মনে হয় না?'

মু। না,—আমার সব ছায়া ছায়া মনে হয়, আমার যেন রাত হয়েছিল, তোমায় দেখে দেখে যেন দিন হয়েছে, আমি আর ফুল তুলে আন্‌ব?

মুরলা। না না,—এই যে ঢের ফুল তুলে এনেছ।

মু। আর ফুল তুলে আন্‌ব না?

দেবী স্বহস্তে যখন পূজা গ্রহণ করিলেন, তখন উপাসকের প্রাণের কামনা হইল, আবার তাহাই দিয়া দেবীকে সাজাই। তখন তিনি বারণ করিলেন—বলিলেন,—'না, অনেক ফুল এনেছ; তুমি হাস্‌ছ কেন?'

এ 'কেন'র ঠিক উত্তর দেওয়া যায় না।

মুকুল। আমি জানিনে, আমার বুকের ভিতর কেমন কর্‌ছে তাই হাস্‌ছি, কি কর্‌ছে বল্‌তে পারলেম না; আমার এক একবার মনের ভিতর কেমন কর্‌ছে, কেন বল্‌তে পারলেম না; আমার বড্ড ইচ্ছে তোমাকে বল্‌তে পারি, তুমি আমাকে

বল্‌তে শেখাবে? ঐ দেখ আবার হাসি আস্‌ছে, কিন্তু হাস্‌ব না, আমি হাস্‌লে তুমি ভালবাস না, আমার কেমন হ'য়ে যায়! আমি কতবার মনে ক'রেছি—হাস্‌ব না; আমার কত কি মনে হ'চ্ছে, ছুটে ছুটে পলাচ্ছে, আমি কিছুই বল্‌তে পাচ্ছিনে; তোমার মনে কিছু দুঃখ হ'চ্ছে? – হুঁ হচ্ছে।'

চামেলী এখন বুঝিল, এ যুবক 'পাগল' নয়—ইহার অনুভূতি আছে। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি সুখ দুঃখ বুঝ্‌তে পার?'

মু। না ওটা বুঝ্‌তে পারি, বল্‌তেও পারি কেমন, আমি এই চলে যাব, এঁকে দেখ্‌তে পাবনা, আমার মনটা একরকম হবে, তার নাম দুঃখ।

সুতরাং চামেলী যুবকের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে কি না বুঝিবার জন্য—প্রকৃত প্রেমের পাগল কি না জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আর রাজকুমারীকে দেখ্‌লে যা হয় তার নাম সুখ।'

আপন ভাবে ভোলা মুকুল এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল,—'না না, খালি মনে হ'চ্ছে আমি চলে যাব, আর দেখ্‌তে পাব না, এ দুঃখ একটু ভাল দুঃখ, আমি কি কব্‌বো জান? রাজকুমারীর পায় দাগগুলি দেখ্‌বো। এমন realistic বাস্তব চিত্র প্রকৃত পক্ষেই উপভোগ করিবার। প্রেমিকের হৃদয়ের কথা প্রেমিকা চলিয়া গেলে তার চিত্র মনের মাঝে ত বিরাজ করিবেই করিবে, কিন্তু অদর্শন-জনিত দুঃখকে সে কি করিয়া ভুলিবে। দর্শন ভিন্ন ত সে জ্বালার উপশম হইতে পারে না। তাই মুকুল সে জ্বালা ভুলিবে মৃত্তিকার উপর রাজকুমারীর পায়ের দাগের যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা দেখিয়া। বুদ্ধিমতী মুক্তরা এই এক কথায় বুঝিয়া লইলেন, যুবকের প্রেমের গভীরতা কতদূর—যুবক তাহাকেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে—এ যুবক প্রেমের পাগল। তাই কথাটা চাপা দিবার জন্য বিষয়ান্তরের অবতারণা করিয়া মুক্তরা বলিলেন,—'দেখ কেমন ফুল ফুটে রয়েছে দেখ?'

মু। আর তো ফুল দেখ্‌ব না; আমি মনে ক'র্‌তেম, গাছে ফুল বেশ দেখায় তাই তুলতেম না; কিন্তু তুমি যে ফুলটি পরে আছ, তা দেখে আমার মনে হ'লো, গাছে ফুল ভাল দেখায় না।'

সৌন্দর্য্য-পিপাসু মুকুলের নয়ন গাছের ফুল দেখিয়া আর তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না,—সে ফুলকে মুক্তরার অঙ্গে শোভিত দেখিয়া, যে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াছে—যে সৌন্দর্য্য দেখিয়া সে মত্ত হইয়াছে,—সে সৌন্দর্য্য আর সে গাছের ফুলে দেখিতে পায় না। এই সৌন্দর্য্যই সে দেখিয়া দেখিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিল, সৌন্দর্য্যের ধ্যানে তন্ময় হইয়া গেল—বিশ্বসংসার ভুলিয়া গেল। দুই সখীর ভিতর যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তাহার রস-গ্রহণ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া মুক্তরা জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি ভাব্‌ছ?'

মু। তুমি কি বল্‌লে আমি কিছু বুঝতে পার্‌লেম না; কেন বুঝতে পার্‌লেম্ না; কেন বুঝতে পার্‌লেম না, আমি কিছু বুঝ্‌তে পারব না? আমার তোমাদের সব কথা বুঝতে ইচ্ছা হয়।

মুক্তরা। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে! তা হ'লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

মু। না না, দিদি বলে দিয়েছে বাবার (স্বামী অচ্যুতানন্দের) কাছে থাক্‌তে; আমি তার কথা না শুন্‌লে সে কাঁদ্‌বে। ঐ একটা বুঝতে পেরেছি, —ভালবাসি, বুঝ্‌তে পেরেছি, দিদি, আমায় বলে ভালবাসি, সে কি বল্‌ব? এই তোমায় ভালবাসি। সামান্য উপলখণ্ড কি নদীর স্রোতকে বাধা দিতে পারে—সে সকল বাধা-বিঘ্নকে আপনার সলীল ভঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া যায়। মুকুলের মনের ভিতর যে প্রেম ফুটিয়া উঠিয়া ছিল, তাহার শত চেষ্টায় সে তাহার স্বর্গলে আবদ্ধ রাখিতে পারিল না। বুক

কাটিল, মুকুও ফুটিয়া বাহির হইল—'তোমায় ভালবাসি।'

লাবণ্যে গণ্ড রঞ্জিয়া চামেলী বলিল,—'ঃঃ ও কথা কি বল্‌তে আছে?'

মু। বল্‌তে নেই? আমি বুঝতে পেরেছি, ঐ দেখ কথা শুনে ও মুখ কেমন হ'লো, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—আমায় বল্‌তে নেই, তোমায় আছে, দিদি যদি আমায় বলে ভালবাসি, তা বল্‌তে আছে; আমি যদি তাকে ভালবাসি, তা বল্‌তে আছে; আমি তোমাকে ভালবাসি বলতে নেই; আমি চল্লেম।

মুক্তরা। যেও না, যেও না।

মুক্তরার নয়ন, প্রাণ ভরিয়া তাহাকে দেখিতে চায়, দেখিয়া দেখিয়া যে তাহার এখনও তৃপ্তি লাভ হয় নাই; তাই সে কাতর বচনে বলিল 'যেওনা, যেওনা।'

মু। তুমি মানা ক'রনা, তা' হ'লে আমি যেতে পার্‌বো না। কিন্তু ভাই, এখানে আমায় থাক্‌তে নেই, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। * * তোমায় ভালবাসি ব'লতে নেই, আমি চল্লুম।"

মুক্তরার অতৃপ্ত নয়ন এখনও যে সেরূপ দেখিতে চায়—কর্ণ যে এখনও তার বচন-সুধা শুনিতে চায়, তাই সে পূর্ব্ব-কথিত 'ও কথা কি বল্‌তে আছে?'—প্রত্যাহার করিয়া বলিল,—'না না বল্‌তে আছে, তুমি যেওনা।' কিন্তু প্রেমের মোহন-স্পর্শে মুকুল বুঝিতে পারিয়াছে, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কতখানি! তাই সে বলিতে পারিল—'বল্‌তে নেই আমি কুটীরে থাকি, বল্‌তে নেই; যদি তোমাদের মত ঘরে থাক্‌তেম, তোমাদের মতন কথা কইতে পার্‌তেম, তোমাদের মত কথা বুঝ্‌তে পার্‌তেম, তা হ'লে তোমাদের কাছে থাক্‌তাম, আবার তোমায় ভালবাসি ব'লতাম; তুমি মানা ক'র না, আমি চল্লেম। সেক্‌পীয়ার মিরান্দার চরিত্রে ও বঙ্কিম-চন্দ্র কপালকুণ্ডলার চরিত্রে যে অপূর্ব্ব প্রেমের চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন—সমাজের মধ্যে বর্দ্ধিত না হইলেও নারীর হৃদয়ে যে প্রেমের অঙ্কুরোদ্গম সম্ভবপর দেখাইয়া কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্রও কুঞ্চিত-হৃদয় ভাবানুভূতিসম্পর্কশূন্য মুকুল চরিত্রের ভিতর প্রেমের বিকাশ ও প্রসারণ, কলাকুশলী মনস্তত্ত্ববিদের ন্যায় চিত্রিত করিয়া তদ্রূপ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন।

আবার মুকুলের বড় ভগ্নী তারাদেবীও যুবরাজ চন্দ্রধ্বজকে আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলিয়াছেন—ভালবাসার সোণার কাটির স্পর্শে জগৎকে তিনি নূতন চক্ষে দেখিয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ভ্রাতা ভগ্নীর কথোপকথন হইতে ভালবাসার প্রকৃতি ও ভালবাসিলে, চিরদয়িতকে আত্মসমর্পণ করিলে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহার একটা সুন্দর চিত্র দেখিতে পাই। মুকুল বলিল, 'ভালবাসি ব'লতে নাই, এমন ভালবাসা বেশ না; তা হ'লে দিদি তুমি ফুলের মতন শুকিয়ে যাবে।' উত্তরে তারাদেবী বলিলেন, 'আর যদি ভালবেসে থাকি?'

মু। তা হ'লে আয় দিদি দুজনে বসে মনের কথা বলাবলি করি।

তা। কি বল্‌বে বল?

মু। চুপ করে বসে থাকি; দিদি! তুমি কি মনে মনে তার সঙ্গে কথা কও? সে নয় সে যেন—

মুকুল সে অবস্থার কথা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া, ভগ্নী তাহার প্রাণের কথা বলিয়া দিলেন,—

'সে যেন সে যেন, মনে হয় হেন,
শিহরি নড়িলে পাতা;
লতায় লতায় পাতায় পাতায়,
কয় যেন তারই কথা।
ওই ওই ওই, ওই কই কই
চকিতে চমকে আঁখি,
কে যেন নয়নে, সে দুটী নয়নে,
রেখেছে মরমে আঁকি।'

কি সুন্দর মনোরম চিত্র! আর প্রেমিকার অবস্থা গিরিশচন্দ্র তারাদেবীর মুখে এইরূপে বলাইয়াছেন,—

'যে দিকে ফিরাই, তারে দেখে আঁখি,
ঘুমালে ভোলে না তারে';

ইহার ব্যাখ্যান নিষ্প্রয়োজন। এ অবস্থা অনুভব করিবার—উপভোগ করিবার সামগ্রী। প্রকৃত প্রেমিকের চক্ষুতে জগৎটা নূতন শ্রী, নূতন ভাব ধারণ করে—কবির কথায় বলিতে গেলে,—

'ধরা ধরে মোহিনী মূরতি ভালবাসা
লতায় লতায় পাখী গায় ভালবাসা গান,
ভালবেসে দোলে ফুল, ভালবাসা ধীর-
সমীরণে, নাহি আর ভালবাসা বিনে,
সে আমার—সে আমার, আমি তার,—
ভালবাসা পরিপূর্ণ জগৎ সংসারে!'

অন্যত্র গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, এই ভাব—'সে আমার, আমি তার'—আর একটু অগ্রসর হইলে একেবারে লোপ পাইয়া যায়; তখন মনে হয়, জগতে কেবলমাত্র প্রণয়াস্পদই আছে, আর কেহ নাই—তখন 'আমিত্ব' তাহার ভিতর নিমজ্জিত হইয়া যায়—দ্বৈতভাবের স্থলে অদ্বৈত ভাব বিরাজ করে। তাই গিরিশচন্দ্র মুকুলের মুখে বলাইয়াছেন, 'কেবল সে আছে, আর আমার কিছুই নাই; আমার সুখ নাই, দুঃখ নাই, আমার লাঞ্ছনা নাই; আমার গৌরব নাই।' তারপর গিরিশচন্দ্র প্রকৃত কলাবিদের ন্যায় বণিক-বালকবেশী মুক্তরা ও মুকুলের সম্মিলন ঘটাইয়া যে সত্যের বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাই এই,—প্রণয়াস্পদকে—প্রাণের দেবতাকে—বাহিরে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ দ্বারা অনুভূতি সাহায্যে দেখিয়া প্রাণের তৃপ্তি হয় না, তাহাকে মনের নিভৃত দেবালয়ে বসাইয়া দেখিতে হয়—প্রাণ ভরিয়া দেখিতে হয়, আর সেই দেখাতেই প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায়। উভয়ের কথোপ-কথনের কয়েক ছত্র তুলিয়া দিলাম :—

মুক্তরা। তুমি হেথায় কি ক'রছ?

মু। কি ক'রছি ব'লব না বলেই বনে এসেছি,—তুমি কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছ?

মুক্তরা। জিজ্ঞাসা কর্‌ছি কেন? আমি বণিক বালক, সওদা এনেছি, খদ্দের খুঁজ্‌ছি।

মু। তুমি পাগল! নগর ছেড়ে বনে এসেছ জিনিষ বেচ্‌তে!

মুক্তরা। নগরে কেউ এ জিনিষ নেয় না, তাই বনে এসেছি; তোমায় নেবার মত দেখ্‌লুম, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

মু। তুমি পাগল, আমায় কি জিজ্ঞাসা কর্‌ছ?

মুক্তরা। আমি পাগল চাই, আমার ভুলের বেসাত পাগল নইলে কেউ নেবে না।

মু। যদি তুমি আমার মত পাগল চাও, তো নির্জ্জনে বসে ফুল ছড়াও। তুমি ভুলের বেসাত নিয়ে ফির্‌ছ, আমি আজন্ম ভুলে ডুবে আছি; কিন্তু ভুলের উপর ভুল—তারে ভুল্‌তে পাচ্ছি না। তুমি যাও, তোমার সঙ্গে আর কথা ক'ব না; তুমি ঠিক তারি মত, তোমার তার মত স্বর, তার মত অবয়ব, তার মত চোখ, তার মত মুখ; মনে করেছি তাকে আমি মনে মনেই দেখ্‌ব, আর বাহিরে দেখ্‌ব না।

বাহিরের ভোগ ফিরাইলেই কি প্রণয়াস্পদের চক্ষুতে প্রকৃত ধূলি দেওয়া যায়? তারপর মুকুল যখন বুঝিতে পারিল, উভয়ের মধ্যে মিলন হওয়া অসম্ভব—উভয়ের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান খুব বেশী, তখন প্রেমাস্পদকে ভুলিতে চাহিল। শুধু যে এই কারণেই ভুলিতে চাহিল, তাহা নহে। মুকুল বুঝিল, মুক্তরাও তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। কতটা স্বার্থ-ত্যাগ করিতে পারিলে রাজকুমারীর ন্যায় অভিজাত-সম্প্রদায়ের কন্যা তাহার মত বনবাসীকে ভাল-বাসিতে পারে, তার বিনিময়ে আমি ত কিছুই ত্যাগ করিতে পারি না—আমার আছে কি যে আমি ত্যাগ কর্‌বো।' তাই মুকুলের মুখে শুনিতে

পাই,—'যদি কখনও এমন হয়, যদি তার জন্যে প্রাণ দেবার আবশ্যক হয়, তা হ'লে প্রাণ দিয়ে যাই। সে রাজকুমারী, আমার প্রাণের তো তার দরকার নাই, তবে কেন তার কাছে যাব? আমি একবার তার কাছে গিয়েছিলাম, কাছে গিয়ে রাজকুমারীকে বনবাসিনী ক'রেছি; আবার যদি কাছে যাই, তাহ'লে সে সোণার পদ্ম শুকিয়ে যাবে।' কিন্তু—প্রণয়ীকে ভোলা কি সহজ কথা—তাহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেলেই কি তাহাকে ভুলা যায়? এত সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ভ্রাতা-ভগ্নীর কথোপকথন হইতে ইহা বুঝিবার একটু চেষ্টা করিব। মুকুল জিজ্ঞাসা করিল, 'দিদি 'তুমি বল্‌তে পার, আমার মনে এখন কি হচ্ছে?' উত্তরে তারাদেবী বলিলেন,—

মনের কথা বুঝ্‌তে নারি মনতো আমার নয়,
ধরিধরি মনে করি ধর্‌তে করি ভয়।
থাকি সদা তারি ধ্যানে, তারেই সদা চাই,
সে যদি হায় কাছে আসে, কেঁদে গ'লে যাই!
আমার সুখের হাটে দুঃখের বেসাত লাভে
হারাই মূল,
ভুল পসরা মাথায় নিয়ে আপন হলো ভুল,

•

বুকে মুখে প্রাণ বোঝে না, নয়নবারি সার,
মনে গাঁথি দিবানিশি নয়ন জলে হার।
ব'লব তারে মনে করি বল্‌তে নারি হায়,
সে যদি এ দারুণ ব্যথা শুনে ব্যথা পায়?

মু। দিদি, আজ তুমি আমার মনের কথা ঠিক ব'ল্‌তে পারে না; আজ আর আমি তারে চাইনে, আজ আমি আপনাকে চাই—আমি তারে ভুল্‌তে চাই; আমি কেন এমন হ'লেম, তাই ভাবি।

তারা। কেন, সে ত তোমায় চায়। তবে কেন তুমি তারে ভুল্‌তে চাও?

মু। ভুল্‌তে চাই কেন?—তোমায় কি ব'লব, আমি আপনিই জানি না! আমি তাই তোমার ঠাঁয় শুন্‌তে চেয়েছিলাম। আমার মনে হয়, আমি কেন এমন হলেম, যারে ভালবাস্‌তে নাই সে কেন ভালবাসে? • • আমি আর ভালবাস্‌ব না।

তারা।

প্রাণে বাসা ভালবাসা প্রাণ কি ভোলা যায়?
জড়িয়ে থাকে প্রাণে প্রাণে, প্রাণ যে তারে চায়!
ভুল্‌তে গেলে আপন ভুলে শূন্য হেরে প্রাণ।
পাথরে দাগ পড়েছে, পোঁছা কি তায় যায়?
নয় তো কথার ভালবাসা ভুল্‌বে কি কথায়?
ধরম করম সরম ভরম সকল যায় ভেসে
মান অপমান থাকে না যে উদয় হয় এসে।
অভিমান রাগ ক'রে হায় বাড়ে অনুরাগ,
অযতনে মনাগুণে বাড়ে এ সোহাগ।

বাস্তবিক ভোলা সোজা নয়—কঠিন পাথরে যে ছাপ পড়িয়া যায় তাহা যেমন কোন মতেই মুছিয়া ফেলা যায় না—ভালবাসার দাগও সেইরূপ মন হইতে পুঁছিয়া ফেলা যায় না। কত ভাল হইয়া গেলেও তাহার দাগ যেমন থাকিয়া যায়, ভালবাসার স্মৃতিও সেইরূপ হৃদয়ে চিরকালের জন্য মুদ্রিত থাকে। প্রণয়াস্পদকে একবার দেখিলেই তাহার উপর যে অভিমান বা রাগ ছিল তাহা অনুরাগে রূপান্তরিত হইয়া যায়।

আর একটা কথা বেশ বুঝা গেল—স্বার্থ বিসর্জ্জনই প্রেমের প্রকৃত লক্ষণ। অন্যত্র যুবরাজ চন্দ্রধ্বজ তারাদেবীকে বাক্‌শক্তিহীনা দেখিয়া আপনিও নির্ব্বাক্ হইয়াছিলেন—স্বেচ্ছায় ভগবানের শ্রেষ্ঠদান বাক্‌শক্তির ব্যবহার বন্ধ করিয়াছিলেন। প্রাণরক্ষাকারী যুবরাজকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া মুকুল যখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমায় জিজ্ঞাসা করি,—

তুমি কি সেই মূক বালিকাকে ভালবাস?' উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, কেন তিনি মূকত্বকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। আমি সম্পূর্ণ উত্তরটা এস্থলে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না :—

যুব। কথায় কি জানাব? তুমি প্রেমিক, আমার প্রাণ বোঝ। আমার হৃদয়ে সেই বালিকা ভিন্ন আর কারও স্থান নাই; তুমি তার কোন প্রিয় ব্যক্তি, এই নিমিত্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম! আমি ভালবাসা কি তা পূর্ব্বে জান্‌তাম না, কিন্তু যেদিন সেই বাক্‌হীন বালিকাকে প্রান্তরে দেখ্‌লাম, আমার জ্ঞান হ'ল ধরা স্বর্গ! সেই দিন নূতন নয়ন পেলেম, সকলই সুন্দর দেখ্‌লেম! তুমি বিবেচনা ক'র্‌ছ, আমি মূকের ভাণ করেছিলেম; তা নয়—আমার অপর উদ্দেশ্য ছিল, ইঙ্গিত ভিন্ন সে বোঝে না, আমি বাক্‌শক্তি ত্যাগ না ক'র্‌লে ইঙ্গিত শিখ্‌তে পার্‌বো না—আমার অন্তরের ভাব তাকে বোঝাতে পার্‌ব না—এই নিমিত্তই সঙ্কল্প করেছিলাম যে, আমি আর এ জীবনে কথা ক'ব না,—তোমার প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে কথা কয়েছি, কিন্তু হায়, সে আমার প্রতি নির্দ্দয়! কিরূপে জীবন বিসর্জ্জন দেব—সেই চিন্তা ক'র্‌ছিলেম, তোমার বিপদে আমার হর্ষ হ'ল, ভাব্‌লেম এই আমার পরম সুযোগ! তার প্রিয়জনের প্রাণরক্ষায় প্রাণ সমর্পণ ক'র্‌ব, এ অপেক্ষা এ সংসারে আমার আর কি সুখ আছে? তাই বুঝ্‌লেম তুমি বড় দুঃখী; ভাইরে আমিও বড় দুঃখী; আমি চল্লেম।

মহাভারত হইতে আমরা দেখিতে পাই, অন্ধক, ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী গান্ধারীদেবী স্বেচ্ছায় অন্ধত্বকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন—স্বামী জগতের যে শোভা-সম্পৎকে দেখিতে পাইতেছিলেন না, তাহা দেখিয়া কেন তিনি আনন্দলাভ করিবেন; তাই সতী শিরোমণির এই স্বেচ্ছাকৃত নয়ন উৎপাটন ব্যাপারে আমরা স্বামী-ভক্তির আদর্শ দেখিয়া ধন্য হই। জগতের যে সকল জাতি কেবলমাত্র প্রকৃতি-মার্গে বিচরণ করে, তাহারা হয়ত এই ইচ্ছাকৃত ব্যাপারকে রোষের বলিয়া—পাপের কার্য্য বলিয়া আখ্যাত করিতে পারেন; কিন্তু আমাদের নিকট এ চিত্র বড়ই মধুর। আর এ যুগে গিরিশচন্দ্র চন্দ্রধ্বজের চরিত্রে একনিষ্ঠ প্রেমিকের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই মনোরম! হয়ত কোন পাঠক মহাশয়ের নিকট এ চরিত্র শৈশবের চিত্র বলিয়া বা ন্যাকামির নামান্তর বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের নিকট এ চিত্র বড়ই সুন্দর! চন্দ্রধ্বজের ভালবাসায়—রূপজ মোহ নাই, কামগন্ধ নাই। এ ভালবাসা পূত পবিত্র ভাগীরথীবারির ন্যায় ওর তর বেগে বহিয়া যাইতেছে। এ ভালবাসার চিত্র একদিন জগৎবরেণ্য সাধক-কবি চণ্ডীদাসের চরিত্রে দেখিয়াছি—রজকিনী রামীর যুগল চরণ শীতল বলিয়া বুকে করিয়া ধরিতে দেখিয়াছি—'আর, চলে নীল সাড়ি নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি পরাণ সহিত মোর' শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

যুবরাজ চলিয়া গেলেন; তখন মুকুলের স্বগতোক্তিতে একটা বড় সত্য আমরা পাই—'রোদনই হৃদয়ের উচ্চ শিক্ষা! প্রেমের সার রোদন, তাই প্রেম পরম বস্তু!' এ কথা যে সত্য তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কোন যুক্তির দরকার হয় না।

তারপর মদনবাণ-জর্জ্জরিত দুই জোড়া প্রাণের মিলন যে ভাবে কলাকুশলী গিরিশচন্দ্র ঘটাইয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার কৃতিত্ব বড় কম দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রেম সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা বলা হইল; এক্ষণে হাস্যরসরসিক বরুণচাঁদের অবতারণায় গিরিশচন্দ্র যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার একটু আলোচনা করিব। আমার বোধ হয়, রস ও ভাঁড়ামির একত্র সম্মিলনে বরুণচাঁদের চরিত্র উদ্ভব হইয়াছে।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'যমুনা'য় আমি কাল্পকবি

রজনীকান্তের সমালোচনা করিবার সময় হাস্যরস সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াছি। সেখানে বলিয়াছি, 'wit and humour অর্থে আমরা বুঝি রঙ্গরস—লোককে হাসাইবার চেষ্টা। সুষ্ঠু উপায়ে রসাত্মক বাক্যে শ্লীলতার সাহায্যে আনন্দদানের ব্যবস্থা করাই রঙ্গরসের প্রধান কার্য্য। রঙ্গরসে মনের অবসন্নতাকে দূর করিয়া উত্তেজনা আনয়ন করে। মনের স্বাস্থ্যকে ফিরাইয়া আনে, আনন্দ দান করে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানও করিয়া থাকে। ব্যক্তি বা সমাজের দোষ দেখাইয়া সংশোধনের পথে লইয়া যাইবার রঙ্গরসই অমোঘ মন্ত্র। রঙ্গরস ঘটনা বা অবস্থাকে অতিরঞ্জিত করে, ভাবের বৈপরীত্যও ঘটায়, অসম্ভব বা অঘটনের ঘটন করিয়া লোকদিগকে হাসায়।' আর্থার কম্পটন রিসেট সাহেবের মতে, আদর্শ ও বাস্তবের জীবনের কাব্যাংশেও গদ্যাংশের সংঘর্ষে হাস্যরসের উৎপত্তি (Humour derives from a sense of incongruity; an instinctive realisation of the clash between the Ideal and the Real, of the poetry of life and the prose of life.) শিক্ষা বা সভ্যতার উপর রঙ্গরস নির্ভর করে না। শিক্ষিত লোকের হাস্যরসকে রঙ্গ আখ্যা দেওয়া যায়, আর অশিক্ষিতের হাস্যরসকে ভাঁড়ামী বা কৌতুক বলা হয়। এইমাত্র প্রভেদ। তবে একথাটাও মনে রাখা উচিত, জাতীয় চরিত্রগত বিশেষত্বের উপর রঙ্গরস নির্ভর করে। কাতুকুতু দিয়া লোককে হাসাইতে পারা যায়, কিন্তু হাস্যরস আনয়ন করিবার সেটা প্রকৃত পথ নয়। বাচালতা আর রসিকতাও যে এক জিনিষ নয় সেটাও মনে রাখা উচিত। অশ্লীলতা ও ইতরামি করিয়া হাস্যরসের অবতারণা করাও বিকৃত রুচির পরিচায়ক। এ সম্বন্ধে গত বর্ষে শ্রাবণ তারিখের "শঙ্খ" পত্রিকায় পরিহাস-রসরসিক 'বীরবল' যে কয়টী কথা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিব। এ বিষয়ে তাঁহার মতের মূল্য যে কত বেশী, তাহা আর কাহাকেও অধিক করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। অধিকন্তু তিনি দার্শনিক বার্গসোঁর মত উদ্ধৃত করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।' Bergson হাসির উপর একখানি আস্ত বই লিখে বসেছেন। তাঁর মতে, হাসির বিষয় হচ্ছে শুধু মানুষ; ও হচ্ছে একটা সামাজিক ব্যাপার, আর ওর কার্য্য হচ্ছে, মানুষকে জড়তার হাত থেকে রক্ষা করা। জীব হচ্ছে মুক্ত, আর জড় বদ্ধ, অথচ জীবের জড় হবার দিকে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, একমাত্র আরামের লোভে। এখন হাসির কাজ হচ্ছে, মানুষের ঐ অধোগতির পথে কাঁটা দেওয়া। তিনি বলেন যে, মানুষ যখন পা-পিছ্‌লে পড়ে তখন সে লোষ্ট্রকাষ্ঠের মত অর্থাৎ একটা জড় পদার্থের মত পড়ে। তখন তার দেহের যুক্তছন্দ থাকে না, সর্ব্বাঙ্গ জড়বৎ আড়ষ্ট হয়ে যায়। তাই দেখে লোক হেসে ওঠে। তার পর যদি দেখা যায় যে, কোনও লোকের মন ও চরিত্র জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ অন্তরের একটা ঝোঁক, অথবা মনের একটা idea বশবর্ত্তী হওয়ায়, তার বুদ্ধিও চরিত্রের সকল লীলা বন্ধ হয়েছে, তখন মানুষে আর না হেসে থাকতে পারে না, যদি না সে ঝোঁক অথবা সে 'আইডিয়া' মারাত্মক হয়। কেন না, তখন তা হয়ে ওঠে tragic. এই হাসির ফলেই সমাজ তার জীব-ধর্ম্ম রক্ষা করে। যে সমাজ হাস্‌তে জানে না, সে সমাজ কাঠ-পাথরের মতই জড়ত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। আর সে সমাজের বয়সের গাছ-পাথর না থাকলেও সে সমাজ মৃত। ধরে নিন যে, Bergsonএর কথা ঠিক যে হাসি হচ্ছে meterialismএর প্রতিবাদ, অতএব তা মানব সমাজকে বাঁচিয়ে রাখে।' এমন যে হাস্যরস তাহার যিনি অবতারণা করিতে পারেন, তিনি প্রকৃতই আমাদের ধন্যবাদভাজন। যে সকল হাস্যরসিকেরা অঙ্গভঙ্গী ও বেশ-বিন্যাসের সাহায্যে হাস্যরসের অবতারণা করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ হাস্যরস-

রসিকদিগের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন না। তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ রসরসিক, যাঁহাদের হাস্যরসের সহিত আমরাও প্রাণ খুলিয়া সকল ভুলিয়া হাসিতে পারি। তাহাকে দেখিয়া হাসিলে চলিবে না—তাহার সহিত একরূপ অনুভূতি লাভ করিয়া যদি হাসিতে পারি, তবেই হাস্যরসের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। সেদিন Montrealএর Mc Gill Universityর অধ্যাপক Stephen Leacock সাহেবও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন,—'Let me hear the comedians own laughter come first, and mine shall follow readily enough, laughing not at him but with him' আর গিরিশচন্দ্রের বকল-চাঁদের হাসির সহিত আমরাও প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছি। তবে একথাও পূর্ব্বাহ্নেই বলিয়া রাখা ভাল, দু এক স্থলে গিরিশচন্দ্র তাহার পূর্ব্বতন যুগের রসিকতার অবতারণা করিয়াছেন। সেগুলিকে আধুনিক রুচিতার কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে তাহারা খাঁটি হাস্যরসের নিদর্শনস্থল বলিয়া বিবেচিত হইবে না। পুস্তকে সেগুলি না থাকিলেই ভাল হইত। তবে অনেকস্থলেই আনন্দের সহিত যে সকল শিক্ষা তিনি দিয়া গিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রথম শ্রেণীর হাস্যরসরসিকদিগের রসরচনায় দেখিতে পাওয়া যায়। সন্নিখিত পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধেও আমি সে কথা বলিয়াছিলাম, 'আর যেখানে আনন্দের সহিত শিক্ষালাভ করা যায়, সেই সকল রঙ্গরসকে প্রথম শ্রেণীর রঙ্গরস বলা যায়।' এখন দেখা যাউক, বকল চাঁদের হাস্যরসটা কি রকমের। বকল চাঁদ আকিংখোর; দৌতাতে মসগুল হইয়া পড়িয়া থাকে। সে পাওীঘানার জনৈক বণিকের পুত্র। ব্যবসা-বাণিজ্যে তাহার মন আদৌ নাই। কেরালীর অধিপতি অয়স্কান্তের জনৈক কর্ম্মচারী ওজন রামের সহিত তাহাকে কথা কহিতে আমরা প্রথমেই শুনি 'মলিন কেন চাল্‌তা-বদন খানি?' 'পাঁচএর মতন মুখ' শুনা গিয়াছে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে 'চাল্‌তা বদন' শুনা যায় নাই। তার পর দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে তাহার মুখ দিয়া খাঁটি রঙ্গরসের কথা বাহির হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। কেরালীর সেনাপতি সুষেণ যখন তাহাকে 'চোপ বেটা' বলিয়া শাসাইলেন, তখন বকলচাঁদ বলিল,—'বাপ, বীরসেনের পুত্রকে ব্যাটা ব'ল্‌ছ, আপনার ঘোল আপনি টক্ ব'ল্‌লে দশজনে কি বল্‌বে বাবা'। কারণ এই সুষেণই আপনার স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য বকলচাঁদকে রাজা বীরসেনের পুত্র ক্ষিতিধর সাজাইয়াছেন; এবং সেও ইহার ভূমিকায় 'মহড়া' দিয়েছে। অভিপ্রায়, সকলকে হস্তগত করিয়া মুক্তারাকে লাভ করিবেন। রাজসমক্ষে এ প্রস্তাব করিবার তাহার সামর্থ্য নাই। অথচ তাহার রূপ দেখিয়া সে মজিয়াছে। দুষ্ট সুষেণ যে কোন গতিকে মুক্তারাকে অঙ্কশায়িনী করিতে চায়। তাই যখন সে বকলচাঁদকে বলিতেছে, 'আমার বুদ্ধি স্থির নাই, বকলচাঁদ! তোর পায়ে পড়ি তুই এই কাজটী আমায় ক'রে দে। * * * ফুল পর্‌তে পর্‌তে পাল্কীতে উঠ্‌লো। আমায় বুক পেতে দিতে ইচ্ছা ক'র্‌লে। বকলচাঁদ, তোর বুদ্ধি শুনে আমি চল্‌বো; তুই আমার প্রাণঘাতী বাপ্!' বকল। ক'টা কাজ একস্তরে ক'রব বল?—রাজাগিরি—আবার তোমার বাবাগিরি। দু রকম তো চল্‌বে না, এক রকম রেহাই দাও!

সুষেণ। সত্যি বল্‌ছি বকল, আমার মাথা ঘুর্‌ছে, ভয়ে বুক কাঁপ্‌ছে; কি হ'তে কি হ'বে; ওইত অকালকুষ্মাণ্ড—কাকে প্রকাশ কর্‌বে! আমার মাথা যে আগুন বেরুচ্ছে!

বাস্তবিক ভয় হইবার যথেষ্ট কারণই ত রহিয়াছে। ক্ষিতিধর নেশাখোর লোক। সুষেণের প্রাণের কামনা সে সব জানে। যদি সে রাজার কাছে সমস্ত বলিয়া দেয়, তাহা হইলে ত আর নিস্তার নাই। এ কথার উত্তরে বকলচাঁদ যে শিক্ষা দিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই অতীব সুন্দর

বরুণ।—এ যে বাবা তোমার ভুলুম! আফিং খেলে নেশা হ'বে না—পাপ কর্‌তে গেলে মন ঢুকঢুক কর্‌বে না—পিরীতে মাথা ঘুর্‌বে না, তা হ'লে এসব কর্‌াই কেন বাবা? সক্ না থাকে ছেড়ে দাও। মনটা আর অমন নওলা কি ধওলা ক'র্‌বে না।'

তারপর ভীত সুবেণকে বরুণচাঁদ উপদেশ দিতেছে, 'এ সবে কাজ কি—তোমার ত কোনরূপ বন্ধনই নাই. তুমি এখনও সময় থাকিতে পালাও। 'আর একটা কথা বলি, তোমার চোখের নেশা বইত নয়, প্রাণের টান্‌তো নয়, তা হ'লে এমন করে সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে এগুতে না; চোখের আড় হ'লে আর পিরীতের ঘোরটা অত থাক্‌বে না···।'

তারপর সুবেণ জিজ্ঞাসা করিল,—'আচ্ছা কি হ'বে? মন্দটাই ধরা যাক্।'

বরুণ। কি হ'বে তার ভাল মন্দ নিয়ে, গোল-ক'র না বাবা! হবে যা হবার হবে; তুমি যে ঘোড়ার চালে কিস্তি মাৎ ক'রবে, ঘর থেকে ঠিক সে বেরিয়েছ, তার ঘো নেই বাবা। বিধাতার চক্র বড় চক্র, আমি চক্রে ঘোর খেয়ে ব'লছি বাবা, তুমি ঘোড়ার চালে কিস্তি দিতে যাবে, কোথা থেকে সে ঘড়ে টিপে দেবে। ব'ড়ের মুখে ঘোড়া বস্‌বে না বাবা! সাধে কি বলে, সিদে পথের চেয়ে পথ নাই। তারা ভুখোড় লোক—অনেক দেখে শুনে ব'লেছে—যারা সোজা পথে চলে, তাদের ঘোড়ার চালও ভাব্‌তে হয় না, ব'ড়ের চালও ভাব্‌তে হয় না। সন্ধ্যাবেলা বেশ ঘুমিয়াটুকু হয়, আর সকালে উঠেও কাকুকে মুখ দেখাতে ভয় হয় না।"

অচ্যুতানন্দ স্বামী জী যখন বরুণ চাঁদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তোমার নাম কি'। তাহার উত্তরে সে বলিয়াছিল,—'চট্ ক'রে বল্‌তে পার্‌বো না, হাসি কি বকেয়া বলুন।' কারণ, তাহাকে অনেকের ভূমিকা লইয়া অভিনয় করিতে হইয়াছে —মহারাজ, পরী, ব্রহ্মদৈত্য, আফিংখোর, রাজকুমার সাজিতে হইয়াছে।

আর অধিক উদ্ধৃত করিতে চাহি না। বরুণ-চাঁদের চাতুরস, দরদ, সরস, সতেজ। প্রাণের তন্ত্রীতে গিয়া বরুণচাঁদের রসাত্মক বাক্যাবলী আঘাত দেয়। তাহার কথা শুনিলে হাসি আপনি আসে। কিন্তু গভীর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, সেবাকে কেরালাধিপতি রবিবর্ম্মার ও তাঁহার মন্ত্রীর সমক্ষে বরুণ-চাঁদের ভাঁড়ামী বাচালতার নামান্তর মাত্র। তাহার পূর্ব্বে বরুণচাঁদ, ভজনরামের সহিত যে রসিকতা করিয়াছিল তাহা চলন সই; কিন্তু সেনাপতি সুবেণের সহিত সে যেভাবে রসিকতা করিয়াছে তাহা মুষ্ঠু ও সঙ্গত নয়—লীলতার গণ্ডীর ভিতর তাহার স্থান নাই। এই সুন্দর নাটকের এই অংশ পাঠ করিয়া বাস্তবিকই আমরা বুঝিতে পারি না, কেন গিরিশচন্দ্র এগুলিকে স্থান দিলেন। নাটকীয় উৎকর্ষসাধনে বা বরুণ চাঁদের চরিত্র বিকাশের ইহা কোন মতেই সহায়তা করে নাই।

সেনাপতি সুবেণের চরিত্রের একটা দিক গিরিশচন্দ্র বেশ দক্ষতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। সে বুঝিয়াছিল, রাজকন্যা মুরলাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব সে কিছুতেই করিতে পারে না। কিন্তু বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার তাহার সাধ গিয়াছিল—সে রাজকুমারীর অনিন্দ্য সুন্দর রূপ দেখিয়া মজিয়াছিল। কোন গতিকে তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টায় সে ফিরিতেছিল। পাওবানা রাজমহিষী ও তাঁহার গুণধর পুত্র ক্ষিতিধরকে সে কৌশলে রাজ্য মধ্যে আনয়ন করিয়াছিল। বরুণচাঁদের সহায়তায় সে মনে করিয়াছিল, মুরলাকে হস্তগত করিবে। কিন্তু মানুষ ভাবে একরূপ, ভগবান গড়েন অন্যরূপ। যখন সুবেণ দেখিল, তাহার কৌশল ব্যর্থ হইয়া গেল—সকল কথা এখনি প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তখন সে দেখিল, পলায়ন ভিন্ন তাহার অন্য গতি নাই। সে তখন 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই নীতির

অনুসরণ করিল। কিন্তু বরণচাঁদের মিথ্যা স্তোক বাক্যে সে ভুলিল—সে মনে করিল, বুঝি সত্যই রাজকুমারী তাহাকে ভালবাসে। সে বরণচাঁদের ফাঁদে পা দিল—ফলে ষৎপরোনাস্তি অপ্রস্তুত হইল। শেষে রাজরোষে যখন প্রাণটা হারাইতে বসিয়াছিল, তখন অচ্যুতানন্দের কৃপায় প্রাণ ভিক্ষা পাইল। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, এ স্থলেও গিরিশচন্দ্র সুবেণ ও বরণচাঁদের জীবন রক্ষার জন্য স্বামী অচ্যুতানন্দের আশ্রয় লইয়া ভাল করেন নাই। অলৌকিক বা অপ্রাকৃতিক ঘটনা ও দৈবীগুণসম্পন্ন পুরুষের বা অতিমানবের দ্বারা এইরূপ উপায় নির্দ্ধারণ করা আর্টের দিক হইতেও ভাল নয়। এই আনন্দের দিনে—মিলনের দিনে রাজা স্বয়ং তাহাকে ক্ষমা করিয়া ছাড়িয়া দিলেও বোধ হয় অধিকতর শোভন হইত।

(ক্রমশঃ)

ওস্তাদ

[চিত্র]

(শ্রীমনোলেখা দাসী)

তার পেশা ছিল ঐ। গান শিখিয়ে যে কয়টি টাকা সে পেত, তা' দিয়ে কোন রকমে তার দিন চলত। বেশী লোভের আশায় সে এদিক সেদিক ঘুরত না; সেইজন্যই তার নাম হয়েছিল জগৎজোড়া।

দেশ-বিদেশ থেকে কত গুণী—জ্ঞানী—শিক্ষার্থী আসত তার কাছে সঙ্গীত-বিদ্যা শেখ্‌বার জন্য। তার শিক্ষার দ্বার ছিল সর্ব্বদা উন্মুক্ত।

আশে-পাশে যে সব ওস্তাদ ছিল, তাদের বড়ই হিংসা হোত ওর অদ্ভুত নাম শুনে। এমন কি, মুখ ফিরিয়েও কেউ তার সঙ্গে কথা বলত না। এই-জন্য তার মন বিষাদে ভরে যেত, বুকের মধ্যে সে অহরহ বেদনা অনুভব করত।

এমনি কোরে কিছুকাল যায়, একদিন হঠাৎ দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে এক পরওয়ানা এল—তাকে শীঘ্রই যেতে হবে ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে। সহসা এই সংবাদে তার মন শঙ্কাকুল হোয়ে উঠ্‌ল, সে যেন মনের মধ্যে বিরাট শূন্যতা অনুভব কর্‌ল।

সেদিন সকালবেলা উঠে মন তার ভালই ছিল না। গতদিনের একটা গজল কিছুতেই সুরের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না, এইজন্য সে একটু বিমর্ষভাবেই ছিল। এমন সময় এল বাদশার পরওয়ানা। মনে মনে ভাব্‌ল—না, আর রাজধানীতে যাব না, দূতকে সে কথা বলে দিই। এই কথা ভেবে যেমন সে উঠ্‌তে যাবে, সাম্‌নে এসে দাঁড়াল তার শিষ্যার সুবিয়া বিবি। তার সদ্যঃ প্রস্ফুটিত গোলাপসদৃশ মুখখানি দেখে সে বাদশা-পরওয়ানার কথা একেবারে ভুলে গেল, অবাক হোয়ে তাকে দেখ্‌তে লাগল।

ওস্তাদজীর মুখ তার দেখে সুবিয়া বিবি বল্লে, "আজ অত মনভারী কেন?"

গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে ওস্তাদজী বল্লে, "কৈ না, এমন ত কিছু হয় নি।"

"না হয়নি!" এই বলে সুবিয়া বিবি মুখ-খানিকে ঘনতারাক্রান্ত মেঘের ন্যায় তড়িৎ গতিতে অন্তঃপুরে চলে গেল।

তবে কি শিরাজী পরওয়ানার কথা জান্‌তে

পেয়েছে? এই চিন্তা তাকে বিভ্রান্ত করে তুলে।

হঠাৎ সুখিয়া এসে বল্লে, "তুমি বুঝি কোথায় যাবে?"

ওস্তাদজীর অন্তঃকরণ

উঠ্‌ল।

"না, না, পিয়ারী, আমি আবার যাব কোথায় তোমায় ছেড়ে!" এই বলে চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানিকে ক্ষণিক হাসিতে ভরিয়ে তুল্লে।

এদিকে রাজধানী যাবার দিনও এগিয়ে এল। একদিন গোপনে নিশীথে সে রাজদূতের সঙ্গে রাজধানীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়্‌ল। কত রাজার রাজধানী পার হোয়ে তবে তারা দিল্লীতে এসে পৌঁছুল। সঙ্গে তার সুখ-দুঃখের সাথির সেই বীণা।

ওস্তাদজীর মন পিয়ারী সুখিয়া বিবির বিরহে ভারাক্রান্ত হোয়ে পড়্‌ল।

• •

দিল্লীনগরী আজ বিচিত্র জন-কোলাহলে মুখরিত। রাজপথ বিচিত্র পুষ্পমাল্যে সজ্জিত। আমীর ওমরাহগণের কারুকার্য্যখচিত বহুমূল্য বসনে রাজপথ আলোকিত। কিন্তু বাদশার গগনচুম্বী অট্টালিকায় বাস করিয়া ও চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজ্যাদি আহার করিয়াও, ওস্তাদজীর মনে এক-বিন্দু সোয়াস্তি নেই।

শাহানশাহ বাদশাহ হুকুম দিলেন,—কল্য প্রভাতে দরবারে তাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষে সঙ্গীতবিৎগণের প্রতিযোগীতার পরীক্ষা হবে। সেইজন্য ভারতবর্ষের নানা রাজ্য থেকে অসামান্য সঙ্গীতপারদর্শী ওস্তাদেরা একে একে রাজধানীতে এসে তাদের সুস্বরে চারিদিক মন্ত্রমুগ্ধ করে তুল্‌ল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে রজনী প্রভাত হোল। দিল্লী নগরী সমবেত সঙ্গীতনিপুণ ওস্তাদের কোলাহলে মুখর হোয়ে উঠ্‌ল।

নির্দ্ধারিত সময়ে রাজ-দরবার জনাকীর্ণ হোয়ে উঠ্‌ল। তিল ধরবার পর্য্যন্ত এতটুকুও স্থান নেই।

সহসা বাদশাহ অন্যান্য ওস্তাদদিগের দিকে চেয়ে বল্লেন, "আপনাদের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনিই প্রথমে মজ্‌রা করুন।"

এই কথা শুনে তাদের মধ্যে নিমেষে চোখ চাওয়া-চাওয়ি হোয়ে গেল।

সহসা এক কিশোর বালক রাজ দরবার আলোকিত কোরে উঠে দাঁড়াল। সমবেত জনমণ্ডলী উৎসুক নেত্রে সেই বালককে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

বাদশার হুকুমে সেই কিশোর বালক বীণায় ঝঙ্কার দিল। সে ঝঙ্কার মৃদু, মৃদুতর, মৃদুতম হোয়ে বেজতে লাগল। যেন সেই সুর মূর্ত্তিপরিগ্রহ কোরে সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর মুখে পুলক জাগিয়ে তুলেছে।

বাদশাহ হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠ্‌লেন, "বহুৎ আচ্ছা!"

আত্মপ্রসাদ লাভ কোরে বালক একবার সেই ওস্তাদের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

সকলেই বালকের অসামান্য সঙ্গীত-নিপুণতার পরিচয় পেয়ে ধন্য ধন্য কোরে উঠ্‌ল।

বালকের এইরূপ পরিচয় পেয়ে অন্যান্য ওস্তাদেরা আর উঠ্‌তে সাহস কোর্‌লে না। তখন বাদশাহ আদেশ কর্‌লেন সেই ওস্তাদকে।

যখন সেই ওস্তাদ তার অতি জীর্ণ বীণাটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে উঠে দাঁড়াল, তখন সকলে ভাব্‌ল—এটা একটা বাতুল, নইলে বালকের কাছে স্বেচ্ছায় হীনতা স্বীকার করে?

সেই ওস্তাদ একটিমাত্র করুণ ঝঙ্কার দিল—তার সেই জীর্ণ বীণাটিতে। সেই অশরীরী সুর বৃহৎ দরবার-কক্ষের মধ্যে কেঁদে-কেঁদে বেড়াতে লাগ্‌ল এবং উপস্থিত সকলের উপর মোহজাল বিস্তার কোর্‌লে।

মূর্চ্ছিত অবস্থায় বাদশাহ বলে উঠ্‌লেন, "মেরে পিয়ারী……"

যখন সকলের মূর্চ্ছা ভাঙ্গল, তখন সেই ওস্তাদকে আর দেখ্‌তে পাওয়া গেল না; কিন্তু তার জীর্ণ বীণাটি ধূলায় পড়ে রয়েছে।

ভাগের পূজা

[লেখক—শ্রীঅজয় কুমার সেন]

পূর্ব্ব পূজারীগণ—(১) শ্রীশৈলবালা ঘোষ জায়া, (২) শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার, (৩) শ্রীসরসীবালা বসু (৪) শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, (৫) শ্রীচারুবালা বসু।

প্রসাদের মার কথা

তাই ত কি করি—কমল কেন এমন অসময়ে এই বিপুল বিপদের মাঝখান থেকে হঠাৎ চলে যেতে চায়? এর মধ্যে কোন কারণ নেই ত? এ সব কথা ছেলের বিরুদ্ধে ভাবতেও যে কষ্ট হয়? যাকে নিজ-সন্তানের মত কোরে দেখ্‌ছি—যার সুকুমার কান্তি এবং স্নিগ্ধ-নেত্র-পল্লবদ্বয় দেখ্‌লে এই গ্লানি-ভরা মন ও শরীর এক নিমেষে জুড়িয়ে যায়—তার চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন প্রকারের বিরুদ্ধভাব পোষণ করা ভারী অন্যায় ও অশোভন! তবে এখন কি করি? চারিদিকে যে সব বিষাক্ত বাতাস মেঘের মত স্তরে স্তরে জমাট বাঁধ্‌তে আরম্ভ করেছে—তা' থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দেখ্‌ছি এক মহাদায়!

কমল দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে যাবে—তার আর এই আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ স্থান ভাল লাগ্‌ছে না—সে দিনকে দিন হাঁফিয়ে উঠ্‌ছে। কমলের এই সব কথা কি সবই সত্য—না এর মধ্যে খুড়োমশায়ের কোন গূঢ় চাল আছে। আমি মেয়ে মানুষ—একলা কতদিক আর দেখ্‌ব?

কমল যখন বল্‌ল, কলকাতায় থাকব স্থির করেছি—তখন আমি যেন কি রকমের হয়ে গেলাম। এই যে বিরাট গগনভেদী আর্ত্তনাদ গ্রামের মধ্যে দিনকে দিন উঠ্‌তে আরম্ভ কোরেছে—এর একটা বিধি-ব্যবস্থা না কোরেই সে চলে যাবে? আমরা আর কতদিক থেকে তা' রক্ষা কোরব? গ্রামের জমিদার যদি শাসকের আসন না নেয়—তা'হলে দেশ যে উচ্ছন্নের দিকে চল্‌তেই থাকবে। এ থেকে কি রক্ষা পাওয়া যায় না?

প্রসাদের কথা আমার মনের মধ্যে গভীরভাবে বিঁধেছে। যে সব গ্লানি মনের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে উঠ্‌ছিল; সে সব কলেজের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হোয়ে গেল। সে যখন আমাকে উদ্দেশ করে বল্‌ল, তোমাদের যেতে ইচ্ছা হয়—যেতে পার, আমি যাচ্ছিনে, সে নিশ্চয় জেনো। তার এই দৃঢ়তাপূর্ণ কথা শুনে অবধি আমার মন তারই দিকে আকৃষ্ট হোয়ে পড়েছে। তাই ত বলি—আমার পুত্রের কথা এই রকমের হওয়া চাই। যখন সমূহ বিপদ এসে দুয়ারে দাঁড়ায়, তখন যদি কেউ তা' থেকে মেরুদণ্ড হোয়ে যায়—তা' হলে তার চরিত্রের বিকাশ হবে কি কোরে? প্রসাদ আমার মানুষের মতন মানুষ! তার প্রাণ যে এমন মুক্ত ও উদার এবং মহানুভূতিপূর্ণ, তা ত আগে জান্‌তাম না;—যতই তার তেজোপূর্ণ কথা শুন্‌ছি আর ভাবছি, ততই যেন আমার মন পুত্র-স্নেহে দোদুল হোয়ে উঠ্‌ছে। এমন পুত্রকেও গর্ভে ধারণ করা সফল, যারা দেশের জন্য, সমাজের জন্য, নির্য্যাতিতা ও উৎপীড়িতাদিগের উদ্ধার করবার জন্য বদ্ধপরিকর। আমার প্রসাদের মতন যদি দু'টী কোরে ছেলে প্রত্যেক গ্রাম থেকে জেগে ওঠে, তা'হলে এই সোনার বাংলাদেশ শান্তি-পূর্ণ হোয়ে উঠ্‌বেই উঠ্‌বে। এ কথা আমি হলপ্ কোরে বল্‌তে পারি।

আজকাল দেশ-প্রীতির যে একটা বিরাট, বিপুল ঢেউ দেশের মধ্যে জেগে উঠেছে—এতে নারী-সমাজ

শিক্ষিত-সমাজ এবং অন্যান্য সমাজের লোকেরা বিস্ময়ে চকিত হোয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছে।

দেশে বন্যা এলে গ্রামে গ্রামে যেমন বিরাট ক্রন্দনের রোল উঠে অসীম আকাশকে ছাপিয়ে যেত —তেমনি এই ঢেউএ সমস্ত সমাজের লোক বিক্ষুব্ধ হোয়ে যাবে। এ আমি ভবিষ্যদ্বাণী কর্‌ছি—এটা আমার প্রাণের কথা—মনের কথা, এ নিষ্ফল হ'বার যো নেই!

কমলের কলকাতায় চলে যাবার কথা শুনে নির্ম্মল যেন কি রকমের হতাশ হোয়ে পড়েছে; কিন্তু প্রসাদ—সে আছে অটল, অচল, হিমাচলের মত স্থির, ধীর, শান্ত।

আমি কে যেন শুন্‌তে পাচ্ছি—প্রসাদের কণ্ঠে সেই বিরাট তরাট ধ্বনি। নির্ম্মলকেও আমি উত্তেজিত কোরে তুল্‌ব। কমল যায় একান্ত যাক্, কিন্তু নির্ম্মলের যাওয়া হ'বে না! একা প্রসাদ পার্‌বে না,—নির্ম্মলকেও চাই! আবার ভাব্‌ছি, নির্ম্মল যে সেই কমলকেই তার সব কাজের মধ্যে দিয়া, যেরূপও ভেবে রেখেছিল, তার বিহনে তার উৎসাহ, উদ্যম, শক্তি থাক্‌বে ত? সে যে এখন থেকে সব আশা ভরসা ছেড়ে দিয়ে বম্ ভোলানাথ হ'য়ে বসে গেছে! আবার তা'কে রুদ্র মহেশ্বর কোরে' জাগিয়ে নিতে পারব না! আবার ত্রিশূল নিয়ে ক্ষেপা ভোলা যদি না দাঁড়ায়, আমাদের কাজ যে মধ্য পথেই আট্‌কা পড়ে গেলো!—সেই ত ভাবনা!

কমলের কথা শুনে মন যেন আরও দমে গেল। একটার কূল-কিনারা শেষ হোতে না হোতেই—আবার দুটো! যদি এমনি কোরেই দেশের মধ্যে প্রবল অত্যাচার ও অনাচার হোতে থাকে, তা' হলে সমাজ কি কেবল চুপ কোরে নাকে তেল দিয়েই ঘুমুবে। তার সেই কুম্ভকর্ণের নিদ্রা কি আর ভাঙ্‌বে না? যদি তাই-ই হয়—তবে আর এ সমাজের সরকার কি সে সমাজের থাকাতেও যা ফল, না থাকাতেও সেই ফল।

আমার কিন্তু মনে হয়, খুড়োমশায়ের এই সব কাজ। কারণ নির্ম্মলের হাতে বিষয় নিগ্রহ ভোগ করার পর থেকে—তাঁর মন আরও উত্তেজিত হোয়ে উঠেছে। আবার এও মনে হয়—খুড়োমশায় একা আর কি কোর্‌বেন—তাঁর সে ক্ষমতাই বা কোথায়। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন একজন নায়ক আছেই আছে—তা' না হোলে এমন বিলম্বুশ একটা কাণ্ড ঘট্‌তেই পারে না।

এই সব বিরাট দুঃখের কাহিনী আপন মনে নিভৃতে বসে বসে ভাবছি, এমন সময় কক্ষবেশে গয়লা-বৌ এসে হাজির হোল। এ কয় দিন তাকে না দেখে এখন আর চেন্‌বার উপায় পর্য্যন্তও নেই। এমন সুশ্রী ও সুগঠিত গঠন কালীবর্ণ হোয়ে গিয়েছে দেখে—আমার মনের মধ্যে যেন কি রকম কোরে উঠলো। ওমা—এই কি আমাদের সেই গয়লা-বৌ নাকি? এ কথা মনে আন্‌তেও যে দুঃখ হয়—সবই অদৃষ্টের ফল!

অতি দুঃখেই বল্‌লাম, ও বউ—বোস্, দাঁড়িয়ে রইলি কেন; কিছু কি বল্‌বার আছে?

গয়লা-বৌ ফুঁপিয়েই বল্‌লে,—আমার আজ দু'দিন ধরে কিছু খাওয়া হয় নি পিসিমা। বাড়ী থেকে তারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই নিদারুণ কথা শুনে আমার মন ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগরের মত সহসা চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌ল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌লাম,—বউ, আমাকে কেন এ কথা জানাস্ নি?

গয়লা-বৌ কেঁদে বলে উঠ্‌ল, জানিয়ে আর কি হবে পিসিমা। এই বলে কিছুকাল চুপ কোরে থেকে আবার বল্‌লে, আমি ভাব্‌ছি—এ পোড়া প্রাণ আর রাখ্‌বো না।

গয়লা-বৌএর এই দুঃখ-ভার-প্রপীড়িত কথা শুনে আমি অত্যন্তই দমে' গেলাম—আগে থেকেই আমি জান্‌তাম যে এই রকমের একটা কাণ্ড হবে গয়লা-বৌকে নিয়ে। বল্‌লাম—তারা কি বলেছে?

তারা আর কি বল্‌বে পিসিমা? এই বলে কিছুকাল চুপ কোরে থেকে গয়লা-বৌ আবার বল্‌তে লাগ্‌ল, তারা বলে, এই যে একরাত্রি তুমি জমিদারের বাগানে আটক ছিলে—তখন তারা তোমায় নিয়ে কি কোরেছিল না কোরেছিল—তা' আমরা বুঝ্‌বো কেমন কোরে? তারা যে তোমাকে বেইজ্জৎ করেনি—তারই বা এমন প্রমাণ কি? এই কথা কয়টি বলে গয়লা-বৌ মাথা হেঁট কোরে রইল—তার চক্ষু দিয়ে শ্রাবণের অজস্র ধারা অঝোরে ঝর্‌তে লাগ্‌ল।

সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বল্‌লাম, বউ আর কাঁদিস্ নি—তোর অদৃষ্টে ছিল তাই আজ এমন হোল। গয়লা-বৌএর কথা শুনে যারা এই রকমের কথা বলে, তাদের ওপর বিষম রাগ হোল। বলি এই রকমের কাণ্ড তাদের কোন এক ঘরের ছেলে কর্‌ত, তা'হলে কি তারা তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিত না আদর কোরে ঘরে তুলে নিত? এত তাদেরই ঘরের বৌ আপনার জন। এ মেয়ে মানুষ—প্রমাণ কোথা থেকে পাবে? যদিও বা সে তার চরিত্রের দোষ প্রমাণ দিয়ে খালস করতে চায়- তা'হলে তোমরা তাকে অসতী বলে উড়িয়ে দেবে। তোমরা যে প্রবল—তোমাদের উদ্যত-দণ্ড দুর্ব্বলের উপর যে সদাই উদ্যত—একি আমরা জানি না বা বুঝি না?

আচ্ছা, আমরা কি চিরকালই প্রবলের অনন্ত অত্যাচার নির্ব্বিবাদে সহ্য কোরেই আস্‌ব; আমাদের কি জেগে উঠ্‌বার কোনই ক্ষমতাই নাই—এতই কি আমরা নির্জ্জীব? আমরা যদি না জাগি—এ পোড়া সমাজ দিনকে দিন নির্ম্মমও কঠোর হোয়ে যে উঠ্‌ছে। কেন সমাজের একমাত্র অধীশ্বর হোয়ে থাক্‌বে পুরুষেরা আর আমরা কি কেউ নই? আমাদের কি কোন বিচার কর্‌বার ক্ষমতা ভগবান দেন নাই—আমরা কি গার্গী, খনা প্রভৃতি আর্য্য-মহিলার বংশধর নই? ভগবানের এই সুন্দর রাজ্যে পুরুষের নৃশংস অত্যাচার কি সমান ভাবেই চল্‌বে—এর কি বাধা দেবার কোন উপায় নেই—হা ভগবান!

যখন এই সব কথা মনের মধ্যে তোলাপাড়া কর্‌ছি; এমন সময় প্রসাদ "মা" বলে কাছে এসে দাঁড়াল। তাকে প্রসন্ন-মূর্ত্তিতে দেখে আমার সর্ব্ব-শরীর জুড়িয়ে গেল—প্রাণে একটা স্বস্তির বাতাস পেলাম।

হঠাৎ গয়লা-বৌকে বসে থাক্‌তে দেখে চম্‌কে গিয়ে প্রসাদ জিজ্ঞাসা কোরলে। কি বল্‌তে এসেছিল না জানিয়েই চলে যেতে উদ্যত দেখে জিজ্ঞাসা করলুম —কি বাবা?

প্রসাদ অতি কষ্টে বল্লে—কি খবর মা?

খবর আছে বাবা!—যা শুনেছি, বল্লুম। প্রসাদ বল্লে—গয়লা বৌ বলেছে?

হাঁ বাবা, তার মুখেই কথা শুনেছি। এই বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম উত্তরের প্রতীক্ষায়।

মুখখানাকে ধীরে ধীরে মাটী থেকে তুলে নিয়ে বল্‌লে, এখন কি কোর্‌বে মা গয়লা-বৌকে নিয়ে? তাকে ত তারা.....

তুই-ই বল্‌না প্রসাদ কি করি?

কিছুকাল শুম্ হোয়ে বসে থাক্‌বার পর, প্রসাদ বল্‌লে, আমি একবার গয়লা পাড়ায় যাব মনে মনে ঠিক কোরেছি—দেখি গিয়ে যদি কিছু কোর্‌তে পারি কিনা। এই বলে সে মুখখানিকে আষাঢ়ের জল-ভার-নম্র মেঘের মতন করে নিজের ঘরে চলে গেল।

প্রসাদকে গম্ভীর-মূর্ত্তিতে চলে যেতে দেখে—আমার প্রাণ শঙ্কাকুল হোয়ে উঠ্‌লো।

পরক্ষণেই গয়লা-বৌ কাতরস্বরে বল্‌লে, পিসিমা, ওকে বারণ করুণ ও পাড়ায় যেতে। কি জানি ছোট জেতের লোক—শেষকালে কি তারা কিছু করে বোস্‌বে, তারা গোঁয়ার—বুদ্ধি-সুদ্ধি বড়ই কম।

বৌকে আশ্বস্ত দিয়ে বললাম, বউ তোকে ওর জন্যে কিছুই ভাবতে হবে না—আমার কি সেই ছেলে প্রসাদ যে, যেখানে সেখানে গিয়ে হাঙ্গামা-হুজ্জুত বাধাবে। তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যদি কিছু কোরতে পারে—তা দেখুক না কেন বৌ?

তারা এমন লোকই নয় যে কথা শুনবে—তারী গোঁয়ার বা, তারী গোঁয়ার। মূর্খ হাবী লোক তারা পিসিমা।

অনেক বেলা হোতে চল্লো দেখে, সরলা-বৌকে বল্লুম, বা বৌ ছেলে মেয়ে ঘাট থেকে নেয়ে আয়—আজ আমাদের এখানে···

সরলা-বৌএর মুখে প্রসন্ন হাসি দেখে আমার মন আনন্দে দোহুল হোয়ে উঠ্‌ল।

অনেককাল পরে আমিও একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচ্‌লুম।

প্রসাদের কথা

সরলা-বৌকে মার কাছে বসে থাকতে দেখে, আমার প্রাণের মধ্যে এক বিষম দোলা লাগ্‌ছিল। না জানি—কত দুঃখের কাহিনী সে কেঁদে কেঁদে মাকে বল্‌ছিল। এই যে নির্য্যাতীতা নারী সমাজ থেকে তাড়িতা হোল এর এখন উপায় কি? এ এখন যাই-ই বা কোথায়? সমাজের কর্ত্তারা কি কেবল নাক ডাকিয়ে ঘুমুবে—আর বিপদের সময় সকলে মিলে ঘোঁট্ পাকাবে—যাতে তার অনিষ্ট হয়। বলিহারী—সমাজের ব্যবস্থা!

কমল কেমন সাদা কথায় মাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল—কি করে এত অত্যাচার, অনাচার, কুৎসা, গ্লানি সয়ে থাকতে পারবেন, তা ও ত বুঝিনে মা?

আমার মার অন্তঃকরণ বলে যে জিনিষটা আছে সেটা বড়ই সাদা। তিনিও এ সবের সব কথাই সাদা ভাবেই বুঝ্‌লেন। তিনি বুঝুন কিন্তু আমি—আমি ত সাদা কথায় বুঝ্‌বার ছেলে নই যে সাদা কথায় ভুলবো? এর মধ্যে নিশ্চয়ই কমলের কোন কারসাজি আছেই আছে; না হোলে কাউকে না বলে-কোয়ে হঠাৎ ক'লকাতায় চলে গেলই বা কেন আর ফিরে এসেই ভাল মানুষটির মতন বলে কিনা—আমার ও আর এখানে থাকা হবে না। কলকাতায় থাকব স্থির করেছি। এ হোচ্ছে বিরাট এক অভিযানের পূর্ব্বসূচনা মাত্র।

মাকে অনেক কোরে বলে-কোয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এখানেই থাকব তার ঠিক করেছি। দেখি কিছু কোরতে পারি কিনা।

সরলা পাড়ায় গিয়ে কোনই ফল হোল না কেবল রচনা করাই সার হোল মাত্র। তারা বলে কিনা—সরলা-বৌ জমিদারের ভোগ্যা পত্নী। এতবড় একটা মিথ্যা অভিযোগের কথা শুনে আমার মন অত্যন্তই দমে গেল। তাদের কথার জবাব মাথা-মুণ্ডু আর কি দেব। যতই তাদের বুঝাবার চেষ্টা করি না কেন ততই তারা অবুঝ হোয়ে বসে। এই ত হোল তাদের অবস্থা। ছোটলোক কিনা—কত-টুকুই বা তাদের শিক্ষা!

কলকাতা থেকে কমল এসে বল্‌লে, রহৎ নাপতের বৌ আর হরি রক্ষিতের আইবুড়ো মেয়ে-টাকে পাওয়া যাচ্ছে না। এ সব দিন্‌কে দিন হোতে চল্‌ল কি? এটা কি অরাজকের রাজত্ব হোয়ে পড়্‌ল নাকি? তা হবে ও বা। শেষকালে হয়ত' আমিও একদিন কোথায় অদৃশ্য হোয়ে যাব।

আচ্ছা, যত খবরই কি কেবল ঠাকুর্দ্দা ও কমলের কাছেই আসে। যারা ঐ সব খবর দেয়—তারা কি আর ঐ দুটো শয়তান ছাড়া অন্য লোক খুঁজে পায় না? এত বড় আশ্চর্য্য! এর কি কোন একটা ব্যবস্থা করা যায় না? ব্যবস্থা ত কোরব—কিন্তু কাকে নিয়ে? সবাই ত কমলের মত লোক—বিশ্বাস করি কাকে?

মা যেন মেয়েলি বুদ্ধিতে কমলকে বিশ্বাস কোরে ফেলেছেন—আমি ত তাকে চিনি। কমল কি

কম বড়িবাজ—সে এক মস্ত খেলোয়াড়। জল-কাতায় যে বাসা করা হোল—সেটা হবে তার লীলাভূমি। এ আর আমি বুঝি না—এতই অবুঝ আছি; সে ছেলে আমাকে পাওনি টাঁদ?

এই যে রমণ নাপতের বৌ, আর হরি রক্ষিতের বিবাহযোগ্যা মেয়েটাকে পাওয়া যাচ্ছে না—এটা কি তাদের দ্বারা হয় নি। নিশ্চয়ই তারা এর মধ্যে আছেই আছে—নচেৎ আস্ত জল-জ্যান্ত দুটো মেয়ে মানুষ ঘর থেকে দিনদুপুরে উধাও হোয়ে যায়? আমাকে কি এতই বোকা ঠাওরেছে তারা যে যা তা দিয়ে বুঝিয়ে দেবে, তখনই তা' সব জলের মতন বুঝে যাব?

আমি মনে মনে যা ঠাওরেছি তাই-ই ঠিক। এ গ্রাম থেকে একবার আমাদের তাড়াতে পারলে, তাদের কার্য্য-সিদ্ধির পথে কোন ব্যাঘাতই ঘোটবে না। তাকি হয়—রাখে হরি মারে কে?

এই সব বিচ্ছিন্ন-চিন্তার মাঝখান দিয়ে যখন মন্থরপদে চলছি; এমন সময় মা ঘরে ঢুকে বল্লেন, ওরে প্রসাদ, কি কোরছিস বাবা একলা ঘরে বসে?

চম্‌কে গিয়ে বল্লাম, কি আর করব মা—এমনিই বসে আছি।

মা গয়লা-বৌএর ছবিখানা দেখে ফেলেছেন নাকি—তা' হলে ত বড়ই কেলেঙ্কারীর কথা? কি করি এবং কোথায়ই বা এ খানাকে রাখি। এযে আমার ব্যথিত হৃদয়ের সান্ত্বনা। হৃদয়ের রক্ত তিল তিল কোরে দিয়ে তবে এই অঙ্গপ্রাবিতাও উৎপীড়িতা নারীর ছবিখানা এঁকেছি। এত ছবি নয়—এ যে গয়লা-বৌএর জীবন্ত নকল মাত্র।

যখনই গয়লা-বৌএর অশ্রুবিচলিতা-করুণা মুখখানির কথা মনে পড়ে, তখন আমার মনের মধ্যে সহস্র বৃশ্চিক দংশনের মতন তীব্র জ্বালার উদয় হয়। হায় অভাগিনী, সমাজপরিত্যক্তা, পরপদলাঞ্ছিতা, নির্য্যাতীতা নারী—তোমাদের পাদস্পর্শে কি ধরণী জেগে উঠ্‌বে না—তোমরা কি কেবলই ধর্ম্মাণের মন্ত্র দিয়েই তোমাদের জীবনের অবশিষ্টকাল কাটাবে—তোমরা কি জাগ্‌বে না—তোমরা না জাগ্‌লে এ বাংলাদেশ পুড়ে ছাই হোয়ে যাবে।

অনেকদিনের পর ছবিখানাকে নিয়ে বসেছিলুম, আঁকতে নয়, ভাবতে। যে এত কাছে, দিন রাত মায়ের পাশে এই ঘরেরই একটি বধূর মত থাকে চোখে দেখ্‌ছি, তার ছবিটা অসম্পূর্ণ রাখ্‌তেও চলত কিন্তু তার ছবি অসম্পূর্ণ রাখা বলে না যার সম্পূর্ণ মূর্ত্তি দেখবার জন্যে নিয়ত অন্তরের মাঝখানে একটা আকুলতা কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছিল। সে ত গয়লা বৌ নয়, সে কোন নারী, সমাজ পরিত্যক্তা, গৃহ বিতাড়িতা, লাঞ্ছিতা, পরপদাশ্রিতা নারী! ইরানীর গয়লা বৌ-এর চোখ শুধুই থাকতো কিন্তু আমার মনের পাতায় তার যে দুটি চোখ সে দুটি যেন, সদ্যতুলে জল-ভরা পদ্মের মত! আজ কাল যা'র কথাবার্ত্তায় সে একটু আধটু হাসে দেখ্‌তে পাই, কিন্তু আমার মনে যে একখানি তার ফোটো আছে, সেই ফোটোর মুখে আমি হাসি খুঁজে পাই নে। ব্যথায় ভরা, বেদনায় ম্লান, আর্ত্ত, আর্দ্র চোখের সামনে তা'কে আমি দেখ্‌তে পাই, যেদিকে থাকে সে, যেতে পারি নে, যেতে চাই—অথবা চাই-নে ঠিক বুঝি নে, যাই না। যাওয়াটা যেন দোষের নয়, তবুও দোষের; চাওয়াটা অসঙ্গত নয়, তবু যেন সঙ্গত নয়—এমনি মনে হয়। অথচ তা'কে না দেখেও থাকতে পারিবে না, তাই আমাকে নির্ভর করতে হয় আমার মনটির, পরে। যেখানে তার ছবি নিখুঁত করে এঁকে গেছে—এঁকেছে কে—কে জানে! সেই ছবিটা থেকেই এই ছবিটা আঁকছি। ছবিটা শেষ হ'লে যেন বাঁচি। প্রতি কথায়, প্রতি মুহূর্ত্তে আর মন হাঁউফাঁউ করতে পারি নে, এই ছবিটা দেখেই কাটাতে পারি।

তুলিটা মুখে রেখে গোলা রঙে ডুবতে ডুবতে

মুখ তুলেছি, দেখি, আমবাগানের মাঝের সরু পথটি দিয়ে সিক্ত বসনে, সিক্ত কেশে, কলস কক্ষে সে-ই আসছে। তখনো অনেক দূরে ছিল, আমাকে সে পায় নি, নিজের পায়ের দিকে চেয়ে আপন ভরে আসছে—আমি জানি—না জানি—না কেন জানি, অন্ধকার—তবুও পারলুম না সেটুকু লোভ সম্বরণ করতে—সিক্ত বসন দেহে আদরে তা'কে এমন করে বেষ্টন করে আছে, এমন আত্মহারা হ'য়ে তারই সঙ্গে আত্ম গোপন করেছে না দেখে আমার এত কালের তুলি ধরাই বৃথা মনে হ'ল। চকিতে বিফল চিত্র-খানার দিকে চেয়ে চোখ তুলেছি, গয়লা বৌর চোখে মিলে গেলো!—তখনি বঙ্গ রমণীর স্বভাবসিদ্ধ সে কি সুগভীর লজ্জায় তার দেহটি কেঁপে উঠ্‌লো যে আমারই চোখ মুদে এলো! অপকর্মটা যে কত বড় ঠিক তখনই বুঝতে পারলুম যখন গয়লা বৌ কলস নামিয়ে আপন বসন ঠিক ক'রে নিয়ে, অবগুণ্ঠন আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে আবার অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লো!

কি ভাবলে আমায়—কে জানে, মোড়টা ঘোরবার আগে আর একবার সেই দৃষ্টিটা তুলে আমাকে দেখে চলে গেলো।

অপকর্ম্ম যত বড়ই হোক্; তার জন্য যতখানি পাপই আমার ভাগ্যে সঞ্চিত হয়ে থাক্, তখন আমার সে কথা আর মনে রইল না। আমার মনে শত উজ্জ্বল দৃশ্যের মত সেই চোখ দু'টিই ভাস্‌তে লাগ্‌লো, আর মনে হতে লাগলো যে যা'কে দেখে সর্ব্বস্ব দান করে নিঃস্ব হ'তে ইচ্ছা হয়, তারই সর্ব্বনাশ করতে পারে যারা, তারা কত বড় হৃদয়হীন, কতবড় অমানুষ!

(ক্রমশঃ)

অগ্রহায়ণ মাসের পূজারী—শ্রীযুক্তা লীলাদেবী।

যুবক সম্মিলনীতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ছাত্রেরা বলে, ছুটীর সময় তারা কি করিবে; বাড়ী যাইয়া তাহারা দেশের দরিদ্র কৃষক সন্তানদিগকে বিদ্যা-শিক্ষা দিতে পারে না? কর্ম্মের সে আগ্রহ কোথায়? নাইট স্কুল করার জন্য আমি বিজ্ঞান কলেজের বারান্দাগুলি ছাড়িয়া দিয়াছি—সেখানে কয়েকজন ছাত্র রাত্রিকালে দরিদ্রগণকে লেখাপড়া শিখাইয়া থাকে। তোমরা যে লেখাপড়া শিখিয়াছ, তাহার দ্বারা দেশের লোকের কি উপকার হইল? দেশের লোকের কাছে তোমরা কি বলিয়া জবাবদিহী করিবে? তাহাদিগকে সকল প্রকারে শিক্ষা দান করা কি তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে? তোমরা ঐ কাজ না করিলে তাহাদের লেখাপড়া শিখাইবার আর কে আছে? সম্প্রতি আমি একটী ছাত্রাবাসে গিয়াছিলাম। কলিকাতার মেসগুলি কিরূপ—সেই কথাই বলিব। তিনি লক্ষ টাকা খরচ করিয়া ঐ বাড়ীটি তৈয়ারী করা হইয়াছে—বাড়ীটিতে না আছে আলো, না আছে বাতাস। উহার মধ্যে থাকিলে ছেলেদের কর্ম্মশক্তি যে কমিয়া যাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কলিকাতায় পশুদের প্রতি অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য একটী সমিতি আছে, আমার মনে হয় মেসের ছাত্রগণের ঐ

সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। ছাত্রগণের মধ্যে তথা যুবকগণের মধ্যে কেবল নির্জ্জীবতা ও অবসাদ। রবিবার সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া আমি স্কুলিয়া ষ্ট্রীট প্রভৃতি পাড়ার ভিতর দিয়া যাই। দেখি পথের দুই ধারের রকে আবালবৃদ্ধ সব বসিয়া আছে—বনিতারা এখনও ঘরের বাহির হইতে শেখেন নাই, তাই তাঁদের ঐ সকল রকে দেখিতে পাই না। তাহারা কেহ এক পাও নড়িবে না, ঐ ভাবে বসিয়া থাকিলে কি করিয়া লোকের মন ও দেহ পুষ্টি লাভ করিবে? শতের একদিন বাদলা বৃষ্টি না থাকিলে আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বাহির হইয়া পড়ে, তখন হাইড পার্ক, কিন্স্ পার্ক প্রভৃতি স্থানে আর লোক ধরে না। আজ ১২।১৩ বৎসর প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে আমি ময়দানে বেড়াইতে যাই, কিন্তু ফুটবল খেলার দিন ছাড়া অন্য কোন দিন মাঠে বেশী লোককে বেড়াইতে দেখি না। শুধু বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে লোক ফুটবল খেলা দেখিতে যায় এবং খেলা হইয়া গেলে সেই কথার তর্ক ও সমালোচনা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসে। এত বড় সবুজ মাঠ পড়িয়া রহিয়াছে—কেহই যায় না। রবিবার দিন ফুটবল খেলা থাকে না সেদিন মাঠ তো মরু ভূমির মত জনশূন্য হইয়া থাকে। কোন কাজ না করিয়া লোকের সৌন্দর্য্য উপভোগের শক্তিও কমিয়া গিয়াছে। জীবনে যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করাও একটা কাজ, তা আজ তাহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনে আসিয়া স্যার মাইকেল স্যাডলার বলিয়াছিলেন—এতগুলা কলেজ দেখিয়া আসিলাম কিন্তু বলিতে বড়ই দুঃখ হয় যে বাঙ্গালীর ছেলের মুখে হাসি দেখিলাম না। সকলের মুখই কেমন একটা বিষাদময়, যেন তিনটা অবিবাহিতা মেয়েকে পার করিতে হইবে। কেন এমন হইবে? জীবনে স্ফূর্ত্তি চাই, গলা ভরা হাসি চাই। কাজ না করিলে ঐ সব কিছুই আসে না। জীবনটা ভোগ করিতে হইলে সকলকে কাজ করিতে হইবে। গড়পড়তা বাঙ্গালী যুবকেরা যা কাজ করে, তারা তার দশগুণ কাজ করিতে পারে।

তারপর সমাজ-সংস্কারের কথা। বরিশালের অশ্বিনীবাবু একটা কথা বলিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশের ছেলেপুলেদের পিতৃমাতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—বিবাহের সময়। অনেক এম, এস, সি, পাশ করা ছেলেও আমার কাছে আসিয়া বলিয়া থাকেন—কি করিব বলুন, মা বাপকে কি কষ্ট দিতে পারি—এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। আমি বলিয়াও থাকি। বলি যে, এখন বুড়াবয়সে আমার সব আইন বদলাইয়া গিয়াছে—ক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্—এই নীতি গ্রহণ করিয়াছি।

"একজন ছাত্রকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তুমি সকল স্থানে সকল লোকের হাতের খাবার খাইয়া থাক? সে উত্তর করিল—হাঁ স্যার, সব খাইয়া থাকি, কিন্তু একটি কথা আছে! সামাজিক নিয়মে ভিন্ন জাতির সহিত একত্র বসিয়া খাইতে পারি না।

ঐ খানেই তো দোষ। আমরা সব কাজ করিব, কিন্তু তার মধ্যে গোঁড়ামি ও ঘণ্টেষ্ট রাখিব। অধ্যাপকগণ নিম্ন জাতির হাতের জল খান না, কিন্তু অনেক স্থানে আমি নিজে দেখিয়াছি, যে জলের পাত্রে বরফ দেওয়া থাকে, সেই পাত্র হইতে জল খাইতে তাঁহাদের কোন আপত্তি থাকে না। বরফ খাইতে কোন দোষ নাই, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকের হাতের জল খাইতে যত দোষ।

(ক্রমশঃ)

শোক সংবাদ

গত ২৯শে আশ্বিন সোমবার ধরিত্র-সৌরমণ্ডলের অপর একটি জ্যোতিষ্ক "উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম" কাব্য রচয়িতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় চিরদিনের জন্য কক্ষচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্যে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা কবে কাহার দ্বারা পূর্ণ হইবে বলিতে পারি না।

গত বিজয়া দশমীর দিবস সাহিত্য-রথ স্কুদেব চন্দ্রের পৌত্রী ইন্দিরা দেবী ৪৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। পিতামহের পদপ্রান্তে বসিয়া তিনি যে হিন্দু আদর্শের চিত্র দেখিবার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিলেন, উত্তর কালে তাহাই তাঁহার গল্পে ও উপন্যাসে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যে কয়জন মহিলা শিক্ষিতা বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি কল্পে প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

গত ১২শে আশ্বিন শুক্রবার বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক সুলেখক যতীন্দ্রনাথ পাল ৩৪ বৎসর বয়সে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তিনি অল্পদিনের ভিতর প্রায় শতাধিক পুস্তক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

ইঁহাদের অকালমৃত্যুতে বঙ্গভাষাভাষী সকলেই শোক সন্তপ্ত। আমরা ইঁহাদিগের সন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and
Published by P. N. Pal. 26-3 Scott Lane, Calcutta.

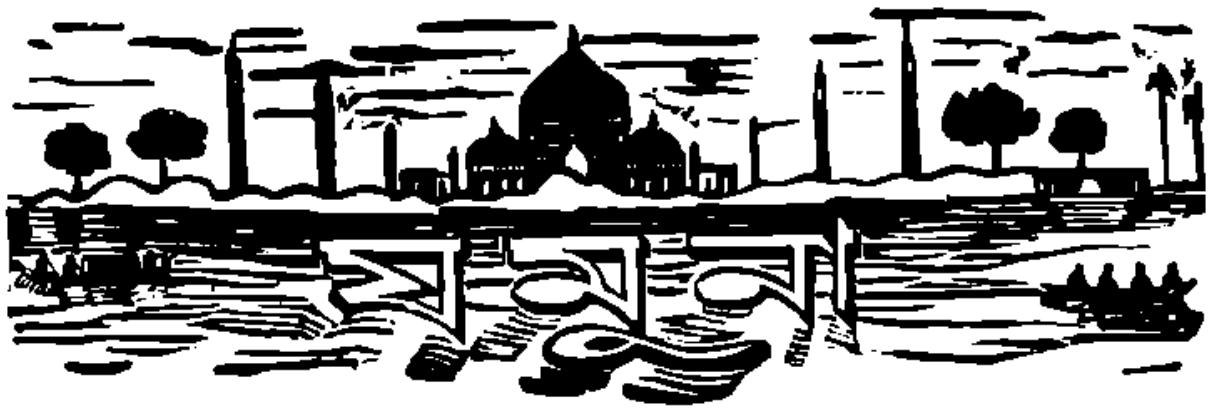

১২শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ ১৩২৯ | ৮ম সংখ্যা

দেব-তত্ত্ব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[অধ্যাপক শ্রীঅমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ]

বিগত চৈত্রমাসে আমরা ত্রিদেব সম্বন্ধে প্রস্তাব মাত্র উত্থাপন করিয়াছিলাম। এই ত্রিদেবের ও অন্যান্য দেবের তত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটা বিষয়ের আলোচনার দরকার। মানুষ দেবতাকে উপাসনা করে কেন সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রসঙ্গে দুটা কথা বলিব।

মানুষ যখন আপনা হইতে অন্য কোন প্রবল শক্তির অনুভব করে, তখন স্বভাবতঃই সে তাহার নিকট আপনাকে অবনত করিয়া তাহার আশ্রয় প্রার্থনা করে। ইহা মানুষের স্বাভাবিক ভাব। এই ভাবে মানুষ প্রবল শক্তির নিকট আত্ম-নিবেদন করে। এ হিসাবে উপাসনা ব্যাবহারিক ধর্ম্মেরই অন্তর্গত। বহুদিক্ দিয়া বহু ভাবে উপাসনার বিকাশ হয়। বিশ্বাসের দিক্ দিয়া পৌরাণিক উপাখ্যান হইতে দর্শন পর্য্যন্ত, প্রচলিত ধর্ম্মমত হইতে বিজ্ঞান পর্য্যন্ত, কল্পনার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইতে সত্যের প্রতি সম্মান পর্য্যন্ত ইহার প্রসার। বৃত্তির দিক্ দিয়া দেখিলে কোন কোন মনুষ্যে উপাসনা-প্রবৃত্তির অভাব দেখা যায়। সীমা নির্দ্ধারণপূর্ব্বক উপাসনার পাত্র সম্বন্ধে অবধারণ করাও যায় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রবল শক্তির নিকট মানুষ আত্ম-নিবেদন করে। সেই প্রবল শক্তিকে অনুকূল করিবার জন্য যে বাহ্য চেষ্টা বা অনুষ্ঠান তাহার নাম কর্ম্ম। যাগ যজ্ঞাদি যত কিছু ব্যাপার সমস্তই ইহার অন্তর্গত। পরে অধ্যাত্ম-তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিকাশে এ সকল কর্ম্ম বা অনুষ্ঠানের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করা

ষের প্রতি বিশ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে কোন প্রকার অনুষ্ঠান পৃথিবীর কোন অংশে বহুকাল ধরিয়া প্রশ্রয় পাইতে পারিত না। পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন সকল মানব এক গূঢ় সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ ও সচরাচর বহু মানব একটী মানবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। কোন জাতির মানবের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তাঁহার মনের ভাব, সেই সমগ্রজাতির মনের ভাব। একজন প্রতীচ্য মনীষী বলিয়া গিয়াছেন যে, কোন জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে সমগ্র জাতিটীর মনের ভাব জানিতে ও সেই জাতিটীকে চিনিতে পারা যায়। শ্রেষ্ঠ মানবের ভাব ও জ্ঞান সমগ্র জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। শ্রেষ্ঠ মানবসকল ঈশ্বরের ভাব-ও জ্ঞান-সঞ্চালনের প্রণালী। প্রথমে একটী মানুষ জ্ঞানী হয়, তার পর সকল মানুষ সেই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। শ্রুতি, শ্রেষ্ঠ মানব সকলের সঞ্চিত জ্ঞানরাশি। প্রাচীন আর্য্য হিন্দুরা শ্রুতি বিস্মৃত হইতে সাহস করিতেন না। শ্রুতি-লোপ বিষম দুর্দ্দৈব বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। সকল জাতিরই tradition আছে। সকল জাতিরই বিশ্বাস, তাহা ঈশ্বরের বাণী।

মানুষ প্রথমে নিজের উপর নির্ভর করিয়া দেখে। কিন্তু যখন সে দেখে তাহার শক্তি অকিঞ্চিৎকর, তখন সে অপরের উপর নির্ভর করিতে যায়। অপরের উপর নির্ভর করিয়া যখন সে সন্তুষ্ট হইতে পারে না, তখন সে অতিপ্রাকৃত কোন শক্তির উপর নির্ভর করিবার প্রয়াস পায়। নিজ শক্তিতে না কুলাইলে কোন না কোন অবলম্বন অন্বেষণ করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মানুষের অবলম্বন অন্বেষণ করিবার প্রবৃত্তি কেন হয়, কোথা হইতে হয়? বিনা অবলম্বনে কিছুই থাকিতে পারে না, মানুষের অন্তরের অন্তস্তরে এই জ্ঞান আছে। যখন আমি আছি, তখন আমারও অবলম্বন করিবার কিছু আছে। যদি আমি বিনা অবলম্বনে থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে, আমি অবলম্বন অন্বেষণ করিতাম না। আমি যে অবলম্বনের অন্বেষণ করি, ইহাতেই বুঝিতে হয়, আমি অবলম্বন-শূন্য হইয়া থাকিতে পারি না।

বলা যাইতে পারে, আমার অবলম্বনের কোন প্রয়োজন নাই। আমিই আমার অবলম্বন। আমি যে অবলম্বন খুঁজি তাহা কেবল আমি আমার স্বরূপ বুঝি না বলিয়া। আমার সুখ দুঃখ আমি অবিদ্যাবশতঃ সৃষ্টি করি, এবং এই সুখ দুঃখের সঙ্গে পারমার্থিক ভাবে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং সুখ দুঃখের ধারণা আমি বর্জ্জন করিতে পারি। আমি মুক্ত হইতে পারি। সে অবস্থায় আমার কাহারও উপর কোনরূপ অবলম্বন করিতে হয় না।

কিন্তু সুখ-দুঃখময় জীবনের সঙ্গে যদি আমার পারমার্থিকভাবে সম্বন্ধ থাকে, এবং আমার সুখ দুঃখের কারণ আত্মাতিরিক্ত অপর কিছুতে যদি নিহিত থাকে, তাহা হইলে আমাকে নির্ভরশীল হইতে হয়। কিন্তু আমার সুখ-দুঃখময় জীবনের কারণ-রূপে জ্ঞানময় চৈতন্যময় যদি কেহ না থাকে, যদি অন্ধ জড়-শক্তির প্রভাবেই আমার সুখ দুঃখময় জীবন সম্ভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার তাহার উপর একান্ত নির্ভরশীল হওয়া বৃথা প্রয়াস। ঘটনাচক্রে যাহা হইবার তাহাই হইবে। সে অবস্থায় আমার কি করা কর্ত্তব্য? সে অবস্থায় বুদ্ধিপূর্ব্বক ঘটনাস্রোতকে আমার অনুকূলে ফিরাইতে হয়। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমার বুদ্ধি আমার আয়ত্তের মধ্যে নাই; এই বুদ্ধি ঘটনাচক্রে আমার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ঘটনাচক্রে যে বুদ্ধি আমার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, ঘটনাচক্রে তাহা আবার আমা হইতে বিযুক্ত হইতে পারে। ঘটনাচক্রে আমি উপস্থিত যে বুদ্ধি পাইয়াছি, তাহার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সেই বুদ্ধির যতটুকু শক্তি, তাহা দ্বারা ঘটনাস্রোতকে যতটুকু আমার অনুকূলে ফিরাইতে পারা যায়, আমি কেবল ততটুকুই ফিরাইতে পারি। যদি বুঝা যায় যে, আমার জন্মের পূর্ব্ব হইতে এই বুদ্ধির সূত্রপাত

হইয়াছে, এবং আমার মৃত্যুর পরেও এই বুদ্ধি অতি সূক্ষ্মাকারে আমার সহিত সংযুক্ত থাকে, তাহা হইলেও এই বুদ্ধি আমার আয়ত্তে নাই, ইহা ঘটনা-স্রোতেরই আয়ত্ত। আমাকে সে অবস্থায় ঘটনা-স্রোতের উপর নির্ভর করিতে হয়। সে অবস্থায় আমার আরাধনা-প্রবৃত্তি নিরর্থক। অন্ধ প্রকৃতির ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া আমার গতি যাহা হইবার তাহাই হইবে। হিন্দু এ অবস্থায়ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয় না। হিন্দু দর্শনের মূলমন্ত্র এই যে, প্রকৃতি প্রকৃতির কার্য্য করুক, তাহাতে বিমূঢ় বা অবশ হইবার প্রয়োজন নাই। আত্মার প্রকৃতিজ সুখ দুঃখের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আত্মার বিমুক্তি সাধন করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা হৃদয়ঙ্গম করাও বুদ্ধি বা জ্ঞানের কার্য্য। এই বুদ্ধি বা জ্ঞান যদি আমার আয়ত্তে না থাকে, তাহা হইলে এই বুদ্ধি বিলুপ্ত হইলে, আমি আবার প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইব। কিন্তু হিন্দু দার্শনিক প্রকৃতির সহিত নির্লিপ্ত ভাবই মুক্তির সাধক বলিয়া মনে করেন। এইরূপ মনে করিবার মূলে একটা কিছু আছে। তাহা এই যে, হিন্দুর বিশ্বাস, প্রকৃতি একদিকে যেমন আত্মার বন্ধনের কারণ, তেমনই আবার অপর দিকে মুক্তির সহায়তা করিয়া থাকে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে আত্মার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ নিত্য ও চিরস্থায়ী। প্রকৃতি আত্মার বন্ধন ও মুক্তির কারণ এ কথা বলিলে বুঝিতে হয় যে, প্রকৃতি প্রথমে আত্মাকে বন্ধন করে, এবং তাহার পর আত্মার মুক্তির পথ হয়। বন্ধনের পূর্ব্বে আত্মার প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে, প্রকৃতি আত্মাকে বন্ধন করিতে পারে না, প্রকৃতিজ তত্ত্বজ্ঞানের অভাব হইলেও আত্মার মুক্তির সার্থকতা থাকে না; সুতরাং বুঝিতে হইবে প্রকৃতির সহিত আত্মার নিত্য সম্বন্ধ। কিন্তু আত্মা চেতন, প্রকৃতি জড়। চেতন জড়ের আশ্রয়ে আছে এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, প্রকৃতি আত্মার কার্য্যের সুবিধার জন্য যন্ত্রস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রকৃতি আত্মার মায়াশক্তি। কিন্তু দেখা যায় যে জীব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশে আনিতে অক্ষম। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, জীব আত্মার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি নহে। আত্মার আর একটা দিক্ আছে, যাহা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখিয়াছে। হিন্দু দার্শনিকের মতে তাহাই ঈশ্বর। জীবভূত আত্মা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল হইতে পারে।

হিন্দুর আরাধনা-প্রবৃত্তির মূলে এই নির্ভরশীলতার ভাব আছে। শুধু হিন্দুর নহে, সকল মানব-জাতিরই আরাধনা-প্রবৃত্তির মূলে নির্ভরশীলতার ভাব আছে। আপনার শক্তিতে না কুলাইলে মানুষ প্রথমে এক অচিন্তনীয় অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর নির্ভর করে। ইহা মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ। আমরা আপাততঃ শুধু তত্ত্বটুকু জানি। কিন্তু এই নির্ভরশীলতার মূল-ভিত্তি কোন সত্যের উপর অবস্থিত কি না, তদ্বিষয়ক জ্ঞান বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। আমাদিগকে প্রথমে বিদিত তত্ত্বগুলিকে পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে, তারপর সেইগুলিকে সাজাইয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।

একজন ইয়ুরোপীয় মনীষী বলিয়াছেন, ভয় হইতে আরাধনা-প্রবৃত্তি উদ্ভূত হইয়াছে। মানুষ নানা প্রকার নৈসর্গিক বিপদের আশঙ্কায় আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। যখন বিজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয় নাই, তখন মানুষ বুদ্ধিবলে নৈসর্গিক উৎপাত হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রয়াসী ছিল না। তখন মানুষ আশঙ্কাবশতঃ নানা নৈসর্গিক শক্তির ভজনা করিত। সরলতাবশতঃ নৈসর্গিক শক্তিগুলিকে তাহারা ব্যক্তিত্ব-ও চৈতন্যযুক্ত মনে করিত। ক্রমশঃ তাহারা সকল শক্তিগুলিকে এক প্রধান শক্তির বশবর্ত্তী ধারণা করিতে লাগিল। কাহারও কাহারও মতে যে সকল দেব নিষ্ঠুর-প্রকৃতি ও ধ্বংসশীল তাহাদিগেরই ভজনায় মানুষের প্রথম প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু

এ মত অন্য সকল ক্ষেত্রে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও হিন্দুর ইতিহাস এ মতের সবিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া মনে করে না।

হিন্দুদিগের অনুষ্ঠান নিত্য ও নৈমিত্তিক প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত। নিত্যক্রিয়া মানুষের অবশ্য করণীয়, নৈমিত্তিক ক্রিয়া অনুষ্ঠাতার প্রয়োজন ও ইচ্ছা সাপেক্ষ। এই অনুষ্ঠান নানাভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে। হিন্দুরা যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, উপাসনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

হিন্দুদিগের যজ্ঞ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর যজ্ঞকে নিত্যকর্ম, আর এক শ্রেণীর যজ্ঞকে নৈমিত্তিক কর্ম বলা হয়। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানও আছে। প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান প্রায়ই যজ্ঞকার্য্যে ভ্রম প্রমাদ ঘটিলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায়শ্চিত্তকে যজ্ঞের অঙ্গ বলা যাইতে পারে না। ইহা একটী অতিরিক্ত অনুষ্ঠান। শাস্ত্রে ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। দেবতাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক অনুষ্ঠানের কথা শুনা যায় না, এবং যাচ্ঞা-সূচক প্রার্থনা-সূচক অনুষ্ঠান খুব কমই অনুষ্ঠিত হয়। দেবগণ স্ব স্ব যজ্ঞভাগ লইবার জন্য আহূত হন। তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা বা তাঁহাদিগের নিকট কোনরূপ প্রার্থনা জানান হয় না। যজ্ঞে দেবতা-দিগকে মন্ত্রবলে সাহায্য করিতে বাধ্য করা হয়। জাতিতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে মানব-জাতির আদিম উপাসনা নৈতিক ভাব-বর্জ্জিত; কারণ আদি মানবেরা আত্মরক্ষা ও স্বার্থসাধন-উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া উপাসনা করিত। হিন্দুর যাগ যজ্ঞাদির মূলেও অনেক য়ুরোপীয় পণ্ডিত নৈতিক ভাবের অভাব দেখিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুর পুরুষমেধ ও সর্ব্বমেধ সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগসূচক যজ্ঞ। এই দুই যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ সর্ব্বস্ব-ও সংসারত্যাগী হন।

হিন্দুদিগের যাগ যজ্ঞ ও ক্রিয়া-কলাপের উদ্দেশ্য দেবগণ ও পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করা। হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে তাঁহাদের নিজেদের যেমন দেব-ও পিতৃ-গণের সাহায্যের প্রয়োজন, দেবগণ ও পিতৃগণেরও সেইরূপ তাঁহাদের সাহায্যের প্রয়োজন। দেবগণ স্বর্গে ও পিতৃগণ অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া পৃথিবীস্থ মানবের শুভ সম্পাদন করেন, সেইজন্য মানবগণ তাঁহাদের নিকট ঋণী। মানবগণের দেবঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ করা কর্ত্তব্য। শুনা যায় প্রাচীন কালে মানবগণ পূর্ব্বপুরুষদিগের পূজা করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পর-লোকে থাকিয়া অসন্তুষ্ট হইলে ইহলোকবাসী মানব-গণের অমঙ্গল ও সন্তুষ্ট হইলে মঙ্গল বিধান করেন। তাহারা ইহলোক হইতে অপসৃত পূর্ব্বপুরুষদিগকে ভয় করিত। তাহারা ভয়বশতঃ পূর্ব্বপুরুষদিগের সন্তোষ বিধানে সচেষ্ট থাকিত। অনেকের অনু-মানে হিন্দুদিগের পিতৃকার্য্যের প্রবৃত্তির ইহাই কারণ।

কিন্তু পিতৃগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পাছে অনিষ্ট সাধন করেন এইভয়ে তাঁহাদিগকে পূজা করা বা তাঁহা-দিগকে সন্তুষ্ট করা এক ব্যাপার এবং হিন্দুদিগের পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠান করা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যাপার। হিন্দুরা পিতৃঋণ পরিশোধার্থ পিতৃকার্য্য করেন। হিন্দুদিগের পিতৃকার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। হিন্দুজাতির ধর্ম্মভাবের সহিত অন্যজাতির ধর্ম্মভাব মিশ্রিত আছে, একটু অনুসন্ধান করিলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তবে খাঁটি হিন্দু ভাবকে বাহির বাহির করাও যায়। খাঁটি হিন্দু ভাবটা কি দেখা যাউক। হিন্দুদিগের বিশ্বাস, দেহ বিনষ্ট হইলে, মানুষ মরে না। মানুষ দেহ নহে, মানুষ আত্মা। মানুষ ভৌতিক দেহ অবলম্বন করিয়া ভৌতিক জগতে শক্তি সঞ্চয় করে, এবং সেই শক্তিবলে তাহার স্বর্গভোগ হয়। যে শক্তিতে মানব স্বর্গভোগ করে করে, তাহাকে পুণ্য বলে। পুণ্যক্ষীণ হইলে পুনরায় তাহাকে মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়। পিতার উদ্দেশ্যে পুত্র এমন কতকগুলি পুণ্যকার্য্য করিতে পারে যাহাতে পিতার ঊর্দ্ধগতি হয়। হিন্দু সেইজন্য

সংপুত্র কামনা করে। ইহলোকে যেমন শরীর পোষণের জন্য খাদ্য প্রয়োজন, পরলোকেও পিতৃগণের, তাঁহাদের সূক্ষ্মশরীর পোষণের নিমিত্ত খাদ্যের প্রয়োজন। হিন্দুর সকল শাস্ত্র বেদমূলক। বেদ আর্য্যদিগের শাস্ত্র। আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন জিনিস শিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের ধর্ম্ম অনার্য্যভাবাপন্ন হয় নাই। অনার্য্যদিগের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্ম আর্য্যদিগের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মকে সম্প্রসারিত করিয়াছে। সকল মানবজাতির মধ্যে সাধারণ কিছু আছে। দেশ, কাল, পাত্রভেদে সেই সাধারণ কিছু নানাজাতিতে বিভক্ত হইয়া আছে। জাতিসকলের মধ্যে যেমন সাধারণ কিছু আছে, তেমনই অসাধারণ কিছুও বিশেষ বিশেষ জাতিতে বিশেষ বিশেষ আছে। সেই সাধারণ কিছু জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। আর্য্যধর্ম্ম যদি অনার্য্য ধর্ম্ম হইতে সাধারণ সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আর্য্যজাতি অনার্য্যজাতির ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না। হিন্দু ধর্ম্ম সম্প্রসারিত আর্য্যধর্ম্ম। ইহা অনার্য্য-মিশ্রিত আর্য্যধর্ম্ম নহে।

একটি কথা কও

(শ্রীলীলা দেবী)

তোমার কথা শুনতে আমার
কতই যে সাধ যায়
কাণ রাখি তাই বাইরে ঘরে
রাঙন আকাশ গায়
শুনতে তোমার পায়ের চলায়
শিউলি ঝরা তরুর তলায়
দিন দুপুরে সাঁজ নিরালায়
উদাস হিয়া হায়!

বাঁশের বনে শন্ শন্ শন্
হাকে যখন মত্ত পবন
দেবদারু ও অশোক যখন
মর্ম্মরিত কায়
তখন আমার সকল পরাণ
তোমার দিকেই ধায়!

ঐ কি কথা কইলে তুমি
ঐ কি তোমার সুর?
মেঘলা দিনের বাদলা হাওয়ায়
যোগান ভর পুর?
ঝুলন দোলা দোদুল দোলে
কেয়ার বনে নীপের কোলে
দোলায় সে ঢেউ উতরোলে
গাও কি সুমধুর?

একটি কথা কও হে তুমি
একটী কথা কও
একটু খানি দাঁড়াও কাছে
একটু থেমে রও
তারার পানে একলা চেয়ে
শুনছি তুমি যাও যে গেয়ে
ঐ তটিনীর হিলোল বেয়ে
বাণী তোমার বও
কও হে তুমি আমার সনে
একটা কথা কও!

বংশের কলঙ্ক

(শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার বসু)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বিদেশে

কাশীরূপ হিন্দুর পঞ্চম পবিত্র তীর্থ, এমন পীঠস্থান বঙ্গদেশে অতি অল্পই আছে। একটী সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী যুবক সেই তীর্থের দেবস্থানাদি দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিতেছিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা। পাণ্ডা, পাণ্ডার গোমস্তা চাকর, দাসাল, দোকানী পশারী, বাঙ্গালী ভিখারী প্রভৃতি বিস্তর লোক তাহার অনুগমন করিতেছিল। তাহার কারণ এই যে, বহুদিন তাহারা এমন শিকার হস্তগত করিতে পায় নাই। ইহার মত দলে (অর্থাৎ বোকা) যাত্রীর অস্তিত্ব যে একালে সম্ভব, তাহা তাহাদের ধারণাই ছিল না। পাণ্ডা যাহা চাহে তাহাই সে দেয়, দোকানী মাল বেচিয়া যে দাম চাহে সে তাহাতে দর দস্তুর না করিয়া সেই দাম ফেলিয়া দেয়। দোকানী তখন বিস্মিত হইয়া অতিরিক্ত রাহাজানিটা ফিরাইয়া দিতে যায়, তখন সেই হাস্যানন যুবকের মুখ গম্ভীর হয়, সে জিনিষ তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া দিয়া চলিয়া যায়? জিজ্ঞাসা করিলে বলে 'যে এক মুখে দুই কথা বলে, তার সঙ্গে আমার কারবার চল্‌বে না'। পাণ্ডার গোমস্তা চাকরে যা বকসিস তার কাছে পেয়েছে, তা বোধ হয় নবাবে হুমায়ে কোন রাজা রাজড়া এলে পায় কি না সন্দেহ। এমন বাবুর সঙ্গে সঙ্গে বাজার শুদ্ধ লোক ছুটিবে না ত' কি?

পাঠক! কে এই সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী যুবকটী, চিনিলেন কি? এই যুবকই আমাদের সেই বকুল-বাগানের অরুণকুমার। সে এইবার সত্য সত্যই কোটিপতি পিতার রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকার আরাম ও বিলাস ছাড়িয়া আসামের জঙ্গলে আসিয়াছে। আসিবার কালে পুত্রবৎসল পিতা বিদেশে পুত্রের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য খানসামা চাকর রসুইয়া বামুনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্র কিছুতেই লোকজন লইয়া যাইতে সম্মত হইল না। কেনেডি সাহেব ও রামবদন বাবুও তাহাতে সায় দিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, কষ্টের পাঠশালে না পড়িলে ছেলে মানুষ হয় না, অতএব ছেলেকে বিলাস ও আরাম হইতে দূরে রাখাই কর্ত্তব্য। সকল খানসামারই অরুণের অনুগমন করা বারণ হইয়া গেল, কেবল গঙ্গাচরণকে কেহ পারিল না, সে যখন শুনিল দাদাবাবুর সহিত তাহার যাওয়া হইবে না, তখন সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কালীশঙ্কর বাবুর নিকট ধরণা দিয়া বসিল। তিনি বলিলেন 'তোর দাদা বাবুর মত করতে পারিস ত আমার আপত্তি নেই।' অরুণের এক একবার ইচ্ছা হইলেও সে মুখ ফুটিয়া পিতাকে কোনও অনুরোধ করিল না; কেন না, এই বালক পিতৃমাতৃহীন অনাথ, তাহার নিকট পেটের দায়ে চাকুরী করিতে আসিয়াছে, ইহাকে আসামের কালা জঙ্গলের কষ্টের মধ্যে লইয়া যাইবার তাহার ত অধিকার নাই; অতএব যতই কাঁদুক সে, তাহাকে লইয়া যাওয়া হইবে না। সে বালক গঙ্গাকে অনেক বুঝাইল, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে বলিয়া ভরসা দিল, তিনখানি দশটাকার নোট বকসিস্ দিল, নিজের দুই সুট কাপড় জামা জুতা দান করিল, কিন্তু কিছুতেই গঙ্গা শান্ত হইল না। সে টাকা কাপড় ফেলিয়া দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। অরুণের চক্ষে জল আসিল। এই পরের ঘরের ছেলে, তাহার সহিত

কোনও আত্মীয়তা নাই, অথচ সে তাহাকে এত ভালবাসে! বিপদে অথবা সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় না পড়িলে প্রকৃত বন্ধুকে চিনা যায় না। এই সম্পর্কহীন বালক স্বেচ্ছায় তাহার কষ্টের ও বিপদের সাথী হইতে যাইতেছে; শুধু যাইতে নহে, যাইবার জন্য মাথা কোটাকুটী করিতেছে। অরুণ এমন কি পুণ্যের কাজ করিয়াছে?

গঙ্গা তাহার পায়ে মাথা কুটিয়া বলিতে লাগিল, "দাদাবাবু, দুটী পায় পড়ি, আমায় নিয়ে চল। তোমায় সেখানে কষ্ট হবে। কে তোমার কাজ ক'রে দেবে, রেঁধে দেবে। আমি ত' কায়েতের ছেলে, রেঁধে দিতে পারবো। আমায় নিয়ে চল।"

অরুণের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল, সে সস্নেহে গঙ্গার মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিয়া বলিল, "ছি গঙ্গা, কাঁদিস নি, আমি সত্যি বলছি, সেখানে পৌঁছে যদি আয়গাটা ভাল দেখি, তাহ'লে তোকে নিয়ে যাব। কেমন হ'ল ত?"

কিন্তু গঙ্গা সেই স্তোকবাক্যেও মনে সন্তোষ লাভ করিল না। শেষ যখন তাহার সকল আবেদনই নিষ্ফল হইল, তখন সে এক মতলব ঠাওরাইল। ওবাড়ীর দিদিমণিকে ধরি গিয়ে, দেখি কেমন যেতে না পাই। কত্তাবাবু আর কারও কথা শুনবে না, কিন্তু দিদিমণির কথা ফেলতে পারবে না।

তাহাই হইল, গঙ্গা বালিগঞ্জের বাড়ীতে আসিয়া অনিলাকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া ধরিয়া বসিল। বালকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দৃষ্টিতে সে সম্ভবতঃ অরুণ—অনিলার পরস্পরের প্রতি মনোভাবটা জানিতে পারিয়াছিল। তাই সে অনিলার ভীতি উৎপাদন করিয়া বিদেশে "দাদাবাবুর" নানা অভাব কষ্ট ও বিপদের সম্ভাবনার কথা পাড়িল;—'একলা মানুষ, সুখী মানুষ, চিরকালটা সুখে কাটিয়েছে, সে কি জঙ্গলে গিয়ে কষ্ট সহ্য করতে পারে? কাপড় কেচে দেবে কে, বিছানা করে দেবে কে, কাপড়চোপড় গুছিয়ে দেবে কে? যে মাছ খেকে কাঁটা বাছিয়ে খেতে জানে না, সে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবে? হয়েছে আর কি? ভাবুন দেখি দিদিমণি, যদি অসুখ পড়ল, যদি পেটের পীড়া হ'ল, তাহ'লে মুখে এক ফোঁটা জল দেবে কে সেখানে? চোর ডাকাতের ভয়ও ত আছে! শুধু ডাকাত? জঙ্গলী পাহাড়ীদের আরও ভয়, তারা ত' কথায় কথায় কেটে ফেলে। রাতবিরেতে একলা দোকলা যদি বেরুতে হ'ল—'

গঙ্গাকে আর বলিতে হইল না, অনিলার মুখ ভয়ে একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, সে যেন সেই ভবিষ্যৎ ভয়ের চিত্রটাকে চোখের সম্মুখ হইতে জোর করিয়া অপসারিত করিবার অভিপ্রায়ে দুই হাতে মুখ ঢাকিল এবং ভীতি বিহ্বল স্বরে বলিল, "না, না, গঙ্গা, তুই সঙ্গে যা।"

চতুর গঙ্গা অভিমানের সুরে বলিল, "কি করে যাব দিদিমণি, কত্তাবাবু যেতে দেবে না, দাদাবাবুও না। এখন তুমি যদি কত্তাবাবুকে একবার বুঝিয়ে বল, তা হলেই হয়। সত্যি দিদিমণি, আমি মাইনে চাইনে, কাপড়চোপড়ও চাইনে, আমি কেবল দুটি দুটি খাব, আর দাদাবাবুর কাছে থাকব। আমি দাদাবাবুকে ছেড়ে থাকতে পারব না।" গঙ্গার চক্ষে সহস্র ধারে অশ্রু ঝরিল, আর এই অনাথ দরিদ্র চাকরের ক্রন্দন দেখিয়া ধনীর কন্যা আদরে যত্নে লালিতা অনিলারও চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। কেবল তাহাই নহে, একটা অদ্ভুতপূর্ব্ব আনন্দে গর্ব্বে কি জানি কেন তাহার বুকটা ভরিয়া উঠিল।

তাহাই হইল, গঙ্গার আবদারই বজায় রহিল। অনিলাবালার উপরোধ এড়াইবেন, এমন ক্ষমতা কালীশঙ্করের ছিল না। যদিও অনিলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে গঙ্গার যাইবার অভিপ্রায়ের কথা বলিল, তথাপি বিষয়ী বুদ্ধিমান কালীশঙ্করের বুঝিয়া লইতে বাকী রহিল না, কাহার সুখের ও সুবিধার জন্য তাঁহার সোনার পুতলীর এই অনুরোধ! বুড়া

কামরাপ উঠিয়াছিল। গাড়ী ছাড়িলে গঙ্গা তাহার পেটরা খুলিয়া একখানি চকচকে নূতন কেতাব বাহির করিয়া অরুণের হাতে দিল। অরুণ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইলে, গঙ্গা এক গাল হাসিয়া বলিল, "ও বাড়ীর দিদিমনি দিয়েছে। তোমারে দিতে গাড়ী ছাড়লে।"

অরুণের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। তাহার হৃদপিণ্ডটা টিপ টিপ করিয়া কাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। গঙ্গা কাপড় চোপড় গোছ গাছ করিতে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু সেই দুই বালক আড়ে আড়ে তাকাইয়া দেখিল, অরুণের দাদাবাবু চক্ষু নিমলিত করিয়া কেতাব খানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়াছে। বস্তুতঃ অরুণ সেই পুস্তকখানিকে অমূল্য পদার্থ জ্ঞানে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছিল। ক্ষণপরে প্রকৃতিস্থ হইলে সে কেতাবের নামধামাদি পরীক্ষা করিল। কেতাবখানি একবারে নূতন, সেখানি আসামের প্রাচীনও আধুনিক বিবরণ। দুই একখানা পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একখানা চিরকুট কাগজ দুইখানি পাতার মধ্য হইতে অরুণের কোলে উড়িয়া পড়িল। হাওয়ায় উড়িয়া যাইতে না যাইতে অরুণ তাহা ধরিয়া ফেলিল, আর তাহাতে যাহা লেখা দেখিল, তাহা পড়িবামাত্র তাহার সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল, কাগজে অনিলার হস্তে মুক্তার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—"মানুষ আশায় বাঁচিয়া থাকে। নিলা।"

অরুণ ভাগ্যবান অরুণ—বার বার চিরকুটখানির বুকে চাপিয়া ধরিল, চুম্বন করিল। গঙ্গার অস্তিত্বের কথা সে একবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই দুই বালক আড়ে আড়ে সব দেখিতেছিল ও মুচকিয়া হাসিতেছিল। অরুণের সকল অবসাদ দূরে গেল, আশা, উৎসাহ উদ্যম, স্ফূর্ত্তিতে তাহার হৃদয়টা ভরিয়া গেল। একটা রাজত্ব পাইলে অথবা তপস্যার ফল লাভ করিলেও বোধ হয় মানুষ তত আনন্দ উৎসাহে পরিপূর্ণ হয় না, যতটা অরুণ এই সামান্য চিরকুট কাগজটুকু পাইয়া হইল। এই সামান্য এক ছত্র লেখাতেই অরুণ অনিলাবালার হৃদয়ের অন্তস্তল সমস্তই খোলা দেখিতে পাইল। তবুও একবার আশঙ্কা দূর হইল না। এ ভাবটা হয় ত ক্ষণিক; হয় ত সে দূরদেশে যাইতেছে বলিয়া অনিলার মনটা ক্ষণিকের তরে তাহার প্রতি মায়া মমতা দেখাইবার জন্য একটু চঞ্চল হইয়াছিল; আবার হয়ত' দুই দিনেই ঐ ভাবটা অন্তর্দ্ধান করিবে। এইরূপ আশা নৈরাশ্যের ঘাত প্রতিঘাতে অরুণের হৃদয়টা আলোড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও সে মনে সুখ পাইল।

গাড়ীতে সময়টা তাই বেশ কাটিতে লাগিল। কামরূপে তীর্থ দেখিয়া যখন অরুণ মনের আনন্দে বাসায় ফিরিতেছে, সেই সময়ে একজন চটি—ওয়ালা (বাসাবাড়ীর মালিক) অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করিয়া অরুণকে বলিল যে, একটি গরীব বাঙ্গালী কলিকাতা হইতে আজ কয়দিন হইল আসিয়া এখানে তাহার বাসায় রহিয়াছে; সে জ্বর লইয়া আসিয়াছিল, এখনও জ্বরে ভুগিতেছে; হাতের পয়সা কড়ি সব খরচ হইয়া গিয়াছে, এখন চিকিৎসা পথ্যের অভাবে রোগটা মারা যাইতে বসিয়াছে; বাবু দয়াল দাতা, গরীবের মা বাপ, বাবু যদি দয়া ক'রে গরীবকে কিছু ভিক্ষা দেন, তা হ'লে তার প্রাণ বাঁচে।

কথাটা শুনিয়া অরুণ থমকিয়া দাঁড়াইল এবং সবিশেষ পরিচয় লইয়া তখনই চটি-ওয়ালার সঙ্গে চটিতে রুগী দেখিতে চলিল, ছোট ঘরে অন্ধকারে ছেঁড়া ময়লা কাঁথা মুড়ি দিয়া একটা লোক পড়িয়াছিল। চটিওয়ালা তাড়াতাড়ি একটা কেরোসিন বাক্স আনিয়া পাতিয়া দিল। অরুণ বলিয়া সস্নেহে রুগীর হাতটা ধরিয়া বলিল, "কি হয়েছে তোমার জ্বর? তার কি, শীগ্‌গিরই সেরে যাবে। এখনই ডাক্তার আনছি।

কি আশ্চর্য্য! রোগী অরুণের স্বর শুনিবামাত্র,

কাঁথা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "স্বপ্ন সত্যি হয় না কি? সত্যিই তুমি—দাদাবাবু! ওঃ ভগবান! তুমি যথার্থই দয়াময়! বলিয়া সেই বয়স্ক লোকটা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অরুণও অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "একি, জয়হরি তুমি এখানে?"

জয়হরি বলিল, "হাঁ দাদাবাবু, আমি এখানে জ্বরে মরতে বসেছি। জানই ত' আমার বাড়ী সিলেটে, বাড়ী যাচ্ছিলুম রোগে ধরেছে। কিন্তু তুমি এখানে কেন? তীর্থ করতে এসেছে, সঙ্গে কে এসেছেন, রাজাবাবু এয়েছেন না কি?

অরুণ হাসিয়া বলিল, "না, আমি একলা এসেছি। যাক্, তুলী চড়ে আমার বাসায় যেতে পারবে। জয়হরি চল, তোমায় আমার বাসায় নিয়ে যাব, সেখানে তোমায় রেখে চিকিৎসা করাব।"

জয়হরির গণ্ড বহিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িল। সে গদগদ কণ্ঠে বলিল, "বেঁচে থাক দাদাবাবু, চিরজীবী হয়ে থাক, এই গরীব কুলপী ওয়ালার যত চুল তত তোমার পরমায়ু হোক! এই খানিক আগে যখন ঘরে প'ড়ে ধুঁকছিলুম, তখন ভগবানকে ডাকছিলুম। ডেকে কেঁদে বলছিলুম যে ভগবান, এই বিদেশ-বিভূঁয়ে আজ যদি দাদা বাবুর মত একটা লোক থাকত—"

অরুণ তাড়াতাড়ি বলিল, "যাক, এখন দাদাবাবুকে পেয়েছ ত'; চল তোমায় বাসায় নিয়ে যাই।"

"না দাদাবাবু, তা হবে না। তোমার দয়া আছে বলেই যে তোমায় পেয়ে বোসবো,তা হবে না। এই চটি-ওয়ালা দাদা বড় ভাল লোক, আমায় ভারি যত্ন করেছে। আমার হাতে যা কিছু ছিল সব খরচ হয়ে গেছে, তবুও দাদা গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে আমায় চিকিৎসা করাচ্ছে। তবে বেচারীর হাতে আর নেই। কি করবে, তাই ভিক্ষে করতে বেরিয়ে ছিল। যখন দাদা বললে, কলকেতা থেকে এক বাবু এসে এখানে আজ ছদিন দুহাতে দান খয়রাৎ করছে, তখনই আমার তোমার কথা মনে পড়'ল। রাগ কোরো না দাদাবাবু, সত্যি কথা বলছি। যখন তোমার গলার আওয়াজ পেলুম, তখন আমার জ্বর ছেড়ে গেল, শরীরে নূতন বল পেলুম, বিছানায় উঠে বসলুম। এখন তোমার দেখা পেয়েছি, আর ভয় নেই। চিকিৎসার ত্রুটি হবে না, এইবার সেরে উঠবো। দাদা আমার খুব যত্ন করেছে, দাদাকে ছেড়ে গেলে মহা পাপ হবে।"

অরুণ হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে। তুমি এত টাকা নিয়ে এলে, সব গেল?"

জয়হরি বলিল, "এত টাকা? কত? মুড়ি-ওলীর ঘরভাড়া দিয়ে বাকী ৩০টী টাকা ছিল, তাই নিয়ে বাড়ী যাচ্ছিলুম। টাকা কুড়ীর জিনিষ কিনেছিলুম, বাকী যাহা খরচে আর যাতায়াতে গেছে।"

অরুণ হাসিয়া বলিল, "সে কি? মুড়িওলীর যথাসর্ব্বস্ব?"

জয়হরি ভাল বুঝিতে পারে নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া বলিল, "কি রকম? মুড়িওলীর যথাসর্ব্বস্ব? তার মানে?"

অরুণ বলিল, "তার মানে, পাড়ায় শুনছিলুম। মুড়ি-ওলীর যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে তুমি চম্পট দিয়েছ।"

জয়হরি আবার শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল, তাহার চোখ মুখ ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল। সে ভীষণ উত্তেজিতস্বরে বলিল, "আমি মুড়ি-ওলীর যথাসর্ব্বস্ব চুরি করেছি? তুমিও তাই বিশ্বেস করেছ দাদাবাবু?"

অরুণ মৃদু হাসিয়া বলিল, "বিশ্বাসই যদি ক'রব, তা হলে তোমার সঙ্গে আলাপই বা ক'রব কেন, আর তোমার খবরই বা নেবো কেন?"

জয়হরি একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আঃ, বাঁচলুম। জগতের আর সকলে বিশ্বাস করুক গে, তুমি যে কর নি, এতেই আমি বাঁচলুম। পাড়ায় বলে কিনা আমি চোর? কে বলে? নিশ্চয়ই

সেই বেড়া বৈরিগি শালার কাজ ; ঐ শালাই ত' আমায় তাড়িয়েছে।"

অরুণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "কি রকম ?"

জয়হরি বলিল, "সে অনেক কথা। আমি যে মুড়ি-ওলীর বাসায় থাকি, তা ঐ বেড়ার ইচ্ছে নয়। কেবল, দাদাবাবু, তোমরা পাঁচজনে এ গরীবকে প্রতিপালন করবে ব'লে ঐ বাসায় এসে উঠেছিলুম ; আর তোমার জন্যেই মুড়ি-ওলী জায়গা দিয়েছিল। তার পরে ঐ বাবাজী শালা কোথায় বাইরে ঘুরে কলকেতায় ফিরে এল, আর আমায় তাড়াবার জন্যে উঠে প'ড়ে লাগ্‌লো। তাড়াবে না ? শালা যে এক ছুঁড়ি নিয়ে এসে বাসায় তুললে, কাজেই আমার জায়গা দিলে যে ছুঁচোর কেত্তন হবে না।"

অরুণ উত্তরোত্তর বিস্মিত হইয়া বলিল, "ছুঁড়ি ? সে আবার কি ?"

জয়হরি বলিল, "সে অনেক মজা, সে তোমাদের শুনে কাজ নেই দাদাবাবু। শালা সেই ছুঁড়িকে জায়গা দেবার জন্যে আমায় তাড়ালে, এখন তা বেশ বুঝতে পারছি।"

অরুণ বলিল, "এখন বুঝলে ? তাড়াবার সময় বুঝতে পার নি ?"

জয়হরি বলিল, "না, তা পারি নি। কি ক'রে পারব ? শালার পেটে যে জিলিপির পাক খেলছিল, তা তখন বুঝতে পারি নি। রাত দশটার সময় কুলী বেচে বাসায় ফিরে এসেছি, এমন সময় বাবাজী যেন কত ভয়ে ভয়ে বললে, খুড়ো, দেশে কি কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে এসেছ ? আমার মুখ শুকিয়ে গেল। বছর পাঁচেক আগে জমীজমা নিয়ে দেইজীদের সঙ্গে আমাদের লাঠালাঠি হয়েছিল, তাতে দু'পক্ষে খুন জখম হয়েছিল। তখন নানা তদ্বির ক'রে পুলিশের হাত হ'তে সকলে ছাড়ান পেয়েছিলুম। সেই মামলা কি আবার নূতন ক'রে উঠিয়ে উঠ্‌লো ? বললুম, সে ত বহুত দিনের কথা [redacted] হয়েছে ? বাবাজী বললে, তাতে অনেক ফেসাদ বেধেছে। আজ সন্ধ্যের সময় পুলিশের লোক (যদিও তারা সাদা কাপড়ে এসেছিল) এই গলীতে ঘুরছিল। আমায় একজন তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলে ; তুমি কতদিন এখানে আছ, তোমার নাম জয়হরি কি না, সিলেটে তোমার বাড়ী কি না। আমার কেমন সন্দেহ হ'ল, ঐ লোকটাকে ভবানীপুরের থানায় অনেক দিন ধরে থাকতে দেখেছি, একদিন ওকে পুলিশের উর্দ্দী পরে পথেও দেখেছি। কাজেই খুব ভাসা ভাসা জবাব দিয়ে পা ঢাকা দিলুম। তারপর উৎপেতে ওদের পেছু নিলুম। গলীর মোড়ে একটা পাহারা-ওয়ালা ওকে দেখে সেলাম করলে। তখন আর সন্দেহ রইল না। তার পর লুকিয়ে থেকে শুনলুম, সেই লোকটা পাহারাওয়ালাকে বলছে, মুড়ি-ওলীর বাসা পাহারা দিতে, আর কুলীওয়ালা ফিরে এলেই আমায় খবর দেবে। ঐ বেশ পাহারাওয়ালা এখন নেই, নিশ্চয় তোমায় দেখে থানায় খবর দিতে গেছে। শুনেই প্রাণ উড়ে গেল। ভাবলুম, নিশ্চয়ই সেই খুন-খারাপির দরুণ এই কাণ্ড হয়েছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললুম, বাবাজী বাঁচাও এ যাত্রা। কি ক'য়ে পালাই ? বাবাজী বললে, ভয় কি, এখনই তোমায় এমনই সাজিয়ে দেব যে, পুলিশের বাবাও তোমায় ধরতে পারবে না, কিন্তু এখ-ই পালাও ; আজ কাল বা পরশু এই তিনটে দিন রেলে চাপতে যেও না, কলকেতায় কোথাও কাটিয়ে দিও। তারপর হাঁটাপথে বারাকপুর বা আর কোনও ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ী ধোরো। এই ব'লে বাবাজী আমায় ধিবি বোষ্টুম সাজিয়ে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে দিলে। আমি জিনিষপত্র ফেলে দিয়ে, মাত্র নগদ টাকা কটা নিয়ে তেমনই বাসা ছাড়লুম ওঃ সে যে কি ভয়, দাদাবাবু, তোমায়ে কি ব'লব। তারপর কত লুকিয়ে বনের পশুর মত তাড়া খেয়ে এখানে পালিয়ে এসেছি দেশে যাব বলে। তা রোগে ধরেছে।"

অরুণ বলিল, "যদি এত ভয়, তবে দেশে যাচ্ছ কি করে? সেখানেও ত' তোমায় পুলিশে ধরবে।"

জয়হরি বলিল, "না, তা ধরতে পারবে না। সেখানেও আমি ভোল বদ্‌লে যাব, খুব লুকিয়ে থাকবো, আর সব সন্ধান নেবো। যদি দেখি, সে হাঙ্গামার কথা চুপচাপ, তা হলে ঠিক বুঝবো, এসব বাবাজীর কারসাজি; আর তা হ'লে কলকেতা ফিরে গিয়ে শালার সঙ্গে একবার বোঝাপড়া ক'রে নোবো। শালা, আমায় বলে কিনা চোর? তোর দেড়ার—"

অরুণ হাসিয়া বলিল, "থাক্, যখন বোঝাপড়া করবে তখন কোরো, এখন মিছে বাতাসের সঙ্গে লড়াই করে ফল কি? সত্যি বলতে কি, ঐ বাবজীটাকে আমারও ভাল লোক বলে মনে হয় না।"

জয়হরি উত্তেজিতস্বরে বলিল, "ভাল লোক? দাদাবাবু, শালার পেটে পেটে বারাণের ছুরি—"

অরুণ বাধা দিয়া বলিল, "থাকগে, মরুকগে, দুষ্ট লোক হয়, আপনিই দুষ্টুর সাজা পাবে এর পরে। এখন যাই, তোমার সব বন্দোবস্তের যোগাড় করি গিয়ে। তুমি কিছু ভেবো না জয়হরি। যত-দিন উঠে পথ্য না কর, আমি কামরূপ ছেড়ে যাচ্ছি নি।"

গভীর কৃতজ্ঞতায় জয়হরির হৃদয় ভরিয়া উঠিল, চোখদুটীও তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। সে অতি-কষ্টে গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতে সমর্থ হইল, "বেঁচে থাক দাদাবাবু, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

অরুণ বিদায় লইল। যাইবার সময় সে দুইখানি নোট চটী-ওয়ালাকে দিয়া গেল। উহাতে জয়হরির জন্য তক্তপোষ এবং পরিষ্কার বিছানা-মশারি ইত্যাদি কিনিবার কথা রহিল।

(ক্রমশঃ)

—

পাগল

(চিত্র)

[শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বরাট-সেন]

হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

আমি হাস্‌ছি কেন? ওগো কাঁদ্‌তে পার্‌ছি না বলেই যে হাস্‌ছি। কেঁদে-কেঁদে আমার যে বুকে চড়া প'ড়ে গেছে! তাই কেবল কান্নার বদলে শুধু হাস্‌ছি আর হাস্‌ছি।

লোকে বলে, আমি 'পাগল'। সত্যিই আমি পাগল না-কি? আচ্ছা যদি পাগলই হই, তা হলেই বা ক্ষতি কি?

না, না ক্ষতি কিছু নেই। আমার আবার ক্ষতি কি? কিন্তু আমার যা হ'য়ে গেছে, তার চেয়েও কি মানুষের আরো কিছু ক্ষতি হ'তে পারে? আমার যা হয়েছে, তা কি কারুর হয়? আচ্ছা,—আমি কি ছিলাম, কেন এমন হ'লাম!—

পাগল রাস্তার একপাশে বসিয়া নিজের অতীত সুখ-দুঃখের কথা ভাবিতে চেষ্টা করিল। এমন সময় একটী মুটীয়া তাহার নিকট আসিয়া এক মোট দেখাইয়া মাথায় তুলিয়া দিবার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল। পাগল তাহা শুনিয়া বিকট রবে "হাঃ-হাঃ" করিয়া হাসিয়া উঠিল! পরে নিজের মনে বলিতে লাগিল—

তোর মোটটা একটু

হয়তো—তোর ভাগ্যে ? তবে আমাকে

অত বোঝা লোকের উপকার ক'রে

ক'রে যা পাকিয়ে ফেলেছি, তার

বিনিময়ে কি পেয়েছি জানিস্ ?—যা যা, তোকে আর সে কথা বলে কি হবে !

ছুটোটা গালি দিতে দিতে চলিয়া গেল।

পাগল তখন নিজের মনে বলিতে লাগিল—

লোকের উপকার ! পরের উপকার ! তার আর শেষ নেই। তোমের মড়া লোকের অভাবে ঘরে পড়ে পড়েছে—সেই মড়া কোমরে গামছা জড়িয়ে, হাত ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে এসেছি, নয় তো একলাই ঘাটে নিয়ে গিয়ে তাকে পুড়িয়ে এসেছি। তবু তার বিনিময়ে, তার বদলে যা পেয়েছিলাম, তা অতি ভয়ানক ! মনে হ'লে বুক ফেটে যায়, চোখ আর এ শুকনো কোটর দুটোয় থাকতে চায়না। এক ফোঁটা জলও চোখ নিঙড়ে পড়ে

মনের ঠাণ্ডা হয়ে চোখের জলও হ'য়ে বরফ হয়ে গেছে গো—বরফ হ'য়ে গেছে !

হাঁ ! সেই যা বলছিলুম পরের উপকারের আজ সেই কথাই বলবো !

সেও ঠিক এমনি ছমছমে রাত, এমনি অন্ধকার, এমনি নিস্তব্ধ, এমনি নিঝুম। চুপ করে মন-ভরা ভাবনা নিয়ে ঘরের মধ্যে বসেছিলুম—মা'র সেই মরা অসাড় দেহখানা বুকে নিয়ে। প'নের বছরের ছোঁড়া শচে, সে গিছলো লোক ডাকতে। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে এসে বল্লে, "কেউ এলোনা দাদা !"

আমি তখন তার কথা শুনতে পেয়েছিলুম কি না, মনে নেই ; আমি নিজের ভাবেই নিজে বিভোর ছিলুম। কাণে হয়ত অস্পষ্ট ভাবে গিছলো "কেউ এলোনা !" তা' আসবে কেন ? শীতের এই গভীর রাতে, সমস্ত দিনের ক্লান্তির অবসাদে তারা সুখ-শয্যায় গা ঢেলে দিয়েছে, তা ছেড়ে কি কেউ এই অন্ধকারে, নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে পরের উপকারের জন্যে শ্মশানে যেতে রাজী হবে ? বোঝে গেছে তাদের ! কেন তারা যাবে ? তার চেয়ে ততক্ষণ পাশমোড়া দিয়ে শুলে অনেক আরাম হবে। কিন্তু অভাগারা, মনে আছে কি ? আমি নইলে যে একদিনও বাসিমড়া ঘরের বার হ'তোনা, আমি নইলে ঘাটে যাবার দোসর কারুর মিলতো না। সে কথা এখন ভুলে গিয়েছ ? এখন ত আর তোমার ঘরে বাসিমড়া নেই—মনে থাকবে কেন ?

হাঃ হাঃ হাঃ ! আর আজ এই মুটে বলে কি—তার মোটটা ঘরে একটু উপকার ক'রে। আবার উপকার ? বাঃ রে দুনিয়া ! কের ডাক্ দিয়েছো—আমায় উপকার ক'রে ? না বাবা, সে রকম নেড়া আমি নই যে, বার বার বেলতলায় যাবো ! তা আর হ'চ্ছে না।

আমি শচের দিকে তাকাতে সে আমার দিকে চেয়ে আবার কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লে, "কেউ যে এলো না দাদা !"

"কেউ এলোনা—তবে আর কি ! সংবাদটা দিয়ে যেন আমার মাথা কিন্‌লে !" দাঁত খিঁচিয়ে রেগে তাকে মারলুম এক চড়। সে ঘুরে 'মা গো' বলে পড়ে গেল।

আমি আর তার দিকে তাকাবারও অবসর পেলুম না। মার সেই মরা অসাড় দেহখানা নিজের ঘাড়ে ফেলে ঘাটের দিকে ছুটে চল্লুম—অন্ধকার ভয়, বাধা সব ঠেলে—এক বীরপুরুষের মত।

তারপর কাঠের আগুন সমস্ত ঘাট সোনার আভায় উজ্জ্বল হয়ে গেল।

এই যে দেখছ আমার মাথায় একটা কালো ঝুলপানা ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় জড়ান রয়েছে—ওটা হচ্ছে আমার মার শেষ বসনের একাংশ। আমার মা ঐ পরে আমার কাছ থেকে চির বিদায় নিয়েছিলেন।—'মা-গো !'

আগুন নিবে গেছে। চিতায় জল ঢেলে

দিলুম। মা আমার ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছেন। আমি তখন সেখানে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলুম। হঠাৎ কি মনে হ'লো, বাড়ীর দিকে ছুটে চলুম।

তখন ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত বেশ কন্‌কনে হয়ে উঠেছে। সেই রাতে ঘান ক'রে বুকে হাত দুটো গুঁজে বাড়ী ফিরলুম। বাড়ীতে গিয়ে যখন পৌঁছেছি, তখন আঁধারের বুকে পুবের স্নিগ্ধ জ্যোতির রেখা ফুটে উঠেছে। আমি নির্বাক্ হয়ে তখন প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ যেন তন্দ্রার ঘোরের মতো করুণস্বরে কাণে বেজে উঠ্‌লো—"কেউ এলোনা দাদা!"

চট্ করে আমার শচের কথা মনে পড়ে গেল। ভাইরে আমার! আমার মাতৃহারা ভাই! ঝড়ের মতন ঘরে ঢুক্‌লুম। এ কে পড়ে রয়েছে উপুড় হয়ে? এ কি! শচে যে এখনও সেই ভাবে পড়ে রয়েছে—তাকে দাওয়ার পর যেমন ভাবে দেখে গিয়েছিলুম ঠিক সেই ভাবে! তবে কি! তবে কি!! এ্যাঁ, তাই ত এ কি! শচের মুখ দিয়ে যে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে! নর্দ্দমা বেয়ে ঐ-না লাল রক্তের দাগ জমাট্ বেঁধে বেরিয়ে গেছে? রক্তের দাগ! লাল জমাট্ রক্তের দাগ! ভয়ে চীৎকার করে উঠ্‌লুম—'শচে'—

কোন সাড়া নেই। বাজ করে প্রতিধ্বনি বলে উঠ্‌লো—"শচে"।

আর স্থির থাকতে পারলুম না। কেঁদে উঠলুম। শচের সেই অজ্ঞান দেহখানা কোলের ওপর তুলে আদর ক'রে ডাকলুম, শচী! ও শচী! কেঁদেছ ভাই, তোমায় মেরেছি বলে? বড্ড কি লেগেছে? কৈ, সে সাড়া দেয় না?

শচেকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বসে রইলুম। মার শোক তখন ভুলে গেছি। আপনি বসে আছি—এই শচীর জ্ঞান হ'লো ব'লে। কিন্তু সূর্য্য মাথার ওপর উঠে গেছে, কৈ শচের ত জ্ঞান হ'লো না! চালের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের আলো এসে শচের পুষ্প-পেলব ঠোঁটের ওপর স্পর্শ করছে—যেন বলছে—"শুকিয়ে গেছে গো, ফেলে দাও ফেলে দাও।"

তাইত! এ ঠোঁটে ত হাসি নেই, এ মুখে ত জ্যোতিঃ নেই! এ হাত পা গুলো যে অসাড়! তবে ত যা ভেবেছি তাই কি!

আবার উঠে দাঁড়ালুম। জোর করে বুকটাকে বেঁধে নিয়ে বেশ করে দাঁড়ালুম। আবার প্রস্তুত হলুম সেই কাজে যাবার জন্তে। বুকের মাঝখানে মর্ম্মস্থলে একটুও ঘা লাগ্‌লো না—এক ফোঁটা চোখের জলও পড়্‌লো না! আমি আবার বে'রলুম শচের অসাড় দেহখানা বুকে নিয়ে।

আবার সেই শূন্য বাড়ীতে ফিরে এলুম। যেখানে একদিনে কেবলই শুনতে পেতুম, স্নেহময়ী মায়ের সাংসারিক বিষয়ে উপদেশ—আর শচের সেই ছেলে-বেলাকার ছড়া, গান থেকে পড়া মুখস্থ করা পর্য্যন্ত। ঘা' খেয়ে খেয়ে বুকটা তো পাথর হয়ে গেছে, তবু কেন জানি না, একলা থাকতে ভালো লাগ্‌ল না।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। সেই অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী রূপবতী বধূর মুখখানি। মনে পড়ে গেল, তার সেই ঘোমটার ঢাকা আধ-আধ চাউনি। প্রাণ চন্‌চন্ কোরে উঠ্‌ল—তার সেই সুখময় স্পর্শ অনুভব করবার জন্ত কত আদর কোরে তাকে চিঠি লিখলুম—তুমি আমার কাছে শীঘ্র এসো, আমার একলা ভালো লাগে না। তার চিঠির আশা কোরে পথ চেয়ে রইলুম।

তিন দিন পরে আমার সব সাধ, সব আশা ভেঙে দিয়ে এক অচেনা হাতে-লেখা একখানা চিঠি এলো—সে মনের দুঃখে আমায় পাগল জেনে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।"

সে মরেছে! সে-ও তবে মরেছে! কেন কিসের জন্ত? আমি পাগল! সেইজন্ত? আগে পাগল ছিলুম

না, এখন যে পাগল হয়েছি। মনে হ'লো, আমার কে আছে? মা নেই, শচে—! সে তো আমার হাতেই...না, না, তা কেন? সে আমার বরাত।

মা নেই, ভাই নেই, আমার স্নেহের বিমলাও নেই। তবে আর আমার কে আছে? কেউ নেই, কেউ নেই, ওগো—কেউ নেই!

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—আছে, আছে, আমারও সব আছে। মায়ের শেষ বসনখানি আমার মাথায় আছে। শচের জামা গায়ে আছে। বিমলার প্রেম বুকের ভেতর লুকান আছে। আমার কি নেই? সব আছে।

বিকিয়ে-যাওয়া

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

বিকিয়ে যেতে চাই আমি গো,
বিকিয়ে যেতে চাই,
দাম নেব না কাণা কড়ি
নেইকো আমার খাঁই!
আকাশের ঐ অসীমতায়,
বাতাসের ঐ চঞ্চলতায়,
পাতালের ঐ নীরবতায়
মন করে যাই-যাই,
তাই বিকিয়ে যেতে চাই!

বনের ছায়ায় ফুল-সাজানো
কচি কচি ঘাস,
মধু পিয়ে প্রজাপতির
মিটেনাকো আশ।
ভোরের বেলায় রবির আলো,
সবুজ পাতায় হাত বুলালো,
পিয়াসী মোর চোখ ভুলালো,—
প্রাণ বলে 'গান গাই',
আর বিকিয়ে যেতে চাই!

বান ডাকে গো, পাগ্‌লী ডাকে
ভেঙ্গে সকল বাঁধ,
ঝড় জাগে গো, পাগ্‌লা জাগে—
মাথায় কাঁপে ছাদ।
খুলে-ধরায় ধ্বংস মাতে,
ঘরের দুয়ার খুলে রাতে,
ইচ্ছে করে তাদের সাথে
একলা হয়ে যাই—
আর বিকিয়ে যেতে চাই!

চোত্ মাসেতে ঘুমোট্ গরম,
চরম-রকম তাত্,
ক্ষেতের মাটি রোদে ফাটে,
নেইকো বারিপাত।
ভাত যোগাতে পরের পেটে,
মাঠের চাষী মরচে খেটে,
প্রাণের সকল বিধা ছেঁটে
বলব তারে ভাই!
পায়ে বিকিয়ে যেতে চাই!

রোদ্ পড়ন্ত; গাঁয়ের বঁধু
জল্‌কে যখন যায়,
আর প্রথম মাতা খোকার মুখে
প্রথম চুমো খায়;—
হাঁদনাতলায় বোটি যখন,
মুখটি ক'রে গোলাপ-বরণ
বরকে দেখেই মুদে নয়ন,—
মন যে মোর হারাই,
আর বিকিয়ে যেতে চাই!

নীল-গগনের রূপ সাগরে
ভাস্‌চে সোণার-চাঁদ,
দেয় দখিনা, গায় পাপিয়া,—
চিত্তে পরমাদ!
এলিয়ে প্রিয়া ঘুমিয়ে থাকে,
জোছ্‌না আসে জান্‌লা-ফাঁকে,
মুখে রূপের ছবি আঁকে,—
স্বর্গ হাতে পাই!
আর বিকিয়ে যেতে চাই!

বিশ্বেরি এই বিচিত্রতায়
হারালো মোর মন,
আমার কাছে সমান নগর,
পল্লী, কি ঘোর বন!
সকাল-বিকাল-রাতের বেলা,
চারিদিকেই বহ'র খেলা,
কঠোর-কোমল রূপের মেলা—
অন্ত যে তার নাই,
তাই বিকিয়ে যেতে চাই!

নেপালীদের বিবাহ প্রথা

(শ্রীনলিনী কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বিদ্যাবিনোদ)

কন্যাদায় কাহাকে বলে নেপালী পাহাড়িয়া তাহা জানে না। কন্যা বয়স্থা হইলে পিতাকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পাত্রের অনুসন্ধানে বাহির হইতে হয় না, "মাংগনে ওয়ালা" মাংগনির চিহ্নস্বরূপ, ব্রাহ্মণ হৈত্রী জাতি, দধি ও সুপারী, মংগর গুরুং নেওয়ার প্রভৃতি এক বোতল "রক্সি" মদ্য সঙ্গে লইয়া আপনি উপস্থিত হয়।

পুত্রের পিতা কন্যার পিতার সম্মুখে প্রার্থীরূপে দণ্ডায়মান হইয়া "পাঁচ হাত মানুষ পনর হাত হ'য়ে আপনার সামনে পড়েছি, আপনার বিবাহ যোগ্য কন্যা আছে, আমারও বিবাহ যোগ্য পুত্র আছে, আশা করি আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন" বলিয়া পুত্রের জন্য পাত্রী প্রার্থনা করেন।

কন্যার পিতা কোনরূপ আপত্তির কারণ না থাকিলে তাঁহাকে একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে আসিতে বলেন। ঐ দিবস প্রার্থী পিতা পাঁচ ছয় জন সগোত্রকে সঙ্গে লইয়া সপুত্রক পুনরায় কন্যার পিতার বাটীতে আগমন করেন। মংগর গুরুং নেওয়ার প্রভৃতিকে এই দিনে দুই বোতল মদ্য সঙ্গে আনিতে হয়। কন্যার পিতা কয়েকজন সগোত্রকে আহ্বান করিয়া ব্রাহ্মণের সমক্ষে উভয়পক্ষ একত্র হইয়া বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। বর বরও বৈবাহিক সম্বন্ধাদি মনোমত হইলে এবং উভয়ে একই কুলদেবতার উপাসক হইলে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে কোন বাধা থাকে না। কন্যার পিতার ইচ্ছার উপরই সমস্তই নির্ভর করে, কোনরূপ অপ্রতিকূল প্রতিবন্ধক না থাকিলে তিনি বাগদান করেন, এবং বরপক্ষকে রাত্রিতে ভোজন করাইয়া থাকেন। এই ভোজে, পুত্রের পিতাকে নিজ পক্ষ হইতে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তির মধ্যে দধি কলা বিতরণ করিতে হয়। বাগদান অন্তে পুত্রের পিতাকে কন্যা দেখান হয়, কেহ কেহ "সাহি" 'মুদ্রি', বাগদানের নিদর্শন স্বরূপ বাগ্‌দত্তা কন্যাকে কয়েকটী মুদ্রা প্রদান করেন। পরে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া শুভদিন স্থির করা হয়, ঐ দিন বরের বাটীতে আসিয়া হোম করেন, তাহার পর বর পান ভোজন করিয়া বিবাহ করিতে যাত্রা করেন। প্রথমে, ঢাক, ঢোল, শিঙ্গা বাজাইতে বাজাইতে বাদকের দল। মধ্যে শুভ্রবেশে মুণ্ডিত মস্তক বর, পশ্চাতে বরযাত্রিগণ চলিতে থাকে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই

বরকে বিবাহ বাটীতে পৌঁছিতে হয়। কন্যার পিতা সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আহার করাইতে বসান। বর আচমন পূর্ব্বক অন্ন গ্রহণ করিলে কন্যার পিতা সকলকে আহারে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন।

বরের সমক্ষে নিক্ষেপ করিবার জন্য একটী "পোলা" প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়। একটী জলপূর্ণ বৃহৎ তাম্রপাত্রের মধ্যে অঙ্গুলের পরিমিত জল ধরিতে পারে এরূপ একটী ছোট তাম্রপাত্রের নিম্নে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া উহা ছাড়িয়া দেওয়া হয়, যখন ঐ পাত্রটী জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখন লগ্নের সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া ব্রাহ্মণেরা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কার্য্যে ব্রতী হন্। অগ্নির চতুর্দ্দিকে চারিজন ব্রাহ্মণ আসন পরিগ্রহ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে থাকেন, আর একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত, মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক উপবিষ্ট বরকে মন্ত্র শ্রবণ করান।

এতক্ষণ উপবাসিনী কন্যাকে লাল রংয়ের তিনখানি সাড়ী, তিনখানি উড়ানি, তিনটী চাদর পরাইয়া অন্তঃপুরে বসাইয়া রাখা হয়।

কন্যাদানের সময় হইলে, পিতা নিজে কন্যাকে পিঁড়ে করিয়া বিবাহ স্থলে আনয়ন করেন।

সম্প্রদান অন্তে উপবাসী শ্বশুর জামাতার পাদোদক পান করিয়া তাঁহাকে সাধ্যানুরূপ কিছু দান করিয়া থাকেন, কন্যার আত্মীয়গণের মধ্যে যাঁহারা "ধরণ" সকল অঙ্গ উপযোগী থাকেন তাঁহারা কন্যার পাদোদক পান করিয়া প্রত্যেকে বরের সম্মুখস্থ একটী জলপূর্ণ তাম্র পাত্রে কিছু অর্থ, দান স্বরূপ, নিক্ষেপ করেন।

পাত্রে নিক্ষিপ্ত অর্থ বরের প্রাপ্য সুতরাং বরের পিতা উহা গ্রহণ করেন।

এই সময় বরের পিতা বা অন্য কোন গুরুজন ব্যক্তি আসিয়া কন্যাকে গহনা পরাইয়া দেন।

বাসর প্রথার প্রচলন ইহাদিগের মধ্যে নাই। সমস্ত রাত্রি বর কন্যাকে বিবাহ মণ্ডপে ব্রাহ্মণগণের সহিত অতিবাহিত করিতে হয়।

ব্রাহ্মণ অগ্নিতে হোম করিয়া প্রাতঃকালে যজ্ঞ শেষ করেন। তখন উভয় পক্ষ হইতে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দানে বিদায় করিতে হয়, এবং দক্ষিণান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সকলকে অভুক্ত থাকিতে হয়। ব্রাহ্মণেরা তুষ্ট হইয়া অনুমতি প্রদান করিলে বর-যাত্রিগণ ভোজন করিয়া বর কন্যাকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

মাধবী

(শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি, এ)

নহতের রবি সকল গ্রহরে ঢেলেছে স্বর্ণ সোণা,
নীলের পাথারে সাদা-মেঘেদের সারাদিন আনাগোনা।
সন্ধ্যা তখনো হয় নাই, পথে চলেছি মাঠের পানে,
থমকি' দাঁড়াদু—ডাহিনে অদূরে ইঁদারাটি যেইখানে।
উঁচু পা'ড় তার, তলাটি বাঁধানো—তরুতকে চারিধার,
একটি সে বড় বকুলের তলে একটু সে আঁধিয়ার।
সেইখানে দেখি অপরূপ একি। তখনি লইনু চিনি—
অস্ত-মেঘের লাল বাস পরি' দাঁড়ায়ে সৌদামিনী।

নটকনা-রং শাড়ীটির ভাঁজে দেহের সকল রেখা
নত-উন্নত তনুটির তটে ছবিটির মত লেখা ;
মুখটি আড়াল, খোঁপাটি আগল—খোপাটীর ফুল তা'র,
গণ্ড—চিবুক—একটু সে গ্রীবা—হাতখানি দেখা যায়।
আলোকের শিখা বেড়িয়াছে যেন শুভ্র সে ফুল-তনু—
সবটুকু তার দেখা নাহি যায়—সংসের রামধনু !

তবু মনে হয় হেরিলাম যেন সারাদেহ আঁখি ভরি',
ষোলকলা যেন নিমেষে পূরিল পূর্ণিমা বিভাবরী !
না-দেখা সে মুখ আভাসে হেরিনু অন্তর-আঁখি দিয়া—
কত জনমের পরিচয় সে যে, চির-জীবনের প্রিয়া !
তাহারি মূরতি গড়িয়া তুলিনু সকলের-পাওয়া-গানে,
সকলের-দেখা ছায়া-আলো-আঁকা রূপসীর রূপটানে !
কালো কেশতলে ললাট নিটোলে আঁকিনু যে ভুরুধনু,
চেয়ে তার পানে উন্মত্ত মনে চরণে পড়িল লুটি' ;
অনলে সলিলে মিলা'য়ে রচিনু উরস আঁখির তারা,
ওষ্ঠে বহিল বিষ-নিশ্বাস, অধরে পীযূষ-ধারা।
আমার মানসী মানবীর রূপে, বকুলের ছায়াতলে,
দাঁড়াইল পুনঃ, মুখখানি আর ঢাকিল না কোনো ছলে !
আজ মনে হয়, একি পরিচয় ! আঁকিনু এ কার ছবি !
সকলে যে মুখ এত বাখানিল, তা'রে ত' দেখে নি কবি !

হায় কবি, হায় ! এমনি করিয়া জীবনের যত ফাঁকি
কল্পনা-রঙে রঙীন করিয়া ভুলায়েছ দুই আঁখি !
আধখানি দেখে বাকি আধখানি ভরিয়া গানের সুরে,
যাহার প্রতিমা গড়িতেছ তুমি, সে যে থেকে যায় দূরে !
লাজ ভেঙে দিয়ে, মুখটি ফিরা'য়ে, খুলিয়া নয়ন-তারা—
আপন পুতলি হেরিয়া সেথায় হও নি আত্মহারা ;
সারাটি রজনী দীপ জেলে' রেখে, বাঁধিয়া বাহুর ডোরে,
স্বপন-মগন সে-রূপ তাহার দেখ নি নয়ন ভরে'।

হৃদয় যাহার দাও নাই, তারে মনের মুকুরে ধরা।
ডুব নাহি দিয়ে, শুধু রূপ-জলে গানের পাগরি ভরা !
ভালো যারা বাসে তারাই চিনেছে, তুমি আঁকিয়াছ তারে—
সে-দিনের সেই তরুণীরে নয়—নিখিলের বনিতারে !
যার তনু ঘেরি' আরতি করিল শরতের আলো-ছায়া—
মানস-বনের মাধবী সে হ'ল ?—ফাগুনের ফুল কায়া !

অন্তরের ক্ষুধা

(গল্প)

(শ্রীঅনিলকুমার সেন বি-এ)

আমার এই চিরব্যথাতুর ব্যর্থ জীবনের কথা যে কোথা থেকে আরম্ভ করব, তা আমি আজ ভেবেই পাচ্ছি নে। শৈশবের কথা খুব আবছায়া স্বপ্নের মত আমার মনে পড়ে। সবার প্রথম ঘটনা আমার মনে পড়ে,—যেদিন আমার স্নেহময়ী মাকে আমি চিরজীবনের জন্যে হারাই।

মায়ের কাছে শুনতুম, বাবা অনেকদিন আগে আমাদের ফেলে চলে গেছেন। সংসারে আপনার বলতে ছিল, আমার মা ও আমার একটী ছোট বোন্ কল্যাণী।

বাবা অনেক টাকা উপার্জ্জন করে যান। মায়ের কাছে শুনেছি, বাবা নাকি মৃত্যুকালে বলে গিয়েছিলেন, তাঁর অভাবে আমাদের ভরণ-পোষণের কোন কষ্ট হ'বে না; তিনি যা জমিয়েছিলেন, তাতে নাকি আমাদের মত দশ-বিশটা সংসার রাজার হালে চলে যেত।

তারপর সেদিনের কথা মনে পড়লে আজও আমার মনটা যেন কেমন করে ওঠে—একটা তীব্র বেদনায় আমার সমস্ত হৃদয় টন্ টন্ ক'রে ওঠে। আমার বয়স যখন বার, তখন আমার মা তিন দিনের জ্বরে যে কোথায় চলে গেলেন, তার সন্ধান তখন ত পাই-ই নি, এখনও বোধ হয় ঠিক্-ঠিক্ পাই নি। আমি আমার একমাত্র আদরের বোন্টীকে নিয়ে অনন্যোপায় হ'য়ে কাকার কাছে চলে গেলুম। যেদিন সর্বপ্রথম আমাদের শৈশবের আনন্দ-নিকেতন ছেড়ে সুদূর প্রবাসে যাত্রা করতে হ'ল—সেদিন যেন চারিদিক থেকে সেই দীর্ঘ বার বছরের অশরীরী স্নেহ-মমতা গুলো অদৃশ্য বাহুবন্ধনে আমায় বেঁধে বলে,—কোথায় যাবে আমাদের স্নেহপাশ ছিন্ন করে?

হতভাগ্য আমি—পিতার মুখ কখনও ভাল ক'রে মনে করতে পারি না। তিনি বাড়ীতে থাকতেন না, বিদেশে ব্যবসার খাতিরে তাঁকে বছরের প্রায় অনেক সময়ই কাটাতে হ'ত। তাই, একমাত্র মায়ের বুকেই আমরা দুই ভাই-বোনে তাঁর স্নেহের নিবিড় স্নিগ্ধ-শীতল ছায়ায় বাসা বেঁধেছিলুম। তাও বুঝি বিধাতার সহ্য হ'ল না, তিনি আমাদের মাতৃহীন সঙ্গে সঙ্গে গৃহহীন ক'রে নির্ব্বান্ধবের পথে বার ক'রে দিলেন। সেই দিন থেকেই এই বিপুল বিশ্বের সঙ্গে আমার প্রকৃত পরিচয় আরম্ভ হ'ল।

প্রবাসে কাকার কাছে এসে আমরা দুই ভাই-বোনে আশ্রয় নিলুম। কাকা এতদিন বাবার কোন সন্ধান রাখা ত দূরের কথা—তাঁর নাম পর্য্যন্ত ভুলে যাবার যো করেছিলেন। কিন্তু এখন দেখলুম—আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য তিনি বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। ভাবলুম—অদৃষ্টের ফেরে শৈশবেই যারা মা-বাপ দুই-ই হারিয়েছে, তাদের আবার সুখ-দুঃখ।

প্রথম প্রথম কাকার এই আগ্রহ ও যত্ন দেখে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতুম আর ভাবতুম—না, আমরা ত নেহাৎ মন্দে পড়িনি, আমাদেরও সুখ-দুঃখের সহায় আছে। কিন্তু এই সাময়িক আনন্দের মধ্যে যখনই আমি কল্যাণীর শুকনো মুখের দিকে

চেয়েছি, তখন আমি আর অশ্রু রোধ কর্‌তে পার্‌লুম না।

কল্যাণী যখন এক একদিন হুমড়ুমে গভীর রাতে ঘুমের ঘোরে ভয় পেয়ে আমায় জড়িয়ে ধ'রে মা, মা, বলে কেঁদে উঠ্‌ত, তখন আমি তাকে আমার বুকের মধ্যে আরও নিবিড় করে টেনে নিতুম। কৈ তাকেও ত বুকের মধ্যে ধরে রাখ্‌তে পার্‌লুম না? বুকের মাঝখান্ শূন্য ক'রে সেও ত হঠাৎ একদিন চলে গেল। আমাকে ছেড়ে যে এক মুহূর্ত্তও থাক্‌তে পার্‌ত না; আমি যার জন্যে ইস্কুলে এক ঘণ্টাও স্থির হ'য়ে বসে থাক্‌তে পার্‌তুম না—সে যে হঠাৎ কি ব'লে চলে যেতে পারে, তা আমি তখন কিছুতেই বুঝ্‌তে পারি নি।

তখন শারদ-শ্রীর পুলক-শিহরণে পল্লীখানি লীলায়িত। পূজার মঙ্গল বোধন বসে গেছে। আমরা নিতান্ত নিরানন্দের মাঝ্‌খানেও বেশ একটা গভীর আনন্দের আভাস পাচ্ছিলুম। কিন্তু সে আনন্দের আভাস যে বুকফাটা হাহাকারের সূচনা হবে, তা কে জান্‌ত? আমার তখন তরুণ বয়স—সেই বয়সেই আমি সংসারের অনেক কথাই বুঝ্‌তে পার্‌তুম। কিছু দিন যেতে না যেতেই আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লুম—কাকার অন্তরের টান আমাদের দিকে হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে যাবার উপার্জ্জিত টাকার দিকে এগিয়ে চলেছে। আমি তা জেনে-শুনেও চুপ করে ছিলাম।

পূজোর সময় সব বাড়ীতেই ছেলেদের আনন্দ-কোলাহলের সাড়া পড়ে গেছে। পাড়ার ছেলেরা যখন নতুন জামা-কাপড় প'রে ছুটোছুটি আরম্ভ ক'রে দিলে, তখন কল্যাণীর দিকে চেয়ে আমার মন যেন কেমন ক'রে উঠ্‌ল। কাকাকে বল্লুম—পূজোয় সবাই নতুন জামা-কাপড় পাচ্ছে, কল্যাণীর কি কিছুই হবে না? তার উত্তরে তিনি বল্লেন—সবাইকার মত আমার অবস্থা ত ভাল নয়। অত টাকা আমি কোথায় পাব?—কথাগুলো আমার আপাদমস্তক জ্বলে গেল, আমি তাঁর সম্মান রেখে কথা বল্‌তে পার্‌লুম না। আমি বল্লুম—আপনার টাকা না থাক্‌তে পারে, কিন্তু মায়ের কাছে শুনেছি, দাদা অনেক টাকা রেখে গেছেন। কাকা হুঙ্কার দিয়ে বল্লেন—তোমার স্পর্দ্ধা ত বড় কম নয়। তুমি কি বল্‌তে চাও, আমি তোমার টাকা সিন্দুকে পুরে রেখেছি? দাদা ত কিছুই রেখে যান নি—কেবল দেনাই ক'রে গিয়েছিলেন। তা সব শোধ হ'ল কোত্থেকে?

এতবড় নির্জ্জলা মিথ্যা যে মানুষে বুক ফুলিয়ে ভগবানের রাজ্যে বল্‌তে পারে, তা আমি এই প্রথম শুন্‌লুম। তবে কি আমার মা মিথ্যা বলে গেছেন? না, তা কিছুতেই হ'তে পারে না। আমি আমার মাকে বেশ চিন্‌তুম—তাঁর মুখ দিয়ে কখনও মিথ্যা বেরোতে পারে না। আমি বিষম রেগে যা বলেছিলুম, তার উত্তরে তিনি আমার গালে একটী প্রবল চপেটাঘাত ক'রে বল্লেন গুরুজনের সঙ্গে কথা বল্‌তেও শেখনি! কেমন লোকের ছেলে যে তা জান্‌বে!

তারপর দু'দিন যেতে না যেতেই কল্যাণী ভয়ানক জ্বরে পড়্‌ল। কিছুদিন থেকেই সে ম্যালেরিয়ায় অবিশ্যি ভুগ্‌ছিল। গ্রামের একজন হাতুড়ে ডাক্তারকে দিয়ে তার চিকিৎসা হচ্ছিল। এক একদিন রাত্রে কল্যাণীর ঘুমন্ত রোগপাণ্ডুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখেছি, আর শ্রাবণের জলধারার মত অবিরাম অশ্রু আমার ঝরে পড়েছে। তাও আমি নীরবে সহ্য করে যেতুম, মুখ ফুটে সহরের ভাল ডাক্তারকে আন্‌তে বল্‌তে সাহস করি নি—কি জানি, যদি এই চিকিৎসাই বন্ধ হ'য়ে যায়!

ষষ্ঠীর সবে বোধন বসেছে, ঠিক সেই সময় কল্যাণী রোগের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হ'য়ে মায়ের কোলে চলে গেল। তখন শুন্‌তে পাই, আমি নাকি হেসে উঠেছিলুম! আমার সমস্ত অশ্রুর নির্ঝর তখন শুকিয়ে মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করছিল। কেন

যে হেসেছিলুম, তা ঠিক বলতে পারি না। তবে বোধ হয় ভগবান আমার বন্ধনগুলি একে একে মুক্ত ক'রে দিচ্ছেন দেখে একটু হেসেছিলুম। কল্যাণীর মৃত্যুর পর থেকে আমার সব আশা, সব রঙীন কল্পনা ছায়াবাজির মত মিলিয়ে গেল।

কাকাবাবুর বাড়ীর আর সে শ্রী নাই। আমরা এসে প্রথম সে বাড়ীর অবস্থা যা দেখেছিলুম, তাতে কে বলবে যে, এই নতুন সাজানো বাড়ী তারই জীর্ণ বুকের ওপর ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। মায়ের কাছে শুনেছিলুম, কাকাবাবুর অবস্থা নাকি আগে বাস্তবিকই ভাল ছিল না; গ্রামের জমিদারী সেরেস্তায় কাজ ক'রে তাঁর সংসার চলত। অবশ্য সংসারে তিনি আর কাকীমা ছাড়া আর কেউ-ই ছিল না। আর আমাদের আসবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অবস্থার এত দ্রুত পরিবর্তন হ'ল, এর কারণ যে 'আলাদীনের প্রদীপ'-প্রাপ্তি নয় তা আমি হলপ্ ক'রে বলতে পারি।

আমার তখন মনের অবস্থা যে কি রকম, তা আমি নিজেই যখন বুঝতুম না, তখন আজ তা ঠিক ক'রে বলতে পারব না। তবে আমি যে তখন নির্জ্জনতা ভাল বাসতুম, তার আর কোন সন্দেহ নেই। আমি বাগানের গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়াতুম। ছেলেরা বলত—আমায় নাকি ভূতে পেয়েছিল। আমার শোবার ঘর ছিল ওপরে ঠিক বাগানের সামনে। যখনই খোলা জানালা দিয়ে আমার চোখ-দুটো সেইদিকে চলে যেত আবার চট্ ক'রে ফিরে আসত—তখনই বেশ বুঝতে পারতুম—তারা লাল কাঁকরের রাস্তা ও বড় বিস্তৃত পাতা বাহারের কৃত্রিম শোভায় তৃপ্তি পেত না, তারা ব্যথিত হ'য়ে ফিরে আসত। আমি সেইজন্যই জানালা বন্ধ করে—দক্ষিণের স্নিগ্ধ নয়ন-ভুলান হরিৎ-শোভার দিকে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকতুম। এক একদিন রাত্রে তরল জ্যোৎস্নাধোয়া ধূসর গাছের ঘন সারির ফাঁকে ফাঁকে আমার মন কার সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। কার যে সন্ধান—তা বোধ হয় ঠিক বলতে পারি না!

শৈশবে মাকে হারিয়ে আমি যত না শূন্যতা বোধ করতুম, কল্যাণীকে হারিয়ে আমার মনে হ'ল, আমার বুকের সব জায়গাটুকুই একবারে খালি হ'য়ে গেছে। তাই এক একদিন ছুটীর পর স্কুল থেকে বাড়ী ফেরবার পথে যে কত ছোট ছোট মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাদের কাণে-কাণে কি যে আবোল তাবোল ব'কে গেছি, তা হয়ত তারা বুঝতে পারত না, কিন্তু আমার মনে হ'ত, যেন আমার শূন্য বুকটা বেশ একটু তৃপ্তিতে ভরে গেছে।

তারপর আর এক দিনকার কথা। ঐ দিনটীর স্মৃতি আমার মন থেকে কখনও মুছে যাবে না, বরং যেন দিন দিন উজ্জ্বল হ'য়েই উঠছে।

সেদিন স্কুল যাবো ব'লে বই হাতে ক'রে কাকা-বাবুর ঘরের সম্মুখ দিয়ে চলে যাচ্ছি, হঠাৎ তিনি আমায় ডেকে বল্লেন—কাল তোমার কাকীমার বোন্ ঝি নির্ম্মলা এখানে আসবে। সে কলকাতায় মেয়েদের বোর্ডিং-এ থেকে পড়ে; গ্রীষ্মের ছুটীতে এখানে দিন কতক থাকবে। তাকে আনতে তোমাকে ষ্টেশনে যেতে হবে, কারণ তার এক দূর-সম্পর্কীয় দাদা তাকে ষ্টেশনে নামিয়ে দিয়ে যাবেন।

পরদিন ভোরেই ষ্টেশনে চলে গেলুম। আমার কৌতূহলী মন যেন কেমন আগে থেকেই এই মেয়েটীর সম্বন্ধে অনেক কথাই ভেবে নিলে।

ট্রেণ এসে দাঁড়াতেই একটা গাড়ীর দিকে আমার নজর পড়ল; দেখলুম, বার তের বছরের একটী সুন্দর ফুট-ফুটে মেয়ে জানলা দিয়ে মুখ বার ক'রে—ষ্টেশনের লোকের ভিতর যেন ব্যগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে। আমি কি জানি কেন, দৌড়ে গিয়ে গাড়ীর সামনে দাঁড়াতেই একটী যুবক ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি কি এই খানেই থাকেন? আমি সম্মতিসূচক উত্তর দিতে তিনিই বলে উঠলেন—আচ্ছা বলতে পারেন, সতীশ বাবুর বাড়ীর কোন লোক ষ্টেশনে এসেছে কিনা? আমি

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বল্লুম—আমিই সেখান থেকে এসেছি।

তখন তাড়াতাড়ি ক'রে সেই মেয়েটীকে নামিয়ে দিয়ে যুবকটী বল্লেন—তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত মনে চল্লুম।

গাড়ী তখন ছেড়ে দিয়েছে।

আমি একবার ভাল ক'রে মেয়েটীর মুখের দিকে চাইলুম। কি দেখ্‌লুম তা বোধ হয় এখনও বেশ বল্‌তে পারি। গোলগাল সুন্দর মুখখানি পথশ্রমে ক্লান্ত—ভাসা ভাসা উজ্জ্বল চোখদুটীতে একটা প্রহর বেদনা যেন আমার চোখে ধরা পড়্‌ল।

হঠাৎ মেয়েটীর কথায় চম্‌ক ভাঙ্‌ল—আমি নিজেকে সংযত করে বল্লুম—চল, গাড়ী আছে।

ঘোড়ার গাড়ীর ভিতর একদিকে তার ছোট একটী বাক্স ও বিছানা রেখে দিয়ে তাকে বল্লুম—ওঠ।

তারপর যেই আমি গাড়ীর দরজা বন্ধ ক'রে দেবার উপক্রম কর্‌ছি, অম্‌নি সে বলে উঠ্‌ল,—ওকি, ভিতরে আসুন, জায়গা ত রয়েছে।

আমি দ্বিরুক্তি না ক'রে তার পাশে গিয়ে বস্‌লুম।

ষ্টেশন থেকে আমাদের বাড়ী অনেক দূর, প্রায় পাঁচ মাইল পথ হবে। উচ্চৈঃশ্রবার অধস্তন বংশধরটী তার জরাজীর্ণ পরিশ্রমক্লান্ত দেহ নিয়ে যেরূপ মন্থর গতিতে চল্‌তে সুরু কর্‌লে, তাতে আমার মনে হ'ল, আড়াই ঘণ্টার কমে আর বাড়ী যেতে পার্‌ব না।

গাড়ীর ভিতর আমরা দুজনেই চুপ ক'রে বসে ছিলুম; আমার এক একবার ইচ্ছে হচ্ছিল, তার সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু একে আমি তার কাছে একেবারে অপরিচিত, তায় আবার আমি কি বল্‌তে হয়ত কি বলে ফেল্‌ব। হঠাৎ সেই-ই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বল্লে—আপনার কথা আমি আগে সব শুনেছি।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আমি বল্লুম—তুমি আমার কথা জান—কিন্তু আমিত তোমার নামটী ছাড়া কিছুই জানি না।

সে তখন আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লে—আপনার মত আমারও সংসারে কেউ নেই। মা-বাপ অনেককাল আগেই চলে গেছেন; বাবা তাঁর এক বন্ধুর হাতে আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন, আর ব্যাঙ্কে যা টাকা রেখে গেছেন, তাতেই আমি বোর্ডিং-এ থেকে পড়ি।

আমার মনের ভিতর তখন একটা সুপ্ত বেদনা মাথা নাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। আমিও যে তারই মত অনাথা—স্নেহের কাঙ্গাল! তার দিকে আমার মন কেমন আকৃষ্ট হ'য়ে গেল। সে আমার মুখের দিকে চেয়ে বোধ হয় তা দেখ্‌তে পেয়েছিল।

দু তিন দিন যেন কেমন একটা সঙ্কোচ ও লজ্জা এসে আমায় বাধা দিত, আমি তার সঙ্গে মন খুলে মিশ্‌তে পার্‌তুম না।

একদিন দুপুরে কাকীমা পাড়ায় বেড়াতে গেছেন। কাকাবাবু বাইরের ঘরে জমি-জমা-সংক্রান্ত দলিল পত্র দেখ্‌ছেন। আমার সেদিন কি জানি কোন্ একটা পর্ব্বের জন্য স্কুল বন্ধ। আমার মোটেই ভাল লাগছিল না; এক একবার মনে হচ্ছিল, খানিকটা ঘুরে আসি। কিন্তু কাকাবাবুর কড়া হুকুমে বাইরের কারো সঙ্গে আমার মেশ্‌বার যো ছিল না; সঙ্গীর অভাবে আমার মনটা ভারি ফাঁকা ফাঁকা বোধ হ'ত।

আমার পাশের ঘরে নির্ম্মলার ঘর ঠিক হ'য়েছিল। অন্যমনস্ক হ'য়ে আমার ঘরে ঢুকতেই দেখি, সে কল্যাণীর ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, আর তার ভাসা-ভাসা চোখ দিয়ে মুক্তোর মত টলটলে অশ্রু গড়িয়ে পড়্‌ছে। আমি যে নিঃশব্দে কখন তার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তা সে মোটেই জান্‌তে পারে নি, হঠাৎ পিছন ফিরে আমার দিকে চেয়ে সে সঙ্কুচিত হোয়ে বল্লে—আপনার বোন্‌ত বেশ

সুন্দর দেখতে ছিল। আপনার ত একটী বোন্ ছিল, কিন্তু আমার যে কেউই ছিল না।

আমাদের মধ্যে যে ব্যবধানের প্রাচীর ছিল, কে যেন তা ভূমিসাৎ ক'রে দিল। আমার সঙ্কোচাকুল অবশ হৃদয় তার দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল। হঠাৎ কি জানি কি খেয়াল হ'ল, তার হাতটী ধরে ফেল্‌লুম। তারপর গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বল্লুম—কল্যাণী যেঁচ থাকলে ঠিক তোমার মতই হ'ত; তার মুখ আর তোমার মুখ যেন একই ছাঁচে গড়া।

সে তখনও ঠিক তেমন ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। আমি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বল্লুম—নির্ম্মলা, আমি তোমার মধ্যেই তাকে পেতে চাই।

নির্ম্মলা ছল-ছল চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—আজ থেকে তুমি আমার দাদা। আমায় তার মত ভাল বাস্‌বে ত?

সেই থেকে আমাদের মধ্যে সব ব্যবধান দূরে চলে গেল। সে যখন আমাকে দাদা বলে ডাকত, তখন আমার মনে হ'ত, কল্যাণী বুঝি আবার এতদিন পরে ফিরে এসেছে। একদিন হঠাৎ তাকে অন্যমনস্ক হ'য়ে কল্যাণী বলে ডাকতেই সে বল্লে—দাদা, আমায় তুমি কল্যাণী বলেই ডেক।

কি আশ্চর্য্য! সে আমার মনের সব দুর্ব্বলতা এই ক'দিনের মধ্যেই ধরে ফেলেছে!

সহমর্ম্মিতার হেম-কাঠির স্পর্শে দুটী তরুণ হৃদয় আকৃষ্ট হ'য়ে পড়্‌ল।

যুবক সম্মিলনীতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঐ খানেই তো দোষ। আমরা সব কাজ করিব, কিন্তু তার মধ্যে গোঁড়ামিও যথেষ্ট রাখিব। অধ্যাপকগণ নিম্ন জাতির হাতের জল খান না, কিন্তু অনেক স্থানে আমি নিজে দেখিয়াছি, যে জলের পাত্রে বরফ দেওয়া থাকে, সেই পাত্র হইতে জল খাইতে তাঁহাদের কোন আপত্তি থাকে না। বরফ খাইতে কোন দোষ নাই, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকের হাতের জল খাইতে যত দোষ।

এ রকম ভণ্ডামি করিয়া কখনও কোন জাতি বড় হন নাই এবং হইতেও পারে না। বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজে এই ব্যবস্থা থাকায় এই দুই প্রদেশের অবস্থাই সব চেয়ে খারাপ।

একথা কথা আছে অপাংক্তেয়—মানুষ মানুষের সঙ্গে এক সঙ্গে বসিয়া খাইবে না—এই নিয়ম এক হিন্দু জাতি ছাড়া অন্য কোন জাতির ভিতর নাই।

যদি কোন নমঃশূদ্র ব্রাহ্মণকে এক গ্লাস জল খাইতে দেয় এবং ব্রাহ্মণ তাহা খায়, তাহা হইলেই নমঃশূদ্রের গায়ের রক্ত জলের রঙ্গ দিয়া ব্রাহ্মণের রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার রক্ত নষ্ট করিয়া দিবে। কুকুর বা বিড়ালের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে আমাদের জাতি যায় না—নীচ জাতির লোকের স্পৃষ্ট জিনিষ খাইলেই জাতি যায়।

যদি কোন নমঃশূদ্র তোমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে—যেই মাত্র সে ঘরে দুই পা দিবে, অমনি ঘরের অদূর পার্শ্বস্থিত কলসীর জল নষ্ট হইয়া যাইবে—সে যদি ঘরে উঁকি মারিয়া দেখে তাহা হইলে জল নষ্ট হয় না। এ যে কি রকম বিধি, তাহা আমি এ জীবনে বুঝিতে পারিলাম না।

আবহমান কাল হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহাই যে এখনও চালাইতে হইবে—ইহার তাৎপর্য্য কি? বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যদি মনের সংস্কার দূর না হয়, তবে সে লেখা পড়ার দরকার কি? শুধু পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিলেই কি মানুষ হওয়া যায়? এখন যেখানে আছ, সেখান হইতে নড়িতে হইবে, মনের ভাব পরিবর্ত্তন করা দরকার। সকলে তোমরা অবসর সময়ে

সামাজিক সংস্কার কার্য্যে লাগিয়া যাও, নিজেরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে যে তাঁহারা কায়স্থ তাঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ, দক্ষিণরাঢ়ী, উত্তররাঢ়ী প্রভৃতির মধ্যে গণ্ডী না দিয়া সকলের মেয়ে বিবাহ করিবে ব্রাহ্মণ, রাঢ়ী, বারেন্দ্রের পার্থক্য তুলিয়া দিবে। তাই বলিয়া আমি কাহাকেও নিম্ন শ্রেণীর লোকের মেয়ে বিবাহ করিয়া বাহাদুরী দেখাইতে বলি না। চতুর্দ্দিক হইতে এখন বালিকাবধূ নির্য্যাতনের খবর পাইতেছি। যে দিন আহিরীটোলার হাঙ্গামা হইয়া গেল, দিনাজপুরে হইল—আরও অনেক স্থানে হইতেছে। তার প্রধান কারণ টাকা। দরিদ্র মেয়ের বাপেরা যত টাকা বরপণ দেবার কথা, তত টাকা দিয়া উঠিতে পারবেন না—কাজেই শাশুড়ী বালিকাবধূর উপর অত্যাচার করে। সে সময়ে তোমাদের সব মাতৃভক্তি উথলিয়া উঠে, তোমাদের চোখের সামনে বালিকাগুলির উপর অত্যাচার হয় এবং তোমরা তাহার কোন প্রতিকার করিতে পার না। তোমাদের নিকট হইতে আমি কত জিনিষ আশা করিয়া থাকি—কিন্তু কিছুই পাই না—ইহা বড়ই লজ্জার বিষয়।

খদ্দরের কথা।

তোমাদের অর্থাৎ এই কলেজের সব ছাত্রদের দিকে যখন আমি তাকাই, তখন আমার সকল আশা একেবারে লোপ পায়। তোমাদের মধ্যে শতকরা একজনও খদ্দর পরিধান কর কিনা সন্দেহ—যারা বাঙ্গালাদেশে খদ্দর প্রস্তুত করিয়াছিল, তারা এখন মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে, বিলাতী কাপড়ের দর সস্তা, কাজেই দেশের গরীব দুঃখীরা বেশী দাম দিয়া খদ্দরের কাপড় কিনিতে পারে না। তোমরা অনায়াসে খদ্দর পরিধান করিতে পার, কিন্তু কেহই খদ্দর পরিবে না—কিছুতেই না। তোমরা অনায়াসে খদ্দর পরিতে পার, বিলাসিতায় কত পয়সা তোমরা খরচ করিয়া থাক—কেন মোটা কাপড় পরিবে না? শীতকালে মোটা মোটা ওভার কোট পরিতে পার—গ্রীষ্মকালে একটা গেঞ্জি একটা শার্ট, তার উপর আবার একটা সার্ট—একটা খদ্দরের জামা কি তার চেয়ে বেশী মোটা? তোমরা যদি এখন খদ্দর না ক্রয় কর, তাহা হইলে কে খদ্দর কিনিবে? লোক হতাশ হইয়া আর তো খদ্দর প্রস্তুত করিবে না। অনেকে ভাবিতেছেন, আজ সস্তায় পাইতেছি, কাজেই বিলাতী কাপড় ক্রয় করি। তাঁদের ভাবা উচিত যে, বিলাতী কাপড়ের ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশে দান সাগর করিতে আসে নাই! আজ তাহারা খদ্দরের প্রচার বন্ধ করিবার জন্য সস্তায় কাপড় দিতে পারে, কিন্তু খদ্দর একেবারে বন্ধ হইয়া গেলেই কাপড়ের দর তারা করিয়া দিবে। এখন যদি একটু কষ্ট করিয়া বেশী দাম দিয়া আমরা খদ্দর পরি, তাহা হইলে ২।১ বৎসরের মধ্যেই খদ্দর সস্তা হইয়া যাইবে, তখন আর এত বেশী দাম দিয়া খদ্দর ক্রয় করিতে হইবে না।

আমরা ঘোড়া হইতে কখনও সাবধান হই না। আমরা কয়েকজন মিলিয়া একটা ষ্টীমার কোম্পানী খুলিয়াছিলাম। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল একটা বিলাতী ষ্টীমার কোম্পানী। আমাদের কোম্পানী কাজ আরম্ভ করার পরই বিলাতী কোম্পানী ভাড়া কমাইয়া দিল। আমাদের দেশের লোকেরা তখন এক পয়সা কম ভাড়ার লোভে বিলাতী কোম্পানীর ষ্টীমারে যাইতে লাগিল। আমাদের ষ্টীমারে কেহ না যাওয়ায় ষ্টীমার সাভিস উঠাইয়া দিতে হইল। যখন আমাদের ষ্টীমার উঠিয়া গেল, তখন সুযোগ বুঝিয়া বিলাতী ষ্টীমার কোম্পানী ভাড়া অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়াইয়া দিল—সেই ভাড়ায় এখন লোককে যাতায়াত করিতে হইতেছে।

তাই তোমাদের বলি, তোমাদের বিলাসিতা ত্যাগ করিতেই হইবে। মিহি কাপড়, পম্পশু জুতা একেবারে ছাড়িয়া দাও। খদ্দরের পয়সায় এ বাবুয়ানী করিয়া লাভ কি? কোন ছাত্র এখনও খদ্দর

না পরিয়া কি করিয়া মিহি বিলাতী কাপড় পরে, তা' আমি কিছুতেই বুঝিতে পারি না।

একজন ফার্ষ্ট ক্লাস এম, এস, সি আজ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। সে বেশ মিহি বিলাতী কাপড় ও জামা পরিয়া আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াই আমি বলিলাম—হয় তুমি গলায় দড়ি দাও, না হয় আমি গলায় দড়ি দিয়া মরি। আমার ছাত্র হইয়া তুমি কি করিয়া এখনও বিলাতী কাপড় পর, তাহা বুঝা আমার বুদ্ধির অগম্য। তোমরা আমার প্রিয় ছাত্র, তোমাদের দিকে না তাকাইয়া আমি কাহার দিকে তাকাইব? তোমরা যুবক, তোমরা যদি আমার কথা না শুন, তাহা হইলে কে আমার কথা শুনিবে? তোমরা আমাকে ভালবাস বলিয়া আমি কি তোমাদের নিকট কিছু পাইবার দাবী করিতে পারি না? আমার এ দাবীটী কি তোমরা রাখিবে না?

যদি দেশে চরকা ও তাঁত চলে, তাহা হইলে দেশের কোটি কোটি নিরন্ন লোকের অন্ন সংগ্রহ হইবে। কৃষকদিগের মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে না। স্বদেশ-প্রচার ও অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন বিষয়ে আমি মহাত্মা গান্ধির যেমন ভক্ত, এমন বোধ হয় আর কেহ নয়। কলিকাতায় কংগ্রেসের সময় সামাজিক কনফারেন্সে আমি মহাত্মার সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া একসঙ্গে কাজ করিয়াছি। এখানে একটি কথা বলিয়া আমি নিজে গৌরব অনুভব করিতে চাই। মহাত্মা গান্ধিকে আমিই কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথমে লোকের নিকট পরিচিত করিয়া দিই। সে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। মহাত্মা সেবার এলবার্ট হলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অবস্থা-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তোমাদের শেষ কথা বলিতে চাই—সকলে কার্য্য আরম্ভ কর—বিলাসী হইয়া বসিয়া সময় নষ্ট করিও না। যে যতটুকু পার, কাজ কর। কেন, রামের সেতু বন্ধনের সময় কাঠবিড়ালী কি কোন কাজ করে নাই? তোমাদের করিবার যথেষ্ট কাজ আছে। রাজনৈতিক দলে যাইতে বলি না আমি বিজ্ঞান কলেজ, বেঙ্গল কেমিকেলের কারখানা প্রভৃতিতে থাকিয়া কি কাজ করি না? বাষ্টিনিয়েই সমষ্টি, সকলে মিলিয়া কাজ না করিলে কাজ শেষ হইবে কি করিয়া? আমি বসিয়া ঘুমাইব, আর দেশটা আপনি জাগিয়া উঠিবে? সকলে সভা হইতে ফিরিয়া গিয়া এই সকল কথা চিন্তা করিও। তোমাদের কর্ত্তব্য সাধনের জন্য তোমরা কি কাহারও নিকট দায়ী নও?—তোমার মাতৃভূমির নিকট দায়ী, ঈশ্বরের নিকট দায়ী—সে দায়িত্ব-জ্ঞান লইয়া কাজ না করিলে পাপ হইবে। তাই আবার বলি—সকলে কাজ কর।

ভাগের পূজা

[লেখিকা—শ্রীলীলাদেবী]

পূর্ণ পূজারীগণ :—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া (২) শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার; (৩) শ্রীমতী সরসীবালা বসু (৪) শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী (৫) শ্রীমতী চারুবালা বসু (৬) শ্রীযুক্ত অভয় কুমার সেন।

প্রসাদের মার কথা

সরলা বৌকে স্নান ক'রতে পাঠিয়ে দিয়ে, নিত্য পূজার খানিকটা সেরে, মনে হ'ল প্রসাদ কেন আজ এখনও আমার জল খাওয়ার তাড়া ক'রতে পূবার ঘরের চারধারে তার সেই ভক্তি আপ্লুত চক্ষু দুটীর আবেদন জানিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে না? তার আবদারে পূজো ছেড়ে উঠ্‌তেই হয়; সাম্‌নে ব'সে আমায় জল খাইয়ে তবে সে ছাড়ে। অতদিন তার অঙ্গে কত

বিরক্ত হই। সংসারের মোহ, ছেলের মায়া, একমনে ঈশ্বর আরাধনার বাধা এই সব ভাবি আর স্নেহ পূর্ণ বিরক্তিতে ছেলেকে ধমক দিই। সে এক অপূর্ব্ব ভর্ৎসনা ও ভালবাসা, আনন্দ ও মিনতির ব্যাপার! আমার বকুনি খেয়ে প্রসাদের প্রশান্ত ওষ্ঠ বেয়ে কি সরল হাসির রেখাই না ফুটে ওঠে! তখন আমার মনে হয় যেন আমার সেই ২০ বছর আগের ৬ বৎসরের শিশুটী। যে পূজার ব্যাঘাতে অন্যদিন বিরক্ত হই আজ কিন্তু সেই ব্যাঘাত টুকুর অভাবে একেবারেই পূজোয় মন ব'সছিল না। কতক্ষণে তার সেই মা ডাক, চোখ দিয়ে নীরব আহ্বানের মিনতি সে আমার দরজার পাশ থেকে জানাতে আসবে? হে ভগবান্! বাধা, বাধা, ব্যাঘাত, ব্যাঘাত করে অস্থির হই কিন্তু তুমি যখন অবাধ অবসর অব্যাহত জীবন দাও তোমাকে ডাকবার জন্যে, তখন যে তোমায় ডাকার মতন মন একটুও হয় না আর! তার চেয়ে বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে দিয়ে তোমায় ডাকা বরঞ্চ হয়, কারণ যেটা পাইনা সেটা পাওয়ার তৃষ্ণা, যেটা হয় না সেটা হওয়ার ইচ্ছা—মানুষের মনে স্বভাবতঃই বলবতী! আর আসনে ব'সতে পারলুম না, তাড়াতাড়ি প্রসাদের ঘরে ঢুকে দেখি···

এ-ও যে কখনও দেখতে হ'বে, তা যে ভাবি-নি, ভাবতে পারি নি। ধ্যানমগ্ন যুবা ও কার ছবির সামনে বসে হৃদয় ঢেলে অঞ্জলি ভরে ও কি ঢেলে দিচ্ছে? ছবিখানা—গয়লা বৌ-এর। হঠাৎ একটা বেদনা যেন ভূতল থেকে উঠে অকস্মাৎ আমার সকল অঙ্গ জড়িয়ে ধরলে। যে কথা ভাবতে যাই, পারি নে; যা-নয় ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিতে যাই, ভুলে যাই, সেই বারিয়ে যায়,—পারি নে; যা হ'তে পারে না মনে করে' দৃঢ় হ'তে চাই, মন থেকে সে কথা আপনা থেকেই দূর হ'য়ে যায় আর মনে হয় সত্যি সত্যি সত্যি। চোখের সামনে যা দেখছি—তাই সত্যি! চোখের দেখা জিনিসটাকে মিথ্যা করতে যা আমি ভাবতে চেষ্টা করছি—সে'টা সত্যি নয়—সত্যি এইটে! চোখের সামনে যা রয়েছে, অগ্নি হেজে যা জ্বলছে! উঃ প্রসাদ! প্রসাদ! আর কেউ নয়? প্রসাদ? তবু-তবু-পারছি না! এ যে নিজের ছেলে! এর দোষ চক্ষে দেখেও কালোকে সাদা বলার মত সুস্পষ্ট মিথ্যাকে আশ্রয় ক'রছি তবু প্রসাদ যে এমন তা ভাবতে পারছি না! প্রসাদ—প্রসাদ—আমার সেই এতটুকুনি প্রসাদ যে-কি তখন এমন হ'তে পারে না হয়? গয়লা বৌ-এর ছবি এঁকেছে ব'লেই কি সে গয়লাবৌকে আটক করার ষড়যন্ত্রে ছিল? গয়লা বৌএর ছবি এঁকেছে ব'লেই কি প্রসাদ আমার খারাপ ছেলে! যা সুন্দর তাই মানুষ আঁকে গয়লা বৌএর ওই যে যথার্থের অসহায়, নিঃস্ব দা-পা ভরা যৌবন-উচ্ছল রূপ এ যে আঁকবারই মত। তা হ'লে কি দরকার ছিল পত্নী নিয়ে আঁকা আঁকির। মায়ার মধ্যে যেন কেমন ক'রছিল—কিন্তু অত বড় ছেলের সামনে চক্ষুলজ্জাও তো বড় কম নয়—তাই আর কিছু না ব'লতে পেরে শুধু ব'লুম—"কি ক'রছিস্ প্রসাদ?" সে ব'লে—"কিছু না মা!" আমি আর সেখানে দাঁড়াতেই পারলুম না, হন্ হন্ ক'রে একেবারে নিজের শোবার ঘরের জানালার কাছে যেখান থেকে আম বাগানের খানিকটা দেখা যায় সেইখানে পাতা মাদুরের উপর মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়লুম—তাই কি প্রসাদ দেশ ছেড়ে যেতে চাইছে না? পল্লী সংস্কার, সমাজ হিতৈষণা, পরোপকার এ সব কি শুধু তার গুপ্তবৃত্তির ঢাকনা? উঃ এতটা যে ভাবতেও পারা যায় না? পাপের নগ্নরূপ দেখিয়ে দিয়ে যখন মানুষ পাপ করে তখন তা তত বীভৎস হয় না বরঞ্চ তা শিক্ষাপ্রদ হ'তে পারে। কিন্তু ধর্ম্মের আবরণে শুভ্র পবিত্রতা দিয়ে মনোমুগ্ধকর ভাবে সাজিয়ে যখন সে পাপকে গোপনে প্রশ্রয় দেয় তখন তা কি ভীষণ কি ভয়ঙ্কর! কাল যাকে আদর্শ স্থানীয় ভেবে পুত্র গৌরবে বুক আমার পূর্ণ হ'য়েছিল আজ তা' কি আঘাতেই না চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে ধূ ধূ শূন্যতায় ভ'রে উঠ্‌লো! সবাই

দেশ ছেড়ে যেতে চাইলে আর ঐটুকু ছেলে সংসারের অনাহার-বাসের লোভ অনায়াসে দমন ক'রে পল্লীর মঙ্গলের জন্যে যখন দৃঢ়কণ্ঠে কার ব'লেছিল—"না মা আমি কিছুতেই এ দেশ ছেড়ে যাবো না।" তখন যে আমি "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা" করার মতন ছেলেই তাকে ভেবেছি। আজ কিনা একেবারে এই? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বাগানের দিকে নজর প'ড়ল, দেখি গয়লা বৌ স্নান ক'রে কিরছে—ভিজে কাপড়ে তার রূপের অপ্রকাশ ঐশ্বর্য্য এমন ভাবেই ফুটে উঠেছে যা শিল্পীর আদর্শ, কবির কবিতা হ'তে পারে—! পুত্র পরনারীর চিত্র এঁকে অন্যায় করলেও তার অভ্যুজ্জ্বল আদর্শ চোখে পড়তেই আমার আনন্দ হ'লো! গয়লা বৌ-র রূপ দেখবার এবং হৃদয় থাকলে তা বোঝবার মত!

আর কবি বা শিল্পী, যে সে রূপ বর্ণনার প্রলোভন এড়াতে পারবে না, তা সেই মুহূর্ত্তেই মনে হ'ল যে মুহূর্ত্তে সিক্ত জলপদ্মটির মত সিক্ত বসনে ঢল-ঢল চোখে ধীর পায়ে বাড়ীর দিকে তাকে আসতে দেখ্‌লুম। আমার ছেলে না এঁকে অন্য কেউ ঐ তরুণীর ছবিটি এঁকে কোন মাসিক কাগজে ছাপাতো, শিল্পীর সুখ্যাতি বেরিয়ে যেতো, আমিও করতুম, এ নিশ্চয়! কিন্তু এ যে চোখে দেখ্‌ছি, কেমন-কেমন ঠেক্‌ছে, কেমন যেন বিষদৃশ ভাব আপনা থেকেই পাপ মনে জমে উঠ্‌ছে।

হঠাৎ গয়লা বৌ কাকে দেখে অমন ক'রে গায়ের কাপড় টেনে মাথায় ঘোমটা বাড়িয়ে দিলে—অমন ক'রে কার দিকেই বা চাইলে সে? ওঃ বুঝেছি আমারই—আমারই—ছেলের! প্রসাদ যে তখনও সেই জানালার সামনেই ছবি নিয়ে বসেছিল, চোখে দেখে এসেছি! ভাবতেই চোখের পাতা মুদে গেলো, আর মনে হ'লো, সর্ব্ব অঙ্গ অসাড় হ'য়ে আসছে।

ভিজে কাপড় ছেড়ে পিঠের উপর চুলগুলি এলিয়ে দিয়ে গয়লা বৌ এসে ডাকলে "পিসি মা!" আমার মনটা তখন এমন হ'য়েছিল তার দিকে না চেয়েই ব'লুম "যা জল খেয়ে আয়। ঐ বারান্দায় ঢাকা দিয়ে রেখেছি।"

সে চলে গেল, আবার সেই ভাবনা, আর কিছুই নয়। শুধুই সেই! শুধুই! শুধু মনে হয়, প্রসাদ! প্রসাদ! আর কিছু নয় প্রসাদ! প্রসাদ কি করেছে, কত বড় অন্যায় কাজ করে কি ভীষণ অপরাধ সে করেছে—কিছু না, শুধু চট উঠ্‌তে লাগলো—প্রসাদ। প্রসাদ! আর কিছু না! দেহ দুর্ব্বল হৃদয় মাতৃ-হৃদয়ের সবটুকু কোমলতা নিঃশেষ করে' সেই যৌবন দৃপ্ত দৃঢ়চিত্ত যুবককে বুকের মাঝখানে টেনে আনে আবার কারা তা'কে ঠেলে ঠেলে বার করে দেয়! জানি-নে, তারা কে? কত তাদের শক্তি, কেমন তারা যে মা'র বুক থেকে ছেলেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়! আর যে সে ছেলে! সেই ছেলে! রূপে, গুণে, মহত্বে, চরিত্রে—যার তুলনা নেই! আর সেই ছেলে, যার গর্ব্ব এই মার বুকখানায় ভরে আছে, কানায় কানায়, রন্ধ্রে রন্ধ্রে! কোথায় এতটুকু স্থান ফাঁক নেই—আমার সেই ছেলে! এমন ছেলে!

ভাবতে ব্যথা লাগে, প্রসাদ অন্যায় করেছে! আবার নিমেষের দেখা সেই ছবিটাকেও ভুলতে পারি নে। সেই ক্ষণিকের দেখা ছবিখানার মধ্যে যে এত গ্লানি, এত লজ্জা লুকিয়ে ছিল বা থাকতে পারে—হয়ত প্রসাদও তা জানে না, তাই সে এঁকেছে। 'অভাগিনী গয়লা-বৌ-এর ব্যথায় তার কোমল কবি হৃদয়টি ব্যথা পেয়েছে তাই তার তুলির মুখে সেই ছবি বেরিয়ে এসেছে, প্রসাদ তাতে দোষ দেখে নি, তার মা আমি—আমারও দেখা উচিৎ ছিল না কিন্তু—আম বাগান দিয়ে আসবার সময় গয়লা বৌ-এর সেই যে সলাজ সানুরাগ চাহনিটা দেখেছি, সেটা যে ভুলতে পারি নে। সেটাই যে লজ্জাকে গাঢ় করে তুলছে। অমন করে চাইবার তার কি উদ্দেশ্য এবং চাইতেই বা লজ্জার ভাবটা অমন

কেন এ প্রশ্নের উত্তর ত নেই—তাইত ভাবছি—এ কি !

প্রসাদ খেতে আসছে শুনেই উঠে পড়তে হ'ল। ঘর থেকে মুহূর্তের জন্য সব আদর কেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। মলো বৌএর গুড়-মুড়ি যেমন ঢাকা, তেমনি পড়ে ছিল, সে রৌদ্রে পিঠ দিয়ে ঘুম না কলাই কি বাচছিল, বলুম—জল খাও নি কেন বাছা ?

মলো বৌ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে-তুমি জল খেয়েছ পিসি মা ?

না—না—ঐ কণ্ঠে পাপ নেই – নেই ! ঐ চক্ষের দিব্য দৃষ্টিতে আবিলতা থাকতে পারে না ! মনে হ'তেই আবার স্নেহে বুক যেন ভিজে গেল, বলুম—আমি খাচ্ছি, তুই খা-না মা !

বল্লে—খাই পিসিমা !

মলো বৌএর কথা

যাঁকে সেবা দিয়ে শ্রম দিয়ে ভক্তিশ্রদ্ধার -অর্ঘ্য দিয়ে দিনরাত পূজো ক'রতে ইচ্ছে করে যদি তাঁরই কলঙ্ক ও অপবাদের হেতু হ'য়ে দাঁড়াতে হয় তাহলে সে ব্যথা যে কতখানি বাজে তা আর ব'লে কি ক'রে বোঝাব ! আমার স্বামীকে আমার মনেই পড়ে না, এমন কোন মানুষ এতদিন দেখিনি যাকে বুকের ভেতর বসিয়ে পূজো ক'রতে ইচ্ছে হ'য়েছে কিন্তু যেদিন পাষণ্ড জমীদারের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বেরিয়ে এলুম—সেদিন আমি নিরাশ্রয়। পতিতা ব'লে ঘরের লোকে ঘরে ঠাঁই দিলে না। কোথায় যাই ? আশ্রয় দিলেন তাঁরই মা। যিনি নিজে বিধবা। আমাকে ঘরে রাখলে লোকে তাঁর নিন্দে রটাবে এ ভয় তাঁর এতটুকুও হ'ল না। এত ভালো এত মহৎ তাঁর অন্তঃকরণ। তিনি কেমন আর তাঁর ছেলে কেমন তা আমি ব'লে শেষ ক'রতে পারি সে সাধ্য আমার নেই। তবে এটুকু ব'লতে পারি এমন মা এমন ছেলে-আমাদের এত বড় গাঁ-টায় আর ছিল না। কমলবাবুর আচরণ দেখে পুরুষ জাতির উপর আমার এমন একটা ঘৃণা এসে-ছিল যদি এঁর দেখা না পেতুম তাহলে বোধ হয় এ জন্মের মত পৃথিবীর বাস তুলা নিটে যেতো। যেদিন থেকে তাঁর সঙ্গে প্রথম চোখো চোখী হ'য়ে নূতন। সেদিন থেকে আমিও নতুন। জগতও চোখে চোখে মিলে গেলে যে এত সুখ—কে তা জানতো—কেমন ধারা সুখ ? তা তো ব'লে বোঝাবার নয় কেমন করে বোঝাতে হয় আমি জানিনে। বুকের ভিতর কেন যে থেকে থেকে কাঁপে, তাঁর চলা ফেরার পথে পলার আওয়াজে কেন নেশা করার মত মুগ্ধ হ'য়ে থাকি তাই বা কে বলতে পারে। এ যে কি—কিসের অনুভূতি তা জানিনে শুধু এই জানি এখন আর এ জীবনে হরিনি কখন ! এত ভালো লাগে নিজেকে এই ভাবনাটার সঙ্গে মিশিয়ে রাখতে ! এতে যে কোন দোষ আছে তা আমি বুঝতে পারি না। মনে হয় কেন তিনি সবক্ষণ কথা ক'ন্ না, তা'হলে আমি সারাদিন সেই ধ্বনি শুনি, কেন তিনি দিনরাত ঘরের মধ্যে না থেকে বেড়িয়ে বেড়ান না, তা হ'লে ত আমি সেই পথ বুক পেতে নিই। সারা দিনটা মনের মধ্যে কেন সেই কথা, কেন সেই চিন্তা—বুঝতে পারিনে।

কাল যখন দুধ জাল দিচ্ছি তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন, পিসীমা মালা জপছিলেন—এমন সময় ভগবতী দিদিমার মেজ মেয়ে এসে মুখের উপর ব'লে ব'লে ফেল্লে—"তা ভালো তোমার ও যে এমন কলিকেলে বুদ্ধি তা জানতুম না বৌ। আচ্ছা তুমি কি ব'লে তোমার ঐ সোণার চাঁদ ছেলেকে ঐ নষ্ট স্ত্রীর সামনে বিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছ তাই ? এত বড় গাঁ খানার কেউ যা সাহস করলে না, তুমি—তুমি মেয়েমানুষ, ভদ্র ঘরের বিধবা, তুমি ঠাঁই দাও বা কেমন ক'রে পোড়ার মুখীকে।"

সিসীমার তখন মালা জপ শেষ হ'য়েছে। শান্ত ভাবেই তিনি ব'ল্লেন "এতে তোমাদের মাথা ব্যথা কেন ঠাকুরঝি! জমীদার যদি দোষ ক'রে থাকে তাকে শাস্তি দাও সরলা বৌএর দোষ তাতে কিছু নেই, লোকে ব'লেও আমি তা বিশ্বাস ক'রিনে। ওরো আমাকেই যদি জমীদার তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আটক্ ক'রে রাখে—তাতে আমার কি দোষ?"

শাস্ত মুখ নেড়ে সিসীমার ঠাকুরঝি ব'ল্লেন—"কে জানে বাপু ও সব বিচের টিচের আমিনে তোমার ভালোর জন্যেই আমায় ব'লতে আসা। তোমার নামে যে একটা কুকথা লোকে ব'লছে বৌ, সেটা কি আর আমার শুনতে ভালো লাগে?"

হাসি মুখেই সিসীমা ব'ল্লেন—"কি কুকথা আমার নামে ব'লেছে সেটা ব'লেই ফেলো না ঠাকুরঝি?

জিভ্ কেটে ঠাকুরঝি ব'ল্লেন—"ছি ছি সেকথা কি মুখে আনবার, যে মুখ দিয়ে বের ক'রব? তোমার কি আমি বলতে পেরুম বৌ, লোকে কি আর তা বোঝে? তবে কি না তোমার বিয়ের যুগ্যি ছেলে রয়েছে ঘরে তাই ব'লছি প্রসাদের নামে যদি কেউ কোনো কথা বলে তোমারও তো সেটা শুনতে তিরিপ্তি হবে না।"

সিসীমা কিছু বলবার আগেই সিসীমার ছেলে ব'ল্লেন—"প্রসাদের নামে নিন্দে রটলে কিছু ক্ষতি নেই, তার বদলে যদি একজন অনাথার প্রাণ ও মান বাঁচে তাইতেই আমরা তৃপ্তি বেশী পাবো।"

বিধবা বেশ করে নাক সিঁটকে বল্লেন—আমার বলা তোমাদের ভালোর জন্যেই বাছা!

সিসীমা ব'ল্লেন—"তুমি তো ব'লছ ঠাকুরঝি। কিন্তু সরলা বৌএর যে আর স্থান নেই এটাও তো ভাবতে হবে। ওকে আর সরলা পাড়ায় নেবে না, আমি যদি ওকে যেতে বলি তা'হলে ওকে পথে গিয়েই দাঁড়াতে হবে! নিরাশ্রয় পশু পাখীকেও মানুষ আশ্রয় দেয় আর এই ছেলে-মানুষ মেয়েটাকে মেয়েমানুষ হ'য়ে, মেয়ে হ'য়ে আশ্রয় দিতে পারবো না? এত নিষ্ঠুর এখনো হ'তে শিখিনি ভাই।"

—"তা বলে নিজের ছেলের সর্ব্বনাশ, নিজের কলঙ্ক মাথা পেতে নেবে বৌ? স্বামী ছেলের সুনামের চেয়ে কি ঐ নষ্ট ছুড়িটাকে আশ্রয় দেওয়া বেশী হ'ল গা?"

তোমাদের বিচারে না হ'তে পারে, আমাদের বিচারে তাই বটে। বিচার বুদ্ধি ত সকলের সমান হয় না ঠাকুরঝি!

হঠাৎ চেয়ে দেখি, তাঁর ছেলের মুখ যেন সহসা আকাশের অনেকখানি আলো এসে পড়ে জল্ জল্ করে দিলে। সিসিমা-ও ছেলের দিকে চেয়ে ব'ল্লেন—ঠাকুরঝি, যারা নিন্দে রটায় তাদের বলো, যে কাজ আমি করেছি, তার ফল ভাল বা মন্দ ভোগ আমিই করব, আর কেউ করবে না, বা করতেও আমি কাউকে ডাকব না—এটা ঠিকই!

রাগে গর্ গর্ ক'রতে ক'রতে সিসীমার ঠাকুরঝি চ'লে গেলেন। সিসীমাও আর কোনো কথা না ক'য়ে উপরে উঠ্লেন। আমিও দুধের কড়া নামিয়ে তাড়াতাড়ি জল আনতে চ'ল্লুম। তাঁর ঘর থেকে পুকুর ঘাটের খানিকটা পথ দেখা যায়, যাওয়া আসার সময় আমার চোখাচোখী হ'য়ে গেলো। এইটুকু চাহনির মাঝে যে কি সুখ কি আনন্দ পাই তা তাঁর পায়ে প'ড়ে জানিয়ে দিতে ইচ্ছা করে! কিন্তু এ সুখের লোভে তাঁকে কষ্ট দিতে পারবো না আর তাঁর মাকেও নিজের ভাগী ক'রতে চাইনে। ঐ যে সিসীমার ঠাকুরঝি ব'লে গেলেন—"পরের মেয়ের জন্য সর্ব্বনাশ ডেকে আনবে নিজের ছেলের" —সত্যই তো আমি কে তাঁদের যে আমার জন্যে তাঁরা এত অপবাদ মাথায় করে নেবেন শুধু শুধু। তাঁরা ভালোবেসে দয়া ক'রে আমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন এইটুকু ভেবেই তাঁদের এখান থেকে আমার চ'লে যাওয়া উচিৎ। যাঁরা আমার উপকার ক'রলেন—

ওঁদের আমি অপকার ক'রছি! ছি! এত নীচ কেন হ'তে যাবো? তা ছাড়া তাঁর গায়ে যে একটীও আঁচড় লাগ্‌বে তা আবার আমার জন্যে এ আমি কিছুতেই সহ্য ক'রতে পারবো না। আমি চ'লে যাবো। কিন্তু কোথায় যাবো? পথ চিনিনে, লেখাপড়া যা জানি তাতে ক'রে কোন কাজ হয় না। হাতে পাঁচটী টাকা আছে ক'দিনই বা চ'লবে তাতে। কান্না পায়, লোক দেখলে বলতে ইচ্ছে হয়, ওগো তোমরা কেউ ব'লে দাওনা, কোথায় যাবো আমি? আমার যে কেউ নেই আর! কোথায় যাবো তা জানিনে কিন্তু যেতে যে হবেই তা জানি, কেউ দাওনা গো বলে, কোথায় যাই কোথায় গেলে একটা মাথা গোজবার ঠাঁই মেলে! কিন্তু কে বলে দেবে? দিক্ আর নাই দিক্ আমি যাব। আমি এখানে থাক্‌লে তাঁর নিন্দে, তাই আমি দূরে চ'লে যাবো—যেখানে গেলে তাঁরও আমার মধ্যে অমন কত শত ক্রোশের পথ আড়াল হ'য়ে দাঁড়াবে। আর থাক্‌তে পারলুম না—দুই চোখ ছেয়ে জল গড়িয়ে এলো, রান্নাঘরের রোয়াকে মস্ত একটা অশথ গাছ ছিল, হাওয়ায় দুলে দু'একটা শুখ্‌নো পাতা আমার কোলের উপর স'রে প'ড়তেই চেয়ে দেখি, গাছের ও পাশে দাঁড়িয়ে তিনি আমায় দেখছেন। একবার ক'রে আমায় দেখ্‌ছেন—আর ছবি আঁক-ছেন, হাতে তাঁর একটা কাঠের তক্তা তাতে কাগজ আঁটা আর এক হাতে রঙের তুলি। কি লজ্জা! এই অভাগীর ছবিই আঁক্‌ছেন না কি?

আমিও যে ওঁর ছবি দিনরাত, মনের পাতায় চোখের কলমে, ভক্তির রঙে, আঁক্‌ছি। আমার নজর প'ড়েছে বুঝতে পেরে তিনি কাছে এসে ব'লেন—"তোমার নামটি কি আমার জানতে ইচ্ছে করে—"

—মরে বল্‌ব—আমার নাম?

—মালতী।"

কি ক'রে যে নামটা মুখ থেকে বার ক'রেছি তা আর ভেবেই পাইনা। কিন্তু সেখানে একদণ্ডও দাঁড়াইনি। আর, এখন মনে হয় কেন দাঁড়ালুম না!—মরতে ইচ্ছে হয়!

বিকেল হ'তে না হ'তে ও পাড়ার বিন্দুবাসী এলেন—তাঁর গুণের কথা তো আর জানতে বাকী নেই। এমন নিন্দুক আর ঝগড়াটে মেয়ে মানুষ আমাদের গ্রামে আর দ্বিতীয় নেই। তাঁকে দেখেই আমার বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠ্‌লো। তিনি যে কি ব'লতে এসেছেন তাও আমার বুঝতে বাকী ছিল না। আমাকে দেখেই বলে উঠ্‌লেন—কি রে বৌ, কাপড় চোপড় কাচা হয়ে গেছে না-কি?

ভয়ে ভয়ে বল্লুম—হয়নি মাসী। এই যাচ্ছি।

—বলেই রোয়াকের কোণ থেকে পেতলের ঘড়াটা তুলে নিয়ে খিড়কীর দোর দিয়ে বেরিয়ে গেলুম।

খিড়কীর দিক দিয়ে যেতে তাঁর ঘরটা বাঁ দিকেই পড়ে। এ সময়েও একবার সেদিকটায় না চেয়ে পারলুম না। ঘরের জানালা বন্ধ—একটার সরু ফাঁক দিয়ে রেখার মত একটা কি দেখা যাচ্ছিল, বোধ হ'লো সেটা আলো! এরি মধ্যে আলো জ্বেলেছেন! আলো জ্বেলে কি করছেন—কে জানে! এ পোড়ামুখীর ছবিখানাই সামনে ধরা আছে কি-না তাও বা কে জানে!

সেই ছিদ্রপথে চোখ রেখে দেখলে হয়ত তাঁকে দেখতে পেতুম, কি কচ্ছেন তা'ও জানতে পারতুম কিন্তু সাহস হ'ল না। ক'পা এগিয়েছিলুম জানালার দিকে, ভয় হো'ল। এ বিজন পথে সন্ধ্যার অন্ধ-কারে কেউ আসবে না জানও, তবুও কেমন ভয় করতে লাগ্‌লো। কা'কে যে ভয়—তা জানি নে। বুঝি নিজেকেই নিজের ভয় হ'তে লাগ্‌লো। আর সেখানে দাঁড়াতে পারলুম না—এগিয়ে চলিছি—

কি রে বৌ! কাল আছিল কেমন? বলে বিন্দু মাসী ডিঙ্গি মেরে একটু তফাতে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর কথার কি যে উত্তর হ'তে পারে তা আমি

ভেবেই শেষুম না, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি. মাসী বল্লেন—কথা ক'চ্ছেন নে কেন বৌ? বলি ভালো আছিস ত? এখানেই থাকবি না কি?

বল্লুম—কোথায় আর যাব মাসি! তবে তুমি যদি কলকেতা যেতে তাহ'লে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যেতুম একবার।"

আমার দিকে চেয়ে মুচ্‌কী হেসে বিন্দুমাসী ব'ল্লেন "তা তুই যদি যেতে চাস্ তো সঙ্কোচ ভাবনা কি? এই কালই ভোরে আমার নাতি হরেকেষ্ট কলকাতা যাচ্ছে। আমি আগে থেকেই জানি তুই এখানে থাকতে পারবিনে। যেদিন জমিদার কলকাতা গেছে সেদিনই বুঝেছি। এমন রূপ চেয়ে দেখবার লোকই বা কে এখানে? কি বলিস্ মালতী বৌ?"

মনে হ'ল এ কথা শোনবার আগে মরণ হওয়াই ভালো ছিল কিন্তু মনের কথা মনেই চেপে ব'ল্লুম—"তা আমি যদি যাই, তোমার নাতি কি নিয়ে যাবে আমায়?"

—"তা কেন যাবে না। সে ভোর চারটের খিড়কীর দরজায় এসে হাজির হবে—তুই ঠিক থাকিস্। পারবি তো?"

—"হ্যাঁ পারবো। তুমি তাকে ব'লো। আমার কিন্তু পাঁচটী টাকা সঙ্গে তাতে বেশ ভাড়া কুলোবে তো?"

"তা ব'লবো" ব'লেই বিন্দুমাসী চ'লে যাচ্ছিল। হঠাৎ কি ভেবে আবার ঘুরে এসে ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'ল্লে—"দেখিস্ মন বদলায় না যেন। এখানে থাকলে ওই ভদ্রলোকের বিধবার মিথ্যে নিন্দে—বেচারী একটী ছেলে নিয়ে ঘর করে—এটা বুঝলি তো? আর সেখানে গেলে তোর ভাবনা কিসের? ভিনতলা অট্টালিকা হবে, সা ভরা গহনা হবে দশটা দাস দাসী সেবা ক'রবে। আদর সোহাগ যত্ন আত্তি কিছুরই অভাব হবে না বুঝলি তো?"

ঘাড় নেড়ে চোখ বুঁজে ভেতো ওষুধ গেলার মত জানালুম বুঝেছি। মনে হ'ল অমন সুখের চাইতে জন্ম জন্ম যদি এখানে, এই মাতা ও পুত্রের ক্ষুদ্র গৃহে অতি বড় দুঃখেও জীবন কাটে সেও ভালো।

পিসিমার মুখ এত গম্ভীর এর আগে দেখি নি। জলের কলসী নামিয়ে, ভিজে কাপড়খানা বাঁশের আলনায় টাঙিয়ে দিয়ে রান্নাঘরের চৌকাঠের পরে বসে বল্লুম—পিসিমা, বিন্দুমাসীরা কলকাতায় যাচ্ছেন, আমাকেও তাঁরা নিয়ে যেতে চাইছেন।

পিসিমা একটিবার ফিরে আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার যেমন উনানের কড়ায় খুন্তী দিয়ে তরকারী নাড়ছিলেন, তেমনি নাড়তে লাগ্‌লেন।

বল্লুম—পিসিমা, তুমি যদি বল···

পিসিমা এ দিকে না ফিরেই বল্লেন—তোমার কি ইচ্ছে মালতী?

হা ভগবান! আমার কি ইচ্ছে? এই তীর্থ ছেড়ে যেতে পারব আমি? কিন্তু না গিয়েই বা কি করব! বন্যার মত, মড়কের মত, অভিশাপের মত এঁদের সংসারটাকে নষ্ট করব—বইত নয়! তবুও তবুও, প্রাণ স্বীকার করে না, যেতে হ'বে তা যে জানতে চায় না!

পিসিমা আমার মুখপানে চেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন—তুমি যেতে চাও মালতি? একটুখানি চুপ করে' থেকে বল্লেন—তোমার ইচ্ছের ওপরত আমার জোর নেই মা। তবে যাঁর সঙ্গে যাবে বল্লু—তার সাথে ত আমার প্রাণ তোমাকে ছাড়তে বলছে না।

বিন্দুমাসীর স্বভাবটা কারই বা অজানা ছিল! তিনি এই গাঁ-খানার কত লোকেরই যে সর্ব্বনাশ করেছেন, তা আর না জানে কে? তবে জমিদার আর সেই বুড়ো খুড়োমশাই-এর জন্যেই কেউ কিছু করতে পারত না, তাঁরাই ছিলেন তার সাহস তার বল, প্রতিপত্তি—যা কিছু।

পিসিমা বল্লেন—সেখানে কোথা থাকবে, কি করবে—কিছু ঠিক হ'য়েছে?

না।

তবে ?—পিসিমা কথাটার উত্তর আমার মুখের দিকে চেয়ে জান্তে চাইলেন বটে কিন্তু আমি বেশ বুঝলুম ঐ তবের দ্বারাই তিনি সব কথার শেষ করে দিলেন।

বল্লুম—পিসিমা, আমি নিজের জন্যে যেতে চাই নে। কিন্তু আমার জন্যে আপনাদের পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে যাবে, আপনাদের নামে নিন্দে রটাবে সেই ভেবেই—

পিসিমা বল্লেন—আমরা তা'তে ভয় পাই নে, মালতী! তার জন্যে তুমি ভেবো না।

চুপ করে বসে রইলুম। হঠাৎ মনে হ'ল পিসিমা আজ আমার নাম ধরে ডাক্‌ছেন কেন? আর আমার নাম—তিনি জান্‌লেনই বা কেমন করে? আমি ত কোনদিন বলি নি—তবে? হঠাৎ ধনুকের ছিলে ছিঁড়ে গেলে ধনুক যেমন ছড়াৎ করে ওঠে, তেমনি মনে হ'লো—নাম আরই আমি একজনকে বলেছি—তিনিই কি বলেছেন? অথবা পিসিমা আমাদের দু'জনকে দেখেছেন?—কথাটা মনে হ'তেই গা কেমন করে উঠ্‌লো। পিসিমা গম্ভীর মুখে রান্নার কাজ করছিলেন, মনে হ'ল ভূমিকম্প হ'চ্ছে—উঠে গেলুম।

প্রসাদের মার কথা

হঠাৎ চম্‌কে গেলাম শুনে, গয়লা বৌ কথা কচ্ছে—কার সঙ্গে? উঠে দেখবার আগেই শুনতে পেলাম, নাম ধরে—মালতী। তখনই বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে এসে আর কাউকে দেখতে পেলাম না। প্রসাদের ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়তে বুঝতে বাকী রইল না, গয়লা বৌ তার সঙ্গে কথা কচ্ছিল, কাকেই বা তার নাম ধরে।

যে ভাবনাটাকে মন থেকে বিসর্জিত করে দিয়ে অভাগিনী, স্বজন পরিত্যক্তা, আশ্রয়হীনা নারী বলে যার প্রতি করুণায় মন প্রাণ ভরে রেখেছিলাম—তা'কেই নিভৃত প্রসাদের সঙ্গে কথা কইতে দেখে আবার মনের আগুন জ্বলে উঠ্‌লো। এবার আর কোন সান্ত্বনাই পেলাম না

সমস্তক্ষণই মনটা ছট্‌ফট্ করতে লাগ্‌ল। সন্ধ্যের পরই গয়লা বৌ বল্লে কলকাতা যাবে। ভাবলুম—যাক্ যাক্! আবার ভাবলুম, বিন্নির সঙ্গে যাবে! বিন্নি কোথায় নিয়ে যাবে কি করবে—কে জানে। ভেবে মতও দিতে পারলুম না। যে তলে তলে আমার পুত্রের গায়ে কালি মাখাবার চেষ্টা করে আমার মুখও পুড়িয়ে দিতে চাইছে তা'কেও সর্বনাশের কবলে তুলে দিতে নারী-চিত্ত সম্মতি দিতে পারলে না। বল্লুম—আমি নিজের ভয় করি নে।

কথাটা মধ্যে বলি নি। নিজের মনকে এর করতুম ও না কোনদিন। কিন্তু এবারে যেন মনের কোন—একখানে একটু সন্দেহ ছিল; যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাসে কথাটা বলতে পারি নি। যেন কোথাও খানিকটে ফাঁক থেকে গেছে।

রাত দশটা হ'বে—এখনই ছেলেরা খেতে আস্‌বে—দালানে কম্বলের আসন পেতে বসে আছি, প্রসাদ ডাক্‌লে—মা!

বল্লুম—কি প্রসাদ?

একবার ঘরে আস্‌বে না?

যাই।

গয়লা-বৌ কোথা মা! তা'কেও ডেকে আনো-না!

গয়লা বৌ পান সাজ্‌ছিল—প্রসাদের স্বর কাণে আস্‌তেই চম্‌কে উঠ্‌লো। তার দিকে চেয়ে হাসতে বল্লুম—কথা কয়ে নয়—ইঙ্গিতে।

ঘরে যেতেই প্রসাদ সেই ছবিখানার সামনে দাঁড়িয়ে বল্লে—তোমাকে একটা জিনিষ দেব মা!

আমার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে গেছ্‌লো।

প্রসাদ ছবির উপরে যে চাদর ঢাকা ছিল, সেটা সরিয়ে দিয়ে আমার পায়ের কাছে মাথা নত করে বল্লে—মা! আমার হাতের এই প্রথম ছবি—মা-আমার, তোমাকে দিলাম!

চোখে জল এ'লো! সে জল চেপে ছবিখানার দিকে চেয়ে দেখি, ছবির নীচে লাল রঙে লেখা—আলতা!

গয়লা বৌ ঘরে ঢুকেছিল; তার পায়ের শব্দে ফিরে চাইতেই সে চোখে কাপড় দিয়ে বেরিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ নিপুণ শিল্পীর অঙ্কিত ছবিখানার দিকে চেয়ে রহিলাম—প্রণাম! গয়লা-বৌ কলকাতা যাচ্ছে—কালই।

প্রণাম বল্লে—সেখানে ওর কেউ আছে—বুঝি! তা থাক্ না! দেখ মা, আমিও ক'দিনই ভাবছিলুম, ডাঙার ভেসা মাছের মত ও যেন এখানে খাপ্ খাচ্ছে না। তার চেয়ে আপনার জনের কাছে যায়, বেশ ত!

আমার মাতৃহৃদয়! সব মেঘ কেটে গিয়ে যেন একেবারে কি হ'য়ে গেলো! কি চমৎকার এঁকেছিস্ প্রণাব! বলে তাকে স্নেহে জড়িয়ে ধরছি, সে আবার প্রণাম করলে।

ক্রমশঃ *

* আগামী মাসের পূজার ভার গ্রহণ করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইন্দিরা দেবী

(শ্রীকুমুদিনীমোহন নিয়োগী)

বাঙ্লার স্ত্রীশিক্ষার সবে এই আরম্ভ এ কথা বলিলে এতটুকু অত্যুক্তি হয় না। ইহার মধ্যে যে সকল মহিলা লেখিকার আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ইন্দিরা দেবী একজন অগ্রণী ছিলেন। গত বিজয়া দশমী তিথিতে উষার প্রাক্কালে ৪৪ বৎসর মাত্র বয়সে ইন্দিরা দেবী পরলোকগমন করিয়াছেন। স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া পুত্র-কন্যা পরিবেষ্টিত হইয়া মৃত্যু—হিন্দুনারীর পক্ষে যত শ্লাঘাই হোক, তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্লা দেশ ও বাঙ্লা সাহিত্য যে বহু পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইল, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

ইং ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে আষাঢ় মাসে ইন্দিরা দেবীর জন্ম হয় কলিকাতা, বাগবাজারে—তাঁহার মাতামহ ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে। ইন্দিরা দেবী প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ৺সুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

ইন্দিরা দেবী শৈশবে পিতামহ ভূদেব বাবুর কাছেই শিক্ষালাভ করেন। বাঙ্লা ও সংস্কৃত সাহিত্যে জ্ঞান তাঁহার অল্প ছিল না। এই নাতিনীটি ভূদেব বাবুর অত্যন্ত আদরের ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে ভূদেব বাবু তাঁহাকে ছোট ছোট গল্প বলিতেন এবং গল্প লইয়া আলোচনা করিতেন, গল্পের শেষাংশ বানাইতে উৎসাহ দিতেন। এক দিন ভূদেববাবু গল্প করেন,—একটা মাটীর ঢেলা ও একটি গাছের পাতা,—দুজনে ভারী ভাব ছিল। বৃষ্টি হইলে পাতাটি ঢেলাকে ঢাকিয়া রক্ষা করিত, বৃষ্টির জলে সে না গলিয়া যায়—আর ঝড় হইলে মাটীর ঢেলা পাতাটিকে বুকে চাপিয়া রাখিত, ঝড়ে সে না উড়িয়া যায়। পাঁচ বৎসরের মেয়ে ইন্দিরা এইটুকু শুনিয়াই পিতামহকে বলেন,—না, এ গল্প হ'ল নয়। ঝড়-বৃষ্টি একসঙ্গে হইলে পাতাও উড়িবে ঢেলাও গলিবে।

অনেক সময়ই দেখা যায়, বিবাহ হইলে বাঙালীর মেয়ের লেখাপড়ার শেষ হয়। ইন্দিরা দেবীর তাহা হয় নাই। তাঁহার পাঠানুরাগ ছিল খুব

প্রবল। ভূদেববাবু নিজে তাঁহাকে সংস্কৃত পড়াইতেন। এগারো-বারো বৎসর বয়সে পিতামহের কাছে ইন্দিরা দেবী রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, ভট্টি, কাদম্বরী প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যাদি টীকা-সমেত পাঠ করেন। এই সময় তিনি বাঙ্গলা ছন্দে কুমার, রঘু, ভট্টি কাব্যের অনুবাদও করেন। সুন্দর অনুবাদ, তবে সে অনুবাদ কখনো ছাপা হয় নাই। ইহার পর নানা ছন্দে তিনি নানা কবিতা রচনা করেন—কিন্তু ছাপাইয়া সেগুলি লোকচক্ষুর সামনে ধরিতে তাঁহার অত্যন্ত কুণ্ঠা ছিল।

তার পর মাসিকপত্রে দুই-চারিটি গল্পে হাস্যকর উদ্ভটতার সমালোচনা করিয়া তিনি প্রবন্ধ লেখেন। সে প্রবন্ধ 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হয়—তাহার নীচে লেখকের নাম থাকিত, "শ্রীঅপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।" এ সমালোচনায় তাঁহার সাহিত্য জ্ঞানের যেমন পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তেমনি বুঝা গিয়াছিল, তাঁর লেখার styleও বেশ পাকা। সে সমালোচনা পড়িয়া ভারতীর তৎকালীন সম্পাদিকা লেখকের পরিচয় সংগ্রহ করিয়া সে লেখার খুব তারিফ করিয়া চিঠি লেখেন।

ইন্দিরা দেবীর আসল নাম ছিল, সুরূপা দেবী। প্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী তাঁহার মধ্যম সহোদরা। ইন্দিরা দেবী কখনো স্বনামে রচনা প্রকাশ করিতে চাহিতেন না; কেমন একটা স্বাভাবিক কুণ্ঠায় বাধিত। ১৩১৫ সালে যখন শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতীর সম্পাদন ভার নূতন করিয়া গ্রহণ করিলেন, তখন ইন্দিরা দেবী ও অনুরূপা দেবীর লেখা জোর করিয়া ভারতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন। ইহার পূর্ব্বে ছদ্মনামে তাঁহার বহু কবিতা এডুকেশন গেজেটেই প্রকাশিত হইত।

"কেতকী" ও ছোট গল্পের বই

এই সময় ভারতীর বর্ত্তমান সম্পাদক মণিলাল বাবু ও সৌরীন্দ্র বাবু বিদেশীয় উপন্যাসের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলে ইন্দিরা দেবীরও আগ্রহ হয়, তিনি একখানি ইংরাজী উপন্যাসের অনুবাদ করেন। ইংরাজী তিনি অল্পস্বল্প জানিতেন। সে জানায় বহির তর্জ্জমার ভার লওয়া চলে না। কিন্তু এমনি তাঁর উৎসাহ যে, জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়া কোনান্ ডয়েল রচিত মিষ্টীরিয়াস অফ ক্লুথার নামক গ্রন্থ আগাগোড়া পড়িয়া তিনি তাহার অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অনুবাদ গ্রন্থ 'গৌধরহস্য' নামে ভারতীতে প্রথম ধারাবাহিক বাহির হয়। অনুবাদ চমৎকার হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা এমন সরল ও প্রাঞ্জল—কোথাও এতটুকু আড়ষ্ট ভাব নাই। ইংরাজীতে কৃতবিদ্য অনেক পুরুষ লেখকও এমন সরল নিপুণ অনুবাদ করিতে পারেন কিনা, জানিনা!

তারপর তাঁর ঝোঁক চাপে মৌলিক উপন্যাস লেখার দিকে। সংসারে নানা কাজ—তিনি কোন দিন সাহিত্যের অজুহাতে সংসারকে অবহেলা করেন নাই। সংসারের প্রতি তাঁর কর্ত্তব্য কড়ায়-গণ্ডায় তিনি বরাবর চুকাইয়া আসিয়াছেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। আর সেই কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর লেখা চলিত। শুধুই কি লেখা! নিজেও তাঁর সুন্দর হাত ছিল। ছবিকে কাপড় পরানো—এমন নিখুঁত করিয়া সারিতেন যে কোন একজিবিশনে সে ছবি গেলে মেডেলের মালা গলায় দুলাইতে পারিত! কিন্তু এই জাহির হওয়ার দিকে তাঁর প্রবৃত্তিই ছিল না। তাই তাঁর হাতের শিল্প আত্মীয় স্বজনের গৃহে ও নিজের গৃহেই আজ সংরক্ষিত আছে।

১৩২২ সালে তিনি "স্পর্শমণি" উপন্যাস লিখিয়া শেষ করেন। এই উপন্যাস "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় ধারাবাহিক বাহির হয়। এই গ্রন্থ এতখানি জনপ্রিয় হয় যে অতি অল্পকালেই ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। এই গ্রন্থের বিশদ সমালোচনা করেন সমালোচক-প্রবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

নলিনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সুদীর্ঘ সমালোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"লেখিকার বর্ণনাশক্তি, ভাবাভিব্যক্তি, কলা-কৌশল, রস-সঞ্চার ক্ষমতা সকলই প্রশংসনীয়। তিনি ঘটনা সমাবেশ (plot) ও চরিত্র বিকাশ (character) উভয় অঙ্গেই সমভাবে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অতি সুকৌশলে ক্রমিক রহস্যোদ্ভেদ হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা আন্তরিকতা পূর্ণ ও মিষ্ট।.....সকল চরিত্রই লেখিকার প্রতিভাগুণে সুন্দর ফুটিয়াছে। এমন কি ক্ষুদ্র চিত্র,—সেকেলে পিসিমা, মুরারির মাতা কাদম্বিনী, বিশ্বনাথের বাড়ীর ঝী মাহী, রত্নকান্তের অন্দরের মোহিনী ঝী, কণ্যাপিসের বাটীর ক্ষুদ্র ভদ্রহরি, এই বাস্তব চিত্রগুলিও নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে। যথো যথো বাস্তব বর্ণনার বেশ মুন্সীয়ানা আছে। গ্রন্থকর্ত্রীর নিজের মন্তব্যগুলি সত্যনিষ্ঠতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়।" (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২৪)

প্রকৃত পক্ষে এই ছবি আঁকাতেই ইন্দিরা দেবীর প্রতিভা খুলিয়াছে বেশী। তাঁহার প্রত্যেক গল্পে প্রত্যেক উপন্যাসে যে-সব চরিত্রের সমাবেশ দেখি, সেগুলিতে একেবারে গোটা জীবন্ত মানুষই দেখি।

স্পর্শমণির পর তাঁর "ফুলের তোড়া", "মাতৃহীন ৪খানি ছোট গল্পের বই ও 'স্রোতের গতি' উপন্যাস বাহির হয়।

গতবৎসর ইন্দিরা দেবীর শরীর খুবই অসুস্থ হয়। এই অসুস্থ শরীরে তিনি পরাজিতা উপন্যাস রচনা করেন। এই সময় ভারতীর সম্পাদক সৌরীন্দ্র বাবুর আগ্রহে তিনি সেই অসুস্থ শরীরেই "প্রত্যাবর্ত্তন" উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন্। এই উপন্যাসখানি গতবৎসর হইতে ভারতীতে বাহির হইতেছে,—কার্ত্তিক মাসে শেষ হইল। শুনিয়াছি, 'প্রত্যাবর্ত্তন' বহুকাল পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়া তিনি আর নানা কারণে অগ্রসর করিতে পারেন নাই। সৌরীন্দ্র বাবুর উৎসাহে তিনি আবার বহুদিনকার পুরাতন জীর্ণ খাতা খুলিয়া বসিলেন। গত বৎসর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আমি দেখা হইলে তাঁর অসুখ এমন বাড়িয়া উঠিল যে চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি বালিতে গঙ্গার তীরে বাসা লইয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং বসিয়া লেখার শক্তিও রহিল না। শ্রাবণ ১৩৩১০৪ ডিগ্রী জ্বর—কি করিয়া লেখা চলে! তিনি উদ্বিগ্ন চিত্তে সৌরীন্দ্র বাবুকে পত্র লিখিলেন -ভাই সৌরীণ, এ যে বিপদে পড়া গেল। এত অসুখে লেখাও যায় না অথচ পাঠকদের কাছে এত বড় অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকব! একান্তই যদি আর লিখতে না পারি, তুমি এর শেষ করে দাও। পাঠক সমাজে যেন এত বড় ত্রুটির কলঙ্ক নিয়ে না চলে যেতে হয়।

সৌরীন্দ্র বাবু তাঁকে আশ্বস্ত করেন, বলেন, না হয় এক মাস দু'মাস নাই বেরুবে,—ভাববেন না। শরীর সারলে লিখবেন।

কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন এ রোগ সারিবার নয়—তাই কারো নিষেধ না মানিয়া সেই প্রবল জ্বরেই তিনি লেখা শেষ করেন। বইখানি গ্রন্থরূপে ১লা আশ্বিন প্রকাশিত হইয়াছে—তিনি তাহা দেখিয়াও গিয়াছেন।

এখনো তাঁর বহু রচনা মাসিকপত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার ভগ্নী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী সেগুলি প্রকাশের ভার লইয়াছেন।

তাঁর রচনার একটি প্রধান বিশেষত্ব,—সরলতা আর শান্ত সংযত ভাব। অনেক নারীর রচনায় দেখি, পাণ্ডিত্যের ঝাঁজ এমনি তীব্র হলকা ছুটাইয়া রহিয়াছে যে গা একেবারে জ্বলিয়া যায়! এই ঝাঁজ ইন্দিরা দেবীর রচনায় মোটেই নাই। সরল অনাড়ম্বর সরল মিষ্ট রচনা—পড়িলে চিত্ত মুগ্ধ হয়। প্লটে ঘনঘটা নাই, বিলাতী সেন্টের বাহার নাই, ইংরেজীর বুকনি নাই—খাঁটি বাংলা বই, খাঁটী বাঙ্গলার জিনিস! এই আত্মম্ভরিতার যুগে জাহিরপনার ঘটার মধ্যে এ সংযম বড় সহজ প্রশংসার বস্তু নয়! ইংরাজী সাহিত্যে Mrs.

Henry Wood এর রচনায় যেমন ঘরোয়া ভাব, সরল মধুর চিত্র ফুটাইয়া চিরদিন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল রহিয়াছে, ইন্দিরা দেবীর রচনাও তেমনি যতদিন বাঙলা সাহিত্য ও বাঙলা ভাষা থাকিবে ততদিন বাঙলার খাঁটী উপন্যাস বলিয়া আদর পাইবে।

তাঁর প্রতিভা বিকাশের মুখে ঝরিয়া গেল। এ দুঃখ কখনো ঘুচিবে না। বাঙলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য, তাই এমন একজন প্রতিভাশালিনী লেখিকা অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন! (ভারতী, ফাল্গুন)

বদ-নসিব

(গল্প)

[শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়]

আজ পলে পলে আমার মনে হচ্ছে,—কেন বেরিয়েছি, কোথা বেরিয়েছি, আর যাই বা কোথা! একটা গোলামী ছেড়ে আর একটা গোলামীর সন্ধানে। একটা সাহেবের অপমান সহ্য হলো না, তাই আর এক সাহেবের লাথী খেতে! আর তারই জন্যে কত আগ্রহ!

ইজি চেয়ারে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নি। ট্রেণের এখনও অনেক দেরী। অখনী আর প্রসাদ আমায় রেখে ফিরে গেল। ঘরটায় কেউ কোথাও নেই। টেবিলের উপর একটা বাতি মিট্-মিট্ করে জ্বলছে। খান কতক ভাঙ্গা চেয়ার, একটা ড্রেসিং টেবিল আর একটা আর্শী।

আঃ! ইজি চেয়ারটায় শুয়ে মনে হচ্ছে—বেশ আরাম। সারাদিনের পরিশ্রমের পর এই যে একটু খানি শোয়াটা আঃ, কত কোমল, কত মধুর! তাও কি চাই উপভোগ করবার সময় আছে?.....ঘুম ত আসবে না। নির্জ্জনে ব'সে আছি, তাই নানাদিনের নানা কথা গুড়্ গুড়্ ক'রে মাথার ভিতর ঢি-ঢ় করে এসে দাঁড়াচ্ছে।

একটু তন্দ্রা এসেছিল। 'ইষ্টেশনে'র এক বাবু একটা বাতি হাতে করে ঘরে ঢুকতেই তন্দ্রা ছুটে' গেল। বাবুটি বল্লেন,—Twenty two down এর passenger? গাড়ী এসেছে; শীগ্‌গির যান্।

গাড়ীতে উঠ্‌লুম। তাড়াতাড়ি এক European Compartment এ উঠে পড়েছি। একজন কাফ্রি ক্রিশ্চান সপরিবারে কলিকাতা যাচ্ছেন। তিনটি ছেলে। তিনটি মেয়ে। বড় মেয়েটির কয়েকটি কচি ছেলে-মেয়ে বেঞ্চের উপর পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, আর দুটি তরুণী বসে বসে গল্প কর্‌ছে। ছেলে দুটো লাফালাফি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাকে উঠ্‌তে দেখে, একটা ছেলে ঘুট্‌ঘি করে ভাঙা-ভাঙা বাঙলায় জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—কোটা থেকে আসেন? যাবেন কোটা? আরও কি বল্‌তে যাচ্ছিল; হঠাৎ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি চোখ্ ফিরিয়ে একটা ধমক দিতেই অমনি ছেলেটা চুপ হয়ে গেল। ক্রমে আমাদের পর্য্যন্ত আস্‌তে আস্‌তেই তাদের সাথে বেশ আলাপ জমে গেল আমার। ইংরাজীতে তারা কথা কইছিল, যদিও ভাষাটা আমাদের দেশের কুলি মজুরদের বাঙলা ভাষার মতই অশুদ্ধ। তরুণী বালিকা দুটিই আমার উপর বেশী ঝুঁকে পড়ে আলাপ জুড়ে দিল। একজনের নাম 'Sunny' (সানি) আর একজনের নাম Lamena (লামেনা) আমার সঙ্গে এক বেঞ্চে বসে অবাধে তারা কত কথা বলে যাচ্ছিল—কেউ

বাধা দিল না। মেয়ে দুটির গায়ের রঙ তেমন ফর্সা না হলেও মুখের চেহারা, হাসি আর চোখের চাউনি আমার কাছে মন্দ মনে হলো না।

Sunny তাদের সংসারের দুঃখের কাহিনীই বলে যাচ্ছিল। সে বল্লে,—আমাদের এই এত বড় সংসারটা নিয়ে বাবা বড় বিপদে পড়েছেন। দেখ্‌বার শোন্‌বার কেউ নেই। আমরা স্কুলে পড়ি। দাদাও পড়ে। Lamena কিন্তু আমার কথা জান্‌তেই ইচ্ছুক। Sunny কে বাধা দিয়ে বলে' উঠ্‌ছিল,—কোথা বাড়ী আপনার? বিয়ে হয়েছে? আপনি ত ইংরাজিতে বেশ কথা কইতে পারেন! এই রকম কত প্রশ্ন।

গাড়ী অগুালে এসে দাঁড়াতেই আমি নেমে পড়লুম। Sunny ও Lamena আমার হাত ধরে Hand-shake করে বল্‌লে,—'যদি কখনও কল্‌কাতা যান, আমাদের সাথে দেখা কর্‌বেন যেন।··· ভুল্‌বেন না।

যাই আর না যাই, তাদের বাড়ীর ঠিকানাটা Note Book এ লিখে নিলুম। গাড়ী থেকে নেমে ফিরে তাকিয়ে দেখ্‌লুম—লামেনার করুণ দৃষ্টি আমার উপর এসে পড়েছে। জানালায় মাথা রেখে হাতের পাখা কয়খানা নাড়া দিয়ে বল্‌লে,—Good Night। প্লাটফর্মের একটা আলোর ছটা তার মুখের উপর গিয়ে পড়্‌ছিল, তাই সেই শুভ্র আলোয় ছটায় চোখ দুটো তার চক্‌চক্ করে উঠ্‌লো।

ক্ষণিকের পরিচয়ে কেন এমন হ'লো জানি না। লামেনার সেই কালো চোখের করুণ চাহনিটুকু আমার মনে হচ্ছে,—চিরকাল মনে থাক্‌বে। এই কলিজার পরতে এমন অনেক ছোট-খাট দৃষ্টির প্রতিচ্ছবি খুঁজলে পাওয়া যায় লামেনা! তোমারও দানটুকু তারই একপাশে খোদাই করে নেব। যাও, ক্ষণিকের সাথী বিদায়!

ট্রেণ থেকে নেমেই শীতে কাঁপতে লাগ্‌লুম। সকাল বেলা মোগাণ্ডী যাবার ট্রেণ ছাড়বে। কতক-গুলা লোক প্লাটফর্মের উপরেই আগুন জেলে শীতের হাতে শরীরটাকে একটু গরম করে নিচ্ছিল।

ধীরে ধীরে Waiting Room এর দিকে চল্লুম। লামেনার চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাব-ভঙ্গি, শুভ্র মুক্তার মতন দাঁতের পাঁতি, হাসি, কথা, সব এক সঙ্গে আমার মনে জাগ্‌ছিল। শীতের বাতাস চারি-দিক থেকে ছুটে আস্‌ছিল।

Waiting Room এ ঢুকে দেখি—ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বল্‌ছে। খানকতক ইজি চেয়ারঘরের এখানে ওখানে অতিথি সৎকারের জন্য তাদের আরাম কোলগুলি বিছিয়ে রেখেছে। ঘরের মাঝে একটা বড় টেবিলের পাশে খানকতক চেয়ার; কোনটার হাত ভাঙা—কোনটার বেতের বুনুনিটা নেই। এক-দিকের এক কোণে একটা বিছানা পেতে খানিকটা চাদর মুড়ি দিয়ে, এক ইংরাজ যুবতী শুয়ে ছিল। ইলেক্‌ট্রিকের সাদা আলো তার সাদা মুখের উপর পড়ায় মনে হচ্ছিল,—একটি ফুটন্ত টগরের মতন কেমন সুন্দর মুখখানি। পাশেই একটি কচি ছেলে। পায়ের তলায় একটা বাঙালী 'বেয়ারা' (বয়স ১২ কি ১৩ বছরের বেশী হবে না) মেঝের উপরে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমি একটা ইজি চেয়ার টেনে বসে পড়তেই মেয়েটি বল্‌লে,—কোথা যাবে বাবু তুমি?"

বল্লুম,—"মোগাণ্ডা। সকালে আমার ট্রেণ—এখনও ঢের দেরী। এই সঙ্গে একটা বাজ্‌কে যাচ্ছে।

তারপর মেয়েটির পরিচয় নিলুম। সে যাবে হাজারীবাগ—আস্‌ছে আসানসোল থেকে। সঙ্গে ওই ছেলে মানুষ বেয়ারা আর শুভ্র কচি ছেলেটি ভিন্ন কেউ নেই। তার স্বামী এক বড় মাতাল—আসানসোলে রেল কোম্পানীর চাকরী করে। ছাড়ে সে রোজ দশ বার—চরিত্র দোষও আছে।

বুঝ্‌লুম,—তার স্বামীর সঙ্গে মেয়েটির নিশ্চয়ই

খুব ঝগড়া হয়েছে এবং সে রাগটা এখনও পর্যন্ত যায় নাই ; তাই আমার মত একজন বিজাতীয়ের সম্মুখেও তার স্বামীর বিরুদ্ধে এতগুলো কথা বলতেও কোন দ্বিধা বোধ করলে না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বল্লে,—আমার স্বামী আর একটা নষ্ট-চরিত্রা মেম ধরে নিয়ে এসে আমাদের বাড়ীতেই আশ্রয় দিয়েছে। দেখুন না বাবু, ছেলেটির বয়স এখনও একমাস হয় নি, এরই মধ্যে আমাকে কাল রাত্রে বাসা থেকে তাড়িয়ে দিলে। আমি তার নামে নালিশ করতে পারতুম, কিন্তু কি করব বাবু, কোর্টের টাকাকড়ি নেই,—যা মাইনে পায় তা ত মদেই উড়ে যায়। বড় কষ্ট হবে তার, তাই চলে এলাম। হাজারি-বাগে আমার এক ভাই আছে, তারই কাছে আশ্রয় নিতে চলে যাচ্ছি।

ছেলেটা কেঁদে উঠ্‌লো। একটা বেঞ্চের উপর থেকে 'বাইপোষটা' নিয়ে ছেলেটির মুখে ধরে দিলে।

তার নামও জেনে নিয়েছিলুম। নাম—"ফ্লোরা।" হ্যাঁ, ফুলের মতই রূপ ছিল তার।

তার নিষ্ঠুর স্বামীর উপর বড্ডো রাগ হচ্ছিল আমার। ফ্লোরাকে যে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে, সে নিষ্ঠুর পারে না, এমন কাজ বোধ হয় দুনিয়াতে কিছুই নেই।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, দুজনেই নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছি, এমন সময় জুতোর মচ্‌ মচ্‌ শব্দ করে এক সাহেব সেখানে ঢুকে পড়্‌ল। সঙ্গে একজন বাঙ্গালী আয়া। সাহেবটাকে দেখেই ফ্লোরার মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেল। ঠিক যেন সে ফুলটিকে ছিঁড়ে কে আগুনে ফেলে দিলে। সাহেবটা তাড়াতাড়ি ফ্লোরার কাছে যেয়ে বিড়্‌ বিড়্‌ করে অনেক কথাই বল্‌লে। সব কথাগুলা বোঝা গেল না —তবে এটা বেশ বুঝ্‌লুম যে সে তারই সেই মাতাল স্বামী। আসনাশোল থেকে সেও চলে এসেছে—ফ্লোরার উপর আরও একটু অত্যাচার করতে।

সাহেবটা যতক্ষণ কথা কইতে লাগ্‌লো ততক্ষণ তার মুখের পানে আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাক্‌লুম। অসুরের মতন মুখখানা তার। ফ্লোরার স্বামী হবার শক্তি সে মুখে কিছুই নেই। মাতাল অবস্থায় কথাগুলো সে এম্‌নি টেনে টেনে বল্‌ছিল যে আমি তার একবর্ণও বুঝ্‌তে পারছিলুম না। ফ্লোরা কিন্তু বেশ বুঝ্‌ছিল। ছেলেটির মুখের পানে তাকিয়ে ধীরে ধীরে দু একটা কথার উত্তরও দিচ্ছিল—কোন কথার প্রতিবাদ না করে।

এ জাতের ভিতরেও এমন শান্ত সুন্দর রমণীমূর্ত্তি যে থাকতে পারে, এ বিশ্বাস আমার ছিল না ; এই বিজাতীয়া বোন্‌টির মুখেই আমি প্রথম দেখলুম।

'আমি তোমার কোন কথাই শুন্‌তে চাই না।' বলে সাহেবটা তার সঙ্গের আয়াকে বল্লে,—"বেবিকো লে আও হামারা সাথ্‌।"

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে আয়া ফ্লোরার কটি ছেলেটিকে কোলে তুলে নিলে। ফ্লোরা কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে তার কালো চোখ দুটি তুলে স্বামীর মুখের পানে একবার তাকালো। আঃ! পিশাচ! আমি আর তার মিনতি-কাতর করুণ চোখদুটির পানে চাইতে পারছিলুম না। ফ্লোরার গোলাপী গণ্ডের উপর ধীরে ধীরে দুটি শুভ্র অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে এলো!

সাহেব তখন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আয়া ঘুমন্ত ছেলেটিকে কোলে নিয়ে তার পিছনে।

ফ্লোরা তাড়াতাড়ি 'বাইপোষ' আর দুধের বোতলটা নিয়ে, নীচে দিকে মুখ রেখে আয়ার হাতের কাছে এগিয়ে দিলে.....তারা চলে গেল। ফ্লোরা বালিসের উপর মুখ রেখে' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

কিছুক্ষণ পরে ভারি ভারি গলায় আমাকে বল্লে,

—'আলোটা নিভিয়ে দিয়ে তুমি ওই ইজি চেয়ার-টায় ঘুমোও বাবু, ওই আমার স্বামী।"

সান্ত্বনার একটি কথাও আমার মুখ দিয়ে বেরুলো না। আমি আলোটা নিভিয়ে সেইখানে শুয়ে পড়্লুম। চোখ্ বুজ্লুম্। সেই অন্ধকার ঘরটার একধারে শোকাতুরা কান্নারতা ফোরা, আর এককোণে নির্ব্বাক বিস্ময়াহত আমি। চুপ করে শুয়ে থেকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। চোখ খুলে দেখি—চারিদিক প্রায় কর্দ্দা হয়ে গেছে। ঘরে ফোরা বা তার কোন জিনিষ পত্রের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। গতরাত্রির সমস্ত কাণ্ড, দিনের অস্ফুট আলোতে আমার চোখের সুমুখে নাচ্তে লাগ্ল। মনে হলো, হয়ত স্বপ্ন দেখ্লুম।

তন্ময় হয়ে ফোরার কথা ভাব্তে ভাব্তে উঠে পড়্লুম। গৌরাঙ্গী যাবার ট্রেণ তখন দাঁড়িয়ে আছে। আধ ঘণ্টা পরে ছাড়্বে। ধীরে ধীরে গাড়ীতে গিয়ে উঠ্লুম।

এক পেয়ালা গরম চা ট্রেণে বসে খেতে খেতে কত কথা মনে হচ্ছিল। চায়ের পেয়ালার উপর পাৎলা ধোঁয়ার সাগর পারের সেই সর্ব্বস্বহারা ভগিনীর চোখ্ মুখের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠ্ছিল।

শীতের বাতাস চিরে মিহিসুরে গার্ডসাহেবের হুইসিলের শব্দ আমার কানে এসে বাজ্লো। চারিদিকের ধোঁয়া তখনও বেশ পরিষ্কার হয়নি। গাড়ী আস্তে আস্তে চল্তে আরম্ভ করল।

জান্লার ধারে সরে' বাইরে পানে তাকিয়ে থাক্লুম।

ওই—ওই, পাশেই সাহেবদের Bungalow quarters গুলোর ধারে, লাল কাঁকরের রাঙা সড়কের উপর ঠিক্ Latrine গাছটার নীচে ফোরা চলে যাচ্ছে! তার রেশমের মত চুলের গোছা এলোমেলো হয়ে কিরোজা রঙের ব্লাউসের উপর এসে পড়েছে; চোখের দৃষ্টি ভোরের আকাশের নিভু নিভু শুক্তারাটির মতই জল্ছিল। হায় রে! আঃ! আমাদের গাড়ী তখন চল্ছে। মনে হলো, ঝাঁপিয়ে পড়ি; চীৎকার করে ডাকি, ফোরা! ফোরা! অভাগী বোন্টি আমার!

একটা ধব্ধবে সাদা সাহেবের ছেলেকে 'পেরেম্বুলেটারে' বসিয়ে একটি ছোট ছেলে গাড়ীটা টেনে নিয়ে আস্ছিল।

ফোরা পাগলিনীর মত ছুটে গিয়ে এই পরের অজানা ছেলেটিকে বুকে তুলে নিয়ে, গভীর আগ্রহে তার তৃষিত ব্যাকুল তপ্ত ওষ্ঠের একটি চুমু তার সাদা গালের উপর বসিয়ে দিলে। বেয়ারাটা বিস্ময়াহত হয়ে' 'প্যারাম্বুলেটার' ধরে তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফোরার করুণ চোখে বিশ্বমাতার আকুল কান্না দেখ্ছিল।

রেলের গাড়ীটা নিষ্ঠুরের মত আমাকে টেনে নিয়ে অনেক দূরে চলে এল।

আর বুঝি দেখা যায় না, ওই—ওই—ঘাঃ। কুরুচুড়ার গাছের পাশে সব লুকিয়ে গেল। ফোরা! ফোরা!!

ছোট গল্প

(শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল)

কথা-সাহিত্যকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—উপন্যাস, ছোট উপন্যাস এবং ছোট গল্প। উপন্যাস, ছোট উপন্যাস অপেক্ষা আয়তনে বড়। উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। চরিত্র ও ঘটনা সমাবেশ উপন্যাসে বেশী থাকে;

স্থান ও কালের ব্যাপকতাও ইহাতে বেশী। ছোট উপন্যাসে জীবনের ঘটনাবলীর বিস্তৃত আলোচনা থাকে না। রসের দিক হইতে দেখিতে গেলে, ছোট উপন্যাসে রসের তরলতা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। অল্প পরিসরের মধ্যে ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশ সাধন করিতে হয় বলিয়া, রসটা একটু ঘনই হইয়া থাকে। কলাবিৎ বা আর্টিষ্টের কৃতিত্বও ইহাতে বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। অল্প সময়ের মধ্যে এ শ্রেণীর পুস্তক পাঠ করিয়া শেষ করিতে পারা যায় বলিয়া, অনেকেই এগুলির পক্ষপাতী। ছাট ছাঁট দিয়া উপন্যাসের এই যে নূতন সংস্করণ আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, পাশ্চাত্যজগতে এগুলির প্রবর্ত্তক merimee, Turgenieff ও stevenson, আমাদের দেশেও অনেক গল্প লেখক এই শ্রেণীর উপন্যাসের পক্ষপাতী। তাঁহারা এগুলিকে কেহ বড় গল্প, কেহ বা মাঝারি গল্প, আবার কেহ বা ছোট গল্পও নাম দিয়া থাকেন। Edgar Allan poe এগুলিকে 'গল্প' নামে অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলি গল্প নয় —উপন্যাসের ছোট সংস্করণ মাত্র। ফরাসী গল্প-লেখকেরা এ গুলিকে nouvelbe আখ্যা দেন। ইংরেজিতে novelette ঠিক এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এই বার আমরা ছোট গল্প সম্বন্ধে Clayton Hamilton সাহেব তাঁহার 'Materials and Methods of Fiction' নামক পুস্তকের ১০ম পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহার একটু আলোচনা করিব।

ইনিও ছোট গল্পকে কথা-সাহিত্যের অন্যতম দিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতেও the short story is a distinct type, আমেরিকার Edgar Allan poeই ছোট গল্পের প্রবর্ত্তক। তিনিই প্রথমে গল্পে পাঠকদিগের মনোমধ্যে কেবল মাত্র একটা অনুভূতির সমগ্র চিত্র অল্প পরিসরের মধ্যে দিয়াছেন। অন্যত্র লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, He made clear to succeeding writers the necessity of striving for unity of impression through strict unity of form' ছোট গল্পে ভাবের একতা নূতন আকারে অল্প পরিসরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

১৮৪২ সালে পো যখন Hawthorne এর 'Tales' নামক পুস্তকের সমালোচনা করেন, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন, 'উপন্যাসের আয়তন ও পরিসর এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে, যে ধৈর্য্যের সহিত পাঠ করা যায় না। এক স্থানে বসিয়া গল্প পুস্তক শেষ করিতে না পারিলে মনের উপর সমগ্রভাবে তাহা কার্য্য করিতে পারে না। পাঠ করিবার সময় কার্য্যগতিকে যদি উঠিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে লেখকের যে ভাব আমরা মনের ভিতর মূর্ত্তিত করিয়া লইতেছিলাম, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়—হয়ত একবারেই মুছিয়া যায়। কেবল মাত্র বইখানি বন্ধ করিয়া উঠিয়া গেলেও সমগ্র ভাবের যে ছাপ আমাদের মনের মধ্যে পড়িয়া যাইত, তাহা আর পড়ে না। ছোট গল্প পাঠ করিয়া আমরা লেখকের সমগ্রভাব উপলব্ধি করিতে পারি। এ গুলি পাঠ করিবার সময় আমরা লেখক মহাশয়ের সহিত একভাবে অনুপ্রাণিত হই—তাঁহারই ইঙ্গিতে আমরা চলিয়া থাকি। সংসারের কোনরূপ প্রতিবন্ধক আসিয়া বা অধীর হইয়া পড়িবার কারণ আমাদিগকে পাঠ হইতে বিরত করিতে পারে না। বাহিরের প্রভাবের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া সমগ্র ভাবটী আয়ত্ত করিয়া লইতে ক্লেশ পাইতে হয় না। তবে ছোট গল্প লেখকদিগের একটা কথা মনে রাখা উচিত, যে ছোট করিবার অনুরোধে তাঁহারা যেন ভাবের বিকাশের দিকে অমনোযোগী না হন। কবিতা যেমন অসম্ভব রকমের ছোট হইলে প্রাণে তৃপ্তি দেয় না, ছোট গল্পও তদ্রূপ; আবার ছোট গল্পের অযথা পরিসর বৃদ্ধি করাও উচিত নয়।'

অধ্যাপক Brander Mathews তাঁহার "Philosophy of short Story" নামক পুস্তকেও ঠিক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন,—ভাবের একতা ও পূর্ণতা (Unity of impression) ছোট গল্পের বিশেষত্ব। উপন্যাসে এরূপ থাকিতে পারে না। প্রকৃত ছোট গল্প যে আয়তনেই ছোট, তাহা নয়। ভাবের একতা আনয়ন করিতে একটি যেমন পারে, উপন্যাস তেমন পারে না। ফরাসীদেশের কথা-সাহিত্যিকদের মতে ছোট গল্পে কেবল মাত্র একটী চরিত্র একটী ঘটনা বা একটী অনুভূতির অথবা একটী ঘটনার ফলে উৎপন্ন কয়েকটী অনুভূতির সমাবেশ থাকে। অধ্যাপক মহাশয়ের কথায় উভয়ের পার্থক্য এইরূপ—The short story is the single effect and self contained, while the novel is of necessity broken into a series of episodes ছোট গল্প হইতে ফলশ্রুতি সমগ্রভাবে পাইয়া থাকি ; শুধু যে ভাবের একতা পাইয়া থাকি তাহা নহে—এ ভাব স্বয়ংসিদ্ধ, অপর ভাবের উপর নির্ভর করে না। আর উপন্যাসের খণ্ডিত অংশগুলি হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উপলব্ধি করিয়া থাকি। ছোটগল্প উপন্যাসের অধ্যায় বিশেষ নহে। বড় উপন্যাস হইতে একটী ঘটনা বা বিষয় লইয়া ছোট গল্প লিখিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। ছোট গল্পকে বাড়াইয়া উপন্যাসে পরিণত করা যায় না। ছোট গল্পে ভাবানুভূতির স্ফুরণ থাকা চাই।

হ্যামিলটন সাহেবের মতে 'The aim of a short story is to produce a single narrative effect with the greatest economy of means that is consistent with utmost emphasis' ছোট গল্পের উদ্দেশ্য হইতেছে, সহজে অল্প পরিসরের ভিতর একটা সজীব ভাবের উদ্রেক করা। ভাবের উদ্রেক কেন প্রকারে করিতে পারা যায়—কার্য্যে (action), চরিত্রের স্ফুরণে (character) ও নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতর ঘটনা সমাবেশে (setting). Setting শব্দে উপন্যাসে বুঝিতে হইবে।

এইখানে ছোট গল্প ও চিত্র বা নক্সার পার্থক্য বুঝিতে হইবে। নক্সায় উপরোক্ত তিনটী পন্থার ভিতর কেবল মাত্র একটি পন্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ চরিত্র বা ঘটনা-সমাবেশ লইয়া নক্সা অঙ্কিত হয়। কার্য্য বড় একটা ইহাতে স্থান পায় না। ছোট গল্পে কিন্তু কার্য্য চাই। এ বিষয়ে উপন্যাসের সহিত ইহার অনেকটা মিল আছে। উপন্যাসে উপরোক্ত কোন দুইটি বা তিনটী পন্থাই অবলম্বিত হয়, কিন্তু তাহারা এরূপ সম্পর্কে সম্পর্কিত, যে একটী অন্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে, অথবা তাহারা অঙ্গাঙ্গীভাবে বিরাজ করে ; কিন্তু সাধারণতঃ ছোট গল্পে একটী অপর দুইটী উপায়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকে। ভাবের দ্যোতক এই ত্রিবিধ উপায় ভেদে ছোট গল্পকে লেখক মহাশয়ের গল্পের প্রারম্ভেই বলিয়া দেওয়া উচিত, কি ভাবে তিনি ভাবের উদ্রেক করিতে চান। আর যেখানেই তিনি তাঁহার মনঃকল্পিত ভাবের উদ্রেক করিতে সফল হইবেন, সেই খানেই ছোট গল্পের পরিসমাপ্তি করা উচিত।

হ্যামিলটন সাহেবের Greatest economy of means আমি এককথায় 'সহজ' বলিয়াছি। এই 'সহজ' কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। যত অল্পসংখ্যক চরিত্র-সমাবেশে বা কম ঘটনার দ্বারা আখ্যান-ভাগ বিবৃত হয়, ততই ছোট-লেখকের কৃতিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ ও কালের পরিসর যত কম হয়, গল্প তত অল্পসময়ে অনায়াসে পড়িয়া শেষ করিতে পারা যায়। এদিকেও ছোট গল্পলেখকদিগের অবহিত হওয়া উচিত। যদি দুইটী চরিত্রে বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করা যায়, তাহা হইলে তিনটী চরিত্র অঙ্কন করা কোন মতেই সমীচীন নয়। যদি একটী ঘটনার সাহায্যে প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলে দুইটী ঘটনার সমাবেশ

করা উচিত নয়। এক সময়ে একস্থানে বসিয়া যদি ঘটনা সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে তদতিরিক্ত দেশ ও কালের অবতারণা করা কোন মতেই যুক্তি-সঙ্গত নয়। এক কথায় বলিতে গেলে, দেশ, কাল, পাত্রের দিকে অধিক মাত্রায় অবহিত হওয়া ছোটগল্প লেখকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

আর একথাটাও মনে রাখিতে হইবে, কেবল-মাত্র পরিসরের অল্পতা দেখিয়া ছোট গল্পের বিচার করিলে, অনেক সময়ে ভ্রমে পড়িতে হয়। আবার স্বাভাবিক পৃষ্ঠার উপর লিখিত গল্পও অনেক সময় প্রকৃত ছোট গল্প। হেনরী জেম্‌সের "The Turn of the Screw" পুস্তকখানি প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠাব্যাপী হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা একটী ছোট গল্প। ইহা যে ছোট উপন্যাস নয়, তাহা পাঠকমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে; কারণ ইহার ফলশ্রুতি এক—ইহা আমাদের মনে একটী ভাবেরই সঞ্চার করিয়া দেয়। লক্ষণ দেখিয়া ছোটগল্পের বিচার করা উচিত।

এক্ষণে অধ্যাপক ব্লিস পেরির অভিমত আমরা একটু আলোচনা করিব। 'চরিত্রগত' ছোট গল্পে চরিত্রের বিশেষত্ব ও অভিনবত্ব থাকা উচিত, যাহা দেখিয়াই পাঠকেরা নূতনত্বের মাদকতায় অভিভূত হইয়া পড়েন। নূতন কোন কিছু দেখিলেই চক্ষুর্দ্বয় আপনি সেইদিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি বলিয়াছেন,—The Character must be unique, original enough to catch the eye at once. চরিত্রের বিকাশ এরূপ ভাবে দেখান উচিত, যাহাতে নূতন অভিজ্ঞতার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর ছোট গল্প ও উপন্যাসের ভিতর পার্থক্য এই যে এগুলিতে অসাধারণ ও অপ্রত্যাশিত রকমের চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 'কার্য্যগত' ছোট গল্পে আখ্যানবস্তুই (plot) বিশদভাবে বর্ণিত হয়। চরিত্রগুলি নির্জ্জীব জড়ের মত ঐগুলিতে ব্যক্তিগত বিশেষত্বের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে একটা কথা উঠিতে পারে, এই অনাবশ্যক চরিত্রগুলি উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজন কি? আমাদের মনে হয়, নৈসর্গিক চিত্রাঙ্কনে যেমন পার্থক্য দেখাইবার জন্য (Contrast and Relief) কোন একটী বা কয়েকটী জীব সংস্থাপিত হয়, ইহাও সেইরূপ বৈশিষ্ট্য দেখাইবার অন্যতম উপায়। 'ঘটনা-সংস্থানগত' (short story of setting) ছোট গল্পে চরিত্র বা কার্য্যের স্থান বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। অধ্যাপক মহাশয়ের কথায় বলি, 'যদি লেখক মহাশয় পৃথিবীর কোন একটী নূতন স্থান বাহির করিতে পারেন বা কোন পরিচিত দৃশ্যের মনোমদ বর্ণন করেন, কিংবা মানবের বিভিন্ন বৃত্তির কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন, তাহা হইলে তাঁহার লিখিত গল্পে চরিত্র ও কার্য্য-সমাবেশ না থাকিলেও আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়া থাকে।'

অল্প সময়ের ভিতর ছোট গল্প পাঠ করিয়া শেষ করা যায় বলিয়া অধ্যাপক পেরি ইহার কয়েকটী সুবিধার কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন। উপন্যাসে এ সুবিধাগুলি বড় পাওয়া যায় না। ছোট গল্প হইতে আমরা আমাদের শিক্ষা ও ধারণানুযায়ী নির্দ্দোষ সৎশিক্ষা লাভ করিতে পারি (innocent didacticism)—ফলশ্রুতি বাহির করিতে পারি; ছোটগল্পলেখক সমস্যা উত্থাপন করিয়া সমাধান করিয়া দেন না, পাঠকগণের উপর সে ভার দিয়া ক্ষান্ত হন; কিন্তু ঔপন্যাসিকের নিকট ঐ সকল সমস্যার সমাধান আমরা চাহিয়া থাকি। ছোট গল্পলেখকেরা আপনা-দিগের ইচ্ছামত প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া যান, অনুক্ষর ঘটনার অংশবিশেষ তাঁহারা কখনই বর্ণন করেন না। বাহুল্যকে সুন্দর করিয়া বলিয়া থাকেন—আর সর্ব্বোপরি তাঁহাদের বর্ণনভঙ্গী কবিত্বময়।

ছোট গল্পে কল্পনার প্রসার থাকা চাই। কল্পনার রঙ্গিন আলোকে বিষয়টী আলোকিত হওয়া উচিত। বিষয়টী নূতন এবং একটা অভিজ্ঞতা ভাল

করিয়া থাকা চাই। আর মনোজ্ঞ ভাষায় তাহাই বর্ণনা করা প্রয়োজন। ছোট গল্পলেখকের বৈশিষ্ট্য এইখানেই—ছোট গল্পলেখকেরা জীবনকে সমগ্রভাবে দেখেন না—জীবনের কোন একটা ঘটনা বা অভিজ্ঞতা তাঁহারা ফুটাইয়া তোলেন। উপন্যাস লেখকের যে অভিজ্ঞতা ও দার্ঢ্য থাকা উচিত, ছোট গল্পলেখকের তাহা না থাকিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। অভিজ্ঞতা জ্ঞানোদর্শন-কলসাপেক্ষ। বহু লোকের জীবন না দেখিলে জীবনের সত্য উপলব্ধি করা দুরূহ। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, জগতের মধ্যে যাঁহারা বড় বড় উপন্যাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা প্রৌঢ়ত্বে উন্নীত হইয়া উপন্যাস লিখিয়াছেন—অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে লেখেন নাই। অবশ্য এ নিয়মের যে ব্যতিক্রম হইতে পারে না, তাহা বলিতেছি না। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা মনীষাবলে অল্প বয়সের ভিতর সংসারজ্ঞান লাভ করিয়া এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন; কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, মনীষা জগতে বড় সুলভ নয়। আর ছোট গল্পলেখকেরা অল্প বয়সে চরিত্রের কোন একটা দিক ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা পাইয়া তাহাই সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়া অমর হইয়া যান। কিপ্‌লিং ১৭ হইতে ২০ বৎসরের ভিতর দু তিনটী সুন্দর ছোট গল্প লিখিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন।

ছোট গল্পলেখকদিগকে অধিকতর কলাকুশলী হইতে হয়। ঔপন্যাসিক আর্টের দিকে ততটা মনোযোগ দেন না। তাঁহার লক্ষ্য থাকে চরিত্রস্ফুরণে, ঘটনা-সমাবেশের দিকে। উপন্যাস একটা ভাব উৎপাদন করে না। অনেক গুলি ভাবের সমবায় উপন্যাসে থাকে। উপন্যাসের কলশ্রুতি অনেক হইতে পারে—পোর ভাষায় বলিতে গেলে totality and unity of narrative effect—ভাবের একতা উপন্যাসে থাকে না। উপন্যাস সত্যপ্রচারের যন্ত্র। উপন্যাস লেখকমহাশয়ের বাণী-প্রচারের ক্ষেত্র। অভিজ্ঞতা না থাকিলে—বর্ণিতব্য বিষয় না থাকিলে ঔপন্যাসিক কি বাণী প্রচার করিবেন? আর্টের বিশেষত্বের দিকে ঔপন্যাসিকেরা অবহিত না হইলে, তাঁহারা যে চিত্র বা ঘটনা অঙ্কন করেন, তাহা আর্টের নিয়মানুযায়ী না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদিগকে সেগুলি আনন্দ দান করিতে সমর্থ হয় না। মনীষাসম্পন্ন ঔপন্যাসিক থ্যাকারে, স্কট ও জর্জ্জ এলিয়ট এ বিষয়ে অবহিত না হইয়াও সফলতা লাভ করিয়াছেন কেবল তাঁহাদের মনীষা বলে। স্কট বর্ণন-ভঙ্গীর (style) দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখেন নাই। থ্যাকারে গঠনবিষয়ে অমনোযোগী ছিলেন, আর এলিয়ট অতিবিস্তৃতিদোষদুষ্ট হওয়ায় সময় সময় পাঠকদিগের বিরাগ উৎপাদন করিয়া থাকেন। পড়িতে পড়িতে ধৈর্য্যচ্যুতি যে পাঠকদিগের ঘটিয়া থাকে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

সৌন্দর্য্যানুভূতি ও কলা-জ্ঞান তরুণ বয়সে সহজ জ্ঞানপর প্রতীয়মান হয়। অল্পবয়স্ক লেখকেরা এ বিষয়ে অধিকতর পারদর্শিতা দেখাইয়া থাকেন। বয়স ও অধ্যবসায়গুণে কলানিপুণতা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভবিষ্যৎ কলাবিদের প্রথম বয়সের রচনা হইতে এমন একটা ভাবের পরিপক্কতা দৃষ্ট হয়, যাহা দেখিয়া বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়। তখনও হয়ত লেখকের বলিবার বিশেষ কিছু নাই, সংসারিক অভিজ্ঞতাও তত তাঁহার জন্মে নাই; কিন্তু বর্ণভঙ্গীগুণে চকমকি চপলায় ক্ষণিক বিকাশের ন্যায় বুঝিতে পারা যায়, লেখকের শক্তি আছে। এ শক্তির অনুশীলন হইলে সুফল পাওয়া সম্ভব। অনেকে আবার ইহাকেই লেখকের অকালপরিপক্কতা বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। অল্পবয়সে যে ভাল ছোট গল্প লিখিতে পারা যায়, ইহাও একটী কারণ। হ্যামিলটন সাহেব ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন, 'This is another reason why the Short Story as opposed to the

novel, belongs to youth rather than to age. বয়োবৃদ্ধ সংসারজ্ঞানপরায়ণ কথা-সাহিত্যিকের নিকট অল্পবয়স্ক গল্পলেখক বাণী প্রচার বিষয়ে পরাজিত হইতে পারেন, কিন্তু কলাকুশলতায় তিনি অধিকাংশ স্থলেই বয়োবৃদ্ধকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখেন। অবশ্য কথাটার ভিতর সত্য আছে; কিন্তু সাধারণ ভাবে একথা বলিতে পারা যায় না। এই কারণেই বোধ হয় হ্যামিলটন সাহেব সাধারণ ভাবে বলেন নাই।

ছোট গল্প বাস্তব চিত্র (realistic) নয়। বাস্তব হইলেই তাহা 'চিত্র' বা 'নক্সা' হইয়া থাকে। ইহা 'ভাবগত' বা 'আদর্শমূলক' (Romantic)। অল্প পরিসরের ভিতর শেষ করিতে হয় বলিয়া পরিচিত দ্রষ্টব্য বিষয় হইতে সত্য নির্দ্ধারণ করিবার প্রথা এক্ষেত্রে অনুসৃত হয় না। আরোহ-প্রথা (Inductive method) এখানে কার্য্যকরী হয় না। অবরোহ প্রথা (Deductive method) এখানে বিশেষ কার্য্যকরী। আর এরূপ করাও সহজ একটা সাধারণ সত্য হইতে বর্ণিতব্য বিষয়গুলি প্রতিপন্ন করা যতটা সহজ, দ্রষ্টব্য বিষয় গুলি হইতে নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া ততটা সহজ ব্যাপার নয়। হ্যামিলটন সাহেবও এই কথাই বলিয়াছেন, একটা সত্য হইতে ঘটনায় অবতরণ করা যতটা সহজ, ঘটনা হইতে সত্যে উপনীত হওয়া ততটা সহজ নয়। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের চিন্তনও যতটা সহজ, শেষোক্ত বিষয় ততটা নয় (it is a quicker process to think from the truth to facts than to think from facts to the truth)। দোষে, মোপাসা উপন্যাসক্ষেত্রে বাস্তব পন্থী; আর ছোট গল্প লিখিবার সময় তাঁহারা ভাব বা আদর্শ পন্থী। পো, হথরণ ষ্টীভেন্সন ও কিপলিং ইংরাজী ভাষায় গল্প লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহারাও ছোটগল্পে শেষোক্ত পথাবলম্বী।

—শিক্ষক

—বাসন্তী

পথে

(কথিকা)

(শ্রীমতী শতদ্রু দেবী)

১

মন ত পথে বা'র হ'য়েছিল। শ্রাবণের বৃষ্টি-ধারার মাঝে যে সম্বল—আশ্বিনের সোণার আলোয় তা' কাজে পরিণত হবার উপক্রম হলো। যে চিন্তা ভোরে আকাশের শুকতারার মতই প্রাণে জ্বল জ্বল করতো, শরতের আলোয় নিমন্ত্রণে আর শেফালি বালার হাসির আভাস পেয়ে সেটা উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠলো। ওদিকে মন প্রাণে খোস হ'লো। ভাল করে জিজ্ঞেস করে জান্‌লুম বৈরা-গ্যের বাঁধ ভেঙেছে, মায়ের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। ত্যাগেরই সুর নিয়ে—ত্যাগেরই সুরভী নিয়ে, ত্যাগের হাওয়া তা'র উপর দিয়ে বয়েছিল, যে কয়টি হিল্লোল উঠেছিল সব কয়টাই ত্যাগের।

গর্ব্বভরে শরতের নীবিড় নীলিমাকে বল্‌লুম "তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু তোমার রূপ অপিতা-তোমার মোহ হ'তে আমি বহু দূরে। আকাশ হেসেই আকুল। শুভ্র জ্যোৎস্নার বন্যা যখন নেমে এল তা'রে বল্‌লুম "ওগো জ্যোৎস্না তুমি-ত বন্যায় কবির মন ভাসাও, দুর্ব্বলের মন রূপালী ছাঁচে গড়, ত্যাগীর কি করবে।" সারাবেলা ত্যাগের গানে প্রাণ ভরে ছিল। কবিদের যা উপাস্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আকারের অনুপম অমূল্য জিনিষ গুলিকে এমন ভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে, প্রাণের কোমল তারে একে-বারেই ঘা পড়েনি। বরং মনে একটু গর্ব্ব হয়েছিল যে নিখিল বিশ্বের লোক যাদের চায় তাদের আমি হেলায় ত্যাগ করিতে পারি। শেফালিকার অভি-নন্দনে ভোরের বাতাস মাথার উপর ঢেলে দিলে, শরতের সোনার আলো দেহ মন উদ্ভাসিত করলে। আমি বুঝলুম্ আমার "নীত্যের আশীষ এসেছে।" আ'লো আর শেফালির কথা সহানুভূতির মধ্যে মনে পড়লো। বুঝলুম তারা আমায় অভিনন্দন কর্ব্বার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছে।

"আর দেরী কি? মন বল্‌লে কিছুই নয় "বাধা বিঘ্ন"? উত্তর এল যে নদী সাগরের পানে ছুটেছে কা'র সাধ্য তারে রোধে।" মনের সাথে দেহ নিয়ে পথে বেরুবো—পথে তা'র সঙ্গে দেখা। অতি কোমল স্বরে সে বল্‌লে "এ কি? উত্তর করলুম "অনন্তের পানে" কথাটার উত্তর দিয়েই চলে যাচ্ছি-লুম। আবার পিছন হ'তে কোমল কণ্ঠে ডাক্‌লে, 'শোন'। আবার ফিরলুম মন এবার বল্‌লে "থেমোনা, পথ সাম্‌নে এগিয়ে যায়। পিছনের আকর্ষণ ছিল বড় জোর। আমায় ফিরতেই হ'লো। মুখ খানি নীচু করে সে বল্‌লে 'ছবি গুলি নাও।' হাওয়ার ছবি হাতে দিয়ে সে চলে গেল। মন আবার বল্‌লে "এগিয়ে চল"। আমি দেখতে লাগ-লুম ছবি। একটির পর আর একটী ঘটনা, দিনের আলোর মতই উজ্জ্বল, শরতের সোণার মতই উপ-ভোগের আর বিদায়ের সাধনার মতই করুণ। ভাল ক'রে চেয়ে দেখলুম সব ছবি গুলি ঠিক আছে একটীও যান হয়নি। অনন্ত পথের যাত্রীকে করলে স্মৃতি পথের পথিক। আকাশের জ্যোৎস্না হেসে চাইলে, শেফালী হেসে নিজেকে বাতাসে ছড়িয়ে দিলে। মন তখন ছুটে যেতে চাইলে সেই স্মৃতি মাখান আরগাটায়। যেটা হেলায় ছেড়ে আস্‌ছিলুম। চোখ দুটী জলে ভরে উঠ্‌লো। বিস্মৃতির দেখান পথটী স্মৃতির পরশে বদ্‌লে গেল।

Printed by P. N. Pal, at the Shastrapracher Press, 5 Chidammudi Lane, and Published by P. N. Pal. 96-3 Scott Lane, Calcutta.

মদন-বিলাস

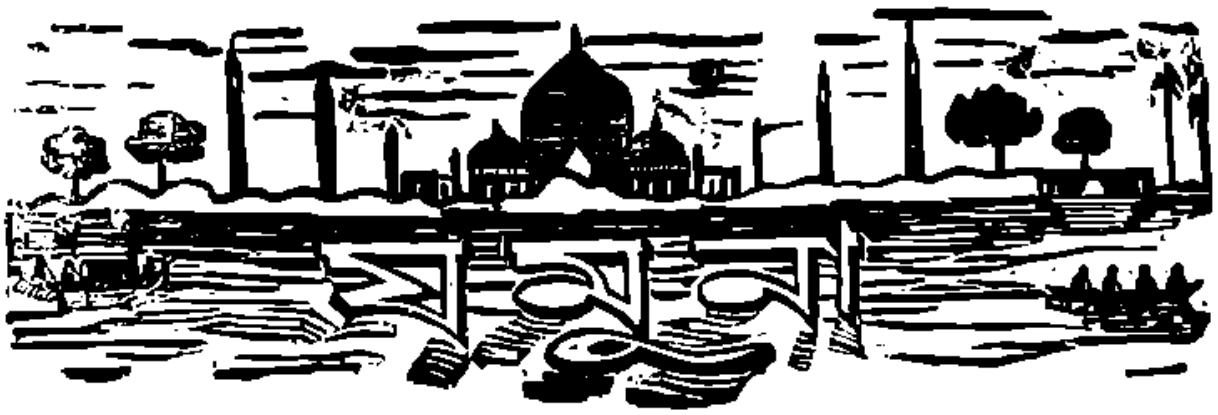

১২শ বর্ষ | পৌষ ১৩২৯ | ৯ম সংখ্যা

অভিনেতা

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ)

মরেছে এক অভিনেতা একটী অভিনেতা,
তাহার লাগি দুঃখ কেন? অমর কে আর কেতা।
একলা সে তার মরেনি ত মরেছে তার সাথে
যুগের যুগের ক্ষুদ্র মহৎ দুঃখ যে হয় তাতে।
নূতন করে রাম বনে যান আসব না আর বলে
লক্ষ্মণ ও তার সঙ্গে নাহি, সীতা ধরার তলে
সঙ্গে তাহার সাঙ্গ হল নূতন করে ত্রেতা,
মরেছে আজ অভিনেতা একটী অভিনেতা।

অর্জ্জুন যায়, ভীষ্ম পলায়, চলে যে যায় শিবি
যযাতি যায় যৌবন কে নূতন করে দিবি।
জীবন্ত এক চিত্রশালা যায়রে চলে যায়
দু' এক ফোঁটা অশ্রুতে তার নাই কি দাবী হায়।
ওলট পালট করে গেল ওই যে ধরা খান,
উহার সাথে প্রতাপ মলো, মরলো সাজেহান
মরলো অনেক মহারথী, মরলো অনেক জেতা
মরেছে এক অভিনেতা একটী অভিনেতা।

সত্য ত্রেতা দ্বাপরের সে কলির শুধু নয়
যুগের জলের অভিষেকে তাহার অভিনয়।
পুরাতনকে বাঁচিয়ে ছিলো রক্ত আপন দিয়ে
তাই সাগরের গা ঠেলে হায় নূতন জনম নিয়ে।

আজ সে গেল নেপথ্যে যে আসবে নাক আর
দুদিন পরে ভুলবে লোকে নামটীও যে তার
তাহার লাগি মনের মাঝে জাগছে শুধু ব্যথা
মরেছে এক অভিনেতা একটী অভিনেতা।

ভাগের পূজা

[লেখক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী]

পূর্ব্ব পূজারীগণ :—(১) শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া। (২) শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার। (৩) শ্রীমতী সরসী বালা বসু (৪) শ্রীযুক্ত বিমলপতি চৌধুরী। (৫) শ্রীমতী চারুবালা বসু (৬) শ্রীযুক্ত অমর কুমার সেন (৭) শ্রীমতী লীলা দেবী।

(৮)

কমলের কথা।

কাল সারা নিশি জাগরণে গিয়েছে। ভোরের দিকে গা'টা কেমন একটু ঝিম্ ঝিম্ করছিল। বিছানা ছেড়ে উঠ্‌বারই ইচ্ছা ছিল না। কাল রাত্রে গিয়েছিলুম রমেশদের বাগান বাড়ীতে, নিমন্ত্রণ ছিল। আমোদের পর যে অবসাদ স্বাভাবিক শরীরের ও মনের এই ঝিম ঝিম, ঝিম ঝিম অবস্থা সেই আমোদেরই প্রতিক্রিয়া মাত্র। রাত্রে আমি যখনি শুই না কেন, ভোর পাঁচটায় আমার ঘুম ভাঙবেই। বড় লোকের ছেলে হয়ে, আরও সংস্র কু-অভ্যাসের দাস হয়েও আজও প্রত্যূষে ঘুমটা কেমন ভেঙে যায়। এ অভ্যাস এখনও ছাড়তে পারি নি।

ঘুম ভেঙে—খুব গরম গরম দু'কাপ চা খেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে বসতে শরীরের ঝিম ঝিম ভাব যেন অনেকটা কেটে গেল। আজ সকালে অমলের আমার সঙ্গে দেখা করবার কথা—ধূমপান করতে করতে তারই প্রতীক্ষা করছিলুম। অমল আমার বাল্যবন্ধু—জীবনে বহু বন্ধু পেয়েছি—বহু বন্ধু হারিয়েছি। যার সঙ্গে একদিন গলায় গলায় ভাব ছিল, যাকে না দেখলে একদিনও থাকতে পারতুম না, যাকে একবার দেখবার জন্ত—দু'টী কথা কইবার জন্য শতবার কাজে অকাজে ছুটে গিয়েছি—তেমন বন্ধু সব আজ অজানা হয়ে গেছে, কদাচিৎ কখনো দেখা হলে অনেকক্ষণ মুখপানে চেয়ে তবে বাল্য-পরিচয়ের সে কথা স্মরণ-পথে যেন আসে। তারপর ক্ষণিকের জন্ত ভাসা ভাসা দু'টো কথা হয়। জীবনে কত বন্ধু এল, কত বন্ধু গেল! কিন্তু অমলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ভাব বাল্যকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত সমভাবে আছে।

ছেলে বেলা স্কুল থেকে বরাবর দু'জনা এক সঙ্গেই পড়েছি, তার পর কলেজেও দু'জনা এক সঙ্গেই পড়েছিলুম। তারপর আমার ঘাড়ে কি ভূত চাপলো, আমি কলেজের পড়ায় ইস্তফা দিয়ে—মা সরস্বতীর সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে বসলুম। অমল একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব গুলি পাশ দিয়ে কোন কলেজের প্রফেসার হয়ে বস্‌ল। এখন আবার শুনছি, অমলচন্দ্র নন্-কো-অপারেশন করে প্রফেসারী ছেড়ে দিয়ে স্বদেশী প্রচার করছে। এবার কলকাতায় এসে অমলের সঙ্গে একদিন মাত্র মিনিট কয়েকের জন্ত দেখা হয়েছিল। দেখলুম, মোটা আট হাতি খাদি একখানি তার পরণে, হাত-কাটা খাদির একটা জামা তার গায়, জামার উপর খাদির একখানা চাদর, পায়ে জুতো নেই। আমি তাকে দেখে হেসে বললুম, 'এ যে একেবারে

'অল খাঁটি'—' অমলও হেসে বললে, 'এর বেশী যে আর সাধ্য নেই।'

আমিও তাড়াতাড়ি কাজে বের হচ্ছিলাম—রাস্তায় দাঁড়িয়ে বেশী কথা কইবার সময় ছিল না। অমল বললে, আমার বাড়ী এসে কথা কইবে। পত্নী-সম্ভার সম্বন্ধে সে কি আলাপ করবে তারও একটু আভাস আমায় জানিয়ে গেল। আজ তার আসবার দিন। অমল আসবে বলে তার আশায় বসে আছি, এমন সময় চাকর রামাইত এসে বললে, একটা বুড়ো গোছের বাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।

রামাইতকে বললুম, 'উপরে নিয়ে আয়।' বুড়ো লোকটী উপরে আসতেই দেখলুম, ইনি আমাদের গ্রামের সেই খুড়ো মশাই! উঠে খুড়োমশাইকে মামুলি ধরণে প্রণাম করতে খুড়ো বললেন, 'জয়ন্ত বেঁচে থাক বাবা, কীর্ত্তিবান পুরুষের মত কীর্ত্তি রাখ।'

খুড়োকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে খুড়ো বললেন, 'আর ভায়া বল কেন, এই বৃদ্ধ বয়সে তোমাদের মুখখানা না দেখলে কি আর থাকতে পারি—তাই গ্রাম ছেড়ে মুখখানা একবার দেখবার জন্য ছুটে এলুম। সমস্ত রাত্রি গাড়ীতে যা ঠাণ্ডা—আর দুর্ভোগ গেছে, তা সে কি আর বলবো!'

আমি বলিলাম, 'খুড়ো একটু চা খাবেন কি—চা আনতে বলবো?'

খুড়ো হাসিয়া বলিলেন, 'হাঁ বাবা, হাঁ—চা অতি উত্তম পদার্থ, দেশ গাঁয়ে কটা লোকে অমন মূল্যবান তেজস্কারী পদার্থ খেতে পারে বল দেখি বাবা! সেই যে সেবার গাঁয়ে গিয়ে ক'দিন চা খাইয়েছিলে—দেহটা বেশ পোষ্টাই ছিল। সুন্দর পদার্থ! খেলেই শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠে। আর এই বুড়ো হাড়ে উত্তেজক পদার্থ না খেলে শরীর যেন বইতে চায় না ভায়া।'

এই বলিয়া খুড়ো খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তারপর সুখবর আছে ভায়া- সুখবর আছে। বলি তোমাদের জন্য তো আমরা ভেবে ভেবে সারা—কোথা থেকে কি ভাল জিনিষটা এনে তাদের মুখে তুলে দেব. সেই ভাবনাতেই আমাদের দিন যায়—তাদের বুঝি বা চোখের আড়াল হলে আর আমাদের কথা মনেও পড়ে না।'

খুড়োর সুসংবাদ শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আমি বলিলাম, 'তা নয় খুড়ো, মনে আমাদের খুবই থাকে—আপনাদের স্নেহের কথা কি আর ভোলা যায়।'

খুড়োর সঙ্গে কথা হইতেছে, এমন সময় অমল ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'এই যে বাবুদের চা খাওয়া হয়ে গেছে নাকি! আসতে একটু দেরী হয়ে গেছে ভাই—অনেকক্ষণ বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম, তা পথে আবার বিমল, অরুণ ওদের সঙ্গে সব দেখা—তাই দেরী হয়ে গেল।'

আমাদিগের গল্প চলিতেছে—খুড়ো মহাশয়ের সুসংবাদ দান অর্দ্ধ পথে স্থগিত পড়িয়া আছে। খুড়ো মহাশয় হাঁ করিয়া অমলের বিদেশী-বর্জ্জন, স্বদেশী-প্রচারের কাহিনী শুনিতেছিলেন। এমন সময়ে চাকর ট্রেতে করিয়া তিন পেয়ালা চা ও টোষ্ট, রুটি, মাখন প্রভৃতি লইয়া আসিল। আমরা দুইজন—আমিও অমল ট্রে হইতে চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইলাম, খুড়ো মহাশয় ফ্যাল ফ্যাল চোখে চা ও রুটী মাখন গুলির পানে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার উদ্যত হস্ত আর অগ্রসর হইল না।

অমল হাসিয়া বলিল, 'খান না ঠাকুর মশায়, চা খাবেন না?'

খুড়ো একটু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, 'এগুলি—ওগুলি -'

খুড়োর মনের ভাব বুঝিয়া আমি বলিলাম 'ওতে দোষের কিছু নেই; ওগুলি পাওরুটি, ও আজকাল সকলেই খায়—আর এগুলি বিশুদ্ধ মাখন।'

খুড়ো সতৃষ্ণ নয়নে মাখন ও রুটির পানে চাহিয়া কহিলেন 'রুটিতে মুরগির ডিম নেই তো!—'

অমল ঠাকুর মহাশয়ের ধর্ম্মভীরুতা দেখিয়া ওঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, 'না-না সে ভয় আপনার নেই—আপনাদের পাড়াগাঁয়ে সস্তা মুরগির ডিম —সেখানকার কটিতে মুরগির ডিম দিলেও দিতে পারে, এখানে ডিম বেজায় আক্রা—এমনি মুরগির ডিম দিলে তো আমরা বেঁচেই যেতাম।

এইবার খুড়ো মশায় চায়ের পেয়ালা চুমুক দিতে দিতে ও রুটি মাখনের আস্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে বলিলেন, 'বড় উপাদেয় বড় উপাদেয়-পদার্থ বাবা—মুড়িও আমাদের ভাল খাদ্য বটে—তবে সে আর এখন এ দাঁতে যেন সয়না, এ অতি নরম মোলায়েম পদার্থ—খেয়ে তৃপ্তি আছে।'

অমলের সঙ্গে খুড়োমশায়ের গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। খুড়োর সঙ্গে অমল পত্নীর সুখ সুবিধা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির আলাপে মত্ত হইয়া গেল। খুড়ো মশায় যেন এসব আলাপ তেমন হৃষ্টচিত্তে পরিপাক করিতেছিলেন না। তিনি বোধ হয় আমাকে যে সুসংবাদ শুনাইতে আসিয়াছিলেন তাহাই শুনাইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছিলেন। অমলও পত্নী-সংস্কারের কথা ছাড়িয়া এই পল্লী বৃদ্ধের সঙ্গেই তরল হাস্যামোদে লিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। খুড়ো মহাশয়ের প্রকৃতি অমল মুহূর্ত্তের আলাপেই বেশ ধরিয়া লইয়াছিল।

খুড়ো মহাশয় চা পানান্তে পরম তৃপ্তির সঙ্গে বলিলেন, 'কিহে ভায়া, তোমাদের এখানে ধূম পানের ব্যবস্থা নেই?' আমি হাত দিয়া সিগারেটের কৌটাটা খুড়োর পানে আগাইয়া দিয়া নিজেও তাহা হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইলাম। অমল সিগারেট না ধরাইয়া পকেট হইতে একটি বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল। সিগারেট ও বিড়ির ধূমের পানে তৃষিত নয়নে চাহিতে চাহিতে খুড়ো মশায় কহিলেন, 'এ বুড়ো বয়সে আর ওসব অনাচার কেন ভায়া—একটা খেলো হুঁকো টুকোর যোগাড় হবে না তোমাদের বাসায় —এ বয়সে আর ওসব সাহেবী ধূম পান আমাদের ধাতে সইবে কেন?'

অমল কহিল, 'খান নি বুঝি কখনো খুড়ো—আচ্ছা বিদেশী অনাচার সিগারেটগুলো নাই বা খেলেন, আমাদের দেশী জিনিসের তৈরী বিড়িই এক-আধটা খেয়ে দেখুন না।'

খুড়ো হাসিয়া বলিলেন, 'তা ভায়া তোমরা খাচ্ছ যখন, তখন আমাদের খেতে আর আপত্তির কি থাকতে পারে—শাস্ত্রেই আছে—মহাজনো যেন গতঃ—সঃ পন্থা—অর্থাৎ কিনা মহাজনের পথই সব সময় গ্রহণ করতে হবে। তা তোমরা যখন বিদ্বান পণ্ডিত, সর্ব্বোপরি দেশের রাজা; তোমরা যা করবে, সেইটেই হবে দেশাচার—তাই চলবে, তাই দেশের সকলে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।' এই বলিতে বলিতে খুড়ো মশায় একটি সিগারেট কৌটা হইতে বের করে তাতে অগ্নি সংযোগ করলেন। খুড়ো মশায় সিগারেটের ধূম পান করছেন, এমন সময় তামাকও এসে উপস্থিত হোল। খুড়ো বাম হাতে অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটি ধরে দক্ষিণ হস্ত হুঁকোর জন্য প্রসারিত করে—এ্যাস-ট্রের উপর সাবধানে অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটির অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া ধীরে ধীরে হুঁকো টানিতে টানিতে বলিলেন, 'তা যাই বল তোমরা, হুঁকো টেনে—তামাক খেয়ে যে শান্তি, তোমার অনেক দামের সিগারেট খেলেও সে শান্তি নেই।'

এমনি নানা গল্প চলিতে চলিতে বেলা অনেক হইয়া গেল। অমল অন্য দিন আসিবে বলিয়া কাজ আছে বলিয়া উঠিয়া পড়িল; খুড়ো মহাশয় ক্ষুণ্ণির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। অমল উঠিয়া যাইতে খুড়ো মহাশয় বলিলেন, 'এ ছেলেটী কে ভায়া—বেশ রসবোধ আছে। তবে পাড়াগাঁয়ের দিকেও খুব ঝোঁক দেখলুম—'

'হাঁ খুড়ো মশায়—অমল খুব ভাল ছেলে, আমারই বাল্যবন্ধু; এম, এ পাশ, আর সেও যে সে পাশ

নয়, একেবারে প্রথম পাশ। পাশ করেই আবার বড় কলেজের প্রফেসর হয়েছিল, এখন স্বদেশী হুজুগে কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে কি করে দেশের উন্নতি করবে তাই ভাবছে। দেশে আমাদের অনেক জমি-জমা অমনি-অমনি পড়ে রয়েছে, তাই অমলের ইচ্ছা দেশে গিয়ে যদি কোন একটা ভাল কাজ করা যায়।'

খুড়ো বলিলেন, 'সে তোমরা ইচ্ছা করলে দেশে অনেক কাজই করতে পার তারা। তোমাদের দ্বারা যে সম্ভব, তা কি আর কারো দ্বারা সম্ভব হবে? ও নিমলে আর প্রসাদ ছোঁড়া যতই যাই কেন না করুক, ওরা ভাল সাধনাবে কোথেকে? স্বদেশেই বল, আর বিদেশেই বল, অর্থ-বলই এখন মহাবল। অর্থ বিনা মুখের কথায় আর এখন চিঁড়ে ভিজবার জোট নেই।'

খুড়োর কথায় হঠাৎ যেন হৃদয়-তন্ত্রীতে কেমন একটা আঘাত লাগিল। আমরা ইচ্ছা করলে দেশের অনেক কাজই যে করতে পারি—এ ধারণা তা হলে খুড়োও রাখেন।—আমাদের দ্বারা যা সম্ভব, সে কি আর কারো দ্বারা সম্ভব হবে। নির্ম্মল, প্রসাদ যা কচ্ছে—গ্রামের জন্ত তারা যে ভাবে স্বার্থত্যাগ করে দিন-রাত খেটে মরছে, সে কি তবে আমাদের মত অর্থশালী লোকের একটু সহানুভূতি পেলেই কোন সৎ চেষ্টাই যে সার্থক হয় না—অর্দ্ধ পথেই যত চেষ্টা উৎসাহ নিভে যায়—এও কি যাদের ক্ষমতা আছে সেই সব দেশবাসীর শৈথিল্যেই। ভাবিতেছিলাম, এমন সময় খুড়ো বলিলেন 'ভাবছ কি যে ভায়া—সুসংবাদ—সুসংবাদ। কি খাওয়াবে বল, তবে সংবাদ বলবো।'

খুড়োকে বলিলাম, 'খাওয়ার জন্ত ভাবছেন কেন খুড়ো—যা খাইবেন তাই খাওয়ান যাবে—সংবাদটা কি বলুনই।'

খুড়ো আরও কিছুক্ষণ টানিয়া ধুলিয়া নানা ভূমিকা করিয়া কহিলেন, 'আরে ভায়া, সেই শুভোরভরা ছুঁড়িকে এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে।'

আমি সাগ্রহে বলিলাম, 'কোন ছুঁড়ি খুড়ো মশাই।'

খুড়ো বলিলেন, 'সেই যে গয়লা বৌ—যেমাকে মাটীতে যার পা পড়ে না, আমাদের দিকে যে ফিরেই চায় না।'

আমি বলিলাম, 'তাকে কি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছেন—না পিছনে আসছে? কার সঙ্গে আসছে—নিজে ইচ্ছে করেই আসছে এবার, না জোর করে নিয়ে আসা হচ্ছে?'

খুড়ো বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিলেন, 'জোর করে কি আর এতদূরের রাস্তা এমন যোয়ান মাগীকে আনা যায়! সে ভায়া অনেক কারসাজী করতে হয়েছে—অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, তবে তো মাগীকে সুদ্ধু করা গিয়েছে।' হুঁকায় সজোরে দুটি টান দিয়া শীতের শিহরণ দূর করিয়া খুড়ো কহিলেন, 'আমি যে খুড়ো, আমায় গ্রামের কে না চেনে বল। বেটী আমাদের কথা এড়িয়ে গিয়ে ভেবেছিলেন যে, বড় আশ্রয় পেয়েছেন, তারপর তুমি চলে আসবার পর এমনি অবস্থা করে তুললেন যে, যাদের বাড়ী রয়েছেন তারা পর্য্যন্ত আর চোখে পথ দেখতে পান না। এমন নামাল-নামাল রব উঠে গেছে—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি গোছ অবস্থা। ওই নিমলে আর প্রসাদ ছোঁড়ার যা অবস্থা করেছি—বাছাধনদের এখন গাঁয়ে থাকাই কষ্টকর—সমাজে বন্ধ হব-হব-অবস্থা। আরে ভায়া, এত কাল আমরা গাঁয়ে কাটিয়ে, গাঁয়ের ভাল মন্দ সব অবস্থার ব্যবস্থা করে, উঁচু মুখে চলে এলাম, আজ কিনা ছুটো ছোঁড়া এসে মাতব্বরী ফলিয়ে আমাদের সেই উচ্চাসন কেড়ে নেবে। এ কি হয়, না হ'তে পারে?'

খুড়ো মহাশয়ের উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা-স্রোতে বাধা

দিয়া কহিলাম, 'তারপর, গয়লা বৌ এখন আছে কোথায়?'

'সে এই এলো বলে ভায়া—দেখো এবার এসে প'ড়ে কেমন করে লুটে পড়ে সে! ঘুটে-কুড়ুনির রাজরাণীর অবস্থা করে দিচ্ছি, সে লইবে কেন? আরে আমরাই না হয় বুড়ো হাবড়া লোক, আমাদের দিকেই না হয় তোদের নজর না পড়ল, কিন্তু আমাদের কমলবাবু হেন বাবু তিনি যে অনুগ্রহ করে তোর দিকে নেক নজর দিয়েছেন, সেই না তোর কত ভাগ্যের কথা! তাও যেন ছুঁড়ির মন ধরে না! এইবার দেখা যাবে! এই ভায়া বিন্দু তাকে নিয়ে এল বলে—আমি সব ঠিক করে এসেছি—বিন্দু আর হরেকেষ্ট তাকে নিয়ে আসছে। দু' চার দিনের মধ্যেই এসে পড়বে।'

খুড়োর কথায় বুঝিলাম, আমি গ্রাম ছেড়ে চলে আসবার পর থেকে তাদের উপর যতটা অত্যাচার করা সম্ভব হতে পারে, তা খুড়ো করেছেন। আমি যে খুড়োর পাপকার্য্যের প্রশ্রয়দাতা, সেও হয়তো আরো স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। আমি এ ব্যাপারের মধ্যে আছি—এমন জঘন্য ব্যাপারের সঙ্গে আমার নাম সংশ্লিষ্ট, এতে আমার যেন একটা ভয়ানক লজ্জা বোধ হতে লাগল। নিজের কাছে নিজের লজ্জা, নিজের এতকালের শিক্ষা-সংস্কারের বিরুদ্ধ কার্য্যে সে লজ্জা তো আছেই, তার উপর মা—যাঁকে মা বলে ডেকেছি, যে প্রসাদের মার কাছে মাতৃস্নেহ পেয়েছি, যে স্নেহরসে বঞ্চিত হয়ে অন্তর আমার শুষ্ক কঠোর মরুভূমির মত হয়ে গিয়েছিল, যাঁকে পেয়ে হৃদয়ের সেই শুষ্ক উৎসে আবার আমার স্রোত বয়ে যাচ্ছে, সেই মা—আমার এই দুর্ব্বলতার জন্য আমার কি ভাববেন! কত না—কত কি তিনি তাঁর পুত্রদের নিয়ে আশা করেন, তাঁরই পুত্রস্থানীয় হয়ে, তাঁর গর্ব্বের কারণ হয়ে আমিই তাঁর হেঁট মুখ করাবো। নির্ম্মল, প্রসাদ যখন একথা শুনে তাদের দিদির কাছে—মায়ের কাছে যাবে, তখন তাদের মুখ থেকে আমার সম্বন্ধে যে সব কথা উচ্চারিত হবে, মায়ের আমার অন্তর কি তাতে ফেটে যাবে না।—চিত্ত কেমন যেন বড় চঞ্চল—উন্মনা হয়ে উঠল।

খুড়ো আমার উন্মনা ভাব দেখে বললেন, 'ভায়া, কিছু তুমি ভেবো না—এমন ভাবে সব ব্যবস্থা করা হয়েছে যে কাকে কোকিলেও কিছু জানতে পারবে না।'

গয়লা বৌর কথা

গভীর নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি। এত অন্ধকার যে কোলের মানুষও চেনা যায় না। আজ রাত্রে বিন্দুমাসির বোন-পো হরেকৃষ্টের সঙ্গে আমার নিজ গাঁ ছেড়ে দূর অজানা দেশে যাত্রার দিন। আমার ভাবনার যে অন্ত নাই—আর আশ্রয় ছাড়িয়া আমি নিরাশ্রয় অকূলে ভাসিতে যাইতেছি। কেন—কেন! এই কেনই শতবার শত প্রশ্নরূপে আমার মস্তিষ্কে উদিত হইয়া সমস্ত দেহকে কাঁপাইয়া শরীর মন অবসন্ন করিয়া দিয়া যাইতেছে।

কাহার কাছে কি জিজ্ঞাসা করিব। যাঁহাদের স্নেহের আবরণ আমাকে সর্ব্ব বিপদ উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া আজ আমাকে আশ্রিতা করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদের কাছে কোন মুখ লইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিতে যাইব যে, তাঁহাদের ছাড়িয়া আমি অকূলে ভাসিতে যাইতেছি—তাহাতে তাঁহাদের মত কি। আশ্রয়দাত্রী ও আশ্রয়দাতাদের মত আমি জানি—আমাকে এরূপ অবস্থায় ভাসিয়া যাইতে দিতে তাঁহারা কখনই মত দিবেন না।

নারী যে কত অসহায়—কত নিরাশ্রয়, কত ক্ষমতাহীন, কত তুচ্ছ—বার বার করিয়া আজ সেই কথাই আমার মনে হইতেছে। হায়! যদি নারী

হইয়া জন্মগ্রহণ না করিয়া পুরুষ হইয়া জন্মিতাম, তবে তো আমার এ দুর্ভোগ দুশ্চিন্তা আমার সহিতে হইত না। যেথায় ইচ্ছা সেথায় চলে যেতে পারতেম। লজ্জা ভয়, নিন্দা গ্লানি, পদে পদে আর এমন নির্মম ভাবে অন্তরের ইচ্ছাকে সবলে আঘাত করে মুষড়ে দিতে পারতো না।

পোড়া রূপ নাকি আমার বড়ই উজ্জ্বল; কিন্তু রূপের যে প্রভায় অন্তরের আকাঙ্ক্ষারাশিকে জাগ্রত করে তোলে, বাসনায় ঘৃতাহুতি দেয়, এ রূপের তেমন দাহিকা শক্তি এ পর্য্যন্ত আমি কোন দিন তেমন ভাবে অনুভব করি নাই। বাল্যে—অতি শিশুকালে বিয়ে হয়েছিল; বিয়ের বহুর অনেক পরেই—ধর্ম্মতঃ যিনি আমার স্বামী হয়েছিলেন, তিনি ম্যালেরিয়া শ্রীহায় ভুগে ভুগে মারা যান। শিশু-কালেই স্বামীহারা আমি। যে বয়সে মেয়েরা সব পুতুল খেলা খেলে, সেই বয়সেই সংসারের খেলা—স্বামী-স্ত্রীর খেলা আমার সাঙ্গ হোল। নারীর মাতৃত্বের সহজাত যে প্রবৃত্তি, সে প্রবৃত্তি আমার বিকশিত হ'তে পারল না। শ্বশুর ঘর করতে এলাম,—ছেলে-থেকো বেটার বৌকে আর কবে কোন শ্বশুর-শাশুড়ি ভাল নজরে দেখে থাকেন! তাই আমি হলুম তাঁদের সবাইকার একটা আপদ—চক্ষুশূল মাত্র। এখন আমি সংসারের একটা বোঝা মাত্র—বোঝাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলেই যেন সংসারের সকলে বাঁচেন! বোঝা সত্যি, ভারও সত্যি—কিন্তু প্রাণহীন জড়পদার্থের বোঝা তো নয় যে, নামিয়ে ফেললেই তার ভারের হাত হতে নিষ্কৃতি পাবেন। —তাই আমার ভার নামাবার উপায় আবিষ্কারের চিন্তায় তাঁদের যে মাথা-ব্যথা ও মুখব্যথা হোত, তাতেই আমি হাঁপিয়ে উঠতাম।—মনে হয় কেন আবর্জ্জনা—সকলের জঞ্জাল হয়ে এ ভাবে অভিশপ্ত জীবনের ভার বহন করি। কি সার্থকতা কি লাভ এ জীবনে। এ জীবনপাতে সংসারের একটি প্রাণীও নেই যে, এতটুকু দুঃখ প্রকাশ করে—এক বিন্দু চোখের জল ফেলে! নিজের কাছেও এ জীবন কবে থেকে যে একটা বিষম অসহনীয় ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে আজ ভাল করে মনেই পড়ে না।

জ্ঞান হবার সময় থেকেই দুর্ব্বহ জীবনের এই ভার বোঝা বইছি। গলগ্রহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার কোন সহজ ও বৈধ পথ আছে কিনা তাই খুঁজতে—কিন্তু পথ আর মিলছে না! কোন ফাঁকে দেহ ও মনের উপর আর একটা উপসর্গ এসে জুটেছে—সেটি হচ্ছে যৌবন। বামুন পাড়ার হরি-মতি সই একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন—সই লো সই—যৌবন বড় বিষম কাল—সখী সাবধান।'

হাঁটতে দোষ, বসতে দোষ, চলতে দোষ—পদে পদে দোষ! যে দোষের জন্য বাড়ীর লোকের কাছে পদে পদে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইতেম, যে দোষ আর কোরবো না মনে মনে হাজারো বার এই সঙ্কল্প করতুম, আবার হয়তো তেমনি আর একটা দোষই করে বসতুম। বুঝতে পারতুম না নিজে কোথায় কি ভাবে কি দোষ করে ফেলিছি। যৌবন আপনাকে প্রকাশ করবার জন্য যতটা ব্যগ্র অধীর হয়, তার চাঞ্চল্য ভেতরে বাইরে যতটা সুপ্রকাশ হয়ে পড়ে তা ছাড়া তার চেয়ে বেশী কিছু আমার ভেতরে বাইরে প্রকাশ হয়েছিল কি না সে আমি জানি না। চঞ্চল যৌবনের চাঞ্চল্য যৌবন আপন প্রভাবেই আমার উপরে আমার অজ্ঞাতসারে বিস্তার করে যাচ্ছিল, চারিদিকে ছিঃ ছিঃ—ধ্যা ছ্যা, চারিদিক হতে অসংখ্য নিন্দা গঞ্জনা যৌবনকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা ইহার মধ্য দিয়াও এই অনিচ্ছার জিনিসটি যে কি করিয়া নিজ রাজত্ব বাড়াইয়া যাইতেছিল তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। যে বস্তুর আগমন নিজে বুঝি না ও জানি না যাহার উপর নিজের কোন হাত নাই, যাহার প্রভাব এড়াইবার সামর্থ্য আমার কোন মতেই নাই সে উপদ্রবের জন্য—আধিপত্যের জন্য আমার দুরদৃষ্টে এত লাঞ্ছনা ভোগ কেন?

এতদিন তবু ঘরে ছিলাম,—শত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহেও মাথা গুঁজবার একটুকু স্থান ছিল, এইবার পোড়া যৌবন আমার সে স্থানটুকুও হারা করলে। এই পোড়া আগুনে ভরা মস্ত দেহটার উপর যে লোকের এত লোভ কেন পড়ে, তার কারণ তো আমি কিছু বুঝতে পারি না। কি আছে এতে, কিসের লোভে লোকে পাগল হয়ে এর পানে এমন করে ছুটে আসে?

ভাগ্যে যা ছিল তা হয়ে গেল। এই লজ্জাকর ঘটনা ঘটবার পর আমি আরও ভাল করে বুঝতে পারলুম যে কত বড় অসহায় নিরাশ্রয় আমি নারী! যে নিরাশ্রয়, আশ্রয় হারা নির্যাতিতা, সংসারে অহর্নিশ বেদনায় সদাই কাতরা, লোকে যেন তার উপরেই অত্যাচার করে, তাকেই আরো বেদনা দিয়ে সুখ অনুভব করে। নইলে জগতে এত থাকতে—এত সুন্দরী থাকতে আমার উপরেই বা এদের এত লোভ হবে কেন—আমার সহস্র লাঞ্ছনায় আশ্রয়টুকু হতে আমায় দূর করে পথে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যই বা এরা এত ব্যাকুল হয়ে উঠবে কেন?

দেহের বিনিময়ে—পুরুষের সম্ভোগের জন্য এ ছার দেহ ছেড়ে দিলে সে দেহের আদর যথেষ্ট মিলতে পারে, তা প্রথম শুনতে ও বুঝতে পারলুম সেইবার বাবুদের বাগান বাড়ীতে গিয়ে। আমার তৃপ্তির জন্য—আমার আরামের বিলাসের জন্য কত রকমই যে আয়োজন হোল। তেমন আয়োজন যে আমার আরামের জন্য কেউ কোনদিন করে দিতে পারে, এ ধারণা আমার কোন দিন ছিল না। এরা ওর কাছে মাঝে মাঝে শুনতে পেতুম আমি সুন্দরী—যুবতী। এতদিন নিজ সৌন্দর্য্য কোনদিন আয়না দিয়ে দেখি নি—দেখবার সুযোগও হয় নি—। সেই বাগান বাড়ীতেই বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজের রূপ দেখেছিলুম—নিজের রূপ নিজে প্রথম দেখেছিলুম—যে রূপ যে যৌবন আমার নিত্য লাঞ্ছনা দিচ্ছে—সে রূপ দেখে লোকে জলতে পারে বটে।

তারপর আমার গ্লানি আমার লজ্জা এরা মাথায় করে নিয়ে আমায় তাদের স্নেহময় কোলে টেনে আপন করে নিয়েছেন। যে হাসিমুখের আদর-কথা জীবনে কোন দিন লাভ করি নাই, আজ এদের কাছে তা অজস্র অফুরন্ত পাচ্ছি—তার উপর আর একটি জিনিস যা পেয়েছি—তা আমার পক্ষে সব চেয়ে নূতন—সব চেয়ে গর্ব্বের। কি এ বস্তুটি—এ কথা মুখে বলবার সাহস আমার নেই—অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে নিভৃতে নিরালায় এ কথা—সে মূর্ত্তি গোপন রেখেই আমার সুখ। আমার ছবি—এই হতভাগিনীর ছবি এঁকে তিনি তাঁর মাকে দেখাচ্ছিলেন, সেই সময় তাঁর ঘরে গিয়ে পড়েছিলুম আমি। লজ্জায় আমার যেন মাথা কাটা গেল—ভাল করে আমার নিজের ছবির পানেই আমি চাইতে পারলুম না। ছেলে মায়ের হাতে এই হতভাগিনীর ছবিখানি তুলে দিচ্ছেন আর মা ছেলের হাতের আঁকা সেই ছবি হাসি মুখে পরম তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ কচ্ছেন!

একবার-একবার মাত্র—পলক পড়তে না পড়তে ছবিখানি দেখে নিলুম—নিজের ছবি দেখে বিশ্বাস হলো না যে আমি অভাগিনী এত সুন্দরী! এত রূপ এত সৌন্দর্য্য যে আমার আছে, সে আমার বিশ্বাস ও হল না—এ যিনি ছবি এঁকেছেন তাঁরই স্নেহের পরিচয় এ চিত্রে শত ভাবে উচ্ছল হয়ে ফুটে উঠেছে—তাই ছবিখানি এত সুন্দর দেখাচ্ছে। নইলে সুন্দর দেখাবার মত আমার মধ্যে তো কিছুই নাই।

দেখি—প্রাণভরে দেখবার সাহস নাই—যতটুকু দেখি—ততটুকু দৃষ্টিতেই প্রাণের সমস্ত আবেগ ক'রে দু'চোখ ভরে তাকে দেখে নি। কিন্তু এ যে মুক্ত দেখে দেখে বাড়ে কেবল দেখারই পিয়াসা। মনে হয় অনন্তকাল ভরে তাঁকে এমনি দেখি—। মনের সাধ মনের ইচ্ছা—কিন্তু এতো পাপ নয়—এ ইচ্ছা তো মনের দুর্ব্বলতা নয়!

আবার ভাবনা—যাব কি যাব না। রাত্রি ক্রমেই আঁধার হয়ে আসছে—সব নিঝুম নিস্তব্ধ।

মাঝে মাঝে শুধু কুকুরগুলি এক একবার ডেকে উঠছিল—তাদের সেই শব্দ শুনে কুকুরগুলিও সাড়া দিয়ে উঠছিল। কি একটা বন্য পাখী যেন মাঝে মাঝে ভীষণ চীৎকার করে উঠছিল, সে শব্দে প্রাণ আমার শিউরে উঠছিল। কত রাত্রি—কত রাত্রি যা হয়েছে এখন—বিন্দু আর তার বোন-পো বোধ হয় এতক্ষণ আমার অপেক্ষায় এসে পুকুর ঘাটে যাবার পথে গাছের তলায় এসে লুকিয়ে রয়েছে। আমায় আশ্রয়-ছাড়া করে নেবার জন্য ওদের এত আগ্রহ কেন? কিসের লোভে ওরা আমায় নিয়ে যেতে চাচ্ছে! সেও কি আমার এই পোড়া দেহ আর রূপের জন্য! এ দেহ নিয়ে তাদের সঙ্গে গিয়ে এই দেহ বিক্রয় করে খেতে হবে নাকি! একেবারে দুর্দশার চরম পথে গিয়ে পড়তে হবে! কি উপায় কি করবো আমি!

ভাবতে ভাবতে কেমন ঘুমের মত হয়েছিল—জেগে দেখলুম পিসিমা আমার পাশে বসে আমার মাথায় হাত রেখে আমায় ডাকছেন। আমায় চোখ মেলে চাইতে দেখে পিসিমা বললেন 'মালতী—ঘুমের ঘোরে অমন করছিলে কেন মা?'

পিসিমার সস্নেহ বচনে আমার চোখের অশ্রু যেন আর বাধা মানল না। হৃদয় আমার যেন পাষাণ ভারের চাপে একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছিল—এতক্ষণে জমাট পাষাণ চাপের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম!

পিসিমা আমার গায় মাথায় তেমনি করে হাত বুলোতে বুলোতেই বললেন 'লক্ষ্মী বাছা আমার এমন করে কাঁদছিল কেন? কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছিলি বোধ হয়। ছি মা—স্বপন দেখে ছেলে মানুষের মত কাঁদতে নেই—এইতো আমি তোর পাশেই শুয়ে আছি। কি দুঃখ অভাব তোর—কোন চিন্তা নাই—শুয়ে ঘুমো। কাল তোর স্বপন শুনবো।

পিসিমা উঠে গিয়ে শোবার পরেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। একে শীতের রাত, তার উপর টিপ টিপানি বৃষ্টি—মনে হয় পাহাড় থেকে যেন শীত নেমে আসছে। এই শীতের রাতে আমি আমার এই পরম স্নেহময় আশ্রয় ছেড়ে কোন অজানা অচেনা রাজ্যে গিয়ে পড়বো। তারা চাইবে শুধু আমার দেহ নিয়ে ছিনি মিনি খেলতে, আমার হৃদয়ের বাথা এরা যেমন বোঝেন-এরা যেমন ভাবে আমায় স্নেহ করেন, এমন স্নেহের ধন এমন ব্যথার ব্যথী আর আমি কোথায় পাব। শুয়ে ভাবতে ভাবতে—কখনো ঘুমে-কখনো জাগরণে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল।

সকাল বেলায় পিসিমা বললেন 'মালতী বাছা—কাল কি স্বপন দেখে কেঁদে উঠেছিলি মা?'

বিন্দু মাসীর সঙ্গে যাবার প্রস্তাবের থেকে যত কথা আমার মনে কাল রাত্রে জাগছিল সব কথা একটিও গোপন না করে পিসিমাকে আমি খুলে বললুম। শুনে পিসিমা একটিও কথা না বলে স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখ পানে চেয়ে রইলেন। আমার চোখ ভরা জল দেখে পিসিমার চোখও শুষ্ক ছিল না। কিছু কাল এমনি নীরব থেকে পিসিমা আমার গায়ে হাত দিয়ে বললেন 'বাছা—তোমার ভার ভগবান আমাদের হাতে দিয়েছেন, যদি আমরা দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে বাঁচতে পারি, সংসারে টিকে থাকতে পারি—তবে লক্ষ্মীটি তুমিও আমাদেরই একজন হয়ে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে। অবশ্য তোমার নিজের যদি তাতে অমত কিছু না থাকে!'

আমার আবার অমত কি হবে। নিজের স্বতন্ত্র মত বলে কোন দিনই তো আমার কিছু নাই। চিরদিন পরানুগ্রহে পরাশ্রয়ে পালিত, পরের ইচ্ছাকেই চিরদিন নিজের ইচ্ছা বলে সযত্নে তা পালন করে এসেছি! আজ আশ্রয় পেয়ে করুণাময়ী আশ্রয়দাত্রীর ইচ্ছাকে অবহেলা করে নিজের কি স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রকাশ করতে যাব আমি। আর আমার ইচ্ছার মূল্যই বা কতটুকু। যার ক্ষমতা আছে সংসারে ইচ্ছার মূল্য তারই থাকতে পারে।

যার নিজস্ব কোন ক্ষমতাই নাই তার ইচ্ছার ক্ষমতা কতটুকু সংসারে! আমি সংসারের যে কিছুই জানি না—নিজ স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে চলতে গেলে পদে পদে সংস্র বিড়ম্বনা আর নূতন নূতন লাঞ্ছনা ছাড়া হয়তো আমার ভাগ্যে আর কিছুই জুটবে না!

পিসিমার কথা শুনে আমি তাঁর পা দু'খানি ধরে বললুম 'মা—আমার নিজের জন্ত কিছু না, আপনাদের আমার জন্ত পাছে কোন কষ্ট হয় সেই ভাবনাতেই আমি শান্তি পাই না।'

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন 'পাগলী মেয়ে কোথাকার—সে যার ভাবনা সেই ভাববে। মাথার উপর নির্ম্মল, প্রসাদ রয়েছে, আমি আছি—আর সবার উপর নিরাশ্রয়ের আশ্রয় রয়েছেন—ভাবনা কি লো তোর।

ভগবান? ভগবান? তবে দেবতা নিরাশ্রয়ের আশ্রয়রূপে তুমি আছ—তবে তোমার অনুগ্রহেই আমি এঁদের আশ্রয় পেয়েছি। এ আশ্রয় ছেড়ে কোথায় যাব আমি!'

প্রসাদের কথা

মার কাছে আজ মালতীর কলকাতা যাত্রার ইতিহাস শুনলুম। অসহায়া নারী আমাদের নিষ্ঠার হাত থেকে বাঁচবার জন্ত নিজে আত্ম বিসর্জ্জনের জন্ত যাচ্ছিল। আমি মনে ভাবি, যাদের এতটুকু ভাল কিছু করবার সাহস বা ক্ষমতা নেই তাদের মন্দ করবার এতটা প্রবৃত্তি আসে কোত্থেকে। যত সব নিষ্কর্ম্মার দল বসে বসে দিবানিশি জোট পাকাচ্ছে কি করে কাকে সমাজে বদ্ধ করবে—কার ঘরে কটা সুন্দরী মেয়ে ছেলে আছে। পেটে এদিকে হয়তো অন্ন নেই—ঘরে হয়তো মা, বোন, পরিবার অন্ন বস্ত্রাভাবে কষ্ট পাচ্ছেন সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—অথচ পরের ঘরের খুঁত বের করবার বেলায় এরাই দু'হাত দশ হাত করে এগিয়ে আসেন।

শক্তি মানেই শক্তির হাত থেকে অসহায় দুর্ব্বলকে রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই আমাদের মোটেই, অথচ লাঞ্ছিতাকে আরও লাঞ্ছনা দেবার জন্ত তাকে সমাজের বাইরে টেনে ফেলে দিতে আমরা সকলের আগে ধেয়ে যাই। গ্রামের যারা মুরুব্বি, যারা মাথা, তারাই গলা ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে ছিনিয়ে নেবার পাত্তা হলেন, অথচ তাকে আশ্রয় টুকু দিয়েই যত পাপ করলুম আমরা। ইচ্ছা হয়—যদি ক্ষমতা থাকতো সমস্ত গ্রামখানিকে কর্ম্মনাশার জলে ভাসিয়ে দিয়ে আবার নূতন করে গ্রাম সৃষ্টি করতুম। নীচতা হীনতা যেন এদের সব অঙ্গের ভূষণ হয়ে গিয়েছে, কোন উচ্চ ধারণা উচ্চ কল্পনা নেই এদের ভেতরে। নিজেদের সর্ব্বনাশ এরা নিজেরা করবার জন্ত অধীর আগ্রহে ছুটে চলেছে—যে বাধা দিতে যাবে, এদের সর্ব্বনাশের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে ভাল পথ দেখিয়ে দিতে গেলেই সেই এদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। গাঁয়ে এসেছিলুম কত আশা কত কল্পনা নিয়ে এখন দেখছি, সব বুঝি পণ্ড হয়ে যায়, সকল বুঝি বা শেষ পর্য্যন্ত আর স্থির রাখতে পারি না। যে কাজে যাই সেই কাজেই পদে পদে পাই বাধা—উপকার ছাড়া অপকারের চেষ্টা কারো কোন দিন করি না—তবু সবাই মনে করে শত্রু। হিতৈষী যারা তারাও বলেন 'ছেলে গুলো ক্ষেপেছে—ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর ওদের প্রয়োজন কি।'

আজ যদি—কমল আমাদের সঙ্গে থাকতো, এই সব সৎকার্য্যে যদি তার একটু উৎসাহ পেতাম, তবে অনেক কাজই আমরা দুটি মামা ভাগ্নে মিলে করতে পারতেম। সে গ্রামের জমিদার—তার অবস্থা ভাল—হাতে যথেষ্ট লোকজন আছে। তার কাছে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেউ বিশেষ কিছু না পেলেও অনেকেই অনেক রকম প্রত্যাশা রাখে। তার মুখের যে কথায় কাজটা সহজ হয়ে যায়—আমাদের শত

চেষ্টায়ও তা করতে অথবা বেগ পেতে হয়। আশা ছিল তাকে দিয়ে অনেক কাজ করাতে পারবো। সে শিক্ষিত যুবক, আমাদের সম-বয়সী তার উপর তার মনও ভাল। কিন্তু গ্রামের দুষ্টবুদ্ধি লোক গুলি যে কি মন্ত্রে তাকে বশ করে তাদের দলে টেনে নিয়েছে—সে আমি কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছি না।

মা বলছিলেন, বিশু ফুটনীটাই গয়না বৌকে কলকাতা নিয়ে যাবার জন্য ফোঁসলাচ্ছে! গ্রামের খুড়ো মশাইও গ্রাম ছেড়ে ক'দিন হল স্থানান্তরে গিয়েছেন। এই কলকাতা নিয়ে যাবার মধ্যে কমলদের কোন যোগ সাজন নেই তো?

মা বলছিলেন তিনি দিন কয়েকের জন্য কলকাতা যেতে চান। আমারও সেই মত। মামা মাকে ও গয়না বৌকে নিয়ে কলকাতা চলে যান, আমি বাড়ীতেই থাকবো। এর একটা শেষ না দেখে আমি যাব না—যেতে পারবো না।

মাকে আজ যখন মালতীর ছবিখানি দেখালুম—তাঁর হাতে তুলে দিলুম-মার কিন্তু তাতে বিরক্তির কোন ভাব দেখিনি। মা স্বচ্ছন্দ চিত্তে হুটমনেই আমার হাত থেকে সে ছবি গ্রহণ করেছিলেন। আমার মাকে আমি জানি—মা এতে অসন্তুষ্ট হতে পারেন না। মালতী কিন্তু আমার ঘরে ঢুকতে গিয়ে ছবিখানি দেখে কেমন লজ্জিতা হয়ে ফিরে গেল। আমি কে, মালতীর কেউ তো নই—সম্পর্ক তো নেই তার উপর সে এক জাত আমি এক জাত, তার উপর আমি পর পুরুষ। আমার হাতে তার ছবিখানি আমি এঁকেছি এতে তার লজ্জিত হবারই তো কথা! আমারই যেন এখন কেমন লজ্জা লজ্জা কচ্ছে!

অসহায় জেনে, আশ্রয়হীনা জেনে মালতীকে আমি আশ্রয় দিয়েছিলুম, তার থেকে কত কুৎসারও না রটনা হিয়েছে। শুনেছি আমার নামের সঙ্গে তার নাম রাষ্ট হয়ে পড়েছে। গ্রামের লোকের খেয়ে কোন কাজ নেই একটা না একটা নিয়ে তারা থাকতে চায়। এ কুৎসায় আমি ভ্রুক্ষেপ ও করি না।

কিন্তু—কিন্তু—আমার অন্তর কি চায়—আগে তো এমন ভাবে অনুভব করিনি। একটি নির্যাতিত রমণীর ছবি আঁকতে গিয়ে হৃদয়ের সে সৌন্দর্য্য দিয়ে সেই ছবিকে ফুটিয়ে তুলে যখন ছবিখানি সম্পূর্ণ হয়ে গেল, তখন মনে হোল এ ছবি যেন আমার কতই নিজস্ব কত আপনার! ছবির সঙ্গে সঙ্গে ছবির সজীব প্রতিমা খানিকে পাবার জন্য তাকে লাভ করবার জন্য অন্তর আমার এত ব্যাকুল হয়ে হয়ে উঠছে কেন! এমন ভাবে কোন দিন তো কোন জিনিষ পেতে চাই নাই—আজ যেন সমস্ত হৃদয় তাকে একান্ত আপনার করে নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে!

আমি যদি সত্যই তাকে চাই তবে সেও কি আমায় চাইবে! তাকে পাবার জন্য আমার যেমন ব্যাকুলতা আমাকে পাবার জন্য তার তেমন কোন ব্যাকুলতা আছে কি!

মা এসে বললেন 'তা হলে প্রণব—আমরা কলকাতা যাব, তোর বাড়ী থাকাই ঠিক?'

'হাঁ মা। কবে যাওয়া হবে!'

পরে বলিলাম মামাকে বল 'একটা ভাল দিন ঠিক করে নিতে, দু'তিন দিনের মধ্যেই তোমরা চলে যাও।'

মাদের যাবার দিন ঠিক হয়ে গেছে। যাবার সময় মাকে ও মামাকে প্রণাম করবার সময় মালতী এসে প্রণাম করলে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণামের মধ্যে যে এমন মাধুর্য্য থাকতে পারে এ ধারণা আমি কোন দিন করতে পারি নাই। প্রণাম করে উঠতে তার আর আমার চোখো-চোখি হোল। সে চোখ দু'টি যেন আমায় কি কথা জানাতে চায়, হৃদয়ের কি ব্যথা যেন সে আমায় প্রকাশ করে বলতে চায়।

আমি মার দিকে ফিরে বললুম 'মা সব সময় আমায় চিঠি পত্র লিখো, নইলে একা বাড়ীতে আমার মন মোটেই টিকবে না। আর দেখ মা, তোমার নূতন ছেলেটির সঙ্গে দেখা হোলে তাকে বোলো—সে যদি এসে এসে আমাদের কাজে একটু সাহায্য কোরত তবে এতদিন কত কাজ আমরা করতে পারতুম।'

মা ছেলে বললেন, 'কার কথা বলছিস্ রে তুই প্রণাব।'

মামা বলিলেন 'প্রণাব কমলবাবুর কথা বলছে দিদি।'

মা বলিলেন 'কমল তোর সঙ্গে কথা কইবার জন্য তো কত চেষ্টাই করেছে, তা তুই তো তার সঙ্গে কথা বলিস নি। যেন, যদি কমলের সঙ্গে দেখা হয় তবে তোর কথা বোলব।'

মারা সব কলকাতা চলে গেলেন। শূন্য বাড়ী ঘরে যেন এক দণ্ড আর আমার মন ভিষ্ঠোতে চায় না।

যাবার সময় মা'কে সব চেয়ে বেশী আনন্দিতই দেখেছিলাম, বুঝেছি, সে কমলের আশায়। সারাক্ষণ মনে হয় সত্য যদি কমল মার কথা শোনে। তা হ'লে কি-না আমি করতে পারি এখানে। কিন্তু সে কি হ'বে-এই ভাবি। *

* মাঘ মাসের পূজায় ভার শ্রীমতী নিরিবালা দেবী লইয়াছেন।

স্বরূপ

(শ্রীলীলা দেবী)

দাউ দাউ দাউ জ্বলে হুতাশন সপ্ত জিহ্বা দীপ্ত জ্বালা,
তার মাঝে ঐ মন্দার নব এক ছড়া পারিজাতের মালা,
সুকুমার শিশু নধর শুভ্র নবনীত-চারু অঙ্গ তায়—
দু বাহু প্রসারি ক্রোড়েতে পাবক যতনে তুলিয়া লইল তায়;
করি জোড় পাণি কত না অগ্নি গদগদ ভাসে গাহিল গান
ধন্য হইল পরশে দরশে অঙ্কে জড়ায়ে জুড়াল প্রাণ ;—

এমনি করিয়া আয়ুধ নিগড় ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম,
পাইল পরশ করুণাময়ের ধ্যান করে যাঁরে সূর্য্য সোম,
অগ্নি বলিল তুমি অদাহ্য বায়ু বলে তুমি অসীম রস—
বারীন্দ্র বলে তুমি অলিক্ত ব্যোম বলে অবতার হে দশ—
তরবারি বলে পরশিতে নারি প্রহ্লাদ হ'য়ে না দিলে ধরা,
ধরার অতীত তুমি যে মোদের—কেমনে পেতাম হে তুখহরা।

ভুল ভাঙ্গা

(গল্প)

[শ্রীমতী পুরনিবাসিনী বেদন]

নির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে পাশাপাশি বেশ সুন্দর দু'টী বাড়ী। দু'টীই ইংরেজী ধরণে বহুমূল্য কৌচ কেদারা দিয়ে সাজান। বাড়ীর ছোট ছোট হাতার মাঝে বেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাগানও আছে। তাতে নানা বর্ণের বিবিধ ফুলে বাড়ী দু'টীর শোভা যেন আরও মনোহর হয়েছিল। একটী বাড়ী ধনী জমিদার তারাপ্রসন্ন বাবুর। এখন তাতে তাঁর একমাত্র চতুর্ব্বিংশ বর্ষীয় পুত্র নির্ম্মল বাস করে। বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, নম্র, ধীর—সর্ব্ববিষয়ে নির্ম্মল পিতার উপযুক্ত পুত্র। তাহার লেখা-পড়ায় যেমন মন ছিল তেমনি আর একটী জিনিষেরও উপর সে বেশী রকম অনুরক্ত। সেটী সঙ্গীতানুরাগ। বিশুদ্ধভাবে গান-বাজনা করতে সে যেমন ভালবাসত,—তেমনি অপরের কণ্ঠে সুমিষ্ট গান শুনলেও সে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ত।

নির্ম্মলের বসবার ঘরে থেকে পাশের বাড়ীর দু'একটী ঘরের ভিতরের প্রায় সবটা ঠিক দেখা না গেলেও সেখানকার শব্দ বেশ শোনা যেত। কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নির্ম্মলের পাশের বাড়ীর লোকরাও যেন গান বেশী ভাল বাসত।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় যখন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় উজ্জ্বল গ্যাসের আলো জ্বলে উঠত, তখন ইডেন উদ্যানের বাজনা শুনতে, গড়ের মাঠের হাওয়া খেতে, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ বায়স্কোপ দেখতে নানা জাতীয় লোক মনের উল্লাসে ছুটত। নির্ম্মল কিন্তু তখন আলো-ছায়ার লুকোচুরির মধ্যে ছাদের উপর বসে পাশের বাড়ীর প্রাণমাতানো সঙ্গীত-সুধা পান করত; এবং যে মোহিনী প্রতিমার সুললিত কণ্ঠ থেকে এই প্রাণোন্মাদিনী সঙ্গীত-ধারা ঝরে পড়ত, তারই কাল্পনিক মূর্ত্তি হৃদয়ে আঁকতে চেষ্টা করত। কারণ, সেই সঙ্গীত মূর্ত্তিটীকে দেখবার সৌভাগ্য তার হয় নি! আজকাল বন্ধুরা তার দেখা পায় না, কোন সান্ধ্য-মজলিসে তার যোগদান করবার অবসর হয় না—এমন কি, প্রিয়বন্ধু রমেশের সঙ্গেও সে তেমন প্রাণ-খোলা ভাবে হেসে-খেলে বেড়ায় না। রমেশ একদিন অনুযোগ করে বল্লে, "নির্ম্মল, তোর হল কি! তুই হঠাৎ এমন গম্ভীর হ'লি কেন, কারও প্রেমে পড়েছিস্?" নির্ম্মল হা হা করে হেসে উত্তর দিল, "বাঃ, আমি আবার গম্ভীর হলাম কই?"

রমেশ বল্লে, "তুই নিজে বুঝ্‌বি কি করে? আমি তোকে এতদিন থেকে দেখ্‌ছি, তোর নাড়ী নক্ষত্র আমার জানা আছে; সত্যি বল্‌ত কারো প্রেমে পড়েছিস্ নাকি? কে সে ভাগ্যবতী?"

নির্ম্মল হেসে বল্লে, দূর তা হ'লে কি আর তুই জান্‌তিস না?"

২

একদিন নির্ম্মলের সাধের স্বপ্ন বহু আরাধনার সত্য হ'ল। শীতের সন্ধ্যা, আর কুয়াসাযুক্ত স্নিগ্ধ-শীতল জ্যোৎস্না। নির্ম্মলের বাড়ীর বাগানটী লাল-নীল-বেগুনি-হলদে মঞ্জুরী ফুলে ভ'রে গেছে। তার মাঝে মাঝে রজনীগন্ধা, হাস্‌নুহেনার প্রাণমাতানো ঝাড়গুলিও শোভা পাচ্ছে। আধফোটা বেকাসি-কার মৃদু মৃদু সৌরভে, শীতের স্নিগ্ধ হাওয়ায় বিরহী বঁধুর প্রাণ বাহির-দর্শন-লালসায় আকুল হ'য়ে

ওঠে। নির্ম্মলেরও নবীন প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি তার মানসী প্রতিমাকে একটীবার দেখবার আশায় ছট্‌ফট্ হ'য়ে উঠেছে। ঠিক এম্‌নি সময়ে অনেকক্ষণ ধ'রে গায়িকা প্রায় হ'য়ে ক্ষুণ্ণ চাতালটীতে এসে দাঁড়াল। নির্ম্মলের পিপাসী চক্ষুদুটী তার দিকে ছুটে গেল। তার মনে হ'ল, সে জাগ্রত না নিদ্রিত! গোলাপী রংএর শাড়ী তার কুসুম-পেলব তনুখানি ঘিরে আছে; কুঞ্চিত রেশমী-কোমল একরাশ চুল লীলায়িত হ'য়ে পড়ে আছে। তার দু'কাণে দু'টী হীরার ফুল। মুখখানি যেন একটী আধফোটা বসরাই গোলাপ।

নির্ম্মল তার চির-আরাধনার মানসী প্রতিমাকে অনিমিষেষ নয়নে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। সুন্দরী একটুখানি এদিক্-ওদিক্ ঘুরেই আবার ঘরের ভিতর চ'লে গেল। নির্ম্মলও অনেকদিন পরে যেন একটু হাল্‌কা মনে রমেশের বাড়ীর দিকে পথে বেরিয়ে পড়্‌ল।

৩

সেদিন প্রভার বাল্যসখী জ্যোৎস্না বলে, "নির্ম্মল বাবু আপনি আমাদের অপরিচিত হ'য়েও আজ ক'দিন থেকে যে ভাবে প্রভার পরিচর্য্যা করছেন, তাতে সত্যি বল্‌তে কি, আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা নেই।"

নির্ম্মল তাকে বাধা দিয়ে বলে, "আপনি নেহাৎ বেশী বল্‌লেন মিস্ মজুমদার; পাড়া পড়শীর অবশ্য কর্ত্তব্য, একের বিপদে অপরের যথাসাধ্য সাহায্য করা। আর সেবার কথা বল্‌ছেন,—আপনার মত সব বিষয়ে উপযুক্ত সঙ্গিনী থাক্‌তে আমি কি কর্‌তে পেরেছি?"

জ্যোৎস্না বলে, না, আপনি আমার প্রশংসা করে নিজেকে ছোট কর্ব্বেন না, সত্যিই এমন প্রাণ ঢালা যত্ন কর্‌তে আপনার মত কেউ পারে কি না সন্দেহ।"

নির্ম্মল সে কথা চেপে গিয়ে আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "হঠাৎ কেমন ক'রে ইনি এত কঠিন রোগে পড়লেন? আমি ত সেদিনও এঁকে বেশ সুস্থ দেখেছি।"

জ্যোৎস্না বলে, "হঠাৎ নয় নির্ম্মল বাবু, অনেক দিন পূর্ব্বেই তার এই অসুখের সূত্রপাত; আমি সেই অবধি এর সঙ্গে আছি। মাঝে দিনকতক বেশ ভাল ছিল, আবার হঠাৎ অসুখ বেড়ে গেছে। এই অসুখেই তার অমন সুন্দর গলা নষ্ট হ'য়ে গেছে।"

এটা নির্ম্মলের পাশের বাড়ী। এই বাড়ীতেই প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী কামিনী দাসী থাকেন, প্রভা তাঁরই একমাত্র কন্যা। কামিনী সচ্চরিত্রা ও বিদুষী। প্রভার পিতা খুব গান বাজনা ভাল বাস্‌তেন; তাই তাঁর স্ত্রীকে বহু যত্নে নাচ গান শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর নিতান্ত অসহায় হ'য়েই কামিনী থেটের দ্বারে থিয়েটারে চাকুরী নিয়ে যথেষ্ট নাম করেছেন। একমাত্র কন্যাকে লেখাপড়া শিখিয়ে সৎপাত্রে বিবাহ দেবার তাঁর একান্ত ইচ্ছা। তিনি সমাজে পরিত্যক্তা হ'য়েও স্নেহবাৎসল্যে অন্ধ হ'য়ে একমাত্র কন্যাকে শিক্ষিত ক'রে তুলেছেন।

নির্ম্মল এসব জেনে শুনেও তাঁদের কাছে যেতে কুণ্ঠিত হ'ত না। সে শিক্ষিত এবং স্বাধীন। আর সংসারে যে জিনিষটী সব চেয়ে লোভনীয়, যার প্রভাবে ন্যায়কে অন্যায় ও অন্যায়কে ন্যায় করাতে বেশী দেরী হয় না, সেই ঐশ্বর্য্যেরও তার অভাব ছিল না। নির্ম্মল সব ভেবে চিন্তেও সেই সমাজ-পরিত্যক্তা অভিনেত্রী কামিনী দাসীর সুন্দরী সুশিক্ষিতা কন্যার রূপগুণে মোহিত হ'য়ে পড়্‌ল। প্রভা আজ ক'দিন হতে গলার অসুখে কাতর, নির্ম্মলের কোমল হৃদয় তাতে ব্যথিত হ'য়ে পড়্‌ল; সে সুযোগ বুঝে আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে তার শয্যার পাশে দিন রাত্রি কাটিয়ে দিল।

ক্রমে প্রভা সঙ্কট অবস্থা থেকে বেঁচে উঠ্‌ল।

তার যৌবনকান্তির পাণ্ডুর মুখশ্রী দিন দিন পুনরায় সুস্থতায় নব সৌন্দর্য্যে বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

নির্ম্মল এখনও সর্ব্বদাই প্রভার খোঁজ নিতে আসে। সে দেখ্‌ল, তার অজ্ঞাতসারে তার মন যেন প্রভার দিকেই বেশী এগিয়ে পড়েছে। সে কেমন একটা তীব্র আকর্ষণে মুগ্ধ হ'য়ে গেল।

প্রভা সে আকর্ষণের মর্ম্ম যে কিরূপ ভাবে গ্রহণ কর্‌ছে, তা সে ভেবে দেখ্‌ল না।

৪

বসন্তের শেষ। গ্রীষ্মের তপ্ত নিঃশ্বাস ধরিত্রীর বুকে আগুনের আঁচ জাগিয়ে তুলেছে। নির্ম্মল নিজের ঘরটীতে বসে বিদ্যুতের পাখার কৃত্রিম বাতাসে স্বস্তি না পেয়ে মনে কর্‌ল, "যাই, প্রভাদের নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি। ঘরের মধ্যে একা একা যেন বড্ড খারাপ লাগ্‌ছে।" সে তাড়াতাড়ি পোষাক প'রে দ্রুত পদে প্রভাদের বাড়ীর দিকে বেরিয়ে গেল।

খানিক পরে প্রভা ও তার সখী জ্যোৎস্না ঘরে ঢুকে নির্ম্মলকে হাসিমুখে সম্ভাষণ ক'রে জিজ্ঞাসা কর্‌লে "আপনি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন বুঝি? বেশ-ভূষা করে বেরিয়েছেন যে?" নির্ম্মল হাসিমুখে বলে উঠ্‌ল, "কেমন গরম পড়েছে বলুন দেখি? চলুন একটু বেড়িয়ে আসি, যাবেন কি?"

জ্যোৎস্না বেশ আনন্দেই সম্মতি দিল। কিন্তু প্রভা যেন একটু কি ভেবে বলে উঠ্‌ল, "আচ্ছা, বেশ চলুন; কিন্তু আমার একটী বন্ধুর আস্‌বার কথা ছিল,—তা যাক্, মাকে বলে আসি।" সে জ্যোৎস্নার হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রভার এই ইতস্ততঃ ভাব দেখে নির্ম্মলের মনটা যেন কেমন একটু কেঁপে উঠ্‌ল। তার মনে হ'ল, প্রভা যেন অনিচ্ছায় শুধু তারই খাতিরে যেতে রাজি হল। সে যেন বাড়ীতে থাক্‌লেই বেশী খুসী হ'ত। কে এই বন্ধুটী যার আগমন প্রতীক্ষায় সে এত উৎসুক হ'য়ে অপেক্ষা কর্‌ছিল? তার মন দারুণ আশঙ্কায় ভরে উঠ্‌ল—তার মনে হ'ল, যেন তার বুকের মাঝখানটা একটী অনবরুদ্ধ তীব্র বেদনায় টন্ টন্ ক'রে উঠ্‌ল। তার মানসী প্রতিমা—সেত একান্ত তারই-সে ত আর কারো নয়!

হঠাৎ সে চোখ তুলে চেয়ে দেখ্‌লে, প্রভা ও জ্যোৎস্না কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে পৃথিবী ছেয়ে গেছে। বসন্তের চাঁদ ধীরে ধীরে অসীম আকাশ-সাগর কোন্ স্বপ্নভরে পাড়ি দিচ্ছে। ইডেন গার্ডেনের পেছন দিকের একটী গেট দিয়ে ঢুকে তারা তিন জনে বর্ষির পেগোডার পাশ দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে নির্জ্জন জ্যোৎস্নালোকে একটা গাছতলায় একখানি বেঞ্চে বস্‌ল। প্রভা দুর্ব্বল বলে বেশী হাঁটতে পারে না, তাই বসে বসে গল্প কর্‌তে লাগ্‌ল। বাগানের সাম্‌নের দিকে অনেক স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা প্রকৃতি কোলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নির্ম্মল গল্প কর্‌ছে, কিন্তু তার মন আজ শুধু একবার প্রভাকে একাকী আস্বাদন কর্‌ছে। হঠাৎ তার একান্ত ঈপ্সিত সময়টী মিল্‌ল; জ্যোৎস্না আপন মনে বল উঠ্‌ল, "প্রভা একটু বস্ ভাই, ওখানে কেমন সাহেবদের ছেলে মেয়েরা খেলা কর্‌ছে। ওদের বেশ সুন্দর দেখ্‌তে নয়?" সে ধীরে ধীরে তাদের দিকে এগিয়ে গেল।

নির্ম্মল নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বল্লে, "আজ আপনি কেমন যেন একটু বিমর্ষ; আপনার শরীর কি ভাল নেই?"

প্রভা চকিতে আপনাকে সংযত করার বিফল চেষ্টা ক'রে অস্তগামী সূর্য্যের ক্ষীণ রশ্মির মত একটু হেসে বল্লে, "আমি ত একটুও বিমর্ষ হই নি, বরং আপনিই যেন আজ কেমন অন্যমনস্ক।"

নির্ম্মল বল্লে, "আমি অন্যমনস্ক, সেটা কি আশ্চর্য্য প্রভা? কত বড় দুরাশা অন্তরে আবদ্ধ রেখে আমি

তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছি তা কি তোমার বুঝ্‌তে বাকী আছে?"

প্রভা যেন বুঝেও বুঝে নাই এমনি ভাবে বলে উঠ্‌ল, "নির্ম্মলবাবু, আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

নির্ম্মল এই কথায় বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হ'য়ে কিছুক্ষণ ব'সে রইল; তারপর আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল, "প্রভা, তুমি এত বুদ্ধিমতী হ'য়েও এই সামান্য কথাটী বুঝ্‌তে পার্‌লে না? এটা আমার দুর্ভাগ্য বল্‌তে হবে! মনে করেছিলাম আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের বাসনা কাউকে জানাব না; কিন্তু প্রভা, আজ তোমার কথায় যে আমি তা না ব'লে পার্‌ছি না। যেদিন থেকে তোমার সুকণ্ঠের মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত শুনেছি, তোমার স্নিগ্ধ-মধুর সুন্দর মূর্ত্তি দেখেছি, সেদিন থেকেই যে আমার প্রাণে তোমার ত্রিদিব-দুর্লভ রূপ অঙ্কিত হ'য়ে রয়েছে।"

প্রভা নির্ম্মলের এই আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বরে ও গভীর অনুরাগে কেমন যেন একটা স্নিগ্ধ পুলকের শিহরণে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু তা ক্ষণিকের! একটু নীরব থেকে সে ব্যথিত কুণ্ঠিত স্বরে বল্লে, "নির্ম্মল বাবু, আজ আমি আপনার প্রাণের যে মধুর পরিচয় পেলুম, তার আর তুলনা নাই; কিন্তু একটা গভীর ব্যথায় আমার অন্তর ব্যথিত হ'য়ে পড়েছে।"

নির্ম্মল রুদ্ধকণ্ঠে বল্লে, "কেন, কেন প্রভা, আমি কি তোমার মত রত্নলাভের যোগ্য নই; যদি তাই হয়, তা হ'লে আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা কর।"

প্রভা ছল্ ছল্ চোখে বল্লে, "না নির্ম্মলবাবু, আপনার মুখে আমার মত নগণ্যা নারী সম্বন্ধে অমন কথা সাজে না। আমারই দুর্ভাগ্য যে আপনার মত স্নেহময় বন্ধুর প্রাণে বাধা হ'য়ে আমাকে আজ দারুণ আঘাত দিতে হ'ল।"

নির্ম্মল ব্যগ্রকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল "কেন আঘাত দেবে প্রভা! তুমি আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের চির-অধীশ্বরী রাণীরূপে বিরাজ কর্‌বার অনুমতি দিলেই আমার সকল ব্যথার অবসান হবে।"

প্রভা যেন একটা দারুণ দুঃস্বপ্নের ঘোরে বলে উঠ্‌ল, "নির্ম্মলবাবু, তা যে হবার যো নেই, আমার মন যে অনেকদিন আগেই অপরের কাছে বিক্রীত। আপনি আমার স্নেহময়, ব্যথার ব্যথী বন্ধু—এটা আমি কখনও ভুলব না, চিরদিন শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিয়ে আপনার স্মৃতিকে পূজা কর্‌ব, এই আমার চিরন্তন বাসনা।

অনেকগুলি কথা একসঙ্গে বলে প্রভা যেন কেমন নিস্তেজ হ'য়ে পড়্‌ল।

আকস্মিক বজ্রপাতে মানুষ যেমন স্তম্ভিত হ'য়ে উঠে, নির্ম্মল তেমনি স্তম্ভিত হ'য়ে হঠাৎ প্রভার পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল।

প্রভা একবার মুখ তুলে নির্ম্মলের ব্যথিত কাতরোন্মাখা দৃষ্টিটুকু দেখিয়াই পুনরায় মাথা নীচু কর্‌ল। তার হাতের কাছের একটা গাছের পাতা সে অকারণে ছিঁড়্‌তে লাগ্‌ল।

চারিদিক হঠাৎ যেন নিস্তব্ধ হ'য়ে গেল। বাগানের ভিতরকার বাজনার শব্দ ও সমস্ত আনন্দসুর—এত উজ্জ্বল আলোকমালা সবই যেন আজ নির্ম্মলের চোখে এক অভিশপ্ত ঘুমন্ত রাজ্যের মত বোধ হ'ল। সে নিরাশ-পীড়িত ব্যর্থ হৃদয়কে একটু আয়ত্ত ক'রে রুদ্ধকণ্ঠে বল্লে, "আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। আমি আপনার গভীর অনুরাগের মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারলুম না। কিছু মনে কর্‌বেন না, চলুন আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিই,—আমার মাথাটা বড্ড ঘুর্‌ছে।"

দারুণ অভিমানে নির্ম্মলের গলার স্বর কম্পিত হ'য়ে রুদ্ধ হ'য়ে গেল। প্রভা উঠে নির্ম্মলের পেছনে পেছনে অপরাধিনীর মত চল্‌তে লাগ্‌ল। জ্যোৎস্না তখন হাঁটুতে হাঁটুতে অনেক দূর চলে গিয়েছিল।

তারা কিছুদূর এসে জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিলিত হ'ল। নির্ম্মল ও প্রভাকে অসম্ভব রকম গম্ভীর দেখে জ্যোৎস্না অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেল; সে কিছুই বল্লে না।

৫

বিদ্যুতের আলো নিবিয়ে দিয়ে একখানি ঈজি চেয়ারে বসে দুই হাতের মাঝখানে মুখটা গুঁজে নির্ম্মল ব্যথিত উপেক্ষিত হৃদয়ের দারুণ অভিমানে ও পুঞ্জীভূত বেদনা শান্ত করতে চেষ্টা করল। বাগানের দিকের খোলা জানালার ভিতর দিয়ে বহু ফুলের একটা পুঞ্জীভূত ঘন গন্ধ ভেসে আসছে। আকাশে সাদা মেঘের মাঝখানে চাঁদ ডুবে গেছে। বেলা, মল্লিকা, গোলাপ আরও কত ফুল তাদের সৌরভে নির্ম্মলের বিক্ষিপ্ত মনটাকে তাদের স্নেহের পরশ দিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু নির্ম্মল আজ তাদের দিকে ফিরেও চাইছে না। তার এত প্রিয় ফুলের গন্ধ, এত সুন্দর শীতল জ্যোৎস্না কিছুই যেন ভাল লাগছে না; সবই যেন তিক্ত, সবই যেন প্রাণহীন।

হঠাৎ একটা মধুর গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠল। তার নীরব চিন্তা ভেঙ্গে গেল। জ্যোৎস্নাধারা দূরের বাগান থেকে তখনও হাস্নুহেনার সৌরভ বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছিল। কিন্তু তার মনে হ'ল এ যেন তার অতি নিকটে, ঠিক যেন বুকের পাশ থেকে সুগন্ধটুকু ছড়িয়ে পড়ছে। নির্ম্মল মুখ তুলতেই তার অশ্রুসজল চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল বাসন্তী-রংএর শাড়ীপরিহিতা দু'টী গোলাপ তোড়ার মাঝখানে হাস্নুহেনার বাসন্তী জ্যোৎস্নার উপর গিয়ে পড়ল। এতদিন থেকে সে জ্যোৎস্নাকে দেখছে,—কিন্তু কৈ কোনদিন ত নির্ম্মলের চোখে তাকে এত সুন্দর এত রমণীয় মনে হয় নি। তার মনে হল আজ যেন জ্যোৎস্না এই স্নিগ্ধ মনোরম সন্ধ্যায় তার কুসুমপেলব করস্পর্শে নির্ম্মলের কত বিক্ষত হৃদয়ে স্নেহের প্রলেপ দিতে মূর্ত্তিমতী করুণারূপে অবতীর্ণা হ'ল।

নির্ম্মল হঠাৎ জ্যোৎস্নাকে এমন ভাবে দেখে নিজের দুর্ব্বলতা যথা সম্ভব গোপন করবার চেষ্টা ক'রে উঠে দাঁড়াল। জ্যোৎস্নাকে সে সাদরে আহ্বান ক'রে বসতে বল্লে। জ্যোৎস্না একটা ক্ষীণ হাসির রেখা টেনে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কাঁদছিলেন নির্ম্মলবাবু? আমি এসে আপনার অসুবিধা করলুম কি?"

নির্ম্মল সংযত হ'য়ে বল্লে, "না, অসুবিধা কিছু না, আপনিই বরং এই হতভাগার জন্যে মিছামিছি কষ্ট ক'রে এসেছেন।"

নির্ম্মলের মনে তখনও দুরাশার ক্ষীণ রেখা উঁকি দিচ্ছিল—যে খুসি বা জ্যোৎস্নাকে দূতী ক'রে পাঠিয়েছে!

জ্যোৎস্না কোন ভূমিকা না ক'রেই সহজ সংযত কণ্ঠে বল্লে, "আপনি ব্যস্ত হ'বেন না। আমি ইচ্ছে করেই এসেছি। সত্যি, আপনার দুঃখে আমি দুঃখ অনুভব করছি—এতটা আপনার মর্য্যাদা বুঝলে না। যারা না চাইতে পায় তারাই বুঝি হেলাফেলা করে!"

নির্ম্মল ভগ্নকণ্ঠে ব'লে উঠল, 'আর ওসব কথায় কাজ কি; আমারই অদৃষ্ট মন্দ, তাই তার যোগ্য হ'তে পারি নি। আমার কিন্তু এখনও বিশ্বাস হয় না, যার কণ্ঠে অত সুন্দর, তার প্রাণ এত পাষাণ!"

জ্যোৎস্না হেসে উঠল, তারপর কি ভেবে নিজেকে সংযত ক'রে বল্লে, "আপনি কি তার গলা কখনো শুনেছেন? সে'ত অনেক দিন থেকে গায় না, তার প্রাণও ত পাষাণ নয়! সে যে অন্যকে ভালো বেসেছে,—খুব শীঘ্রই তাদের বিয়ে হবে।"

নির্ম্মল শরবিদ্ধ হরিণের মতচমকে উঠে বল্লে, "কেন সে যে সর্ব্বদাই গায়,—আমি ত' প্রায়ই শুনি। আর সেই মিষ্টি সুরে প্রতিই যে আমার প্রথম

আকর্ণ সত্যি করে বলুন, দোষটা আপনার—আমি যে সরলা গান শুনি, তাকি তার গলা থেকে নয়?"

জ্যোৎস্না লজ্জাজড়িত স্বরে ঈষৎ হেসে বলে "বোধ হয় আমারই গান শুনে থাকবেন; প্রভা আমার গান শুনতে বড্ড ভালোবাসে, তাই আমি রোজ গাই।"

নির্ম্মল আকাশ যেন থেকে পড়ল। হায় হায়! এতদিন সে কি দারুণ ভুলের পেছনে নিজের জীবনটাকে উৎসর্গ করে দিয়েছে! আর এর ফলেই আজ তার এই উপেক্ষার যাতনা সইতে হ'ল। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্লে। তার পর সে অনিমেষ নয়নে জ্যোৎস্নার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগ্‌ল। সে দেখা যেন শুধু চোখ দিয়ে নয়, সে দেখা অন্তরের অন্তস্তল থেকে। জ্যোৎস্না দেবীপ্রতিমা—জ্যোৎস্নার রূপেও মন মুগ্ধ হয়, সে প্রাণকে সুশীতল—তৃপ্ত করতে পারে। তাই প্রভার নিকট উপেক্ষিত পরাজিত নির্ম্মলের ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষিত নয়নে সুন্দরী যুবতী জ্যোৎস্নাকে যেন প্রস্ফুটিত এক রাশ রেজুল ব'লে মনে হ'ল। আর, আর গান,—সেই মিষ্ট, মধুর, হৃদয়-মাতান গান—তা এরই কোমল মাধুরীমণ্ডিত কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হ'ত। তা হ'লে এই-ই ত তার মানসী প্রতিমা! এর চেয়ে সুখের আর কি হ'তে পারে? একজন উপেক্ষার পেষণাঘাতে হৃদয় চূর্ণ করেছে, আর একজন তার দানের ভাণ্ডার উজাড় করে দেবার বাণী নিয়ে তার ব্যথিত হৃদয়ের দ্বারে উপস্থিত। নির্ম্মল যেন কোন্ এক অনির্ব্বচনীয় সুখের রাজ্যে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেল্লে।

হঠাৎ কি এক স্বপ্নের ঘোরে নির্ম্মল বলে উঠ্‌ল, "জ্যোৎস্না, তুমি আজ আমার এই ব্যথিত প্রাণে যে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিলে, আমার ভুল ভেঙ্গে দিয়ে আমার প্রাণে যে কতখানি তৃপ্তি ঢেলে দিলে, তা এ জীবনে কখনো ভুলব না। আমার মনে হচ্ছে, সংসারে আমারও ব্যথার ব্যথী আছে সকলেই যে আমায় উপেক্ষার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে না, তা আমি আজ যেন বুঝ্‌তে পাচ্ছি। আমার এই অনাদৃত ব্যথিত হৃদয়ের ভার নিয়ে আমায় কৃতার্থ কর্‌বে কি? বল জ্যোৎস্না, তোমার স্নেহের স্পর্শে আমার চিত্তের সকল গ্লানি, সকল মলিনতা মুছে ফেলে আমায় তোমার প্রেমের যোগ্য ক'রে তুল্‌বে কি?"

জ্যোৎস্না আনন্দের আতিশয্যে নারীজনোচিত লজ্জা সঙ্কোচ ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি নির্ম্মলের কম্পিত হাত দু'খানি ধরে বলে উঠ্‌ল, "ছিঃ, তুমি পুরুষ, তোমার এমন দুর্ব্বলতা সাজে না। আমি অবলা নারী, যদি তোমার চরণে স্থান পাবার যোগ্য হই, তা হ'লে সেটা আমারই জন্ম জন্মান্তরের সৌভাগ্য ব'লে মনে কর্‌ব।

বংশের কলঙ্ক

(শ্রীদত্যেন্দ্রকুমার বসু বি.এ)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সরোজনাথের সঙ্কল্প

রামসদয় বাবু সরোজনাথকে দিয়া পত্র লিখাইতেছেন। অকূল কর্ণধারে পৌঁছিয়া চারিখানি পত্র লিখিয়াছে, একখানি পিতাকে এবং অপর তিনখানি রামসদয় বাবুকে, সরোজনাথকে ও রমেন্দ্রকে। রামসদয় বাবু অকূলের পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হন নাই এমন কথা বলা যায় না, তবে কোন একটা বিষয়

সেই পত্রে পড়িয়া যে তাঁহার মনটা চিন্তাকুল হইয়াছিল, তাহা তাঁহার মুখ চোখের ভারি ভারি ভাব দেখিয়া স্পষ্টই অনুমান করা যায়। পরেশকে দিয়া সেই পত্রের যে উত্তর লিখাইলেন, তাহা এইরূপ:—

হরি শরণং।

কল্যাণবরেষু,—

প্রিয় শঙ্কর, তোমার পত্র প্রাপ্ত হইয়া এবং তুমি নিরাপদে পৌঁছিয়াছ ও ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। আশা করি সুস্থ ও নীরোগ থাকিয়া কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সাধন করিতে সমর্থ হইবে।

আমি তোমার পিতৃতুল্য, তোমাকে আমি সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকি। সেই হেতু আমার নিকট তুমি কিছু প্রার্থনা করিলে আমার তাহা পূর্ণ করা কর্ত্তব্য, একথা স্বীকার করি। কিন্তু আমি অন্ধ পিতার মত স্নেহাধিক্যের ফলে অনুপযুক্ত পুত্রের অন্যায় প্রার্থনা পূর্ণ করিতে একেবারেই সম্মত নহি। কঠোর হইলেও সত্য ও হিত কথা বলা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া এই কথা বলিলাম, ভরসা করি ইহাতে দুঃখ হইবে না, অথবা স্বকর্ত্তব্য হইতে চ্যুত হইবে না।

তুমি এইবার যথার্থ সংসার সংগ্রামে প্রবেশ করিতেছ। এই সময়টা যথার্থই মানুষের জীবনের সন্ধিক্ষণ। আমি তোমার পিতৃস্থানীয়ত্ব হিতৈষী বলিয়া তোমাকে গুটী কয়েক উপদেশ দিতে চাই, আশা করি, আমি যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কথাগুলি বলিতেছি, সেই ভাবে তুমি কথাগুলিকে গ্রহণ করিবে। আমি সংসারের পরীক্ষায় অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি, কেন না আমি বৃদ্ধ! এই হেতু আমার শিক্ষার ফলসাভে তোমাকে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করি না।

তুমি ইংরেজী সাহিত্য বিশেষরূপে চর্চ্চা করিয়াছ। অতএব বিখ্যাত লেখক বাকস্‌টনের নাম বোধ হয় তোমার অবিদিত নাই। এই বাকস্‌টন তাঁহার ঠিক তোমারই মত বয়সের এক পুত্রকে কিছু উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। আমি সেই উপদেশটী তোমার সম্মুখে ধরিব।

বাকস্‌টনের বিশ্বাস ছিল যে, যুবকেরা দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া যাহা করিতে ইচ্ছা করে, যদি তাহারা তাহাতেই সংলগ্ন হইয়া থাকে, যদি তাহারা সেই সঙ্কল্পটি দৃঢ় অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা প্রায় যাহা মনে করে তাহাই হইতে পারে। তাই তিনি পুত্রকে লিখিয়াছিলেন, "তুমি এখন জীবনের এমন সন্ধিক্ষণে পদার্পণ করিয়াছ যে, হয় তোমায় বাঁধে না হয় ধরিণে ফিরিতে হইবে। এখন ইহাতেই তোমাকে তোমার কার্য্যপদ্ধতির, কার্য্যনীতির, দৃঢ় সঙ্কল্পতার ও মানসিক বলের সুপরিচয় দিতে হইবে। অন্যথা তোমাকে স্থায়ী পক্ষে নিয়ত হইতে হইবে এবং অকর্ম্মণ্য অব্যবস্থিতচিত্ত কর্ত্তব্যবিমুখ যুবকে পরিণত হইতে হইবে। একবার ঐ অবস্থায় পড়িলে আর উদ্ধারের আশা নাই, এই কথাটী মনে রাখিও। আমি নিশ্চয় জানি যে, যুবকেরা ভাসংস্থ যাহা হইতে ইচ্ছা করে, অনেক স্থলে তাহাই হইয়া থাকে। তুমি যদি সর্ব্বান্তঃকরণে কার্য্যোৎসাহী ও পরিশ্রমী হইতে দৃঢ় সঙ্কল্প কর, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও তুমি তাহাই হইবে এবং যাবজ্জীবন আনন্দ লাভ করিবে।"

এই অমূল্য উপদেশটী অনুক্ষণ মনে রাখিও। যদি বল মনের উপর সকলের সমান আয়ত্ত থাকে না, তাহা হইলে আমি বলি ওটা ভুল ধারণা। অভ্যাসে সকল জিনিষই আয়ত্ত হয়। যাহারা যথার্থ বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, তাহারা একথা বুঝে, মূর্খে ভাবে দৃঢ় সঙ্কল্প স্থায়ী হয় না। কর্ণওয়ালিসের একটী মহান্ আদর্শ ছিল। সেটী এই:—"দৃঢ় সঙ্কল্প অধ্যবসায়ই প্রকৃত বিজ্ঞতার লক্ষণ।"

তুমি যে কার্য্যে প্রবেশ করিতেছ, তাহাতে দৃঢ়সঙ্কল্পতা বড়ই আবশ্যক। এতদিন ছেলে খেলায় মাতিয়া ছিলে বলিয়া অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলে; কিন্তু অব্যবস্থিতচিত্ততা মানসিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ। তুমি

এখন বিশৃঙ্খলার স্থানে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে নিযুক্ত হইয়াছে। বহুসংখ্যক বিপরীত-ভাবী বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন মানুষের মনের বলের সহিত তোমার মনের বলের সংঘর্ষ হইতে অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ইহাতে কত মনের বল, কত দৃঢ়সঙ্কল্পতা আবশ্যক, তাহা বুঝিতে পারিতেছ। বিশেষতঃ ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপারে ঐ দুইটী গুণের বড়ই আবশ্যক। ইউরোপীয় জাতি এই দুইটী গুণে সমধিক গুণশালী বলিয়া আজ জগৎময় তাহাদের একাধিপত্য।

কিন্তু এই সংঘর্ষে কেবল উচ্চতর শক্তির পরিচয় দিলে সম্যক ফল প্রাপ্ত হইবে না, সেই সঙ্গে সহানুভূতি চাই, ভালবাসা চাই, স্বার্থত্যাগ চাই। অপরের মনের ভাবের মধ্যে তোমায় প্রবেশ করিতে হইবে, তাহাদের অবস্থাটী নিজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা ভালবাসা ও সহানুভূতির বাতাসে উড়াইয়া দিতে হইবে। জগতে নিত্য কত মতদ্বৈধ, কত কলহ, কত সংঘর্ষ উদ্ভূত হইতেছে! উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের মধ্যে, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে, মহাজন ও খাতকের মধ্যে এমন কি শান্ত গৃহস্থাশ্রমে —যেখানে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য—সেখানেও স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে নিত্য কলহ ও মনোমালিন্যের কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু সেই কলহ সত্ত্বেও মানুষের মত মানুষ হইতে হইলে একটী কথা অনুক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা সকলেই যে সেই এক অদ্বিতীয় পরম পিতার সন্তান এবং মানুষ মাত্রেই যে আমাদের ভ্রাতা, একথা যেন কখনও ভুলিও না। এই কথাটী স্মরণ থাকিলে সেই কলহের মধ্যেও অভিন্নতা ও একতা দেখিতে পাইবে। বিদ্যাবল, ধনবল, শক্তিবল স্বাস্থ্যবল,—সবই মানব হিতার্থে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করিবে। একথা মনে রাখিও, ভগবান তোমায় ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন কেবল নিজের নীচ স্বার্থ সাধনের জন্য। নহে, সার্থকতার জগতের দুঃখ-মোচনের জন্য অর্থ তোমার দাস, তুমি অর্থের দাস নহ। একজন ইংরেজ কবি বলিয়া গিয়াছেন, কেবল গির্জ্জা গড়িয়া বা পাদরীর পেট ভরাইয়া ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন করা হয় না, নরনারায়ণ ও পশুপক্ষীর সেবা করিলে হয়। এ সেবার সংযম, ধৈর্য্য, অক্রোধ অহিংসা ও স্বার্থবিসর্জ্জন প্রধান উপাদান।

উপদেশটা প্রকাণ্ড লেকচারের মত হইল। ভরসা করি যে উদ্দেশে দিয়াছি, তার স্পিরিটটা বুঝিবার চেষ্টা করিবে। যদি এই ভাবে কর্ত্তব্যসাধন করিয়া যাও, ভগবান তোমার প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। ইতি—

পুঃ সরোজ, অনিলা ও অমিয় ভাল আছে। অমিয় তোমার অনুপস্থিতি বড়ই অনুভব করে।

নিত্য আশীর্ব্বাদক—

তোমার বড় কাকা—

পত্র শেষ হইলে রামসদয় বাবু একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কেমন সরোজ লেখা ঠিক হয় নি? বাস্তবিক আমি আদালতের ঘরে দলাদলির একবারে বরবাদ করতে পারি নি।"

সরোজ একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "ওটা কি অরুণকে লক্ষ্য করে বলছেন? তা যদি বলে থাকেন, তা হ'লে ব'লব অরুণকে আপনি এখনও চেনেন নি!"

"ও হো-হোঃ। তোমার সামনে বলাটা ভুল হয়েছে, তোমার চোখে অরুণ যে একটা ডেভিলস (দেবতা বিশেষ)!"

"আপনি বলেন কি? অরুণের কোন্ গুণটা রেখে কোন্ গুণটা বোলবো। তার মত যদি সব ছেলে হ'ত—"

"তা হলে বাঙ্গালী জাতটা স্বর্গে যেত, কেমন না?"

"স্বর্গ যেত কি না যেত, তা জানি নি, কিন্তু জাতটা যে বড় হ'ত, জগতে মাথা উঁচু হত, তাতে আর সন্দেহ নেই।"

তোমার মতে হতে পারে, কিন্তু আমার মতে নয়।

সরোজ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আপনি যতই

বলুন, ওটা কিন্তু ঠিক আপনার মনের কথা নয়। আচ্ছা, এখন আপনি এই সব কথা বলছেন, কিন্তু মনে করে দেখুন দেখি যেদিন অরুণ জামা জুতো সমেত জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে অনিলকে তুলেছিল, সে দিন আপনি নিজেই কি বলেছিলেন ?"

রামদয় বাবুর মুখ গম্ভীর হইল। কয়েক নীরবে বসিয়া থাকিয়া ভারি গলায় বলিলেন, "স্বীকার করছি সরোজ, ছেলেটার এমন একটা গুণ আছে যাতে ভাল না বেসে থাকা যায় না। কিন্তু তা ব'লে অলসতা, অকর্ম্মণ্যতা বা চপলতাকে ত' প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।"

আপনার ঐ একটা বিষম ভুল ধারণা বলে মনে হয়। পরিশ্রমী, কার্য্যকুশল বা গম্ভীর হবার দরকার হয় নি বলে সে এতদিন ছেলেখেলা করে কাটিয়েছে। আবার শীগ্‌গির আসাম থেকে শুনবেন, সে কি রকম মানুষের মত কাজ করেছে।

শুনলুম, আপনিই তাকে আসামে তাড়াইয়েছেন, আপনিই তাকে 'বংশের কলঙ্ক' বলে তার অভিমানে ঘা দিয়েছেন, তাই সে আরও ছুটে বেরিয়েছে। যদি আসামে তার কোন বিপদ আপদ হয়, তা হ'লে আপনি তার দায়ী। শুধু তার বিপদ নয়, তার বিপদ হ'লে আরও অনেকের হবে। তার মুখ চেয়ে কত জন বেঁচে রয়েছে, তা জানেন কি ?

রামদয় বাবু সরোজকে কখনও এমন উত্তেজিত ভাবে কথা কহিতে শুনেন নাই। একটু বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আর কেউ আছে কিনা তা জানি নি, তবে তুমি যে আছ তা জানি। কিন্তু আমাদের বয়েস হয়েছে, ঢের দেখেছি, ঢের শিখেছি, আমরা সহজে ওরকম গোঁড়া ভাবক হ'তে পারি নি। বংশের কলঙ্ক বলেছি সাধে ? আমি কিছু বলতে চাই নি, পরে নিজেরাই সব শুনতে পাবে। আসামে গেছে ব'লে এত হৈ চৈ করছ, যেন কি একটা সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। কেন বল দেখি ? এই রকম ক'রে-পুতু পুতু করলে বাঙ্গালী জাত কখনও উঠতে পারবে ? একেই ত' আমরা ধ্বংসের মুখে যেতে বসেছি, এর উপর যদি কেউ ছেলেকে একটু ম্যানলি (মানুষের মত মানুষ) করতে গেল, তা হ'লেই মাত মো বাবা। জঙ্গলে ভয় আছে, বিপদ আছে, স্বীকার করি, কিন্তু ভয় বা বিপদ কোথায় নেই ? এই কলকাতা সহরে প্রতি-ক্ষণে দুর্ঘটনার ভয় রয়েছে। মানুষের প্রাণ একটা সরু সুতোয় ঝুলছে, কখন ছিঁড়বে কে বলতে পারে ? তা ব'লে মিছে ভয় করে ছেলেকে যথার্থ মানুষ হ'তে দেব না, এ কেমন কথা ? বীর জাতদের মধ্যে ছেলেকে যারা সৈনিকের বৃত্তিতে অভ্যস্ত করায়, তারাও মৃত্যু, ভয়, আর বিপদকে শিয়রে রেখে ছেলেকে মানুষ হ'তে পাঠিয়ে দেয়। তবে আমা-দের বাঙ্গালীর ঘরে ছেলে বিদেশে গেলে মড়াকান্না ওঠে কেন ?"

সরোজ বলিল, "আসামের কালাজ্বরে কালা জ্বরে মরে যাওয়া, অথবা জঙ্গলীদের হাতে মরা ছাড়া অন্য উপায়ে কি ছেলে মানুষ হতে পারে না ?"

রামদয় বাবু বলিলেন, "কেন থাকবে না ? শত শত উপায় রয়েছে। তবে এটা হাতের গোড়ায় পাওয়া গেল, তাই কেনেডি সাহেব ঐ উপায়টাই অবলম্বন করলেন। এই কেনেডি সাহেবই গল্প করে ছিলেন, ওঁদের দেশে মার্কুইস অভ্‌লোর্ন মহা সম্ভ্রান্ত ও ধনবান জমিদার, তাহার বাৎসরিক আয় আশী লক্ষ টাকা ; তাঁর একমাত্র পুত্র লর্ড ব্রাউন তাঁর আফ্রিকার হীরার খনিতে কাজ করতে গেছে, অথচ সেই খনিটা নূতন আবিষ্কার হয়েছে, একবারে ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে, সেখানে দিনে সিংহ চরে বেড়ায়।"

সরোজ বলিল, "ওদের কথা ছেড়ে দিন, ওরা অর্থ-পিশাচ জাত। পয়সার জন্যে করে না এমন কাজ নেই।"

রামদয় বাবু বলিলেন, "না, না, তা নয়, একথা মনেও স্থান দিও না। তোমরা ভাব তারা কেবল

জগতের মেটিরিয়াল সাইডটা নিয়ে আছে, আর কিছুর ধার ধারে না; কিন্তু যথার্থ কথা তা নয়। ওদের ভিতরে খুঁজিলে সবই পাবে। জ্ঞান বিজ্ঞান বল, দর্শন মনোবিজ্ঞান বল, অর্থনীতি সমাজনীতি সমরনীতি বল, ধর্ম্মালোচনা বল, যা বল, সব তাতেই ওদের চর্চ্চা করা আছে। ওদের দেখে সেকস্‌পিয়ার বাইরন ষ্কট ডিকেন্স, সেলি ওয়ার্ডসওয়ার্থও জন্মায়; আবার যেমন নিউটন ওয়াট্‌স ফ্যারাডে, ওয়েলিংটন নেলসন রিড্‌লি লেটিমার ও জন্মায়; তা বলে যে য়ুথচাইলড্ জন্মায়না এমন নয়। অথচ ওদের বাপ মা ছেলেকে পুতু পুতু করে না। পাদরীর ছেলেই হ'ক বা ধনকুবেরের ছেলেই হ'ক, সবাইকেই মানুষ গড়িয়ে তোলবার জন্যে সংসারে ছেড়ে দেওয়া হয়। আমার দেশের জমিদার বা বড়মানুষের ছেলে যদি হলেন, তা হলে তার কেমন ভাবে লালন পালন হয়? সে কথা আর বলে কাজ নেই।"

সরোজ বলিল "তা হ'ক, কিন্তু ওরা ইহকালের উন্নতি নিয়ে আছে—"

রামসদয় বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আরে থাম বাপু। খালি কতকগুলো বাজে মিথ্যে কথা বলে নিজের জাতের গুমোর করতে দেও না। যেদিন দেখবো আমাদের দেশ থেকে আইন আদালত জাল জুয়োচুরি মামলা মকর্দ্দমা উঠে গেছে, যেদিন দেখবো ঠকামি জোচ্চুরি হ'তে আরম্ভ করে ডাক্তার উকীল হয়ে পয়সা রোজগার করা লোকে ছেড়ে দিয়েছে, যেদিন দেখবো দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা লোটা কম্বল নিয়ে বদরী নারায়ণের দিকে ওটী ওটী অগ্রসর হচ্ছে,—সেদিন ও সব কথা শুনবো। আত্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানই সত্য আর সব মায়া এবং ব্রহ্মজ্ঞানেই গতি মুক্তি সুখ শান্তি, এ আদর্শ সকল দেশেই আছে এবং এ আদর্শ সর্ব্বদা মনে রাখাই মঙ্গল। কিন্তু তা যখন সর্ব্বদা মনে রাখিনি, অথবা সাধনা ক'রে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হই নি, তখন মিছে ঐ আদর্শটা নিয়ে আড়াল দিয়ে জাল জুয়োচুরি, ঠকামি দাগাবাজী ক'রে পয়সা রোজগার করার মানে টা কি?"

সরোজ বলিল, "জাল জুচ্চুরি কোথায় পেলেন?"

রামসদয় বাবু বলিলেন, "বাঃ জাল জুচ্চুরি নয়? ভিটকিলিমিটাকে কি বল? আমাদের সমাজটা যে এই ভিটকিলিমিতে উৎসন্নের পথে যাচ্ছে, তা মান ত? আমরা লম্বা লম্বা মুখ বেড়ে বা খবরের কাগজে মস্ত মস্ত আর্টিকল লিখে দেশের লোককে কাদমন বাক্যে অর্থাৎ সব কাজে সব বিষয়ে স্বদেশী হ'তে পরামর্শ দিচ্ছি, এমন কি ম্লেচ্ছ ভাষার সংস্পর্শ ছেড়ে দিয়ে খাঁটি দিশি বুলি ধরতে বলছি, একালের সঙ্গে কোনও সংস্পর্শ না রেখে কেবল সেকাল আঁকড়ে ধরে বসে থাকতে বলছি, অথচ নিজের ছেলেটিকে স্কুল কলেজে পড়িয়ে ডাক্তার উকীল তৈরী করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করছি না; আমরা খেতে শুতে হাঁটতে বসতে একবারে নিক্তির ওজনে মনু পরাশরের মতের সঙ্গে মিলিয়ে শৌচাচমনাদি নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করতে পরামর্শ দিচ্ছি, অথচ পয়সা উপায় করবার সময় কোনও শাস্ত্র কোনও আইন মানি না। সাহেবের চাকরিও করছি, উঞ্ছবৃত্তিও করছি, অথচ কণ্ঠি কুঁড়োজালি মালা-ঠকঠকি বা গঙ্গা নাওয়াটুকুও আছে। ডাকাতে যেমন কালীপুজো করে মানুষ খুন করতে বা ঘরবাড়ী লুঠ করতে যায়, এও সেই রকম অনেকটা। বল দিকি আফিসে কাজ করলে ঠিক সময়ে ত্রিসন্ধ্যা পুজো আহ্নিকসম্ভব হয়, না মনুর আদেশ মত শৌচ স্নান সম্ভব হয়? সাহেবদের কথা ছেড়ে দাও, যিনি লোকের অধীনেযে সব বামুন অন্ন সংস্থান করে, তাদেরও ঠিক ঐ রকম লেকচারের উপদেশ মাফিক জীবন যাপন করা চলে? তবে ও সব বাজে লেকচার বা মিথ্যে আর্টিকেল লেখার উদ্দেশ্য কি? ও সব কি ভিটকিলিমি নয়?"

সরোজ বলিল, "দেখুন, আমি অত শাস্ত্র টাস্ত্র

জানি নি। ও সব তর্ক ভাল শাস্ত্র-জানা বামুন-পণ্ডিতেরাই করতে পারেন। তবে আমাদের সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, আপনারা বিলিতি বিদেশী ভাবে মজে আছেন বলে আপনাদের এই রকম সব ধারণা হয়েছে। আমাদের দেশে দুটো সহরের লোক দেখে এই সব বলছেন; কিন্তু এখনও পল্লীতে বিস্তর নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক হিন্দু আছেন, তা জানেন। স্বামীজীর বক্তৃতায় শুনেছি, এ সব সহরে ম্লেচ্ছাচারীরা বিরাট হিন্দু সমাজ সাগরের উপরে ফেনার মত ভাসছে, ও আবার সাগরের জলেই মিলিয়ে যাবে, নীচে যে অগাধ অপরিমেয় জলের রাশি রয়েছে সেটা কখনও মিলিয়ে যাবে না।"

রামসদয় বাবু বলিলেন, "বেশ, তাই স্বীকার করলুম, সহরের হিন্দু ফেনা আর পল্লীর হিন্দু বিরাট বারিরাশি। কিন্তু এই ফেনা যে এখন নীচের বারি রাশিকেও সংস্পর্শের গুণে ফেনিয়ে তুলছে, তার কি হবে? শুনতে পাই, খুব অজ পাড়াগাঁয়েও আজ-কাল বামুন পণ্ডিতের ঘরে সেমিজ সাবান এসেন্স তেল ঢুকেছে, তা জান ত'? চা চুরুট খায় নি, এমন জায়গা ত' দেখিনি। কতটুকু করলে নিষ্ঠে থাকে, আর কতটুকু না করলে নিষ্ঠে থাকে না, তা ত' কেউ লাইন টেনে সব বিষয়ে বুঝিয়ে দিতে পারে না; পারলেও দিচ্ছে না। তুমি হয় ত' যতটা বলবে, আর একজন হয় ত' তার চেয়ে একটু বেশী বলবে। কেই বা বলে, আর কেই বা শোনে। কে কাকে মানে? মানবার মত লোক কই? যাকে মানতে বলবে, হয় ত সে ঘোর বিষয়ী ব্রাহ্মণ, সে বুনো রাম-নাথ আর নেই। প্রায় যেদিকে চাও, সেই দিকেই মেকি আর ভেজাল। কাজেই মুখের কথায় চিঁড়ে ভিজান চলে না। দৃষ্টান্ত চাই, নিজেদের জীবন-যাপনে, নিজেদের নিষ্ঠাপালনে দৃষ্টান্ত দেখান চাই, তা না হ'লে এখনকার যুক্তি তর্কের দিনে শুধু উপ-দেশে কিছুই হবে না।"

সরোজ বলিল, "আপনার আমার মত দু চার জন সহরে বাবুতে না মানতে পারি, কিন্তু এখনও বিরাট হিন্দু সমাজ এই এখনকার 'দৃষ্টান্ত' হীন বামুনদেরই মেনে চলছে ত'!"

রামসদয় বাবু বলিলেন, "বিরাট হিন্দু সমাজটা কাকে বল? তোমার দল নিয়ে তুমি বিরাট হিন্দু সমাজ, আমি আমার দল নিয়ে বিরাট হিন্দু সমাজ, আবার ঐ সেখো-সেখোও তাদের সমাজ নিয়ে বিরাট হিন্দু সমাজ। তুমি আমার মেয়ের বিয়েতে খেতে আসবে না, যোগ দেবে না, আমি আবার হাজার হাজার খরচ ক'রে পাঁচশ' ভাল বামুন পণ্ডিতও আনাবো, শালগ্রাম রেখে অগ্নি সাক্ষী ক'রে মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে মেয়ের বিয়ে দেব।

সরোজ বলিল, "আমি যে সাত্ত্বর পুরাণ জানি নি, তা হলে এর জবাব দিতুম, থাকতো অমিলা!"

রামসদয় বাবু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "ওঃ কি কথা থেকে কি কথাই এনে ফেললুম দেখ! আমি মানছি যে আমার ভুল হ'তে পারে। কিন্তু এটাও বলে রাখি, ঘটটা রয় সয় তটটা করাই ভাল, তার বেশী কচলালেই লেবু তেতো হয়ে যায়। কালের স্রোত কেউ নিবারণ করতে পারে না। পারেন এক ভগবানের অবতার, তিনি ভিন্ন আর কেউ না। তিনি এসে কতকটা ধ্বংস করেন, কতকটা নূতন গড়েন, সমাজটা আবার নতুন আর সজীব হয়। কেবল পুরোণোটা থাকে না, থাকতে পারে না। নতুন আর পুরাণোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করে নেওয়াই কালের ধর্ম্ম। কাজেই নতুন হবার সখটা সম্পূর্ণ মনে পুষে লোক দেখিয়ে ভিটকিলিমি করে পুরোণোটা আঁকড়ে ধরে থাকবার ভান করাটা সমাজের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর নয় কি?"

সরোজ বলিল, "তা হ'তে পারে, কিন্তু আপনি যাদের সভ্য উন্নতিশীল জাত ব'লে ধরছেন, সেই ইউরোপীয়েরাও ত' পুরোণোটা ছেড়ে দিয়ে নতুনটা কেবল আঁকড়ে বসে রয়েছে। সেটা খুব ভাল?"

রামসদয় বাবু বলিলেন, "না, তাও ভাল নয়।

কিন্তু কে তোমায় বলেছে যে ওরা পুরোণোটাকে একবারে ছেড়ে দিয়েছে! জান কেন, ইতিহাসেই পড়েছ ত' এই ইংরেজরা কি রকম কনজার ভেটিব জাত? হঠাৎ ওরা পুরোণোটা ছাড়তে চায় না। তবে যখন দেখে পুরোণোটা কিছু ছাটছুট করালে কালের উপযোগী হয়, তা হলে তারা তাই করে। একটা মজা দেখ, ওদের শাস্ত্রেই আছে, মানবের আদি জনক জননী আদম ও ইভ্, জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খেয়ে জগতে যত দুঃখ কষ্ট এনেছিলেন; সুতরাং জ্ঞানটাই বর্জ্জন করা উচিত বলে মনে করা অস্বাভাবিক নয়। এই পুরোণো ভাবটাকে কি ওরা আঁকড়ে ধরে আছে? তা ত' নেই। বরং পাশ্চাত্য জাত মাত্রেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুল চর্চ্চা করছে, আর তা হ'তে মানুষের কত উপকার সাধন করছে। আমাদের শাস্ত্রে কিন্তু এর উল্টো কথা বলে। বেদ বেদান্ত বল, উপনিষদ গীতা বল, যে শাস্ত্রই ধর না কেন, সকল শাস্ত্রেই উপদেশ দিচ্ছে যে জ্ঞানই দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। অথচ আমাদের দেশের লোক আর সব বিষয়ে পুরোণোটাকে আঁকড়ে ধরে থাকলেও এই পুরোণো কথাটাকে বিসর্জ্জন দিয়েছে। আজ জ্ঞান বিজ্ঞানের আদর থাকলে দেশের কি উন্নতি হ'ত?"

সরোজ বলিল, "সে কি এই জ্ঞান, না আর কিছু?"

রামসদয় বাবু বলিলেন, "প্রথমে এই জ্ঞান বিজ্ঞান চাই ত, তারপর আর কি। প্রথমে ক, খ, না চিনলে একবারে মহাভারত রামায়ণ পড়া যায় কি? তার পরে আর একটা মজা দেখ, ওদের শাস্ত্রে খ্রীষ্ট বলেছেন 'এক গালে চড় মারলে অপর গাল ফিরিয়ে দেবে'; অথচ ওদের মত খুনখারাপি লড়ালড়ি রক্তারক্তি করতে জগতে অন্য কোনও জাত নেই। আমাদের শাস্ত্রে ভগবান অর্জ্জুনকে নিমিত্তমাত্র হয়ে, তাঁতে কর্ম্মফল অর্পণ করে, কার্য্য করতে উপদেশ দিয়েছিলেন, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পালন করতে বলেছিলেন, যুদ্ধে আততায়ীকে হত্যা করতে বলেছিলেন; অথচ আমাদের দেশের লোকের মত সকল কাজে আত্মাহীন যুদ্ধে বা রক্তারক্তিতে অনুরাগহীন লোক জগতে নেই বল্লেই হয়। কাজ করতে ভগবান পুনঃ পুনঃ বলে গেছেন, অথচ এমন কাজে ভয় অন্য কোথাও নেই।"

সরোজ বলিল, "তা বলে ভাববেন না যে, অরুণ কাজে কখনও বিমুখ হবে।"

রামসদয় বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যে অরুণের একটী মস্ত গোঁড়া ভক্ত তা জানি। তুমি ওর কোন দোষ দেখ না। কিন্তু সব যদি শুনতে বা জানতে, তা হলে নিশ্চয় তোমার মত বদলে যেত।"

সরোজ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "কি রকম? আমি অরুণের সব কথা জানি নি, যে অরুণের আদ্য নাড়ী নক্ষত্র সব জানে? অরুণ যে কাজে হাত দেবে, তা সকল করবেই করবে, এ আপনি দেখে নেবেন।"

রামসদয় বাবু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তাই বুঝি বার বার ফেল হয়ে, কেঁদে কেঁদে মেট্রিক পাশ করলে!"

সরোজ সাগ্রহে বলিল, "তাই ভেবেছেন বুঝি? ও ইচ্ছে করলে একবারে পাশ করতে পারত না, এমন কথা মনেও স্থান দেবেন না।"

রামসদয় বাবু তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, অমন কথা ঢের শুনেছি। ও কথার মানেও নেই, মাত্রাও নেই। পারত, ত' পাশ করলে না কেন? ও রকম অবর্ণণ্য, অলস ছেলে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।"

সরোজ ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া বলিল, "আপনি বলেন কি? অরুণের মত ছেলে বংশের গৌরব। শুধু বংশের গৌরব কেন, যে ওর সম্পর্কে আসবে সেই ভাগ্যবান, যে ওকে কন্যাদান করে আপনার করে নেবে, সেও ধন্য হবে।"

রামসদয় বাবুও বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বলি-

লেন, "বলে যাও, ঐ ছেলেটী বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, ঐটী সৃষ্টি করেই বিধাতার নির্ম্মাণ-কৌশল ফুরিয়ে গেছে, কেমন না? তা বাপু, তোমরা ওকে যে চোখেই দেখ, আমার এই একটা তৃপ্তি যে অমন ছেলের হাতে আমার মেয়েটীকে দিতে হবে না।"

সরোজের মুখখানা হঠাৎ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সে ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে বলিল, "যদি যথার্থ কথা বলতে বলেন, তা হলে অনিলার উপযুক্ত পাত্র অরুণের তুল্য কেউ নেই।"

রামসদয় বাবু বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "বটে! তা মশাইকে যখন ও সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা ক'রব, তখন মতামত দেবেন, এখন আমি আমার মেয়ের যে সম্বন্ধ স্থির করেছি, তাই শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করছি।"

সরোজ গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমার সঙ্গে বলছেন? ওটা ত' হতেই পারে না।"

রামসদয় বাবু প্রথমে কথাটা বুঝিতে পারিলেন না। পরে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম? এর মানে?"

সরোজ ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমি বিবাহ ক'রব না।"

রামসদয় বাবু, ঈষৎক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "সে কথা আগে বল্‌লেই পারতে তো। আজকালকার ছেলেরা হয়েছে যেমন এক রকম।"

সরোজ বিনীতভাবে বলিল, "তখন বল্‌বার অবসর পাই নি।"

রামসদয় বাবুর ধৈর্য্যের বাঁধ একটু একটু করিয়া ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। বিশেষতঃ সরোজের ধীর স্থির সম্ভাষণ তাঁহাকে আরও অধিক ক্ষেপাইয়া তুলিতেছিল। এইবার যথার্থই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন, "অবসর পাও নাই বটে! দেখ, মুখে একখানা, পেটে একখানা, আমি মোটেই পছন্দ করি না। তোমায় ত' কখনও তা করতে দেখিনিত তবে আজ আবার একি খেয়াল চাপ্‌লো?"

"খেয়াল নয়, এইটেই আমার সঙ্কল্প।"

"সঙ্কল্প? তা হলে কি তুমি বলতে চাও, সেদিন বিবাহের প্রস্তাবে যে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছিলে, সেটা ভাণ?"

সরোজ নীরবে নতমস্তকে বসিয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে তখন কি হইতেছিল, তাহা অন্তর্যামী ব্যতীত কেহ জানিল না। রামসদয় বাবু কিন্তু তাহার এই ভাব দেখিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বল, চুপ করে রইলে যে? তখন একরকম, এখন অন্য রকম, এর মানে কি? এ ডিউপ্লিসিটির (শঠতা) কি দরকার ছিল?"

সরোজকে ডিউপ্লিসিটা কথাটা চাবুকের মত আঘাত করিল। বিনা অপরাধে সেই চাবুকের ঘা খাইয়া সরোজের মুখে যাতনার রেখা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে ক্ষণিক; মুহূর্ত্তপরেই সরোজ প্রকৃতিস্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ ধীর গম্ভীর স্বরে বলিল, "এর ভিতরে ডিউপ্লিসিটি বা ডাব্‌ল্-ডিলিং কিছুই নেই। আমার তখন কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটে উঠেছিল আপনার মহত্ব দেখে। পথের কাঙ্গালকে ডেকে আপনি রাজভক্তে বসাতে চেয়েছিলেন, এইতে আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় প্রাণ ভরে গিয়েছিল। কিন্তু তার পরে ভেবে দেখেছি এই বিবাহ হতে পারে না।"

"কেন? হতে পারে না কেন?"

"কোন শাস্ত্রে ভাই ভগিনীর বিয়ের ব্যবস্থা আছে? সেই ছেলেবেলা হতে অনিলাতে আমাতে সহোদর সহোদরার সম্বন্ধ। তাকে আমি কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি। কত আদর করেছি, কত—"

"কি ছেলেমানুষের মত বকছ? নিলা ত' তোমার যথার্থই বোন নয়। এক সঙ্গে ছেলেবেলায় এমন অনেকে ভাই বোনের মত খেলা ধুলো করে থাকে, আবার বড় হ'লে তাদের বিয়ে হয়। পাড়াগাঁয় এমন ত' অনেক হতে দেখেছি।"

"যাদের হয়, তাদের হয়, আমাদের হ'তে পারে না। আমি অনিলাকে এখনও—সেই ছেলেবেলা-কার বোনটীর মত দেখি।" কথাটা বলিবার সময় সরোজের গলা কাঁপিল।

রামসদয় বাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া সরোজের পিঠ চাপড়াইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "নাও, নাও, ওসব পাগলামি ছাড়। আমি তোমায় সময় দিলুম, এখনই ত' আর বিয়ে দিচ্ছি না। এর পর ভেবে চিন্তে জবাব দিও। এখন আমি চলুম।

রামসদয় বাবু এই কথা বলিয়া পত্রখানি লইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সরোজ বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। কতক্ষণ সে এই ভাবে তন্ময় হইয়া ছিল, তাহা জানে না, হঠাৎ অলঙ্কার-নিক্কণের শব্দে তন্দ্রাবিচ্ছিন্ন হইয়া সে দ্বার পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল অনিলা কক্ষে পদার্পণ করিয়াই লজ্জায় আরক্তমুখ হইয়া পলাই-তেছে। যেদিন সরোজ পাগলের মত তাহাকে কি সব আবোল তাবোল বলিয়াছিল, সেই দিন হইতে অনিলা ব্যাধভয়ভীতা কুরঙ্গীর মত তাহাকে দেখিলেই পলাইয়া যাইত, কদাচিৎ তাহার সম্মুখে বাহির হইত। সরোজ এই সব লক্ষ্য করিয়াছিল, এবং উহাতে নিতান্ত লজ্জিত ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়াছিল। যাহার একটু সুখবিধানের জন্য সে প্রাণ দিতে পারে, সে তাহাকে দেখিয়া পলাইয়া যায়, এ দুঃখ সে রাখিবে কোথায়!

সরোজ দাঁড়াইয়া উঠিয়া ক্ষুব্ধ ব্যথিত কণ্ঠে ডাকিল, "অনিলা!"

অনিলা সেই স্বর শুনিয়া চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার লজ্জা কোথায় চলিয়া গেল। সে ভীতিব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "কি হয়েছে সরোজ দা, তোমার কি অসুখ করেছে?"

সরোজ দুঃস্বরে বলিল, "না অনিলা, কিছুই হয় নি।" কণপরে ব্যগ্রভাবে বলিল, "অনিলা, বল, আমায় ক্ষমা করেছ? লক্ষ্মী বোনটী আমার, তোমারি দাদার ঘাড়ে ভূত চেপেছিল তাই সেদিন থিয়েটারের একটিং করছিল। বল সব ভুলে যাবে, আবার আমরা যেমন ভাইবোন ছিলুম তেমনই হব?" অতিরিক্ত উদ্বেগ ও উত্তেজনার ফলে সরোজের দেহ থর থর কাঁপিতেছিল, মুখচক্ষু দিয়া অগ্নি নির্গত হইতেছিল।

অনিলারও সর্ব্ব শরীর থর থর কাঁপিতেছিল। তাহার মুখে কথা যোগাইল না, সে কেবল কৃতজ্ঞ নয়নে সরোজের দিকে চাহিল। সরোজ ধন্য বোধ করিল, তাহার মনের মরলা কাটিয়া গেল।

সরোজ মনের উপর কঠোর শাসন করিয়া যথাসম্ভব সহজ সরল কথায় হাসিয়া বলিল, "দেখ ত' আজ ক'দিন আমার কাছে পড় নি কেন? আজ পড়তে হবে কিন্তু বলে দিচ্ছি, না হলে রবিবারে ছুটী দেব না, একটা চ্যাপটার টডহাণ্টার কসতে হবে।"

অনিলার চক্ষুদুটী আনন্দে হাসিয়া উঠিল, সে আসিয়া সরোজের হাত ধরিয়া বলিল, "না সরোজ দা, আজ নিশ্চয় পড়বো, রবিবারে আমায় জেঠামণির বাড়ী নিয়ে যাবে বল।"

"আচ্ছা, আচ্ছা রে পাগলি! তাই হবে। ও ভাল কথা মনে পড়েছে তোমার একখানা ম্যাপ ঐ দুয়ারে রেখে দিয়েছি নিয়ো, এই নাও চাবি।"

সরোজ এই কথা বলিয়া চাবির থোলোটা অনিলার হাতে দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, সেটা সে লইল কিনা দেখিতেও পাইল না। অনিলার মুখচোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে ঘাড় হেট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যখন সে মুখ তুলিল তখন দেখিল, কেহ ঘরে নাই। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া দুয়ার খুলিল। দেখিল সেখানে ম্যাপখানি রহিয়াছে। আর দেখিল ফটো ও একখানি পত্র। সে পত্র সরোজের নামে অরুণের লেখা। একবার অনিলা ইতস্ততঃ করিল, তাহার পর ম্যাপ, ছবি ও পত্র লইয়া চারিদিকে সলাজ চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অনিলা এক দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিল। (ক্রমশঃ)

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য-প্রতিভা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল)

২৭। সামাজিক নাটক।

এই শ্রেণীর নাটকগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—পারিবারিক ও সামাজিক। শুদ্ধ সামাজিক নাটক বলিতে আমরা বুঝি,যে নাটক সামাজিক সমস্যা লইয়া বিরচিত। গিরিশচন্দ্র পণপ্রথা ও বিধবা-বিবাহ লইয়া 'বলিদান' ও 'শাস্তি কি শাস্তি' নামক দুইখানি নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি' ও 'গৃহলক্ষ্মী'কে আমরা পারিবারিক নাটক-পর্য্যায়ভুক্ত করিলাম। অবশ্য প্রণয়মূলক নাটকগুলি, যাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে, তাহারাও এই শ্রেণীভুক্ত। 'প্রফুল্ল' ও 'হারানিধি' যথাক্রমে ১২৯৪ সালে ১৪ই বৈশাখ ও ১২৯৬ সালে ৩০শে ভাদ্র ষ্টার-রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। 'গৃহলক্ষ্মী' কবিবরের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় পুস্তকের পুরোভাগে কৃতজ্ঞতাস্বীকার-শীর্ষক ক্ষুদ্র একটি মুখবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, তাঁহার পূজ্যপাদ পিতৃদেব জীবনের শেষভাগে 'গৃহলক্ষ্মী' লিখিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন এবং অন্যান্য নানা কারণে নাটক-খানির চতুর্থ অঙ্ক পর্য্যন্ত লিখিয়া, রচনা স্থগিত রাখেন। তৎপরে তাঁহার স্বর্গারোহণের পর পুস্তকখানি অভিনয়ের বিশেষ উপযোগী দেখিয়া তিনি তাঁহার পিতৃবন্ধু সুসাহিত্যিক শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে সম্পূর্ণ করিয়া লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন; এবং পঞ্চম অঙ্কটী তাঁহারই লিখিত। সুরেন্দ্র বাবু এই কয়টী কথা যদি আমাদিগকে জানাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই ধরিতে পারিতাম না যে, পঞ্চম অঙ্কটী গিরিশবাবুর স্বরচিত নয়। অবশ্য ইহাতে দেবেন্দ্রবাবুর কম কৃতিত্ব সূচিত হইতেছে না। তিনি স্বয়ং একজন নাটককার ও কথা-সাহিত্য-রচয়িতা। প্রত্যেক লেখকের একটা বিশেষত্ব থাকে। তাঁহার ও একটা বিশেষত্ব আছে; কিন্তু তিনি এমন সুন্দর ভাবে গিরিশচন্দ্রের ভাবে ও ভাষায় অনু-প্রাণিত হইয়া লিখিয়াছেন যে,পাঠ করিয়া কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না যে, ইহা গিরিশচন্দ্রের লেখনীপ্রসূত নয়। আমরা কয়েকবারই এ অংশ পাঠ করিয়া লেখক মহাশয়ের নিজস্ব লেখনী ভঙ্গী পর্য্যন্ত বাহির করিতে পারি নাই। সমগ্র নাটক-খানির সহিত এই অংশ এমন সুন্দর অঙ্গাঙ্গীভাবে বিরাজ করিতেছে যে ধরিবার উপায়ই নাই যে, দুই হাতের লেখা। ফরাসী নাটকের যাহা denou-ment বা পরিণতি, তাহা এ ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

এক্ষণে আমরা পারিবারিক তিনখানি নাটক সম্বন্ধে দু'চারি কথায় একটু আলোচনা করিব। 'প্রফুল্লের' বর্ণিতব্য বিষয় বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধবনিতার অজ্ঞাত নয়; কারণ আমার বোধ হয়, স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অমর পারিবারিক উপন্যাস 'স্বর্ণ-লতা'র নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত 'সরলা' ভিন্ন কোন নাটক 'প্রফুল্লে'র ন্যায় নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে অভিনীত হয় নাই। গিরিশচন্দ্র কত রঙ্গের

উদ্রেক করিবার জন্য ধনাঢ্য যোগেশ চন্দ্রের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া অশ্রুরোধ করা যায় না—সহমর্ম্মিতায় বুক ফাটিয়া যায়। তাহার মধ্যম ভ্রাতা এটর্ণি রমেশের কৌশল-জালে তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে দেখিয়া—তাহার 'সাজান বাগান শুকাইয়া গেল' শুনিয়া নাটকারের সহিত একবাক্যে বলিতে হয়, 'উকীল কি চিজ!' তারপর যোগেশের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন স্বয়ং নাটককার। তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ অভিনেতার অভিনয় কৌশলে নাটকখানি মর্ম্মস্পর্শী হইত। রসরাজ অর্দ্ধেন্দু শেখরও এই ভূমিকায় কৃতিত্ব যত কম দেখান নাই। আমার মনে হয়, বাঙ্গলাদেশের ভাবপ্রবণ দর্শকের মনে করুণ রসের উদ্রেক করিতে গিয়া কবিবর অনেক অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। যখনই এই নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, তখনই দর্শকের ন্যূনতা দেখা যায় না। অভিনয় দর্শন করিয়া প্রাণে একটা বেদনা অনুভব করিতে হয়, প্রাণের তন্ত্রীগুলিকে কে যেন আঘাত করিয়া করুণ রসের উদ্রেক করিয়া দেয়। যোগেশচন্দ্র ও তাহার সহকর্ম্মীদের উপর যুগপৎ ঘৃণা আসে। অভিনয় দেখিতে দেখিতে আমরা ভাবের বন্যায় ভাসিয়া যাই। চিন্তা করিয়া দেখিবার অবসর পাই না, নাটকখানি সুলিখিত হইয়াছে কি না। গভীর দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, নাটকখানি সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জক হইলেও—আমাদের মনে করুণ রসের উৎস ছুটাইয়া দিলেও নাটকীয় সৌন্দর্য্যের সমাবেশ ইহাতে তত বেশী নাই। পুস্তকখানি একটু বেশী রকমের অস্বাভাবিকতা-দোষদুষ্ট। চিন্তাশীল পাঠকদিগের নিকট এই কথা বুঝাইবার জন্য আমার যাহা বক্তব্য তাহা একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। অবশ্য প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, মহাকবি সেক্সপীয়রের নাটকেও যে অস্বাভাবিকতা দৃষ্ট হয় না তাহা নয়—দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাউক, লেডী ম্যাকবেথের চরিত্র। সে চরিত্র যে সর্ব্বথা নারীজনসুলভ হইয়াছে, তাহা নয় সত্য। সর্ব্বত্র যে স্বাভাবিক হইয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। অবশ্য ইচ্ছাশক্তি ম্যাকবেথ পৃথিবীর ছিল; কিন্তু তিনি কোনদিনই কল্পনায় রঙ্গিন নেশায় মসগুল হন নাই। এই প্রবল ইচ্ছা-শক্তিই ম্যাকবেথকে কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছিল, তাঁহার হৃদয়ে প্রেরণার সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। কল্পনার রাজ্যে লেডী ম্যাকবেথ কখনও প্রবেশ করেন নাই বলিয়া তাঁহার দূরদৃষ্টি ছিল না—তাই কার্য্যের পরিণতি কিরূপ হইতে পারে, তাহা তিনি আগে বুঝিতে পারেন নাই। সর্ব্বনাশও তাই হইয়াছিল। হিতাহিত জ্ঞান যে তাঁহার আগৌ ছিল না, একথা বলিতে পারা যায় না; তবে ম্যাক-বেথের অপেক্ষা তাহা কম ছিল, একথা সত্য। ঘুমের ঘোরে বেড়াইবার সময়ও তাঁহার মুখ দিয়া আত্মগ্লানির কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার দেহ ও মন যখন একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেল, তখন তাহার কারণ যদি আমরা অনুসন্ধান করিতে যাই, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিতে পাই, অন্যান্য কারণের মধ্যে বিবেকের কষাঘাত ও একটা কারণ। লেডী ম্যাকবেথ-চরিত্রের একটা দিক খুব স্বাভাবিক। তাঁহার স্বামীভক্তি—পতিপ্রেম—পতির প্রতি অনুরাগ অতুলনীয়। অনেক সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন, "Her whole ambition is for him and through him, of herself and of elevation for herself she never speaks. She lives only in him and in his greatness". লেডী ম্যাকবেথের উচ্চা-কাঙ্ক্ষার কেন্দ্র ছিল তাঁহার স্বামী। স্বামীকে উন্নতির উচ্চ শিখরে অবস্থিত দেখিবার উচ্চাভিলাষ তাঁহার ছিল—আপনার উন্নতির জন্য তাঁহাকে কোনদিন চেষ্টা করিতে দেখা যায় নাই। আপনার অবস্থার উন্নতি করিবার কোন কথাই তাঁহার মুখ দিয়া ফুটিয়া বাহির হয় নাই। স্বামীর সত্তায় ও তাঁহার

মহত্বে আপনাকে তিনি সর্ব্বদাই নিমজ্জিত রাখিতেন। ম্যাক্‌বেথ ও ম্যাক্‌বেথপত্নী উভয়েরই দোষ ছিল। উভয়েই জানিতেন যে, দুজনাই দুজনার সর্ব্বনাশের মূল। ম্যাক্‌বেথই লেডী ম্যাক্‌বেথকে প্রথমে আশায় প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন—হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করিয়া দিয়াছিলেন। লেডী ম্যাক্‌বেথ সহজে স্বামীকে কার্য্যোদ্ধারের পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা পাইতেন। ম্যাক্‌বেথের উচ্চাভিলাষ-অগ্নিতে সর্ব্বদাই তিনি ইন্ধন জোগাইতেন। দুর্ব্বলচিত্ত ম্যাক্‌বেথ যখন আর অগ্রসর হইতে চাহিতেন না, তখন লেডী ম্যাক্‌বেথই তাঁহাকে সরলা পথ স্মরণ করাইয়া তাঁহার প্রাণে শক্তির সঞ্চারণ করিয়া দিতেন—তাঁহার বলহীন আত্মাকে সবল ও কার্য্যক্ষম করিয়া ইপ্সিত কার্য্যোদ্ধারের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। দুইজনে দুইজনকে বেশ বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু কলাকুশলী সেক্সপীয়ার এই দুই চরিত্র এরূপ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, একজনের মুখ দিয়া অন্যের প্রতি দোষারোপ করান নাই। বিদায়ের দৃশ্য কি সুন্দর! নীরবে উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে আঁখির ভাষায় বিদায় লইয়া চলিলেন—কেহ কাহারও প্রতি দোষারোপ করিলেন না। লেডী ম্যাক্‌বেথের চরিত্রে যে নারীসুলভ কোমলতা ছিল, তাহা সেক্সপীয়ার দু একস্থলে বেশ দেখাইয়া দিয়াছেন;- দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন—

গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ :—

'স্তন্যপায়ী শিশুরে দিয়েছি স্তন;
সস্নেহে ধরেছি তারে বুকের উপরে,—
হেন শিশু এবে যদি হাসে মম মুখে,
দন্তহীন মুখ হ'তে স্তনাগ্র ছিনায়ে,
আছাড়িয়া মস্তিষ্ক-বিদারি তার
প্রতিজ্ঞা যেমতি করি তোমার সমান।'

১ম অঙ্ক ৭ম দৃশ্য।

অন্যত্র দ্বিতীয় অঙ্কের ২য় দৃশ্যে লেডি ম্যাক্‌বেথ অকৃতকার্য্য হইয়া বলিতেছেন:—

'কোষ মুক্ত করি রাখিয়াছি রক্ষকের অসি,
ভ্রম নাহি হ'বে যেতে।
আকারে না হ'ত যদি পিতার সমান,
আমি সাধিতাম কাজ।'

লেডী ম্যাক্‌বেথের চরিত্রের কাঠোরতা, পরন্তু পুরুষ ভাব ধার-করা—তাঁহার চরিত্রগত নিজস্ব ভাব নয়। ইহা তাঁহার ইচ্ছাকৃত ভাব। কোন কোন সমালোচক তাঁহাকে 'unsexed' পুরুষভাবাপন্ন বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন; কিন্তু আমরা এ মতের পোষকতা করিতে পারি না। আমরা Veritye সহিত একমত হইয়া বলিতে চাই:—'But Lady Macbeth knows that to execute her fell purpose she must be nerved by some unnatural access of ferocity. And it seems as if her prayer were answered: the woman who can go into that chamber of death must be unsexed, for a space: but nature recurs, and while Macbeth is brutalised by crime, her finer spirit is broken by the reaction from moral self-violence.'

লেডি ম্যাক্‌বেথ জানিতেন যে, তাঁহার কার্য্যোদ্ধার করিতে হইলে তাঁহাকে অস্বাভাবিক রকমের কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইবে; নচেৎ কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। তাই দুর্ব্বল মানসিক বলের অধিকারিণী পুরুষভাবাপন্ন হইয়া কার্য্যোদ্ধারের ভ সিদ্ধা সকলই ঠিক করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতার মুখের সাদৃশ্য দেখিয়া নারীসুলভ কোমলতা তাঁহার কাঠিন্যকে ভাসাইয়া দিল—তিনি ফিরিয়া আসিলেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বলিতে হয়, লেডী ম্যাক্‌বেথের ধার-করা অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে, সহজ কোমলতা যুদ্ধ করিয়া অবশেষে জয়ী হইয়াছে; ইহা নৈতিক প্রতিক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল। আর ভাব-বিপর্য্যয়ের ফলে—পুরুষোচিত

ভাবে কাহা করিবার জন্য তাঁহাকে শক্তির বড় কম পাইতে হয় নাই।

সেই মানুষের চরিত্রে অস্বাভাবিকতা ও স্বাভাবিকতার সংমিশ্রণে যে সুন্দর চিত্র ফুটিয়াছে, তাহাতেই তাঁহার চরিত্র ইংরাজী-সাহিত্যের সৃষ্ট চরিত্রগুলির ভিতর একটী মনোরম চিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য নাটকে কিন্তু রমেশের চরিত্রে স্বাভাবিকতার লেশ মাত্র নাই। ভ্রাতার সহিত ব্যবহারে ত নাই—পত্নীর সহিত ব্যবহারেও স্বাভাবিকতা ফুটে নাই। অর্থাগমই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্য-প্রণোদিত হইয়া উচ্চশিক্ষিত রমেশ যে সকল কার্য্য করিয়াছে, তাহার কোনটাই সমর্থন করা যায় না। জগতে কারণ ভিন্ন কার্য্য হইতে পারে না। রমেশের চরিত্র যেরূপ ভাবে গিরিশচন্দ্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার কারণ কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে কেন এরূপ হইল, তাহার আভাস বা ইঙ্গিত গিরিশচন্দ্র কোথাও দেন নাই। যদি তিনি রমেশের পূর্ব্ব চরিত্রের কথা একটু জানাইতেন, তাহা হইলে কতকটা আমরা বুঝিতে পারিতাম। যদি দেখিতাম, রমেশচন্দ্র মদ্য সংসর্গে পড়িয়া ও অস্বাস্থ্যকর আবেষ্টনীর ভিতর দিয়া চলিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম, এরূপ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আর কেবল অর্থ-প্রীতিপ্রণোদিত হইয়া যদি রমেশ পিতৃতুল্য ভ্রাতাটিকে সর্ব্বনাশ করিত, তাহা হইলে কোন মন্তব্যের অর্থ সে কেন ভাঙ্গিল না, তাহাও ত কথাকুশলা গিরিশচন্দ্র কোথাও নাই। সবে মাত্র পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে, বাহির হইতে না হইতেই এই ঘুঘাচুরী বিদ্যাটা বাড়ীতে আরম্ভ করিয়া দাদার ঘর ভাঙ্গা কেন যে করিল, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

সংসার ভাঙ্গিতে যে সকল উপাদানের আবশ্যক —যৌথ পরিবার যে সকল কারণে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইতে দেখা যায়—তাহাদের কোন একটা কারণই এই সম্ভ্রান্ত যৌথ-পরিবারের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া দেখান হয় নাই। তাই এই সংসারটা ভাঙ্গিতে দেখিয়া বড় কষ্ট হয়।

'স্বর্গলতায়' চট্টোপাধ্যায়দিগের সংসার ভাঙ্গিবার কারণ বেশ স্পষ্ট করিয়াই মাননীয় গ্রন্থকার তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সুনিপুণ ভাবে দেখাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—'কিন্তু তাঁহাদিগের মাতার পরলোক গমনের পর শশিভূষণের স্ত্রী স্বামীকে স্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, এক সংসারে আর অধিক কাল থাকা আয়-ব্যয় সম্বন্ধে সুবিধার বিষয় নহে। শশিভূষণ তাহাতে হঠাৎ কোন অসদ্ভাব প্রকাশ করেন নাই। হাজার হউক, তবু দুই ভাই। উভয়েই এক মায়ের গর্ভে জন্মিয়াছে, এক মায়ের স্তন্যপান করিয়াছে, এক মায়ের ক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। সহস্র বিবাদ হইলেও একজন আর একজনের প্রতি একবারে স্নেহশূন্য হয় না। কিন্তু তাঁহাদের স্ত্রী-দিগের মধ্যে ত আর সে রক্তের টান নাই। মাঝে মাঝে তাঁহাদিগের মধ্যে কলহ-বিবাদ হইতে আরম্ভ হইল, কিন্তু স্বামীর দোষকতা কেহই পান নাই; এজন্য এ পর্য্যন্ত গৃহবিচ্ছেদ ঘটে নাই।' তার পর কেমন করিয়া শশিভূষণের স্ত্রী প্রমদার 'কাল ভাঙ্গানী'তে সংসারটা ভাঙ্গিয়া গেল, তাহা নিপুণ লেখক মহাশয় অমর তুলিকাসাহায্যে অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন। আর এ ক্ষেত্রে অকারণ একটা সংসার ভাঙ্গিয়া গেল।

এই সনাতন যৌথ-পরিবার প্রতিষ্ঠানটা ভাঙ্গিয়া ফেলা যে গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশ্য তাহা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। এরূপ করিবার দুইটী কারণ সম্ভবপর বলিয়া আমাদের মনে হয়। একটী 'এটর্ণী বা উকীল কি চিজ'।—তাহা দেখাইবার জন্য, অপরটী বাঙ্গালী দর্শক ও পাঠককে কতক রসে অভিষিক্ত করিবার জন্য। যাহা হউক, অতীব দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথমটীতে

তিনি একেবারেই কৃতকার্য্য হন নাই ; দ্বিতীয়টীতেও যে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না।

জগতে অবিমিশ্র ভাল বা মন্দ কিছুই পাওয়া যায় না। এইগুলিও মানুষ। দোষে গুণেই মানুষ। তাঁহারা উচ্চশিক্ষিত। কেন তাঁহারা অমন প্রকৃতির লোক হইবেন, তাহার সন্তোষজনক একটা কারণ থাকা চাই। রমেশের চরিত্রে সদ্‌গুণের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশ স্বেচ্ছায় সোপার্জ্জিত অর্দ্ধ অংশ দুই ভ্রাতাকে ভাগ করিয়া দিলেন। পৈত্রিক সম্পত্তি তিনি কিছুই পান নাই। তথাপি নিজের চেষ্টায় ও যত্নে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন। রমেশ উচ্চশিক্ষিত এটর্নী। সুরেশ কুসংসর্গে পড়িয়া মদ্যপায়ী লম্পট। এই উচ্চ ত্যাগ স্বীকারের মাহাত্ম্য রমেশ বুঝিতে পারিল না। তাহার মুখে যখন শুনি, —'ভাইয়ের চেয়ে পর কে? প্রথমে মা মরলো, তার পরে বাপের বিষয় মরলো, ভাইপো হবেন জ্ঞাতি-শত্রু। এই মদে দাদার অপকার, আমার উপকার। এই বিষয়গুলো যে ব্যাপারী ব্যাটারা বেচে নেবে, তা ত প্রাণে সইছে না। দাদাকেও ফাঁকি দেওয়া চাই, ব্যাপারীগুলোকেও ঠকান চাই। ঘর মদ ধরেছে', সই করে নেবার ভাবি নি ; আজই হ'ক, কালই হ'ক, মর্টগেজ সই করে নিচ্ছি। ভাবনা হচ্ছে দ্রীর—তা তখন দেখা যাবে। মদ আমার সহায় ; ছুড়তে দেওয়া হবে না, আজই দাদাকে মদ খাওয়াতে হবে ; একবার দাদার কাছে যাই'।—তখন স্তম্ভিত হইয়া যাই। তার পর যতদূর অগ্রসর হইতে থাকি, ততই তাহার জুয়াচুরীর কার্য্যকলাপ দেখিতে পাই—তাহার জুয়াচুরীর শেষ নাই। মানবোচিত দুর্ব্বলতার একটুও লক্ষণ রমেশের চরিত্রে ফুটিয়া উঠে নাই। তাই রমেশ-চরিত্র অস্বাভাবিক। তাহার হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও অনুতাপ আসে নাই।

এক্ষণে আমাদের কল্পিত দ্বিতীয় কারণটী সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। যাহা অনুভূতির দ্বারা উদ্রেক করিতে পারে, তাহাকেই আমরা রস নামে অভিহিত করিয়া থাকি। আলঙ্কারিকদের মতে ইষ্ট নাশ হইলে ও অনিষ্ট ঘটিলে মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার নাম করুণ রস। শোকই করুণ রসে স্থায়ী ভাব। শোচাই ইহার একমাত্র অবলম্বন। করুণ রস উদয় হইলে মাথা হাত ইত্যাদি অবয়ব হইয়া থাকে। উদ্দীপন, অনুভাব, বৈবর্ণ্যনিষ্ঠা, ভূপাত, ক্রন্দন এইগুলি করুণ রসে প্রকাশিত হয়। বৈবর্ণ্য উচ্ছ্বাস, নিঃশ্বাস, স্তম্ভ, প্রলাপ, নির্ব্বেদ, মোহ, অপস্মার, ব্যাধি, গ্লানি, মৃতি ও ভ্রম এই লক্ষণগুলি করুণ রসে প্রতিভাত হয়। বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ-চিন্তা প্রভৃতি ব্যভিচারীর ভাবও ইহাতে প্রকটিত হইয়া থাকে।

গিরিশচন্দ্র আলোচ্য নাটকে শোকের দাবানল প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছেন। যোগেশের উন্মাদ দৃশ্যে 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!'—যে করুণ রসের চিত্র নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত করিয়া দেয়, তাহা অতুলন। মানুষ যতবড় কঠোরহৃদয় হউক না কেন, আমার বিশ্বাস, এই দৃশ্য দেখিয়া অন্ততঃ অলক্ষ্যে তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িবেই পড়িবে। উমাসুন্দরীর উন্মাদ-দৃশ্যের প্রলাপ বাক্যগুলিও বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে ; এ দৃশ্যও প্রাণের তন্ত্রীগুলিকে আঘাত দিয়া থাকে। যোগেশের স্ত্রী জ্ঞানদা ও তাহার মাতা উমাসুন্দরীর মৃত্যুর কারণ গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন; কিন্তু প্রফুল্লকে অকারণ মারিয়া ফেলিয়া নাট্যকার পাশ্চাত্য নাট্যরথীদের পদানুসরণ করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু আমাদের সাহিত্যের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ক্রমাগত দর্শকের চিত্তকে ঘা দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাদের চিত্তকে উন্নত করিতে পারেন নাই।

আমাদের বিশ্বাস 'প্রফুল্ল' নাটকের নামকরণ সার্থক

হইয়াছে—প্রফুল্লের দিব্য চরিত্রের মহিমায়। তাঁহারই চরিত্র-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বিষেপাগলা বুড়া মদন ঘোষ আপনার বাঁচিবার আশায় যে পাপাভ্যস্তটুকু লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা আনিয়া আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে যাদবকে রক্ষা করিবার জন্য অকাতরে দান করিয়াছিল। মৃত্যুশয্যায় শায়িত যাদবের 'কাকীমা, আমায় না খেতে দে কাকা মেরে ফেল' কথায় পাষাণহৃদয় গলিয়া যায়। রমেশ, কাঙালী ও জগদম্বি যখন বালক যাদবকে হত্যা করিবার জন্য লইয়া আসে, তখনকার চিত্রটা একটু আলোচনা করিয়া এই মহিমময়ী মহীয়সী মহিলা-শিরোমণি প্রফুল্লের আদর্শ হিন্দুমহিলার চিত্র বুঝিবার চেষ্টা করিব। স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি তাঁহার ছিল। স্বামীর বাক্য বেদবাক্য বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। শাশুড়ীকে মাতার ন্যায় যত্ন করিতে সর্ব্বদাই তাঁহাকে ব্যস্ত দেখি। একমাত্র বংশধর যাদবকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা দেখিয়া রমণী-হৃদয়ের কোমলতা বেশ অনুভব করিতে পারি। আবার তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাই। স্বামীর মঙ্গল-কামনা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত করিয়াছেন। বিরলবাক্ বধূর ভাব-কম্প উৎসাহিত হইয়া স্বামীকে ধর্ম্মের পথে চালিত করিবার জন্য, প্রতারণাময় সংসারে মহাপাতকের ভার লাঘব করিবার জন্য—স্বামীর হিতার্থে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কোমলে কঠোরে মিলিত হইয়া উজ্জ্বল-মধুর হইয়াছে। এই চিত্রের কতকটা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। জগদম্বি আসিয়া যখন যাদবকে তাহার বাড়ী লইয়া যাইতে চাহিল, তখন সিংহের ন্যায় রোষকষায়িতলোচনে গর্জ্জন করিয়া প্রফুল্ল বলিল—

'কে রে রাক্ষসি! মার কোল থেকে তার ছেলে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছিস্? তোর দয়া না, মায়া না, দূর হ। নরকে তোর মত যত পিশাচী আছে, একত্র হ'লে পারবে না;—দূর হ, দূর হ!

রমেশ। প্রফুল্ল তুই ছোঁ! কি কর্ত্তে এসেছিস্! এখান থেকে যা, ছেলের বড় ব্যামো, চিকিৎসা কর্ত্তে হবে।

প্রফু। তুমি এখনও প্রতারণা কচ্ছো? তোমার অধিক কি বলবো, তুমি আর কার জন্য এ সর্ব্বনাশ কচ্ছো? তুমি কার জন্য সহোদরকে পথের ভিখারী করেছ? কার জন্য কনিষ্ঠকে ভেসে দিয়েছ? কার জন্য বংশধরকে অনাহারে মেরে টাকা রোজগার কচ্ছো? তুমি কার জন্য গর্ভধারিণীকে পাগলিনী করেছ? শুনেছি তুমি বিদ্বান্, আমি অবলা স্ত্রীলোক, আমায় তুমি বুঝিয়ে দিতে পার, এ মহাপাতকে লাভ কি? পরকালের কথা দূরে থাকুক, ইহকালে কি সুখভোগ করবে? সদাশিব বড় ভাই মদে উন্মত্ত, মা পাগলিনী হয়েছেন, ছোট ভাই কয়েদ খেটেছে, বংশের একটী ছেলে অনাহারে মৃত্যু-শয্যায়। এ ছবি তোমার মনে উদয় হলে, তোমার জীবনে কি সুখ, আমি ত বুঝ্তে পাচ্ছি না।

রমে। দেখ্ প্রফুল্ল, ছোট মুখে বড় কথা কস্ নি; ভাল চাস্ তো দূর হ', নইলে তোরে খুন কর্বো।

প্রফু। তুমি কি মনে কর, আমি প্রাণ এত ভালবাসি যে, অবোধ নিরাশ্রয় বালককে রাক্ষসের হাতে রেখে প্রাণভয়ে পালাব? প্রাণভয়ে স্বামীকে পিশাচের অধম কার্য্য কর্ত্তে দেব? আমি ধর্ম্মকে চিরদিন আশ্রয় করেছি, ধর্ম্মকে ভয় করেছি, আমার প্রাণের অত ভয় নেই; নিশ্চয় জেনো—তোমার চেষ্টা বিফল হবে। সকল কার্য্যের শেষ আছে, তোমার কুকার্য্যের এই শেষ সীমা। ধর্ম্ম অনেক সহ্য করেছেন, আর সহ্য কর্বেন না, সতর্ক হও, আমি সতী, আমার কথা শোন; যদি মঙ্গল চাও, আর ধর্ম্ম-বিরোধী হ'য়ো না। তুমি কখনই এই শিশুকে বধ কর্ত্তে পারবে না।

রমেশ। প্রফুল্ল, দূর হ'—ভাল চাস্ তো দূর হ!

প্রফুল্ল। আমার ভাল কি! এ সংসারে আমার ভাল আর কি আছে? আমার ভাল আমি চাই নি, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমি এত দিন যা'র জন্য বড় অস্থির ছিলাম, আজ তোমার জন্য ব্যাকুল হয়েছি!

বাস্তবিক সতীর নিজের মঙ্গল ত কিছু নাই। স্বামীর মঙ্গলই তাঁহার মঙ্গল। সতীর ত আপনার পৃথক্ সত্তা কিছু নাই—তিনি যে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী।

পাপকর্ম্মে অভ্যস্ত রমেশের কাণে এসব কথা আদৌ ভাল লাগিতেছিল না—'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী'। সে রাগিয়া বলিল—'প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তোরে খুন ক'রে ফেল্‌বো; নয়ে যাবি তো যা!'

হারাণ। কাকীমা পালাও, তোমায় মেরে ফেল্‌বে। আমি মরি, তুমি পালিয়ে যাও।

বালকের বাঁচিবার সাধ নাই—সে জানিয়াছে, শমন তাহার শিয়রে বসিয়া রহিয়াছে। সে চায় তার কাকীমাকে বাঁচাইতে;—তাই প্রাণের আবেগে বালক বলিল, 'আমি মরি, তুমি পালিয়ে যাও'। সুনিপুণ চিত্রকর গিরিশচন্দ্র তুলিকার সামান্য ব্যবহারে যে চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রাণস্পর্শী। বালকের চরিত্রের বড় একটা দিক কয়েকটী অক্ষরে এমন ভাবে অঙ্কিত করা সামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। উত্তরে প্রফুল্ল বালককে কিছু না বলিয়া স্বামীর উদ্দেশে বলিতে লাগিল,—'তোমার কি প্রাণ পাষাণে গড়া? এই স্নেহপুতলী ছেলেকে না খাইয়ে মার্‌লে! ছি ছি ছি! তোমায় ধিক! তোমায় সহস্র ধিক! আমার কথা শোন, আমার মিনতি রাখ, আর মহাপাপকে লিপ্ত হ'য়ো না; আমি আবার বল্‌ছি, ধর্ম্ম অনেক সহ্য করেছেন, আর সহ্য করবেন না।

রমেশ। তবে মর! (প্রফুল্লর গলা টিপিয়া ধরণ, ক্রন্দনী ও জগদম্বিকার বাধা দেওয়া আক্রমণ)

(সেই মুহূর্ত্তেই সার্জ্জন, কমাণ্ডার, ইন্‌স্পেক্টার, পাহারাওয়ালার সহিত সুরেশ ইত্যাদির প্রবেশ)।

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো এসেছ? যেদোকে দেখো; আমার দিন ফুরিয়েছে, আমার জন্যে ভেবোনা, আমি যার জন্যে জোর করে প্রাণ রেখেছিলেম, আজ আমি নিশ্চিন্ত হলেম। আমি তোমার মাকড়ী দিয়েই সর্ব্বনাশ করেছিলাম, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর; আমি জান্‌তেম না, এ সংসারে এত প্রতারণা! ভগবান্ আমায় ভাল বাসেন বলে নিয়ে যাচ্ছেন,—যেখানে প্রতারণা নাই, সেইখানে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাঁর দুঃখিনী মেয়ে, অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি, আজ আমায় তিনি কোলে নিচ্ছেন! (রমেশের প্রতি) দেখ, তুমি স্বামী! তোমার নিন্দা কর্‌বো না; জগদীশ্বর করুন, যেন আমার মৃত্যুতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। তুমি বড় অভাগা—সংসারে কাহাকে কখন আপনার কর নি। আমার মৃত্যুকালে প্রার্থনা—জগদীশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করুন। ঠাকুরপো, অভাগিনীকে কখনও মনে ক'রো—আমি চল্লেম!

(মৃত্যু)

করুণ রস উদ্রেক করিবার জন্য যে সমুদায় উপায় গিরিশ চন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, এতক্ষণ তাহা সহ্য করিয়া যাওয়া যাইতেছিল। কিন্তু স্বভাব-কোমল বাঙ্গালীর হৃদয় আর সহ্য করিতে পারে না। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, আবার তাহারই পুনরুক্তি করিয়া বলি, ক্রমাগত মাথাইয়া আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি প্রতিক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে; এক্ষণে তাহারা একরূপ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য পদ্ধতি মতে এই প্রথার দোষ দেওয়া চলে না। সাহিত্যাচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুরের নব-প্রকাশিত 'বঙ্গের কথা ও দুঃখ-সাহিত্যে' আমার মতের পোষক কয়েক ছত্র পাইয়া

এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম • • অবশ্য শেক্সপিয়র যে তাঁহার হ্যামলেট নাটকের শেষাঙ্কে একত্র ছয় সাতটা হত্যা করিয়া গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের রীতি রক্ষা করিলেন, এবং কিং জনে যে বালক আর্থারের চক্ষু দুটি উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা দ্বারা তুলিয়া ফেলিবার জন্য উদ্যোগ চলিল -- তদ্বারা নাট্য-সম্রাট বৃথা শোক উদ্দীপনার চেষ্টা করিলেন • • • • । কারণ যে দুঃখ মনে শুধু ঘা দেয়, কিন্তু চিত্তকে উন্নত করে না—যে দুঃখ ত্যাগের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া নাই, এমন দুঃখ বর্ণনা করা আমাদের সাহিত্য-নীতির বিরুদ্ধ।" অবশ্য সাহিত্যাচার্য্যের বক্তব্যের প্রথম অংশ আমরা গ্রহণ করি—অর্থাৎ তাঁহার সহিত আমরা বলিতে চাই, বৃথা শোক-উদ্দীপনার চেষ্টা করা ভাল নয়;—আবার ক্রমাগত শোক-উদ্দীপনার চেষ্টায় সফলতা লাভ করা যায় না,—মনের স্থিতিস্থাপকতার একটা সীমা আছে স্মরণ রাখা উচিত। যে দুঃখ মনে শুধু ঘা দেয় চিত্তকে উন্নত করে না, সে দুঃখের বর্ণনা করা ভাল নয়। সকল জিনিষের একটা ফলশ্রুতি আছে। দুঃখের চিত্র দেখিয়া কি লাভ করিলাম, কি শিক্ষা করিলাম, তাহা দেখা উচিত। দুঃখ হইতে নিবৃত্তি লাভ করা ভাল চাই। যে দুঃখ সুখের সন্ধান বলিয়া না দিতে পারিবে, সে দুঃখ ভোগ করায় লাভ কি?

আলোচ্য নাটকে গিরিশচন্দ্র আর একটী অস্বাভাবিক রকমের নারী-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—জগমণি। এরূপ চরিত্র যে কদাচিৎ চক্ষে পড়ে না, তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালী ঘরে কাঙ্গালীর মত স্বামী নাই যে, অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাও বলিতে পারি না—তবে স্ত্রীর বড় বড় অত্যাচারগুলা সহ্য করা যে বড় সহজ ও স্বাভাবিক তাহাও ত মনে হয় না। আর জগমণির মত চরিত্র অঙ্কিত করিবার কোন উদ্দেশ্যও আমরা খুঁজিয়া পাই না।

রাত্তার জ্ঞানদার মৃত্যু-সংঘটনও অস্বাভাবিক হইয়াছে। কোন আশ্রয়ে তাহার মৃত্যু হইলে যে দৃশ্যটী কমনীয় রসাত্মক হইত, তাহা ত আমাদের মনে হয় না। জ্ঞানদার মত সতী সাধ্বী গুণবতী চরিত্রের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়।

যাদবের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছে তাহাও কতকটা অস্বাভাবিক। যখন বেলেস্তারার যন্ত্রণায় বালক ছট্‌ফট্ করিয়া 'জল' 'জল' চাহিতেছে তখনকার দৃশ্য মর্ম্মন্তুদ। বেলেস্তারা-প্রয়োগে প্রাণ-বিনাশের চেষ্টা কোন সাহিত্যে আছে কি না জানি না। মরণোন্মুখ বালকের কাতরোক্তিতে যখন রমেশ জগমণিকে বলিল, 'দাও একটু জল দাও' তখন জগমণি উত্তরে বলিয়াছিল, 'না না, তবু পাঁচ মিনিট যুঝ্‌বে।' মাতৃভ্রাতৃষা রমণীর মুখ হইতে শুধু কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির আশায় যে এত বড় নিষ্ঠুর কথা বাহির হইতে পারে, তাহা ধারণা করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। এই উত্তর শুনিয়া রমেশের মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না। পাঁচ মিনিট বাঁচিয়া থাকাও যেন তাহার অভিপ্রেত নয়। যাদব যখন উত্তরে বলিল, 'না আমি জল খেলেই মর্‌বো; না আমি জল খেলেই মর্‌বো; এই দেখ না, আমার গায়ে ইঁদুর-পচার গন্ধ বেরিয়েছে, আমায় কুকুরে চিবিয়ে খাচ্চে।' তখনও রমেশের মুখ হইতে—একটু জল দাও—কথাটা বাহির হইল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রমেশের হৃদয়ে দুর্ব্বলতার চিহ্ন কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি পূর্ব্বোক্ত 'দাও একটু জল দাও' কথাটা দুর্ব্বলতার চিহ্ন বলিয়া ধরা যায়, তবে কেবলমাত্র এই একস্থলেই তাহার দুর্ব্বলতা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু এ কথাও বলিয়া রাখা ভাল, সে দুর্ব্বলতা ক্ষণিক যদি জগমণির ও যাদবের কথা শুনিয়াও রমেশ জল দিতে চাহিত, যদি সে দুর্ব্বলতা তাহার ইচ্ছাশক্তি-নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা হইলে সে দুর্ব্বলতাকে দুর্ব্বলতা বলিতে পারিতাম। এ সাময়িক দুর্ব্বলতার কারণ—প্রত্যাবর্ত্তিক্রিয়া (Reflex action)। বাহিরের করুণ দৃশ্য রমেশের ইন্দ্রিয়

গ্রামে আঘাত করিয়া অন্তর্দাহী মানুষ সাহায্যে মুখ হইতে 'একটু জল দাও' কথাটা বাহির করিয়া দিয়াছে মাত্র। যখন সে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল, তখন তাহার চিন্তা করিবার অবসর ছিল না; আর তাহা না হইলে যখন চিন্তা করিবার অবসর পাইল, তখন কেন কথাটার পুনরুক্তি করিতে পারিল না।

প্রফুল্ল, উমাসুন্দরী, জানদা, পীতাম্বরের চরিত্র সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। মদন ঘোষের চিত্রও খুব স্বাভাবিক হইয়াছে। কাঙালীর ভাগিনেয় ভজহরির চরিত্র প্রফুল্লের চরিত্র মাধুর্য্য দেখিয়া একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল; তাই মরণ যখন যখন বলিল,—"প্রফুল্ল—প্রফুল্ল, তুমি কোথায়? সে, পাহারাওয়ালা জমাদার এসেছে, আমি আর কিছু ভয় করি নি। প্রফুল্ল, তোমায় বাঁচাতে পাল্লেম না, এই আমার দুঃখ রইল; আমি পাগল নই, আমি পাগল নই; ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর!"

তদুত্তরে উত্তরে বলিতে পারিয়াছিল,—'না, তুমি পাগল নও; আমিও মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, মা, তুমি এই পাগলকে মানুষ করেছ; কিন্তু মা, তোমার মৃত্যুতে যেন ভজহরির দুর্ব্বুদ্ধি দূর হয়। মামাবাবু, মামীমা, রমেশ বাবু, দেখ, আমি যদি জজ হ'তেম, তোমাদের মাপ কত্তেম; তোমরা যথার্থই অভাগা।'

ভজহরির সহিত আমরাও বলি, রমেশ তুমি বাস্তবিকই অভাগা। প্রফুল্ল-পরশমণির স্পর্শে তোমার হৃদয় যখন সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, তখন তুমি যে কি ধাতে গঠিত তাহা বুঝিতে পারি না।

(ক্রমশঃ)

দীক্ষা

(গল্প)

(শ্রীলীলা দেবী)

সেদিন বিকেলে পারিজাতদের ওখান থেকে বেড়িয়ে এসে শিউলি যেমনি বাড়ীতে পা দিয়েছে, অমনি তার মা ভিতর থেকে চেঁচিয়ে ব'ল্লেন, "ও শিউলি! তোর মাষ্টার মশায় যে কখন থেকে এসে ব'সে আছেন, এত দেরী ক'রে ফির্‌লি!

শিউলির মুখ তখন কোন একটা উচ্চ ভাবের প্রেরণায় ভারী উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল; মার কথা তার কাণেই গেলো কিনা সন্দেহ। তবুও অভ্যাসের বশে সে তাড়াতাড়ি পড়বার ঘরে ঢুকে অন্যমনস্ক ভাবে একখানা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে ব্যাকরণের সূত্রগুলি দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাষ্টার মশায়ের মুখ দৃষ্টির দিকে হঠাৎ চেয়ে ব'ল্লে,—"এত ব্যাকরণ ট্যাকরণ প'ড়ে কিই বা হয়?" মাষ্টার মশায়ের গম্ভীর মুখে একটু হাসি দেখা দিল; তিনি একটু অবাক্ হ'য়েই ব'ল্লেন, "হঠাৎ এ কথা? আপনারাই আবার বলেন, পুরুষরা মেয়েদের শিক্ষার পথ রোধ ক'রে রেখেছে—মেয়েদের যেই নূতনত্বের সখ্‌টা মিটে যায়—অমনি তাদের এই নির্ব্বোধ পদে পদে—"

শিউলি তাঁকে বাধা দিয়ে এর উত্তরে ব'লে ফেল্লে, "তা যাই বলুন আপনি, আমাদের দেশে যে গুরু শিষ্য সম্বন্ধটা ছিল, তাতে মানুষ যত সহজে জ্ঞান-সমুদ্র পার হ'তে পারতো, আজকাল এত মাথা ঘামিয়ে তার সিকিও পার হ'তে পারবে কি না সন্দেহ।"

মাষ্টার মশায়ের মুখটা আবার গম্ভীর হ'য়ে গেলো। রুমালখানা নিয়ে বেদার্দ্র ললাট মুছে ফেলে তিনি ব'লেন, "কেন, আজকালকার দিনেই যে ও সম্বন্ধটা বাদ প'ড়েছে, তাতো নয়—উপস্থিত তার প্রমাণ আমি আর আপনি।" মাষ্টার মশায়ের সংযত মনোভাব যৌবনের প্রাবল্যকে তবুও এড়াতে পারলে না; কথাটা ব'লে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শান্তিপূর্ণ সুন্দর মুখখানা আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। শিউলি তাড়াতাড়ি ব'লে, —"না—না, এ আর সে—অনেক তফাৎ—আকাশ আর পাতাল!—ধরুন, যেমন কালিদাস ব'লেছেন, বামন যেমন উচ্চ গাছের ফল পাড়ার মনো হাত বাড়ালে হাস্যাস্পদ হয়, আমরাও যদি তেমনি সেই গুরু-শিষ্যের অতুলনীয় স্নেহ-ভক্তি, নিষ্পার্থিব জ্ঞান-লিপ্সা ও জ্ঞান-সংকারের তুলনা নিজেদের মধ্যে ক'র্‌তে যাই, তাহ'লে আমাদেরও তাই হ'তে হবে।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ গুরুর গাম্ভীর্য্য, বয়োবৃদ্ধতা, সন্ন্যাস ও ত্যাগ যে শিষ্যের মনে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করে, তা পাশ্চিত্যদের ওখানে আর দেখে এলুম।"

"কি রকম?"

শিউলি এর উত্তর দেবার আগেই পাশের ঘর থেকে শিউলির মামা অনিল ব'লে উঠ্‌লো,—"রকম এই যে, সেই গুরুদেবের পাকা দাড়ী আছে, গেরুয়া-ছোপান কাপড় আছে, হয় তো দাঁতপড়া মুখ, টাক-ওলা মাথা, আমাদের শিউলি ভক্তিতে গদগদ হ'য়ে গলায় আঁচল দিয়ে এক লম্বা নাকখৎ দিয়ে ফেলে! বুঝ্‌লে চিরেন! তুমিও যেমন পাগল! দেখ্‌ছো না আজকাল তোমার ছাত্রীর মাথায় কতকগুলো ভয়ানক superstiton ভূতে পাওয়ার মত চেপে ব'সেছে?"

চিরেন্দ্রনাথ বসু অনিলের সাধারণ বন্ধু ও তার ভগ্নীর গুরু—অর্থাৎ মাষ্টার মশায়। বন্ধুর কথার উত্তর না দিয়ে চিরেন পাশ্চিত্যের ঘর তামুক খাগ্‌লো; কিন্তু বাদার কথার উত্তরে শিউলি এতই ভেতে গিয়েছিল যে, কিছা-বাঁধা চুলের রাশ এক হাত দিয়ে পিঠে। উপর সবিনে ফেলিয়ে ব'লে, "মামা! ওটা তোমার ভারী অন্যায়, আমার কিছুতেই সহ্য হয় না। তুমি যাকে জান না তার দোষ গুণ সম্বন্ধে বিচার করাটা নিতান্তই ক্ষুদ্র, হ'ক সে দাঁত-পড়া টাক্‌ওলা বা দাড়ীওলা যা কিছু—"

শিউলির ছোট বোন দিদির এই এক গারি বিশেষণের বাহুল্যতে সভানে-ফুল খেয়া বারান্দা থেকে খিল্-খিল্ ক'রে হেসে ব'লে উঠ্‌লো —"দিদির আর মাথাটা বড্ড গরম হ'য়ে গেছে।"

পাশের ঘর থেকে অনিল আবার চেঁচিয়ে ব'লে —"পাশ্চিত্যদের ওখানে আজ বোধ হয় খুব গরম মণ্ডা দেওয়া খাবার খেয়েছে তাই এত তেতে গেছে।"

লজ্জিত বিরক্তিকে উদ্যত ছাত্রীর মুখের দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি মাষ্টার মশায় ব'লে উঠ্‌লেন—"থাক্ না অনিল, কেন ওকে মিথ্যা বিরক্ত ক'রছ? সকলের মনের ধারণা যে একই রকম হবে তার কি কোন মানে আছে? ভিন্ন রুচির্হিলোকাঃ।"

পাতা খোলা বইখানা বন্ধ ক'রে শিউলি ব'লে—"আপনারও বোধ হয় আমার কথাটা ঠিক ক'রতে পারেন নি? আমি ব'লছি এই কথা যে, যেখানে শিক্ষক বা জ্ঞানদাতার মূর্ত্তি আপনাকে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা না করিয়ে ছাড়ে না, সেখানে মানুষ যে নিজেই নত হ'য়ে পড়ে।"

নতমুখেই মাষ্টার মশায় ব'লেন—"তাহলে পাশ্চিত্যের গুরুকে আমায় একবার দেখতেই হ'চ্ছে অধ্যাত্ম-বিদ্যাই বলুন আর অন্যান্য কলা-বিদ্যাই বলুন, গুরু শিষ্যের মধ্যে যদি অনৈক্য আসে বিশেষ আবার অধ্যাত্ম বিদ্যাতে এটা বিশেষভাবে অনুপেক্ষণীয়।" তাহলে কি তেমন কাজ হয়?

গালে হাত দিয়ে ভাবতে ভাবতে শিউলি ব'লে "আমি, যখন বড় হ'য়ে যব

নেবো, তখন কিন্তু অমনি কোন বৃদ্ধের কাছেই নেবো, —যাঁর পাকা চুলের শুভ্রতা মনকে একটা জ্ঞান-প্রবণতার চরণে আপনি প্রণত ক'রে তুল্‌বে।"

মাষ্টার মশায়ের মুখটা ঠিক দেখা গেলো না; এক রকম ফিরে দাঁড়িয়েই তিনি ব'ল্লেন—"সেটা আপনার অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ—নিশ্চয় ক'রে একেবারেই এখন ব'লে ফেল্‌বেন না।"

দু'বৎসর কেটে গেছে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের খাতিরে দাদার বন্ধুকে শিউলিও দাদা ব'লে ডাকে। মাষ্টার মশায়ের অতখানি গাম্ভীর্য্যও ধীরে ধীরে সরল মাধুর্য্যে পরিণত হ'চ্ছিল। শিউলির পরীক্ষার দিন এগিয়ে আস্‌ছিল, তাই মাষ্টার মশায়কে দু'বেলাই আস্‌তে হয়। অনেক সময় সারাদিনও কেটে যায়।

শিউলির বন্ধু পারিজাত বালবিধবা তাকে ইস্কুল-কলেজে পড়িয়ে শিক্ষা দেওয়া তার বাপমার সাধ। কলেজেই শিউলির সঙ্গে তার আলাপ। কিন্তু কেবল লেখা-পড়াতেই তো বিধবার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে না, ঠাকুর-দেবতার পূজার্চ্চনাও চাই; তা ছাড়া পারিজাতের বয়স হ'য়ে যাচ্ছে, তাই দু'বৎসর হ'ল পড়াশুনা ছাড়িয়ে কুলগুরু আত্মানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে পারিজাতের দীক্ষা নেওয়া হ'য়ে গেছে। এখন পারিজাতের বেশীর ভাগ সময় পূজা-র্চ্চনা, তীর্থ-ভ্রমণ ইত্যাদিতেই কেটে যায়। কলেজ ছাড়া সত্ত্বেও শিউলির সঙ্গে পারিজাতের বন্ধুত্ব অটুটই আছে,—পাশের বাড়ী যাওয়া-আসা, দেখা শুনা সর্ব্বদাই হয়। সেদিন সন্ধ্যা বেলা শিউলি এসে দেখে, পারিজাত আহ্নিক ক'রতে ব'সেছে। আহ্নিক শেষ হ'য়ে গেলে, সখীর হাত ধ'রে শিউলি ব'ল্লে—"সেদিন যে মন্ত্র নিয়েছিস্ কিছু ফল পেয়েছিস্?"

সখীর হাতখানি ছেড়ে দিয়ে পারিজাত ব'লে উঠ্‌ল—"আমার মাথা—ছাই পেয়েছি!" এই তাচ্ছিল্যভরা উত্তরে শিউলি সত্যই অবাক্ হ'য়ে গেলো। সে আবার প্রশ্ন ক'রলে—"অত বড় জ্ঞানী লোকটা তোকে কি কিছুই দেখাতে পারলেন না?"

—"তুই এ বিষয় কি বুঝ্‌বি শিউলি—মন্ত্র কি দিলেই হয়, না নিলেই হয়?"

—"তবে?"

—"তবে আর কি; বিধবার জীবনে যে কষ্ট সহ্য ক'র্‌তে হয়, তাই ক'রতে হবে—যতদিন বাঁচ্‌বো—সাধ-আহ্লাদও বুকের ভিতর চেপে রেখে জলে পুড়ে মর্‌তে হবে—এই আর কি!" পারিজাতের চক্ষু সজল হ'য়ে উঠ্‌লো। অনূঢ়া শিউলি বিধবার বেদনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হ'য়েও বন্ধুর ব্যথায় সমবেদনা দেখিয়ে ব'ল্লে, "তা তো জানি সখী, তবে কি না আমাদের দর্শন-বেদান্তে ব'লেছে যে, এ সবই মনের বিকার, আসল সুখ বা আনন্দ ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়াতে; তা সে পথ তো বিধবাদের জন্যেও খোলা আছে ভাই।"

—"পারিজাত একটা নিঃশ্বাস ফেলে ব'ল্লে—"সে কি আর আমাদের মত স্ত্রীলোকের জন্যে? আমাদের মন এখন পৃথিবীর সমস্ত রস প্রাণ-মন দেহ দিয়ে শুষে নিতে চায়, স্বর্গের অমৃত তার কাছে শূন্যতা মাত্র!"

শিউলি দৃঢ়স্বরে ব'লে—"আমি কিন্তু ভাই মনে ক'রেছি, চির জীবন কুমারী থেকে সেই শ্রেষ্ঠ আনন্দলাভ করবার চেষ্টা ক'রব, আর পরার্থে এ জীবন উৎসর্গ ক'রব।"

—"মন্ত্র তন্ত্র নিবি তো?"

—"নিশ্চয়ই! আমার কিন্তু তাই ইচ্ছে,—তোর গুরুর মতন অমনি খুব বুড়ো মানুষ, যাঁকে দেখলেই ভক্তি হয়—"

—"আচ্ছা বেশ তো—তুই যদি বলিস্, তা'হলে আমার গুরুকে চিঠি লিখে আনিয়ে নিতে পারি। তিনি খুব ভালো লোক; তোর মন্ত্র নিতে ইচ্ছে হ'য়েছে শুন্‌লে নিশ্চয়ই আস্‌বেন।"

—"দাঁড়া ভাই আগে এম, এ টা পাশ দিয়ে নি,

তার পরে তো কলেজ ছাড়বোই—তখন ঐ সব নিয়ে থাকা যাবে, তখন তাঁকে আন্‌তে লিখিস্।"

৩

পরীক্ষার আর একদিন বাকী আছে। বাড়ীতে শিউলি ও তার মাষ্টার চিরেন ছাড়া আর কেউই ছিল না। সমস্ত পড়া শেষ ক'রে উঠে দাঁড়াতেই শিউলি ব'লে—"বসুন না চিরেন দা। এরি মধ্যে উঠ্‌ছেন কেন?" ছাত্রীর এই আগ্রহাতিশয্যে আবার ব'সে প'ড়ে চিরেন ব'লেন "ব'সে আর কি হবে শিউলি!"

—"আমার একটু কথা আছে যে. বসুন আপনি! অনাসনষ্ট হবেন না. ঠিক্ শুনবেন কিন্তু!"

—"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই শুনবো, বলো তুমি!"

চিরেনের জ্ঞানদীপ্ত সরল মুখে আশা উৎকণ্ঠার অধৈর্য্য ফুটে উঠেছিল—না জানি শিউলি কি কথাই ব'লে ফেল্‌বে। নিজের মনকে তো বিশ্বাস নেই, তার উপর অনূঢ়া বালিকার প্রগল্‌ভতা হয় তো সংযমহীনতাকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেল্‌বে—কিন্তু চিরেনের এ আশঙ্কাকে সম্পূর্ণ রূপেই মুছে দিয়ে শিউলি ব'লে—"দেখুন, আমি ভেবে রেখেছি এবার পরীক্ষাটা হ'য়ে গেলে কলেজ তো ছাড়বোই তখন অধ্যাত্ম-বিদ্যা নিয়ে আলোচনা করা যাবে—কি বলুন?"

—"তা পাকা দাড়ীওলা গুরুটুরুর সন্ধান পেয়েছ না কি?"

—"যান্, আপনিও ঠিক্ দাদার মতন দুষ্টু হ'য়েছেন; খালি ঠাট্টা করেন।"

—"আচ্ছা, এবার আর ঠাট্টা ক'রব না। গুরু কোথায় পেলে বলো দেখি?"

—"ঐ পারিজাতদের সেই গুরু; তাঁকেই আমারো মনে ক'রেছি।"

—"তা বেশ তো! পারিজাতের আধ্যাত্মিক অবস্থা গুরুর কৃপায় কতদূর এগিয়েছে, সেটা আগে ভালো ক'রে জেনে নিও।"

—"পারিজাতের কথা ছেড়ে দিন্। তার এসব ভালোই লাগে না। এই অনিত্য সংসারের ভোগ-লালসাই সে সত্য ব'লে মনে করে; তাতে আর দীক্ষার ফল কি বলুন?"

—"হাঁ তা কতকটা বটে, কিন্তু তোমায় তো আমি আগেই ব'লেছি শিউলি, যে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধে শুধু ভক্তি শ্রদ্ধা থাকলেই চ'লবে না, দুজনে মিলে যাওয়া চাই; একাত্মা না হ'লে মন্ত্রের ফল ফলবে না, সাধনায় সিদ্ধি হবে না।" কথাগুলোর উত্তরে শিউলি শুধু একটা চোক গিলে ব'লে "আপনি এবার বিয়ে ক'রতে দেখে যাচ্ছেন বুঝি? দাদা সেদিন বলছিল।"

আকাশ অকাল মেঘে ঢেকে যাওয়ার মত চিরেনের প্রতিভাদীপ্ত মুখখানা কালো হ'য়ে গেলো। তিনি খুব আস্তে ব'লেন, "সেটা তোমার দাদার ভুল—আমার দেশে অন্য অনেক কাজ আছে।"

—"কি কাজ আমরা একটু শুনতে পাই না কি?"

ছাত্রীর মুখে সলজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে চিরেন ব'লেন—"আমাদের গ্রামের গরীব দুঃখীদের জন্যে বিনা বেতনের ইস্কুল মাষ্টারীর চেষ্টায় আছি। তা ছাড়া সময় পেলে নির্জ্জনে ব'সে নিজের কাজও একটু-আধটু করা যাবে;—তা ব'লে তোমার বিয়ের নেমন্তন্নটা ফাঁক যায় না যেন—"

—"বেশ লোক আপনি! Example is better than precept এ কথার অর্থ ব্যর্থ ক'রে দিতে চান্ না কি? আপনি যখন বিয়ের উল্টো পথে যাচ্ছেন, তখন ছাত্রীও তো সেই আদর্শই 'কপি' ক'রবে।"

—"এ কথা কেন ব'লছ শিউলি! পাশের পড়া তৈরীর মাষ্টারকে অত বড় সম্মানে দেবার কোনো মানে নেই। যথার্থই যে তোমার গুরু

হবে, তার আদর্শই অনুসরণ ক'রো। আমি তো তার যোগ্য নই।"

চিরেনের ব্যথিত মুখের দিকে চেয়ে লজ্জিতা শিউলি কথাটা বদ্‌লে নেবার ছলে তাড়াতাড়ি ব'লে —"তা আপনি যাই বলুন, আমার সঙ্কল্প আমি ছাড়্‌ছি না। জগতের সেবা ও বিশ্বের প্রেম আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে ফোটাতে চেষ্টা ক'রব। এ আপনারই শিক্ষা;—আপনিই তো আমায় এ সব শিখিয়েছেন।"

গায়ের শালটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়েই চিরেন ব'লেন,—"ও সব ভুলে যাও শিউলি; যিনি তোমার গুরু হবার জন্যে আস্‌ছেন, তাঁর জ্ঞানে নিজেকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলো।"

"কাল তা হ'লে আর একবার আস্‌বেন তো?"

"আর এসে কি ক'রব? আমার আসায় তো আর দরকার হবে না; আশা করি পরীক্ষাতে তুমি উত্তীর্ণ হ'তে পারবে।"

—"তা হলে আবার কবে দেখা হবে?"

—"তা তো ব'লতে পারি না শিউলি! এখন জন্মভূমি আমায় কর্ত্তব্যের ডাকে টান্‌ছে—সেখানে যে অনেক কাজ।"

বারণ্ডা ছাড়িয়ে চিরেন তখন বাগানের খানিকটা রাস্তা পার হ'য়েছেন; তাঁকে ফিরিয়ে শিউলি আবার ডাক্‌লে—"ও চিরেনদা! এখনি চ'লে যাবেন না—আর একটু কথা আছে।"

না-ছোড়-বান্দা ছাত্রীর পাল্লায় প'ড়ে অগত্যা চিরেনকে ফির্‌তে হ'ল। বাগানে দাঁড়িয়েই তিনি ব'লেন- "আজ আসি শিউলি! সন্ধ্যা হ'য়ে এলো —বাড়ীতে কেউ নেই—" তাঁর কথা শেষ হ'তে না দিয়ে শিউলি ব'লে উঠ্‌ল—"আজ কতদিনের মত চ'লে যাচ্ছেন, একটু মিষ্টি-মুখ না ক'রে যেতে পাবেন না। আমি যতক্ষণ না আসি, পড়ার ঘরে একটু ব'সুন, চলে যাবেন না বল্‌ছি, তা হলে তখনক—"

শিউলির অসমাপ্ত কথা আর শোনা গেলো না। সে তখন অন্দরের দোতালায় টপ্‌টপ্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে।

ছাত্রীর মিনতি সহজে এড়ান দুষ্কর; আর সেটা দেখায়ও অতি অভদ্র!—চিরেন আস্তে আস্তে ফিরে এসে পড়ার ঘরের সেই নির্দ্দিষ্ট চৌকিখানাতে আবার ব'সে প'ড়লেন। তখন সূর্য্যাস্তের রাঙা আলো ধীরে ধীরে আকাশের গায়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল। শিউলিদের বাগানের নারকেল গাছের মাথায় একজোড়া শালিক সারাদিনের সঞ্চয় চঞ্চুপুটে নিয়ে নীড়ে ফের্‌বার জন্য উন্মুখ হ'য়ে যেমনি ডানা মেলেছে, অমনি একপাল কাকের তাড়নায় সে নীরার তীরের মুখচুপ্‌ হ'য়ে মাটীতে প'ড়ে গেলো। তাই দেখে চিন্তাশীল চিরেনের বুক ফেঁপে একটা দীর্ঘশ্বাস বরবর ছড়িয়ে প'ড়ল—আহা! সারাদিনের সঞ্চয়! সারা জীবনের সঞ্চয়ও যে অনেক সময় অমনি ক'রেই নষ্ট হ'য়ে যায়! এর উত্তরে দার্শনিক চিরেন মনে মনেই জবাব দিলে—এতে তো দুঃখ করা উচিত নয়। "প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষায় যত্নবান হইও না"—এই তো ভগবানের বাণী। কাল থেকে আর পড়াতে আস্‌তে হবে না;—এ চিন্তা কেন তবে চিরেনের মনকে বার বার ব্যথাক্রান্ত ক'রে তুল্‌ছে? কাল থেকে সে শিউলির শিক্ষকতার দায় থেকে মুক্ত ব'লে সেই কালকের প্রভাত-সূর্য্য বুঝি চিরেনের পৃথিবী ব্যতীত অন্য সব স্থানে কিরণ ছড়াবেন? কালকের উষা চিরেনের জগতে শেফালিকার অভিনন্দনে আর আভনন্দিত হ'য়ে উঠ্‌বে না! নাঃ, এ চিন্তার নিরোধ কাটাতেই হবে—এর যে কোন মানেই নেই! কিসের দুঃখ!—কিসের বেদনা—আনন্দের সন্তান হ'য়ে!

চিরেনের চিন্তার ঢেউ কেটে বসন্ত-বাতাসের হিল্লোলের মত শিউলি ব'লে—"কি ভাগ্যি যে পালান নি। আমি ভাব্‌ছিলুম, বুঝি চ'লেই গেলেন—নিন্ একটু খান্।"

শিউলির মুখের দিকে উদাস দৃষ্টি নামিয়ে হস-সোল্লা খেতে খেতে চিরেন ব'লেন—"তোমার এই শেষ দিনের আতিথেয়তা জীবনে ভুলবো না।"

কথাটা যেন শুনতেই পায় নি এইভাবে শিউলি ব'লে—"আপনি যে ব'লছিলেন, গুরু-শিষ্যের মধ্যে একাত্মবোধ দরকার; তা কি ক'রে হ'তে পারে? ধরুন, গুরু নিশ্চয়ই বয়সে শিষ্যের পিতৃতুল্য হবেন, আর জ্ঞানে তো বটেই;—সেস্থলে একজনকে নীচে, অপরকে উপরে থাকতে হবেই। সমভাব না হ'লে তো একাত্মবোধ হয় না!"

একটু হেসে চিরেন ব'লেন—"কেন? বয়সে যে পিতৃতুল্যই হ'তে হবে, তার মানে কি? সমবয়সী হ'লে কি কোন ক্ষতি আছে?"

গোলাপী সাড়ীর আভাই বোধ হয় শিউলির গাল দুটি হঠাৎ লাল ক'রে ফেলে; সে কিন্তু এ ভাবের কথাটা মোটেই প্রশ্রয় না দিয়ে খুব গম্ভীর হ'য়ে ব'লে—"যা Out of Question তা নিয়ে তর্ক ক'রে কি হবে বলুন? সমবয়সীর সঙ্গে বন্ধুত্বই হ'য়ে থাকে; সমবয়সীর কাছে কেউ কখন জ্ঞানলাভ করতে যায় না। হাজার তিনি জ্ঞানী হন্ না কেন—তবু বয়সের অভিজ্ঞতা ব'লে জিনিষটা সম্পূর্ণ আলাদা।"

"কিন্তু এটাও ঠিক্ জেনো শিউলি—বন্ধুর কাছে তোমার মনঃপ্রাণ যেমন উন্মুক্ত ক'রে দেখাতে পারো, বয়োবৃদ্ধ গুরুজনের কাছে তুমি তা পার না। নিজের প্রাণ যেখানে দিবালোকের মত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হ'য়ে না উঠেছে, সেখান থেকে প্রাণের মধ্যে কিছুই পৌঁছুবে না—হাজার জ্ঞানীর জ্ঞানদীপ্তি ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে আসবে। প্রাণের সেই নিভৃততম স্থানটী—যেটা তুমি অসঙ্কোচে, অবাধে খুলে ধরেছ সেইখান থেকেই আলো এসে পৌঁছুবে।"

"—এটা যে আমি কিছুতেই ধারণা ক'রতে পারছি না চিরেন দা! যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, আজ্ঞাবহতা, পূজনীয় বয়োবৃদ্ধের প্রতি সম্ভব, একবয়সী বন্ধুর কাছে সেটা কি কখন সম্ভব হ'তে পারে?"

"এর উত্তর আমি এখন তোমায় দেবো না, পরে তুমি নিজেই বুঝ্তে পারবে। এখন শুধু তোমায় জিজ্ঞাসা করছি—তা যদি হ'ত, তা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সখা হ'য়ে গুরু হ'লেন কেন? আর যাঁরা তাঁকে এত ভক্তি-শ্রদ্ধা ক'রতেন, এমন কি যুধিষ্ঠিরকে পর্য্যন্ত না দিয়ে সমস্ত গীতাটা অর্জ্জুনকেই ব'লেছেন কেন? অথচ অর্জ্জুনের সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের রহস্য-পরিহাস একাত্ম-সখ্যতার প্রমাণ যে আমরা পুরাণে পাই।"

(আগামী বারে সমাপ্য)

ভিখারিণী

(চিত্র)

[শ্রীমনোলেখা দাসী]

সেদিন আকাশটা ছিল মেঘের ভারে থম্‌থমে। সারা আকাশের গায়ে কে যেন কালী মাখিয়ে দিয়েছে।

যখন বাহিরের অবস্থা এই রকমের, তখন রাস্তায় বেরিয়ে পড়্লাম। আসন্ন বৃষ্টির উপক্রম দেখে যে যার ক্রত আশ্রয়ের জন্য ছুটতে লাগ্‌ল। পাশের বাড়ীর এক একটা ঝাপ্‌টা এসে রাস্তার পথিকদের মধ্যে বেশ একটা বিপ্লব বাধিয়ে

ভুগ্‌ছিল। এমন সময়ে দেখি, একটি ভিখারিণী গাছের তলায় বসে করুণ-স্বরে বিলাপ কর্‌ছে। সে বিলাপে যেন বিশ্বের সব গোপন ব্যথা, সব হাহাকার ফুটে বেরুচ্ছে!

নিকটে গিয়ে বল্‌লাম,—তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?

সে কেঁদে বল্‌লে, আমার স্বামীকে খুঁজে পাচ্ছি না—কোথায় হারিয়ে গেছে।

—তোমরা কোথায় থাক?

আমাদের ত ঘরদোর কিছুই নেই বাবা—পথে-পথে ভিক্ষে করে বেড়াই;—আর যেখানে-সেখানে মাথা গুজে পড়ে থাকি।

এমন ক'রে কথাগুলি সে বল্‌লে যে প্রাণের ভিতর তা তীরের মত তীক্ষ্ণ ভাবে বিঁধ্‌ল।

—তা' হ'লে এখন এই গাছতলায় বসে কি ক'র্‌বে?

কি আর ক'র্‌ব বাবা! যতক্ষণ না তাকে পাই, এই গাছতলায় বসে থাক্‌ব!—

একে ভীষণ দুর্য্যোগ, তায় আবার গাছগুলিও একটা বিরাট অন্ধকারের চাদর কোরে তুলেছিল। নীড়হারা পাখীর দল অপরের বাসায় আশ্রয় নিয়ে আর্ত্তস্বরে চীৎকার ক'র্‌ছিল; মাঝে মাঝে তাদের পক্ষ-সঞ্চালনের শব্দও বাতাসে ভেসে আস্‌ছিল। আবার কেউ-কেউ সঙ্গীহারা হ'য়ে থেকে-থেকে ব্যথিতের মত গুম্‌রে উঠ্‌ছিল।

ভাব্‌ছিলাম, এখন একে একা এই অবস্থায় ফেলে যাওয়া সঙ্গত হ'বে কি না—

কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বল্‌লাম—আমার সঙ্গে চল আমার বাসায়,—তারপর না হয় তোমার স্বামীকে খোঁজা যাবে। এখন এই দুর্য্যোগে ত তার সন্ধান পাওয়া যাবে না।

মিনতির সুরে সে বল্‌লে, না বাবু, আমি এখান থেকে যাব না;—সে যে অন্ধ, চোখে দেখ্‌তে পায় না!

—এই দুর্য্যোগের মধ্যে তোমার মত সেও কোথায় একটু স্থান পেয়েছে—তার জন্য ভাবনা কি?

—না বাবু, তা হয় না; আমাকে না দেখ্‌লে তার বড় কষ্ট হবে।—এই বলে সে তার জীর্ণ বসনের প্রান্ত দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিল।

অগত্যা তাকে নিয়ে সারা নগরের রাস্তা ও গলি ঘুঁজন কোরে বেড়ালুম, কিন্তু কোথায়ও তার স্বামীর সন্ধান পাওয়া গেল না।

সে হতাশ চোখে পড়্‌ল এবং কাঁদতে কাঁদতে বল্‌তে লাগ্‌ল,—বাবু, সে অন্ধ—তার যে দুটী চক্ষু নেই। আহা বেচারা, কোথায় পড়ে গিয়ে না জানি কত কষ্টই পাচ্ছে! তার চোখ দুটো মুক্তোর মত টল্‌টলে অশ্রুতে ভ'রে গেল।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লাম,—এখন ত তাকে পাওয়া গেল না, দু'দিন বাদে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তুমি আমাদের বাসায় চল—কাল না হয় আর একবার ভাল কোরে খোঁজা যাবে।

—না বাবু, আমি আর কোথাও যাব না—এই গাছতলাতেই বসে থাক্‌ব। যতদিন না সে ফিরে আসে, আমি তার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাক্‌ব। সে যে আমা বই আর কাকেও জানে না—সে যে নিতান্তই অসহায়।

তার এই কথা শুনে আমার চোখ দুটী জলে ভরে গেল।

* * *

ক'দিন আর আমার কোন খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ একদিন সেই ভিখারিণীর কথা মনে পড়ে গেল; আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম।

সেই গাছতলায় গিয়ে দেখি—সেই ভিখারিণী তেমনি ভাবেই তার স্বামীর জন্য পথ চেয়ে বসে আছে! আমার মনে হল,—আমি না মানুষ, আমার অন্তরেও না ভগবানের রাজ্য বিরাজ কর্‌ছে! আমি কি করে তার এই বিপদে ভুলে ছিলাম!

অপরাহ্নের মত তার সাম্নে গিয়ে বল্লাম, স্বামীর কোন সন্ধান পেলে ?

হঠাৎ চম্‌কে উঠে সে বল্লে—না বাবু, এখনও সে আসে নি ! আজ সে নিশ্চয়ই আস্‌বে।

তার পূর্ণ একাগ্রতা দেখে আমি মুগ্ধ হোয়ে গেলাম। সহানুভূতিপূর্ণকণ্ঠে বল্লাম,—চল আজ সহর ছেড়ে মাঠের দিকে যাই—যদি সেখানে তোমার স্বামীর কোন সন্ধান মেলে।

পথে যেতে যেতে যখনি দুই চারিজন লোককে একসঙ্গে দেখি, তখনি মনের মধ্যে যেন কি রকম কোরে ওঠে, মনে হয়, বুঝি এইবার নিতান্তই তার দেখা পাব।

এই রকম কোরে তাকে কত খুঁজ্‌লাম—কত আশা নিরাশায় পূর্ণ হোয়ে গেল, তথাপি তার কোন সন্ধান মিল্‌ল না। যখন ক্লান্ত পা দু'টী পথশ্রমে অবশ হোয়ে পড়ে, ভিখারিণীর তখন তার বিষণ্ণ মুখখানি তুলে বলে, বাবু ! আমার কি হবে ?

তার এই বুকচেরা কথার উত্তর আমার মুখদিয়ে বেরোয় না ; আমি কেবল নীরবে তা শুনে যাই। আমার এই একান্ত স্বামীগত প্রাণা ভিখারিণীর জন্য অন্তরে একটা দারুণ ব্যথা জেগে ওঠে।

• • • •

একদিন খবর পেলুম—কোন এক বিজন মাঠের পাশে একটি অন্ধ ভিক্ষুক মৃতাবস্থায় পড়ে আছে। শুনে তার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ল। সে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে গেল !

আহা সতীসাধ্বী নারী ! এত দিনে তার পথ-চাওয়ার শেষ হোল—সে বুঝি মরণের মাঝে আরও নিবিড় কোরে তার স্বামীর সন্ধান পেলে !

নেপালীদের বিবাহ-প্রথা

(শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার বি, এ, বিদ্যাবিনোদ)

গুর্খালিগণের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিধান অনুসারেও অনেক যুবক-যুবতীর বিবাহ সংঘটিত হইয়া থাকে। পাহাড়ে স্ত্রী-অবরোধ প্রথার প্রচলন না থাকায়, অবিবাহিতা যুবতীগণ প্রায়ই সম-বয়স্কাদিগের সহিত হাটে-বাজারে বেড়াইতে যাইয়া থাকে। কোন যুবক কোন যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইলে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া কৌশলে তাহার মন হরণ করে, এবং তাহাকে নানা প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া নিজ গৃহে লইয়া যায়।

পিতামাতার অজ্ঞাতসারে যাহারা এইরূপ ভাবে গোপনে প্রণয়ীর সহিত পলায়ন করে, তাহাদিগের আর শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হইতে পারে না, এবং কন্যাও পিতার আমন্ত্রণ ব্যতীত পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিতা হয়। কন্যা যদি স্বজাতীয় কোন যুবককে আত্মদান করে, তাহা হইলে পিতা কন্যা-জামাতাকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া উভয়ের কপালে "দধি ও চাউলের" টীকা পরাইয়া দেন, এবং তাহারা মস্তক অবনত করিয়া "ধোক দিনু," বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করে।

নেওয়ারগণের বিশ্বাস এই যে, অবিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে রজঃস্বলা হইলে পিতামাতার দেহে পাপ স্পর্শ করে। এইজন্য কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলেই একটী বিল্বফলের সহিত তাহার উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়। পরে কন্যা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সুবিধা মত কোন উপযুক্ত পাত্রের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করা হইয়া থাকে। তখন বিল্বফলটিকে জলে

নিক্ষেপ করা হয়; এবং ইহাদিগের বিশ্বাস এই যে ফলটি অনন্ত কাল সলিলগর্ভে অবস্থান করে।

এই সংস্কার অনুসারে নেওয়ার রমণীগণ কখন বিধবা হয় না; এক স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহারা স্বচ্ছন্দে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে।

হিন্দু জাতির বিবাহ-প্রথা একটু বেশ নূতন রকমের—"Rowautic" তাহা বেশ কোন হিন্দু যুবক কোন অবিবাহিতা হিন্দুযুবতীর রূপে মুগ্ধ হইলে সে সেই যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া রস-সঙ্গীত গাহিতে থাকে। সঙ্গীত-নৈপুণ্যে যুবতীর নিকট পরাজিত হইলে যুবক সে স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে; অন্যথায় যুবতীকে বিবাহার্থ বন্দিনী করিয়া গৃহে লইয়া যায়। বিবাহান্তে যুবতী বিজেতার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পিতৃ গৃহে প্রত্যাগমন করে। কয়েকদিন পরে "পরমি ঘটক আর মদ্য, রৌপ্য মুদ্রা ও শূকর শাবকের মৃত দেহ' ইত্যাদি উপঢৌকন সঙ্গে লইয়া কন্যার গৃহে উপস্থিত হয়। তখন কন্যার পিতা অথবা কোন গুরুজন অতিমাত্র ক্রোধের ভান করিয়া ঘটককে প্রহার করিতে উদ্যত হন। ঘটক নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করে, এবং কন্যার মূল্য স্বরূপ কিঞ্চিৎ রৌপ্য মুদ্রা ও একটি শূকর প্রদান করিয়া কন্যাটিকে তাহার হস্তে অর্পণ করিতে অনুরোধ করে।

হিন্দু যুবক-যুবতীর "কোর্টসিপ" করিয়াও বিবাহ হইয়া থাকে। যুবক যদি যুবতীকে অবশ্যই বিবাহ করিবে এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে যুবতীর পিতা যুবক-যুবতীর ঘনিষ্ট ভাবে মেলামেশায় কোনরূপ বিশেষ আপত্তি করেন না।

দিদিমার কাশীবাস

(গল্প)

(শ্রীআশুতোষ সান্যাল)

আমার দুই মামা—কালাচাঁদ ও লালচাঁদ। মায়ের আপন ভাই না হ'লেও লোকে জানত, তাঁরা দিদিমারই ছেলে। দিদিমা ছিলেন খুব বড় লোকের একমাত্র মেয়ে। গরীব হ'লেও বিদ্যাবুদ্ধিতে প্রখর দেখে দিদিমার বাবা আমার দাদামশাইকে ঘর-জামাই রেখেছিলেন এবং মরবার সময় সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দিদিমার নামে উইল ক'রে, দাদামশাইকে তার ট্রাষ্টি নিযুক্ত করে যান। দিদিমাও সকল বিষয়ে এমন বুদ্ধিমতী ছিলেন যে, অত বড় বিদ্বান্ দাদামশাই তাঁর কাছে ছিলেন—কলের পুতুলটি। লোকে দাদামশাইকে বৈদ্য বলতে ছাড়ত না—কিন্তু তিনি তা হেসেই উড়িয়ে দিতেন। বৈদ্য তিনি আদৌ ছিলেন না;—তবে, যাকে গুণবন্ত বলে তাই; আর সেটা শুধু দাদামশাই কেন—যারা দিদিমাকে জানত, তারাই তাঁর সুখ্যাতি করত। সংসারের খুঁটি-নাটি হ'তে আরম্ভ ক'রে দাদামশায়ের হাইতোলায় তুড়ি দেওয়া পর্য্যন্ত দিদিমাই বরং দাদামশায়ের একটু বেশী পক্ষপাতী ছিলেন। সাংসারিক সকল বিষয়ে দয়া, মায়া দেখাতে তিনি যেমন অদ্বিতীয়া ছিলেন, তেমনি গাম্ভীর্য্যেও তাঁর কাছে সকলেই পরাজিত ছিল। বাড়ীর কুকুর বিড়াল হতে—দাদামশাই পর্য্যন্ত সবাই তাঁকে ভালও বাসত যেমন, ভয়ও করত তেমন! বড় লোকের একমাত্র কন্যা, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হ'লেও দিদিমার

ঠাকুর-দেবতার উপর অচলা ভক্তি ছিল। তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে কোনটিকে যে তিনি মানতেন না, সেটা বলা বড় কঠিন। একালের লেখাপড়া না জানলেও—তাঁর বাপের কাছে সংস্কৃত, বাঙলা প্রভৃতি শিখতে তিনি অবহেলা করেন নি; তা ছাড়া—মহাভারত, রামায়ণ, গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। সর্ব্ব বিষয়ে অসাধারণ গুণসম্পন্না হ'য়েও দিদিমার একটা বিষয়ে বিশেষ অভাব ছিল—সেটা তাঁর রূপ। আর সেই জিনিষটার অভাবই বোধ হয় দাদামশায়ের চরিত্র সম্বন্ধে যখন নানা কথা রটে হ'য়ে পড়েছিল, তখন ধৈর্য্যশীলা দিদিমা সে বিষয়ে দাদামশাইকে একটিও প্রশ্ন করেন নি। বরং, সেটা নিজের ত্রুটী বিবেচনায় নানা যুক্তিতর্কে নিজের মনকে বুঝিয়েছিলেন।

দিদিমার সন্তানের মধ্যে ছিলেন আমার মা। অত্যন্ত আদুরে মেয়ে হ'লেও, এবং পাড়া-পড়সী, আত্মীয়-স্বজন সহস্র যুক্তিতর্কে বোঝাতে চেষ্টা করলেও—ঘর জামাই রাখার প্রস্তাবে দিদিমা রাজী হন নি। তবে ইচ্ছা করলেই যেন সাক্ষাৎ হয় তাই কলকাতাতেই—ভাল ঘর দেখে কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। কন্যার বিবাহের বছর কতক পরেই দাদামশাই—মত আদরের দিদিমাকে চিরদিনের মত ছেড়ে চলে গেলেন। দাদামশায়ের মৃত্যুর পর কিছুদিন তীর্থে তীর্থে বেড়িয়ে দিদিমা যখন কলকাতায় ফিরে এলেন, সেই সময় দিদিমার এক দূর-সম্পর্কীয়া ভগ্নীর দুঃসংবাদ পেলেন। দূরসম্পর্কীয়া হলেও এই ভগ্নীটি ছিলেন দিদিমার বাল্যসখী। দিদিমার পিতাই তাঁর এই পিতৃমাতৃহীনা ভ্রাতুষ্পুত্রী-টিকে লালন পালন করেন, পরে এক কুলিন পণ্ডিতের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। কপাল মানুষের সঙ্গে সঙ্গে যায়, তাই বিবাহের পর দুইটী সন্তানের জননী হ'য়ে, তিনি বিধবা হন। যতদিন সম্ভব, পুত্র দুটিকে প্রতি-পালন করতে, কারুর কাছে তিনি হাত পাতেন নাই; কিন্তু কলসীর জল ক্রমাগত পান করলে কত-দিন থাকে? স্বামীর সঞ্চয় নিঃশেষ হয়ে গেলে, বিধবা বড়ই কষ্টে পড়লেন। কিন্তু সংসারে আপনার বলতে কেউ ছিল না, বিশেষতঃ স্বামীর ভিটে ছেড়ে যাওয়াও বড় কষ্টকর। তাই স্বামীর বংশধর দুটিকে মানুষ করবার যে ইচ্ছা এতদিন হৃদয়ে বদ্ধমূল ক'রে নিজের দেহপাত ক'রেও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর-ছিলেন, অদৃষ্টের চক্রান্ত পাক ঘুরেই সব পণ্ড করে দিল। ক্রমাগত পাঁচ ছয় মাস ম্যালেরিয়ার ভুগে বিধবা একেবারে অকর্ম্মণ্যা হয়ে পড়লেন। আবার অসুখের শেষের কিছু দেনা করতে হয়েছিল। কাজেই তা শোধ করতে তাঁর শেষ সম্বল স্বামীর ভিটাটুকুও বাধা-বাধা হ'ল। ভবিষ্যতের যবনিকা সরে গিয়ে এক বিরাট ধ্বংস এসে তাঁর সুমুখে দাঁড়াল। নিরুপায় হ'য়ে তিনি অবশেষে তাঁর বাল্যসখী—দিদিমার কাছে পত্র লিখলেন।

দিদিমার প্রাণও সহজ ছিল না। বাল্যসখীর দুরবস্থার সংবাদ তাঁর প্রাণের মধ্যে আঘাত করল; করুণাময়ী তাঁদের আনবার ব্যবস্থা করলেন।

দিন কয়েক পরেই ছোট দিদিমা তাঁর দুই শিশু-পুত্রের হাত ধ'রে দিদিমার আশ্রয়ে এসে দাঁড়াতে দিদিমা সাদরে তাঁদের বুকে টেনে নিলেন। বছর ঘুরতে-না-ঘুরতে ভগ্নস্বাস্থ্য ছোট দিদিমা তাঁর পুত্র দুটিকে দিদিমার কাছে গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজলেন। ছেলে দুটিকে মানুষ করবার ভার দিদিমার ওপর পড়ল। পাকে-চক্রে সন্ন্যাসিনী দিদিমাকে আবার সংসারের সুখ-দুঃখে দৃষ্টিপাত করতে হ'ল। দিদিমার সেই দুই বোনপো—আমার দুই মামাতুল।

(২)

কালুমামা বড় হ'লেও লালুমামার বুদ্ধির ওজন ছিল বেশী। অত বড় পণ্ডিতের ছেলে হ'লেও আমাদের বিদ্যার ঘর ছিল একেবারে শূন্য। লালু-মামা—তবুও দিন কতক স্কুলে গিয়েছিলেন, কিন্তু কালুমামা মা সরস্বতীকে দেব-দেবীর মধ্যে গণাই

করতেন না। কাজেই তাঁর বিদ্যাভ্যাস 'ভয়ে ভয়ে' হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক কেউ না থাকায়, দিদিমার শান্তীয়কে মামারা যেমন ভয় করত না। বিশেষতঃ, এই পিতৃমাতৃহীন বালকদ্বয় যত বড় দুর্দ্দান্তই হোক্ না কেন—দিদিমার মাতৃহৃদয়ের অতৃপ্ত বাসনা তাদের শাসনে বাধা দিত। মামারাও যখন দেখ্‌ল যে, দু ফোঁটা চোখের জলে দিদিমার সব কঠিনতা ধুয়ে যায়, তখন তারাও সেইটাই তাদের পাওপাত অস্ত্র করে নিল। লাভের মধ্যে উভয়েই অল্পদিনের মধ্যে দশের কাছে বর্ণামার্ক ট্রেড্‌মার্ক পেয়ে পাড়ার এবং সুবিধামত যে পাড়ার ছেলেদের মুরুব্বি হয়ে দাঁড়াল।

পাড়ায় একটা হিন্দুস্থানীদের কুস্তির আখড়া ছিল; দু ভাই সেখানে কুস্তি করতে যেত; এবং সেই সব ছোট লোকদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে মামাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনতে শুনতে সময় সময় দিদিমা অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌তেন। অনেক ভেবে চিন্তে দিদিমা কালুমামাকে একটা কয়লার দোকান করে দিলেন। কালুমামা আমার বাবাকে ধ'রে একটা সওদাগরী আফিসে চাকরী ঠিক করে নিয়েছিল। কাজে ঢুকে, অত্যাচার অভিযোগগুলা কমল বটে; কিন্তু নূতন উপসর্গ এসে জুট্‌ল।

আগে নগদ পয়সা হাতে পড়্‌ত না; এখন হাতে পয়সা পেয়ে দুজনেই অল্পদিনের মধ্যে মাতাল হ'য়ে দাঁড়াল। প্রথম-প্রথম বয়লার দোকানেই আড্ডা জম্‌তো,—কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দিদিমার অগোচরে বাড়ীতেও সময়ে সময়ে চল্‌তে লাগল। এই সময় একদিন গঙ্গার ঘাটের পরিচিতাদের মধ্যে এক কন্যাদায়গ্রস্তা বিধবা দিদিমাকে ধরে বস্‌লেন—কালুমামার সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতেই হবে। অনেক ক'রেও দিদিমা তাঁকে বোঝাতে পার্‌লেন না যে, ছেলের স্বভাব চরিত্র যেরূপ, তাতে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। অবশেষে বিধবার কাতর আবেদনে দিদিমার প্রাণ গলে গেল; তিনি গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে শপথ করলেন, তাঁর কন্যাকে বধূরূপে গ্রহণ করবেন।

বিবাহের কথায় কালুমামার খুবই উৎসাহ দেখা গেল। খুব ধুমধাম ক'রে সেই মেয়ের সঙ্গে কালুমামার বিবাহ হয়ে গেল।

বিয়ের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত কালুমামার হাবভাব দেখে দিদিমা এবং পাড়ার লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লে। কিন্তু ছাইচাপা আগুন—পুনরায় স্বরূপ প্রকাশ হ'তে বেশী দেরী হ'ল না। দাদার বিয়ে হওয়ায়, কালুমামাও জেদ ধ'রে বস্‌ল—বিয়ে করবে। একজনের বিবাহ দিয়েই দিদিমা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন, দুজনের বিবাহ হলে,—এবং যদি বধূদের বনিবনা না হয়—তা হলে, তাঁকে যে শীঘ্রই সংসারের শেষ বন্ধনটুকু কাটাতে হবে, তা দিদিমা বেশ জান্‌তেন। তাই, কালুমামার কথায় তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। কিন্তু করুণাময়ী দিদিমার স্নেহের বন্যা উথ্‌লে উঠ্‌তে কতক্ষণ! কালুমামার অশ্রুসিক্ত নিবেদন শীঘ্রই তাঁর মতের পরিবর্ত্তন করে দিল।

বাঙ্গলা দেশে মেয়ের অভাব নেই,—তা সে যেমন ছেলেই হোক্। দিদিমার সামান্য চেষ্টাতেই কালুমামার অদৃষ্ট প্রসন্ন হ'ল। একদিন শুভলগ্নে তারও বিবাহ হ'য়ে গেল।

(৩)

মানুষের সব চেয়ে পিচ্ছিল হচ্ছে—সংসারের প্রবেশ-পথ। বিবাহের পূর্ব্বে যে যত লাফালাফিই করুক্ না কেন - পরে কিন্তু সাবধানে পা টিপে না চল্‌তে পার্‌লেই পতন অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ এই সময়টায়, স্বার্থপর সংসার যখন তার রাঘবমুকের রক্তে রঞ্জিত পক্ষ বিস্তার ক'রে মানুষের সমুখে ভেসে উঠে, তখন দুর্ব্বলপ্রাণ মানুষের বুদ্ধি বিবেচনার ধাঁধাঁ লেগে যায়। বিবাহের পর মামাদের চরিত্রেও পরিবর্ত্তন দেখা দিল।

কালুমামা ছিল সাদা প্রাণের লোক। ভাব-অভাব রেখে ঢেকে বলতে বা করতে জান্‌ত না।

সংসারে এক দিদিমা ছাড়া কাউকেই সে ভয় বা ভক্তি করত না। স্বার্থান্বেষী লালুমামার কূট স্বভাব কালুমামার প্রতিকার্য্যে অবিরত বা'র হ'য়ে তাকে মহা বদ্‌রাগী ক'রে তুলত। একেই ত তিনি ছিলেন গোঁয়ার গোবিন্দ প্রকৃতির লোক, তার ওপর লালুমামার প্যাঁচোয়া বুদ্ধির খুঁটি নাটি তাঁকে সময় সময় একেবারে ক্ষেপিয়ে দিত। সে সময় এক দিদিমা ছাড়া তাকে শান্ত করতে দুনিয়ায় আর কেউ ছিল কি না সন্দেহ। মামাদের এই নিত্য-নৈমিত্তিক বিবাদ-বিসম্বাদের মূলে মামীরা আছেন, একথা লোকে বললেও—দিদিমা বিশ্বাস করতেন না; কারণ, সে বেচারীরা মামাদের কাণ্ড কারখানা দেখে সর্ব্বদা ভয়ে কাঁটা হ'য়ে থাকত। বিশেষতঃ, বড় মামী—'মাটির মানুষ' বলে কথার সার্থকতা তাঁতেই দেখেছি। মেজ মামী লোক মন্দ ছিলেন না, তবে রঙ্গ-রোষে ইদানীং তাঁকে একটু কেমন কেমন ঠেকত। সাধারণতঃ দেখা যায়, জায়ে-জায়েই ঝগড়া-ঝাটি হয়, কিন্তু মামাদের ছিল স্বতন্ত্র। তাঁরাই এ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন।

বিধবা হবার পর হতে দিদিমার সংসারের উপর আকর্ষণ খুব কমই ছিল। এমন কি, তাঁর একমাত্র কন্যা আমার মা—তাঁর কথাই মাঝে মাঝে ভুলে যেতেন। মাকেই বরং মাঝে মাঝে দিদিমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হ'ত যে, তাঁর মেয়ে বেঁচে আছে। সেই দিদিমা বড় আশা ক'রেই মামাদের নিয়ে সংসার পেতে-ছিলেন। কিন্তু ভগবান যাঁর কপালে মোটা অক্ষরে সন্ন্যাসিনী লিখে দিয়েছেন—তাঁর প্রতি সংসারের সুদৃষ্টি পড়বে কেন! বিধাতার ওপর কলম চালাতে গিয়ে দিদিমা হাড়ে হাড়ে বুঝলেন, সংসারের সুখ তাঁর অদৃষ্টে নেই।

মামাদের কলহ দিদিমাকে ক্রমেই অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। প্রথম প্রথম দিদিমা বিরক্ত হ'য়ে খুব ভৎর্সনা করতেন বটে, কিন্তু বকে বকে তিনি নিজেই হার মেনেছিলেন; তাই—অধিকাংশ সময় তিনি তাঁর গুরুদেবের আশ্রমে থাকতেন।

সে দিন রবিবার—লালুমামার আফিস ছিল না। পূর্ব্ব রাত্র শনিবার ছিল—দুভায়েই বাড়ী আসে নি। সকালে যখন তারা বাড়ী এল, তখনও রাত্রের নেশার ঝোঁক কাটে নি। লালুমামাই প্রথম বাড়ী ঢুকেছিল; এবং কালুমামাকে উদ্দেশ ক'রে অশ্রাব্য ভাষায় বকে যাচ্ছিল। কালুমামার বাড়ী ঢোকবার সময় হওয়ায়, অনেক চেষ্টা ক'রেও বড় মামী কোন প্রকারেই লালুমামাকে চুপ করাতে না পেরে শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। কালুমামা বাড়ী ঢুকেই লালুমামাকে বকাবকি করতে দেখে মহা গরম হয়ে উঠ্‌ল। বড় মামী অনেক হাতে পায়ে ধরেও তাকে শান্ত করতে পারলেন না।

দুভায়ে প্রথমে গালাগালি, পরে হাতাহাতি হবার উপক্রম হ'ল। মেজমামী সেয়ানা ছিলেন; তিনি কালু মামার দেহের শক্তিও জানতেন। তাই স্বামীর পরাজয় অনিবার্য্য ভেবে তিনি লালুমামাকে ঘরের ভেতর পুরে দোর বন্ধ ক'রে দিলেন। কালুমামা পাগ্‌লা হাতীর মত সমস্ত বাড়ীটা তছ্‌নছ্ করে, অবশেষে বড়মামীকে হুকুম করলেন,—"আজ থেকে ভায়ে-ভায়ে পৃথক—সব আলাদা হবে—নেলোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না।"

লালুমামাও এতদিন তাই খুঁজ্‌ছিল, কাজেই পৃথক হতে বেশী বেগ পেতে হ'ল না। কথার সঙ্গে-সঙ্গেই কার্য্যারম্ভ। দুভায়ের দু'আয়গায় রান্নার ব্যবস্থা হ'ল। মেজমামী হিসাবি ছিলেন, তাঁর কোন কষ্ট হল না; কিন্তু বড় মামী পুরাণো হেঁসেলে ঢুকে রান্নার চাইতে কান্নাই সার করলেন।

এত বড় একটা কাণ্ড বাড়ীতে হয়ে গেল, এর বিন্দু বিসর্গও দিদিমা জানলেন না। তিনি সকালে উঠে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন; যখন বাড়ী ফিরলেন—তখন বেলা প্রায় বারোটা।

বাড়ী ফিরে মেজবৌকে রান্নাঘরে তোলা

উনুনে রাঁধতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "হাঁ বৌমা—বারান্দায় রাঁধলে কেন?" মেজবৌ ঘোমটা একটু টেনে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন, "বড় ঠাকুর আমাদের পৃথক করে দিয়েছেন।"

"পৃথক! সে কি?"

দিদিমার গলার আওয়াজ শুনে বড়মামী চোখ মুছতে মুছতে এসে দিদিমার পায়ে প'ড়ে বল্লেন, "মাগো রক্ষা করো। তুমি দুদণ্ড বাড়ী ছিলে না;—দুভায়ে সর্ব্বনাশ ক'রে বসেছে।"

"হুঁ"—দিদিমা কোন কথা না ব'লে নিজের ঘরে গিয়ে গঙ্গাজলের ঘটীটা রেখে, বেরিয়ে এসে ডাক্‌লেন, "কালু—লালু"—কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। দিদিমার গম্ভীর স্বর শুনে উভয়েই ঘরের ভেতর নিঃশব্দে বসে ছিল। উত্তর না পেয়ে দিদিমা আধোল তাবোল কতকগুলা-বকে, পরে দৃঢ়স্বরে বল্লেন,—"আমার বাড়ী ওসব হবে না। এ বাড়ীর সাত পুরুষে কখন দুটো হাঁড়ী চড়ে নি। তোমরা যে আজ এসে জুড়ে বসে ভিটের অকল্যাণ করবে, তা আমি কিছুতেই হ'তে দেব না। যে যার আপনার বাড়ী গিয়ে ওসব ভাগ-বাটরা করগে—আমার বাড়ী ওসব লক্ষ্মীছাড়াপনা চল্‌বে না। বেরিয়ে যাও সব আমার বাড়ী থেকে।" রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে দিদিমা আপনার ঘরে গিয়ে দড়াম্ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। সে দিন আর বাড়ীর কারুর খাওয়া-দাওয়া হল না।

(৪)

এই ঘটনার পর মামাদের অত্যাচারের বেগ অনেকটা হ্রাস হ'ল। পূর্ব্বের মত এক সঙ্গেই সকলের খাওয়া চল্‌তে লাগল। দিদিমার সেদিন-কার কথাগুলা কালুমামার কাণে না ঢুক্‌লেও—অন্তরে অন্তরে বিঁধেছিল লালুমামার। একদিন মদ খেয়ে এসে প্রাণের আবেগে সে দিদিমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "বড়মার বাড়ী বলেই না যখন তখন বেরিয়ে যেতে বলেন। তা না হ'লে—সেদিন-কার অত অপমানের পরেও মুখ বুঁজে থাক্‌তে হ'চ্ছে। কি কর্‌ব—ভগবান মেরেছেন—তাই পরের লাথি ঝাঁটা খেয়েও প'ড়ে থাক্‌তে হয়।"

কথাগুলো মাতালের হলেও—দিদিমার প্রাণে বড়ই আঘাত বাজল। * * *

সমস্ত রাত ঘুম হল না—চোখের জল ফেলে তাঁর রাত কাটল। বড় কষ্টই না তিনি সেদিন সে কথা-গুলো বলেছিলেন;—তাঁর নিজের পেটে ছেলে হলে কি সেগো এত বড় কথা বল্‌তে পারত।

সকালে শয্যা ত্যাগ ক'রেই দিদিমা বাবাকে ডাক্‌তে পাঠালেন। বাবা এলে দিদিমা বললেন, "রাধানাথ! আমি একটা উইল করতে চাই—আর সেটা আমি আজই করতে চাই। গুরুদেব শীঘ্রই কাশী যাবেন। আমিও মনে করেছি তাঁর সঙ্গে গিয়ে—সেইখানেই যে কটা দিন বাঁচি কাটিয়ে দেব।"

দিদিমার কথায় বাবা বিস্মিত স্বরে বললেন, "সে কি! কাশীবাস করবেন কি? আর উইল করবারই বা এত তাড়াতাড়ি কি?"

"না রাধানাথ—আমি আজ আছি কাল নেই—। "তা বেশ ত! উকিলের সঙ্গে একটা পরামর্শ ক'রে—তার পর যা হয় করা যাবে—"

"হাঁ, সেই জন্যই তোমায় ডাকিয়েছি; তুমি মহিম উকিলকে ডেকে পাঠাও। যা লেখ্‌বার আমি লিখে রেখেছি। যাতে আজই হয়, তার বন্দোবস্ত কর। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—এর একটা" ব্যবস্থা না ক'রে জল গ্রহণ কর্‌ব না।"

এই বলে দিদিমা তাঁর মহাভারতের ভেতর হতে একখানা কাগজ বের ক'রে বাবাকে দিলেন। বাবা দিদিমাকে বিশেষ চিন্‌তেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে তাঁকে টলান অসম্ভব! অগত্যা তিনি মহিম উকি-লের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়্‌লেন।

উইলের খসড়া দিদিমার ইচ্ছামত সেইদিনই তৈরী হয়ে গেল; তারপর যা যা করতে হবে তার

সমস্ত ভার বাবার ওপর দিয়ে দিদিমা নিশ্চিন্ত হলেন।

বাবার মুখে শুনলাম, দিদিমা শীঘ্রই কাশী যাবেন। আগে ইতিমধ্যে একদিন দিদিমার বাড়ী গিয়েছিলেন বটে,—তবে ব্যাপার কিছুই জানতে পারেন নি। বাবা উইলের কথা কাউকে বলেন নি, কারণ দিদিমার নিষেধ ছিল। হঠাৎ একদিন সকালে দিদিমা আমাদের সকলকে ডেকে পাঠালেন। আর সঙ্গে আমরা সব-ভাই বোন দিদিমার বাড়ী গিয়ে দেখি, দিদিমা মোট ঘাট বেঁধে তৈরী।—পরদিন সকালের গাড়ীতে কাশী যাত্রা করবেন; আর সে যাওয়া দুদিনের জন্য নয়,—চির-দিনের জন্য কাশীবাস করতে।

দিদিমার কথা শুনে মা কাঁদতে লাগলেন; মার চোখে জল দেখে আমাদেরও চোখ শুকনো রইল না। বিশেষতঃ, আমার প্রাণে বড়ই বাজল—কারণ সকল ভাই বোনের মধ্যে দিদিমার স্নেহটা আমিই দখল ক'রেছিলাম বেশী। দিদিমা মাকে অনেক বোঝালেন, তিনি নিজেও চোখের জল সংবরণ করতে পারলেন না।

সন্ধ্যার আগে দিদিমার গুরুদেবের সঙ্গে বাবা এবং মফিস উকিল এসে উপস্থিত হলেন। কালু-মামা, লালুমামা এবং মামীমারাও পুত্র-কন্যাসহ দিদিমার জন্য কাঁদতে লাগলেন। সকলে উপস্থিত হ'লে দিদিমা মামাদের ডেকে বললেন, "কালু, লালু আমি যাচ্ছি বটে, তবে আমার বাপের ভিটের মর্য্যাদা তোমাদের হাতে স'পে দিয়ে যাচ্ছি। আমি এই উইল করেছি, যাতে পরে তোমরা এ বাড়ী ভোগদখলের নয় বলে দুঃখ কর, তাই তোমাদের দুভায়ের নামেই আমি এ বাড়ী লিখে দিয়েছি।"

দিদিমার কথায় কালুমামা ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠে তাঁর পা জড়িয়ে ধ'রে বলল, "বড়মা তুমি থাক—তুমি যেওনা; আমরা বাড়ী চাই না—"

কালুমামার মস্তক স্পর্শ ক'রে দিদিমা বললেন, "না কালু—তা'মায় আর বাধা দিস্‌নে। বাবা বিশ্বনাথ যখন টেনেছেন, তখন আর আমায় তোরা মায়ায় বড়াস্‌নে। আমি তোদের সেইখানে ব'সেই আশীর্বাদ করব।" তারপর লালুমামার দিকে চেয়ে বললেন, "লালু, ভায়ের চেয়ে আপনার জন আর কেউ নেই—বিশেষ কালুর মত ভাই। তার অমর্য্যাদা করিস্‌নে।"

লালুমামা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। দিদিমার কথায় হঠাৎ যেন জেগে উঠে ধরা গলায় সে বলল,—"বড়মা আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কেন কাশী যাচ্ছ। আমারই দোষে আজ আমরা মাতৃহীন হলাম। আমি মাতাল—তোমার অবোধ ছেলে—তাকে ক্ষমা কর বড়মা! যে মদ আজ আমাদের এই সর্ব্বনাশ করেছে, আমি আজ সকলের সুমুখে তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—আজ থেকে আমি আর কখন তা ছোঁব না।—আর বাড়ী তুমি দাদার নামে লিখে দাও।" দিদিমার পা ছেড়ে, কালু-মামার পা জড়িয়ে ধরে সে পুনরায় বলল, "দাদা—দাদা—আমায় ক্ষমা কর—"

কালুমামা দুহাতে লালুমামাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বেরুল না, শুধু দু'চোখ দিয়ে আশীর্ব্বাদের ধারা লালুমামার মস্তক সিক্ত ক'রে দিল। সেই মহান্ দৃশ্যে সকলেরই চোখের পাতা ভিজে উঠল।

পরের দিন সকাল থেকেই আত্মীয়-স্বজন এবং লোকে দিদিমার বাড়ী ভরে গেল। দিদিমার কাশীবাসের কথায় সকলেই দুঃখিত হ'লেন—সকলের চোখেই জল এল।

কালুমামা দুদিন হ'তে একরকম জল ত্যাগ করেছে। সবচেয়ে ব্যথা তারই বোধ হয় বেশী বেজেছিল; কারণ, সংসারে সে দিদিমাকেই বেশী ভাল বাসত। তাই, সে দিনের প্রভাত তার কাছে বিজয়ার প্রভাতের মত বেদনাভরা বোধ হচ্ছিল।

সকলের কাছে একে একে বিদায় নিয়ে দিদিমা অবশেষে যখন কালুমামাকে বুকে টেনে নিলেন, তখন তাঁর নিজের চক্ষেও ধারা বয়ে যাচ্ছিল। এই উর্দ্ধান্ত ছেলেটিকে তিনি এতটুকু বেলা থেকে শুধু শাসন করেই এসেছেন, আজ তাই স্নেহের উৎস শাসন ছাপিয়ে ছুটে বেরুচ্ছিল। অতি কষ্টে আত্ম-সংবরণ করে বললেন, "যাবা কালু, যাবার সময় আর আমায় কাঁদাস্‌নে। তোকে চিরদিন শাসন ক'রেই এসেছি, আজ প্রাণ খুলে তোদের দুই ভাইকে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—যেন তোদের সুমতি হয়—"

"মা—মাগো—কার কাছে তোমার এই অশান্ত ছেলেদের রেখে যাচ্ছ—" কালুমামা ও ভালুমামা বালকের মত কেঁদে উঠ্‌ল; তাদের কান্নায় দিদিমা অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লেন। মার দিকে চেয়ে দিদিমা বললেন, "সতি—তোর ভাইদের বোঝা।"

দিদিমার চিরদিনের মত চলে যাওয়ার কথায় মার বুক ভেঙ্গে পড়েছিল। মা যে কি বলে বোঝাবেন তা নিজেই বুঝ্‌তে পারলেন না। তবু দিদিমার এই পুণ্য কার্য্যে বাধা দেওয়া অনুচিত বিবেচনায় মা অনেক কষ্টে তাঁর মনকে বুঝিয়ে রেখেছিলেন। এখন দিদিমার কথায় মামাদের অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চেয়ে মার প্রাণের সব দৃঢ়তা মুহূর্ত্তে গলে গেল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মা বললেন, "দাদা"—তারপর আর কথা বেরুল না, কালুমামার গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠ্‌লেন। মাকে ওভাবে অবলম্বন হ'তে দেখে কালুমামা চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল, "থাম্ দিদি—কোথায় যাবে না। নেলো, ধর ত বড়মার পা দুটো ছেড়ে দেখি এতগুলো ছেলে মেয়ে ফেলে পাষাণী মা কোথায় পুণ্য করতে যায়।" তারপর দিদিমার গুরুদেবের দিকে চেয়ে পুনরায় বলল,—"গুরুদেব, এখন মাকে বোঝাও—নইলে আজ রক্ত-রক্তি করব—কেলো নেলোকে ত জানেন।"

চারিদিকের অশ্রুর প্লাবনে মুহূর্ত্তে দিদিমার সব ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পাপ, পুণ্য—ওলট পালট হ'য়ে গেল। পরতলে পতিত মামাদের দু'হাত দিয়ে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, "গুরুদেব—আমার যাওয়া হল না। বিশ্বনাথের ইচ্ছা নয় যে, এদের ফেলে যাই। আপনি যাত্রা করুন—আমি মধ্যে মধ্যে আপনার চরণ দর্শন করতে যাব।"

সেই মহিমময় দৃশ্যে গুরুদেবের চক্ষুও জলে ভরে এসেছিল। তিনি দিদিমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বললেন, "এ ছেড়ে কোথায় যাবি মা; এই তোমার কাশী বিশ্বেশ্বর—বিশ্বনাথ তোমার মঙ্গল করুন।"

কালুমামা আহ্লাদে আত্মহারা হ'য়ে বলে উঠ্‌ল, "নেলো মদ ছেড়েছে, থাকেনা।—কিন্তু আমি আজকের দিনে না খেয়ে থাকতে পারব না। আজ আমায় ক্ষমা কর বড় মা—তারপর যেদিন মদ ছোঁব, সেই দিনই তুমি কাশী চলে যেও—"

অনুতপ্ত

(গল্প)

[শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ বি এ]

কলেজ থেকে ফিরে এসে, জামা-কাপড় ছেড়ে, হাতে একটু বেড়াচ্ছি, এমন সময় ছোট ভাই এসে বল্লে, "দাদা, তোমার নামে একটা টেলিগ্রাম আছে।" টেলিগ্রামের নাম শুনলে প্রাণেই একটা অজানা আশঙ্কা মনে আসে। তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামখানা খুলে পড়ে দেখলুম, জামাইবাবু আমায় আজকেই

মেদিনীপুর যেতে বলেছেন। ছোট ভাইটি খবর শোন্‌বার জন্য আমার মুখের দিকে চেয়েছিল; আমি বল্লুম, "ওরে ঠাকুরকে বলে দে খাবারটা যেন শীগ্‌গির শীগ্‌গির করে দেয়, আমাকে এখনি মেদিনীপুর যেতে হবে।"

ছোট ভাই খবর দিতে নীচে নেমে গেল।

সকাল-সকাল খাওয়া দাওয়া ক'রে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে দেখি, ট্রেণ ছাড়তে তখনও এক ঘণ্টা দেরী। এখন থেকেই লোকের বেশ ভিড় হ'তে লাগ্‌ল। যাত্রীদের ধাক্কা হুড়ম ক'রে গাড়ীতে উঠ্‌লুম। কোনও মতে একটু বস্‌বার জায়গা ক'রে প্লাটফর্মে যাত্রীদের চলাফেরা দেখ্‌তে লাগ্‌লুম।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সময় হয়ে এল। গাড়ী ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা পড়ে গেল। এমন সময় দেখি, একজন বাঙ্গালী যুবক একটা ব্যাগ ও বিছানা নিয়ে ছুটে আস্‌ছেন। কোনও গাড়ীতে জায়গা না পেয়ে ভদ্রলোক হতাশ হ'য়ে আমাদের গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। তখন দরজা বন্ধ হ'য়ে গেছে; বেচারীর ম্লান মুখে ও ছুটাছুটীর ভঙ্গী দেখে আমি তাঁকে ডেকে বল্লুম, "কতদূর যাবেন?" ভদ্রলোকটি বল্লেন, "বাঁকুড়া। একটু জায়গা হবে কি?" আমি বল্লুম, "তা হ'তে পারে,—আপনাকে কিন্তু এই জানালা গলে ভিতরে আস্‌তে হবে।"

ভদ্রলোক তাই করলেন। আমার সহানুভূতি দেখে অপরাপর যাত্রীরা একটু বিরক্ত হ'ল।

ভদ্রলোককে একটু বস্‌বার জায়গা দিয়ে বল্লুম, "আপনার নামটা জান্‌তে পারি কি?"

নবাগত ব্যস্ত হ'য়ে বল্লেন, "নিশ্চয়। খুব পারবেন। আমার নাম শ্রীসুবোধচন্দ্র মিত্র। তা মশায়ের নামটা…।" আমি আমার নাম বল্লুম। তারপর অসম্ভব রকমের ভিড় দেখে সুবোধবাবু হতাশ হ'য়ে বল্লেন, "আজ আর সোয়ার হবার কোনই সম্ভাবনা নাই, এখন রাতটা কাটান যাবে কি ক'রে?" আমি বল্লুম, "একটা বড় গোছের গল্প বলুন না, তা হ'লে রাতটা একরকমে কেটে যাবে।" তিনি বল্লেন, "কি আর নতুন গল্প বল্‌ব? আমার জীবনটাই একটা প্রহেলিকাময় গল্প।" কথাটা শুনেই কি জানি কেন, তাঁর অতীত কাহিনী শোন্‌বার জন্য মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। বল্লুম, "আচ্ছা বলুন না।" তখন তিনি আরম্ভ করলেন—

"বাবা যখন চিরদিনের জন্যে এ জগৎ থেকে বিদায় নিলেন, তখন রেখে গেলেন, আমার হতভাগিনী মাকে, আমাকে আর পৈত্রিক ভিটা—একখানা জাঙ্গাড়োরা একতলা ইঁটের বাড়ী। আমার বয়স তখন পনর বছর, সবে এণ্ট্রান্স পাশ দিয়ে এফ, এ পড়তে কলকাতায় গেছি, এমন সময় বাবা মারা গেলেন। পাড়ার ও আত্মীয়াগীরা পড়া ছাড়্‌তে উপদেশ দিলেন, আমিও তাঁদের কথামত কাজ কর্ত্তে প্রস্তুত হলুম।

মা কিন্তু তাঁর অন্ধের যষ্টি একমাত্র ছেলেকে পড়া ছাড়্‌তে দিতে রাজী হলেন না। তিনি বল্লেন, —গহনা-পত্তর বেচে যেমন করে' হোক আমার লেখাপড়ার খরচ চালাবেন। কথাটা আমার বুকে খুবই লেগেছিল। মা'কে বুঝিয়ে বল্লুম, "লেখাপড়া বন্ধলে ত খুব বেশী আন্‌তে পারব না। এখন যা'ই আনি না কেন, তা'তেই চলে যাবে।" কিন্তু মা আমার বড়ই অবুঝ; সে কথা তিনি ভাল রকম বুঝ্‌তে পার্‌লেন না, বল্লেন, "তা' হোক, আমাদের দু'জনের পেট যেমনি করে হ'ক, চলে যাবে। তুই কলেজে পড়; পরে ভাল চাকুরী পেতে পার্‌বি।" এবার আর মা'র কথার ওপর কথা কাটাতে পার্‌লুম না। বাবার শেষ কাজ যথারীতি শেষ ক'রে কলকাতায় চলে এলুম। এবারে এসে কোথায় যে উঠ্‌ব, তা'র কিছুই ঠিক না করেই বেরিয়ে পড়েছিলুম। আমার এক দূর সম্পর্কীয় ভাই ছিলেন, ভাবলুম তাঁ'র বাড়ীতেই আপাততঃ থাকা যা'ক, তা'র পর অন্যত্র দেখে নেওয়া যাবে। কিন্তু হায়। যা'র অদৃষ্ট খারাপ,

তা'র কোথাও সুখ নাই। কিছুদিন থাকতে না থাকতেই সেখানে তাঁরা এমনি ব্যাভার করতে লাগলেন যে, আমাকে অগত্যা তাঁদের বাড়ী ছাড়তে হ'ল। কোথায় যাই? মা'কেও কিছু লিখলুম না;—জানি, তিনি শুনলে মনে বড়ই কষ্ট পাবেন।

রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। পথে আমাদের কলেজের এক অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি আমাকে খুবই স্নেহের চক্ষে দেখতেন। তাই তাঁকে সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙ্গে একেবারে আমার সমস্ত কথা ব'লে ফেলুম। তিনি আমার হাতখানা ধরে বল্লেন, "তুমি এখন আমার সঙ্গে এস, পরে থাকবার জায়গা ঠিক ক'রে দেব।" তাঁর সঙ্গে আমি তাঁর বাড়ীতে গেলুম। আমার সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি শুনে তিনিও কষ্ট পেলেন। তা'র পর আমায় ভাল ক'রে খাইয়ে নিজে কলেজ-বোর্ডিংয়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমার খাওয়ার ও থাকবার সুবন্দোবস্ত ক'রে যাবার সময় বলে গেলেন, "তোমার যখনি কোন কষ্ট হবে, তখনি আমায় খবর দিও।" তাঁর এই স্নেহের ঋণ জীবনে যে কখনও শোধ করব, সে ক্ষমতা আমার নাই। বোর্ডিংয়ে এসে মা'কে নতুন ঠিকানায় চিঠি লিখলুম। কেন যে হঠাৎ বাড়ী ছাড়া হ'ল, তা' তিনি অত ভাল বুঝলেন না; হয়ত' মনে করেছিলেন—বোর্ডিংয়ে থাকলে পড়াশোনার বেশ সুবিধে হবে। আমিও এ সম্বন্ধে তাঁ'কে কিছু লিখি নি।

বোর্ডিংয়ে প্রথম প্রথম সব ছেলের সঙ্গে মিশতে আমার কেমন-কেমন ঠেকত। কিন্তু যখন দেখলুম,—আমি দূরে থাকি, ব'লে ছেলেরা আমায় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তখন অগত্যা তাদের হাত থেকে রক্ষে পাবার জন্য তাদের সঙ্গে মিশতে হ'ল। হাবরে পাড়া গাঁয়ের ছেলে! সহরের প্রলোভন যে কত তা ত জান না? এই প্রলোভনের মধ্যে না পড়লে হয়ত আজ আমাকে এমন ঘৃণিত জীবন কাটাতে হ'ত না। ভাল ছেলের দলে মিশতে না পেরে, খারাপের দলে গিয়ে মিশলুম। আগে চুরুটটা ধরলুম, তারপর গাঁজা, গুলি, প্রভৃতি নেশাগুলি আয়ত্ত করে ফেললুম। ঘোড়দৌড়ে গিয়ে বই কাপড় বিক্রী ক'রে বাজী খেলতে লাগলুম। মা'র কাছে টাকা চাইতুম,—কিন্তু তা'র কোনও সন্তোষজনক হিসাব জীবনে তাঁ'কে দিই নাই, তিনিও কখনও চান নাই। পুত্র-বৎসলা মা কখন স্বপ্নেও ভাবেন নি যে, তাঁর সুপুত্র খারাপ পথে এতদূর অগ্রসর হ'য়েছে। মানুষের অধঃপতন সুরু হ'লে যেমন সে ভালমন্দ বিচার করতে শক্তি হারায়, আমারও তেমনি হ'ল। তার-পর একটী আস্ত পশু হ'য়ে পড়লুম—জীবনের যে সার পদার্থ চরিত্র, তাই হারিয়ে ফেললুম। অধ্যাপক মহাশয় আমার বিষয় জানতে পেরে বেশ ভর্ৎসনা করলেন, কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। তাঁর কথা আমার এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গেল; কেননা, তখন যে আমি নেশার মশগুল। তখন তিনি মাকে আমার দেখে নিয়ে নিজের কাছে রাখবার জন্যে চিঠি লিখলেন।

গরমের ছুটীতে বাড়ী গেলে স্নেহময়ী মা আমায় কিছুই বল্লেন না। দু'একদিন পরে কথাচ্ছলে বল্লেন, "দেখ বাবা, চরিত্র জিনিষটা সবচেয়ে দামী জিনিষ, যেটা থাকলে লোকে সকল রকম দুঃখকষ্টের মধ্যে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। চরিত্র জিনিষটা ঠিক রেখো বাবা।"

"দুই চার দিনের মধ্যেই কয়েকজন নূতন লোককে আমাদের বাড়ীতে আসতে দেখে অবাক্ হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম,—তাঁরা সবাই কে দেখতে এসেছেন। আমারও বিয়ে হ'য়ে গেল।

কিন্তু এ বিয়েতে আমি সুখী হ'তে পারলুম না। সুশীলা সরলা পত্নী পেয়েও কেন যে আমার কপালে সুখভোগ ঘটলো না, তা' ভগবানই জানেন। যে একবার খারাপ পথে গিয়ে পড়ে—তার পক্ষে

স্বপথে ফিরে আসা বড় সোজা কথা নয়! একদিন দুপুর রেতে মা ও বৌয়ের বাক্স খুলে টাকাকড়ি গহনাপত্তর নিয়ে পালিয়ে গেলুম! তা'দের যে কি হবে, তা' একবারও ভাববার অবসর পাই নি।

তারপর?—তারপর আমায় বোডিং ছাড়তে হ'ল। মা ও স্ত্রীর কথা একেবারে ভুলে গেলুম। কলকাতার এক জঘন্য পাড়ায় এক জঘন্য কুঁড়েতে পড়ে রইলুম। আমি দুশ্চরিত্র, লম্পট, নরকের প্রেত! এইরকম থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন কি মনে হ'ল—দেশে ফিরে গেলুম। এসে কি দেখলুম! সে শোচনীয় দৃশ্য দেখে বুক ফেটে গেল,—পাষাণ আমি,—আমারও দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল! আমার স্নেহময়ী মা নেই—প্রেমময়ী পত্নী নেই.....”

গাড়ী তখন মেদিনীপুর ষ্টেশনে এসে পেমেছে। আমি তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র নিয়ে নেমে পড়লুম। সুবোধবাবুর করুণ কাহিনীর শেষটুকু আর শোনা হ'ল না।

শোক-সংবাদ

সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ২২শে অগ্রহায়ণ ৮২ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি এক সময় 'বঙ্গদর্শন', 'সাহিত্য' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। 'মধুমতী' ও 'শৈশব সহচরী' নামক দুইখানি উপন্যাসও তাঁহার রচিত। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

'বেহার চিত্র', 'হিন্দুনারীর কর্ত্তব্য' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা সুলেখক যতীন্দ্র মোহন গুপ্ত বি, এল মহাশয় অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সহজ রচনায় যতীন্দ্র বাবু সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার 'বেহার চিত্র', 'সমাজ চিত্র' প্রভৃতি বঙ্গ সাহিত্যে আদরণীয় হইয়াছে। ভগবান তাঁহার সন্তপ্ত পরিবার-বর্গের হৃদয়ে শান্তি বিধান করুন।

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and Published by P. N. Pal. 26-3 Scott Lane, Calcutta.

CALCUTTA UNIVERSITY

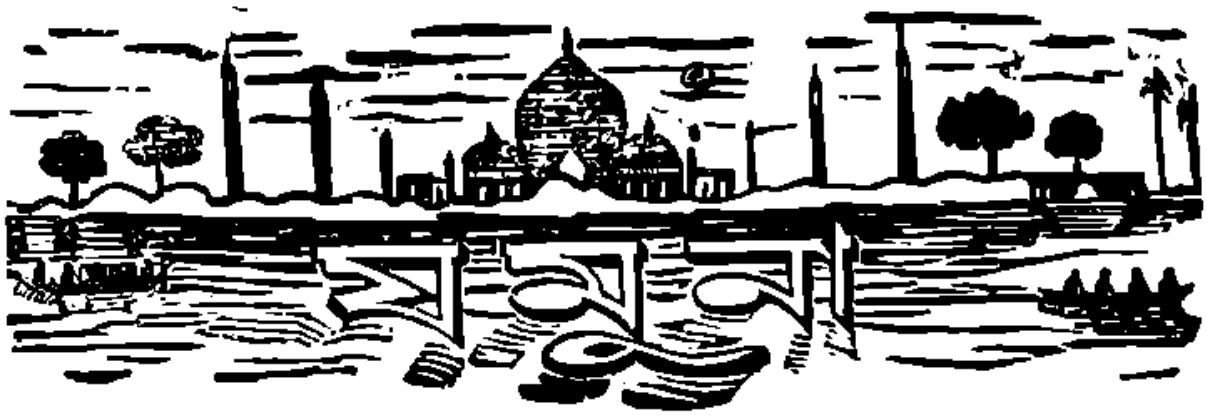

১২শ বর্ষ | মাঘ ১৩২৯ | ১০ম সংখ্যা

টলষ্টয়ের আনা কারেনিনা

(কালিদাস মিত্র এম, এ)

আজকাল উপন্যাসে ভাবুকতা বা 'আইডিয়ালিজ্‌ম্' জিনিষটা অনেকটা পেছিয়ে গেছে, তার জায়গায় এখন 'রিয়্যালিজ্‌ম্' বা বাস্তবেরই দিন এসেছে। আদর্শ নরনারীচরিত্র-অঙ্কন ও একটা বিরাট মহান্ ভাবের আদর্শ কবি কল্পনার রঙিন তুলিতে রাঙিয়ে করে খাড়া করার চেয়ে, চক্ষুতে নিত্য যা হচ্ছে, মানুষের যা স্ব) প্রকৃতি, যে রকম অবস্থায় মানুষ সচরাচর পড়ে থাকে ও যে রকম ঘটনা-চক্র সংসারে নিত্য অহরহ ঘটছে, নানান্ রকম খুঁটিনাটির ভেতর দিয়ে তারই পরিচয় দেওয়া এবং বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরার ভেতর দিয়ে নরনারীর চরিত্র বিশ্লেষণ করাই এখন উপন্যাসের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন লোকে আর কবি-কল্পনার পাখায় ভর করে অসীমের মধ্যে আদর্শ খুঁজতে উধাও হতে চায় না, তারা চায় সোজা কথায় সরল সত্য, যা তাদের প্রাণ স্পর্শ কর্ত্তে পারে।

এখন যেন সত্যের যুগ একটু একটু করে এসে পড়ে, কল্পনার রাজ্যের উপর হস্তক্ষেপ কর্চ্ছে। হস্তক্ষেপ কর্চ্ছে বল্লে ঠিক বলা হয় না, বরং বলতে গেলে দেখা যাচ্ছে, যে অনেকটা হটিয়েই দিয়েছে। এখন আমরা চাই যাহা সত্য, শাশ্বত, চিরন্তন—তা সে যত কঠোরই হোক্ না কেন। আমরা চাই অভিজ্ঞতার ফল—তা সে মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞতার ফলই হোক্ বা ঘটনা-পরম্পরা লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা

হ'তে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তারই ফল দেখুন। আজ-কালকার নূতন উপন্যাস-সাহিত্যের চরিত্রগুলি বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্মত অভিজ্ঞতার ফল। তাদের মধ্যে শক্তির পরিচয় থাকা চাই এবং একটা কঠোরতার ছাপ তাদের চরিত্রে দেখতে পাওয়া যায়, যারা সত্যের রূপান্তর মাত্র। সেগুলি কল্পনা-লোকবাসী অশরীরী প্রাণী নয় বা দেবদেবীও জীবন্ত নয়—তারা মানুষ, রক্তে মাংসে গড়া আমাদেরই মত মানুষ।

উপন্যাসে এই নতুন ধারাটা ফরাসী দেশ থেকেই বহেছিল। তারপর এক একে য়ুরোপের সব দেশেই ছড়িয়ে পড়ে। এখন প্রাচ্য দেশেও এই নতুন সজীবতার সাড়া পাওয়া গেছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে য়ুরোপের সাহিত্য-জগতে রুশিয়া অনেকখানি পেছিয়ে ছিল। প্রথম যিনি রুশীয় সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের উন্নত দরবারতলে পরিচয় করিয়ে দেন, তিনি হচ্ছেন কাউন্ট টলষ্টয়। টলষ্টয় বড় ঘরের ছেলে; কিন্তু তিনি ইচ্ছে করে চাষাকে বরণ করে নিয়ে, দরিদ্রের সঙ্গে মিলে মিশে বসবাস করে, দরিদ্রভাবে থেকে একদিকে যেমন রুশিয়ার Lower class অর্থাৎ জনসাধারণের প্রাণের নাড়ীস্পন্দন বুঝে নিয়েছিলেন, অপর দিকে Aristrocrat class অর্থাৎ ধনী বড়লোকদের চরিত্র সম্বন্ধেও তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা পাবার সুবিধা হয়েছিল।

তাঁর রচনাই রুশসাহিত্যকে বিশ্বমানবের দ্বারে পৌঁছিয়ে দিল। শুধু পৌঁছিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত রহিল না—এমন ভাবে দিল যে, লোকে তাহাকে আদর করে ঘরে না নিয়ে থাকতে পারল না।

রুশীয় উপন্যাসের প্রকৃতি হচ্ছে এই যে, তাতে ভাব-প্রবণতার একটু আধিক্য দেখা যায়। রুশেরা চট্ করে বুঝে নেয়, এবং বেশ তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করে যে, মানব-প্রকৃতি কি চায়, কোথায় তার লক্ষ্য এবং সংসার থেকে সে কি অভিজ্ঞতা লাভ করছে ও তার আশ-পাশে যারা তার সংস্পর্শে আসছে তারাই বা কি ভাবে ঘুরছে ফিরছে, তাদেরই বা প্রাণে কোন্ ভাবের উদ্রেক হচ্ছে যে জাতির প্রাণটা সজীব ও কাঁচা, তারা যদি একটা বিরাট্ শক্তিশালী প্রাচীন সভ্যতার আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়ে, তবে এই মানব-প্রকৃতি অধ্যয়ন করিবার ক্ষমতা ও আত্ম-বোধশক্তি সে জাতির মধ্যে শীঘ্রই স্পষ্টভাবে দেখা দেবেই দেবে।

রুশেরা বিদ্রোহ করে। তারা ধর্ম্ম, সমাজ, জীবনযাত্রা সব বিষয়েই পুরাণো মতের পরিপন্থী। নূতন কিছু চায় যে, তার দেশ, তার সাহিত্য, তার ধর্ম্ম, তার জাতীয় জীবন পুরাণোর ছেঁড়া জীর্ণ কন্থা খানা ফেলে দিয়ে, তার বন্ধ কেটে বাহিরের মুক্ত হাওয়ায় আকাশের তলে ছুটে বেরিয়ে আসুক—হাঁফ ছেড়ে বাঁচুক। এই কথা নিয়ে নূতন রুশ আলোচনা করে, বাদানুবাদ করে, খবরের কাগজে দেখে, সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হয়, তবু এই নতুনের ঝোঁক কাটাতে পারে না—কাটাতে চায় না। নতুন আলোয় দেখা পেয়েছে তারা, তারা এখন কি আর পুরাতনের শেকল পরে ঠাণ্ডা ভালো মানুষটীর মত বসে থাকতে পারে? এটা আশা করাই অসম্ভব! তারা যদি কতক পরিমাণে স্বাধীনভাবে চলতে পায়, বসতে দাঁড়াতে পায়, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ কর্ত্তে ও চিন্তা কর্ত্তে পারে, তবে তাদের প্রাণের এই যে সজীব স্পন্দন, এই যে তীক্ষ্ণ অনুভূতি সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠে, সাহিত্যকে পরিস্ফুট কর্ত্তে পারে। মুক্ত স্বাধীন হাওয়া এবং স্বাধীন চিন্তার আলো না পেলে আর্টের চারাগাছ বাড়তে পায় না। বাঁধনের চাপে কোনও সাহিত্যই তেমন মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠ্তে পারে না।

রুশীয় সাহিত্যে অবাধ চিন্তার খোলা দরজা দিয়ে অনেক জিনিষ ঢুকে পড়েছে, যা সে দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন। যা সত্য তা চিরদিনই সত্য, বাঁধনের

চাপে সত্যকে বেঁধে রাখা যায় না—কাপড় দিয়ে যেমন আগুন ঢাকা শক্ত। রুশীয় সাহিত্যে সত্যের উপাসনার পথ প্রথম দেখালেন—টলষ্টয়।

রুশীয় উপন্যাসে যেরূপ সরলভাবে হৃদয়ের তোলপাড় উলোট-পালোট করে, তন্নতন্ন করে দেখান হয়, তাতে করে এদের হৃদয়টা শিশুর প্রায় সরল ও কাঁচা বলে মনে হয়; অথচ সমস্ত জিনিষটা পাঠকের প্রাণ স্পর্শ না করে থাকতে পারে না। এদের উপন্যাসে নিজের দেশের যা কিছু সবই ভালো এমন দেখাবার প্রয়াস নাই। আমাদের সমাজ, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের নর-নারী প্রকৃতি, অন্য সব দেশের ও সব জাতির চেয়ে ভালো এমন বড়াই তারা করে না। আমাদের হ্যান্ ছিল, ত্যান্ ছিল বলে তারা অতীত গৌরবের স্মৃতির ছাই মেখে, নিশ্চিন্ততার গাঁজায় দম দিয়ে ভোঁ হয়ে বসে থাকতে মোটেই পছন্দ করে না। তাদের উপন্যাসে ঘটনাচক্র এমন ভাবে ঘটে উঠে বা নরনারী-প্রকৃতি এমনভাবে ফুটে উঠে, যা স্বাভাবিক। লেখক শুধু নিজের তলিয়ে দেখবার ক্ষমতা ও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে বর্ণন করবার শক্তির পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত হন। লেখক যেন কোন দেশের বা জাতির বা সমাজের ব্যক্তিবিশেষ নন্। তিনি যেন বিশ্বমানবের, জগত সমাজের, সমগ্র পৃথিবীর। তিনি যেন দর্শক। যা যা ঘটছে এবং যারা সত্য বলে তিনি মনে করেন তাই বিশ্বমানবের সামনে তিনি তুলে ধরে দেখাচ্ছেন। কল্পনার হুরে ফেলিয়ে তুলে কতকগুলা অদ্ভুত ঘটনা-পরম্পরার হেতর দিয়ে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে টেনে নিয়ে গিয়ে তিনি চরিত্রগুলিকে "কাদর্শ" করে তুলতে চান না। তাঁরা সাদাসিদে ভাবে মোটা কথায় মানবচরিত্র বর্ণন করেন। একটা আদর্শের খাতিরে কতকগুলা জটিল ভাবের সমাবেশে একটা জগড়েজ কিছু করে তুলতে তাঁরা একবারই নারাজ।

বোধ হয় এই কারণেই, অর্থাৎ কল্পনার খেলায় তারা তত পটু নয় বলে, রুশ দেশে খুব বড় বা নাম করবার মত কবি এখনও দেখা দেন নি; কিন্তু কাল্পনিক সাহিত্যের যে অংশটা অনপ্রিয় এবং স্বাভাবিক তাতে রুশিয়া নিজের পথ করে নিয়েছে। ওদেশে এখন অনেক বড় বড় ঔপন্যাসিক জন্মেছেন।

টলষ্টয় ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি সব বিষয়েই অনেক জিনিষ লিখেছেন, এখানে সে সকলের আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এখন তাঁর অ্যানা কারেনিনা উপন্যাসের কথঞ্চিৎ আলোচনা মাত্র কর্ব্ব।

কেউ কেউ বলেন, War and Peace টলষ্টয়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস; কিন্তু আমার মনে হয় আলোচ্য উপন্যাসখানি তাঁর সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনটি দখল কর্ত্তে পারে। এই উপন্যাসে তিনি রুশের ঘরোয়া-সমাজের পরিচয় দিয়েছেন।

'অ্যানা কারেনিনা'য় বহু চরিত্রের সমাবেশ করা হয়েছে। এত বেশী চরিত্রের একত্র সমাবেশ 'আর্ট' হিসাবে নিপুণতার পরিচয় নয়। উপন্যাসের 'আর্ট' যে কি তা নিয়ে বাদানুবাদ এখনও শেষ হয়ে একটা সুমীমাংসা হয়ে যায় নি। তবে আমাদের মনে হয় যে, সেই উপন্যাসেরই আর্ট সব চেয়ে বেশী, যাতে কার্য্যস্রোতের বেশ একটা দৃঢ় অব্যাহত গতি থাকে—সেই স্রোত যেন একটা বিশেষ ঘটনার দিকে বা একটা বিশেষ লক্ষ্য রেখে বয়ে যায়; আর সব পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও চরিত্র যেন এই প্রধান স্রোতের শাখারূপে এই মূল স্রোতটিকে বেগবতী করিয়া তুলে এরই মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলে; অর্থাৎ অন্য সব আশপাশের চরিত্র ও ঘটনাবলী যেন এই প্রধান অনুষ্ঠেয়টিকে ফুটিয়ে তোলে।

যেমন 'চন্দ্রশেখরে' দুইটী বিভিন্ন কাহিনী একসঙ্গে গ্রথিত হয়েছে—একটি চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবলিনীতে গঠিত ও আর একটী নবাব-দলনী-গুরগণ-তকী ইত্যাদি চরিত্রে গঠিত; সেরূপ এই উপন্যাসেও

দুটী কাহিনী সংযুক্ত হয়েছে। একটীর প্রধান চরিত্র Anna ও Wronsky ও অপরটীর কেন্দ্রে Kitty ও Levine এই দুইটী প্রধান স্রোতের পারিপার্শ্বিক রূপে যেমন লোক এনে ফেলা হয়েছে ও যে সব ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে, তাদের সবটাই যে মূল গল্প দুটীকে ফুটিয়ে তুলতে কোন রকম সাহায্য করেছে তা বলা যেতে পারে না। অনেক সময় এমন অনেক ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে, যার শেষে দেখা যায় যে, সে সকলের অবতারণায় তেমন বিশেষ কোন দরকার ছিল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান যেতে পারে যে, Kittyর বন্ধু Warinka ও Levineএর ভাই Segye Ivanitchএর পরস্পরের প্রতি আসক্তি এবং ইহার ব্যর্থতার মধ্য দিয়া Kitty এবং Levineএর চরিত্র যে কিছু মাত্র ফুটে উঠেছে তা নয়। Kitty-Levineএর অদৃষ্ট-চক্রের সহিত পূর্ব্বোক্ত দুজনের চরিত্র যে বিশেষ ভাবে জড়িত তাও নয়। • কিটিকে বিবাহ করতে লেভিন কেন যে অযথা বিলম্ব করেছিল, তারও কোন সন্তোষজনক কারণ দেখতে পাওয়া যায় না। ভায়াগুলি রাজধানী করে পাঠান হওয়ায় বিবাহ বন্ধ থাকলো এটা একটা কারণের মধ্যেই নয়। টলষ্টয়ের 'আনা কারেনিনা' বুঝতে হলে শুধু আর্টের দিক থেকে দেখলে চলবে না। টলষ্টয় কোন আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করেন নি। সমাজে যেমন চরিত্রটি তিনি নিজে দেখেছিলেন ও যেমনটী তা মানব চক্ষের নিকট যে ভাবে ফুটে উঠেছে, তেমনটী তিনি সেই ভাবে লিখে গেছেন। লেভিনের ভায়াগুলি পাঠান হওয়ায়, যতদিন না সেগুলি ফেরৎ আসে ততদিন বিবাহ হতে পারে না এইরূপ ধারণা লেভিনের ছিল।

থাক্ ও সব কথা। এখন প্রধান প্রধান চরিত্র সম্বন্ধে একটু আলোচনা করবো। প্রথম পাতা খুলেই আমরা Stivaর সাক্ষাৎ পাই। সে বড় ঘরওয়ানা ঘরের ছেলে। তার চরিত্রের মাধুর্য্য একবার যে অনুভব করেছে, সে তাকে জীবনে ভুলতে পারবে না। দোষে গুণে Stiva মানুষ। মদ ও কন্যাদায়ে যে ভক্ত ছিল, মানুষকে আনন্দ দিতে ও সুখী করতে তাদের অভাব অভিযোগ দূর করতে সর্ব্বদাই তার চেষ্টা ছিল। তার অর্থের টানাটানি, ফরাসীদেশীয় গৃহকর্ত্রীর (governess)র প্রতি আসক্তি, তার স্ত্রীর দুঃখে দুঃখানুভব, তার প্রতি ভালবাসা ও ছেলে মেয়েদের প্রতি আন্তরিক টান প্রভৃতির যে চিত্র দেখতে পাই, তা থেকে বেশ বুঝতে পারি যে, সে একটা খাঁটি রক্তমাংসে গঠিত মানুষ, তার দোষ থাকা সত্ত্বেও তাকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না। উপন্যাসের নায়িকা আনা তারই ভগ্নী। Stivaর পত্নী ডলি, রাজ কুমার ও তাঁহার পত্নী Cherbatzskyর কন্যা। ইহাদের চরিত্র উন্নত ও মধুর, ইহাদের অনুভূতিসকল ঠিক পথেই চলেছিল, ইহারা সরল, নিষ্কপট প্রকৃতির লোক। মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে এরা চলতে জানত। ডলি ও তাহার ভগ্নী কিটি দুজনেই সুশ্রী। ডলি তার স্বামীর ব্যবহারে বড়ই ত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। তার স্বামীর হাতে টাকা না থাকায়, ছেলেদের প্রতি তাদের কর্ত্তব্য সে ঠিক রকমে করে উঠতে পারতো না, ভাল রকম কাপড় চোপড় দিতে পারতো না। সময়ে সময়ে তার মনে এরূপ ধারণা উঠতো যে সাধারণ বড়লোকেরা যে

• এই পর্য্যন্ত আমার স্বর্গীয় ভ্রাতার লেখা। লেখাটা পড়ে আমার মনে হ'ল মনস্বী ম্যাথিউ-আর্ণল্ডের ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে শ্রীযুক্ত লেখাটা আরম্ভ করে দিয়েছিল। কি রকমে সে শেষ করত তা জানি না। আমি সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে পরবর্ত্তী অংশে আর্ণল্ডের ভাবে ভাবিত হয়ে আলোচনা করছি। ভবিষ্যতে তাহার অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের চেষ্টা করব।

শ্রীহারুচন্দ্র মিত্র

ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে সেটা ঠিক, না ধর্ম্ম ও নীতির পথে চলাই ঠিক? সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ-পরা বড়ঘরের ব্যাভিচারিণীরা পরপুরুষের সহিত আমোদ-আহ্লাদ করে প্রকৃত আনন্দ পায় কি না, এ বিষয় নিয়ে সে অনেক মাথা ঘামিয়েছিল। তার মনে দুর্ব্বলতা এসেছিল—এবং ঐ পতানুগতিকের পথ ধরে চলবে—সে ঠিক করে ছিল, স্রোতে গা ভাসান দেবে মনে করেছিল, পনের মিনিটের মধ্যেই আবার তার ভিতরকার প্রকৃত মনুষ্যত্বের কথাটার সাড় ছিল না। আবার সে বিশ্বাসী সরল প্রকৃতির মানুষ হয়ে দাঁড়াল। স্বামীর প্রতি যে ভালবাসা ক্ষীণ হয়ে আসছিল, আবার তা সতেজ হয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। এই দ্বন্দ্বের চিত্র সুন্দরভাবে টলষ্টয় দেখিয়েছেন। আর তার প্রকৃত প্রকৃতি যা ঠিক সেই রকমই সে ছিল। সে অন্য পথে—পাপ-প্রলোভনের পথে যেতেই পারে না। কিটির চরিত্রও ঠিক ডলির মতই ছিল; কিন্তু কিটি অভিজ্ঞতা সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল; আর ডলি বইখানা যখন আরম্ভ হ'ল, তখনই অনেকটা সাংসারিক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে বসেছিল। লেভিন কিটিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত—পূজা করত। অনেকেরই ধারণা লেভিন—টলষ্টয় স্বয়ং। যাক্ সে কথা। লেভিন বড় ঘরের ছেলে, পয়সা কড়ির অভাব তার ছিল না, কিন্তু সে বইয়ের পোকা ছিল—ভাবুক ছিল হিতাহিত জ্ঞান বেশী মাত্রায় তার ছিল। লোকের ভাল করবার প্রবৃত্তি তার খুব বেশী ছিল। সে বড়-ঘরের ছেলেদের মত সাজে থাকতে ভালবাসত না। সে আপনার জমীদারীর মধ্যে বাস করতে—আর প্রজাদের ও সাধারণ লোকদের মঙ্গল কামনায় যে সকল অনুষ্ঠান ও বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল, সেগুলির উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করত। স্বভাবতঃ সে একটু লাজুক ছিল, কিন্তু সে কারেই লোকের দোষ ধরত কিটি তাকে পছন্দ করত; কিন্তু তার প্রাণের টান্ কাউণ্ট Wronskyর দিকে বেশী ছিল। তার চেহারা ছিল সুন্দর। বড়লোকের ছেলে লেভিন সম্রাটের শরীররক্ষী পার্শ্বচর (aide-de-camp) ছিল; তার ক্ষমতাও অসীম। সে আদব-কায়দাদুরস্ত লোক; মেজাজটাও তার ঠাণ্ডা ছিল; কিন্তু অল্পেই রেগে উঠ্‌তো। বইএর শেষ দিকে যখন এসে পড়ি, তখন দেখ্‌তে পাই তার চরিত্র অনেকটা বদ্‌লে গেছে।

কিটি লেভিনকে প্রত্যাখান করে দিয়েছিল বেচারী হতাশ অন্তঃকরণে ছাখের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল। আবার এদিকে Wronsky কারেনিনার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে, তার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল; আগে সে যে রকম কিটির প্রতি টান দিয়েছিল সে রকম আর সে দেখাত না; বরঞ্চই করে দিয়েছিল বল্‌লে বেশী বলা হয় না। Wronsky যে কিটির মনে একটা স্থায়ী অনুভূতির চিহ্ন রেখে দিতে পেরেছিল, তা নয়; কিন্তু সৌন্দর্য্যশালিনী রমণীকে প্রত্যাখান করলে, তার রূপের গর্ব্বে আঘাত লাগলে সে বিষম ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। সে একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। এই আঘাতের ফলে তার শরীর ভেঙ্গে পড়্‌লো। স্বাস্থ্যের জন্য বাড়ীর লোকদের সঙ্গে বিদেশ যাত্রা করল। সেখানে থাকতে-থাকতেই সে তার শরীরের সবলতা ও মনের স্বাস্থ্য অনেকটা ফিরে পেলে—এবং সে একটা সত্যের আবিষ্কার করে ফেল্লে যে, লেভিনকে সে যে শুধু পছন্দ করে তা নয়—প্রাণের সহিত ভালবাসে। বিদেশ থেকে ফিরে এসে প্রথমে দুজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হ'ল, তখন প্রাণে প্রাণে দুজনে মিশে গেল, তাদের বিবাহ হয়ে গেল। লেভিন একগুঁয়ে, অব্যবস্থিতচিত্ত ও হিটখিটে স্বভাবের লোক হ'লেও দুজনে বেশ সুখে কাটিয়ে দিয়েছিল।

আর কিটির মত স্ত্রী সহিতে কে না সুখে জীবন

কাটাবে। বাস্তবিক, টলষ্টয়ের নারী-চরিত্রগুলি এমন জীবন্ত ও সুন্দর যে পড়ে মনে হয় না আমরা একটা আগাগোড়া কাল্পনিক চরিত্র পড়েছি।

নায়িকা অ্যানা কারেনিনার চরিত্র এইবার আমরা আলোচনা করব। সেণ্টপিটার্সবর্গের সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী Alexis Karenin-এর সহিত নয় বৎসর আগে অ্যানার বিবাহ হয়েছিল, এবং তার Serge নামে একটী মাত্র ছেলে ছিল। এ বিবাহে কিন্তু কিছুমাত্র সুখী হয় নি, প্রাণে তার তৃপ্তি ছিল না। একট অভাবের অনুভূতি সর্ব্বদাই বোধ করত—সর্ব্বদাই আপনাকে নির্ব্বাসিতা মনে করত; কিন্তু আপনার ছেলেকে সে প্রাণের সহিত ভালবাসত, তাকে নিয়েই তার নিঃসঙ্গ জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়ে দিত। চিত্তের তার স্থিরতা ছিল। ডলি ও ষ্টীভার মিলন ঘটিয়ে দিবার জন্য অ্যানা তাদের বাড়ীতে গিয়েছিল এবং সে ক্ষেত্রে যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিল, তা দেখে বাস্তবিকই তার প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব আসে। তার দেহের সৌন্দর্য্য ও মানসিক সৌন্দর্য্যের যে পরিচয় পাই তাতে বাস্তবিকই আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই।

সেণ্টপিটার্সবর্গ হতে অ্যানা, Wronsky র মার সঙ্গে একসঙ্গে যাত্রা করে। মস্কোর ষ্টেশনে Wronsky তার মার সঙ্গে দেখা করতে আসে; এবং অ্যানার সঙ্গে তার প্রথম দর্শনে সে তার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যায়। তার পর ষ্টেশনে যখন হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটে—একটা গরীব কুলী ট্রেণে চাপা পড়ে—তখন অ্যানার মাতৃমূর্ত্তির চিত্র দেখে—তার প্রাণের কোমল বৃত্তিগুলির স্ফুরণ দেখে, তার প্রতি আরও মাত্রায় আকৃষ্ট হয়। বল-নাচের সময় আবার দুজনে দেখা হয়েছিল। এবার দুজনেই দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে। কিটিকে সাহায্য করতে—যাতে তার মনটা আবার অন্যের দিকে ঝুঁকে না পড়ে তা থেকে রক্ষা করবার জন্য অ্যানা বলনাচে যায়; কিন্তু সেখানে সে নিজেই প্রাণটা হারিয়ে আসে।

সেণ্টপিটার্সবর্গে ফিরে এসে অনেক বারই Wronsky র সহিত মিলবার তার সুবিধা হয়। অ্যানার স্বামী পুত্রে তাহার সহিত সমবেদনা দেখাত না সত্য, কিন্তু এখন তার চরিত্র অ্যানার পক্ষে অসহ্য হয়ে পড়ল। সে অ্যানার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। সে রাজতন্ত্রের দলের লোক। আপনার মতের বিরুদ্ধে কোন কথা সে শুনতে পারত না। হিতাহিত জ্ঞান ও বিবেক তার ছিল; কিন্তু সেগুলা মনের নিকৃষ্ট অঞ্চলে থাকত। ভাসা ভাসা দেখতে গেলে তাকে খিট্‌খিটে, বিশ্রীভিমাণী, গর্ব্বিত বড়লোক বলেই মনে হ'ত। অ্যানার চরিত্রের পরিবর্ত্তন কিছুমাত্র তার চক্ষে পড়ে নি। সে যদি বুদ্ধিমান হ'ত, তা হলে সব ধরে ফেলতে পারতো; উভয়ে আর বেশীদূর এগুতে পারতো না। অ্যানাও Wronsky র প্রতি লালসার টানের স্রোতে একদম গা ভাসান দিয়েছিল।

Wronsky র যে একটা বিশেষ কিছু গুণ ছিল, যা দেখে অ্যানার মত চরিত্রের মেয়েমানুষ পতঙ্গের মত লালসার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তা নয়; কেন যে এমনটা ঘটল, তা আমরা ঠিক বুঝতে পারি না। অ্যানার মত উচ্চশিক্ষিতা ও স্বাস্থ্যকর আবেষ্টনীর ভিতর পরিবর্দ্ধিতা স্ত্রীলোক তাহার দুর্দ্দমনীয় লালসাকে বশে আনবার জন্য—আত্মরক্ষা করবার জন্য একটুও চেষ্টা করল না—উপায়ের পথ বাহির করবার জন্য একটুও চিন্তা করল না দেখে একটু কমনতর কেমনতর বোধ হয়। কিন্তু আবার বলি, টলষ্টয় যেমনটী দেখেছেন, তেমন চিত্রটীই এঁকেছেন।

এ সকল সত্ত্বেও বলি, অ্যানার চরিত্রের মাধুর্য্য আমাদের মনে চিরকালের জন্য একটা ছাপ রেখে

যায়। তার চরিত্রের পতন, ভুল-ভ্রান্তি ও দুঃখের ভিতরও তার তাজা উন্নত প্রাণ, মেয়েলী স্বভাব আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে—শুধু সহানুভূতি কেন, আমরা তাকে সম্মান দেখাতেও কুণ্ঠিত হই না।

এবার আখ্যায়িকার দিকে অগ্রসর হওয়া যাক। দৌড়-দৌড়ের মাঠে বেড়া ডিঙাবার Steeple chase এর সময়Wronsky যখন বিপদে পড়েছে, তখনকার আনার মুখের ভাব দেখে তার প্রাণের ভেতর যে একটা ঝড় বয়ে উঠেছে, তা বেশ বুঝতে পারা যায়। তার স্বামী আনার এ ভাবটা ধরে ফেলেছিল, এবং অবশেষে প্রকাশ করে বাদানুবাদও করেছিল। রাগের মাথায় তার প্রাণের Wronsky বিপদে পড়েছে দেখে স্পষ্টই আনা বলেছিল যে, সে আর তার স্ত্রী নয়। সে Wronskyকে ভালবাসে—সে Wronskyর। Karanine কঠিন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক হ'লেও বিবেকের সাহায্যে আনার ভাবটা বুঝতে পেরেছিল। বাড়তে যখন সে ফিরে এল, তখন দেখলে আনা পুত্র সন্তান প্রসব করেছে—আর তার প্রণয়ী Wronsky সেখানে দাঁড়িয়ে। আনা জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে দেখে, তার ভিতরকার প্রাণটা গলে গেল। সে তাকে প্রাণের সহিত ক্ষমা করল। আনার চোখে এখন তার স্বামী যতটা উঁচে উঠ্‌লো Wronsky ততটা নেমে গেল। আনার বাঁচবার আর আশা নাই দেখে, Wronsky আত্মহত্যা করিল। সাধারণ ঔপন্যাসিকেরা এইখানেই পুস্তক শেষ করতেন; কিন্তু টলষ্টয় তা করেন নাই। তিনি বৃথা কলহ-রস উদ্রেক করবার চেষ্টা করেন নি। আনা ও Wronsky আবার দু'জনেই বেঁচে উঠল। আনা আবার Wronskyর দিকে আগ্রহভরে ছুটল—স্বামীর সহিত আবার মনোমালিন্য হ'ল। Karanine যখন তার স্ত্রীকে ক্ষমা করেছিল, তখন তাকে দেবতা বলেই মনে হয়েছিল; আবার তার স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় দেখতে পাওয়া গেল। আনা ও Wornsky একসঙ্গে গৃহত্যাগ করল। ইটালীতে কিছুদিন থেকে রুশিয়ায় আবার তারা ফিরে এল। তার মানসিক শান্তি একেবারে দূর হয়ে গেল। নিন্দা তার হ'ত না। তাই সে আফিং ধরল। হিংসা ও রাগ তার শরীরে খুব বেশী বেড়ে উঠ্‌লো। Wronskyকেও নানারূপে জ্বালাতন করতে লাগল এবং নিজেও জ্বলতে লাগল। Wronsky এ সময়ে বেশ স্থিরচিত্তে চলতে লাগল; তার প্রেমের বৈলক্ষণ্য কিছুমাত্র দেখা গেল না। সে অনেক সহ্য করল। তার পর যখন ঝগড়া হ'য়ে সে তার মাকে দেখতে গেল, তখন আনা তার অভাবটা খুব বেশী করে অনুভব করতে লাগল। আনা তাকে ডেকে পাঠাল -টেলিগ্রাম করে বলে দিল—শীঘ্র এস। উত্তরে সে বলে পাঠাল—রাত্রি দশটার আগে যেতে পারে না। অস্থিরচিত্ত আনা নিজেই তখন ছুটলো। যখন দুঃখ ও হিংসা অতি মাত্রায় তাকে আক্রমণ করে বসল, তখন প্লাটফর্ম থেকে নেমে যে দ্রুতগামী মালগাড়ীখানা দাঁড়িয়ে ছিল তার সাম্নে ইচ্ছা করেই পড়্‌লো। তার মাথাটা একধারে পড়ে রইল, আর সমস্ত দেহটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। শেষে বেচারা আনার পরিণতি এইরূপ হল।

আর্ণল্ড সাহেব লিখেছেন যে, আমরা এখন এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্বন্ধের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ প্রায়ই থাকে না, আর ফরাসী দেশের উপন্যাসে এই নূতন ভাবটা একটু বেশী রকমে ফুটে উঠেছে। রুষ দেশের উপন্যাসের সঙ্গে, তার মধ্যে আবার প্রধানতঃ টলষ্টয়ের উপন্যাসের সঙ্গে—ফরাসী দেশের বাস্তব উপন্যাসগুলির তুলনাই হয় না। প্রথমতঃ সে সকল উপন্যাসে কোন রকম মনোরম অনুভূতির বিকৃতি দেখতে পাওয়া যায় না। আর যা পাওয়া যায়, তা মিথ্যা কাল্পনিক ও ক্লেশদায়ক অনুভূতি। আলোচ্য উপন্যাসে যেমন, টলষ্টয়

আর রহস্যময়তার জন্য কোনখানেই আমাদিগকে বিশ্বাস করতে হয় না যে Wronsky'র প্রতি ক্যারেনিনার যে আসক্তি এটা একটা বড় অনুভূতি—ইচ্ছাশক্তির আবেশ। দ্বিতীয়তঃ, রুশদেশের ঔপন্যাসিকেরা যে প্রকার আসক্তি ও বাভিচারের বর্ণনা করে থাকেন, সে সব আসক্তি বা বাভিচার করে ফৌজদারী আইনমতে দণ্ড নিতে হয়; তথাপি বলতে হবে, এরা মনস্তত্ত্বের পূজার অর্ঘ্য দিতে মনে করেন না যে, আমরা জগতে একটা বড় কাজ করছি। কারেনিনা' অনেক দিক দিয়ে আছে যে তাতে দুঃখ হয়—অনেক অশ্লীল কথা ও বর্ণনা আছে বলা, কিন্তু এমন কিছু নাই যাতে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামকে পীড়া দেয়। এ সকল পুস্তকের বর্ণনা আমাদের লালসাকে উত্তেজিত করে না; কিন্তু ফরাসী লেখকের উপন্যাস পাঠ করে ইন্দ্রিয় সকল উত্তেজিত হয়; ভোগের দিকে—লালসার দিকে—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দিকে মনটা ছুটে যায়।

এখন আমরা লেভিনের চরিত্র একটু আলোচনা করব। সে চিন্তাশীল, কিন্তু ভগবানে তার বিশ্বাস নেই। বিশ বছরের যুবা থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের প্রৌঢ়রা ফরাসী ও রুশিয়া দেশে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই এ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে; বিশেষতঃ যাহারা বড় ঘরের ছেলে তারা ত ফেলেই ফেলে। লেভিন সমবোপযোগী বৈজ্ঞানিক গবেষণাতে সব কাল করত—বিজ্ঞানের উপর তার খুব আস্থা ছিল। তার বন্ধু-বান্ধব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সতীর্থদিগের সহিত একমত হয়ে সে ঠিক করেছিল ধর্ম্ম বলে কিছুই নেই। চিন্তাশীল ও ভাবুক ছিল বলে সে সকল কার্য্যের একটা কারণ খুঁজে বার করবার জন্য চেষ্টা করত। জীবনটা কি? কোথা থেকে এর আরম্ভ আর কোথায় বা এর শেষ? এ সব প্রশ্নের কোন সঠিক জবাব দিতে না পেরে সে বড়ই চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিল; শেষে আত্মহত্যা করতেও প্রস্তুত হল। কিন্তু এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে সে রক্ষা পেয়েছিল দুইটা কারণ থেকে। সে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ভুল বুঝেছিল যে, বিশ্বসংসারে বিশ্বাসের কোন স্থানই নেই। তাদের খৃষ্টধর্ম্মে আস্থা ছিল না সত্য; কিন্তু তাদের নিয়েই ত আর সমস্ত জগৎটা নয়। সে দেখেছিল, তার প্রিয়তমা পত্নী কিটি এ বিশ্বাস হারায় নি, এবং এর থেকেই সে শান্তি পেত; অধিকন্তু সে দেখত—তাদের দেশের গরীবের ঘরের মেয়েরা প্রায়ই খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিল এবং তাদের মনে শান্তিও ছিল। দ্বিতীয়তঃ সে দেখত, তার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা বিবর্ত্তন-বাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণা করে আনন্দ পেত, এবং তারা কোন দিনই জীবনের উদ্দেশ্য কি সে বিষয়ে চিন্তাই করত না।

এইরূপ যখন তার মানসিক অবস্থা, তখন তার একটী ছেলে হ'ল। তার কচি মুখখানা দেখে সে সব ভুলে গেল—আত্মহত্যা করা আর তার হ'ল না। জগতের অপর পাঁচজনে যেমন বেঁচে থাকে, সে তেমনি বেঁচে রইল।

এই সময় একদিন সে মাঠে গিয়ে একজন চাষাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আচ্ছা বলতে পার, কেন একজন চাষী অন্য চাষীর চেয়ে অধিক মাত্রায় কোমল প্রকৃতির হয়?" উত্তরে সে বলেছিল, "মশায়, মানুষ ত আর সবাই সমান নয়, কেউ মিটিও তাকের মত উদরসর্ব্বস্ব হয়, আবার কেউ জানবুক গ্লেটোর মত আত্মাকে নিয়ে—ভগবানকে নিয়েই থাকে" সে আবার তাকে প্রশ্ন করলে—সে কি রকম? উত্তরে চাষাটী বলেছিল, 'ভগবানের নিয়ম মেনে সত্যের পথে চলা ও আত্মার পথে—ভগবানের জন্য জীবন ধারণ করা একই কথা।" সে কথাটার আর কোন জবাব না দিয়ে সে আপন মনে ভাবতে ভাবতে তার কাছ থেকে চলে গেল। বাস্তবিকই কথাটা যে খাঁটী সত্য তা তার ধারণা হ'ল। আর জীবনে ভাল হবার জন্য সে প্রাণপণে

চেষ্টা করতে লাগল এবং ভগবানের কাছে হৃদয়ে যাতে বল পায় তার জন্য প্রার্থনাও করলো। আমরা আলোচ্য গ্রন্থখানির শেষে টলষ্টয় যে কয়ছত্র লিখেছেন তার বঙ্গানুবাদ করে দিলাম;—আমি প্রার্থনা করবোই থাকবো; কিন্তু কেন যে এ কাজ করি, তারও সদুত্তর দিতে পারবো না। আমার প্রাণ এখন কিন্তু মুক্তির আস্বাদন পেয়েছে; ঘটনার দাস আর হতে চায় না এবং জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত ভাল কাজ করিতে প্রাণ চায়।

লেভিনের প্রকৃত ধর্ম্মের আস্বাদ পাওয়াটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। পূর্ব্বে যে কথা বলেছি সে কথার পুনরুক্তি করে আবার বলি, ঋষি টলষ্টয় ধর্ম্ম জীবনে যে প্রত্যক্ষ সত্য অনুভব করেছিলেন ও My Confession, My Religion প্রভৃতি নিবন্ধে যে কথাটা ব্যাখ্যান করেছেন, সেই সত্যটাই লেভিনের চরিত্রে দেখিয়েছেন। আর্ণল্ড সাহেবের একটী ছত্র উদ্ধৃত করে প্রবন্ধটীর শেষ করলাম :—"But in Levine's religions experiences Count Tollstoi was relating his own."

সন্ন্যাসী

(গল্প)

[শ্রীঅজয় কুমার সেন]

(১)

সুচারুভূষণ তাহার বৌদিদিকে গম্ভীর স্বরে কহিল, "বৌদি, বারবার যদি বিয়ের কথা আমার কাণের কাছে বোলবে, তা' হ'লে কিন্তু ভাল হবে না তা' এখন থেকে বলে রাখ্‌ছি।"

তাহার বৌদিদি তাহাকে রাগাইয়া মজা দেখিবার জন্য মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা ঠাকুর পো, কি ভাল হবে না শুনি—বিয়ে কোরবে না এই ত—না আর কথা আছে?" বলিয়া তিনি উৎসুক-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

বৌদিদির জবাব শুনিয়া সুচারুভূষণ আরও গম্ভীর হইয়া কহিল, "আর যা' আছে পরে তা' টের পাবে; তখন কিন্তু হা-হুতাশ কোরতে থাকবে, তা' এখন থেকেই বলে রাখ্‌ছি!" তাহার সমস্ত মুখখানা আরো অসম্ভব রকমের গম্ভীর হইয়া উঠিল।

সুচারুভূষণের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া তাহার বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, "কি জানতে পারব ঠাকুর পো? না হয় শেষকালে বেরিয়ে যাবে—এই জন্য বুঝি হা-হুতাশ কোরব?" বলিয়া তিনি মৃদু হাসিলেন।

বৌদিদির কথায় বাধা দিয়া সে কহিল, "সে যাই করি না কেন—পরে তা' জানতে পারবে। এখন যদি বলে ফেলি তা' হোলে ত সব কেঁসেই গেল—আমাকে বুঝি এত বোকা ঠাওরেছ বৌদি?"

"না, না, তুমি বোকা হোতে যাবে কেন—তুমি মস্ত সেয়ানা পুরুষ!" বলিয়া বৌদিদি যেমন ঘর হইতে বাহির হইবেন, অমনি বাহিরে শেখরনাথ তাঁহার পথ রুদ্ধ করিয়া কহিলেন, "কে এমন মস্ত সেয়ানা পুরুষ?—"

কিরণ শেখরনাথের হাত ঠেলিয়া দিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিয়া কহিলেন, "নাও, নাও, এখন কথা রেখে পথ ছেড়ে দাও—আমি, যাই।" বলিয়া তাঁহাকে আবার সরাইয়া পথ

করিতে গেলেন; কিন্তু বাধা পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি যে কর তার ঠিক নেই! ওখানে ঠাকুরপো রয়েছে—সে খেয়াল কি নেই?"

"সে খেয়ালই যদি থাকতে, তবে আর তোমার সঙ্গে এই রকমের ছেলেমানুষি করি?" বলিয়া শেখরনাথ ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, সুচারু টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া একখানা পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছে।

দাদাকে দেখিতে পাইয়া সুচারু আর কোন কথা না বলিয়া যেমন ঘর হইতে বাহির হইবে, অমনি তাহার বৌদিদি পুনরায় আসিয়া কহিলেন, "ঠাকুর পো, শোন একটা কথা আছে।"

"না আমি বারবার তোমার কথা শুনতে পারি না; তোমার কেবল এক কথা। ও ছাড়া কি অন্য কথা নেই বৌদি?" সে রাগিয়া ঘরের বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

সুচারুকে রাগিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া, শেখরনাথ কিরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এমন কথা যা' আমি শুনতে পারি না?"

"না, এমন কিছু গোপনীয় কথা নয়—যা' তোমার শুনতে নিষেধ আছে। কথা আর কি—আমার বড় ইচ্ছা যে ললিতার সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে দিই।" বলিয়া স্বামীর দিকে উত্তরের আশায় উৎসুক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

"তা'ত ভালই হয়, কিন্তু সুচারু কি বিয়ে করতে রাজী হ'বে?" বলিয়া শেখর একটু চিন্তিত হইয়া উঠিলেন; কারণ অনেকবার শেখরনাথ সুচারুর জন্য ভাল ভাল সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বিবাহ করিতে কোন মতেই রাজী হয় নাই। এখন যে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইবে, এ ভরসা তাঁহার অতি কমই ছিল।

স্বামীর কথা শুনিয়া কিরণ আর বিশেষ কিছু না বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ সুচারু আসিয়া কহিল, "বৌদি বড় ক্ষিদে—পেট জ্বলছে।"

ম্লিষ্ট কণ্ঠে বৌদিদি কহিলেন, "এস খাবে এস।" বলিয়া তাঁহার ঘরের দিকে চলিলেন।

সুচারুকে জুতাসমেত তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিতে দেখিয়া কিরণ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "লক্ষ্মী ঠাকুর পো, জুতোটা খুলে এস—খুলে এস। তোমার দাদার আলায় ও ঘরে টেকা দায় হোয়ে উঠেছে, আবার যদি তুমি এই রকম আরম্ভ কর, তা' হ'লে আমাকে বাড়ী ছেড়ে বনে পালাতে হবে।"

"না বৌদি, তুমি পালাতে যাবে কেন—তোমাদের দু'জনকার আলায় আমাকেই হয়ত পালাতে হবে।" বলিয়া সে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিরণ সুচারুকে হাসিতে দেখিয়া কহিলেন, "বুড়ো ছেলের আবার হাসা হচ্ছে—হাসতে লজ্জা হয় না?" বলিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া নিজের কাজে মন দিলেন।

"বৌদি মাপ কর—আর কখনও হবে না।" বলিয়া সুচারু নীরবে আহারে মন দিল।

কিরণ তাহার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। সুচারুর মুখের দিকে চাহিতেই তাঁহার গাম্ভীর্য্য এক নিমেষে ছুটিয়া গেল, তিনি সুচারুকে স্নেহের সুরে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর পো, আমার একটা সাধও কি তুমি পূর্ণ করবে না?"

সুচারু সে কথার কোন জবাব না দিয়া আপন মনে আহার করিতে লাগিল।

(২)

ললিতার সহিত সুচারুর বিবাহ দেওয়া কিরণের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। যখন তিনি কোন মতেই সুচারুকে বিবাহে সম্মত করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার মন ব্যথায় ভরিয়া গেল।

সংসারে ললিতার আপনার জন বলিতে আর কেহই ছিল না—দূর সম্পর্কের এক মামা তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তিনি নিজের পুত্র কন্যা

লইয়াই সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন। শোকাভাব ও অর্থাভাব প্রযুক্ত ললিতার জন্য বড় একটা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই; অথচ ললিতারও বিবাহের বয়স দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছিল। এই সব বিপদের মাঝে হঠাৎ একদিন কিরণ আসিয়া মামাকে কহিলেন, "মামা, ললিতাকে আমি নিয়ে যাই। তাকে দেখে যদি ঠাকুরপোর বিয়ে কর্‌তে মত হয়।"

কিরণের কথা শুনিয়া তাঁহার মামার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। অতিকষ্টে অশ্রুসংবরণ করিয়া তিনি কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ মা, যদি ওর জন্য কিছু কর্‌তে পারিস্। আমার ত দেখ্‌তেই পাচ্ছিস্—কি ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়ে আছি।" বলিয়া তিনি করুণ নয়নে কিরণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিরণ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "মামা, আপনাকে আর বেশী কিছু বোল্‌তে হবে না—আমি সবই বুঝি।"

ঠিক সেই সময় ললিতা ঘরে ঢুকিতেই কিরণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ললিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ললিতা, আমার সঙ্গে যাবি?"

দিদির কথায় ললিতার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে আনন্দে কিরণের সহিত যাইতে সম্মত হইল।

যাত্রার দিন মামী ললিতাকে কহিলেন, "হাঁরে ললিতা তুই তবে কিরণের সঙ্গে যাচ্ছিস? তা' যা বাছা—এখানে তোর বড়ই কষ্ট হচ্ছে। যা কিরণের কাছে দিন কতক থেকে আয়।" বলিয়া তিনি গভীর স্নেহে ললিতার চিবুকে চুম্বনরেখা মুদ্রিত করিয়া দিলেন। ললিতাও মামীমার পদধূলি লইয়া যেমন দাঁড়াইবে, অমনি কিরণ আসিয়া কহিলেন, "মামীমা, আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেলাম। আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?" কিরণ তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া বলিলেন, "আমি ওকে নিয়ে চল্লুম মামীমা।" মামীমা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলেন,—"তা ওকে নিয়ে যাও মা—দেখো যদি ওর—" তাঁহার কথা আর বাহির হইল না। তিনি আঁচলে চক্ষু মুছিলেন। বাস্তবিকই তিনি ললিতাকে তাঁহার পুত্রকন্যা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। ললিতাকে লইয়া কিরণ গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া অবধি ললিতা কিরণের সঙ্গে একটা কথাও বলিল না। সে একমনে বাহিরের জনস্রোত দেখিতেছিল। হঠাৎ কিরণ তাহাকে বলিলেন, "কি ভাবছিস্ রে ললিতা? আমার সঙ্গে যেতে বুঝি তোর কষ্ট হচ্ছে?"

ললিতা মুখ ফিরাইয়া কহিল, "না দিদি, কষ্ট হবে কেন?

কিরণ আর ললিতাকে অধিক কিছু বলিলেন না, তিনি মনে মনে ললিতার অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

যখন ললিতার মা তাহাকে পাঁচ বছরের রাখিয়া চিরদিনের মত চলিয়া গেলেন—তখন এই মামা-মামীই তাহাকে মানুষ করিবার ভার লইলেন। তাঁহারা কত দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়াই না ললিতাকে মানুষ করিয়াছেন! সে কথা মনে করিয়া তাঁহার চক্ষুর পাতা আর্দ্র হইয়া উঠিল। কখন যে তাঁহারা বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সে খেয়ালও ছিল না। হঠাৎ সহিসের আহ্বানে চকিত হইয়া কিরণ ললিতাকে কহিলেন, "ললিতা বোন এস—এই আমাদের বাড়ী।" বলিয়া তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। ললিতাও তাঁহার পিছনে নামিয়া আসিল।

কিরণ ললিতাকে সঙ্গে লইয়া একে একে সব ঘর দেখাইয়া শেষে নিজের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। দিদির প্রকাণ্ড বাড়ী, ঘরজোড়া আসবাব পত্র প্রভৃতি দেখিয়া ললিতা চমকিত হইয়া গেল—মনে মনে ভাবিল,—দিদির এত ঐশ্বর্য্য!

(৩)

বৌদিদির আগমন সংবাদে সুচারুভূষণ তাঁহাকে খুঁজিতে আসিয়া দেখিল, অনিন্দ্য-সুন্দরী এক কিশোরী বৌদিদির কাছে বসিয়া আছে। বিস্ময়ে ও লজ্জায় সুচারুর আপাদমস্তক রাঙা হইয়া উঠিল; সে যে জন্য বৌদিদির নিকট আসিয়াছিল তাহা বলিতে না পারিয়া যেমন নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইবে, অমনি তাহার বৌদিদি ব্যগ্র কণ্ঠে কহিলেন, "ঠাকুরপো, শুনে যাও—একটা কথা আছে।"

"এখন কথা থাক্ বৌদিদি—পরে তা' হ'বে।" বলিয়া সুচারু দ্রুতপদে অন্দর ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

দিদির মুখ হইতে 'ঠাকুরপো' সম্বোধন শুনিয়া চকিতে ললিতা একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল। লজ্জায় তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তিম হইয়া উঠিল। সে অত্যন্ত জড়সড় ভাবে একপাশে সরিয়া বসিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া সুচারু যেমন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, অমনই তাহার মনের মধ্যে এক বিপ্লব বাধিয়া উঠিল। সে ভাবিল, কি জানি উনি কি মনে করিয়া চলিয়া গেলেন! সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

সহসা কিরণ বলিয়া উঠিলেন, "ললিতা, তুই এই পানগুলি সাজ, আমি একবার দেখে আসি—নইলে ঠাকুরপো হয়ত না খেয়েই চলে যাবে" বলিয়া কিরণ ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

ললিতার পান-সাজা শেষ হইয়া গেল; সে উঠিবার উপক্রম করিতেই সুচারুভূষণ ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে অভিমানের সুরে কহিল, "বৌদিদি, এখনও বুঝি পান সাজা হোল না—ও ছাই না হয় একটু থাক-না?" কথাটা শেষ করিয়া সে যেমন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, অমনি বৌদিদির পরিবর্ত্তে সেখানে ললিতাকে দেখিয়া লজ্জায় চুপ করিয়া গেল। তারপর কি মনে করিয়া সে ললিতাকেই উদ্দেশ করিয়া কহিল, "বৌদিদি কোথায় জানেন?"

ললিতা লজ্জাজড়িত অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "দিদি এইমাত্র আপনারই খোঁজে বেরিয়ে গেলেন।" সুচারু ইতিমধ্যে একবার এই অপরিচিতা কিশোরীর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল।

সুচারুভূষণ চলিয়া গেল। ললিতা যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে নিজের এই অতর্কিত বিপদের কথা স্মরণ করিয়া মরমে মরিয়া গেল।

ললিতা যখন আপন মনে এই আকস্মিক ঘটনার কথা তোলাপাড়া করিতেছিল, তখন কিরণ ব্যস্ত ভাবে আসিয়া কহিলেন, "ললিতা, সুচারু কি এসেছিল?"

"হাঁ দিদি, তিনি এসে বল্লেন, বৌদিদি কোথায়। আমি বল্লাম, তিনি আপনার খোঁজে গিয়েছেন।" কিরণ অসহিষ্ণু হইয়া কহিলেন, "দেখ্‌ছি ঠাকুরপোর জন্যে আমায় পাগল হ'য়ে যেতে হবে। একা এর জন্যই এই রকম—না জানি গর্ভের সন্তান হোলে আরো কি হবে।" তিনি ঘরের বাহির হইতেই সুচারু সাম্‌নে আসিয়া কহিল, "আচ্ছা বৌদিদি, তুমি কি কেবল লুকিয়ে লুকিয়েই বেড়াবে—খেতে কি দেবে না?" সুচারুকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার বৌদিদি কহিলেন, ঠাকুরপো, চলে যাচ্ছ কেন—এ ঘরে কি বাঘ আছে যে, এত ভয়?"

সুচারু বৌদিদির কথার উত্তর দিয়া কহিল, "খেতে দেবে কি না তাই বল, বাঘ-টাঘ আছে কি না আছে—সে সব আমি জানি না।"

"তুমি একবার এ ঘরে এস, আমার দরকার আছে; তারপর তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।" বলিয়া কিরণ দাঁড়াইয়া রহিল।

সুচারু বেগতিক দেখিয়া ঘরে ঢুকিতেই কিরণ ললিতাকে কহিলেন, "ললিতা, ঠাকুরপোকে প্রণাম কর।"

ললিতা যেমন গলবস্ত্রীকৃতবাসে সুচারুকে প্রণাম করিবে, অমনি সে পা দুটী সরাইয়া লইয়া কহিল, "ও কি করেন—ও কি করেন, পায়ে হাত দেবেন না।"

ললিতা অগত্যা ভূমিতেই মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল।

কিরণ হাসিয়া কহিলেন, "ঠাকুরপো, ললিতা তোমাকে প্রণাম কোর্‌ল, তুমি একটা কিছু আশীর্ব্বাদ করলে না—যাতে ওর বিয়েটা শীঘ্র হোয়ে যায়—"

কিরণের মুখে দুষ্টামীর হাসি ফুটিয়া উঠিল। সুচারু ধীরভাবে বলিল, "আমি আশীর্ব্বাদ কোর্‌লেই যদি ওঁর বিয়ে শীগ্‌গির হোয়ে যায়, তা হ'লে—আমি সেই রকমই আশীর্ব্বাদ কর্‌লুম।"

"মনে মনে আশীর্ব্বাদ কোর্‌লে তার কোন ফল হয় না ঠাকুরপো!" বলিয়া কিরণ চকিতে ললিতাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "আমিও তোকে সেই আশীর্ব্বাদই কোর্‌ছি ললিতা।" তিনি ললিতাকে আরো নিবিড়ভাবে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন; মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলেন—যেন ললিতা তাঁহার এই সদানন্দ ঠাকুরপোর যোগ্য হইতে পারে।

দিদির স্নিগ্ধশীতল, স্নেহের ছায়ায় দাঁড়াইয়া ললিতা কি ভাবিল, তাহার পদ্মের পাপড়ির মত দুই চক্ষু হইতে শিশির বিন্দুর মত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। কি যেন একটা স্বপ্নময় পুলকে তাহার সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ বহিয়া গেল।

হঠাৎ ললিতার আবেশ ভঙ্গ করিয়া সুচারু বলিয়া উঠিল, "আমি তবে চল্লুম বৌদি।"

কিরণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইয়া গেল।

(৪)

সেই রাত্রেই সুচারুভূষণ গৃহত্যাগ করিল। অনেকদিন হইতেই তাহার রামকৃষ্ণমিশনে যোগ দিবার ইচ্ছা ছিল। এই সুযোগে সে নর-নারায়ণের সেবার ভার লইয়া মিশনের কাজে অন্য দেশে চলিয়া গেল।

তাহার একদিনও মনে হয় নাই যে, সে এমন করিয়া হঠাৎ গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইবে। যাহার এমন স্নেহময় দাদা এবং স্নেহময়ী বৌদিদি বর্ত্তমান—সংসারে তাহার আবার কিসের দুঃখ! তবুও তাহার মনে হইল যে, সে একটা বাঁধন বন্ধন এড়াইয়া চলিয়া আসিয়াছে। বিবাহে তাহার কোন দিনই ইচ্ছা ছিল না; তাই বৌদিদির সহিত ললিতাকে আসিতে দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল—এইবার তাহার অগ্নি-পরীক্ষার সময় আসিয়াছে। তাই সে গৃহত্যাগ করিল। বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়া প্রথমে তাহার মনে একটু চাঞ্চল্যের ভাব দেখা দিয়াছিল, সে তাহার স্নেহময়ী বৌদিদিকে ভুলিবার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছিল। তাই সে মন আরো দৃঢ় করিয়া পূর্ণোদ্যমে কাজ করিতে লাগিল। যখন তাহার কার্য্যের ক্ষিপ্রতা দেখিয়া সহযোগী সন্ন্যাসিবৃন্দ একবাক্যে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন তাহার চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া বলিল, "এই তুচ্ছ প্রাণ যদি নর-নারায়ণের সেবায় না যায় করিলাম, তবে আর জীবন ধারণে ফল কি?"

কিন্তু এই সব চিন্তার মধ্যেও মাঝে মাঝে বৌদিদির ব্যথিত মুখ তাহার মনে পড়িত। আর মনে পড়িত—ললিতার ঈষৎ লাজ সরম-জড়িত মুখখানি। কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। ললিতার সরল সুন্দর মুখ যতটা তাহাকে বেদনা না দিত, বৌদিদির সদাস্নেহময় মুখ তাহার অন্তরে একটা বেদনার সঞ্চার করিত।

কিছুদিন চলিয়া গিয়াছে। সুচারুভূষণ একদিন চিন্তার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে, এমন সময় আশ্রমের এক ব্রহ্মচারী আসিয়া কহিলেন, "স্বামীজীর আদেশ, কাল প্রত্যূষেই আমাদের প্রয়াগ যাত্রা

করিতে হইবে। আগামী সোমবারে কুম্ভমেলা। সেখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হইবে—মিশনের উপস্থিত থাকা বিশেষ প্রয়োজন।"

ব্রহ্মচারীর কথায় চমক ভাঙ্গিলে, সে বিষম লজ্জিত হইল। কোন কথা বলিবার অবকাশ না পাইয়া শুধু তাঁহার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। ব্রহ্মচারীও তাহার অবস্থা সম্যক-রূপে বুঝিতে পারিয়া সংযত কণ্ঠে কহিলেন, "আপনার বুঝি বাড়ীর কথা হঠাৎ মনে পড়িয়াছিল, তাই আপনি চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছিলেন? এটা যে মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা।" বলিয়া ব্রহ্মচারী চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই সুচারু কাতর কণ্ঠে কহিল, "ভাই এ সব চিন্তা নিবারণের উপায় কি?"

"একমাত্র ভগবানের উপর আত্ম-সমর্পণ ভিন্ন অন্য পথ যে নাই ভাই।"

ব্রহ্মচারীর উপদেশ তাহার মনে বড় বাজিল। সে ভাবিল—একি দুর্বলতা—একি পরিহাস! সে কি তবে এতদিন আত্মবঞ্চনা করিতেছে? সে মন দৃঢ় করিল—তাহার মন হইতে আত্মীয় স্বজনের চিন্তা দূর হইয়া গেল—তৎপরিবর্ত্তে একটা পবিত্র আনন্দের স্পন্দন অনুভব করিল। তাহার মানস-চক্ষে ভাসিয়া উঠিল—ভগবানের সুন্দরপ্রসারিত শান্তির রাজ্য। সে তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেল।

(৫)

কুম্ভমেলায় স্নান করিবার জন্য নানাদেশ হইতে বহু মুক্তিপ্রয়াসী সাধু সন্ন্যাসী ও নর-নারীর আবির্ভাব হইয়াছে। জনস্রোতের সে দৃশ্য অবর্ণনীয়। গঙ্গা ও যমুনার বিশাল সঙ্গম বিপুল জনসমাগমে চঞ্চল—বিক্ষুব্ধ।

গঙ্গার বিশাল বালুতটে মিশনের সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাত্রীদের যাহাতে কোন রকম অসুবিধা না হয়, সেইজন্য সেবাশ্রমের সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বদাই তৎপর। যাত্রীদের মধ্যে কাহারও অসুখের সংবাদ পাইলেই সেবাশ্রমের সন্ন্যাসিরা গিয়া অতি যত্নে তাহাকে আশ্রমে লইয়া আসিয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়া ভাল হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেন। নর-নারায়ণের সেবায় রত হইয়া পবিত্র কাজে সুচারুভূষণের মন আনন্দে মাতিয়া উঠিল—সে প্রাণে একটা বিমল শান্তি অনুভব করিল।

একদিন সুচারুভূষণ অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছে। তখন আলো-আঁধারের সম্মিলনে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থল কি যেন একটা মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। গঙ্গাগর্ভে নামিতেই, অদূরে দেখিতে পাইল—একটি শ্বেতবর্ণের কি যেন জলের উপর ভাসিতেছে। তাহার মনে সন্দেহ হইল—তৎক্ষণাৎ সে সাঁতার দিয়া নিকটে গিয়া দেখিল—কাপড়ের আঁচল স্রোতের বেগে কাঁপিতেছে। আঁচল ধরিয়া টান দিবা মাত্র তাহা বেশ ভারী বলিয়া তাহার বোধ হইল। তাহার মনে হইল, হয়ত কেহ স্রোতের বেগে নদীগর্ভে ভাসিয়া আসিয়াছে। সে ডুব দিয়া স্পর্শে যাহা অনুভব করিল, তাহাতে সে আরও বিস্মিত হইয়া গেল।

অধিক চিন্তা না করিয়া সুচারু অনেক কষ্টে জলমগ্ন দেহটীকে তীরে তুলিয়া আনিল। এতক্ষণ তাহার মোটেই হুঁস ছিল না। তীরে উঠিয়া মুখের দিকে চাহিতেই সে অবাক্ হইয়া গেল; সে সেই অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী নারীকে তীরে লইয়া আসিয়া বালুর উপর শোয়াইয়া দিল। বুকের এবং নাকের কাছে হাত দিয়া দেখিল—নিঃশ্বাস অতি ধীরে ধীরে পড়িতেছে।

তখন প্রভাত-সূর্য্যের অরুণ-বরণ কিরণমালা গঙ্গার জলের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মিশনের অন্যান্য সহযোগী সন্ন্যাসিগণ তখন স্নানের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুচারুভূষণ এক দৃষ্টিতে কিশোরীর মুখের গতি পরীক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ আশ্রমের এক ব্রহ্মচারী সুচারুভূষণকে

এরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি একে কি স্রোতের মুখ থেকে বাঁচিয়েছ? প্রাণের স্পন্দন আছে ত? চল এখনি ধরাধরি করে আশ্রমে নিয়ে যাই।"

তখন দুইজনে সেই কিশোরীকে আশ্রমে লইয়া গেল।

(৬)

কয়েকদিন অবিরত সেবার পরও যখন কিশোরীর চেতনার সঞ্চার হইল না, তখন আশ্রমের সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ডাক্তার আসিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরীক্ষা করিয়া যাইতেছেন। সকলেই যেন কেমন এক রকম অবসন্ন হইয়া কখন এই অপরিচিতা কিশোরীর জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, সেই চিন্তাতেই বসিয়া আছেন।

সুচারুভূষণ ও তাহার অন্যান্য সহযোগিগণের অক্লান্ত সেবা ও যত্নে যেন তাহার জীবন রহিয়া গেল। কয়েকদিন দিবারাত্র যমের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যেদিন সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দল সেই অপরিচিতা নারীর জীবন রক্ষায় জয়ী হইলেন, সেই দিন সুচারুভূষণ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

হঠাৎ কিশোরীর চক্ষুর পাতা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। সুচারুভূষণ আশান্বিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিশোরী একবার মাত্র নয়ন মেলিয়া চাহিল ও তাহার পরই আবার চক্ষু বুজিল।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, ভয়ের আর কোন কারণ নাই। এ যাত্রা তাহার জীবন বাঁচিয়া গিয়াছে।

সেদিন তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। দূরে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া গাছের মাথায় জড়াজড়ি করিয়া ধরণীর বুকে নামিয়া আসিতেছিল। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে আলো-আঁধারের এক বিচিত্র সম্মিলনে কি যেন একটা স্বপ্নের জাল চারিদিকে গভীর নীরবতার সূচনা করিতেছিল। গঙ্গার বুকের উপর তখনও ওপারের নৌকার ক্ষীণ আলোকরেখা এক অবিচ্ছিন্ন রক্ত রেখায় চিক্‌মিক্ করিতেছিল। তীর্থযাত্রীদের কুটীর-শ্রেণী হইতে নিঃসৃত কৃণ্ডলীকৃত ধূমরেখা আকাশে-বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

আশ্রমের প্রাঙ্গণে তরুমূলে তখন সন্ন্যাসীর দল সমস্বরে ভগবানের স্তুতিগান করিতেছে। কিন্তু সুচারুভূষণ আজ কি জানি কেমন অন্যমনস্ক। সে একবার বাহিরে আসিয়া বিশ্বের এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না। সে আজ কিছুতেই ভগবানের নামগানে আপনার সুর মিলিত করিতে পারিল না।

গুরুদেবের আদেশে আজ সে রোগিনীর পাশে বসিয়া আছে। গুরুদেব তাহাকে আজ তাহার সেবায় এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম করিতে আদেশ দেন নাই।

সেই সময় রোগিনীর ঘুমের ঘোরে যন্ত্রণায় একবার অস্ফুট শব্দ করিল। সুচারুভূষণ অপলক দৃষ্টিতে কিশোরীর অনিন্দ্যসুন্দর রোগপাণ্ডুর মুখখানি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল।

তাহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া গেল; সে কোন্ মায়াপুরীর রাজ্যে আপনাকে একেবারে হারাইয়া ফেলিল। তারপর হঠাৎ কি জানি কেন, বিস্মৃতির কোন্ অতলগর্ভ হইতে তাহার চক্ষুর সম্মুখে একটা অতীত দিবসের দৃশ্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আজ ললিতার কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে একবারমাত্র ললিতাকে দেখিয়াছিল—তাই আজ এই নির্জ্জন সন্ধ্যায় কিশোরীর নিদ্রিত মুখের দিকে চাহিয়া সুচারু ভাবিল—এ যে তাহারই প্রতিচ্ছবি! সে আবার ভাবিল কিন্তু প্রতিচ্ছবি হইলেও এ ত ললিতা নাও হইতে পারে। ললিতা এই সুদূর প্রয়াগে স্নান করিতে আসিবে কেন? তার ত প্রয়াগে স্নান করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ের সময় হয় নাই। তবে এ কে?

হায়! এত দিন পরে তাহার এ কি চিত্তবিভ্রম! ভগবানের এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! সে যে ব্রহ্মচারী—তাহার পক্ষে এ চিন্তা যে মহাপাপ!

একটা দারুণ লজ্জা, ধিক্কার ও অপমানে তাহার সমস্ত অন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল।—তাহার এ কি অধঃপতন!—এই দুর্বল কাপুরুষ অপবিত্র মন লইয়া সে নরনারায়ণের সেবায় ব্রতী হইয়াছিল!

সুচারু উন্মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া রহিল। অতি কষ্টে আত্ম দমন করিয়া সে ভাবিল—আমি যে কেবল ইহার পরিচর্য্যার ভার পাইয়াছি! এই নারীর সম্বন্ধে চিন্তা করিবার ভারত আমার নয়! ভগবান এ কি করিলে!

হঠাৎ রোগিনী পাশ ফিরিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "একটু জল।" সুচারুর চিন্তাসূত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল; সে কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া তাহার মুখের মধ্যে বিন্দু বিন্দু ঢালিয়া দিল। রোগিনী তাহাতে সুস্থ বোধ করিল, বলিল—"আমি কোথায়?"

সুচারু ধীর কণ্ঠে বলিল, "আপনি ভাল হাসপাতালেই আছেন। এটা একটা আশ্রম—আপনি কোন চিন্তা করবেন না।"

তাহাকে অনেক দিনের পর কথা বলিতে শুনিয়া সুচারু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। সে ভাবিল, তাহার সেবা সার্থক হইয়াছে।

কিশোরী আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আমি এখানে কেমন করে এলাম?" সুচারু বলিল, "আমরাই আপনাকে স্রোতের মুখ থেকে বাঁচিয়েছি। আপনি এখানে নিরাপদেই আছেন।"

কিশোরী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "আমার দিদি কোথায়?"

সুচারু বলিল, "আপনি সেরে উঠলে তাঁর কাছে আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।"

কিশোরী কিছু না বলিয়া সুচারুর মুখের দিকে যেন কেমন একটা ঔৎসুক্যমিশ্রিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে ছটা ও চেহারার মধ্যে সুচারুকে চিনিতে পারিল না।

আশ্রমবাসিগণের যত্নে ও সেবায় কিশোরী অল্প দিনের মধ্যেই বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। সে একদিন সুচারুভূষণকে বলিল "আমাকে দিদির কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।"

সুচারু কি যেন ভাবিয়া বলিল—"আপনার দিদির কাছে? আচ্ছা তা, আমি স্বামীজীকে বলব—তিনি যা আদেশ দেবেন তাই হবে।"

স্বামীজী এতদিন সবই লক্ষ্য করিতে ছিলেন। এখন দেখিলেন যে, কিশোরীকে আর আশ্রমে রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়। মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞ বহুদর্শী সন্ন্যাসী বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, সংসারত্যাগী যুবকদের সম্মুখে একজন অপরিচিতা নারীর অবস্থান মোটেই শুভ নহে। তাই তিনি আদেশ দিলেন, কিশোরীকে শীঘ্রই গৃহে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

সেদিন সকলে সুচারুভূষণ আশ্রমের অন্যান্য রোগী-দিগের পরিচর্য্যায় ব্যস্ত, এমন সময় স্বামীজী আসিয়া তাহাকে জানাইলেন যে, কালই তাহাকে বালিকাকে লইয়া গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে হইবে। তিনি বালিকার ঠিকানা প্রভৃতি সুচারুকে জানাইলেন।

স্বামীজীর নিকট কিশোরীর কলিকাতার ঠিকানা শুনিয়া সুচারুর মন বিস্ময়ে ভরিয়া গেল। হঠাৎ বিস্মৃতির যবনিকা তাহার মানসপট হইতে সরিয়া গেল—একটা সুখের চিত্র তাহার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল। সেই স্নেহময়ী বৌদিদি—স্নেহময় দাদা, আজ কোথায়। তাহার গৃহত্যাগ না জানি সেই স্নেহময়ীর—করুণাময়ীর প্রাণে কি কঠোর ভাবেই বাজিয়াছে! তাহার দাদা না জানি ভাইয়ের শোকে কেমন উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন!

হঠাৎ স্বামীজীর কথায় তাহার চমক্ ভাঙ্গিল। সে তাঁহার কথার উত্তরে একটা অনাবশ্যক উত্তর দিল। স্বামীজী তাঁহার এই তরুণ শিষ্যের ভাব বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন,

—"বাবা, কলকাতার ঠিকানা শুনে অমন অন্যমনস্ক হয়ে উঠ্‌লে কেন? শেখর বাবু কি তোমার পরিচিত?"

সুচারু স্বামীজীর কথার কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না; আজ তাহার অন্তর মিথ্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—তাহার সমস্ত মন বলিয়া উঠিল—এক মিথ্যার অভিনয়। মনের স্বাভাবিক ক্ষুধা যে তাহার অতৃপ্তই রহিয়া গিয়াছে—তবে সে কিসের জন্য সংসার ছাড়িয়া নর-নারায়ণের সেবায় ব্রতী হইয়াছিল। কে যেন তাহার হৃদয়ের গোপন পুর হইতে তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—চলে যাও কাপুরুষ! সংসারের চিন্তা এখনও তোমাকে ছাড়ে নাই—স্নেহ মমতার বন্ধন যে তোমার মুক্ত হয় নাই!

সুচারু অপরাধীর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ সে ছল ছল নেত্রে স্বামীজীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"প্রভো, আমার একি হ'ল? আমার সব ব্রহ্মচর্য্য যে ভেসে গেল! শেখর বাবু আমার দাদা—এ কিশোরী যে আমার পরিচিত।"

স্বামীজী বিস্ময়ে চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি সংসারেই ফিরে যাও। সংসারেও ত নর-নারায়ণের সেবা আছে—তুমি সেই কাজেই ব্রতী হোয়ো—"

তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। বাস্তবিক, তিনি সুচারুকে তাঁহার তরুণ শিষ্যদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ করিতেন। তাই তাহাকে বিদায় দিতে হইবে বলিয়া তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল; তিনি সুচারুর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"বাবা সংসারে থেকেও একথা যেন মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুলে যেও না যে, নর-নারায়ণের সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সেই কাজে সফল হও।"

স্বামীজী আর দাঁড়াইলেন না। সুচারু আশ্রমের ভিতর তাহার নির্দ্দিষ্ট ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

গাড়ীতে সুচারু বুঝিতে পারিল, মানসিক চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য শেখরনাথ কিরণ ও ললিতাকে লইয়া তীর্থ ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন। প্রয়াগের জনস্রোতে তাঁহারা ললিতাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ললিতা স্নানের সময় ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া স্রোতের বেগে ভুবিয়া গিয়াছিল, তাই সুচারু তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিল। শেখর কয়েকদিন অবিরত সন্ধান করিয়াও যখন ললিতার কোন খবর পাইলেন না, তখন তিনি কিরণকে লইয়া শূন্য মনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

সুচারু দেখিল, ললিতা তাহাকে চিনিতে পারে নাই। তাহার জটা ও বৈরিক বসনের মধ্যে ললিতা সুচারুকে ধরিতে পারিল না। ললিতা মাত্র একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য সুচারুকে দেখিয়াছিল—তাই সে এতকাল পরে তাহাকে চিনিতে পারিল না। সুচারুও বিশেষ কিছু বলিল না।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সুচারুচরণ যখন হঠাৎ ললিতাকে লইয়া তাহাদের সেই চিরপরিচিত গৃহের সম্মুখে আসিয়া নামিল, তখন সুচারুর মুখ লজ্জা ও ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। সে ললিতাকে লইয়া যখন একেবারে অন্দরের ভিতর প্রবেশ করিল, তখন ললিতা সন্ন্যাসীর মুখের দিকে বিস্ময়াপ্লুত নেত্রে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ তাহার কি মনে হইল, সে আর একবার সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল।

টপ্‌টপ্‌ করিয়া সিঁড়ি দিয়া বিতলে উঠিয়া যখন সুচারু কাতরকণ্ঠে "বৌদিদি, বৌদিদি" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন ললিতা সন্ন্যাসীর পার্শ্ব হইতে জড়সড় ভাবে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। লজ্জায় তাহার আপাদমস্তক রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

কিরণ তখন সবেমাত্র রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠের তৃষিত আহ্বান শুনিয়া কিরণ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুচারুর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি

ছুটিয়া আসিলেন। সুচারু অবসন্ন হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

• • •

তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। শেখরনাথ আপিস হইতে গৃহে ফিরেন নাই। সুচারু গৈরিক বসন ত্যাগ করিয়া যেমন সেই পরিচিত সুরে আবদার করিয়া বলিল—"ও বৌদি, কৈ খাবার নিয়ে এস—ক'দিন যে ভাল করে খাওয়া হয়নি—তার খোঁজ রাখ?"

কিরণ হাসিতে হাসিতে আসিয়া রহস্য করিয়া বলিলেন—"বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাবার সময় ত বৌদিদির কথা মনে ছিল না! বলি, বাড়ীতে কি ললিতাকে পেতে না যে, সন্ন্যাসী হ'য়ে তপস্যা ক'রে তাকে নিয়ে আসবে?"

এবার আর সুচারু বৌদিদির কথায় পূর্ব্বের মত রাগ করিল না; সে বলিল—"আচ্ছা আচ্ছা—ঢের হ'য়েছে! একজনকে বাঁচালে যদি দোষ হয়, তবে ও কাজ আর করছি না।" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই শেখরনাথ আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুচারু তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি তাহাকে গভীর স্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

ললিতা শেখরনাথের পদধূলি লইতে গেল; শেখরনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"থাক্—থাক্—!" ঠিক সেই সময় কিরণ হাসিয়া রহস্যের সুরে বলিলেন "এ প্রণাম না পাও ত তুমিই ঠকে যাবে—মনে থাকে যেন, ললিতা আর তোমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে না। তুমি যেমন বোকা, তার শেষ প্রণামটা আর নিলে না!"

গভীর লজ্জায় সুচারু ও ললিতার কর্ণমূল রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

কল্পসৃষ্টি

(শ্রীকালিদাস রায় বি. এ. কবিশেখর)

তোমারে লভিনি যবে, পশিত শ্রবণে
যে ভূষাশিঞ্জনমঞ্জু, কূজনে গুঞ্জনে,
যে মধুর বাণী বীণা-বেণুর ঝঙ্কারে;
যে পরশ লভিতায় বলয়-সঞ্চারে,
যে নয়ন-প্রসন্নতা নির্ম্মেঘ আকাশে,
চরণ-চারুতা যাহা সরোজ বিলাসে,
যে কৃষ্ণ-কুণ্ডল-কান্তি আষাঢ় নীরদে
যে লাবণ্য বন্ধুরতা গিরির সংসর্গে,
যে অধর-অরুণিমা সন্ধ্যাম্বরস্বপনে
হেরিতাম, নিত্যনব মানস-নয়নে,
তোমা আজি গৃহে লভি, তোমা পানে চাই
একে একে তার সবি কেবল মিলাই
কেমনে,—অবাক হয়ে ভাবি বসে' ঘরে
মিলিছে সে কল্পসৃষ্টি অক্ষরে অক্ষরে?

দীক্ষা

(গল্প)

(শ্রীলীলা দেবী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪

শিউলির মন্ত্র নেওয়া হ'য়ে গেছে। আত্মানন্দ ব্রহ্মচারীর পদধূলি মাথায় নিয়ে শিউলি বল্লে, "আদেশ করুন, কি ভাবে জীবনের পথে চ'লতে হবে?" অনবরত কম্পিত মাথাটি আরও একটু কাঁপিয়ে রেখাঙ্কিত ললাটের নীচে পোটরগত চক্ষু দুটী অর্দ্ধমুদ্রিত ক'রে বৃদ্ধ ব'ল্লেন, "বিয়ে-থাওয়া ক'রে ধর্ম্মের সংসার ক'রো মা। আর এই মন্ত্র দু'সন্ধ্যা দশবার ক'রে জপ ক'রো, তা হলেই তোমাদের মত সংসারীর পক্ষে যথেষ্ট।"

সঙ্কোচ কাটিয়ে শিউলি বল্লে—"আমি যে বিয়েই করব না ঠিক ক'রেছি।"

—"তবে ক'রবে কি?"

—"দেখুন আজকাল আমাদের দেশের কত দুঃখ-দুর্দ্দশা, তার উপর মেয়ের বিয়েতে ভালো ছেলে যোগাড় ক'রতে বাপ-মার যা ভাবনের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। তাই আমার বিশ্বাস, আমার মত দু' একজন মেয়ে যদি অবিবাহিতাই থাকে, তাতে বিশেষ আর কি ক্ষতি হ'তে পারে—".

—"সে কি মা সহজ কথা! তা তুমি দেখো যদি পারো।"

তারপর অনেক দিন অনেক রাত কেটে গেলো। শিউলির মনে অনেক সমস্যা, অনেক জান্‌বার ইচ্ছা, অনেক অপ্রাপ্ত সাধনা অপূর্ণই থেকে যাচ্ছিল। জ্ঞান, কর্ম্ম ও সাধনার প্রবল প্রেরণা শিউলির মনকে দিন দিন উদ্দাম গিরি-নির্ঝরের মত স্বতঃবেগ-বলে ও অদম্য শক্তিতে উচ্ছলিত ক'রে তুল্‌ছিল। এর পরিণামে সে ভোগ ক'রছিল বিপুল অশান্তি! এর মধ্যে গুরুদেবের সঙ্গে শিউলির অনেকবার দেখা হ'য়েছে; কিন্তু একটা সঙ্কোচ ও ভয়মিশ্রিত লজ্জা তার সমস্ত জিজ্ঞাসাকে বদ্ধ ক'রে রেখেছিল। গুরুদেবের অজস্র শিষ্য; সকলের কাছেই তিনি বাঁধা বুলি আওড়ান। অন্য সকলের তাতেই তৃপ্তি হয়, কিন্তু শিউলির মন তাতে তৃপ্তি পায় না! গুরুদেব যদি একটীবারও তার মনের ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করতেন —কিন্তু সে চেষ্টা যে তাঁর মোটেই নেই। চিরেনদা কিন্তু তার মনের প্রত্যেক কোণটীর খবর রাখতেন। সে কোন কথা বলার আগেই তিনি কেমন ক'রে অধীত পুস্তকের মত তার অন্তরের ভাব-টুকু অনায়াসে উপলব্ধি করে নিতেন। চিরেনদা যদি ব্রাহ্মণ হ'তেন, আর তাঁর বয়স যদি গুরুদেবের মতন হ'ত, তাহ'লে—তাহ'লে কি হ'ত ভাববার আগেই তাড়াতাড়ি শিউলি তার চিন্তাস্রোতকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। যা অসম্ভব, তা ভেবে লাভ কি? কিন্তু তাকতে না চাইলেও গোধূলির ম্লান আলোয় পড়বার ঘরে ব'সে ব'সে চিরেনের নির্দ্দিষ্ট আসনের দিকে চেয়ে শিউলি তার শিক্ষকের জ্ঞানোজ্জ্বল তরুণ মুখের সেই মধুর গাম্ভীর্য্য এখনও দেখতে পায়। চিরেনের স্নিগ্ধ চক্ষের সস্নেহ দৃষ্টি এখনও তার বেদনাতুরা প্রাণকে সমবেদনা না জানিয়ে ছাড়ে না। প্রথম প্রথম

দীক্ষা নেওয়ার নূতনত্বে চিরেনের অভাব শিউলি ততটা বুঝতে পারে নি। নূতনত্বটা যত পুরাতন হ'য়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের বিফলতা তত্ই স্পষ্ট হ'য়ে চক্ষুর সামনে তার নগ্ন রূপ দেখিয়ে দিলে। তখন শিউলির সমস্ত অন্তঃকরণ এমন একটা শূন্যতায় ভ'রে উঠলো, যা কাটিয়ে ওঠা শিউলির কুসুম-কোমল দেহ-মনের পক্ষে একান্তই অসাধ্য। সন্ধ্যার অবসরে পড়বার ঘরের শান্ত কোণটী তার সবচেয়ে আরামের ও আকাঙ্ক্ষার হল। সে সময় ভাই বোনদের পদ-শব্দে সে বার বার চম্‌কে উঠতো—ঐ কি তিনি এলেন? নিজের এই অসম্ভব কল্পনায় নিজেই মনে মনে ব্যথাতুর না হ'য়ে তার উপায় ছিল না। একজনের প্রতিদিনের দু' এক ঘণ্টার অভাব যে সমস্ত দিনরাতগুলোকে এমন ভাবে নৈরাশ্যের ধমাট স্তূপে পরিণত ক'রতে পারে, এটাই শিউলির সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব'লে বোধ হ'ত। নিশীথের উপাধান অবিরাম অশ্রুসিক্ত ক'রে যদি বা বুকের ব্যথার শান্তি হয়, আবার প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যে কোথা থেকে পুঞ্জীভূত মেঘ এসে সারা বুকখানা ছেয়ে ফেলে! দুঃখ সবারেই আছে, কিন্তু যার দুঃখ বলবার নয়—জানাবার নয়, সে কেমন ক'রে বাঁচে! আর বলবারই বা কি আছে যে ব'লবে সে! শুধু ব্যর্থতা আর অর্থহীন বেদনা—কাউকে ব'লতে গেলে সে তো হেসেই অস্থির হবে। আত্ম-লাভের ইচ্ছায় গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়া, সে তো একেবারেই বিফল হ'ল; সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা জিনিস সে হারিয়েছে, যার অভাব কিছুতেই মিটছে না। দিনের আলো, চাঁদের কিরণ, ফুলের হাসি, পাতার কাঁপন, পাখীর গান ও অলির গুঞ্জন এ সবের মধ্যে শিউলি ভগবানেরই নানা মূর্ত্তি দেখতে পেতো—কিন্তু এখন সে সব কোথায়!

(৫)

ভগবানের রাজ্যে সত্য যখন চাকা থাকেনা। ছাইচাপা আগুন কতক্ষণ থাকে? শিউলির সরল ভক্তি-নির্ম্মল মন অচিরেই সাধনার পথ খুঁজে পেলে। একদিন ভোরে শিউলি স্বপ্ন দেখ্‌লে, কে যেন তাকে কতকগুলি যোগের প্রণালী শেখাচ্ছে, মনঃস্থিরতার উপায় ব'লে দিচ্ছে। এই রকম প্রায়ই সে দেখতে লাগ্‌লো, আর যত বারই দেখে সেই একই লোক—লোকটির চেহারা ঠিক্ যেন চিরেনদার মতন! শিউলি জোর ক'রে এ কথা মন থেকে তাড়িয়ে দেয়—ছি! ছি! সে যে মন্ত্র নিয়েছে গুরুর কাছে। অন্য লোকের শিক্ষা সে নেবে কেন? তার মন ত কখনই এত হীন নয়। কিন্তু যতই সে নিজেকে ধিক্কার দিক্ ও নিজের কাছে নিজেকে লুকাতে চেষ্টা করুক্,—সেই স্বপ্নকথিত উপায়ে সাধনা তাকে ক'রতেই হ'ল। কে যেন অদৃশ্য অঙ্গুলীর চালনায় তাকে জোর ক'রে আসনে নিয়ে বসিয়ে দেয়, কিছুতেই শিউলি সাধনা না ক'রে থাকতে পারে না। তারপর স্থির মনের স্বচ্ছতায় নূতন ভাবের প্রেরণা শিউলিকে দিয়ে সুললিত রচনায় প্রবৃত্ত করাতে লাগ্‌লো। প্রথম প্রথম শিউলির বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হতো—কেমন ক'রে সে এমন সুন্দর সন্দর্ভ লিখে ফেলে? নিজের লেখা সে প্রথমে খুব গোপনে রাখ্‌লে; কিন্তু ক্রমে ক্রমে শিউলির এই নূতন ক্ষমতা তার দাদা অনিল আবি-ষ্কার ক'রে ফেল্লে। নূতন নূতন শিউলির লজ্জা ক'রত, এখন সে লজ্জা কেটে গিয়েছে। দশজনের হাতে তার লেখার আলোচনা মাসিক পত্রে চ'লছিল। একদিন অনিল এসে ব'লে—"আনিস্ শিউলি, আজ একটা নূতন খবর আছে।"

লেখানিরত চোখ দুটী তুলে শিউলি ব'লে "তোমার তো নূতন খবর, সে আমি আমি জানি—আমায় লিখতে দাও এখন।"

—"সত্যি ব'লছি এ একেবারে নূতন। তোর খুব ভালো লাগ্‌বে—শুনতে চাচ্ছিস্ নি, পরে কিন্তু পস্তাবি।"

"আচ্ছা, ব'লে ফেলো চট্ ক'রে, এই পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি।"

—"শুনতে আরম্ভ ক'রলে এক ঘণ্টা শুনেও যদি তোর তৃপ্তি না হয়?"

—"সত্যি ব'লছি দাদা, তুমি বড্ড বাজে বকো, কি ব'লবে ব'লেই ফেলোনা।"

এতক্ষণে ভগ্নির ঔৎসুক্য বেশ জমে উঠেছে দেখে তাকে রাগাবার ফন্দিতে কিছু না ব'লেই অনিল ঘর থেকে চ'লে যাচ্ছিল। শিউলি তাড়াতাড়ি অনিলের পাঞ্জাবিতে এক টান দিয়ে ব'লে—"বেশ লোক তুমি যা হ'ক। curiosity জাগিয়ে দিয়ে এখন পালান হ'চ্ছে।" হাসতে হাসতে অনিল ব'লে "মেয়েদের curiosity চিরপ্রসিদ্ধ, তার প্রমাণ তোর পাঞ্জাবী-টানা।"

—"আচ্ছা বেশ, মেয়েদের কেবল দোষই আছে—গুণ কিছু নেই; এখন তুমি কথাটা ব'লে ফেলো দিকি।"

—"আমার আপিসের এক বন্ধুর কাছে খবর পেলুম—তাদের দেশ যশোর জেলায় বনগ্রামে। সেখান থেকে তার দাদা লিখেছে, বনগ্রামের চিরেন্দ্র নাথ বসুর মতন এমন লোক যদি দেশের প্রত্যেক গ্রামে থাকতো, তা হ'লে এ দেশের এমন দুর্দশা থাকতো না। তিনি দেশে গিয়ে অবধি দেশের শ্রী ফিরে গেছে। এমন দয়ালু, পরোপকারী মানুষের লোক তারা আর দেখেনি।—তিনি এমনই প্রিয়দর্শন যে, সবাই তাঁকে ভাল বাসে। তার উপর আরো একটু লিখেছে যে, তিনি একজন মস্ত যোগী হ'য়েও কাউকে তা জানতে দেন না; ঠিক সাধারণের মতই থাকেন, কেউ জানতেই পারে না যে, তিনি একজন সন্ন্যাসী; অথচ তাঁর অবসর কাল যোগ-সাধনাতেই কেটে যায়। শেষে ঠিকেন কি না যোগী হ'ল। কি বলিস্ শিউলি?"

শিউলির মুখ তখন কলমের ডগায় ঠিক মিশে না গেলেও এত নীচু যে, অনিল বোনের মুখখানি ভালো ক'রে দেখতেই পেলে না। বুকের দ্রুত স্পন্দন, মনের উদ্দাম চঞ্চলতা জোর ক'রে থামিয়ে শিউলি ব'লে—"তাঁর তাহ'লে এখন অনেক শিষ্য-টিষ্য হ'য়েছে বোধ হয়?"

সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে অনিল ব'লে "না মোটেই না, সেইটাই সব চেয়ে আশ্চর্য্য। লিখেছে—তিনি তো কাউকে তাঁর শক্তি জানতেই দেন না, যদি বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা জানতে পেরে তাঁর শিষ্যত্ব নিতে চায়, তিনি তাতে একেবারে অসম্মত! তিনি বলেন, তিনি নিজেই অজ্ঞান—তার ওপর পরকে কি শেখাবেন!"

একবার চোখ তুলে শিউলি বলে—"অদ্ভুত লোক কিন্তু!"

—"অদ্ভুত না অদ্ভুত। না বিয়ে-টিয়ে করে সংসারী হ'ল, না কাজ কর্ম্ম ক'রে দু'পয়সা উপার্জ্জন ক'রল। না হয় তার বাপের পয়সা আছে; তা হ'লে লেখাপড়া শেখার তো একটা সার্থকতা দেখানো চাই। অথচ চিরেনটা এমন ভাল ছেলে ছিল—আমাদের student life এর সমস্ত ইতিহাসটাই তার গুণে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে—তাকে কি কম ভালবাসতুম!"

বন্ধুর অভাব মনে ক'রে অনিলের মুখ আবার কালো ছায়ায় ম্লান দেখাচ্ছিল। এ প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে একটু ভেবে শিউলি ব'লে—"আমার বইটার proof correction তো হ'য়ে গেছে। এবার ছাপাতে কতদিন লাগবে?"

—"এই হপ্তাখানেকের মধ্যেই দাদা না তোর বই সোনার জলে "নিষ্কৃত চিন্তা" নাম নিয়ে ঘরে ঘরে বিরাজ ক'রবে।"

দিন পনের পরে একদিন ব্যস্ততার সঙ্গে বাড়ী ঢুকেই অনিল চেঁচিয়ে ব'লে "কি কাণ্ড ক'রলে মা, শিউলি!"

অনিলের মা তখন বারান্দায় ব'সে তরকারী

আপনার মত সকলেই নামকো ওয়াস্তে কাম ক'রে থাকে। যে বেনামী বই ছাপায়, সে যে নামের জন্যে বই লেখেনি এটা নিশ্চিত; আদালতের জন্যে এই আমাদের মস্ত বড় প্রমাণ—তার উপর তারিখ রয়েছে তাতে। আমার বন্ধুর বই একমাস আগে বেরিয়েছে, তার একমাস পরে আপনার বই।"

এই অপরিচিত লোকের সঙ্গে একলা কথা কইতে ও এত বড় মানিকর ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে শিউলির মাথাটা যেন কাটা যাচ্ছিল। উঃ! শেষে এত বড় মিথ্যাপবাদ তার জন্যে সঞ্চিত ছিল! কেন সে বই লিখতে গেলো? কিন্তু সে তো ইচ্ছে ক'রে লেখেনি—কে যেন তাকে দিয়ে জোর করিয়েই এ কাজ করিয়েছে! ব্যাকুল ভাবে নিদ্রিত অনিলের হাতে ঠেলা দিয়ে শিউলি ব'লে,—"দাদা, দাদা, ওঠো। শিগ্‌গীর—ওঠো একবারটী"—নিদ্রা ব্যাঘাতের বিরক্তিতে অনিল হ'লে উঠ্‌লো—"কি করিস্ শিউলি! ভারী বিশ্রী মেয়ে তুই!"

—"তোমার পায়ে পড়ি দাদা, শিগ্‌গির ওঠো!"

—"আবার বিরক্ত ক'রছিস্? যা ব'লছি এখান থেকে, আমায় ঘুমোতে দে।"

—"তোমার সঙ্গে একজন দেখা ক'রতে চায়; একবারটী চোখ চাও।" আলস্য ভেঙে নিদ্রাজড়িত চোখ একটু খুলে অনিল ব'লে—"আঃ কিছুতেই শান্তি দেবে না দেখ্‌ছি—কে এসেছে?" ব'লেই নিদ্রারক্ত চোখ বিস্ফারিত ক'রে সম্মুখের ব্যক্তিটীর প্রতি অবাক্ হ'য়ে দেখে অনিল ব'লে "আপনি?"

"হ্যাঁ, আমি এসেছি শ্রীমতী শিউলি রায়ের কাছে-দেবা চুরীর অভিযোগ নিয়ে। আমার বন্ধুর রচনা ইনি আগাগোড়া নকল ক'রে নাম কিনছেন—"

লজ্জায়, অপমানে শিউলিরও উপর রাগে অনিলের কাণ মাথা তখন ভয়ানক রকম গরম হ'য়ে উঠেছে, চট্ ক'রে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় অনিল ব'লে "আমার বোন এমন কাজ করে নি, কখন। আমাদেরই অভিযোগ আনা উচিত, আমরাই নালিশ ক'রব। আপনার বন্ধুই চুরী ক'রেছে তার প্রমাণও দেখিয়ে দেবো।"

—"অসম্ভব! আমার বন্ধু নামের জন্য লালায়িত নয়; এর প্রমাণ আমাদের গ্রামের হাজার লোকে দিতে পারে।"

অনিলের ঠোঁট তখন ক্রোধে কাঁপছে; দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে নিয়ে সে ব'লে "নামের জন্যে না হ'তে পারে, পৃথিবীতে বই ছাপানোর আরো অনেক কারণ আছে—টাকা-টাকা! টাকাই বেশীর ভাগ লোকের দরকার।"

বন্ধুর প্রতি এত বড় অবিচার হরিদাসের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব, রাগে তার গায়ের চাদর কখন চৌকীতে জড়িয়ে গেছে ও বইখানা হাত থেকে পায়ের তলায় প'ড়ে লুটোপুটী খাচ্ছে, তা সে জান্‌তে পারলে না। টেবিলের উপর এক ঘণ্ড ঘুসি মেরে সে চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লো—"বেশ ব'লেছেন আপনি! যে লোক নাম, যশ, ধন-মান হেলায় পরিহার ক'রেছে, যার লালসা-বাসনার অতৃপ্তি পরমার্থ-লাভে মিটে গেছে, যে অতি সুন্দর, অতি মহান্, অতি উজ্জ্বল, অথচ অতি মধুর, তাকেই চোর বলা সাজে বটে! সে কি লোক, তা আপনি জানেন না। না জেনে দেবতার নামে কলঙ্ক দেবেন না।"

রাগের মাথায় এর উত্তরে অনিল কি একটা ব'লতে যাচ্ছিল, কিন্তু শিউলি তাতে বাধা দিয়ে আগন্তুকের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে "আপনার এই মহাপ্রাণ বন্ধুটির নাম কি?"

বন্ধুর প্রতি এই সাধু প্রয়োগে এতক্ষণে হরিদাস একটু আশ্বস্ত হ'য়ে চড়া সুর নামিয়ে বল্লে—"নাম? নাম ব'লতে বারণ ক'রে দিয়েছে।"

শিউলি কৌতূহলী হ'য়ে আবার জিজ্ঞাসা ক'রলে—"তিনি থাকেন কোথায়? তাও কি ব'লতে বারণ?"

—"থাকেন বনগ্রামে।"

অনিল ও শিউলি পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে ভাবলে—বনগ্রামে? বনগ্রামে তো চিরেনও থাকে—তবে কি সেই?

শিউলির দুই চোখ তখন জলে ভ'রে গিয়েছে। সে মিনতি এক রকম ক'রেই হরিদাসকে ব'লে "আমাদের কি সেখানে একবার দয়া ক'রে নিয়ে যাবেন? আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবো—তিনি যখন এত ভালো, তখন নিশ্চয়ই এই অনুতপ্তাকে ক্ষমা ক'রবেন।"

৭

"আমায় ক্ষমা করো তুমি!"

—"ক্ষমা কিসের শিউলি?"

—"না, না, অমন ব'লোনা তুমি, ক্ষমা করো আমায়!"

—"কি ক্ষমা ক'রব শিউলি? আমি খুব ভালো ক'রেই জানি, তোমার "নিভৃত চিন্তা" আমার নিভৃত চিন্তার কপি নয়। অথচ সকলের কাছে তো তা বলা যায় না, আর তারাই বা বিশ্বাস ক'রবে কেন? তা ব'লে তুমি কি ভাবছ, আমিও তাই বিশ্বাস ক'রে ব'সে আছি? না শিউলি, তোমাকে আমি খুব ভালো ক'রেই চিনি!"

—"না তার জন্যে নয়। তোমায় আমি কত কষ্ট দিয়েছি, তোমায় না মেনে অন্য গুরু খুঁজতে গিয়েছি, অথচ তুমি এতদূরে থেকেও আমাকে দিয়ে কত সাধনা করিয়ে নিয়েছ—আর আমার বিশ্বাস তুমিই আমাকে দিয়ে এই বই লিখিয়েছ—তাই দু'টো বই এক হ'য়ে গেছে, অথচ নকল কেউ করে নি। তোমায় আমি চিনতে পারিনি—তার জন্যে আমায় ক্ষমা করো।"

চোখের জলে শিউলির বুক ভেসে যাচ্ছিল। তার হাতখানা নিজের হাতের উপর রেখে চিরেন বল্লেন—"আমিও এ সব ইচ্ছে ক'রে করিনি। আমা ও অজ্ঞাতে এ সব হ'য়েছে শিউলি; প্রাণের আকর্ষণ যে যথার্থ, এই বই দু'খানাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ!"

চোখ মুছে শিউলি ব'লে, "তুমি তো আমায় এখনো দীক্ষা দাও নি?"

সেই চিরমধুর হাসিটুকু এতদিন পরে আবার চিরেনের মুখে ফুটে উঠলো। সেই হাসিমাখা মুখের দিকে শিউলি অবাক্ হ'য়ে চেয়েছিল। চিরেন তেমনি হেসে ব'ল্লেন—"দীক্ষা কি আর এখনো দিতে বাকী আছে শিউলি?"

—"দীক্ষার মন্ত্র তো জানিনে?"

—"মন্ত্র জাননা? ভালবাসাই যে মন্ত্র শিউলি! —তা যে তোমায় আমি অনেক আগেই দিয়েছি।"

শিউলি লজ্জায় চোখের পাতা চিরেনের মুখের উপর তুলতে পারছিল না। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে থাকবার পর চিরেন আবার ব'ল্লেন "এবার তো আর আমায় ছেড়ে যাবে না শিউলি?" উত্তরের প্রতীক্ষায় চিরেনের স্নিগ্ধ মাধুর্য্যভরা চক্ষু দুটি উৎকণ্ঠা ও আগ্রহে জল জল করে উঠল।

উঠে দাঁড়িয়ে শিউলি বেশ দৃঢ়স্বরে ব'ল্লে—"তা কি ক'রে হয় বলো? আমি তো তোমার তপস্যা ভঙ্গ করতে আসিনি! আমি শুধু এসেছিলুম, তোমায় প্রণাম করতে—তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে।"

মা-হারা

(শ্রীলীলা দেবী)

(পুরুলীয়া বস্ত্রব্যবসায়ী লেডি চৌধুরী ৺শ্রীমতী অতিমা দেবীর বাৎসরিক স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে রচিত)

আমরা যে মা, মা-হারা !
কেমন ক'রে আছিস্ দূরে
(তোর) ছেলের চোখে বয় ধারা ;
বুকভরা ঐ স্নেহের পাথার
কেমন ক'রে হ'ল উজাড়
ডাক্‌লে সাড়া পাইনে তোমার
কেঁদে হ'লেম্ সারা
অস্ত-রবি পাটল সোণায়
নদীর জলে রঙ্গ বোনায়
ছুটলো হারা আকাশ কোণায়
আমরা যে মা আঁধারে—
ঘরের প্রদীপ জ্বাল্‌ না গো মা
সীমন্তিনী শিবের উমা
একলা মোরা রইতে নারি
শুখ্‌নো মরু মাঝারে ;
বসিয়ে কাছে নিজের হাতে
খাইয়ে দিতে প্রভাত-রাতে
তেমনি ক'রে খাইয়ে দে মা
(স্নেহের) সুধায় পাগলপারা
আমরা যে মা, মা-হারা !

৭ই জানুয়ারী, ২৯২৮

বংশের কলঙ্ক

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার বসু)

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পরীক্ষা

অরুণকোল পত্র

ভাই সরোজ,

তোদের ছেড়ে এসে এখানে পৌঁছেছি, এ কথাটা ঠিকও বটে, ঠিক নাও বটে ; কেন না দেহটা এখানে এসেছে, কিন্তু মনটা ওখানে পড়ে রয়েছে। তোরা আমার মনটা ভাগাভাগি করে নিয়েছিস, কোথায় বেশী পড়ে রয়েছে, তা তোকে নাই বললুম !

ভাই, আমার মনে সদাই ভয়। আমার বড় উচ্চ আশা। এ আশা যে কখনও সফল হবে, তা ত' মনে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি নি। তবে তুই আমায় আশ্বাস দিয়েছিস তাতেই মনটা আশান্বিত হয়ে রয়েছে। তাই, সেই সোনার পুতলীকে কি পাব না ? ভগবান কি আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করবেন না ?

বড়কাকা বলেন, আমি অকর্ম্মণ্য। বাস্তবিকই আমি তাই। লেখা-পড়ায় আমার মত নিরেট 'ডাম্প' আর নেই বললেই হয়। তাই ভয় হয়, যদি তিনি আমাকে বঞ্চিত করেন ! তা হ'লে সরোজ, বলে দিচ্ছি আর দেশে ফিরবো না।

কিন্তু ভাই, আমার স্পর্দ্ধাও, কম নয়! তার উপযুক্ত হতে পারবো, এই গুমোর করে এসেছি; কিন্তু হব কি করে? তার উপযুক্ত হতে পারে জগতে এমন কে আছে? তুই যদি রাগ না করিস, তা হলে একটা কথা বলি। এটা কেবল কথার কথা। তার উপযুক্ত একমাত্র তোকেই দেখি। তবে তুই যে তাকে মার পেটের বোনের মত দেখিস, তা জানি। তাই বলছি, তার যোগ্য স্বামী কাউকে দেখতে পাই নি। তবে আমি কেন তার আশা করি? লোকে কত কি অসম্ভব আশা ক'রে তপস্যা করে, আমিও তাই করছি। তপস্যা সত্যিই করবো। এক মনে, একধ্যানে একটা কার্য্য সাধন করাকে যদি তপস্যা করা বলে, তা হ'লে দেখবি আমি কি ক'রে কাজ করে যাই।

যথার্থই কাজে লেগেছি ভাই। আগে এখানে আসার কথাটা বলি। গৌহাটী পর্য্যন্ত বলার কিছু নেই। তবে কলকাতার কূপমণ্ডুক আমরা, আমাদের কাছে সবই নতুন। যা হ' একবার মধুপুর গিয়েছি মাত্র। গৌহাটী পৌঁছানর মধ্যে লক্ষ্য পড়িটা বেশ লেগেছিল। গৌহাটী থেকে বেলা দুটোর পর গাড়ী ছাড়লো, তারপর ২৪ ঘণ্টা গাড়ীতে কাটাবার পর ডিব্রুগড় পৌঁছলুম। গৌহাটী ছাড়তেই দুদিকে গাছপালায় ঢাকা ছোট ছোট পাহাড় দেখতে পেলুম; ঠিক যেমন মধুপুর যেতে দেখেছিলুম। ভোরের বেলা ট্রেণের ডান ধারে খুব উঁচু পাহাড়ের শ্রেণী দেখতে পেলুম, শুনলুম নাগা পর্ব্বত; পাহাড়ের পায়ের তলায় ঘোর জঙ্গল, বুকের উপর সাদা মেঘ, আর মাথায় মুকুটের মত গাঢ় কাল মেঘের রাশি। যেখানে সমতল ক্ষেত্র দেখলুম, সেখানে কত চা-বাগান; তাতে কত সারি সারি কুঁড়ে ঘর আর সাহেবদের বাংলো। ঝাঁড়ি ঝাঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, কুলীরা টোকা মাথায় দিয়ে কাজ করছে। এই আমার প্রথম চা বাগান দেখা।

যাক্, ডিব্রুগড় জায়গাটি বেশ দেখলুম। ব্রহ্মপুত্র আর ডিব্রু নদীর সঙ্গমস্থলে এটা অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্রের ওপর পারে হিমালয়ের কোলে মিরি, মিশমি, আবর, দফলা প্রভৃতি অসভ্য জাতির দেশ। ডিব্রুগড়ে দুদিন থেকে চেষ্টা যত্নে করলুম। সেখানে আমাদের চা-বাগান। সেখান থেকে ব্রহ্মদেশে হাঁটা-পথে যেতে তিন দিন লাগে। চা-বাগানে আমি নিজের পরিচয় দিই নি। কেও আফিস থেকে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হয়ে এসেছি, এই ভাবের চিঠি এনেছিলুম। তাতে বাবার আর কেনেডি সাহেবের নাম স্বাক্ষর ছিল। কাজেই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব হয়ে হাট-কোট চড়িয়ে খুব কর্ত্তামি করলুম। সেখানে প্রায় তিন চার শ' কুলি খাটছে। বিনায়ক নবলস্কর ব'লে একটী মারাঠী যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সে পুরুষোত্তম কোঠারের খুব আপনার লোক, ভাবী জামাই। পুরুষোত্তম বাবু তাকে এখান থেকে কিছু কুলী নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন; চা-বাগান দুটাই আমাদের। দিবাঃ ছেলে স মিলে আমাদের এজেণ্ট ঘর মুস্কিলে পড়েছেন। সেখানে পুরোণো কোম্পানীর পুরোণো মানেজার জগন্নাথ ঘোষে সমস্ত কুলিমজুর ও মেটদের হাত করে কাজে ভয়ানক বাগড়া দিচ্ছে, হিসেবপত্র দিচ্ছে না। সে সব নিজের হাতে রাখতে চায়। এখন এক ভয়ানক মুস্কিল হয়েছে; কোঠারে তাঁর পরিবার নিয়ে সেই ভীষণ জায়গায় রয়েছেন। ঘোষে যদি কুলীদের ক্ষেপায়, তা হলে হয়ের কথা। তাই বিনায়ককে এখান থেকে লোক নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন; কিন্তু সেখানেও ঘোষের লোক রয়েছে, সে লোক ছেড়ে দিচ্ছে না।

জানিস ত আমি কেমন একগুঁয়ে। গোড়া থেকে বিনায়ককে দেখেই ওর উপর কেমন মায়া বসে গিয়েছিল। সে তাই আমাদেরই বয়েসী, কাজেই যখন দেখলুম বিনায়কের উপরোধ-অনুরোধ ভেসে যাচ্ছে, এজেণ্ট কোঠারের হুকুম-পত্র অগ্রাহ্য হচ্ছে,

তখন বিনায়কের দিক নিতে মনটা ঝুঁকে পড়ল। আর এজেন্টের আসন ভাল রকমে প্রতিষ্ঠার জন্যেই আমার এখানে আসা। কাজেই গোঁ যখন ধরলুম যে, ঐ মোড়ের লোকটাকে টিট্ করে দিয়ে বিনায়কের সঙ্গে লোক পাঠাবই, তখন তাই করলুম। দুঃখ এই, একটা বিষয়ে যা গোঁ ধরেছি তা পাবার আশা নেই। গোঁ ধরেছি বটে তাকে পাব বলে, কিন্তু ঐ গোঁটায় বেলা হয়ে যুকটা কেঁপে ওঠে কেন।

সিবাং স মিলে এসে দেখলুম, যথার্থই ঘোর অরাজকতা। আমাদের এজেন্ট কোঠারে মশাই খুব নিরীহ ভদ্রলোক, আর জগন্নাথ মোড়ে বেটা হয়া ক হমাচ্ছে। সে এমনই বদমায়েসি খেলে রেখেছে যে, কুলীরা আমাদের এজেন্টকে মানে না। এখানকার লোকজনকে সে বেটা বশ করে ফেলেছে, তার উপর সিবাং নদীর ওপার থেকে দুটো জঙ্গলী আবরকে এনে ভাড়া করে রেখেছে। জগন্নাথ লোকটা নিজেও ভয়ানক দুর্দম চেহারা। আমাকে দেখে বেটা হেসেই অস্থির, বলে ঐ ছোঁড়াটা এসেছে মনিবদের তরফ থেকে কর্ত্তামি করবে বলে। নিবড়' আছিই এখানে। শুনেছি লোকের কাছে শাসিয়ে বেড়াচ্ছে, আমার হাড়গোড় ভেঙে সিবাংয়ের জলে ফেলে দেবে।

আছিও কি বলেছি জানিস? তার লোকজনকে শুনিয়ে বলেছি যে, আমি তার তরে পিপড়ের গর্ত্ত খুঁজে বেড়াচ্ছি লুকুবো ব'লে। হাঃ! হাঃ! হাঃ। এর মধ্যেই তার দলে দুটো ভাগ করে দিয়েছি। গজাটাও বেশ একটা দল পাকিয়ে আমার করে নিয়েছে। ওঃ, গজাটা যে চালাক! তাই ওকে নিয়ে এসে বড় ভাল করেছি। এমন ধারা আমায় যে ভালবাসে তা জানতুম না।

দেখ্‌না, দুচার দিন গেলেই ঐ জগন্নাথের কি দশা করি। এখন এই পর্য্যন্ত। পরে যা ঘটে ক্রমে ক্রমে লিখবো। চিঠির জবাব দিস্ ভাই। জানিস্ ত' ভাই এখানে এক রকম বনবাস। তার পর কি? বাবা তোদের ওখানে আসেন? দুষ্টু অমিকে আমার চুমো দিস্। তুই আমার ভালবাসা পাবিস্ —আর—অন্য আমার নিন্দা—না পাক! তবে দয়া করে তার খবরটা দিস্। ইতি অরুণ—

পত্রখানি শেষ করিতে অনিলা কত বার ভীত চকিত নয়নে চারিদিকে চাহিল। একবার মুহূর্ত্তের জন্য সেখানা বুকে চাপিয়া ধরিল; আবার তখনই লজ্জায় আরক্ত হইয়া শয্যায় মুখ লুকাইল; একবার, দুইবার তিনবার,—চিঠি পড়া যেন আর শেষ হয় না! অথচ এ ভাবে এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া চিঠি পড়া অনিলার স্বভাবের বিরুদ্ধ।

অনিলা একবার ভাবিল, চিঠিখানা যথাস্থানে রাখিয়া আসে। আবার ভাবিল, না, ফটোখানার মত চিঠিখানাও আপনার করিয়া লইলে ক্ষতি কি? না, বড় লজ্জা করে! কিন্তু—কিন্তু—বড় লোভও হয় যে! কি করি!

ফটোখানা? ফটোখানার কথা মনে পড়িতেই অনিলার সমস্ত মুখখানি লজ্জায় একবারে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। ছিঃ ছিঃ! সরোজদা ত' নিশ্চয় জানতে পেরেছে; তা না হলে যেখান থেকে মাপ নিতে বলেছে, সেইখানে ফটোখানা রেখে দেবে কেন? শুধু কি ফটো? এই চিঠিখানা? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তা হলে ত' সরোজদা ছেনে-শুনে ইচ্ছে করেই চিঠিখানাও ওখানে রেখেছিল! কি ক'রে সরোজদার কাছে মুখ দেখাবো? না, আর সরোজদার সামনে বেরুবো না।

সরোজদা দেবতা! কি সরল পবিত্র মন, যেন গঙ্গার জল! আমাদের কি ভালবাসে! আর—আর—তাকে বোধ হয়, নিজের প্রাণকে যত ভাল বাসে, তার চেয়ে তাকে বেশী ভালবাসে। সেদিনে কি একটা ভুল হয়েছিল, তাই আমার সঙ্গে আবোল-তাবোল বকেছিল। আহা! তার জন্যে নিশ্চয়ই কত দুঃখ, কত অনুতাপ হয়েছে! মুখখানি কতদিন

ঘরে একবারে শুকিয়ে রয়েছে। না সরোজদা, নিশ্চয়ই তোমার সামনে বেরুবো, যেমন পরার ভাইবোনটীর মত ছিলুম, তেমনই থাকবো।

যাই, চিঠিখানা দুয়ারে রেখে দিয়ে আসি। আচ্ছা, আমার কাছে রাখলে তার কি ক্ষতি? সরোজদা ও' যা পড়বার, তা প'ড়ে নিয়েছে, এখন আর ও চিঠিতে কি দরকার? না, না, কাজ নেই, রেখে দিয়ে আসি। যত দোষ হয়েছে, আমি নারী ব'লে! তা না হলে, বন্ধুর চিঠি, আপনার লোকের চিঠি পড়তে দোষ কি? যার যতটুকু পায়ের তলে, যে কি কচ্ছে, কি খাচ্ছে, কেমন আছে—জানবার জন্যে প্রাণটা ধড়ফড় করে, তার চিঠি পড়তে দোষ কি? না, কাজ নেই চিঠি রেখে, বড় লজ্জা করে, সরোজদা কি মনে করবে? অনিলা উঠিয়া দাঁড়াইল, চিঠিখানি একবার অধরোষ্ঠে স্পর্শ করিল, তার পর বুকের মাঝে সেখানি লুকাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে আপনার শয়ন কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কিন্তু পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সে শুনিল, মাষ্টার মহাশয় অমিয়কে সেখানে পড়াইতেছেন। যে দিক দিয়া সে আসিয়াছিল, সেদিকে সরোজদার গলার সাড়া পাইল। অনিলা একবারে লজ্জায় ও ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িল, যেন সে কত অপরাধ করিয়াছে! তখন সে বাহিরের বৈঠকখানায় যাইতে পা বাড়াইল। কিন্তু সে দিকে অগ্রসর হইয়াই সে রামসদয় বাবুর উঁচু গলা শুনিতে পাইল। সে শুনিল, রামসদয় বাবু কাহাকে বলিতেছেন, "তা আমার এখানে এসেছো কেন? তার বাপ বকুলবাগানের নামজাদা লোক, তার বাড়ী খুঁজে নিতে ত' কষ্ট হবে না। তার ছেলে মেয়েমানুষ রেখেছে কি না রেখেছে, আমি তার কি জানি, সেইখানে যাও।"

অনিলা স্তম্ভিত হইয়া সেইখানে দাঁড়াইল। তাহার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন জল হইয়া গেল, সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। যে ঘরটায় সে দাঁড়াইয়াছিল, সেটা বৈঠকখানার পাশের একটা ছোট ঘর। সে ঘরটা প্রায় অন্ধকারাবস্থায় পড়িয়া থাকে। অনিলা কোনও দিকে পা বাড়াইতে গেলে যখন তাহার পা ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তখন সে দাঁড়কয়ান পাখার আড়ালে একখানা ভাঙ্গা সোফার উপরে বসিয়া পড়িল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে লুকাইয়া অপরের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল।

একজন অপরিচিত লোক অপূর্ব্ব বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতেছিল। সে ভাষা অন্য সময়ে শুনিলে হয়ত অনিলা হাসি চাপিতে পারিত না; কিন্তু এখন যে বিষয়ের কথা হইতেছিল, তাহাতে অনিলার হাসি শুকাইয়া গিয়াছিল। অনিলা শুনিল, লোকটা এই ভাবের কথা বলিতেছে, "আজ্ঞে বাবু তা জানি। তিনি হলেন রাজার ছেলে, তাঁর ঠাকুরকে কে না জানে? তাঁদের রাজপুরীর সঙ্গেই তো আমাদের ঘর। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ও' আমার কথা নয়, কথা হচ্ছে, আপনার এখানে রমেশ ব'লে যে বাবুটী পড়াতে আসেন তাঁর সঙ্গে।"

রামসদয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কার সঙ্গে, রমেশের সঙ্গে? কেন, রমেশের সঙ্গে এই ব্যাপারের সম্পর্ক কি? আর তুমি কেষ্ট, তুমি কালীঘরে বাবুর পাড়ায় থাক, তা সেইখানেই ত' রমেশের মেস-বাড়ী, তার সঙ্গে সেখানে দেখা না ক'রে এখানে এসেছ কেন?"

লোকটা মুদী ওরফে বাবাজী। সে বলিল, "আজ্ঞে তখন ত' আপনার হতে পত্র পাইনি। আজ চিঠি পেয়েই মেস-বাড়ীতে খোঁজ করতে গিয়ে এখানে বাবু এসেছে শুনে এলুম।"

রামসদয় বাবু আর কোনও জবাব না দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওরে কে আছিস ওখানে, রমেশ বাবুকে ডেকে দে ত।"

তাঁহার ডাকে প্রথমেই সরোজ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল এবং মুহূর্ত্ত পরেই রমেশ আসিয়া

উপস্থিত হইল। রমেশ উপস্থিত হইবামাত্র বাবাজীর চোখের সহিত তাহার চোখের টেলিগ্রাফ হইয়া গেল, তাহা আর কেহ দেখিতে পাইল না।

রামসদয় বাবু, সরোজ ও রমেশকে দেখিয়াই বিষম উত্তেজনার স্বরে বলিলেন, "এই নাও হে শোন, এ লোকটা কি বলে! সরোজের সকল গুণের আধার কেমন একবার শোন!"

সরোজ ও রমেশ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে বাবাজীর প্রতি চাহিয়া উত্তরের প্রত্যাশায় রহিল। কিন্তু বাবাজী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই রামসদয় বাবু ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "এই লোকটা বলছে, তোমাদের অরুণ বাবু নাকি একটা মেয়েমানুষকে মাস মাসা দিয়ে থাকে। এখন আসামে চাকরি হ'লে সেখান থেকে চিঠি লিখেছে—রমেশের কাছে টাকা নিতে। সত্যি মিথ্যে তোমরাই খোঁজ করে দেখা আমি ও সবে নেই।"

সরোজ তখন কথাটা কিছুই বুঝিতে পারে নাই, সে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। রমেশ যথোচিত বিস্ময়াভিনয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল "অরুণ মেয়ে মানুষ রেখেছে? কে বললে? আমি নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস করি না।"

রামসদয় বাবু বাবাজীর দিকে চাহিলেন, বাবাজী বলিল, "আজ্ঞে, রেখেছেন কি না রেখেছেন, এই চিঠি পড়লেই বুঝবেন। দেখুন না।" এই বলিয়া বাবাজী একখানি পত্র বাহির করিয়া রমেশের হাতে দিল। পত্রখানি দিবার সময় বাবাজীর ও রমেশের চোখে চোখে একটা ইসারা হইয়া গেল। সেই ইসারা ও ঈষৎ হাসি অন্যের কেহ লক্ষ্য করিল না; কিন্তু পাশের ঘরে অনিলা দেখিল। সে সেই ঘরে বসিয়া বৈঠকখানার সকলকেই দেখিতে পাইতেছিল।

রমেশ চিঠি খানা পড়িয়া সরোজের হাতে দিল। পত্রে অরুণ বাবাজীকে লিখিয়াছে, রোগিণী কেমন আছে; যাহা কিছু আবশ্যক হইবে রমেশের নিকট লইবে। রমেশ তাহার বন্ধু, বাবাজীর বাসার পাশেই তার মেস-বাড়ী, তাড়াতাড়িতে রমেশের সহিত বাবাজীর আলাপ-পরিচয় করিয়া দিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছে, ইত্যাদি।

রমেশ কণপরে বলিল, "তাতে কি হয়েছে? অরুণ আমায় বলে গিয়েছিলো বটে, মুড়িগঞ্জীর বাড়ীতে বাবাজীর হাতে দিয়ে একটা স্ত্রীলোককে তার ঘরে সাহায্য করতে; আর তার জন্যে টাকাও পাঠানো বলে গিয়েছিলো। কাল মনিঅর্ডার পেয়েছিও বটে। তা, অরুণ ত' এমন বিস্তর অনাথ-গরীবকে সাহায্য করে থাকে।"

বাবাজী বিনীতস্বরে বলিল, "আজ্ঞে না-বাবু, এটা সে রকম নয়। আপনারা জানতে চান, মুড়িগঞ্জীর বাড়ী খোঁজ করলেই জানতে পারবেন। তা ছাড়া বকুল বাগানের ঐ পাড়ার যে লোকেই জানে। মেস-বাড়ীর আপনি না জানতে পারেন, কিন্তু আর সবাই জানে।"

রমেশ বলিল, "কি আশ্চর্য্য! তাও কখন হতে পারে? আমি ঘুণাক্ষরে জানতে পারলুম না, আর জগৎশুদ্ধ জানলে? অরুণ লুকিয়ে এমন কাজ করেছে, এ যে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না!"

রামসদয় বাবু বলিলেন, "তোমাদের প্রবৃত্তি নিয়ে ত' কিছু আসে যায় না। চিঠি পড়লে,—এ লোকটা যা বলছে তাও শুনলে। কিছুদিন আগে আমিও একখানা উড়ো চিঠি পেয়েছিলুম, তাতেও এই ভাবের নালিশ ছিল। তবে বেনামা বলে চিঠিখানা ততটা গ্রাহ্য করি নি। এখন ত স্পষ্ট নালিশ শুনলুম। বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না বটে, কিন্তু পেটে একখানা মুখে একখানা মানুষ হাজার হাজার আছে, তা জান? লোক চেনা কি সহজ কথা?"

রমেশ বলিল, "কি করে বুঝবো বলুন? যার বাইরেটা এত ভাল দেখায়, তার ভেতরটা এত কাল হতে পারে?"

এতক্ষণে সরোজ কথা কহিল। ক্ষুব্ধ রোষে তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সে একবার ঘৃণার দৃষ্টিতে বাবাজীর দিকে চাহিল। পরে অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ভেতর-বাইরে আলাদা আর যার হ'ক বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু অরুণের সম্বন্ধে যে এ কথা বলে, সে মিথ্যা-বাদী।" সরোজের অধরোষ্ঠ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। রমেশ তাড়াতাড়ি বলিল, "আমিও তাই বলি, আমিও ত তাই বলি।"

পাশের ঘরে অনিলার জ্বরঘখানি সরোজের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। তার চোখদুটী আনন্দে অশ্রুপূর্ণ হইল।

রামসদয় বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দেখ সরোজ, তোমাদের ঐ নাটকে অভিনয়টা অন্য সময়ে কোরো। যাক্, এ সব ব্যক্তি ব্যাপার নিয়ে কচলাকচলি করতে চাই নি। ওহে বাবাজী মাকি, তুমি তোমার রমেশ বাবুকে পেয়েছ, টাকাও তোমার এসে পড়েছে। এখন যাও, পরে মেস-বাড়ীতে গিয়ে বাবুর সঙ্গে দেখা কোরো।"

বাবাজী যে আজ্ঞে বলিয়া নমস্কার করিয়া বিদায় হইল। রামসদয় বাবু অল্পের নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "আমি দেখছি, আমার বিও'র ভুল হয় নি। আমি বরাবর বলে আসছি, অরুণ-প্রায়া অনিলাটা পালের গুরুনী। যাক্, ভালই হ'ল, একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলুম।"

সরোজ বিমর্ষ ও ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "কিসে নিশ্চিন্ত হলেন? অরুণের সম্বন্ধে? এটা কি আপনার উচিত হচ্ছে? কোথা থেকে কে একটা ছোট লোক কি বলে গেল, আর তাই শুনে আপনার একটা ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে গেল!"

"তোমাদের আদর্শ নিয়ে তোমরা থাক, আমি ওর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না,"—রামসদয় বাবু এই কথা বলিয়া রোষভরে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সরোজ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "আমি আজ অরুণকে সব লিখে দিচ্ছি, তা হলে ঐ বাবাজী বেটার বুরুকি ভেঙ্গে যাবে।"

রমেশ বাধা দিয়া বলিল, "তোর যেমন বুদ্ধি! যার আগাগোড়া মিথ্যে, তার সম্বন্ধে আবার চিঠি লেখালিখি কি? অরুণকে লিখে কেবল ব্যস্ত করা বই ত' নয়! সেছে সে একটা কাজে, কোথাকার একটা তুচ্ছ মিথ্যে কথা নিয়ে তাকে চিঠি লেখ, আর সে সব কাজ ফেলে এখানে ছুটে আসুক।"

সরোজ বলিল, "তবে কি করা যায় বল দিকি? রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। অরুণ, যার মত ছেলে কখনও হয় নি, হবে না, তার নামে কলঙ্ক—বদনাম। ইচ্ছে করছে এখনই ছুটে গিয়ে ঐ বাবাজীটাকে ঘাড় ধরে বা দু'চার দিই।"

রমেশের চোখ দুটা তখন এমন একটা কুটিল বিদ্বেষ-বিষ নিক্ষেপ করিল, যাহা দেখিতে পাইলে সরোজের সরল মনও সতর্ক হইতে পারিত। সরোজ দেখিল না, কিন্তু আর একজন দূর হইতে দেখিল—সে অনিলা। রমেশ হিংসার স্বর যথাসম্ভব গোপন করিয়া বলিল, "দেখ, এ সব কাজে রাগলে কিছু ফল হয় না। তুই দেখ না, আমার পাড়ার মেয়ের গায়েই ঐ লোকটার নজর, আমি দুদিনেই সব সত্যি খবর যোগাড় করছি। বেটার বুরুকি তখন ভেঙ্গে দেওয়া যাবে। কি বলিস?"

সরোজ বলিল, "যা ভাল বুঝিস তাই কর; আমার মাথা বিগড়ে গেছে। সাচ্চা কথা বলতে কি, অরুণের নামে নিন্দে শুনলে আমার সমস্ত শরীরটা রাগে ঝি ঝি করতে থাকে। দেবতার মত নির্মল নিষ্পাপ মন তার, তার নামে বদনাম! দুঃখ এই, কাকাবাবু তাই বিশ্বেস করলেন। এ বিশ্বাস তাঁর দূর করতেই হবে।"

সরোজ এই কথা বলিতে বলিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল, রমেশ তাহার প্রতি কুটিল বক্রদৃষ্টি

নিক্ষেপ করিতে করিতে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। অনিলা অলক্ষ্যে থাকিয়া সমস্তই লক্ষ্য করিল।

সকলে চলিয়া গেলেও অনিলা বহুক্ষণ তদবস্থায় বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া সে কত কি ভাবিতে লাগিল। আজ সে কি কথা শুনিল? যাহার বালকের মত সরল স্নেহপ্রবণ নিষ্পাপ মনটী তাহার অন্তর্নিহিত ভাবধারার দর্পণে অহরহঃ প্রতিফলিত হইতেছে, সে কখনও এমন কদর্য্য কুটিল কার্য্য করিয়া সেই দৃষ্টি এড়াইতে পারে? সে কখনও বিষবৃন্ত পয়োমুখ হইতে পারে? কখনই না,—অনিলার সমস্ত মনটা বিদ্রোহী হইয়া উত্তর দিল—কখনই না! অথচ এই লোকটা আসিয়া যেন অকপট সরল সত্য কথাই বলিয়া গেল। সে ত' সকলে উদার, সে জগতের সকলকেই আপনার বলিয়া দেখে, কাহারও দুঃখ-কষ্ট দেখিলে সে একদণ্ড চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার পক্ষে একটা অনাথা স্ত্রীলোককে অর্থ সাহায্য করা বিচিত্র নহে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এত লুকোচুরি কেন? যখন যাকে যা দেয়, তখন সে ত' তা জেঠামণিকে বলে; জেঠামণির উপরেই এই রকম কত সাহায্যের ভার দেয়। এবার তা করে নি কেন? করলে অনিলা নিশ্চয়ই শুনতে পেত। তার কোন্ কাজটা জেঠামণি অনিলাকে না বলে থাকতে পারে?

এ কি কঠোর পরীক্ষা! পরীক্ষা? কিসের পরীক্ষা? পরীক্ষা আবার কি? অনিলার হৃদয়ের দেবতা সে, তাকে দোষ স্পর্শ করতে পারে না। তার কোনও পাপ থাকলে অনিলার মনই তা বলে দিত। না, সব মিথ্যে অপবাদ। জগৎশুদ্ধ লোকে ও কথা বললেও অনিলা বিশ্বাস করবে না। (ক্রমশঃ)

অদ্ভুত কামনা

(শ্রীমোহিতলাল মজুমদার)

আমি চাই, তুমি হবে মহামহীয়সী—
ধোপা শুধু হইবারে সম্রাট-প্রেয়সী;
কত ভক্ত ঘেরি' কোমা করে অবস্থান,
রবিরে বেড়িয়া যথা গ্রহ জ্যোতিষ্মান্
আলোক-সঙ্গীতে! কটাক্ষ কৃপার,
মৃদু হাসি—তাহি তরে লক্ষ তরবার
লক্ষ বুকে বিঁধিবারে মানে না বারণ!
স্বয়ম্বরে বহু আগে করেছ বরণ
অজ্ঞাতসে, হৃদয়ের নিভৃত সভায়—
সে-কথা কেমন করে' কারে বলা যায়।
রোষের আভাসে যার সবে মূর্ছাহত,
আমারে 'তোমার দাসী' লিখিতে সে চাহ—
ফিরিয়া চাহে না কেহ ভুরু' যার পানে,
তুমি তারি বধূ হ'বে আত্ম-সম্প্রদানে।

ভাগের পূজা

[লেখিকা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী]

পূর্ব্ব পূজাধিপতি:—(১) শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া। (২) শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার (৩) শ্রীমতী সরযীবালা বসু (৪) শ্রীযুক্ত বিপদতি চৌধুরী (৫) শ্রীমতী তারবালা বসু (৬) শ্রীযুক্ত অমরমুখায় সেন (৭) শ্রীমতী লীলা দেবী (৮) শ্রীযুক্ত জাবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

৯

[কৈফিয়ৎ;—আমরা গত মাসে লিখিয়াছিলাম, শ্রীমতী গিরিবালা দেবী মাঘ মাসের পূজার ভার লইয়াছিলেন। এইরূপই ঠিক ছিল, অকস্মাৎ শ্রীমতী গিরিবালা দেবীর পিতা অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি ২৩শে পৌষ তারিখে, "ভাগের পূজা"র উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার মহাশয়কে তাঁহার অক্ষমতা জানান। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য লেখিকা মহাশয়া অত্যন্ত লজ্জিত আছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়রত্নবাবু, শ্রীমতী গিরিবালা দেবীর বিপদের কথা শুনিয়া শ্রীমতী প্রভাবতী দেবীকে পূজার ভার লইতে অনুরোধ করেন। লেখিকা মহাশয়া অতি অল্পকালের মধ্যে রচনা পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন।

—যমুনা সম্পাদক]

কমলের খেয়াল

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভাল করে চোখ চেয়ে তখনও অমলকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি, মনে হ'ল সে যে স্বপ্ন। সে তো স্বপ্নেই দেখা দিয়ে লুকিয়ে গাছে। জেগে আর আমি তার কোথায় দেখা পাব। কি মধুর সে স্বপ্ন। সমস্ত প্রাণখানি জুড়ে বসে আছে। প্রাণখানি যেন সে মধুরতা স্পর্শে ডুবে গেছল, টেনে তুলেছি, এখনও তা থেকে মধু ক্ষরে পড়ছে।

স্বপ্নটা এমন কিছু না। অমল যেন আমার সঙ্গে আমাদের দেখে গেছে! না মানে সে রোদ, না মানে অন্ধকার, না বাছে সকাল-দুপুর, আমার হাত ধরে সারা গাঁ-টায় টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর যেথায় ছিল যত আতুর, দুঃখী, সবাইকে ডেকে ডেকে জমিদার বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছে আর তাদের বলে দিচ্ছে—যাও, জমিদার সবাইকে আশ্রয় দেবে, আহার দেবে, বস্ত্র দেবে, রোজগারের পন্থা বলে দেবে। ব'লে আমার বাড়ীতে এসে আমাকে দিয়েই খাওয়াবার তরিবৎ থেকে টাকা নিয়ে দু'হাতে তাদের দিচ্ছে আর বলছে, জমিদার তোমাদের এখনকার অভাব মিটিয়ে দিলেন, ভবিষ্যৎ তোমাদের নিজের হাতে তোমরা গড়তে থাক, তখন কারু সাহায্যেই তোমাদের আর দরকার হবে না। বলছে, আমি তোমাদের চরকা-পড়া দেখাব, কেমন করে' তুলোর গাছ জন্মাতে হয়,তা বলে দেব, সেই তুলো থেকে কেমন করে সুতা কাটতে হয় নিজের হাতে তা দেখিয়ে দেব, ঘরে ঘরে স্ত্রীপুরুষকে তাঁত চালাবার উপায় দেখিয়ে দেব—তারপর তোমরা! তোমরা নিজেরা! আর কিছু বলতে হ'বে না, তোমরা আপনা থেকেই সুস্থ সবল হ'য়ে উঠ্‌বে!

শুনে সেই সব অভাগাদেরই বা কি উল্লাস। অমলের পাশে আমি চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে আছি, প্রজারা আমারই জয় গান করতে করতে যাচ্ছে, অমলের তাতেই সে কি উৎসাহ।

বল্লে—কমল! আমি চোখের সামনে কি দেখ্‌ছি জানো?

জিজ্ঞাসা করলুম—কি অমল?

সে বল্লে—আমার চোখের সামনে আমি দেখ্‌ছি তোমার এত বড় জমিদারীর মধ্যে একটি দুঃখী নেই, একটি অসুখী নেই! সব ভোর-পেট খাচ্ছে, আপন-আনন্দে আপনার ঘরে কাজ করছে, খেলে খেলে বেড়াচ্ছে। সকলের অবস্থাই সচ্ছল, কেউ কাকে হিংসা করছে না, দ্বেষ করছে না, সবাই সুখী। অন্ন তাদের অভাব, যা পায় তাইতেই সে'টা মিটে যাচ্ছে, দারুণ অভাব-অনটনের মধ্যে পড়ে পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরছে না, যে যতটুকু পেয়েছে, সে তাতেই সুখী। চাষী যে যেখানে ছিল, সব চাষল করেছে, তাঁতি তাঁত চালাচ্ছে, আপন-আপন পিতৃ-পিতামহের ব্যবসাতে সবাই আবার মন দিয়ে লেগে পড়েছে! গোলামী করতে, পরের জুতোর তলায় ধুলো মাখ্‌তে কেউ আর রেলের পথে ছুটে যাচ্ছে না, মাস-কাবারের দিন গুণে আর কোন অভাগাই দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ছে না; কমল, বাংলা দেশের মাঝখানে তোর এই রাজাটুকু অমরাতে পরিণত হ'য়েছে!

অমল চুপ করে' আমার মুখের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ বসে রইল, তারপর আবার তেমনি গদ্‌গদ কণ্ঠে বল্‌তে লাগল—তোর এইটুকু দেশের মধ্যেই কবি ভারতবর্ষের আদল ও সত্য রূপ দেখ্‌তে পেলেন, এই মাটীটুকুকেই সাধক সাধনার তীর্থ বলে নতি করলেন, এইখানেই আবার সেই অতীত কালের মত প্রভাত-সন্ধ্যা ঋষি-কণ্ঠোচ্চারিত বেদ-গান ধ্বনিত হ'চ্ছে, এই দেশেতেই আবার সেই ভারতের গৌরবময় তপোবন সৃষ্টি হ'চ্ছে—দেখে সারা ভারতবর্ষ তোর দেশের অনুকরণ করছে! কমল, আমার চোখের সম্মুখে আমি সে দৃশ্য দেখ্‌তে পাচ্ছি। সোণার বাংলা সত্যিই সোণার হ'য়ে দেখা দিয়েছে।

ঘুম ভেঙ্গে গেল! কোথায় বা সোণার বাংলা, আর কোথায় বা সেই সোণার বাংলার রূপ-দর্শনোন্মত্ত সাধকশ্রেষ্ঠ—অমলচন্দ্র!

রাত্রি কত জানি না, ঘর অন্ধকার, ঘড়িটার ঠক্ ঠক্ আওয়াজই কাণে আস্‌ছে, কত বেজেছে জানবার কোন সম্ভাবনাই নেই আলো না জ্বাললে, কারণ শোবার ঘরের ঘড়িটা 'না বাজা' করা হ'য়েছিল। এক একবার ইচ্ছা হচ্ছিল উঠে আলোটা জেলে দেখি, কত বাজ্‌ল! ঘুম যখন আসবার আর কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না, তখন রাত যদি বেশী না থাকে ত উঠেই পড়ি। কিন্তু এই ইচ্ছাটা কার্য্যে পরিণত করবার প্রধান বাধা এসে দাঁড়াল, আলস্য ও অনিচ্ছা। যাকে খরৌদ্র-কিরণ বিছানা থেকে জাগিয়ে দেয়, তার পক্ষে এমন অসময়ে শয্যা ত্যাগ করা সম্ভবও নয়। শুয়ে শুয়ে ভাবনা হোল—লোকে স্বপ্ন দেখে কেন? শুনেছি এ সম্বন্ধে অনেক বই আছে যা পড়লে সব জানা যায়; দুঃখের বিষয় এই পড়বার মত প্রচুর অবসর আমার ছিলনা,—আমি পড়িনি তবে একখানা বই পড়েছিলুম,—এই কলকাতার সোণাগাছীর পাশেই একটা বইয়ের দোকানের একটা ফড়ে একদিন খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বই ফিরি করছিল, তারই কাছ থেকে মস্ত এক দার্শনিক পণ্ডিতের লেখা "স্বপ্নতত্ত্ব" বই কিনে পড়েছিলুম, ছাই তার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝি নি, আড়াইটে টাকা একদম চলে গেছে! তা ছাড়া, লোকের মুখে শুনে এইটুকু আমার জানা ছিল যে, লোকে দিন-রাত যা ভাবে বা করে, ঘুমের ঘোরে তাই স্বপ্ন দেখে! আমি এ কথাটা বিশ্বাস করতুম। করবার কারণও ছিল। দেশে থাকতে এমন অনেককে আমি স্বপ্নে দেখেছি, যাদের মুখ আমার ধ্যান, জ্ঞান ছিল। কিন্তু অমলকে ত আমি ভাবি নি, তার সঙ্গে পাড়াগাঁর মাঠে-ঘাটে ঘুরেও ত কখনো বেড়াই নি, বেড়াবার ইচ্ছেও নেই—তবে? তার কথা শুনে লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করে' চাষাভূষোর—ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ সেটা—'ভবিষ্যৎ' কামনা করতে আমার দায় পড়ে গেছে—তবে কেন এমন স্বপ্ন দেখ্‌লুম—কে জানে ছাই-পাশ, কেন দেখলুম। আর দেখিছি ত দেখিছি·

—তা নিয়ে কি হবে মাথাটা ঘামিয়ে।

পুড়োকে জাগিয়ে, ডেকে একটু গল্প শুরু করব না কি—ভাবছি, সেও কেমন মনঃপূত নয়। ভ্যাড়োর-ভ্যাড়োর, আর নির্জ্জলা খোসামোদ। থাক্ গে—সেটা—দিনের বেলা যথেষ্টই পাওয়া যাবে। পাশ ফিরে চক্ষু মুদে শুয়ে পড়ি। কিন্তু আরো আশ্চর্য্য! চক্ষু মুদেও যে এমন সুন্দর সুস্পষ্ট দেখা যায়, তা ত আগে জানতুম না। আর অন্ধকারেও এমন আলো কোথা থেকে জলে উঠ্‌ল, কি করে জ্বল্‌লো—তা'ও ত জানি নে, অথচ স্পষ্ট দেখতে লাগলুম, সেই ছবি। সোণার বাংলার সেই মোহন মধুর ছবি—অমল যা স্বপ্নের মধ্যে আমার হাত ধরে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। স্বীকার করছি সে দৃশ্য অতি মনোহর, কিন্তু সে আমি দেখ্‌তে চাইনে, জন্মে অবধি কোন দিনই চাই-নি, আজ-ও না! কি হবে দেখে! কার কি হল-না-হল, ভেবে আমার লাভ?

দূর হোক্—উঠে পড়ি। রাত থাকে একটু থাক্, না-হয় ঘুম একটু কমই হ'ল একদিন, জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখার হাত থেকে ত নিস্তার পাব। শুনেছি, শরীর খুব খারাপ না হ'লে এমন জেগে-জেগে কেউ স্বপ্ন দেখে না, এ না-কি ভারি অসুস্থতার লক্ষণ।

অসুস্থতার লক্ষণ—মনে হতেই সর্ব্বাঙ্গ যেন ভয়ে চমক দিয়ে উঠ্‌ল। গা শির-শির করতে লাগল। অসুস্থতার শেষ সীমা ভাবতে গিয়ে দেখি মৃত্যু! মৃত্যুর পরের অবস্থা যে কি তা আমি জানি নে। তবে এ আমি যে থাক্‌ব না, তা নিশ্চয়—নিশ্চয়। এই ত আমার মা-বাবা দু'জনেই ছিলেন, দু'জনেই মারা গেলেন, আর তাঁরা মা-বাবা রইলেন কি? তাঁরা ত জমিদারী, টাকা-কড়ি হীরা—জহরত স্পর্শ করতেও আসেন না। সব পড়ে রইল, তাঁরা সব সম্পর্ক কাটিয়ে চলে গেলেন। আচ্ছা এমন যদি হত যে, ঘরে গিয়ে আবার জন্মে সেই আত্মীয়-স্বজন, সেই বাড়ী-ঘর, সেই সব দিয়ে পাওয়া যেত—তা হ'লে কি সুন্দর হত। তা হ'লে বোধ হয় 'মৃত্যু' শুনলেই এমন আঁৎকে উঠতে হত না। তা হলে আর অসুস্থতার ভয়েও আমাকে এমন ভয় পেতেও হত না। কিন্তু সে ত আর হয় না!

আচ্ছা, আমি যদি মরেই যাই আজ, আমার এত বড় জমিদারী, এত প্রতাপ, এত প্রতিপত্তি—সবই আমাকে ফেলে চলে যেতে হবে! আমার বাপ মা'র আমি ছিলুম, আমার ত তেমন কেউ নেই আমার পরে যে এ সব দেখ্‌বে-শুন্‌বে, তবে এ-সব কি হবে? গবর্ণমেণ্ট নিয়ে নেবে, না পাঁচ ভূতে যার যেমন ইচ্ছে ভাগাভাগি করে নিয়ে সরে পড়বে! —নাঃ উঠেই পড়তে হল! এ সব ভাবনা ভেবে কি শেষটায় মাথা খারাপ করে ফেলবো।

উঠ্‌লুম, খাট থেকে নেমে মাথার কাছেই দেওয়ালের গায়ে ছিল সুইচ-টা, টিপে দিতেই ঘর আলোয় ভরে গেল। দেখি, সবে দু'টো! তাই ত! রাত ত এখনও বহুৎ—কি কর্ত্তব্য? খুড়োর শরণ নেওয়া, না আর একবার ঘুমের চেষ্টা করা? মনে হ'ল, ঘুমের চেষ্টা করাই উচিত, তবে এখনি বোধ করি আর ঘুম হবে না। এক কাজ করা যাক্—চটি-জুতোটা খুলে পাশের বাথ ঘরে ঢুকে হাঁটু পর্য্যন্ত পা দু'টি ধুয়ে গোটা কতক কুলি করে, কাণে, মুখে, ঘাড়ে বেশ করে' জল দিয়ে তোয়ালেতে মুছতে মুছতে খাটে বসে একটু চুরুট ধরিয়েছি, চোখ দু'টোয় যেন একটু একটু টান পড়তে লাগল। ঘুম এলে এমনি টানই পড়ে।

আবার আলো নিবিয়ে শুলুম এসে! খানিক পড়ে থাকবার পরই সেই অমল আর তার সেই সোণার বাংলা। এবারে স্থির—বাধা দেব না, দেখি না কোথায় গিয়ে ভাবনাটা থেমে যায়। দেখাই যাক্-না, ক্ষতি যখন এতটুকু নেই, মন্দ কি, অমল এলে গল্প করা চলবে। ভেবে, পাশ-বালিশটাকে বুকের মধ্যে চেপে চক্ষু বুজে রইলুম।

সোণার বাংলার মাঠে মাঠে দেখি ধানের ঢেউ

হয়ে যাচ্ছে, তার ঘরে ঘরে খটাখট শব্দে তাঁত চলেছে, মেয়ে-মদ্দ এক সঙ্গে পথে-ঘাটে বিচরণ করছে। মেয়েদের সে দু'হাত লম্বা ঘোমটা নেই, পায়ে-পায়ে জড়াজড়ি ভাব নেই, খোলা মুখে, স্বচ্ছন্দ পায়ে পুরুষের মতই সোণার বাংলায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি যে আমি, আমাকেও পথের এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে তাদের পথ দিতে হচ্ছে, তাদের মুখের দিকে কি দেহের দিকে দৃষ্টি ফেলবার সাহস হচ্ছে না। চোখ দিয়েই ত দেখ্‌তে হবে,চোখ যে ওঠে না! ছেলে-মেয়েরা সব পুরু পুরু কাপড় হলদে রঙে ছুপিয়ে প'রে হাত ধরাধরি ক'রে গান গেয়ে বেড়ায়, ছেলেদের চোখের কোলে সে কালো দাগ নেই, গালগুলি নিটোল, মাথার চুলে তেড়ী আছে কি-না দেখা যায় না, মাথায় সব ছোট ছোট হলদে কাপড় জড়ানো; মেয়েরা—এক একটি যেন পদ্ম! প্রান্তরে শস্য চরছে, মন্ত্রবলে হাড়গুলি সব ঢাকা পড়েছে, গাছগুলি ফলভারে অবনত, বাজারে এত জিনিষের আমদানী হয়েছে যে,লোকে কিনে নিয়ে যেতে পারছে না! সোণার বাংলায় দিলে নেই, 'নীহারণ' নেই দেহে হাড়ের উপর মাংস গজিয়েছে আর সবার নীচে যে খুব গাঢ় ও শীতল রক্ত প্রবাহিত—তা সোণার বাংলার অধিবাসীদের শুধু মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কাছারীতে একটা নালিশ নেই, আদালতের শকুনী-গৃধিনী সভ্যিকারের ভাগাড়ে যাবার দিন গুণ্‌ছে, আরও মজা এই হয়েছে, হাজামা—হুজ্জোতের নাম নেই-থাকায় শুদ্ধ-মাহিনায় পুলিসের লোক আর চাকরীতে টেঁকে থাক্‌তে পারছে না, তারাও হাল-গরুর দর যাচিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের লাল পাগড়ী আর সোণার বাংলার ছেলে-মেয়ের হলদে পাগড়ী দু'টোই দেশের লোক এমন-এক-চক্ষে দেখ্‌ছে যে, দু'য়েতে যেন আর একটুও প্রভেদ নেই। সোণার বাংলার দিকে দিকে শান্তি বিরাজিত, মাঠে-মাঠে, ঘরে-ঘরে তার সোণার ভরা ধান, গরুর বাঁটে তাঁর অফুরন্ত সুধার সমুদ্র, বনে-বনে তার পাখীর গান, আকাশে তার নূতন-সূর্য্য চন্দ্র, সুখ যেন এর থরে থরে মূর্ত্তি ধরে ভেসে বেড়াচ্ছে!

এই সোণার বাংলা আমার! একান্ত আমারই! আমারই সেই জমিদারীকে, আমারই অত্যাচার-দগ্ধ গ্রামগুলিকে মিলিয়ে যাদুকর অমল কোথাকার এক যাদু দণ্ড বুলিয়ে এই সোণার বাংলা করে দিয়ে গ্যাছে। কি তার যাদুর প্রভাব, কি থেকে কি করেছে! ধন্য যাদুকর, ধন্য তুমি আর ধন্য তোমার যাদুমন্ত্র!

স্বপ্ন বটে! যা কখনো হবে না, হতে পারে না, স্বপ্নে তারই একটা ছবি দেখিয়ে আজ্ঞা বিব্রতই ত করলে আমাকে! এই স্বপ্নটির মধ্যেও কি কোনো যাদুকরের প্রভাব অবস্থান করে আছে, তা না হলে আমিই বা এ থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছি নে কেন! এই উদ্ভট সোণার বাংলার জন্যে আমার এ রাত্রি-জাগরণ ক্লেশ বহন কেন?

শেষ দেখ্‌তে গিয়ে দেখি, আমার জমিদারী বল্‌তে কিছু নেই, হীরা-জহরত, টাকা-কড়ি কিছু নেই, যাকে জিজ্ঞেস করি সেই দেখিয়ে দেয়—সোণার বাংলার দিকে! সবাই বলে, তোমার বাপ নাই, মা নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র-কন্যা নাই, অর্থ নাই, সম্পদ নাই,লালসা নাই, লোভ নাই, আছে শুধু ঐ সোণার বাংলা। তোমার ছিল, তা'ও ঐখানে, যা তোমার ছিল না, তা'ও ঐখানে! ঐ—সোণার বাংলায়! আর একদিন দেখি, আমার অঙ্গের সে সূক্ষ্ম বসন নেই, হস্তে সে অঙ্গুরীক নেই, মণিবন্ধে ঘড়ি নেই—তাদের বদলে সোণার বাংলার এক মোটা কাপড় কটিতে, আর কোথাও কিছু আবরণও নেই, আভরণও নেই। লোকে বলে, তোমার সোণার বাংলা! আমার জমিদারী, আমার দেশ—এতক্ষণ যেন আমার ছিল না, তাদের মত নেংটি পরতে তবে 'আমার' হ'ল! শুধু তাই নয়, শুনলুম, আমি তাদের, তারা আমার, আমার ও তাদের সবাইকার এই সোণার বাংলা!

পাড়ায় একঘর মুসলমান ভদ্রলোক থাকতেন, তাঁদের বাড়ীর সেই পাখীগুলোর শব্দেই জান্‌তে পার-লুম,রাত্রি অবসান। বিছানা ছেড়ে উঠলুম, প্রাতঃকৃত্য সেরে চা খেতে বসেই কাগজ খুলে দেখি, এ বছরের কংগ্রেসের সভাপতি কি, আর, দাসের অভিভাষণ বেরিয়েছে। হেডিংগুলো এত বড় অক্ষরে ছাপা যে, কেউ না পড়ে আর থাকবে না। আমার শোনা ছিল, এঁর মত বক্তা হাইকোর্টে তখন আর কেউ ছিল না, ইনি নাকি মকদ্দমার সময় জজদের দস্তুর মত ঘনক দিয়ে কাজ নিতেন, তিনি যে পক্ষে যেতেন, বিজয়লক্ষ্মী তাঁর গলায় মালাটি না দুলিয়ে ছাড়তেন না। এখানী ইনি সব ছেড়ে ছুড়ে খুব নাম কিনেছেন বটে, তার জন্যে আমার কিন্তু বিশেষ শ্রদ্ধা টদ্ধা হয় নি বেশী—তবে অদ্বিতীয় বক্তা আর প্রধান আইন-ব্যবসায়ী টিপ্‌-টপ্‌ সাহেব বলে এঁকে আমি চিরদিন একেবারে দেবতা করেই রেখেছিলুম, তাঁর অভিভাষণটা না পড়ে পারলুম না। পড়তে দেখি, এও সেই সোণার বাংলা গড়বার কথা! সেই পল্লীতেই ফিরে যাও, পল্লীজীবনই জীবন…

চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেছল, দু চুমুক দিয়েই চাকরকে বল্লুম, খুব গরম খানিকটা চা আন্তে! স্বপ্নের নেশাটা কি এখনো ছাড়ল না, তাইই জের এখন অবধি চল্‌ছে! খানিক গরম চা পড়লেই, ভেবেছিলুম স্বপ্নের ঘোর কেটে যাবে।

কিন্তু কাটল না। অভিভাষণ পড়া শেষ করে চুরুট ধরিয়ে ভাবতে লাগলুম—সত্যি কি সোণার বাংলা বলে একটা কিছু আছে? না…

খুড়োমশাই এসে প্রথমেই বল্লেন, দেখ বাবাজী, ঐ সেই পুরুতগিন্নির কথাটা তোমাকে বল্‌তে ভুলে গেছি। মাগী বর ঘোর ছেড়ে বাপের বাড়ী পালিয়েছে……

চাকর বল্লে, অমলবাবু।

পেছনেই অমল! হাতে খবরের কাগজ। মুখখানি যেন হাস্যবিকশিত! খুড়ো মশাইকে নমস্কার করে' আমার দিকে চেয়ে বল্লে—কাগজ পড়লি কমল?

মাথা নাড়লুম, পড়েছি।

অমল বল্লে—কি রকম পড়লি দেশবন্ধুর ··

বল্লুম, ও-সব খেয়াল।

অমল চেয়ারে বসতে যাচ্ছিল, না-বসে চেয়ার খানা ঠেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বল্লে—খেয়াল?

বুঝতে পারলুম, কথাটা অন্যায় বলেছি। অত বড় একজন লোকের বাণী উপহাস করা উচিত হয় নি আমার!

ভয়ে ভয়ে বল্লুম, সবটা পড়ি নি এখনো।

হিঃ কমল!

আমার মুখ শুকিয়ে গেছ্‌লো। অমলের ধিক্কারে নয়, নিজেরই অপরাধে! অমলের ধিক্কারটা শুধু আমাকে জানিয়ে দিলে, সে-টা কত বড় অপরাধ। কিন্তু ধীরে ধীরে তর্ক-শক্তিও আমার জাগছিল, বল্লুম, দেখ, মুখে বল্‌তে পারেন সবাই, পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়ার আর দলাদলির ঠেলা যাঁরা না পুইয়েছেন, তাঁরা কল্পনায় সোণার বাংলা…হ্যাঁ অমল, ভাই, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি…

অমল বাধা দিয়ে বল্লে—থাক্ স্বপ্ন…কমল ম্যালেরিয়া হয়ত সবটা আমাদের করায়ত্ত নয়, তবে দলাদলির কথা যা বল্‌ছ, আমাদের যে মন্ত্র, তাতে দলাদলি হবার সম্ভাবনা কোন কালেই হবে না। যেখানে সবাই মোটা কাপড় পরবে, মোটা ভাত খাবে, প্রাণপণ খেটে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবে—সেখানে দলাদলি স্থান পাবে না।

আমি বল্‌তে যাচ্ছি, অমল স্বপ্নেও আমি এই…

অমল বলে—শোন। এই কলকাতা সহরে দলাদলি নেই, কেন জান? এখানেও—গোলা-মীতে হোক, আর যাতেই হোক্, লোককে খেটে খেতে হয়, আপন-আপন অন্ন সংস্থান করতে হয়,

হলাহলি করবার সময় বা প্রবৃত্তি এদের নেই। পাড়াগাঁয়ে এখন পূর্ণমাত্রায় আছে আমি জানি, শুনেছি, অনেক স্থানে গিয়ে দেখেছি-ও, কিন্তু সে কেন আছে জান? কর্ম্মের অভাব আছে বলে! কাজ নেই, প্রচুর অবসর—তাই! আমি জানি, তাদের কাজ-ও নেই, অন্নও নেই, তারা এক রকম মরিয়া হয়েই এই সব অপকর্ম্মে লিপ্ত হয়ে আছে। একবার তাদের কাজের সন্ধান দিয়ে দাও, পথ বাৎলে দাও, তাদের মুখও বন্ধ হয়ে যাবে। কলসীর জল ততক্ষণই ভক্ ভক্ করে, যতক্ষণ সে না পূর্ণ হয়। এদেরও অলস ও শূন্য অন্তরগুলিও কর্ম্ম দিয়ে পূর্ণ করে দাও, কোন গোল থাকবে না। কমল, সেই কর্ম্মের সন্ধানই দিতে হবে, সেই পাড়াগাঁয়ে যারা অন্নহীন, বস্ত্রহীন, অ-মানুষ হয়ে পড়ে আছে, তাদেরই অঙ্গে বস্ত্র দিয়ে, উদরে অন্ন দিয়ে, মানুষ করে নিতে হবে। এই এখন আমাদের কাজ, এই আমাদের সাধনা! পূর্ণ করতে হবে, নইলে জীবনই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ভাই!

খুড়ো মশাই বল্লেন—যা বলেছ ভায়া! কাজ, কাজ, কাজ! সেই যে ছেলেবেলায় মেঘনাদবধ কাব্যে পড়েছিলুম,

যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি
আঁধার পূরে তার দেখিবে না আর…

খুড়ো মশাই-এর স্মরণশক্তির নমুনা এর আগেই আমি পেয়েছি। খুড়ো মশাই একটা কি টৈকিয়ৎ দিতে যাচ্ছেন, কমল হঠাৎ আমার দু'টি হাত জড়িয়ে বল্লে, একবার তোর দেশটা দেখিয়ে দে, আর কিছু অর্থ দে,—আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।… দিবি?

আমি ভাবছি, কমল বল্লে,—বেশী না, যা তুই পারিস্, যা দিলে তোর কষ্ট হ'বে না, ভাই…

বল্লুম, আমাদের ওখানে কাজ আরম্ভ করবি?

করবো, করবো, কমল, তুই সংসার হ—যতটুকু চাস্…

তবে একদিন চল…

কমল বল্লে—একদিন কেন বন্ধু? আজই…

আজই?

নির্ব্বিকার কমল—আজই!

গ্রামের পথেই প্রথম দেখা প্রসাদের সঙ্গে। সে কোন দিন আমার সাথে কথা কয় নি। আজ একবারে আমাকে বুকের মধ্যে টেনে আলিঙ্গন করে বলে উঠ্‌লো—তোমার কথাই ভাবছি ভাই। এক মায়ের সন্তান আমরা, অথচ তুমি কোথায় আর আমি কোথায়? যাক্—তুমি এসে পড়েছ ভাই, তোমার দেশ—তুমি নাও; যা ভাল বোঝ কর। আমি চল্লুম!

কোথায়?

কলকাতায়, মার কাছে।

মা সেখানে?

হাঁ।

নির্ম্মল?

সেখানেই?

কবে গেলেন?

পাঁচদিন, গয়লাবৌকে নিয়ে গেছেন।

এস—বাড়ীতে বসে কথা কইব।

বলে তা'কে টেনে নিয়ে গেলুম। কমল তাকে ছাড়বে না, বল্লে—আপনাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না।

প্রসাদ কাঁদ-কাঁদ হয়ে বল্লে—দু'দিন। দু'দিনের জন্যে ছুটি দাও, আবার ফিরে আস্‌ব। একবার শুধু…

কমল—শুধু কি প্রসাদ?

প্রসাদ গম্ভীরভাবে বল্লে—আর নয়—আর একদিন বলব।

আর একদিন কেন ভাই?

বল্লে—কি হয়েছে কিছু বুঝতে পারছি নে ভাই। তবে একবার কলকাতা যেতে চাই। জানি নে কেন।

অমল বল্লে—তা মা'র সঙ্গে দেখা করে এস—একবার।

প্রসাদ হাঁপ ছেড়ে বলে উঠ্‌লো—কাল ভোরেই যাব!

আমি ত জেবেই পাই নে, যে প্রসাদ চিরকাল মা'কে ছেড়ে সহরে পড়তো, হঠাৎ তার এমন ভাবটা হয় কেন?

ক্রমশঃ

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য-প্রতিভা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল)

গার্হস্থ্য নাটকগুলির মধ্যে 'হারানিধি' একখানি উৎকৃষ্ট নাটক। ইহার রসানাভূতি ও সৃষ্ট চরিত্রগুলির আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। প্রথমেই বলিয়া রাখি আলোচ্য নাটকের চরিত্রগুলি রক্ত-মাংসে গঠিত মানুষের চরিত্র। এখানে অস্বাভাবিকতার লেশমাত্র নাই। নাটকখানির উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য যে সকল চরিত্রের সমাবেশ প্রয়োজন হইয়াছে, কবিবর তাহাই কৃতিত্বের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন।

নাটকখানির বর্ণিতব্য বিষয় সংক্ষেপে এই:—ধনী মোহিনীমোহন ও গৃহস্থ ঘরের হরিশ দুই বাল্য-বন্ধু। হরিশের জামাতা অঘোর কুসংসর্গে পড়িয়া সংসার হাল্কা করিয়া ও দু একটা ঘড়ি মেরামত করিয়া দিব বলিয়া লইয়া আসিয়া বিক্রয় করিয়া টাকাটা আত্মসাৎ করে এবং ধরা পড়িয়া জেলে যাইবার ভয়ে আগ্রায় পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। সেখানে গিয়া দশজনের মত জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য সদাব্রত বর্দ্ধন ডাক্তার সাজিয়া ব্যবসা চালাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছু কিছু উপার্জ্জনও করিতেছিল, এমন সময় ভাগ্যক্রমে একটা নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। এক ভদ্রলোকের বাড়ী হইতে ডাক্তার বাবুর ডাক পড়্‌ল। তার নিজের কথায় ব্যাপারটা খুলিয়া বলি—'হুসীদ ভদ্র তাঁর স্ত্রীকে হাওয়া খাওয়াতে এনেছেন; কল্‌কাতায় তার চিকিৎসা করে কিছুই হয়নি; উপযুক্ত ডাক্তার দেখে, আমায় ডাক্ পড়্‌লো, আমিও এসে নাড়ী ধরলাম; বিধুমুখীর পেট উঁচু, মুখে কাপড় চাপা; শুন্‌লেম বড় জ্বর হয়; ক্যালোমেল প্রভৃতি ভাল ভাল ঔষধ ব্যবস্থা করলুম; ছবেলা যাতায়াত; ৪৲ টাকা করে ফি আর পাল্কী ভাড়া। ... এক দিন দেখি পেসেণ্টের (রোগিনীর) হাতখানা একটু শক্ত আর ঠাণ্ডা; আর বাড়ীতে জন প্রাণী নেই; সমস্ত নীরব! ক্রমে একটু এদিক ওদিক আওয়াজ আস্‌তে লাগ্‌ল, দেখি বাড়ীর সদরে কনেষ্টবল সাহেব; আর মা একদিক—যে জানলা ভেঙ্গে সট্‌কে পড়লুম।' তারপর খবরের কাগজে একটির অঘোর দেখিল যে অঘোর মিত্র এলায়েস (Alias) সদাব্রত বর্দ্ধন একজন গোমস্তার মেয়েকে বার করে এনে পেটেপোরে খুন করেছে; আর রাত দুপুরে জলে ঝাঁপ দিয়ে মরেছে। একটা দোষারোপের নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কলিকাতায় এসে জুয়াচুরীর নূতন নূতন ফন্দী করে ফাঁকি দিয়ে কিছু কিছু রোজগার করতে লাগ্‌ল। ইতিমধ্যে সে আন্‌তে

---

* কাস্তবাসে শ্রীযুক্ত শৈলজা মুখোপাধ্যায় লিখিবার ভার লইবেন।

পারে যে, তার শ্বশুরের বন্ধু মোহিনীমোহন তার ভাতের গর্ভ-সঞ্চার করে, তার সরকার গুণনিধির সঙ্গে তাকে আগ্রায় পাঠিয়ে দেয় ও তাকেই দেখ্‌তে গিয়ে সে বিপদে পড়েছিল; আরও সে শুন্‌লে যে, মোহিনীমোহন তার শ্বশুর বেচারাকে জুয়াচুরী করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তার মনে প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা হ'ল। নানারকম ফন্দীও সে ঠিক করেছিল; কিন্তু মানুষ গড়্‌তে চায় এক রকম, ভগবান করিয়ে নেন অন্যরকম। তারপর একদিন সে তার খুড়-শ্বশুর নবর সঙ্গে গিয়ে রাত্রিতে দূর থেকে তার পত্নী সুশীলাকে দেখ্‌লে। সে দেখ্‌লে, সুশীলা প্রাণের আবেগে তার একখানা ফটোকে পূজা করছে; আর প্রাণের আবেগে বল্‌ল—"আর নীরব থেকো না, কথা কও, দাসীর প্রাণ শীতল কর, আমি বড় তাপিত, আমায় শীতল কর।—• • দাসীকে পায়ে রাখ, একটী কথা কও—একটী কথা কও। হতভাগিনী ডাক্‌ছে, দেখা দাও; একটী কথা কও।" নেপথ্যে থাকিয়া অঘোর 'সুশীলা!' বলিয়া ডাকিল। তখন সোৎসাহে সুশীলা বলিল, 'প্রাণনাথ আমায় কথা কও, দাসীর প্রাণ জুড়াও, কই নাথ, কই নাথ, কই তুমি কথা কও।' অঘোর আবার নেপথ্যে বলিল, 'সুশীলা, যদি দিন পাই, দেখা হ'বে।'

ধ্যানরতা পত্নীর এই দিব্য চিত্র দেখিয়া অঘোরের সুপ্ত বিবেক জাগ্রত হইয়া উঠিল, চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য সে সচেষ্ট হইল—সুশীলার উপযুক্ত স্বামী হইবার জন্য প্রাণপণে সে যত্ন করিতে লাগিল। চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ যেমন আকৃষ্ট হয়, তাহার হৃদয় তেমনই সুশীলার দিকে আকৃষ্ট হইল। কিন্তু খাঁটি চরিত্র না লইয়া সেই দেবীর কাছে যাইতে তাহার মন সরিল না—তাহার চরিত্র খাঁটি সোণায় রূপান্তরিত হইল। ভাগ্যক্রমে যখন সে ৬০০০৲ টাকা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইল, তখন জুয়াচুরী করিয়া যাহার নিকট হইতে যাহা লইয়াছিল তাহাকে তদতিরিক্ত বহুতর টাকা দিয়া পূর্ব্ব দোষের প্রায়শ্চিত্ত করিল। অঘোরের চরিত্র পরিবর্ত্তনের চিত্র খুব স্বাভাবিক ভাবে নিপুণতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। পঞ্চম অঙ্কের ১ম দৃশ্য উকিলের আফিসে যখন অঘোর মাতামহের বিষয়ের দরুণ পাওনা ৬০০০৲ টাকা লইতে যায়, তখন উকীলবাবু তাহাকে বলেন,'টাকাটা দেখে নিন' —উত্তরে সে বলিয়াছিল,—'ঘণাই পড়ে পাই চোদ্দ আনা,আর দেখাদেখি কাজ নাই।' তারপর সকলের প্রাপ্য টাকা যখন অধিকধাত্রায় পরিশোধ করিয়া স্বীকার করিল যে, সে এক দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে, তখন উকীলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবীমূর্ত্তি কি?' অঘোর উত্তরে বলিল,—'দেবীমূর্ত্তি কি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন! যে উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রাণের ঘোর তম নাশ করে, যে বিমল প্রতিভা পাষাণ-হৃদয়ে সৎ প্রবৃত্তি অঙ্কুরিত করে, আমার হৃদয়ে অনুতাপ আনে, সেই দেবীকে তখন দর্শন করেছিলুম।' তখন উকীল আনন্দ গদগদচিত্তে বলিয়া উঠিলেন, Clear, clear as daylight; Give me your hand, you are a changed man (অর্থাৎ বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি আপনি শুধ্‌রে গেছেন, হাত বাড়িয়ে দিন অভ্যর্থনা করি। অনুবাদটা গিরিশবাবুর নয় আমাদের) আপনি যখন টাকাও দিলেন, তখন আমার সন্দেহ ছিল। আমি বুঝেছি, আমি বুঝেছি।' সংসারাভিজ্ঞ ব্যবহারজীবী স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন যে, দেবীর কৃপায় তাঁর চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। একটা আদর্শের সন্ধান না পাইলে শুধু অনুতাপে স্থায়ী কাজ হইতে পারে না। অনুতাপ মনটার ময়লা মাটি দূর করিয়া দেয়। কিন্তু পতিত জমী মনটার আগাছা গুলি তুলিয়া ফেলিলেই চলে না, আবার আগাছা জন্মাইতে ত দেরী লাগে না। তাই সেখানটা চাষ করিতে হয়। এখন তিনি দেখিলেন, হরিণের মন জমিটা চাষও হইয়া

গিয়াছে, প্রেমের ফসলও বোনা হইয়াছে, তাই তিনি আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া পূর্ব্বোক্ত কথা বলিয়া উঠিলেন। এখন উকীলবাবুর কথায় তার বন্ধু তেজ বাহাদুরের চমক্ ভাঙ্গিয়া উঠিল। তিনি ত শুনিয়াছেন বেচারীর স্ত্রীর সঙ্গে আদৌ সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে এ দেবীটী কে? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি কি? কথাটা কি, দেবীমূর্ত্তি কি?'

অঘোর। বিধাতার ধ্যানের সৃষ্টি! নন্দন-কুসুম অকলঙ্ক শশী সে প্রতিমার তুলনা নাই, প্রাণময়ী প্রেমময়ী মূর্ত্তি।

তারপর অঘোর যখন মোহিনীর খরচাশুদ্ধ হ্যাণ্ডনোটের বাকীর টাকাটা মিটাইয়া দিল, তখন মোহিনী বলিল, 'বাবা তুমি কে, আমি জানি নি, কিন্তু তুমি আমার শিক্ষাদাতা, তোমা হ'তেই আমার জীবন ফিরেছে।' তারপর মোহিনীবাবু তেজবাহাদুরের অনুরোধে টাকাটা লইয়া উকীলবাবুকে কোন চেরিটেবল পারপাসে অর্থাৎ দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য দিতে বলিয়া গেলেন। এই সময়ে অঘোরের মনের ভাবটা যে রকম হইয়াছিল, তা তাহার স্বগতোক্তি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়—'এইবার সটকাই। ভিখারী বেটীকে টাকাটা দিয়ে, খুড়োর কাছে বিদায় হয়ে, আর একবার সুশীলাকে দেখে ভেসে পড়ি।' কিন্তু অদৃষ্টের শুখন কাটিয়া যাইতে পারে কে? প্রেমময়ী পত্নীর সহিত আবার তাহাকে মিলিতে হইল। শেষ অঙ্কে যখন উন্মাদগ্রস্ত হরিশ আপনার কন্যাকে ব্যাভিচারিণী মনে করিতেছিল—যখন তিনি সন্দেহ-দোলায় দুলিতেছিলেন, তখন অঘোর বলিয়া উঠিল,—'মশাই মার চেয়ে যে দরদী তাকে বলে ডান। আমি যখন সন্দেহ কর্ত্তে নি, আপনি কেন সন্দেহ করেন।' কথাটায় হরিশের লুপ্ত চেতনা ফিরিয়া আসিতে লাগিল—ক্রমে সে প্রকৃতিস্থ হইয়া জামাতা অঘোরকে 'হাবানিধি' রূপে পাইল।

'হাবানিধি' নাটকের এই হইল একাংশ। অঘোরই নাটকের এ অংশের নায়ক; কিন্তু আলোচ্য নাটকের আর একটা দিকের নায়ক হইতেছে—হরিশের পুত্র নীলমাধব। গিরিশ-চন্দ্রের অনেক নাটকেই দুইটী করিয়া নায়ক দেখিতে পাওয়া যায়। মোহিনী-মোহনের ১০০০০৲ টাকার জন্য তাহার বন্ধু হরিশ জামিন হইয়া পৈত্রিক ভদ্রাসন বাড়ী বন্ধক দিয়া-ছিলেন। হরিশ জানিতেন, ঐ দেনা ত তাহার নয়, মোহিনীমোহনের হাতে টাকা হইলেই তিনি পরিশোধ করিয়া দিবেন। হরিশ জীবনের আশা পরি-ত্যাগ করিয়া বন্ধুর একবার প্রাণদান করিয়াছিলেন, ও অনেকবার বহু প্রকারে উপকার করিয়াছিলেন। আর তাঁর এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, এ দেনা যখন মোহিনীমোহনের, তখন তিনি অবশ্যই দেনার টাকাটা পরিশোধ করিয়া দিবেন; কিন্তু চক্রী মোহিনীমোহনের বহুদিন হইতে তার বাড়ীর সংলগ্ন বন্ধুর বাড়ীটা আত্মসাৎ করিবার ইচ্ছা ছিল। তাই তিনি ফন্দী করিয়া বন্ধুকে জামিনদার খাড়া করিয়া-ছিলেন। এ জামিনের টাকা দিতে না পারায় বাড়ীখানা যখন বিক্রয় হইয়া যায়, তখন মোহিনী-মোহনই তাহা খরিদ করেন। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই আমরা ইহা জানিতে পারি। মোহিনীর চরিত্রের আভাস আমরা এইখানেই প্রথম পাই। তাঁর মুখেই যখন প্রথম শুনি, 'গরিব লোকের আর কাজ কি? বড়লোকের জন্য মাথা দেবে, বড় লোকের জন্য দেহে মাসুষ যোগাবে, কুকুরের মত দুটি খাবে, আর থাকবে'—তখন আশ্চর্য্য হইয়া পড়ি তাঁহার ধারণাটা দেখিয়া। তারপর যখন হরিশ দেখি-লেন বাড়ী খানা ফিরিয়া পাইবার কোন আশাই নাই তখন বলিলেন, 'তুমি কি বড়লোক? বড়লোক বলে পরিচয় দিও না, বড়লোকের কলঙ্ক ক'র না। অনেক ধনাঢ্য প্রাতঃস্মরণীয়; তাঁদের ধন দরিদ্রের দুঃখ-মোচনের জন্য—তাঁদের নাম করলে দিন ভাল যায়, তাঁদের দানে বেশ অদৈন্য, তাঁদের বড়লোক বলি, তুমি বড়লোকের চণ্ডাল!' উত্তরে মোহিনী বলিয়া-ছিলেন,—"সে রকম দু'ই একটা আছেন বটে

ঘটে।" ইহা হইতে তাঁহার চরিত্রের একটা দিক বেশ সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। তার পর কাদম্বিনীর প্রতি অমানুষিক ব্যবহারে তাঁহার প্রতি ঘৃণার মাত্রা বাড়িতে থাকে। পরিশেষে যখন হরিশ্চন্দ্রকে কন্যাদান করার সময় সুশীলাকে পাইবার জন্য লালসা করিতে দেখি, এবং তাহাকে অন্তঃপাতিনী করিবার চেষ্টা ও বিষম আয়োজন করিতে দেখি, তখন ঘৃণার মাত্রা সপ্তমে চড়িয়া বসে। পাপাত্মা মোহিনীমোহন পত্নীকে কখনও ভালবাসেন নাই—সুনজরে কখনও তাঁহাকে দেখেন নাই। একদিন কমলা তাঁর স্বামীকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলেন যে, হরিশের স্ত্রী হৈমবতী তাঁর যেখনহাসি. তাঁদের উদ্‌বাস্তু ক'রো না। তখন স্বামী স্ত্রীতে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার আংশিক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। মোহিনীমোহনের চরিত্র কি রকম ছিল, তাহা এ অংশটা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়।

মোহিনী। • • • • তুমি কেউ নও, এই কথা জেনো; আমার মেয়ে মানুষ করবার বাঁদী—এর অধিক আস্পর্দ্ধা কর, দূর করে তাড়িয়ে দেবো।

কমলা। আমি তোমায়, কখন কিছু বলিনি, কখন কোন অনুরোধ করি নি; আমার এই কথাটী রাখ, আর আমি কখন কিছু বল্‌বো না। যেখনহাসীরা বিশ্বর উপকারী, আমি যেখনহাসির যত্নে হেমাকে (কন্যা) ফিরে পেয়েছি। দিনকে দিন বলে নি, রাতকে রাত বলে নি; অনেকদিন ভুগিয়ে দিয়ে আমার হেমাকে বাঁচিয়েছে, তা'রে তুমি উদ্‌বাস্তু ক'র না।

মো। আর কি বক্তৃতা আছে, শুনি!

কমলা। যেখনহাসির নিঃশ্বাস পড়লে হাড়ে হাড়ে বিঁধবে; শুনেছি তোমরা দুজনে একসঙ্গে পড়েছ, একসঙ্গে খেলিয়েছ, একসঙ্গে খেয়েছ, এক সঙ্গে শুয়েছ, হরিশবাবু তোমার জন্যেই জামিন হয়েছিলেন; তাঁর সর্ব্বনাশ কর্‌লে ধর্ম্ম কিরূপ হবে?

মো। হুঁ, তুমি কে, তা জান?

ধনিতা কামিনীর গায়ে অগ্নি ফেলিয়া দিলে সে যেরূপ ক্রুদ্ধা হয় ক্রোধাগত আঘাতে কমলাও সেইরূপ ক্রুদ্ধা হইয়া অভিমানভরে বলিলেন,—

'আমি তোমার স্ত্রী; সহধর্ম্মিণী। যাতে তোমার ভাল, তাতে আমার ভাল; তোমার অমঙ্গলে আমার অমঙ্গল; তোমার জীবনে আমার জীবন! তাই তোমায় বারণ কর্‌ছি।'

মোহিনী। এতদূর! ম'লে সতীলক্ষ্মী যাও না কি?

কমলা। বালাই, ষাট; তুমি অক্ষয়—অমর হও, আমি তোমার কোলে চোখ বুজি।

স্বামীর মৃত্যুর কথা শুনিয়া পতিগতপ্রাণা সাধ্বী হিন্দু রমণীর ক্রোধ অভিমান সব ভাসিয়া গেল—তিনি তাঁর প্রাণের কামনা পতিদেবতার পদে জানাইলেন, কিন্তু ধন-মান গর্ব্বিত মোহিনী সে কথা বুঝিতে পারিলেন না—স্ত্রী যে সহধর্ম্মিণী, ও সহকর্ম্মিণী তা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন মেয়ে মানুষের এত বড় আস্পর্দ্ধা; আমার দ্বার প্রবল পরাক্রান্ত জমীদারকে এমন কথা শুনাইয়া দিবার তাঁর কি অধিকার; তাই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি তা জান না?'

কমলা। আমায় বল, আমায় শিখিয়ে দাও।

মোহিনী। তুমি বাঁদী, দাসী, আসবাব।

কমলা। আমি তার চেয়ে ত কখন বড় হইনি, হবার ইচ্ছাও করি নি। আমি তোমার বাঁদী, তাই তোমার মঙ্গল খুঁজ্‌ছি।

মোহিনী। তুমি অতি নির্ব্বোধ। তোমায় বুঝিয়ে বল্‌ছি শোন! বল্‌বার কারণ আছে, নইলে তোমার মত নির্জ্জীব পদার্থকে বোঝাবার আবশ্যক ছিল না। আমার মেয়ে তোমার হাতে মানুষ হচ্ছে, এই আমার বোঝ্‌বার দরকার; আমার মেয়ে না তোমার মত অপদার্থ হয়। ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, এ সব যদি মনে ছিল, বড়লোকের ঘরে এলে কেন? তুমি ছোট ঘরের মেয়ে, বড়লোক কেমন ক'রে হয়,

কাল না, সাত হাত মাটী কোদলা ও একটা পয়সা পাবে না, জোর টাকার সম্পত্তি কি অমনি হয়? গ্রাম জালিয়ে প্রজা শাসন কর্‌তে হয়, গচ্ছিত ধন ফাঁকি দিতে হয়, নাতোয়ানের বিষয় কেড়ে নিতে হয়, তবে বড়লোক হয়। বিষয় হ'লে লাঠির আগায় বিষয় রক্ষা কর্‌তে হয়। তুমি এসব জান না; যেমন জান না, আমি জান্‌তে বলি নি—ঘরে বসে খাও দাও থাক, মেয়েটাকে উচ্ছন্ন দিওনা, এই আমার কথা। আমি চোখ্ বুজ্‌লে মেয়েরই বিষয় হবে; তুমি যদি ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শাপ-মন্যি দেখাও, তা হ'লে এই অট্টালিকা দেখ্‌ছো—দুদিনে মাঠ হবে; তুমি মনে কর, আমি মেয়ের হাতে টাকা দিয়ে, গরীবের বাড়ী পাঠাই, ধর্ম্ম দেখাতে? তা নয়—খপরের কাগজে লিখ্‌বে যে, মোহিনীবাবু মহাশয়; তাঁর কন্যা দীন দুঃখীর বাড়ী-বাড়ী গিয়ে যার অন্ন নেই, তারে অন্ন দেয়, যার বস্ত্র নেই, তার বস্ত্র দেয়, দশটা বাড়িয়ে লেখে—এ খুন, মাগাবাজী ঘরজালানির হজমিগুলি।

কথাগুলি শুনিয়া কমলা প্রথমে বিশ্বাস করিতেই পারিলেন না যে, এগুলা তাঁর স্বামীর প্রাণের কথা। তাই জিজ্ঞাসা করিল?

ক। তুমি কেন আমার সঙ্গে প্রতারণা কর? কেন আমায় দুঃখ দাও? তোমার ত সে স্বভাব নয়?

মোহিনী। তুমি ছেলে মানুষ; এতদিন আমার সঙ্গে ঘর কর্‌ছো তবু বল্‌ছো প্রতারণা কর্‌ছি? চক্ষের উপর যে কাজগুলো হ'য়ে গেল, তা দে'খে তোমার জ্ঞান হয় নি? তোমার চক্ষের উপর বড় বৌকে বৃন্দাবনে মারলুম; কি ক'রে তার বিষয় হস্তগত করলুম, তা তুমি দেখনি? না দেখে থাক আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আমি দেখ্‌ছি, হেমাকে তুমি যা বল তাই দেখে। কতকগুলা আগ্‌ডুম-বাগ্‌ডুম শিখেছে; ধর্ম্ম কর্ম্ম, লোক-লজ্জা এসব কথা তাঁর মুখেও শুন্‌তে পাই! আমার একটি অনুরোধ রাখ,—বল্‌লে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে পার, স্বামীর একটা কথা রাখ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম এসব যে লোক দেখান, তাই তাকে শেখাও। যদি না শেখাও, আমার মেয়ে আমি তোমার কাছ থেকে তফাতে রাখ্‌বো।

কমলা। আমি আমার পেটের সন্তানকে এই উপদেশ দেবো?

তার পরের অংশ আর উদ্ধৃত করিব না। ভদ্র-ঘরের সন্তান পরিবারকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া প্রহার পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

মোহিনীমোহনের চরিত্রের একটা দুর্ব্বল দিকও ছিল—সেটা কন্যা হেমাঙ্গিনীর প্রতি টান—ভালবাসা। কন্যার নিকট তিনি একটী পুতুলের মত ছিলেন। তার শত অত্যাচার তিনি অম্লানে সহ্য করিতেন। তার পায়ে যদি কুশও বিদ্ধ হইত, তবে হইলে সেটাকে শেলের মত বিঁধিয়াছে বলিয়াই মোহিনীমোহনের ধারণা হইত। কবিবর গিরিশচন্দ্র এইখানেই শুরুতর রকম আঘাত দিয়া তাঁহার চরিত্র সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। রাস্তার মাঝখানে কমলা হেমাঙ্গিনীকে দেখিয়া যখন মাতালেরা ইতরামি করিতে লাগিল, তখন নীলমাধব সেখানে আসিয়া পড়ায় তাহারা পালাইতে পথ পাইল না। কিন্তু তার পূর্ব্বেই হেমাঙ্গিনীর মূর্চ্ছা হইয়াছিল। মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা অপনোদন হইতেছিল, আবার সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছিল। জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে কন্যাকে দেখিয়া মোহিনীমোহনের বিগত জীবনের প্রতি ঘৃণা আসিল। অকপট চিত্তে বলিয়া ফেলিলেন—নীল-মাধব! তোমায় কি বল্‌বো? আমি নরাধম! তুমি এমন মহাশয়, আমি তা জানতুম না, আমি তোমাদের সর্ব্বনাশ করেছি, আবার সর্ব্বনাশ কর্‌তে এসেছিলুম, কিন্তু বিশ্বাস কর—আমার সাজা যথেষ্ট হয়েছে, আমিই আমার বুদ্ধির দোষে স্ত্রীকন্যাকে এনে মাতালের মুখে ধরেছি, আমিই বুঝি আমার হেমাকে মারলুম। দেখ আমার হেমা ধূলোয় পড়ে!'

নীলমাধব উত্তরে বলিয়াছিল, 'একে বাড়ী নিয়ে যান, ভাল ডাক্তার দেখান। এর খুব শক্ (shock) লেগেছে।'

নীলমাধব মেডিকেল কলেজের ছাত্র। সে যখন বলিল আঘাতটা গুরুতর, তখন মোহিনীমোহন আরও ভীত হইয়া পড়িল, ও বলিল, 'বাবা, তুমি আমার সঙ্গে এস, আমার হেমাকে তুমি বাঁচাও।'

তার পর যখন মোহিনীমোহন একটু চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন, তখন ঠিক করিলেন নীলমাধবই যত অনিষ্টের মূল। তাঁহার ধারণাটা তাঁহার কথায় বলি—'নীলমাধব ব্যাটাকে কি ক'রে জব্দ করবো? মাতালদের তাড়িয়ে দিলে, হেমাকে যত্ন দেখালে, এই বেটা মক্কার চেয়ে বসেছে। এই বেটা লেখাপড়া জানে, তারি মতলবে সব হয়েছে', আর এইরূপ মনে হইবা মাত্রই ধনমদে গর্ব্বিত মোহিনীমোহন উপকার ভুলিয়া গেলেন, স্থিরসঙ্কল্প করিলেন, 'সুট করাবো, রাস্তার লোক দিয়ে বলাৎকার করাবো, কাটবো, মারবো, না হয় ফাঁসি যাব।'

হেমার চিকিৎসার ভার পড়িল সুচিকিৎসক ধরণী ডাক্তারের উপর। ইনি নীলমাধবের আত্মীয়। কিন্তু ডাক্তার রোগের মূলটা ধরিয়া ফেলিলেন—তাঁর মনে হইল, এটা প্রেমের বিকার জাত ব্যাধি। প্রণয়াস্পদ নীলমাধব ও তার মা ও ভগ্নীকে কাছে পাইলেই হেমা নীরোগ হইয়া উঠিবে। তাই তিনি একদিন নীলমাধবের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া হৈমবতীকে বলিলেন, 'হেমাঙ্গিনীকে বাঁচাতে হবে, না ব'লো না মা! নির্দ্দোষী বালিকা তোমায় মার মতন জ্ঞান করে, তুমি না দয়া কর্‌লে মারা যাবে, তার আর চিকিৎসা-শাস্ত্রে ঔষধ নেই।'

সরলমতি হৈমবতীর প্রাণটা নীলমাধবকে সে বাড়ীতে পাঠাইতে প্রথমে চাহিল না; কারণ তাঁর কপাল যে ভাঙ্গা! শক্রপুরীতে কি করিয়া তাঁর শিবরাত্রির সলিতা—তাঁর আঁধার ঘরের আলোকটিকে—সে তার একমাত্র আশ্রয়স্থল সোণার নীলমাধবকে পাঠান। তাঁর স্বামী পথে পথে ঘুরিতেছেন—বা কি ভাবে আছেন, তাহা তিনি জানেন না। নীলমাধবই যে তাঁর অন্ধের যষ্টি—সে সম্বল ছাড়িয়া দিতে তিনি চাহিলেন না, তখন ডাক্তারবাবু তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—'মা, তোমায় যে মার অধিক জানে সে মৃত্যুশয্যায়—তবু একবারও তোমাদের নাম ভোলে নি। সে দিবা রাত্রি তার মাকে বল্‌ছে, মা আমার দেখন হাসি মাকে এনে দে—তা হ'লেই আমি ভাল হবো।' মা, তোমার সর্ব্বনাশ হয়েছে ব'লে কি একজন অবলা বালিকার প্রাণ রক্ষা কর্‌বে না? সর্ব্বনাশ হয়েছে ব'লে কি পরোপকার কর্‌বে না? মা, তা হ'লে তো সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশই বটে! মানুষের যতই কষ্ট হোক, যতই বিপদ হোক, বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকতে পারে, তুমি কি এই ঘোর বিপদে মধুসূদনকে ডেকে বল্‌বে, তোমার মনের বেগে অবলা স্নেহময়ী বালিকার প্রাণ রক্ষা কর্‌তে পার্লে না? বিপদ বড় নয় মা! মহত্বই বড়, বিপদের মৃত্যুর পর অধিকার নাই, মহত্ব চিরদিনের সাথী। মা তোমার উপযুক্ত কথা হয় নি!

হৈমবতী। যদি আবার কোন বিপদে পড়ি?

ধরণী। যে বিপদকে ভয় করে, সে পরোপকার কর্‌তে পারে না, যার পরোপকারের জন্য প্রাণ না নৃত্য করে, সে পরোপকার কর্‌তে পারে না। মা, তোমায় আমি মানবী জানি নি, অন্নপূর্ণা বলে জানি, ছেলেবেলায় তোমায় স্কুলের ছেলেদের পরিবেশন কর্‌তে দেখে চক্ষে জল এ সতো; ভাবতেম, এই অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি, এ আবার কি মা, আমার সে ধ্যানের মূর্ত্তি। তাতে আঘাত করো না; দিদি। দিদি। তোমাকেও যেতে হবে, তুমি চির-সন্ন্যাসিনী, তোমার এই ব্রত।

ডাক্তারের কথায় তাঁর চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি যাইতে রাজী হইলেন। বাস্তবিক জগতে মহত্বের চেয়ে বড় কিছু নাই।

হেমাঙ্গিনী তাঁহাদের অক্লান্ত পরিচর্য্যায় ও

নীলমাধবের সাহচর্য্যে তাহাকে দেখিতে পাইয়া তার যে একটা অযাচিত ভয় আসিয়া তার মনকে সম্পূর্ণভাবে অধিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিল, তা দূর হইয়া গেল—তার হেমনহাসি মাসীর ও সুশীলার পায়ের ধূলা লইয়া সে নিরাময় হইয়া উঠিল।

ইঁহাদের পবিত্র চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া মোহিনীমোহনেরও চরিত্র একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। নীলমাধবের উপর সময়ে সময়ে তাঁহার ঘৃণা হইত—তিনি মনে করিতেন, পিতার সর্ব্বস্বাপহরণ কারীকে শাস্তি দিবার জন্য সে এরূপ ছলনা করিতেছে, কিন্তু তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য তাঁর সর্ব্বনাশ করা; কিন্তু সে ভুল একেবারে তার দূর হইল, যখন সে তাদের বাড়ীর দখলে একরার ও বিক্রী দলিল খানা (Conveyance) ফিরিয়ে দিল। মোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ দলিলগুলো কোথায় পেলে?' উত্তরে নীলমাধব কেবলমাত্র বলিয়াছিল, 'আমায় কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না।' মোহিনী-মোহন তখন আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, 'ইস্ কারে কি ঠাউরেছি, এর ষড়যন্ত্রে লাভ কি? চণ্ডাল মন, আর অবিশ্বাস আনিস্ নি; তারপর প্রকাশ্যে তাহাকে বলিলেন,—'বাবা নীলমাধব, যথার্থই কি তোমার মত মানুষ হয়, এ সম্ভব আমি—জানতুম না? আজ আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়্‌ছে, তোমার বাপ আমায় জল থেকে তোলে, আমি বাড়ী এসে বাবাকে বল্‌লুম, হরিশ আমায় সাঁতার দিতে নিয়ে গিয়েছিল; গয়না চুরি কর্‌লুম, বল্‌লুম, হরিশের পরামর্শে; আমার জন্য অস্থি চূর্ণ হয়ে গেল; বল্‌লুম, সেই জন্যই বাধিয়েছে। তোমার বাপ বাইরে থেকে এসব কথা শুনে বল্‌তো, বেশ করেছিস্, আমার নামে দোষ দিয়ে বেঁচে গিয়েছিস তো? তার আমি এই সর্ব্বনাশ কর্‌লুম! এই কাজ আমাতেই সম্ভব, কিন্তু হরিশের ছেলে যা হওয়া উচিত, তুমি তাই!

নীলমাধব কথাটা শুনিয়া বলিয়া উঠিল,—'মশাই কুকার্য্য অনেকেই ক'রে থাকে, কিন্তু আপনার ন্যায় সরল প্রাণে স্বীকার, অতি কম্ লোকেই করে।

মূরুক বোঝে নাই যে, অনুতাপানলে মোহিনী-মোহনের জীবনের কলামাটি সব পুড়িতেছে। পূর্ব্বে যখন স্ত্রীর নিকট গোপন কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তখন তিনি অহঙ্কার করিয়া আপনার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, আর এখন শাস্তি পাইবার জন্য—ক্ষমার অধিকারী হইবার জন্য অকপটে অনুতপ্ত হৃদয়ে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, আর নীলমাধবের কাছে ভিক্ষা চাহিয়া বলিলেন—'বাবা নীলমাধব! তুমি আমার হেমাকে দেখ্‌তে এস, বোধ করি, তুমি কাছে বস্‌লেই সে প্রাণদান পাবে। তোমায় একটি অনুরোধ করি, তুমি তার প্রাণদান দাও, ডাক্তার আমায় ভয়ে বল্‌তে পারে নি, তার বড়ই ইচ্ছে, তুমি এস দাও, সে ঠিক ঠাউরেছে, তুমিই আমার হেমার পরম ঔষধ! বাবা কাঙ্গালকে এই দান দাও, চণ্ডালকে এই ভিক্ষা দাও।'

উদার হৃদয় হরিশের পুত্র কৃপণতা বলিয়া কোন কিছু ত জানে না। অনুতপ্ত মোহিনী-মোহনকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল—সে রাজী হইল। মোহিনীমোহনের এখন একমাত্র লক্ষ্য হইল কি করিয়া হরিশের ও তাঁহার পরিবারের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। তাই হৈমবতীকে দেখিয়া প্রাণের আবেগে বলিলেন,—'হেমনহাসি! আমি কি বল্‌বো, আমার কি বলবার আছে? মার্জ্জনা চাহিব, তার তুমি অপেক্ষা রাখনি, তোমার পবিত্র মন, ক্রোধ স্পর্শ কর্‌তে পারে না; পৃথিবীতে দেব-কন্যারা বাস করে, এ আমার স্বপ্নেও জ্ঞান ছিল না! যদিও আমার মত নীচ, পাপাত্মা জগতে নাই, তবু আমার ভরসা হচ্ছে, যখন তোমরা আমায় ক্ষমা, পরমেশ্বর আমায় মার্জ্জনা করবেন। দেব-কন্যার সমান রেখে আমায় মার্জ্জনা করবেন।

সুশীলা। মা, তুমি আমায় ক্ষমা করেছ জানি, তবু একবার পবিত্র মুখে বল, আমি তোমার ছেলে, আমি না বুঝে অপরাধ করেছি, আমি অবোধ অজ্ঞান অজ্ঞ! মা, কথা কইলে না? কথা কইলে না, ঘৃণা করোনা মা, তোমাতে তো ঘৃণা স্থান পায় না!

সুশীলা এবার কথা কহিল, 'বলিল, আপনি আমার বাপের সমান।'

মোহিনী তখন বলিলেন, 'না, তোমার বাপের আমি সর্ব্বনাশ করেছি, দেখি প্রাণ দিয়ে যদি প্রায়শ্চিত্ত হয়। দেখনহাসি, তোমার কি স্তব করবো, কি পূজা করবো, তোমার পূজা আমার সাজে না, তোমার গুণগান আমার গাজে না, চণ্ডালের মুখে বেদধ্বনি সাজে না। একটি মিনতি, যদি আমাকে ঘৃণা না কর, আমাকে পায়ে রাখ।'

হৈমবতী উত্তরে বলিলেন, 'কি বলছেন?'

মোহিনী। দেখনহাসি! আমায় বাধা দিও না; যদি আমায় চরণে রাখ, যদি আমায় ঘৃণা না কর, আমার স্নেহ তোমার উপযুক্ত নয়, তুমি পাষাণ দিয়ে তুমিই নাও।

স্নেহ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না—যে কথা স্বপনে-স্বপনে ভাবিয়াছে, যে ব্যাপারটা জীবনে ঘটবে না বলিয়া সে জানিত, সে কথাটা বাহির হইতে শুনিয়া—লাজসজ্জার মাথা খাইয়া সে প্রাণের আবেগে বলিয়া ফেলিল,—'কর্ত্তাবাবু, তুমি কেঁদনা, দেখনহাসী মাসী আমায় ভালবাসে, সুশীলা দিদি ভালবাসে, নীলবাবু ভালবাসে।' ডাক্তার বাবু দেখিলেন, হৈমবতীর উত্তরটার উপর তাঁহার রোগীর জীবন বাঁচন নির্ভর করিতেছে, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—'অনেক হয়েছে মশাই, আপনারা আমার পেসেণ্টের কাছ থেকে সরে আসুন, যা' করে এস; তবু দিদি থাক, আর নীলমাধব—যদি বিয়ে বিপরীত না হয়, থাকলেও থাকতে পারে।' বিবাহের একরূপ ঠিকঠাকই হইয়া গেল—চোখের ভাষায় স্থির হইয়া গেল। অনন্তর হরিণের নিকট যখন অঘোর, সুশীলা ও হৈমবতী উপস্থিত হইল, তখন হরিণ আত্মহত্যা করিতে উদ্যত। অঘোর তাঁহার হাত হইতে বন্দুকটা কাড়িয়া লওয়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুই?' উত্তরে অঘোর বলিয়া উঠিল, 'আমি জামাই ভূত'। বাস্তবিকই সকলেই অঘোর যে মরিয়াছে তাহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তারপর অঘোর ও সুশীলার কথা শুনিয়া হরিণের চৈতন্য হইল। তখন তিনি সর্ব্বসমক্ষে বলিয়া উঠিলেন,—'মা, আমি বুঝতে পারি নি, আমি এ সকল কথা জানতেম না, আমি পাগল অবস্থায় কি করেছি মনে করো না; সিত্রি আমি উন্মাদ হয়েছিলুম, তুমি বুঝেছ? নইলে তোমাকে সন্দেহ করি, নবকে সন্দেহ করি? নীলমাধবকে সন্দেহ করি, সুশীলাকে সন্দেহ করি? আমি দুর্ব্বল, বিপদে কাতর হয়েছিলুম, কিন্তু তোমরা লোকশিক্ষা দিলে, বিপদে লোককে কিরূপ ধৈর্য্য হ'তে হয়।' তারপর মোহিনী আসিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন; হরিণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার সর্ব্বনাশে তোমার কেন প্রবৃত্তি হ'ল, আমি কি তখনও কিছু অপরাধ করেছিলুম; উত্তরে মোহিনী প্রাণের কপাট খুলিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন, 'ধনমদ, মাতালের আবার প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি কি? অর্থের আশ্চর্য্য মহিমা! এই অর্থকে আমি সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেছি, কি মূঢ়তা; কেউ বা মনে করতে পারে আমি অর্থহীন? অর্থ হ'লে অকাতরে দান ক'রে দেশের দুঃখ নিবারণ করতে পারতুম; অনাথা বিধবার অশ্রুজল মোচন করতে পারতুম, ক্ষুধাতুরকে অন্ন দিতুম, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতুম, কিন্তু না—তার ভাগ্য যার অর্থ নাই, সে অর্থ কি বিষময় পদার্থ! সে জানে না, অর্থে কেবল অনর্থ হয়, দুর্ব্বলকে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাক, দুর্ব্বল পীড়ন প্রাণে শিক্ষা দেয়। অষ্টপ্রহর মনকে উপদেশ দেয়, সতীর সতীত্ব নাশ কর, পরের অপহরণ কর, এই অর্থের প্রভাবণায়

যে প্রতারিত না হয় সে সাধু; আমি মস্ত বোকা ছিলাম! সরলপ্রকৃতি হরিশ বাল্যবন্ধুকে প্রাণের সহিত ক্ষমা করিলেন; কিন্তু মোহিনী বলিলেন, ক্ষমা যে ক'রলে তার একটা প্রমাণ দিতে হবে—'আমি পুত্রহীন, যদি তুমি নীলমাধবকে আমায় দাও, তা হ'লে জান্‌বো যে আমরা" বাল্য বন্ধুই বটে; আমি বিনামূল্যে নেব না, আমার এই মেয়ে তোমায় দিলাম, এ অপেক্ষা অধিক ধন আর আমার নাই!'

হরিশ বন্ধুর দান অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিয়া—নীলমাধবের হাতে হেমাঙ্গিনীকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, 'এটী যত্নে রেখ বাবা'। মোহিনীবাবু তখন নীলমাধবকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ দলিল প্রদান করিয়া বলিলেন, 'তুমিই আমার অর্থের উপযুক্ত অধিকারী। আমার হাতে যেমন এই অর্থে অনর্থ সাধন করেছে, তোমার হাতে মরুভূমে বারিধারার ন্যায় তাপিতকে শীতল কর্‌বে।'

মিলনের মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। হরকপটু অদৃষ্টের জনান্তিক নীলমাধব বাবুকে বলিল,—বোঝ ভাই, যদি তরীপোত না পড়ত ঃ, এই যে লা ঘোল ফেল, এই পছন্দসই বরটী (ডাক্তার) রয়েছেন।'

উত্তরে ধরণীবাবু বলিলেন, 'দূর শালা চাঁটা।'

অঘোর তখন সকলের সামনে বড় গলায় বলিল, —'সকলে মনে করেছেন চাঁটাই বটে, কথনা খুসে যায় না মহা বাবা, কিন্তু চুরিটে চামারিটে করেনি। যদি না বিশ্বাস করেন (সুশীলার প্রতি) ঐ লাসিন হইলো।'

অঘোরের চরিত্র যাহার কৃপাকটাক্ষে নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে—যাহার কৃপায় সে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়াছে, সর্ব্বসমক্ষে তাহার গুণ-কীর্ত্তন না করিয়া সে থাকিতে পারিল না। প্রাণের আবেগে সে কথাটা বলিয়া ফেলিল ও কতকটা আশ্বস্ত হইল।

এই অংশের নায়ক নীলমাধব। হরিশের চরিত্র আর বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব না। পূর্ব্বেই তাহা করিয়াছি। তার মত অবস্থায় পড়িলে মানবের পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। পরোপকারী বন্ধুবৎসল হরিশ প্রথমে সমুদয় বিপদের হাত হইতে অবলীলাক্রমে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন —আশ্রয়হীন অনাথ বালকদিগের জন্য তাঁর প্রাণটা বড় ব্যথিত হইয়াছিল, ভগবান যে তাহাদের ভার তাঁরই উপর ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন; সে ভার তিনি কেমন করিয়া ছাড়িয়া দিবেন, ভাবিয়া তিনি আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের কষ্টকে গ্রাহ্যের মধ্যেই না আনিয়া,অটল পর্ব্বতের ন্যায় সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, তাহার পত্নী ও কন্যা শত্রুর বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছেন, তখন সমস্ত ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল—প্রতিহিংসা লইতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন;পরিশেষে ঐ বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে করিতে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। পরপর যে ভাবে তাঁহার ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; এবং একথা বলিয়া রাখাও ভাল যে, উহা মনস্তত্ত্বের অনুসারী হইয়াছে।

নীলমাধব উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান। তাহার ভগ্নী সুশীলা ও সে তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত— তাঁহারই উচ্চ আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া জীবন পথে তাহারা চলিতেছে। মেডিকেল কলেজের সে ছাত্র। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সে কিছুমাত্র কাতর হয় নাই। বিজ্ঞানের সেবক হইয়াও তার ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস ছিল—ভগবানে তাহার মতি স্থির ছিল। তাই তাহার মুখ হইতে শুনিতে পাই—'ভগবান! এই প্রার্থনা করি যেন অধর্ম্মে মতি না হয়।' তারপর যখন তাহাকে ভাবিতে দেখি কি করিয়া এতবড় সংসারটা চালাইবে, তখন যেন একটু অবসাদের কাল মেঘের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সেটা যে ক্ষণিক তাহা তাহার স্বর্গতোক্তি হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়—ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া সে হৃদয়ে বল পাইল, তাই তাহাকে বলিতে

শুনি,—'তার কি, পরমেশ্বর বল দেবেন,' পরিশ্রমীকে পরমেশ্বর সাহায্য করবেন।' এ সকল কথা রাবড়া পুলিশের ধাপের দৃশ্যে আমরা শুনিতে পাই। যখন 'প্রেম সাধে কলঙ্কিনী মোহিনী' কর্তৃক পরিত্যক্তা বারবিলাসিনী তাহার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া ভাগীরথী-সলিলে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়া ঝাঁপ দিতেছিল, তখন কাহার মৃদুল স্পর্শে তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল—কে আবার তাহার সম্মুখরূপে আসিয়া তাহার সকল দুঃখের অবসানের পথে এরূপ ভাবে আসিয়া দাঁড়াইল! সে দেখিল, একজন যুবক তাহাকে ধরিয়া রহিয়াছে;—তাহার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল, বলিয়া ফেলিল,—'আমায় ছেড়ে দাও, কলঙ্কিনীকে স্পর্শ করে কেন কলঙ্কিত হও?' উত্তরে মধুর বচনে যুবক বলিয়াছিল, 'ভগবান্ কি আত্মঘাতী হ'তে জীবন দান করেছেন? আত্মঘাতী হয়ো না, অপরাধী হবে।' উত্তরে কাদম্বিনী বলিয়াছিল—'আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও, এ জগতে আমার আর স্থান নাই।' যুবক নীলমাধব তখন বলিল, 'জীবন-বিসর্জ্জন! এই কি প্রায়শ্চিত্ত? যদি দুর্ম্মতিবশতঃ কিছু অন্যায় ক'রে থাক, ভগবানের কাছে মার্জ্জনা চাও তিনি দয়াময়, তোমায় মার্জ্জনা করবেন; পরোপকার-ব্রত কর, সেই মহৎ প্রায়শ্চিত্ত! ভগবানের আরাধনা কর, দীন দরিদ্রের সেবা কর, মানুষ মাত্রেই দুর্ব্বল, দুর্ব্বলতা কার না আছে?' এমন আশার কথা কোন দিন কাহারও নিকট সে শুনে নাই। সে তখন বলিতে লাগিল, তার ন্যায় কলঙ্কিনী বারবিলাসিনী কি ভগবানের দয়া পাইবার যথার্থ পাত্র! ইহার উত্তর-প্রত্যুত্তরে যে সকল কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

নীল। তুমি জান না, ভগবান্ কলঙ্ক-ভঞ্জন। তিনি তাপিতের আশ্রয়; তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও, দুর্ম্মতি দূর কর, এই মহারণ্যে তোমার স্থান নেই? এ কথা মুখে আন? কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী সকলের স্থান আছে, আর তোমার স্থান নাই?

কা। তুমি বালক, তুমি জান না, তোমার পবিত্র মন, তাই তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, পরমেশ্বর আমার মতন পাপিনীকে স্থান দেন না।

নীল। অবশ্য স্থান দেন; এই দেখ, তাঁর দাসকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন, তিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, আমি তাঁর আদেশে তোমায় আশ্রয় দিতে এসেছি।

আশ্রয়হীন যুবকের কতখানি মনের জোর থাকিলে এরূপ বলিতে পারে? কাদম্বিনীও জীবনে এমন আশার কথা আর কখন শোনে নাই—জীবন-যৌবনের বিনিময়ে—কলঙ্কের পসরা মাথায় লইয়া যাহার পথে সে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিল, তাহার ব্যবহার আর এই বালকের ব্যবহারে স্বর্গ মর্ত্তের প্রভেদ দেখিল। সে তখন বলিতে চাহিল, দৈবপ্রেরিত এ বালক কে? সে জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কে! তুমি কি কোন দেবতা? আমার যে আবার জীবনে সাধ হচ্ছে!'

নীল। আমি দেবতা নই, তোমার মত দুর্ব্বল; কিন্তু তোমার আমার এই প্রভেদ—তুমি পরমেশ্বরকে প্রত্যয় কর না, আমি তাঁর চরণে দৃঢ় প্রত্যয় রাখি।

(ক্রমশঃ)

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and Published by P. N. Pal. 26-3 Scott Lane, Calcutta.

CALCUTTA N.
Acc. No.
Book No
LIBRARY

২য় বর্ষ | ফাল্গুন ১৩২৯ | ১১শ সংখ্যা

বঙ্গ-সাহিত্যে বিবেকানন্দ

(শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল)

আমার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে বলিবার পূর্ব্বে যে ধনকুবের হস্তপদস্পন্দন মনোরঞ্জন পরিষ্কার করিয়া এই সভা স্থাপন করিয়া ভারতবাসী শতসহস্র লোকের অন্নসংস্থানের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার বংশধরগণকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। এই কার্য্যেও দরিদ্রনারায়ণের সেবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তার পর আজ যে সমিতির সাদর আহ্বানে আমরা এখানে মিলিত হইয়াছি, সেই 'বিবেকানন্দ সোসাইটী' যে পুণ্যশ্লোক যুগাবতারের চিরস্মরণীয় নাম ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন সেই সমিতি যাহাতে সেই মহাপুরুষের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া তাঁহার নামের অমানুষিক শক্তিপ্রভাবে জগতে ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিতে পারেন, মানুষকে মানুষ-রূপে—ভগবানের অংশরূপে—দরিদ্রনারায়ণরূপে দেখিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখের অংশভাগী হইতে পারেন, তাহাই ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

আপনাদের এই সহরটাকে বৃহৎ ধার্ম্মিক সহর বলিয়া যদি আমি অভিহিত করি, তাহা হইলে

বোধ হয় আমি সত্যের পথ হইতে বড় দূরে আসিয়া পড়িব না। এত বড় পারিপার্শ্বিক সহরের আমার নিজ জ্ঞান কিছুই নাই; তবে পাশ্চাত্য লোকদের এইরকম সহরের জীবনটা যেরূপ ভাবে চলিয়াছে, তাহার বিবরণ আপনারা সকলেই ইংরাজী বই পড়িয়া জানিয়াছেন, আর এই স্থানের জীবনের ধারা কোন্ পথে চলিতেছে, তাহাও আপনারা সকলেই জানেন। আমি সে সকল বই পড়িয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি—তাহা হইতে বুঝিয়াছি, সে সব দেশের শ্রমজীবী লোকেরা দাসত্বভাবে সতত বদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহাদের জীবনটা যন্ত্রের পেষণে একদম চাপা পড়িয়া যায়। অনুভূতিসকল স্ফূর্ত্তি পাইবার অবকাশ না পাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। সেইজন্য আপনাদিগের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ, আপনাদের জেমসেদপুরের শ্রমজীবীরা যাহাতে তাহাদের জীবন তাজা রাখিতে পারে, তাহার চেষ্টা আপনাদিগকে করিতে হইবে, কারণ তাহারা ত আপনাদেরই ছোট ভাই। যতদিন না তাহাদের ভিতর আত্মানুভূতি জাগিবে—যতদিন না তাহারা মনুষ্যত্বের প্রকৃত রস গ্রহণ করিতে পারিবে—যতদিন না তাহারা উদ্বুদ্ধ হইবে, ততদিন আপনাদিগকে তাহাদিগের পথ দেখাইয়া দিতেই হইবে। আর সেই মহাপুরুষের কথায় বলি, যতদিন না নিম্নশ্রেণীর লোকেদের ভিতর হইতে মনুষ্যত্ব জাগিয়া উঠিবে, ততদিন অন্যায় অত্যাচারের হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে না। মনুষ্যত্ব জাগাইতে হইলে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। নৈশবিদ্যালয় বা ঐরকমের বিদ্যালয় করিয়াই শিক্ষা দিতে হইবে তাহা আমি বলিতেছি না, আমি বলি—লোকসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া—যাত্রা, গান, কথকতা, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। আর যে মহাপুরুষ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, কার্য্যে দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহার ভিতর নূতন প্রেরণা ও শক্তিসঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার স্থান বঙ্গসাহিত্যে কোথায়—সেই কথা একটু আলোচনা করিব।

অবশ্য একথা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা ভাল, আমাদের গদ্যের ভাষা কিরূপ হইবে বা কিরূপ হওয়া উচিত বা কিরূপ হওয়া সঙ্গত তাহা লইয়া এখনও অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে। সুধীমণ্ডলী হইয়া যে সর্ব্বজনগ্রাহ্য একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা বলা যায় না।

উপস্থিত সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসপিপাসু ব্যক্তিরা আমার বক্তব্য বিষয়টা শুনিয়া মনে করিতে পারেন, যেভাষাকে তিনি ত মুষ্টিভিক্ষা দিয়াছেন, তার জন্য তাঁহার বঙ্গসাহিত্যে আবার একটা স্থান আছে কি? তিনি সমাজকে নূতন করিয়া গঠন করিয়াছেন—জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন—জাতীয় আত্মবোধের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন—সরলভাবে প্রাণের কথায় কলিপাবন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ভাবের ব্যাখ্যা করিয়া সহজ সরল ধর্ম্মের স্রোত বাঙ্গলাদেশে আবার প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, আর সর্ব্বোপরি কর্ম্মের স্রোত বহাইয়া নিশ্চেষ্ট, জড় বা মৃতকল্প জাতিটার ভিতর প্রাণের স্পন্দন বহাইয়া দিয়াছেন সত্য, বঙ্গভাষার তিনি কি করিয়াছেন? সেই কথাটাই আজ আমি একটু আলোচনা করিব। বাস্তবিকই ভাষার তিনি যাহা দিয়াছেন তাহা মুষ্টিভিক্ষা, কিন্তু এই মুষ্টি বহুমূল্য রত্নমুষ্টি। ইহাই আমার আজিকার বক্তব্য বিষয়।

মহাপুরুষ স্বামীজী স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার উপদেশ দিয়া আমাদের যেরূপ জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন, তাহার স্বাধীনতার দিকে অবহিত হইতে বলিয়া আমাদের অশেষ কল্যাণও করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষা সংস্কৃতানুসারিণী

ছিল। বিভক্তি, প্রত্যয় প্রভৃতি বাদ দিয়া তদ্ভব শব্দগুলিই বাঙ্গালাভাষায় ব্যবহৃত হইত। প্রকৃত বাঙ্গালা শব্দগুলি অন্যান্য জাতির লোকেদের মত উৎকলপ্রচলিত শুদ্ধ ভাষায় প্রবেশ লাভ করিতে পাইত না—তাহারা যেন অপাংক্তেয় ছিল—প্রচলিত কোন কোন অভিধানে সেগুলির উল্লেখ থাকিলেও বর্জ্জনীয়। ভিতর দেশজ, গ্রাম্য, চলিত প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ইহাই সূচিত করিয়া দিত যে, তাহারা পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃতানুসারী শব্দের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত নয়। আমাদের পণ্ডিত লেখকমহাশয়েরা ঐ সকল শব্দকে সর্ব্বদা পরিহার করিতেন। তার পর যে মহাপুরুষ এই শব্দগুলির প্রতি প্রথম কৃপা-কটাক্ষে চাহিয়া ভাষা-জননীর দ্বারে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতুম পেঁচার নক্সা' লইয়া আসিলেন, তিনি স্বর্গগত টেকচাঁদ ঠাকুর—প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়। পণ্ডিত-দিগের কৃপা লাভ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। তখন তাঁহারাই মাতৃমন্দিরের একমাত্র পুরোহিত ছিলেন। সে পুজোপচার মন্দিরের মধ্যে পৌঁছিতে পারিল না—মার আমার পূজার ভোগে আসিল না—মার ব্যথিত ক্রন্দন পূজারীরা দেখিতে পাইল না। সে ভাষা চলিল না। গতানুগতিক পণ্ডিতী ভাষা চলিতে লাগিল। তারপর বঙ্কিম-যুগে আলালী ভাষার সম্মেলনে ভাষা আবার নূতন শ্রী ধারণ করিল, ভাষায় নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল। এই সময়ে বাঙ্গালা গদ্য কিরূপ হইবে তাহা লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল; তখন স্বামীজী ভগীরথের ন্যায় ভাষা ভাগীরথীকে নূতন খাতে লইয়া চলিতে চাহিলেন। সাধন-বলে যে পথের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন, তূর্য্য-নিনাদে বাঙ্গালীকে সেই পথ দেখাইয়া চলিলেন। সে আজ বাইশ বছরের কথা, সে উদাত্ত বাণী আজ আপনাদিগকে শোনাইয়া দিব।

"আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতের সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যাঁরা "লোকহিতায়" এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তা ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর বিদ্যাবত্তা হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য, গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূত-কিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন, বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে, ও সকলে তত্ত্ব-বিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষায় যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারী ভাষা কোনও কালে হবে না! ভাষাকে ক'য়তে হবে যেন সাফ্ ইস্পাত, মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে—সেই, একচোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতের গদাইলস্করি চাল—ঐ এক চাল—নকল করে অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছে। ভাষা হ'চ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।" ("ভাব্‌বার কথা"—'বাঙ্গালা সাহিত্য')

দেখুন বলিবার কি কায়দা! উভয় পক্ষকে বিচারে আহ্বান করিবার পদ্ধতিটা একবার আলোচনা করিয়া দেখুন। ভাষা ভাব-প্রকাশের

ধর্ম্ম মাত্র। ভাবই প্র· অবশ্য ভাব ও ভাষার সম্বন্ধ কি, তাহা বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে চাই না। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে—ভাষা না থাকিলে ভাবের আদান-প্রদান চলিতে পারে না, ভাষা না থাকিলে উন্নত চিন্তা করাই যায় না। আবার ভাব না থাকিলে শুধু ফাঁকা কথায় কাজ হইতে পারে না। যাক্ সে কথায়। ভাষার প্রয়োজনীয়তা হইতেছে লোক শিক্ষার জন্য, লোকের মঙ্গল কামনার জন্য,—লোক-হিতায়। সাধারণ লোকে যে কথাটা যে ভাবে বুঝিতে পারে, সেই ভাবেই তাহা বলা উচিত। লোকবিশ্রুত পূর্ব্বপূর্ব্ব মহামনীষীরা এই পন্থাই অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া তিনি বক্তব্য বিষয়ের পোষণ করিলেন। তার পর স্বামীজী দিলেন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ—সেই ভাষাই স্বাভাবিক ভাষা, যাহে করে আমরা প্রাণের কথা—আমাদের সুখদুঃখ প্রভৃতি অনুভূতির কথা জানাইয়া থাকি। কথ্য ভাষা ও লেখ্য ভাষার পার্থক্য তিনি দূর করিয়া দিতে চান। প্রাণের শব্দের যে শক্তি আছে তাহা তিনি বুঝাইয়া দিতে চাহিলেন। শব্দ ব্রহ্ম, এটা কি কেবল ফাঁকা কথা—কেবল কথার কথা? আবার সে শব্দ কি কেবল সংস্কৃত শব্দ? তা কখনও হইতে পারে না। অন্ততঃ হাজার বৎসর ধরিয়া যে বাঙ্গালা শব্দ চলিয়া আসিতেছে, কোথাও অবিকৃত ভাবে, কোথাও বা উচ্চারণ বিকৃতিতে একটু রূপান্তরিত হইয়া—তার কোন শক্তি নাই? শুধু শব্দ নয়, শব্দ-সমষ্টিতে যে ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে, তার কি অন্তর্নিহিত শক্তি নাই? অবশ্যই আছে। সেই শক্তির স্বরূপ স্বামীজী সাধনা-বলে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন—আর তাই তিনি এরূপ জোরের সহিত এই বাণী প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন। আর উচ্চভাবও যে এ ভাষায় দেওয়া যায়, তাহা তিনি ও অন্যান্য তাঁহার সহযোগীরা তাঁহাদের রচনা-দ্বারা, দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহা হইতে তিনি আরও প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁর কথাটা ব্যবহারিক—পরীক্ষিত সত্য। দার্শনিক চিন্তা যে এ ভাষায় বেশ চলে, তা তাঁর ও তাঁর গুরুভাইদের বইগুলি পড়িয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

তার পর মনে স্বতঃই এ প্রশ্ন উঠিতে পারে, বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্ দেশের চলিত ভাষাটা গ্রহণ করা উচিত? ইহার উত্তর স্বামিজীর কথায় বলি—"প্রাকৃতিক নিয়মে যেটা বলবান হচ্ছে ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটাই নিতে হবে, অর্থাৎ কলকাতার ভাষা। পূর্ব্বপশ্চিম, যেদিক হ'তেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখ্‌ছি সেই ভাষায় লোকে কথা কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা নিতে হবে। যত রেল এবং গতায়াতের সুবিধা হবে, তত পূর্ব্বপশ্চিম ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হ'তে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত ঐ এক কলকেতার ভাষাই চল্‌বে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতের বেশী নিকট, সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা দিন্‌দিন্ হচ্ছে সেইটী দেখ। যখন দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষা অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়ার ভাষা এক ক'র্‌তে হয়, বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ ক'র্‌বেন। এখন গ্রাম্য ইতরামিকেও মনে স্থান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটী ভুলে যেতে হবে।" স্বাভাবিক কথাটার উপর টীকা-টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। স্বামিজীর ভাব-যোগী যে অক্ষরে অক্ষরে সফল হইতে চলিয়াছে তাহা আর কাহাকেও বিশেষ ভাবে বলিতে হইবে না। যখন যে সহর শিক্ষার কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে, বাণিজ্যের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে বা রাজধানী হইয়াছে

সেইখানকার ভাষাই বাঙ্গালার সর্ব্বত্র অনুসৃত হইয়াছে। এ কথাটা পুরান লেখার সহিত যাঁহারাই পরিচিত আছেন, তাঁহারাই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

এখানে একটা কথা আমি বলিতে চাই; এই ভাষা-গঠন ব্যাপারে প্রাণ ও কাণের সামঞ্জস্য রাখা চাই। প্রাণটা থাকা চাই তাজা—ভাবটা যাহা হইতে জীবন্ত বাহির হইবে, আর কাণটা থাকা চাই এমন যাহাতে চট্ করিয়া ধরিয়া ফেলিতে পারিবে কোথায় সুরটা ছিঁড়িয়া গেল। শুক-চণ্ডালী দোষটা আমরা সেকালের একালের মাঝামাঝি যাহারা তাহারা বড় পছন্দ করি না। তাই বলি, ভাষা ভাগীরথীর স্রোতের ন্যায় তর তর বেগে বহিয়া যাইতেছে; যে শব্দ আসিয়া ইহাতে পড়িতেছে সে শব্দ দুরাগত জলকণার ন্যায় ইহাতে আসিয়া পড়িয়াছে, আধারে অপনত্ব হারাইয়া ফেলিতেছে; সে শব্দকে ভাষা হইতে দূর করিবার দাবী কাহারও নাই; কিন্তু সে শব্দকে এমন ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে কাণে না বাধে—ভাবের রেশটা যেন বজায় থাকে। কথাটা আর একটু খুলিয়া বলি; যদি নিছক সংস্কৃত কথাই ব্যবহার করিতে হয়, তবে তাহার সঙ্গে চলিত কথা মিশাইয়া নূতন খিচুড়ী তৈয়ার করা যেন না হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বলি Queer amalgam করিবেন না। তবে ইহাও বলিয়া রাখি, মনীষা-বলে যিনি ঘসিয়া মাজিয়া রুচিকে টু না করিয়া উভয় প্রকার ভাষাকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া চালাইতে পারিবেন; তিনি যে শক্তিধর পুরুষ হইবেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

স্বামীজী যখন এই মতটা চালাইবার চেষ্টা করেন তখন অনেক সাহিত্যিক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ভাগীরথীর স্রোতধারা কালে যেমন পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন পথে চলিয়াছে, ভাষা-ভাগীরথীও তেমনি পুরাতন খাতে না চলিয়া নূতন পথে চলিতেছেন। দূরদর্শী পাঠকবর্গকে বলিয়া দিতে হইবে না ভাষার গতি এখন কোন্ দিকে। স্বামীজী স্পষ্টই দেখাইয়া গিয়াছেন, ভাবহীন প্রাণহীন ভাষা, শিল্প, সঙ্গীত-কোন ও কালেরই হয় না।

সত্য বটে স্বামীজী বঙ্গ-ভাষায় অধিক কিছু লিখিয়া যান নাই, তথাপি তাঁহার 'বর্ত্তমান ভারত' ও 'ভাব্‌বার কথা' চিন্তাশীল পাঠককে নূতন চিন্তা-ধারার সহিত পরিচিত করিয়া দিবে—প্রাণে বিমল আনন্দ দান করিবে। শিক্ষিত বাঙ্গালী নূতন কথা শিখিতে পারিবে—চিন্তা করিবার খাদ্য পাইবে। আর সত্য বলিতে কি, হৃদয়ে একটা প্রেরণা পাইবে; জাতীয়-জীবন গঠন করিতে কোন্ কোন্ দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত, তাহার দিক্‌দর্শন পাইবে। রস সৃষ্টি, শিক্ষা ও আনন্দদানই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য; সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রহ্মচারী সংসারত্যাগী যাতি তমঃপ্রধান জাতিটাকে নিম্নতম স্তর হইতে তুলিয়া রজোগুণের অধিকারী করিবার জন্য যে বীরত্বের আবশ্যক, তাহা তিনি যথেষ্ট সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন; স্বাধীনতার প্রকৃত মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য" এই কথাটা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। রস বা স্থায়ী অনুভূতির সৃষ্টি একেবারেই করেন নাই একথাটা ঠিক্ নয়। তিনি অন্ততঃ নবরসের মধ্যে একটা রস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন; সে রসটা কালক্রমে এমন তরল ও পানসে হইয়া গিয়াছিল যে, পান করিয়া আনন্দ পাওয়া যাইত না। রস-সৃষ্টির দিকটা ছাড়িয়া দিলেও বাঙ্গালী জাতিকে যে শিক্ষা ও আনন্দ দান করিয়া ভাব-প্রকাশের প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তিনি যে বাঙ্গালা ভাষা-ভাষীর মঙ্গলসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার কৃতজ্ঞ জাতি কোন কালেই বিস্মৃত হইবে না; আর বঙ্গ সাহিত্য এই অযাচিত দানের জন্য তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবে।" *

* মেদিনীপুর বিবেকানন্দ সোসাইটীর বিশেষ অধিবেশনে ২৭শে ডিসেম্বর ১৯২২ সালে পঠিত।

না

(শ্রীলীলা দেবী)

গাঁথ্‌বো না আর আশার মালা
বাঁধ্‌বো না আর প্রেমের গান,
ভ'র্‌বো না আর মূলের ডালা
রাখ্‌বো না মান-অভিমান ;
বাঁধ্‌বো না সুর বীণার তারে
তুল্‌বো না ফুল কানন-ছায়,
ভুল্‌বো না পথ নদীর ধারে
ঝুল্‌বো না আর ফুল দোলায় ;
ছুট্‌বো না আর বাঁশীর ডাকে
তমাল-কদম্ব-কুঞ্জবন,
ছুট্‌বো না নীল যমুনা-বাঁকে
কলসী কাঁকে ভ'র্‌তে মন ;

চাইবো না আর কারও মুখে
চাওয়ার মত চাউনি আর,
জাগ্‌বো না আর আগার সুখে
টল্‌বো না দুখ দেখ্‌লে তার ;
চ'ল্‌ব না আর কাঁকণ হেনে
দুলিয়ে মালা বাজিয়ে মল,
বুঝ্‌বে না যা কাজ কি জেনে,
গ'ল্‌বোনা চোখ ফেলে জল ;
গাইবো না গান উছাস তুলে
ভাঙ্‌বো না ধ্যান তোমার আর,
কাঁদ্‌বো না যাও বলিই ভুলে
মরণ-অসাড় প্রাণের তার !

পাশবই

(গল্প)

(শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বরাট-সেন)

এক

লোকনাথ মুখুজ্যের নাম জানিত না এমন লোক সে একলে খুব কমই ছিল। এমন চক্রী আর মামলা-বাজ লোক গ্রামে দ্বিতীয় ছিল না —

লোকনাথ জমিদারী ষ্টেটের পাঁচ টাকার মুহুরী হইলেও জমিদার এই বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকটাকে খুবই সেক্‌নজরে দেখিতেন। তিনি তাঁহার সহায়তায় নিজের জমিদারীও অনেকটা বাড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহাতে নানালোকে নানা কথা বলিত, কিন্তু স্বার্থান্বেষী লোকনাথ তাহাদের সে সকল অনাবশ্যক কথায় কান দিতেন না।

প্রভুসহিত লোকনাথের যতই ঘনিষ্ঠতা হইতে লাগিল, লোকনাথের প্রতাপ ততই প্রবল হইতেছিল। সংসারে আপনার বলিতে কেহ না থাকিলেও লোকনাথের জমি-জায়গা, বিষয় সম্পত্তির লোভ ক্রমে এতই বাড়িয়া যাইতেছিল যে, সময়ে সময়ে ইহার তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইত।

জমিদারের এই প্রকার অন্যায় পক্ষপাতিতায় গাঁয়ের সকলেই জমিদারের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহারা বেশ জানিত, ইহাতে প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের কিছুই হইবে না তাই তাহাদের পুঞ্জীভূত ক্রোধ ও ঘৃণা লোকনাথের উপর গিয়া পড়িল।

তারপর একদিন হঠাৎ গভীর রাত্রে লাঠি, সোঁটা ও সড়কির শব্দে ঘুমন্ত গ্রামবাসিদিগকে সন্ত্রাস ও ত্রস্ত করিয়া, মশালের আলোয় গ্রামখানাকে আলোময় করিয়া লোকনাথ মুখুজ্যের ঘরে ডাকাত পড়িল। চেঁচায়া লোকনাথ লাঠি সোঁটার বহর দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে আসিয়া কাঁহা-কোঁচা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখাইয়া ঘুন্সি হইতে চাবির রিঙ্‌টা বনাৎ করিয়া ডাকাতের সর্দ্দারের পায়ের তলায় ফেলিয়া দিলেন।

লোকনাথের ঘরে একটা কাঠের সিন্দুক ভিন্ন আর কিছু বাক্স পেঁটরা দেখা গেল না। সিন্দুকটা খুলিয়া দেখা গেল, তাহার ভিতর খানকতক খাসা বাসন, কয়েকখানি ধান ধুতি আর একখানি পোষ্ট-অফিসের পাশবই; এ ছাড়া আর কিছু বিশেষ উল্লেখযোগ্য জিনিষ তাঁহার ঘরে ছিল না। তবুও ঘরে জিনিষ পত্র যাহা ছিল, তাহা অথো নাড়িয়া চাড়িয়া ঘরের মেজেটা একবার পরীক্ষা করিয়া তেমন কিছু সিঁদ না পাইয়া ডাকাতের সর্দ্দার চাবির রিংটা লোকনাথকে ফিরাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

লোকনাথ 'পাশবই' খানাকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া, ডাকাতের পশ্চাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া হর্ষোৎফুল্ল মুখে অস্পষ্টস্বরে বলিল, "এ বাবা বড় শক্ত ঘুঘি। গভর্ণমেণ্টের তৈরী 'পাশবই'—এ চুরি যাবার ভয় নেই—হাঃ—হাঃ।"

দুই

প্রভাতে ক্যাণ্ডমণি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কাল রাত্রে তোমার বাড়ী ডাকাত পড়েছিল বুঝি দাদামশাই?"

"ঐ ডাকাত পড়াইসোর হয়েছিল বে ক্যাণ্ডমণি, তারা বর্ত্তে কিছু পারেনি—"

—"একটা টাকাও নিয়ে যেতে পারেনি?"

—"এক আধলাও না রে—"

—"তুমি বুঝি নগদ সব লুকিয়ে ফেলেছিলে?"

"নগদ থাকলে ত লুকুবো।"

"তোমার নগদ নেই দাদামশাই!" বিস্ময়ে ক্যাণ্ডমণির চোখ দুটী বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

"থাকবেনা কেন? সব পোষ্ট অফিসের 'পাশবই'।"

"তাই বল। তা আমায় কত হবে?"

"ওঃ। সে ঢের। তোর মত সাতশ নাহুনি সাতহস্ত খেয়ে মেখে ফুরুতে পার্ব্বেনা" বলিয়া লোকনাথ হাসিয়া ফেলিলেন। লোকনাথের সে হাসিতে ক্যাণ্ডমণি অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিল।

ক্যাণ্ডমণি দুধের ঘটিটা সেইখানে রাখিয়া চলিয়া গেল। লোকনাথ কেশবিহীন মস্তকে এক পলা তেল মাখিয়া স্নানে বাহির হইলেন।

এই ক্যাণ্ডমণির সঙ্গে লোকনাথের পূর্ব্বে একটা সম্বন্ধ ছিল। সে অনেকদিনের কথা; তখন লোকনাথের যৌবন উত্তীর্ণ, আর ক্যাণ্ডমণি অবিবাহিতা কিশোরী। লোকনাথের সংসারে আপনার বলিতে কেহই ছিল না। ক্যাণ্ডমণিরও এক বিধবা মা ব্যতীত এ সংসারে আর দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না। সেই সময় ক্যাণ্ডমণির সঙ্গে লোকনাথের বড় ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। ইহাতে পাঁচজনের পাঁচ রকম কথায় লোকনাথ তাহার অভিপ্রায় ক্যাণ্ডমণির মায়ের নিকট ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু বুড়ী তাহাতে রাজী হয় নাই, উপরন্তু সেই বৎসরই পাশের গ্রামে হরি গোঁসাইয়ের সঙ্গে লোকনাথের চোখের উপর ক্যাণ্ডমণির বিবাহ দিল। কিন্তু ভগবানের অলঙ্ঘ্য বিধানে বছর ঘুরিতে না ঘুরিতেই ক্যাণ্ডমণি শাঁখা-নোয়া ঘুচাইয়া, সিঁদুর মুছিয়া ভস্মের মত মায়ের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

ক্যাণ্ডমণির বৈধব্যকাতর মুখখানি দেখিয়া লোকনাথ ইহজন্মে আর বিবাহ করিবে না স্থির করিলেন। তার পর দুই বছরের মধ্যে ক্যাণ্ডমণির জননীরও পরপারের ডাক আসিল—ক্যাণ্ডমণির

কোন একটা বিধিব্যবস্থা না করিয়া তাহাকে অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া সে বুড়ীও চলিয়া গেল।

দুই তিনটী গাই বাছুর ঘরে ছিল। তাহাদেই মুখ দেখিয়া অ্যাস্তমণি কোন রকমে দিন কাটাইতে লাগিল।

তিন

"দীনের দিন গেল হে হরি,
আমি ভজন সাধন কখন করি

প্রাতঃকাল। বৈরাগী ঠাকুর গায়ে নামাবলি দিয়া করতাল বাজাইয়া গান গাহিয়া পথ দিয়া যাইতেছিলেন।

তখন লোকনাথ স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। পথে বৈরাগী ঠাকুরকে দেখিয়া ডাকিলেন; তিনি আসিলে তাঁর হাতে একটী টাকা, প্রায় আড়াই সের চাউল ও তদুপযুক্ত তরিতরকারী দিয়া সিধা সাজাইয়া দিলেন।

বৈরাগীঠাকুর সে গ্রামে অনেকদিনই ভিক্ষা করিতেছেন; কিন্তু কখনও একটী আধ্‌লা লোকনাথ মুখুজ্যের হাত দিয়া গলিতে দেখেন নাই। তাই এই অভাবিত ভিক্ষা পাইয়া একবার লোকনাথের মুখের দিকে সৌম্যমুখে চাহিয়া রাস্তায় যাইয়া করতাল বাজাইয়া তিনি আবার গান ধরিলেন—

—"আমি ভাবি হ'ব সন্ন্যাসী—
হয়ে গৃহবাসী, প'রে মায়ার ফাঁসী,
সংসারের প'রে হয়ে রইবো মোর চাষী।"

ঘরে তালা লাগাইয়া মুখুজ্যেমশাই স্নানে যাইবার জন্য হাতে গঙ্গাজলের ঘটীটা লইয়াছেন, এমন সময় অ্যাস্তমণি ডাকিল "দাদামশায়, দুধটা নিন্।"

মুখুজ্যে মশাই আবার ঘর খুলিয়া দুধের ঘটীটা বাহির করিয়া দিলেন। ঘটীটা দাওয়ায় বসাইয়া অ্যাস্তমণির মুখের দিকে চাহিয়াই লোকনাথ যেন একটু বিমর্ষ হইয়া উঠিলেন। অ্যাস্তমণির মুখখানা বিষণ্ণ দেখিয়া লোকনাথের বুকে বড় আঘাত লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কিরে অ্যাস্তমণি, তোর বুঝি অসুখ করেছে?"

"না, দাদামশায়, তোর বেলা কালো গরুটা মরে গেছে—"

"তাই জন্যে বুঝি কেঁদেছিস্ পাগ্‌লি!—তার জন্যে আর হয়েছে কি,—আমি তোকে কালো গরুর চেয়ে খুব ভাল একটা সাদা গরু কিনে দেব।"

অ্যাস্তমণি দাদামশায়ের মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না। কালো গরুটী মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্নও যে মারা যাইবার যোগাড় হইয়াছে সে তখন তাহাই ভাবিতেছিল।

একবার দুর্গানাম স্মরণ করিয়া মুখুজ্যে মশাই গঙ্গাস্নানে বাহির হইয়া পড়িলেন। রাস্তায় যাইতে যাইতে বৈরাগী ঠাকুরের সেই গানটাই পুনঃপুনঃ তাঁহার কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল,—

"দীনের দিন গেল হে হরি
আমি ভজন সাধন কখন করি—"

তাঁহার মনে হইল,—সত্যই ত দীনের দিন, চলিয়া যাইতেছে! ভজন সাধন ত কিছুই করা হইল না! ইহকালে 'তরিয়া' যাইবার মত 'পাশপোর্ট' ত গভর্মেণ্টের কাছে আছে, কিন্তু পরকালেরও যে একখানা 'পাশপোর্ট' দরকার। নইলে সে সময় কি করিয়া পরপারে যাইব। মনে মনে এই সব ভাবিতে ভাবিতে স্নান সারিয়া মুখুজ্যে মশাই, ভাল করিয়া নাকে কানে রসকলি পরিয়া, বুকে হরিপাদপদ্মের ছাপ লাগাইয়া, গায়ে নামাবলিখানা জড়াইয়া গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে যে হিতাকাঙ্ক্ষীকেই দেখিলেন, তাহাকে কিছু না কিছু দান করিয়া তবে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন।

গ্রামের পাঁচজন মাতব্বর হঠাৎ মুখুজ্যে মশায়ের এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া পরস্পরের গায়ে ঠেলা দিয়া বলিলেন—"কালে কালে কতই দেখ্‌ব—"

চার

"আচ্ছা নিধির মা, তোর আক্কেলটা বাপু কেমন বলত? এই এত বড় ছেলেটাকে ঘরে বসিয়ে রাখ্‌লি এখনও স্কুলে দিলি না; ভবিষ্যতে ওর হবে কি, সে ভাবনাও কি তুই ভাব্‌বি না?"

নিধির মা পূর্ব্বে মুখুজ্যে পরিবারে দাসীর কাজ করিত। মুখুজ্যে মশায়ের কথা শুনিয়া সে বলিল —"কি করি দাদাঠাকুর! দেখ্‌তেই ত পাচ্ছ, খেতে পরতেই কুলোয় না, তার ওপর ইস্কুলের মাইনে দিয়ে কি করে পারি—"

—"সেই জন্যে ছেলেটা মুখ্যু হয়ে চিরকাল কষ্ট পাবে! না, কালই আমি নিধেকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়ে আস্‌ছি; দেখি কে কি কর্ত্তে পারে।" বলিয়া নিধের দিকে চাহিয়া বলিলেন "অ রে নিধে? ব্যাটা গাড়োলের মত বসে কি কচ্ছিস্, কাল সকালে আমার কাছে যাবি, ইস্কুলের মাইনে আর তোর জল খাবারের যা লাগে চেয়ে আন্‌বি। ঠিক যাবি যেন ভুলিস্‌নি।"

নিধে ত অবাক! নিধের মার মুখ দিয়াও কথা সরিল না। মুখুজ্যে মশাই হন্ হন্ করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তারপর একেবারে ক্ষ্যান্তমণির বাড়ী আসিয়া হাঁক দিয়া ডাকিলেন "অ-রে ও ক্ষ্যান্তমণি, ওকি তুই শুয়ে রয়েছিস্ যে—খাওয়া হয়নি বুঝি?—আর পোড়া কপাল—খাবিই বা কি? গরুটাও গেছে মরে না?"

মুখুজ্যে মশাইকে দেখিয়া, ক্ষ্যান্তমণি উঠিয়া বসিয়া একখানা আসন পাতিয়া দিয়া বলিল— "ব'সো দাদামশায়!"

"না আর বস্‌বো না, বেলা হ'ল। আয় দেখি—তোর খাওয়া হয় নি, কিছু চেষ্টা দেখি—"

"তোমার কি ভীমরতি হয়েছে দাদামশায়; আজ যে একাদশী!" ক্ষ্যান্তমণি শুষ্ক মুখে হাসিবার চেষ্টা করিল।

"ওঃ! তাও ত বটে!" বলিয়া মুখুজ্যে মশাই জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আহা বাপু, আমারই না হয় ভুল হয়েছে, কিন্তু তোর আক্কেলটা কি বল দিকিন্? তোরা ছাড়া আর আমার আছেই বা কে? এই বুড়োটার জন্যে একটু সেবা ধর্ম্ম ক'রে তোদেরও একটু পরকালের কাজ কর্ত্তে ইচ্ছে হয় না?"

"কি এমন সেবাধর্ম্ম দাদামশায়?"

"সেবা ধর্ম্ম আমার মাথা আর মুণ্ড! মনে কর্‌ছি, কাল থেকে কাঙ্গালী ভোজন করাবো, কিন্তু অত বড় কাজটায় তোরাই যদি আমার সাহায্য না করিস্ তবে কি করে হয় বল্‌ত? আয় দেখি একবার আমার বাড়ী, সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলিগে।"

"চলো" বলিয়া ক্ষ্যান্তমণি মুখুজ্যে মশায়ের অনুগমন করিল। বাড়ী যাইয়া কুড়িটী টাকা লইয়া ক্ষ্যান্তমণির হাতে দিয়া মুখুজ্যে মশাই বলিলেন— "কাল সকালে যদি নিধে আমার কাছে আসে ত এই টাকা ক'টা তাকে দিস্, না হয় তুই নিজেই গিয়ে তার বাড়ীতে দিয়ে আসিস্। আর এই 'পঞ্চাশ' তোর গাই গরু কেনবার, বুঝ্‌লি?"

ক্ষ্যান্তমণির মুখে কথা সরিল না; সে চুপ করিয়া রহিল। তারপর মুখুজ্যে মশায়ের কাঙ্গালী-ভোজনের কথা শুনিয়া ক্ষ্যান্তমণি হতবুদ্ধি হইয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল।

পাঁচ

"ভাখ্ ক্ষ্যান্তমণি, সবই বেশ হচ্ছে বটে, কিন্তু একটা কথা মনে হ'লে মনটা বড় চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। কি করি বল্‌ত?"

সকাল বেলা। ক্ষ্যান্তমণি গোয়াল পরিষ্কার করিয়া আসিয়া কাঙ্গালী-ভোজনের আয়গাটা পরিষ্কার করিতে যাইতেছিল। মুখুজ্যে মশায়ের কথা শুনিয়া সে দাঁড়াইল। মুখুজ্যে মশাই বলিতে লাগিলেন "ভাখ্, সে অনেক দিনের কথা যে ক্ষ্যান্ত-

মণি, তখন আমরা সব এক পরিবারেই ছিলুম। কিন্তু আমার সঙ্গে মনান্তর হওয়াতে আমাদের জেঠ্‌তুতো ভাই পাঁচু দাদা ঝগড়া করে সেই যে আলাদা হয়ে চলে গেল, মরবার আগে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে একবার দেখা করেনি না। আমিও তখন নিজের রাগ নিয়েই ব্যস্ত ছিলুম। কিন্তু এখন বুঝ্‌ছি ক্যাস্তমণি, আমার এতটা রাগ করা ঠিক হয় নি।" মুখুজ্যে মশায়ের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল।

ক্যাস্তমণি নির্ব্বাক। আজ কয়দিন ধরিয়াই সে মুখুজ্যে মশায়কে কেমন আনমনা দেখিতেছে; তাই মুখুজ্যে মশায়ের মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিতের মত সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

"আচ্ছা ক্যাস্তমণি, যদি তাদের আমার এখানে নিয়ে আসি তা হলে বেশ হয় না? একটা ছেলে নিয়ে সে বিধবার বড় কষ্ট হচ্ছে।"

ক্যাস্তমণি এতক্ষণে কথার জবাব দিতে পাইয়া যেন কতকটা স্বস্তি বোধ করিল, বলিল—"হ্যাঁ দাদামশাই, তুমি তাদের এখানেই নিয়ে এস।"

"কালই গিয়ে নিয়ে আসি কি বল্?—দেরী ক'রে আর কি হবে। আর আমার কাছে তারা আস্‌তে কিছুতেই অমত কর্ব্বে না; কি বলিস্?"

"হ্যাঁ দাদামশাই, তুমি তাদের তোমার কাছেই নিয়ে এস।" বলিয়া ক্যাস্তমণি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

লোকনাথ গুন্ গুন্ স্বরে গাহিতে গাহিতে নামাবলি স্কন্ধে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। হরি সভার কীর্ত্তন শেষ হইলে মুখুজ্যে মশাই যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন বেলা তিনটা। কাঙ্গালী ভোজন সবে শেষ হইয়াছে। ক্যাস্তমণি তখন সেই জায়গাটাই পরিষ্কার করিতেছিল। মুখুজ্যে মশাইকে আসিতে দেখিয়া ক্যাস্তমণি ভাত বাড়িয়া দিয়া পুকুরঘাটে চলিয়া গেল।

ছয়

সাঁঝের আঁধার ঘনাইয়া আসিয়াছে। ক্যাস্তমণি ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরা পায়ে ঘসিয়া 'সল্‌তে' পাকাইতেছিল। সেই সময় বিনোদ মিত্তির হাসিতে হাসিতে ক্যাস্তমণির দাওয়ায় উঠিয়া একখানি ছিন্ন কম্বলের আসন টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন "আজকাল সারাদিনটা কোথায় থাকিস্ রে ক্যাস্ত?"

"মুখুজ্যে মশায়ের অন্নসত্রে" বলিয়া ক্যাস্ত আবার নিজের কাজে মন দিল। সে এই পরনিন্দুক বিনোদ মিত্তির লোকটাকে মোটেই পছন্দ করিত না।

"মুখুজ্যে মশায়ের আজকাল হঠাৎ যে বড় ধর্ম্ম-ভাব হয়ে পড়্‌লো? লোকজনার নথি-পত্তরগুলো কি গঙ্গাই বাড়ী বাঁধাতে দিয়েছে, না—সত্যিই পুঁড়িয়ে ফেলেছে!" বলিয়া বিনোদ মিত্তির হাসিয়া উঠিল।

ক্যাস্ত কোন জবাব দিল না।

"তার না অনেক টাকার পাশবই পাওয়া গেছে শুনেছি।"

"হুঁ"

"আন্দাজ কত টাকা হবে বল্‌তে পারিস্?"

"আমি তা কি ক'রে জান্‌ব!"

"সে কি রে? সারা দিনটা তার বাড়ীতেই পড়ে রয়েছিস্, যদি সে খবরটাই না নিলি, যদি নিজের ভবিষ্যৎই না ভাব্‌লি, তা হলে আর করি কি?"

"সে খবর নিয়ে আমার লাভ?"

"আরে ছিঃ! তুই এমন বোকা তা ত আমি আগে জান্‌তাম না। আমি মনে করেছিলাম বুঝি তুই ঐ ফন্দিতেই ওর সেবাধর্ম্মে অত লেগে পড়েছিস্। দেখ, তোর বাবা যখন মারা যায়, তখন ব'লে গিয়েছিল, দেখিস্ বিনোদ, মেয়েটা যেন আখেরে কষ্ট না পায়। তাই তোর জন্যে এত ভাবি—নইলে আমার কি!" বিনোদ মিত্রের নয়ন-

দুটী অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল; তিনি কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়া তাহা সামলাইয়া লইলেন। পরে বলিলেন, "তোর ভালোর জন্যেই বলছি রে ক্যান্ত। যদি মুখুজ্যের খুব ব্যারামটা হয়ে পাশবইখানা সরিয়ে ফেলতে পারিস্, তা'হলে আখেরে তোর ভাল হবে। ও আর ক'দিন বলনা! যদি ওর পাশবইখানা বুদ্ধি করে নিজের নামে করে নিতে চাস্, তাও ও তোকে দিতে পারে। এক-কালে ও ও তোকেই ভাল—"

ক্যান্তমণি বাধা দিয়া বলিল—"কি বলছো, তার ঠিক নেই।"

মিত্তির মশায় ফল ধরিয়াছে মনে করিয়া একবার বাহিরের আঁধারের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"আঁধার হয়ে এলো রে ক্যান্ত, চল্লুম। নিজে যা ভাল বুঝ্‌বি তাই করিস্।"

বিনোদ মিত্তির চলিয়া গেলে, তাহার মনটা যেন কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল, সন্ধ্যে পাকাইতে সেদিন আর তাহার মন সরিল না। সে নিজের ঘরে যাইয়া শুইয়া পড়িল।

সাত

ক্যান্তকে ফাজালী ভোজনের সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বগলে ছাতাটী লইয়া মুখুজ্যে মশাই বলিলেন —'সব ঠিক ক'রে করিস্ ক্যান্ত, আমি কালই বৌঠানকে নিয়ে ফিরে আস্‌ব।" বলিয়া একবার দুর্গার পটের দিকে চাহিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

তিন প্রহরের সময় ঘুলিময় পদে তিনি তাঁহার স্বর্গগত জ্যেষ্ঠতাতপুত্র পাঁচুলালের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। বাড়ীতে ঢুকিয়াই দাওয়ায় ছাতাটী রাখিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। একটু বিশ্রামের পর হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া ভ্রাতৃবধূকে বলিলেন —"কাজ্জা বৌঠান্, তুমি কি রকম মানুষের মেয়ে বাপু? আমি কাজের লোক, তা ত জানই; খোঁজ-খবর নেবার সময়ই পাই না। কিন্তু তোমারও কি ভুলে আমার বাড়ীর মাটীটি মাড়াতে নেই? তোমরা পাঁচজন আপন থাকতে, এই বুড়ো বয়সে আর কি কষ্ট সহ্য কর্ত্তে ইচ্ছে হয়?—আমার সঙ্গে কালই তোমাকে কিন্তু যেতে হবে বাপু—নইলে ভাল হচ্ছে না।"

ভ্রাতৃজায়ার তেমন কোন অমত দেখা গেল না; কারণ পাঁচুলালের মৃত্যুর পর তিনি অতি কষ্টেই সংসার চালাইতেছিলেন। সেই রাতটা থাকিয়া মুখুজ্যে মশায় প্রাতেই ভ্রাতৃজায়াকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন।

• •

মুখুজ্যে মশায়ের ক্রিয়াকর্ম্ম বেশ চলিতেছিল। একদিন হঠাৎ হরি সভা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তাঁহার ভেদবমি হইল। তারপরই জ্বর, ক্রমে বিকার দেখা দিল।

বৈদ্য শিরোমণি ঠাকুর টিকি নাড়িয়া বলিলেন —"এ বাতশ্লেষ্মা-বিকার, এতে কর্ত্তা কদাচ রক্ষা পায়।"

ক্যান্ত মুখে একটু গঙ্গাজল ঢালিয়া দিয়া বলিল —"তবে কি সত্যিই দাদামশাই বাঁচ্‌বে না— শিরোমণি ঠাকুর?" তাহার মুখে যেন একটা বেদনার ভাব ফুটিয়া উঠিল। মুখুজ্যে মশায়ের এক-খানি হাত ক্যান্তমণির কোলে ও আর একখানি হাত ভ্রাতৃজায়ার হাতের উপর। গ্রামের দু'জন উকিল আসিয়া মুখুজ্যে মশায়ের শিয়রে জাঁকাইয়া বসিয়াছেন। যদি তিনি তাঁর 'শেষ-ইচ্ছা' কিছু প্রকাশ করেন, অমনি তাঁহারা দুজনে সেটাকে রেজেষ্ট্রী করিয়া দিবেন।

বৈদ্য নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন— "মহাপ্রাণীর বহির্গমনে এখনো বিলম্ব আছে।"

উকিল দুটী অমনি জেরা করিতে আরম্ভ

করিলেন। "আপনার গেঁড়ীর ডাঙ্গার বিষয়টা কাকে দিতে ইচ্ছা করেন?"

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর হইল—"হরি সভার উন্নতির উদ্দেশে।"

"ঘোষের ডাঙ্গা?"

"কাঙ্গালী-ভোজনে—"

"ধামুন পগার—?"

"বুড়ো-শিব-মন্দিরের সংস্কারার্থে—"

"আর—মিত্তির বাগান?"

"বৌঠান্—"

"নগদ যা কিছু আছে?—"

"আমার-শ্রাদ্ধে—"

"তৈজস পত্র, ঘর বাড়ী?"

"বৌঠান্।"

"বাস্, তা হলে সব ঠিক হয়ে গেল। আর কিছু নেই ত, ভেবে দেখুন?"

"না"—

ক্যান্তমণি এতক্ষণ চুপ করিয়া সব শুনিতেছিল। 'পাশবই' কারো ভাগে পড়িল না দেখিয়া সে মুখুজ্যে মশাইকে বলিল—"আর—'পাশবই'খানা দাদামশায়?"

"সেখানা তোকে দিয়ে গেলাম—"

উকিল সে কথাটা তাঁর 'উইলে' লিখিয়া দিলেন।

দিবাকরের শেষ রশ্মি ক্ষীণ হইয়া আকাশের গায়ে মিলাইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মুখুজ্যে মশাই-এর বাড়ীতে হরি হরি ধ্বনিতে খোল করতাল বাজিয়া উঠিল। তারপর বৈ-তামা বিতরণ করিতে করিতে মুখুজ্যে মশায়ের দেহ গঙ্গাতীরস্থ করা হইল।

• • •

পরদিন প্রত্যূষে ক্যান্তমণি মুখুজ্যে মশায়ের প্রদত্ত 'পাশবই' খানা বিনোদ মিত্রের হাতে দিতেই তিনি টাকার 'পরিমাণটা কত দেখিবার জন্য আগ্রহভরে যখন পাশবই খানা খুলিলেন, তখন দেখিলেন জমার ঘরে শূন্য—কিন্তু তাহার এককোণে বড় বড় অক্ষরে লাল কালিতে লেখা রহিয়াছে।—

"ক্যান্ত!—এ মানুষের তৈরী 'পাশবই', এতে ঢের ভুলচুক্ থাকতে পারে। কিন্তু ত্যাগের মাহাত্ম্যে যদি পুণ্যের 'পাশবই'যোগাড় কর্ত্তে পারিস্, তাহ'লে ধর্ম্মরাজের সে হিসেবের নড়চড় কিছুতেই হবে না। জমিদারের মুহুরী আমি, তোর ওপর কাঙ্গালী-ভোজনের যে ভার দিয়ে গেলাম, তাইতেই যদি মনঃপ্রাণ সমর্পণ কর্ত্তে পারিস্, তা হলে ধর্ম্ম-রাজের মুহুরী চিত্রগুপ্ত তোর সে 'পাশবই'তে পুণ্যের জের ঠিক ঠিক জমা করে যাবে।"

লেখাটা পড়িয়া, 'পাশবই' খানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, মুখখানা ঘৃণায় বীভৎস করিয়া বিনোদ মিত্তির ক্যান্তর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আচ্ছা যা হোক্, তোকে ঠকিয়ে গেল ক্যান্ত!"

ক্যান্ত সে কথার কোনই উত্তর দিল না। কিন্তু পরদিনই দেখা গেল, মাথার চুল মুড়িয়া, গেরুয়া বসন পরিয়া, হাতে হরিনামের মালা লইয়া ক্যান্ত দ্বিগুণ উৎসাহে কাঙ্গালী ভোজন করাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের বাণী

(শ্রীঅনিলকুমার সেন বি-এ)

অধ্যাপক S. C. Rollo কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার কাব্যে যে সনাতন সত্য ও ভাবধারা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বাণী তিনি যেরূপ বুঝিয়াছেন ও প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

অধ্যাপক মহাশয় বলেন,—অতীতের মহীয়সী স্মৃতি ও উজ্জ্বল আদর্শ জাতির গৌরবের বস্তু। তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া জাতি আপনার ভবিষ্যৎ গন্তব্য পথ ঠিক করিয়া লয়। যখনই জাতীয় জীবনে ক্লান্তি ও অবসাদ আসিয়া পড়ে, তখনই লোকে অতীতের সেই উচ্চ আদর্শ দেখিয়া জীবনে নূতন প্রেরণা আনয়ন করিয়া থাকে। জাতির এই গৌরবময়ী স্মৃতির মধ্য দিয়া জাতীয় কবি কি ভাবে জীবনে বল সঞ্চার করিয়াছেন, তাহার একটু আলোচনা করিব ও জগতে তিনি যে বাণী প্রচার করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার আভাস দিব।

গান গাইয়া যাওয়াই কবির চরম আনন্দ। কবি জীবন হইতে দূরে থাকিতে পারেন না; কারণ কবির কণ্ঠে জীবনই সুর যোগাইয়া থাকে—জীবনের মধ্যেই কবি ভাবের প্রেরণা অনুভব করিয়া থাকেন। যে কবি জীবন হইতে যতদূরে সরিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার বাণীও তত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, জীবনের মূলে যে তুচ্ছ কর্ম্ম-কোলাহল ও জড় জগতের আধিপত্য রহিয়াছে—তাহার মলিন স্পর্শ কবির দেহে লাগিলে তাঁহার কণ্ঠের গান প্রাণের গান হইবে না—তাঁহার গান জড় জগতের হিমশীতল স্পর্শে একটা মিথ্যা মোহের সৃষ্টি করিবে। কবি নির্জ্জনে স্বকীয় অভিজ্ঞতার উপর চিন্তা করেন; তাই তাঁহার গানে বাস্তব ও আদর্শের এমন সুন্দর সম্মিলন—তাই তাঁহার গানে জীবনের তুচ্ছ ঘটনার বর্ণন অপেক্ষা একটা চিরন্তন সত্যের আভাস ফুটিয়া ওঠে। নির্জ্জনেই কবির কানে বিশ্বস্রষ্টার স্বর্গীয় সঙ্গীতধারা বর্ষণ করে—তিনি ভগবানের সত্তা অনুভব করিয়া ধন্য হন। তাঁহার হৃদয় পবিত্র বলিয়া তাঁহার দৃষ্টি স্বচ্ছ ও সুদূরপ্রসারী। তাঁহার কণ্ঠে বিশ্ব-মানবের এমন একটা সার্ব্বজনিক সুর বাজিয়া ওঠে, যাহা সর্ব্বশ্রেণীর লোকের হৃদয়-তন্ত্রীতে সমান ঝঙ্কার দিয়া থাকে। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রকাশ ভঙ্গী তাঁহার বাণীর এই ব্যাপকতার একটা প্রধান কারণ বলা যাইতে পারে। জাতীয় জীবনের স্বাধীনতায় কবি বৃথা বাদ-প্রতিবাদের ভিতর প্রবেশ করেন না—তিনি কর্ম্মকোলাহল হইতে দূরে থাকিয়াও জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, জাতির প্রাণের কথা অনুভব করিতে পারেন। তাই তাঁহার সঙ্গীতে যেমন উন্মাদনার সৃষ্টি করে, তেমনি বিচার-শক্তিকেও জাগাইয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই সনাতন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার হৃদয় জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। কবি তাঁহার অনন্যসাধারণ মনীষাবলে ও গভীর দার্শনিক চিন্তার সাহায্যে সেগুলির ভিতর একটা সুসমঞ্জস ঐক্য ও সুষমা স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার গানের সুরে এমন একটা তেজোদৃপ্ত বিরাট ভাব ফুটিয়া ওঠে—এমন একটা উন্মাদনাশক্তি সঞ্চার করিয়া দেয়, যাহা আমাদের চিত্তের দুর্ব্বলতাকে একেবারে দূর করিয়া, জড়তার অবসান করিয়া মানসিক শান্তি আনিয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মানবতার গান বাজিয়া উঠিয়াছে। যৌবনে তিনি মানব-জীবনের প্রত্যেক অনুভূতি ও তাহাদের পরস্পর বিভিন্নতা মনোযোগ পূর্ব্বক লক্ষ্য করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, প্রতি মানবাত্মার অন্তরের কথা কবির কণ্ঠেই মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিবে। তাঁহার কণ্ঠে প্রেমিকের গান, পথিকের পথপর্য্যটনের আনন্দ যেমন আমাদের মনে পুলকের সৃষ্টি করে, তেমনি হতাশের দীর্ঘশ্বাস, পীড়িতের আর্ত্তনাদও তাঁহার কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া আমাদিগকে শোকে মুহ্যমান করিয়া দেয়। তাঁহার গানে যেমন আনন্দের অশ্রু প্রবাহিত হয়, তেমনি শোকের মর্ম্মস্পর্শী অশ্রুও ঝরিয়া পড়ে। কবিকে শুধু নির্জ্জনে চিন্তা করিলে চলিবে না—তাঁহাকে বেদনাকাতর মূক মানবের অব্যক্ত প্রাণের কথা, তাহার শোক-দুঃখের কাহিনী জগৎকে শোনাইতে হইবে।

সাধারণ লোকে ত আর কবির মত মর্ম্মস্পর্শী সুরে হৃদয়ের গোপন সুখ—গোপন ব্যথা প্রকাশ করিতে পারে না, তাই কবিকেই তাহাদের মুখপাত্র হইয়া তাহাদের প্রাণের কথা শোনাইতে হইবে। কিন্তু কেবল মুখপাত্র হইলেও চলিবে না—কবিকে

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে—"

কবিকে জগতের সমস্ত বেদনা ও দৈন্যের মধ্যেও একটা সুখের রাজ্য সৃষ্টি করিয়া নিরাশাপীড়িত মানবহৃদয়ে বলসঞ্চার করিতে হইবে—তাঁহাকে বলিতে হইবে——

"কবি তবে উঠে এস,—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই সাথে,—তবে তাই কর আজি দান।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু—
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপুট! এ দৈন্য মাঝারে কবি
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি।"

কিন্তু যৌবনের সেই রবীন্দ্রনাথকে এখন আর আমরা সে ভাবে দেখিতে পাই না। এখন অনুভূতির বিবৃতি না করিয়া, তাহাদের উৎস বাহির করিতেই তিনি ব্যস্ত। তিনি এখন মহাকবি সেক্সপীয়ারের পথানুসরণ করিয়া মানব-জীবনের বিচিত্র লীলার বিশ্লেষণ না করিয়া কোনও সত্যে উপনীত হন না—তিনি আপনার দূরদৃষ্টি-জাত গভীর সত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবনের অনুকূল ও প্রতিকূল ঘাতপ্রতিঘাত নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া সনাতন সত্যের সহিত তাঁহাদের একটা সমীচীন সংযোগ সাধন করিয়া দেন। তাই, তাঁহার বাণী আসক্তির উদ্রেক করে না—তাঁহার বাণী আসক্তিকে শান্ত ও নীরব করিয়া দেয়—তাঁহার গানে জীবনের চাঞ্চল্য শান্তির বিমল ধারায় পরিপ্লুত হইয়া দিব্য ও পবিত্র হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ অনেক প্রেমের গান রচনা করিয়াছেন। তাহার কতকগুলি পাঠকের প্রাণে আনন্দের সঞ্চার করিতে, সরলতা ও মোহের আবেশে কাব্যসাহিত্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গীতিকবিতারূপে অমর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই শ্রেণীর প্রেমের কবিতা কবির হিসাবে উৎকৃষ্ট হইলেও, মনে ভাবের হিল্লোল তুলিতে পারে না; প্রেমের পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রাণে চরম শান্তি আনয়ন করিতে পারে না—সেগুলি পিপাসা দূর না করিয়া উত্তরোত্তর গভীর পিপাসা বাড়াইয়া দেয়। তাই মানবাত্মা পার্থিব প্রেমের জন্য প্রথমতঃ লালায়িত হইলেও পরে ভগবানের মধ্যেই প্রেমের চরম পরিণতি পাইতে উন্মুখ হইয়া ওঠে। ইহাই প্রেমের যথার্থ স্বরূপ—এই প্রেমই গভীর ও শাশ্বত। তিনি 'চিত্রাঙ্গদা'য় আমাদিগকে এই বাণীই শুনাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের গানের আরও একটা বিশেষত্ব এই যে, ভগবানের অসীম দয়া ও করুণার কথা তাঁহার গানের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভগবান জীবের জীবন দিয়াছেন, এ কথা নানা ভাবে বলিয়াও কবি নীরব হইতে পারেন নাই—ভগবান যে বিশ্বের সমস্তই দিয়াছেন—এই কথাই যেন তাঁহার অন্তরের কথা। এই কথাই নানা ভাবে, নানা ছন্দে তিনি গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবানই নিখিল বিশ্বের প্রাণোন্মাদিনী গীতি ও রস সৃষ্টি করিয়াছেন; শুধু সৃষ্টি করিয়াই তিনি নিশ্চেষ্ট হন নাই,—তিনি অবিরাম গান গাহিয়া যাইতেছেন;—সারা বিশ্ব তাঁহার গানের ভিতর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বহু আরাধনা ও সাধনার বলে তাঁহার দিব্য সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায় ও সেই স্বর্গীয় সঙ্গীতের সুরের সহিত মানবাত্মার অন্তরের সঙ্গীত যোগ সাধন করিতে পারা যায়; আর এইরূপ করিতে পারিলেই শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়।

তাঁহারই সত্তা যুগে যুগে জীব-জগতে প্রাণের সঞ্চার করিয়াছে। প্রাসাদ ও মন্দিরে তাঁহার সন্ধান পাওয়া বড় কঠিন—সহসে যদি তাঁহার সন্ধান পাইতে চাও, তবে পথের ধূলার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাক—দেখিবে, তিনি নিরাশ্রয়কে হাত ধরিয়া, আশার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া পন্থব্যপথে অগ্রসর করাইয়া দিতেছেন।

ভারতের প্রাণ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগে কবির হৃদয় ভরপুর! তিনি ভারতের সনাতন আদর্শ কেবল পাশ্চাত্য জগতে নহে, ভারতকেও নূতন করিয়া শোনাইয়াছেন। তাই, তাঁহার গানে মুক্তিপিপাসু ভারতের ভবিষ্যৎ আশা মূর্ত্তিমতী হইয়া দিকে দিকে একটা প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে।

শেষ-আহ্বান

(শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্)

ঘন ঘন হাঁকিছে নাবিক—
হে সমুদ্র-পথের পথিক,
সময় যে নাহিক অধিক,
তীর ছেড়ে তরী প'রে, এস এস ত্বরা ক'রে,
তোমার মুখের পানে চেয়ে অনিমিখ্
লগ্নকালে নৌকা ল'য়ে এসেছি নাবিক।
ঘন ঘন শিঙ্গা মোর ডাকে,
এসেছি যে লইতে তোমাকে,
এড়াতে পারিবে নাক, যেখানে যে ভাবে থাক,
নিভেরে জড়ায়ে শত স্নেহ-মায়া-পাকে—
আমার আহ্বান হ'তে কে তোমারে রাখে!
কবে কোন সৃষ্টির প্রভাতে
এসেছিলে তুমি শূন্য-হাতে,
তার পর ভুলি' গিয়া খেলাইলে ধূলি নিয়া
স্নেহ-প্রীতি, প্রেম-স্মৃতি মিশায়ে তাহাতে
হাসিলে কাঁদিলে কত ঘাত-প্রতিঘাতে।
মাঝে মাঝে আসি কত পথ,
পুরাইতে তব মনোরথ,
কত না বন্দরে থামি' তরণী বেঁধেছি আমি,
কত আলো-ছায়া, পথে সম্পদ-বিপদ,
—তবু বাহিয়াছি তরী ধরি' দীর্ঘ পথ।
ঐ দেখ পালে লাগে বায়,
অকূলের পানে তরী ধায়,
সকল বন্ধন টুটি, এখনি সে যাবে ছুটে,

এপারের ঘাটে তারে বেঁধে রাখা দায়,
—যেতে হবে, এসে তবে তরীতে ওরায়।
ঐ শুন ভৈরব কল্লোল,
নৃত্য করে মত্ত সিন্ধু-জল,
বৈধ্য নাই, ধৈর্য্য নাই, পরিপূর্ণ সর্ব্বদাই,
তদ্যাবধি এ জলধি উদ্দাম চঞ্চল,
নীল জল খর স্রোতে শুভ্র ফেনোচ্ছল।
বহু দূরে যিতে হ'বে পাড়ি,
তাই আমি করি তাড়াতাড়ি,
আপনার দেহ স্নেহ সাথে না যাইবে কেহ,
হে পান্থ, আসিতে হবে এ সবারে ছাড়ি',
নিষ্ঠুরি' হৃদয় তব ল'য়ে যাব কাড়ি।
মিছে ফেলা নয়নের জল,
পিছে চাওয়া, তাও ত বিফল,
বন্ধু-জন-সুহৃৎ-দারা পড়িয়া থাকিবে তারা,
নহে নহে এ সকল পথের সম্বল,
সাথে শুধু যাবে জেন নিজ কর্ম্মফল।
আহরিতে বিবিধ রতন,
ক'রেছিলে কত না যতন,
সমগ্র জীবন ভরি' কত না আগ্রহ করি',
তুষিলে আশায় ভুলে প্রিয় পরিজন
মোহ বশে সত্য ভাবি' নিশার স্বপন।
এ সবারে যেতে হ'বে ফেলে
দুই হাতে দুই পাশে ঠেলে,
ভরিয়া হৃদয়-নীড় যারা ক'রেছিল ভীড়,
বিদায়ের কালে আজ তারা কাছে এলে
চাহিও না চাহিও না স্নেহ-আঁখি মেলে।
রে অবোধ মানবের মন
কেন তোর হেন বিস্মরণ,
যে কথা বলিয়া এসি কেমনে তা ভুলে গেলি,
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালে কেন অকারণে
বারে বারে আপনারে কর আবরণ।
এত বলি' পথিকে তুলিয়া
যাত্রি দিল তরণী খুলিয়া,
পশ্চাতে ক্রন্দন-রোল, সম্মুখে তরঙ্গ-কোল,
অনন্তে চলিল যাত্রী সকলি ভুলিয়া,
এপারে রহিল পড়ে দেহ আগুলিয়া।

বংশের কলঙ্ক

(শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বৈধিনী

বিনায়কের সঙ্গে কয়েকজন কুলিকে পাঠাইবার পর অরুণ সেই দিন চাবাগানে রহিল এবং সেখানকার কারকর্ম্মের কতকটা শৃঙ্খলা সাধন করিল। কতক লোককে মিষ্ট কথায়, কতককে তার প্রদর্শনে আর বেশীর ভাগ লোককে অর্থে বশীভূত করিয়া সে যখন জগন্নাথ বোরের দল ভাঙ্গিয়া দিতে সমর্থ হইল, তখন সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু বিদ্রোহীকে তাহার নিজের ডেরায় শায়েস্তা করিতে না পারিলে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে না, এই কথা মনে করিয়া সে দুই দিন পরে সিবাং স মিল কোম্পানীর কারখানায় উদ্দেশে যাত্রা করিল। সারা দিন হস্তী পৃষ্ঠে ভ্রমণ

করিবার পর প্রায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে যখন সিবাং-আবু গ্রামের বাজারে পৌঁছিল, তখন তথায় একটা মোরগের লড়াই হইতেছিল।

চারিদিকে বিস্তর লোক ঘিরিয়া বসিয়া মহানন্দে লড়াই দেখিতেছিল। কখনও কখনও তাহাদের মুখ দিয়া "বাঃ আবাঃ, বাঃ আবাঃ" রূপ অদ্ভুত হর্ষ ও উৎসাহধ্বনি নির্গত হইতেছিল। অধিকাংশ লোকই করাত কলের কারখানার কুলি মজুর।

অরুণ বাজার হইতে কিছুদূরে নামিয়া মালপত্র গঙ্গার জিম্মায় দিয়া কারখানায় তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কোয়ার্টারে (আস্তানায়) পাঠাইয়া দিল; এবং নিজে ভিড় দেখিতে অগ্রসর হইল। বাজারের কাছে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া সে ঐ সব কাণ্ড দেখিতেছিল।

অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের দিকে সে মাথার টুপিটা আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই সে হঠাৎ কুলীদের মধ্যে কেন একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, দেখিতে পাইল না। সে দেখিল, হঠাৎ কুলীরা ভীত ত্রস্ত হইয়া তাল করিয়া উঠিয়া বসিল এবং ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া কাহার উদ্দেশে প্রণাম করিল। সঙ্গে সঙ্গে সে যেদিকে টুপি আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই দিক হইতে দুইটী মনুষ্য-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। যে মানুষটী প্রথমে আসিতেছিল, সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াই সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই জুতার ঠোকর দিয়া তাল করিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল; তাহাদের অপরাধ, তাহারা তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সাবধান হইয়া বসে নাই বা তাহাকে প্রণাম করে নাই।

আগন্তুকের আকৃতি ভীষণ। এরূপ দীর্ঘ, মাংসল, দৃঢ়, বলিষ্ঠ অথচ কদাকার লোক প্রায় সচরাচর দেখা যায় না। তাহার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মুখে বসন্তের দাগ, তাহার চেহারাটীকে আরও ভীষণ করিয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র চক্ষুটী জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ, তাহার স্থূল অধরোষ্ঠে যেন ক্রূরতা, কপটতা ও নির্দ্দয়তা মাখান রহিয়াছে। অথচ লোকটার পোষাক-পরিচ্ছদ কুলীর মত নহে, ভদ্র মারাঠীদের পরিচ্ছদের মত। তাহার হাতে একটা চাবুক ছিল। তাহার দেহরক্ষীর মত যে লোকটা তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছিল, তাহার চেহারা আরও ভয়ানক। লোকটা একবারে বোঁগা, বেঁটে ও বক্সবাঁটুল। তাহার মাথাটা কামান, কেবল তাহার মাথার মাঝখানে একটা ঝুটী আছে। তাহার কটা চামড়া, কাল মিটমিটে চোখ, চেপ্টা নাক, সর্ব্ব শরীরে ভীরের ফলার উল্কিটাটা। তাহার পরিধানে বেতের চুড়ি বসান গাছের পাতার টেনা; মাথায় বেতের চুড়ি দিয়ে গাঁথা টুপি, লাল রঙ্গ করা চুলের গোছা, শূকর-দন্ত এবং বকের ঠোঁট ও পালক দিয়া টুপিটি সাজান; কাণে বেতের দুল; গায়ে চুণ, গলায় প্রবাল ও কড়ির মালা; বাহুর খাপের মধ্যে লুকান অস্ত্র কোমরে ঝোলান; হাতে মড়ার মাথার খুলিতে পানীয় দ্রব্য।

অরুণ দূর হইতে সকল ঘটনাই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। প্রথম দর্শনেই এই লোকটার প্রতি তাহার অশ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। পরে সে যখন দেখিল, লোকটা জবরদস্ত যমদূতের মত কুলীদিগকে লাথি মারিতে মারিতে অগ্রসর হইতেছে; এবং বলপূর্ব্বক কুলি-স্ত্রীকে তাহার আপনার জনের নিকট হইতে কাড়িয়া আনিয়া নির্লজ্জের মত ব্যবহার করিতেছে, তখন লোকটার প্রতি দারুণ ক্রোধ ও ঘৃণায় তাহার অন্তর পূর্ণ হইল।

এদিকে মোরগের লড়াই চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে বাঃ আবাঃ ধ্বনি উঠিতে লাগিল। ক্ষণেক উত্তেজনা ও উৎসাহের স্রোত বহিল। তাহার পর যখন একটা মোরগ অপরটীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল এবং স্থানটা রক্তে রাঙ্গা হইয়া গেল, তখন কুলীরা মহোল্লাসে হর্ষধ্বনি করিয়া সেই স্থানটা

লক্ষ্য করিয়া ছুটিল; একটা হৈ হৈ শব্দ উঠিল। কিন্তু হঠাৎ তাহাদের গতি রুদ্ধ হইল। ভিড়ের ঠেলা-ঠেলিতে একটা কুলী মোড়ায় আসীন মানুষটার ঘাড়ে পড়িয়া গিয়াছিল। সেই মানুষটা তখন অনলগম্ভীরস্বরে "হকাও ঘাড়" বলিয়া চীৎকার করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কুলীটার গলা টিপিয়া ধরিল। অন্যান্য কুলীরা ভয়ে দিশাহারা হইয়া বেলায় বাধাপ্রাপ্ত বারিধি-তরঙ্গের মত মাথা নীচু করিয়া যথাস্থানে হটিয়া আসিল। ভিড় সরিয়া গেলে পর প্রভুর সঙ্কেতানুসারে সেই রাক্ষসের মত অনুচরটা নিরীহ কুলীটাকে লইয়া গিয়া রঙ্গস্থলের মধ্যস্থ ভূমিতে প্রোথিত দণ্ডে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তাহার প্রভু শক্ত মাছের চাবুক লইয়া কুলীটার পিঠে সপাসপ বসাইয়া দিতে লাগিল। কুলীর আর্ত্তনাদে চলন্ত ট্রেণ থামিয়া গেল।

এ সকল কাণ্ড মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘটিয়া গেল। অরুণ প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল; কিন্তু কুলীর হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে তাহার মোহ ভঙ্গ হইল। দারুণ ক্রোধে তাহার দেহ থরথর কাঁপিয়া উঠিল। রাগে জ্ঞান-হারা হইয়া সে দুই তিন লম্ফে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল এবং সবলে সেই নিষ্ঠুর লোকটার হস্ত হইতে চাবুক কাড়িয়া লইল।

বোধ হয় সূর্য্যটা আকাশ হইতে মাটীতে ছিটকিয়া পড়িলে ততটা বিস্ময় হইত, এই অভাবনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া কুলীদের ততোধিক বিস্ময় সঞ্জাত হইল। তখনও তাহারা চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। কে এই দেবকুমারের মত বালক? এ কি আকাশ হইতে নামিয়া আসিল? তাহাদের প্রভুর হাত হইতে চাবুক কাড়িয়া লয়, এমন মানুষ আছে না কি! এও কি সম্ভব!

প্রভু ও অনুচর প্রথমে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। দীর্ঘকাল অপ্রতিহত কর্ত্তৃত্ব উপভোগের পর সেই কর্ত্তৃত্ব বাধাপ্রাপ্ত হইলে তাহা আশ্চর্য্য বলিয়া অনুমান করাই স্বাভাবিক। অনুচরটা অরুণকে হয় ত কোতোয়ালী সাহেব মনে করিয়া দশহাত দূরে সরিয়া গিয়াছিল, বস্তুতঃ সুযোগ সুষ্ঠাম সুগঠিত অরুণকে এই বেশে দেখিয়া এরূপ ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কেবল তাহার কাল চুল ও কাল চোখ দেখিয়া পরে ভ্রম দূর হইতে পারে। অনুচরটা এখানকার অনেক করাত কলে ও চা-বাগানে ঐরূপ সাহেব দেখিয়াছিল; সে জানিত সাহেবদের কাছে বন্দুক পিস্তল থাকে; আগ্নেয়াস্ত্রকে ইহাদের শ্রেণীর লোক যমের মত ভয় করে; তাই সম্ভবতঃ অতর্কিতভাবে অরুণকে আসিয়া তাহার প্রভুকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া সে ভয়ে পিছাইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু তাহার প্রভুর অরুণকে প্রথমে সাহেব, অতএব কোনও ডেপুটি কমিশনার অথবা পোলিটিকাল এজেন্ট আফিসের উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী মনে করিলেও, পরে তাহার কেশ ও চক্ষুর বর্ণ দেখিয়া এবং ক্ষুব্ধ অরুণের মুখে উচ্চারিত হিন্দী ভাষা শুনিয়া তাহাকে ভারতবাসী বলিয়া চিনিতে পারিল। সাহেবের হিন্দী ত' এমন ভাবে উচ্চারিত হয় না। সাহেবরা "ছোড় দেও" বলে না, "ছোড় ডেও" বলিয়া থাকে। তবে এ লোকটা কে? সামান্য এক কোঁটা বালক। তবে কি এই বালকটাই হেড আফিস থেকে এখানে কর্ত্তাগিরি করতে এসেছে?

মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই ধড়িবাজ লোকটা ঘটনাটা বুঝিয়া লইল। হেড আফিসের এই ছোঁড়াটা আজ এখানে এসে পৌঁছেছে, আসবার সময়ে পথে সে তার হাতী দেখিয়া আসিয়াছে। তবেই ত' বেশ হয়েছে। বৈর সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, ছোঁড়াটা আপনিই মরণের ফাঁদে পা দিয়েছে। এর গায়ে পড়ে ঝগড়ার ছুতো ধরে আজ বেটাকে সাবাড় করে দিই।

তখন লোকটা এই ভাবে চিন্তা করিয়া অনুচরকে একটা সঙ্কেত করিল। কিন্তু অনুচরটা হাবুলের মত হইলেও সে সাহেব জাতকে যমের মত ভয় করিত, তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না; সে সভয়ে পিছাইয়া গেল এবং ছুটী ছুটী পিছাইয়া গিয়া ভোঁ দৌড় দিল।

তখন সেই ছুবলা চেহারার লোকটা উত্তরোত্তর ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিয়া নিজেই অরুণের প্রতি ধাবমান হইল। কিন্তু তাহার প্রহারোদ্যত উর্দ্ধোত্তোলিত হস্ত ব্যর্থলক্ষ্য হইল, সে নিজেই সশব্দে ধরাশায়ী হইল; কেন না, অরুণ কুস্তির কসরতে ও বক্সিং খেলায় পরম পারদর্শী ছিল বলিয়া এমন সুন্দর কৌশলে মাথা নিচু করিয়া হটিয়া পড়িল যে, সেই লোকটা তাল সামলাইতে না পারিয়া অরুণের শরীরেই হোঁচট খাইয়া ঠিকরিয়া পড়িয়া গেল। অরুণ ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়াই কোটটা খুলিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিল এবং ছুবলাটা উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রহারার্থ হস্ত উত্তোলন করিতেই প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে আবার তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিল।

বলা বাহুল্য, উপস্থিত জনসঙ্ঘ বিস্ময়ে আনন্দে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। বিস্ময়ের কারণ,—এ অঞ্চলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ও দুর্দ্ধর্ষ লোককে একটা বালকে এক আঘাতে ভূতলশায়ী করিয়া দিল; আনন্দের কারণ—তাহারা নিজে যাহার ভয়ে কুকুর বিড়ালের মত মার খাইয়াও ভয়ে মার হজম করে, ফিরাইয়া মারিতে সাহস করে না, তাহাকে অপর একজন অধিকতর বলবান লোক আজ কুকুর বিড়ালের মত মারিয়া ভূমিসাৎ করিয়া দিল।

কিন্তু তাহাদের এই আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। সেই ছুবলা লোকটা মার খাইয়া আরও ক্ষেপা হইয়া উঠিল। গা ঝাড়িয়া উঠিয়া সে দন্ত কিড়িমিড়ি করিয়া ভীষণ স্বরে হিন্দী ভাষায় বলিল, "তুই এখানে মরতে এসেছিস? বাচ্চা, ছোঁড়া, মরণের পানক উঠেছে ব'লে আজ জগন্নাথ মোরের গায়ে হাত তুলেছিস্?"

জগন্নাথ মোরে—এই কথাটা শ্রবণ মাত্র অরুণের মনে যে বিস্ময় সঞ্জাত হইল তাহা অপসারিত না হইতে ভীমকায় মোরে বন্য মহিষের মত গোঁ গোঁ রব করিয়া ঘাড় গুঁজিয়া অরুণকে তাড়া করিল। কিন্তু অরুণের প্রচণ্ড ঘুষি খাইয়া সে একেবারে টলিয়া পড়িল। অরুণ কিন্তু তাহাকে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর না দিয়াই তাহার মুখে ও কোঁকে উপর্য্যুপরি কয়েকটা ভীষণ মুষ্ট্যাঘাত করিতে মোরে একেবারে বিকলচেতন ও বিস্রস্তদেহ হইয়া কাদার ভেলার মত মাটীতে পড়িয়া গেল; দর্শকেরা মহানন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

মোরের নাক মুখ ও অন্যান্য বহু স্থান দিয়া রক্তস্রাব নির্গত হইতেছিল, অরুণেরও হাত মুখ দিয়া রক্ত ঝরিতেছিল। অরুণ একটু শ্রান্তও হইয়া পড়িয়াছিল। সে তাই আন্তি দূর করিবার মানসে মোরের পরিত্যক্ত কোটের উপর গিয়া বসিয়া পড়িল। অমনই আবার কুলীদের মধ্যে একটা বিরাট হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল, এবং অরুণ আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, কুলীরা দলে দলে অগ্রসর হইয়া তাহার পদতলে মাথা নোয়াইয়া জোড়হস্তে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অজ্ঞাত ভাষায় স্তবস্তুতি করিতেছে। অরুণ পরে শুনিয়াছিল, তাহারা সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে তাহাদের প্রভুর পদে বরণ করিয়াছিল।

এই একটী ঘটনাতেই অরুণের জীবনের একটানা স্রোতে একটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল। অরুণ এইবার বুঝিল, দায়িত্বপূর্ণ জীবন কি। এতগুলি মানবের উপর কর্ত্তৃত্ব, তাহাদের পরিচালনা এবং পিতার ও পিতৃবন্ধু পিতৃতুল্য কেনেডি সাহেবের বিরাট কার্য্যে সুশৃঙ্খলা বিধান,—এতগুলি কার্য্য বিধাতা একসঙ্গে তাহার স্কন্ধে তুলিয়া দিতেছেন। কোথায় কলিকাতায় তাহার লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, কর্ম্মশূন্য আরামের জীবন, আর কোথায় এই

আরামের দায়িত্বপূর্ণ, উদ্বেগময়, কর্ম্মময় কঠোর জীবন!

অরুণ পরদিন হইতেই কারখানার কাজে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিল। সে নিজে কুলীদের সঙ্গে যোগ দিয়া কুলীদেরই মত পরিশ্রম করিতে লাগিল। যাহাকে আন্তরিক কাজ করিতে দেখিল তাহাকে সে শুধু মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, অর্থেও তাহাকে পুরস্কৃত করিতে লাগিল। তবে অরুণ গঙ্গার মুখে শুনিত, এজেন্ট পুরুষোত্তম কোঠারে অত্যন্ত ভালমানুষ, অরুণের আগমনে সে যেন স্বর্গ হাতে পাইল। সে দেখিল, এই সদর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বয়সে নবীন হইলেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কর্ম্মঠ, সাহসী ও শক্তিশালী। ইহার উপর অরুণ যখন কুলীদের বশ করিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত কারখানার কার্য্য চালাইতে লাগিল, তখন আর তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। বিশেষতঃ দারুণ দুষ্ট দুর্দ্ধর্ষ মোরেও যখন অরুণের ভয়ে নরম হইয়া পড়িল, তখন বস্তুতঃই আনন্দে তাহার চক্ষে জলধারা বহিল। সে প্রথমে এখানে আসিয়া সকল বিষয়েই বিশৃঙ্খলা ও মোরের একাধিপত্য দেখিয়া পরিবারবর্গকে ভিক্রগড় পাঠাইয়া দিয়াছিল, এতদিন তথা হইতে আসিতে ভরসা করে নাই। অরুণ আসিবার দশ বার দিন পরে সে নিশ্চিন্তমনে বিনায়ককে পরিবার আনিতে পাঠাইয়া দিল। পুরুষোত্তম নিজে ভাল কাজ বুঝিত; সুতরাং কাজ যখন সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতে লাগিল, তখন সেও খুব মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া হিসাব নিকাশ রাখিতে লাগিল। অরুণ কোঠারের পরামর্শানুসারে কারখানার লোকগণের মধ্য হইতে কয়েকজনকে বাছিয়া সদর মেট, মেট, জমাদার, সরকার ইত্যাদি নিযুক্ত করিল এবং কাঠ-চালানি ব্যাপারেও যথোপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিল।

এই সকল ব্যাপারে গঙ্গা তাহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল। তাহার মিষ্ট কথায় সকলে তুষ্ট ছিল, তাই সেও প্রভুর মত প্রায় সকল লোকেরই মন হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বিনায়ক অরুণেরই প্রায় সমবয়স্ক। দুই এক দিনের আলাপেই সে একবারে অরুণের গোড়া হইয়া পড়িল। সে অরুণের নিকট বিস্তর দ্রব্য উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইল; বিনিময়ে কিছু দিতে না পারিয়া সে বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইল। অরুণ তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত হাসিয়া তাহার নিকট তাহাদের এক সুট জাতীয় পোষাক চাহিয়া লইল; বিনায়কও তাহার নূতন সুটটা (ধুতি, উড়ানী, টুপি, জুতা) দিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিল।

সিবাং নদীর একটা অংশে বড় মাছ ধরিবার সুবিধা ছিল; বিনায়ক সেই স্থানটী আবিষ্কার করিয়াছিল। সেখানে অবসর পাইলে সে প্রায় মাছ ধরিত। অরুণের মাছ ধরার সখ আছে শুনিয়া বিনায়ক তাহাকে একদিন লইয়া গেল। তাহার পরেই বিনায়ক ভিক্রগড় চলিয়া গেল। কিন্তু অরুণ তদবধি প্রায়ই অবসর কালে সেই নির্জ্জন স্থানটায় বসিয়া মাছ ধরিত।

আজ সে যখন বিনায়কের পোষাকটা পরিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছিল, তখনও অনেকটা বেলা আছে।

অরুণ একাগ্রচিত্তে বসিয়া মাছ ধরিতেছিল। নদী স্রোতের অবিরাম কলকলধ্বনি বিহঙ্গকাকলীর সহিত মিশিয়া প্রকৃতির বিরাট নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। যে বৃক্ষছায়ায় বসিয়া অরুণ মাছ ধরিতেছিল, তাহার পত্রান্তরাল ভেদ করিয়া প্রখর সূর্য্যকিরণ তাহার মাথায় আসিয়া পড়িতেছিল। অরুণ বিনায়কের মারাঠী টুপিটা তুলিয়া মাথায় পরিল। অরুণ ভাবিতেছিল,—আচ্ছা এই সূর্য্য-কিরণ এখানেও যেমন পড়িতেছে বালিগঞ্জের একটী বাড়ীতেও তেমনি পড়িতেছে ত'। আমি তার কথা যেমন ভাবছি, সেও আমার কথা তেমনি

ভাবছে ত' ? সূর্য্যকিরণ, তুমি সব জায়গায় যাও, সর্ব্বত্র সমান তোমার গতিবিধি। সূর্য্যকিরণ যেমন পাত্রাপাত্র বাছে না, রাজপ্রাসাদের পুষ্পোদ্যানে যেমন পড়ে তেমনি দরিদ্রের কুটীরের পার্শ্বস্থ আবর্জ্জনা স্তূপের উপরও ত' পড়ে। তবে ভগবানের দয়া তেমনি সর্ব্বত্র সমানভাবে পড়ে না কেন ? লোকে যা আশা করে তা পায় না কেন ? যাকে না পেলে বেঁচে থাকা না থাকা সমান, তাকে পেতে এত বাধা কেন ? আমি অনুপযুক্ত, আমি বংশের কলঙ্ক, তাই তাকে পাব না !

তারপর কুলীরা ! আহা এরা কি দুঃখী ! দুটী পেটের ভাতের জন্যে দেশ ঘর ছেড়ে কোথায় জঙ্গলে এসে পশুর মত জীবন যাপন করছে ! আচ্ছা, এদের এই বিরাট দুঃখের মাঝেও কি কিছু সুখ দেওয়া যায় না ? অবশ্যই যায়। না, এদের জন্যে আমি ডিব্রুগড় থেকে মাষ্টার আনাবো, স্কুল করে দেবো, এদের ব্যায়াম এবং নির্দ্দোষ আমোদ ও খেলার যোগাড় করে দেবো, এদের পচাই খাওয়ার নেশা ক্রমে ক্রমে কমিয়ে দেবো। বনের পশুকেও শেখালে তার হিংস্রত্ব দূর হয়, মানুষের হবে না ? নিশ্চয় হবে ! আমিও ওদের সঙ্গে হাসবো খেলবো,—

অরুণের চিন্তার শেষ হইতে না হইতে চিন্তায় বাধা পড়িল। হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। অরুণ শঙ্কা ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিল, তাহার চোখ হইতে আগন্তুকের হাত খসিয়া গেল। চোখের আঁধার কাটিয়া গেলে অরুণ পশ্চাদ্দিকে যাহা দেখিল, তাহা বোধ হয় জীবনেও সে কখন ভুলিবে না। সে দেখিল, উজ্জ্বল দিবালোকে দাঁড়াইয়া অপরূপ রমণীমূর্ত্তি। সে রমণী কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে উপনীত। তাহার বিস্ফারিত নয়নদুটী দিয়া অপূর্ব্ব তেজোময় জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। রমণী উচ্চ শ্যামাঙ্গী, কিন্তু অপূর্ব্ব সুন্দরী ;—রমণীর মারাটী স্ত্রীলোকের মত বেশভূষা ; তাহার অঙ্গে রঙ্গিন কুর্ত্তা, রঙ্গিন সাড়ী ও কাছা-আঁটা (বাঙ্গালার চক্ষে বিসদৃশ ঠেকিলেও তাহার দেহলালিত্যে মানাইয়া গিয়াছিল), নয়নদুটী কজ্জলরেখাঙ্কিত, কপালে সিন্দুরের টিপ, ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি বেণী-সংবদ্ধ হইয়া ভুজঙ্গীর মত পৃষ্ঠ-দোদুল্যমান, বিম্বফলের ঈষদ্রক্তিম বিম্বফল তুল্য অধরোষ্ঠের মধ্য দিয়া দাড়িম্ব-বীজের মত দশনপাতি শোভমান।

বালিকাও সবিস্ময়ে অরুণের দিকে চাহিয়াছিল। ক্ষণেক পরস্পর এইরূপে নিমগ্ন হইয়া থাকিবার পর অরুণ লজ্জিত হইয়া দৃষ্টি অবনত করিল। নীরবতা কঠোর হইতে কঠোরতর অনুভূত হইতেছিল, বিশেষতঃ অরুণ এই অবস্থায় পড়িয়া বড়ই অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। তাই অরুণ হিন্দী ভাষায় সেই অপরিচিতা অদৃষ্টপূর্ব্বা রমণীকে তাহার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করিল। রমণী কোনও উত্তর না দিয়া একই ভাবে তাহার মুখপানে তাকাইয়া রহিল। অরুণ ভাবিল, রমণী তাহার কথা বুঝিতে পারিল না ; হয়ত' সেই মারাটী মহিলা মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কিছুই জানে না। তাই সে আকারে ইঙ্গিতে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিল। অরুণের সেই অপরূপ অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া সেই রমণীর মুখের কোণে হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিয়া রমণী ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া খিল খিল রবে হাসিয়া উঠিল। অরুণও তাহার হাসি দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। তখন এই সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষ ও রমণীর মধ্যে খুব এক চোট হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। যখন উভয়ে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইল, তখন অরুণ আপন মনে মাতৃ-ভাষাতেই বলিয়া উঠিল, "অভিনয় করলুম মন্দ নয়। এই জন্যেই কেনেডি সাহেব বলেন, আমাদের এই ভাষার গোলমালে ভারতবাসীর মধ্যে কখনও একতা হবে না।"

বালিকা এইবার কথা কহিল। অরুণ তাহার কথা শুনিয়া একেবারে চমকিত হইয়া উঠিল। অরুণ সবিস্ময়ে শুনিল, মারাঠী বালিকা পরিষ্কার বাঙ্গলায় বলিতেছে, "ওঃ আপনিই বুঝি কলকাতার বড় আফিস থেকে এসেছেন? আপনার কথাই আমি ছিরুপড়ে শুনে এসেছিলুম। তা, আপনার এরকম বেশ কেন?"

অরুণ অবাক! এমন বিশুদ্ধ বাঙ্গলা উচ্চারণ মারাঠী বালিকার মুখে কিরূপে সম্ভবপর হইল, অরুণ কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। বালিকা অরুণের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আপনিই বলিল, "আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন আমার বাঙ্গলা শুনে? কিন্তু এতে আশ্চর্য্যের কারণ নেই। আমার জন্ম বাঙ্গলা দেশে, বাঙ্গলা দেশেই আমি মানুষ হয়েছি, বাঙ্গালীর সঙ্গেই আমাদের মেশামিশি।"

অরুণ উত্তরোত্তর বিস্মিত হইয়া বলিল, "আপনি কে? আপনি কি কোঠারে মহাশয়ের মেয়ে?"

বালিকা বলিল, "হাঁ আমি তাঁর মেয়ে—আমি মৈথিলী।"

অরুণ হাসিয়া বলিল, "মৈথিলী? কি সুন্দর নাম! আমার কথা ছিরুপড়ে কার কাছে শুনলেন?"

মৈথিলী লজ্জিত হইয়া মুখ নামাইল। অরুণ বুঝিল, বলিল, "ওঃ বুঝেছি, বিনায়কের কাছে বুঝি? সে আপনাদের আনতে গিয়েছিলো না? আপনারা কখন এলেন? পথে কোনও কষ্ট হয়নি ত'?"

"না, কোন কষ্ট হয়নি; বেলা দশটার পর পৌঁছেছি। আপনার সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল, এমন সুখে আমরা আগের বারে আসতে পারিনি—"

"ওঃ, তখন সবে নতুন এসেছিলেন, তখন সব এলোমেলো ছিল, তাই অসুবিধে হয়েছিল।"

"আর এখন? এখানে এ কয়দিনে কি করে ফেলেছেন? যা শুনেছিলুম এসে দেখলুম সব সত্যি—আপনার কি অদ্ভুত ক্ষমতা—"

"ওঃ, বিনায়ক কি গল্পই বানাতে পারে! যাক্, আপনি তো এখানে তাকেই খুঁজতে এসেছিলেন, এ চাবিগাটায় সে আছে বটে।"

"এতক্ষণে আমাদের রান্নাবান্না শেষ হয়ে গেল। তাই মা ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। আপনাকে দূর থেকে মারাঠী পোষাক দেখে বিনায়ক বলে মনে করেছিলুম।"

অরুণ হাসিয়া বলিল, "তা, বিনায়ক না হই, আমি রুণদা বটে।"

"আপনার নাম রুণ? তবে যে শুনেছিলুম অরুণ বাবু?"

"ঐ হ'ল, যেমন বিনায়কে থেকে বিনু, তেমনই অরুণ থেকে রুণ!" উত্তরে হো: হো: হাসিয়া উঠিল।

মৈথিলী হাসিতে হাসিতে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "আপনি যদি এখন থেকে যথার্থই আমার রুণদা হন, তা হলে বলুন আমার ছোট বোনটীর মত মৈথিলী বলে ডাকবেন, আর পরের মত আপনি মশাই করবেন না?"

অরুণ মহা সন্তুষ্ট হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাই হবে, আমি তোমায় মৈথিলী বলেই ডাকবো। কিন্তু তুমিও তোমার রুণদাকে পরের মত আপনি মশাই করতে পাবে না। যখনই তুমি আমায় আপনি মশাই করবে, তখনই আমিও তোমায় ফিরিয়ে "আপনি মশাই করবো, মনে থাকে যেন।"

এই মিথ্যা-শঠতা-প্রবঞ্চনাময় সংসারে ভ্রাতা-ভগিনীর অকৃত্রিম স্নেহ কি মধুর! অরুণের জীবনে এইটীর বড় অভাব ছিল। একেই বাল্যে সে মাতৃহীন, তাই একটু বড় হইলে তাহার মনটা রমণী-স্নেহের অভাব বড়ই অনুভব করিত। বাল্যে অনিলা ভগিনী-স্নেহ দানে কতক পরিমাণে তাহার এই অভাব পূর্ণ করিয়াছিল, কিন্তু কিছুদিন হইতে তাহাদের পরস্পরের প্রতি ভাব পরিবর্ত্তনে সে অভাবটা অরুণের মনে নূতন করিয়া জাগিয়া

উঠিয়াছিল। এক্ষণে বিদেশে বন্ধুবান্ধবহীন স্থানে স্নেহহীন কর্কশ কঠোর জীবনে এই বিদেশী বিজাতীয় বালিকার অযাচিত অমূল্য ভগিনী-স্নেহ দানের প্রতিক্রিয়া অরুণের পক্ষে যেন শাহারার মাঝে ওয়েসিসের মত প্রতিভাত হইল। সে কৃতজ্ঞ নয়নে মৈথিলীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

মৈথিলীও পরম তৃপ্তি পাইল। একেই সে পূর্ব্বে অরুণের নানা গুণের কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। এখন আবার অরুণের সুন্দর রূপে ও মধুর আলাপে স্বতঃই তাহার মন অরুণের প্রতি আকৃষ্ট হইল। বস্তুতঃ সে তাহাকে বড় ভাইটীর মতই দেখিতে লাগিল। প্রকাশ্যে বলিল, "না, তা কোরবো না। তোমায় কণদার মতই দেখবো। আচ্ছা কণদা, তুমি এই ভাল মানুষটী, তুমি কি করে সেই রাক্ষস মোরেটাকে লড়াই করে হারালে?"

অরুণ লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "দিনাথকে ডাকবে না? খাবার দাবার হয়ত শুকুচ্ছে। চল তাকে খুঁজে নিয়ে যাই, সে হয় ত আবার খুঁজতে আমার বাসায় গেছে।"

"তুমি যাও কণদা, গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিও, আমি রুনু, ম. হয়ত' খাবার নিয়ে বসে আছে। দেখি, কি মাছ ধরেছ? ওমা, ভাঁড়ে মা ভবানী!" উত্তরে আবার হো হো হাসিয়া উঠিল। অরুণ বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, সন্ধ্যের সময় দেখিয়ে যাব'খন কি মাছ ধরেছি, তখন কত তামাসা করবে দেখা যাবে।"

মৈথিলী হাসিতে হাসিতে বেণী দোলাইয়া বনকুরঙ্গীর মত ছুটিয়া চলিয়া গেল; স্থানটার সিত শুভ্র রজতধারার মত অফুরন্ত হাসির অন্তর্ধান করিয়া যেন সাত সমুদ্রের অন্ধকার দেখা দিল। অরুণ সস্নেহে তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। স্বতঃই তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটী দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইল। এই দূর দেশে অবিহিত কঠোরতার মাঝে হঠাৎ দেবতার দানের মত এই নারী-হৃদয়ের স্নেহ-কোমলতার আবির্ভাবে তাহার মনোরাজ্যে ভাবতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছিল। সে কি মৈথিলীকে দেখিয়া, মৈথিলীর কথা শুনিয়া আর একটী কিশোরীর সান্নিধ্য অনুভব করিতেছিল? কিন্তু সে ত তাহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, অহরহ সে ত' তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াই আছে।

সরলা চিন্তাশূন্যা মৈথিলী দ্রুতপাদবিক্ষেপে তাহাদের বাসাবাটীর উদ্দেশে অগ্রসর হইতেছিল। কারখানার সন্নিকটে সে একটা ঝোপের আড়ালে থমকিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, মোরে একটা বৃক্ষকাণ্ডের উপর বসিয়া তাহার এক আধর জাতের সহিত অতি সন্তর্পণে চুপি চুপি কথা কহিতেছে। কথা কহিবার সময় তাহার কদর্য্য মুখে চোখে অপরূপ ভাবাভিব্যক্তি হইতেছিল। সে যখন হস্তে হস্ত নিষ্পেষিত করিয়া, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ভীষণ ক্রোধের সহিত কথা কহিতেছিল, তখন তাহাকে হিংস্র বাঘের মত দেখাইতেছিল। আবার যখন কুটিল ক্রূর দৃষ্টিতে চাহিয়া কথা বলিতে বলিতে বীভৎস হাসি হাসিতেছিল, তখন তাহাকে যেন শয়তান বিষধর সর্পের মত দেখাইতেছিল।

মৈথিলী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে সব কথা শুনা যাইতেছিল না। তবে মাঝে মাঝে সে দুই একটা কথা যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার আকাশের মুক্ত বিহঙ্গের মত চিন্তাশূন্য মনে চিন্তার রেখা পড়িল। "বড় আফিসের বাবু", "বাঙ্গালী বাবু", "কোঠারে", "চেনা গাসঙ্গ", "সুধাংশুবাবু", —প্রভৃতি কয়টী নাম মোরের মুখে উচ্চারিত হইল। "কোঠারের মেড়কী" কথাটাও মৈথিলী স্পষ্ট শুনিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল। যে দুই দশ দিন তাহারা প্রথমে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিল, তাহাতেই সে মোরের শয়তানি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া গিয়াছিল। সে তাহার জঘন্য কদর্য্য স্বভাবের কথা জানিত,

এবং তাহার চোখের চাহনি ও হাবভাবেও সে তাহার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিল। তাই এখন রাক্ষস আবরটার সঙ্গে তাহার এই ভাবের গুপ্ত পরামর্শের কথা শুনিয়া সে চিন্তিত হইল। সে মোহের দৃষ্টি এড়াইয়া ঘুরিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল বটে, কিন্তু তাহার সুন্দর হাসি হাসি মুখখানি চিন্তাশূন্য হইতে পারিল না।

(ক্রমশঃ)

সংস্কার ও বহিষ্কার

(গল্প)

(শ্রীহেমন্তকুমার সরকার)

১

এখন সে কায়স্থ হয়েছে - দুদিন পরে হয়তো বা কুলীন ব্রাহ্মণই হ'য়ে যাবে, কেন না ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ করাতে তার না হোক তার ছেলেপিলের গায়ে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের higher dilution-এর অনুপাতে ব্রাহ্মণের রক্ত ছিল—কারণ বঙ্কিমের দিদিশাশুড়ী কোন্ খোটা ব্রাহ্মণের স্ত্রী ছিলেন। কৌলিন্যের সঙ্গে কাহনের এত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ—যে পৃথিবীর কোনও সমাজ সে বন্ধনে বাধা দিতে পারে নি। এ ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যতিক্রম হয় নি।

তিলির ছেলে—গোরুর পিঠে ছালা দিয়ে হাটে গিয়ে পয়সা লুঠে এনেছে ;—বঙ্কিমের ঠাকুরদার নাম ছিল কেষ্টা তেলি—এ তো বামুন কায়েত নয়—বুদ্ধিমান জাত,—ইংরেজের পা না চেটে জাতব্যবসাই বজায় রেখেছিল। বঙ্কিমের বাবা কিন্তু দু'কলম ইংরিজি ঘোরত ক'রে গ্রামের পোষ্ট মাষ্টারি করতো। অর্থের অভাব ছিল তা নয়—তবুও পাড়াগাঁয়ের সর্ব্বোচ্চ সরকারী চাকরীর ইজ্জতের খাতিরে তিনি এই হীনতার গৌরবের লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। লোকে জিজ্ঞাসা করলেই তিনি কায়স্থ ব'লেই নিজেকে পরিচয় দিতেন। বাংলাদেশের কায়স্থ—সমাজ যেন ধাপার মাঠ—সমাজের যত আবর্জ্জনার স্থান ওখানে ;—তবে তাতেই জমি সারালো হয়। তাই কায়স্থ সমাজ এত উন্নতিশীল। লোকে দুর্নাম করে যে বঙ্কিমের বাবা সত্যিই নাকি গ্রামের জমিদার কায়স্থ বংশের সঙ্গে রক্ত সম্বন্ধে যুক্ত। যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র পাল যখন বিলাতফেরত হ'য়ে এলেন—তখন সমাজে কেউ কায়স্থ বলে তো স্বীকার করলোই না—উপরন্তু বিলাত যাওয়ার জন্য তাঁকে সকলে একঘরে করলো।

২

বঙ্কিম পৈতৃক সম্পত্তির জোরে কলকাতায় এসে বসবাস করলেন। তাঁদের পাশের বাড়ীতে মেয়েরা টেনিস খেলতো—টেনিসের জালখানায় শুধু বলই বাধতো এমন নয়—আশা ছিল দু একটা ছেলেও বাধবে। ভাল ছেলে আর পাওয়া যায় না অথচ মিসেস রায়ের ইচ্ছা তাঁর 'সুন্দরী সুশিক্ষিতা' মেয়েকে একটি সুন্দর সুশিক্ষিত ছেলের হাতে দেন। কিন্তু ভাল ছেলে গুলোর কি যে দৃষ্টি ছিল, তারা কিছুতেই মিসেস রায়ের কন্যারত্নটির টেনিস খেলার প্রশংসা ছাড়া আর কোন প্রশংসা করতো না। আর একটা কথা তারা বুঝতো, শুধু টেনিস খেলোয়াড় নিয়ে সংসার চালানো মুস্কিল হয়। কত ফ্রেঞ্চ পালিশ, হার মানলো, কত দামী পোষাকের দাবখান দিয়ে রূপকে উঁকি মারতে

অবকাশ দেওয়া হ'লো—কিন্তু উদ্দেশ্য আর সিদ্ধি হয় না। অবশেষে এই রূপের সমস্যার সমাধান মত আকার তুলা রূপবান বঙ্কিমচন্দ্র পাল মহাশয় প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়লেন।

৩

মিঃ রায় গবর্মেণ্টের মস্ত বড় চাকুরে—নিজে বিলেতফেরত, বাড়ীর কুকুরটা বেড়ালটাকে পর্য্যন্ত একবার স্বর্গ বিলেতে ঘুরিয়ে এনেছেন। বঙ্কিমের ভেতর পিতার ইচ্ছাটা একটু বর্ত্তমান ছিল। ব্যারিষ্টারি পাশ ক'রে এসে প্র্যাকটিসের কোনও সুবিধা না দেখায় সে ভাবলো যে এই বিবাহটা হ'লে তার মুন্সেফি একটা নিশ্চয়ই জুটে যাবে। হ'লোও তাই।

মুন্সিফ থেকে বঙ্কিম এখন হাইকোর্টের জজ হয়েছে। সে আগেকার বন্ধুদের চিনতে পারে না—আত্মীয়-স্বজনদের তো আমলই দেয় না; ব্রাহ্মমতে বিয়ে ক'রে থাকলেও নিজের মেয়ের বিয়ের সময় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে—

"Wanted a liberal Kayastha bridegroom for the only daughter of a high government official. No Dowry. A house, a motor car and a decent monthly allowance will only be given."

"একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর একমাত্র কন্যার জন্য একটি গোঁড়ামিহীন কায়স্থ ছেলে চাই। বরপণ কিছু দেওয়া হইবে না। একটি বাড়ী, একখানি মোটর গাড়ী আর উপযুক্ত মাসহারা মাত্র দেওয়া হইবে।"

৪

নরু সেই যে বিলেতে গিয়েছে—আর ফেরবার নামটি করে না—সেখানে গিয়ে পরের কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে টাকা ধার করে—আর প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ডুব দিয়ে জল খেতে গিয়ে একবার গলায় টাকরা মাছ বেধে গেল। Maria নামে একটি মেয়ে আদালতের আশ্রয় নেবার যোগাড় করেছে, এমন সময় এক টেলিগ্রাম উপস্থিত—

"Dowry more than a lakh in cash and kind come back by the next mail."

"Mother"

—"নগদে সম্পত্তিতে লাখ টাকার উপর পণ—পরের মেলেই চ'লে এসো"

"মা"

টেলিগ্রাম পেয়েই নরু লাফিয়ে উঠ্‌লো। মায়ের আজ্ঞায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ষাকালের নদী রাতে পার হয়েছিলেন নরুর আটবছরের রুদ্ধ মাতৃ-ভক্তি সোডাওয়াটারের বোতলের গ্যাসের মত খুলে গেল, আর সে ভাঙাবোতলের গুলির মত ছিটকে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে কালা আদমির দেশ ভারতে এসে পড়লো।

(৫)

সে আসবার আগে মিঃ পালের বিলেত থাকার ইতিহাস সব শুনেছিল—মিস্ রবার্টসন আজ বুড়ো বয়সেও পালকে ভুলতে পারেন নি। তাই একখানা কার্ড নরুর হাতে পাঠিয়ে দিলেন পালকে দেবার জন্যে—যদি সে একটি লাইন লেখে। কার্ডখানিতে ছিল—

Miss Robertson

729, University Avenue, Cambridge.

"মিস রবার্টসন, ১২৯নং ইউনিভারসিটি এভিনিউ কেম্ব্রিজ।"

নরু এসেই প্রেমে প'ড়ে গেল—যাকে বলে love at first sight প্রথম দেখাতেই ভালবাসা। রোমিও জুলিয়েতের অভিনয় সে অনেকবার বিলেতে দেখেছে—এইবার নিজের জীবনে অভিনয় আরম্ভ করলো। ছেলের রং কটা এবং বিলেতের ডিগ্রী আছে শুনে মিসেস পাল তখনই engagement (বাগ্‌দান) শেষ করলেন। এদিকে মিঃ পাল মিস্ রবার্টসনের

কার্ডখানি পেয়ে বেশী কিছু বলেন না। নরু দেখলো মিসেস পাল মিঃ পালের একরকম অমতেই সব সারলেন। পাল সাহেব যেন একটু ভয় খেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বুদ্ধিমানের মত চুপ করেই গেলেন। বিয়েটা তো হ'য়ে গেল। মিস পাল যাকে চেয়েছিলেন তার সঙ্গে পর জন্মে মিলিত হবেন —এই মনে ক'রেই উতলা প্রবল শান্ত করলেন।

কিছুদিন পরে মদ খেয়ে এপোপ্লেক্সি রোগে নরু মারা গেল। বছর খানেক পরে নরুর স্ত্রীর যে সব লক্ষণ দেখা দিল, তাতে নরুর বৌদি ভীত হ'য়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বিধবা-বিবাহের আয়োজন হ'ল। সমাজ সংস্কারের সাহসিকতায় নরুর দাদা উৎপল বাবুর নামে ব্রাহ্ম সমাজে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

(৬)

ছেলেটি এখন বড় হয়েছে। উৎপলের সন্তান আর তার চেহারার মধ্যে একটু যদি তফাৎ থাকে! এই সাদৃশ্য নিয়ে নানান্ জনে নানান্ কথা বলে— কিন্তু সত্যটা শুধু অন্তর্যামীই জান্‌লেন—সমাজের মাথার সাস্কারক ব'লেই উৎপলের আসন কিন্তু অটলই থাক্‌লো। মিস পাল যাকে কৈশোরে হৃদয়ের দেবতা ব'লে বরণ করেছিলেন —সেই যুবক-টির ঘাড়ে সমস্ত কলঙ্ক চাপিয়ে উৎপল বাবু সমাজ থেকে তাকে বহিষ্কৃত ক'রে দিলেন।

বাঁশীর বিষ

(শ্রীকালিদাস রায় বি, এ, কবিশেখর)

ঐ কিশোরের বাঁশরীর স্বর বিঁধল আমায়
সর হতে।
উড়াল মোর লজ্জাভরম নিশাস উহার
ঝড় হয়ে॥
সেই হতে সই ঘর ছেড়েছি
আপন জনে পর করেছি,
তারেই শুধু চুঁড়ে বেড়াই হৃদয়ে অন-
ন্তর হয়ে॥
হারান লাজ কে ফিরাবে যে উড়াল
সে বিনা?
খোঁয়টা আমার পাইনা খুঁজে হইছি পাগল
জ্ঞানহীনা।
সর্ব্বনেশে শ্বাস বায়ু তার
বুকে চেপে ধরব এবার
ঘুরছে আমার দৃষ্টিশ্রুতি তারি খোঁজে
চর হয়ে॥
স্বর যে তাহার বিষ মাখানো পরাণ জলে'
যায় বিষে,
বিষের ওষুধ বিষ না শুনি? এ বিষজ্বালা
যায় কিসে?
দংশিল যে সাপ হয়ে,' সই,—
ওঝাও কে মোর হবে সে বই?
ভাব্‌ছি তবে আস্‌বে সে ব্যাধ এবার ভিষক-
বর হয়ে॥

পূজার ডায়েরী

(গল্প)

[শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়]

কলিকাতা।

ঘোড়ার আস্তাবলের পাশে এক জীর্ণ কুটির।

ষষ্ঠী :—

সারাটা দিন ধরে' বৃষ্টির ঝম্‌ঝমানি !—আশ্বিনের আঙ্গিনায় সে যেন কোন্ ক্যাপা শ্রাবণের প্রলয়োল্লাস বেধে গেছে !

জলো হাওয়ার সঙ্গে, বাদল বরিষণের সুরে সুরে আমার প্রাণে এ কি নিবিড় ব্যথা ঘনিয়ে আস্‌ছে ! এ গৃহহীন পথহারা পথিকের বুকের অতল তলে চাপা কোন্ হারা-মায়ের ঘরা-মুখের প্রতিচ্ছবি আজ আকাশে-বাতাসে ভেসে উঠ্‌ছে ! অশ্রুর বারিধারার উছল কলরোল ভেদ করে' এ কার বহুকালের শোনা কণ্ঠের বাণী আমার এই চির-তৃষাতুর কাঙাল পরাণপুটে আছাড়ি পাছাড়ি খেয়ে কাঁদরিয়ে উঠ্‌ছে,—এ সবুজ স্নেহের শোপন হাত-ছানি কোথায় টেনে' নিয়ে যেতে চায় এ হতভাগা ছন্নছাড়াকে ? সে কোন্ শরৎ-সেফালি-সুরভিত পল্লীবাটের ধানের ক্ষেতের বাঁকা পথে ?.....

সংসারের শেষ বন্ধন-গ্রন্থিটিও যে দিন থেকে শিথিল হয়ে গেছে, সেইদিন থেকেই তো চোখের জলে আমার সে পল্লী-মায়ের কাছ থেকে' চিরবিদায় নিয়ে এসেছি ;—সে তো বহুদিনের কথা ! তাই আজ আমার কাঁটা-বেঁধা বুকের অফুরন্ত বেদনার টন্‌টনানি প্রাণপণে দু হাতে চেপে ধরে' শুধুই মনে হচ্ছে, —'চোখের জলে যারে বিদায় দিয়েছ মা, আজ আবার কিসের ছলে তাকে ফিরিয়ে নিতে চাও ?' সেখানে তো কোন ব্যাকুল হৃদয় আজ তার কালো চোখের করুণ কামনা নিয়ে আমার আগমন প্রতীক্ষায় অস্থির হয়ে ছুটোছুটি কর্‌ছে না,—এ অনাথের মাথা রাখ্‌বার মত ঠাঁই, সেখানে তো কারও কোলেই হবে না ; তবে কেন এ উদগ্র আকাঙ্খা আমার প্রাণে জাগিয়ে দিলি ? .....

যে ক' বিঘে জমি, পিতা আমার মরা করে' রেখে গিয়েছিলেন, সে তো পিতৃশ্রাদ্ধের ঋণের দায়ে বহুদিন আগে জমিদারের দখলে চলে গেছে,—গাঁয় যে পোড়ো ভিটেটুকুর মায়া পরিত্যাগ করে' গ্রাম ছেড়ে' চলে' এসেছি, সেটুকুও হয় তো গিয়ে দেখ্‌ব, শাঙড়া, আঁকড়, আর চিড়্‌চিড়ির ঝোঁপ-জঙ্গলে ভরে গেছে ; নয় তো সেখানে জমিদারের নূতন কোন প্রজার বসতবাটি বানানো হয়েছে। .....তা হোক্, তাহ'লেও কি তার সমস্ত স্মৃতি মন থেকে' মুছে' ফেল্‌তে পেরেছি ? ছেলে বেলা থেকে যে সব বন্ধু-বান্ধব, গ্রাম্য সম্পর্কের যে সব আত্মীয়-প্রতিবেশীর সাথে আমার জীবনের প্রথম পরিচয় হয়েছিল, তাদের কেউ কেউ এ জগত থেকে' হয় তো চিরবিদায় নিয়ে চলে গেছে, কেউ বা আমায় দেখ্‌লে এখন হয় তো চিন্‌তেই পার্‌বে না ! এমনি সব নানান্ স্মৃতিবিজড়িত পরিচিত-অপরিচিতের মধ্যে এক জনের স্মৃতি আমি মন থেকে এখনও বিদায় দিতে পারি নি ! যে অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত পুষ্পের অম্লান সুরভি অন্তরের মর্ম্মস্থলে গুপ্তধনের মতই লুকানো আছে, তার তো কাঙাল বাতাসে উড়ে যাবার ভয় নেই ! হয় তো শেষের দিনে, সে কোন্ নীরব-নিস্তব্ধ বাদল-রাতের অন্ধ-কারে বিজলী-হানা খেয়া-ঘাটের পারে দাঁড়িয়ে আমার সারা জীবনের সঞ্চিত গোপন-বার্ত্তা, মৃত্যু-

দেহভার তখন হতে তুলে' দিতে যাব,—তার আগে নয়!

সেই কথাটাই বলি।—

শৈশব-জীবনের যাতায়াত উল্টে দেখ্‌তে গেলে নজরে পড়ে,—নানান্ অর্থহীন হিজিবিজির মাঝে একটা পাতা শুধু উজ্জ্বল ভাবে লেখা হয়ে গেছে। তার আগেকার দুর্বোধ্য হিজিবিজির মাঝেও একটা সুষমা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু তার পরের যা-কিছু-সব কেমন যেন বিসদৃশ—এলোমেলো ভাবের! একটা মাদকতা-ভরা বেদনার সৃষ্টি করে বলে,' সে রক্ত-আখরে লেখা পত্রখানি, প্রাণপণ চেষ্টায় গোপনতম স্থানে লুকিয়ে রাখ্‌তে চাইলেও যে আমায় লুকিয়ে রাখা হয় না!

…সে এক রোদ্-সোহাগী পৌষ-প্রাতে ধানের ক্ষেতে তার সাথে আমার প্রথম দেখা-শুনা! তার আগেও হয়তো কতবার কত বাদল-ভীত আকাশের নীচে, কত নিদাঘ তপ্ত মধ্যাহ্নে, কত বাসন্তী প্রভাতে তাকে আমি দেখেছি, কিন্তু এমন করে' সন্ধি-ক্ষণের দেখা কোনদিনই হয় নি। তখন ক্ষেতে ক্ষেতে ধানকাটার উৎসব লেগে গেছে। অতি প্রত্যূষে শীতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে চাষারা তামাক খাবার আগুনের খুঁদলো নিয়ে, গরুর গাড়ী হাঁকিয়ে মাঠে যেতো। ছেলেমেয়েরা আঁচলে মুড়ি বেঁধে' তাদের পিছনে ছুটতে ছুটতে নদীর কিনারে পাকা ধানের ক্ষেতে গিয়ে হাজির হতো! প্রভাতের মিষ্টি রোদের দিকে পিঠ পেতে নদীর বালিতে বসে' বসে' আমাদের মুড়ি খাওয়া চলতো। শিশির-ভেজা সবুজ ঘাসের উপর অরুণ-রবির শান্তোজ্জ্বল রশ্মি হাজার মুক্তার মত চিক্-চিক্ করে' উঠ্‌তো,—নদীর স্বচ্ছ ঝির্‌ঝিরে জলের ঢেউএ ঢেউএ বিজলীর চমক্ যেন খান্-খান্ হয়ে পড়্‌তো,—আর সেই সোণালী আভার ঝিলিমিলি গায়ে মেখে সিন্দুর-বরণ পাকা ধানের শরিষগুলি শীতের বাতাসে কেঁপে কেঁপে অবনত মস্তকে প্রভাত সূর্য্যকে তাদের শেষ-বিদায়ের অভিনন্দন জানাতো!…

এমনি এক তৃপ্তিভরা সুবর্ণোজ্জ্বল আনন্দ-প্রভাতে রাণীর সঙ্গে আমার পরিচয়! তার হাতের নখের ডগা দিয়ে ধানের শিষ্ ছিঁড়ে' ছিঁড়ে' সে বাঁ হাতে শুদ্ধ বাঁধ্‌ছিলো,—একটা দুষ্টু ছেলে হঠাৎ তার পিছন দিক থেকে' এসে' তার হাতের শিষ্-গুলো টেনে' ফেলে' দিয়ে ব'লে' উঠ্‌লো,—খবরদার রাণী, আমাদের মাঠে ধানের শিষ্ ছিঁড়্‌তে পাবি নে,—তুই নিজের মাঠে যা!

রাণী তার মুখের পানে একটিবার তাকিয়ে সরে' দাঁড়ালো। আমি ছিলুম একটু তফাতে দাঁড়িয়ে। আমার দিকে তার নজর পড়্‌তেই, অভিমানভরা ঠোঁট দুটি একটু কেঁপে উঠ্‌লো, তারপর ফিক্ করে একবার হেসে' হাতের বাকী ধানের শিষ্‌গুলি দূরে ছুঁড়ে' ফেলে দিলে। ছেলেটা তখন চলে' গেছে।

…সে কি দেখেছিলুম?—রাঙা রবির প্রথম কিরণের মতই সেই একটুখানি সলজ্জ হাসির মধ্যে কি যে দেখেছিলুম, তা-ভাষা দিয়ে বোঝানো যাবে না। তার পর এই এতকালের মধ্যে কত বিনিদ্র রজনী শুধু সেই কথা ভেবেই অতিবাহিত করেছি,—ভাষার সমুদ্র মন্থন ক'রেও তো এমন কোন শব্দ-সম্পদের সন্ধান মেলে নি, যার দ্বারা এক আমি ছাড়া আর কাউকে সে সৌন্দর্য্যের যথাযথ অর্থ বোঝানো যায়! তার দুটি কাজল-কালো হরিণ-চোখের সেই নিবিড় চাহনির দিকে কতক্ষণ চেয়েছিলুম জানি না'—কানের দুটি দুলের পাথর, দীপালিকার মত চিক্‌মিক্ করে' উঠ্‌লো।…কাছে গিয়ে বললুম—আমি তোকে ধানের শিষ্ ছিঁড়ে' দেব,—আয়!

সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে,—না।…

ধানের শিষ্ ছিঁড়ে সঞ্চয় করবার লোভ যেন তার মোটেই ছিল না—সে শুধু চাইছিল একটুখানি নিছক্ আনন্দ।

তারপর, তার সাথে আমার কতবার কতরকমে দেখা-শুনা হয়েছে—কত কথা। সে কত খেলার কথা, হাসির কথা, গানের কথা! কত অভিমান, কত ক্রন্দন, কত অত্যাচার! সবই মনে আছে। এখনও সেগুলি বায়স্কোপের ছবির মতন আমার চোখের সুমুখে ভেসে' ওঠে। হয়তো দু'একটি ছোট-খাট কথা ভুলে গেছি,—ফুলের মত তারা হয়তো কোন্ পথের বাঁকে ঝরে' পড়েছে; তা ছাড়া, সবই আমি মালার মতন একটি একটি ক'রে আমার এই বুকের তলে গেঁথে রেখেছি। যাক্,—সে সব পুরাণো কথা একে একে বল্‌তে গেলে' বোধ হয় আজ সারাদিনেও শেষ করা যাবে না।

বছর চার পরে বাবার মৃত্যুর পর, তাঁর ঋণের দায়ে জমিগুলি চলে' গেল জমিদারের হাতে। মাতুলের দৃষ্ট এবং অন্যান্য হিতৈষী ব্যক্তির অনুরোধে সুপুত্রের মতই বসতবাটিটাও বন্ধক রেখে' পিতার শ্রাদ্ধাদি কর্‌তে হ'লো।

রাণী তখন বড় হয়েছে। আমাদের বাড়ীর দিকে বড় একটা আস্‌তো না।

একদিন ভাত রেঁধে' নিজেই কেন্ গড়াতে গিয়ে হাতটা পুড়ে গেল। গরমার হাঁড়িটা দূরে ফেলে' দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় রাণী এসে' একগাল হেসে' বল্‌লে,—ও সব কি বেটা ছেলের কাজ? যাও আমি গড়িয়ে দি।

বল্‌লুম,—কি কর্‌বো বল্, পেটের জ্বালা তো সইতে পারি না।

—কেন, একটা বিয়ে কর্‌লেই তো—!

একটু হেসে বল্‌লুম,—বিয়ে করি ত' তোকেই কর্‌বো মনে করেছি।

অন্য সময় হ'লে কথাটা শুনে হয়তো সে ছুটে পালিয়ে যেতো, নয় তো আমার মাথায় পিঠে দৌড়িয়ত দাড়ি দিয়ে দিত, কিন্তু সে তখন ভাতের হাঁড়ি নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত ছিল ব'লে, মাত্র একটা বাঁকা সলজ্জ কটাক্ষ হেনে' ঈষৎ রাগের হাসি হেসে' বল্‌লে,—যাও! কেন্ বল্‌বে তো আমি এখনি চলে যাব বল্‌ছি!

থালে ভাত সাজিয়ে আমায় খেতে দিয়ে রাণী বল্‌লে,—ও মা, এ আলু ভাতে ভাত কেমন করে' খাবে বল দিকিন্?

আমি চুপ করে' রইলুম। রাণী বল্‌লে, আমাদের বাড়ীতে খাবে? আজ বাবাকে বল্‌ব। ছি! তোমার এত কষ্ট!

ঘাড় নেড়ে' বল্‌লুম,—না!

আমার খাওয়া শেষ হলে রাণী চলে গেল।

ভাব্‌লুম, রাণীর এ স্নেহের অত্যাচার হয়ত আমায় সইতেই হবে। নিশ্চয়ই আমার এ কষ্টের কথা, সে তার বাবাকে বল্‌তে ছাড়্‌বে না।

পাঁচ ছ' দিন তার সঙ্গে আমার আর দেখাই হলো না! তার অসুখের আশঙ্কা ক'রে মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। সেদিন নিজেই তাদের বাড়ী গিয়ে দেখে আস্‌ব ভেবে' পথে বেরিয়েছি, এমন সময় দেখ্‌লুম, কল্‌সী কাঁখে রাণী পুকুরের দিকে চলেছে। কাছে গিয়ে বল্‌লুম,—আর যা'স্ নি যে রাণী?

রাণী একটু সচকিত হ'য়ে কেমন যেন করুণ দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে বল্‌লে,—বাবা বলেছে, তুমি আর আমার সঙ্গে কথা ক'ও না।

বুকটা মুহূর্ত্তের জন্যে কেঁপে' কেঁপে' থেমে' গেল। মনে হলো, কোথায় যেন একটা বীণের গিট্-দেওয়া শেষ তারটাও পট্ করে' ছিঁড়ে' টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল! প্রাণপণে দৌড়ে সেখান থেকে' পালিয়ে এলুম।

ঘরে এসেই প্রথমে হাঁড়ি-কল্‌সী যা কিছু ছিল, ভেঙ্গে চুরমার্ করে' দিলুম,—বিছানা পত্র টেনে' ছুঁড়ে' ফেলে দিয়ে চৌকাঠের উপর পরিশ্রান্ত হয়ে বসে' পড়্‌লুম। চোখ দিয়ে মনে হলো আগুন ঠিক্‌রে বেরোচ্ছে, হাতের কব্জি দুটো মনে হতে লাগ্‌লো লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে,—বুকখানা

পাথরের চেয়েও কঠিন। সমস্ত শরীরের প্রতি রক্ত-কণা পর্য্যন্ত উন্মাদ উন্মাদনায় অধির চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। এ কি অসুরের বল আমার শরীরে?

রাত্রির অন্ধকার তার সুপ্তিভরা মাদকতা নিয়ে এলো। আমি অপরাধীর মত অন্ধকারে গা ঢেকে' গ্রাম ছেড়ে' পথে বেরিয়ে পড়্‌লুম। কোথায় আমার পথের নিশানা,—কোথায় যাব, কিছুই জানি না! পথে পথে মন ফিরিয়ে নিজের-শের যাত্রা চিরবিদায় নিয়ে চলে' গেল সমস্ত বাধা-বন্ধন এড়িয়ে!

.....দশটি বছর আর সেখানে ফিরি নি। তেম্‌নি ঘর-ছাড়া জীবন নিয়ে ঘুরে' বেড়াচ্ছি কোন্ অজানার সন্ধানে! কোথায় এ পথ চলার শেষ নিজেই বুঝি না।

আজ আবার সেইখানেই ফিরে যাবার তরে প্রাণের ভিতরটা কেঁদে উঠ্‌ছে। হয়তো গিয়ে দেখ্‌ব—রাণীর বিবাহ হ'য়ে গেছে,—কত ছেলে-মেয়ে নিয়ে সে ঘরকন্না পেতেছে।

তবু আমাকে যেতেই হবে।

পল্লী-প্রান্তরের ষ্টেশনে

রাত্রি :—

...সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌ছে। এইখানে বসেই আমার আজকার ডায়েরীটা শেষ ক'রে নি।

ফিরে এসেছি,—আবার সেই গ্রামেই ফিরে এসেছি। ষ্টেশন থেকে' শিশির-ভেজা ঘাসের পথে, সদ্যোবরণ নবীন ধানের মঞ্জরিভরা ধানের ক্ষেতের ধারে ধারে যখন আস্‌ছিলুম, তখন আমার পা দুটো যেন কিসের সঙ্কোচে কেবলই জড়িয়ে যাচ্ছিল,—কে যেন আমার হাতের ইসারায় কেবলই জানাচ্ছিল ফিরে' চল্,—ওরে হতভাগা পথিক, ফিরে' চল্।

নদীর কিনারে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো! এ বুঝি মায়ের বোধন-মঙ্গল! ধানের ক্ষেতের মাঝে মাঝে সরু রাস্তার ধারে' কয়েকটা ছেলের মাথা দেখা যাচ্ছিল,—তারা হল্লা করে' বাড়ী ফিরছে!

ওই,—ওই, গ্রাম থেকে শাঁক বেজে উঠ্‌লো না? ওই যে সব চেয়ে জোরে যে শাঁকটা বাজ্‌ছে, সেটা বোধ হয় রাণীর ছুটি কচি কিশলয়ের মতন রাঙা ঠোঁটের চুম্বন পেয়ে'!—না, না,—এই! তার চিন্তাও যে পাপ! আর! চোখ বেয়ে দুফোঁটা অশ্রু অনাহূতের মতই গড়িয়ে পড়্‌লো!

নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়াতেই, অজিত আমায় চিন্‌তে পার্‌লে।—'এই প্রশান্ত, তুই যে রে? এ যে চিন্‌তে পারাই যায়! বাঃ! আমাদের কি এম্‌নি করেই ছেড়ে যেতে হয়?—বেশ, বেশ, চল্—

তারই বাড়ীতে আশ্রয় নিলুম। শুন্‌লুম, সে বি, এ, পাশ ক'রে কোন্ এক গ্রামে চল্লিশ টাকার স্কুল মাষ্টারি করে। বিয়ে তার অনেকদিনই হয়ে-ছিল। বাড়ী গিয়ে দেখ্‌লুম, পাঁচ ছ'টি ছেলে মেয়ে তার। লজ্জানম্র বধূবেশে যাকে দেখেছিলুম, তিনি দেখ্‌লুম, এখন ঘরের গিন্নি। আমার সাথে যেন কথাবার্ত্তা সুরু করে' দিলেন।

.....রাণীকে দেখ্‌তে পাই নি!—জিজ্ঞাসা করি করি ক'রেও সে খবরটা কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারি নি। কইতে না পারার প্রাণপোড়ানী জ্বালা বুকের তলা তলেই রইল। তাই থাক্! ওগো আমার নিভৃতের সাথী,—সেই খানেই থাকো!

কলকাতা ফিরবার মুখে,—ট্রেণ বিজয়া দশমী :—

...হাতটা শুধুই কেঁপে' কেঁপে' উঠ্‌ছে, কিছুই লিখ্‌তে পারছি না! আজ আবার কলকাতায় ফিরে' যাচ্ছি।...উঃ! কি বুকফাটা পিয়াস্! এ সময় একগ্লাস জলও পেলুম।

আজ ক'দিন ধরে' ডায়েরীর একটা পাতাও লেখা হয়নি!

..... নবমীর দিন বলি হচ্ছে। আমার অনুসন্ধিৎসু চোখ দুটো শুধুই এদিক ওদিক ঘুরে' বেড়াচ্ছিল, যদি কোন হতভাগীর ছটা কালো আঁখির চকিত চাহনির সাথে দেখা হয়! অজিত আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। মেয়েদের দলের উপর দৃষ্টি পড়্‌তেই হঠাৎ সে আমায় বলে' উঠ্‌লো,—ও যে শুনেছিস্,—রাণী মারা গেছে!

এঁ্যা!—কাণের পাশ দিয়ে হঠাৎ একটা বন্দুকের গুলি সাঁ করে' বেরিয়ে গেলে যেমন অবস্থা হয়, আমারও ঠিক তাই হলো!

সহসরে 'মা' 'মা' শব্দের সঙ্গে ঝপ্ ঝপ্ বলি হ'তে লাগ্‌লো!.....প্রতীমার মুখের পানে তাকিয়ে দেখ্‌লুম, উঃ, রক্তাম্বরধারিণী মা'র মুখে-চোখে সে কি রক্ত-লোলুপ দৃষ্টি! মাগো! বেটিও রক্ত চায়!

কেমন করে' দিনটা কেটে' গেল জানি না। দশমীর দিন কল্‌কাতা রওনা হলুম। পথের পাশেই রাণীদের বাড়ী! রাণীর বাবা মারা গেছেন,—বিধবা সে অনেক আগেই হয়েছিল, শুন্‌লুম নাকি সে একটি কচি মেয়ে রেখে' গেছে। কেমন যেন অন্যমনস্কভাবে তাদের ঘরে ঢুকে' পড়্‌লুম। দরজার একপাশে একটি চার পাঁচ বছরের মেয়ে দু'গাছি ভাঙা চুড়ি নিয়ে খেলা কর্‌ছিল। আকুল আগ্রহে খুকিকে বুকে জড়িয়ে ধর্‌তেই, আমাকে একান্ত আত্মীয় ভেবে' সে আমায় চুড়ি দু'গাছি দেখিয়ে আধ আধ ভাষায় বল্‌লে,—মাতেন্ চুড়ি!—হায় রে, চুড়ি পাল্টিতেও হয় তো এখনও তার হাতের পরশ লেগে' আছে! আমার কাছে সে নিষ্ঠুর চুড়ি যেন কতকালের কত কথা আর একখানা হারা মুখের ব্যথিত স্মৃতির আভাস জাগিয়ে দিয়ে গেল।

দেখ্‌লুম, তুলসীতলায় রাণীর মা, মাটির উঠানের উপর একজোড়া পদরেখা দেখ্‌ছেন আর কাঁদ্‌ছেন। রাণী হয় তো কোন্ এক ফাল্গুন-বর্ষণ সন্ধ্যায় ভিজে মাটির উঠানের উপর দাঁড়িয়ে তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়েছিল,—আজ শরতের রৌদ্রে উঠান শুকিয়ে গেছে, কিন্তু তার পায়ের দুটি চিহ্ন বেশ স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে' উঠেছে মৃতের বক্ষ স্মৃতি বুকে নিয়ে!...

ধীরে ধীরে সেখান থেকে' বেরিয়ে পথে এসে' দাঁড়ালুম। কোথাকার বুকুধালিকরা উদাস বায়ু কোন্ দিগন্তের পার হ'তে বয়ে এসে' আছাড় খেয়ে পড়্‌লো—পথের পাশে একটা শিউলি গাছের গায়ে। ঝর্ ঝর্ করে' একরাশ শিউলি ফুল মাটির উপর ঝরে' পড়্‌লো!

পুরাতন চিঠি

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমি এই খোলা নদীতে নির্জ্জন চরের মধ্যে এসে ভারি আরাম বোধ করছি। বেশ বুঝতে পারচি একজন আছেন যিনি আমাদের মনুষ্য বেষ্টনগুলোকেই ধীরে ধীরে সুদ্ধে বেঁধে তুলছেন—জীবনের বীণাটিকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দিলেই হল, আর কিছু নয়। নিজে এটাকে নিয়ে দুরন্ত ছেলের মত নাড়াচাড়া করতে গেলেই সমস্ত খোল-মাল করে ফেলি। আর তাঁর হাতে একেবারে তুলে দিতে পারলে কি আরাম! আজ আমার মনে হচ্ছে সমস্ত দিন রাত আকাশ যেন আমার ভার নিয়েছে—সূর্য্যালোকিত দিনগুলির প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন অতি নিঃশব্দে আমার শুশ্রূষা করছে। এই

আমার ঘর, আবার আপন ঘর, সুনীল সুন্দর সমুজ্জ্বল সহাস্য শান্তি, এই যে উদার বিস্তার, এই যে অবাধ আকাশ এই যে আপনাকে ভাঁজে ভাঁজে খুলে দিয়ে সম্পূর্ণ মেলে দেবার উদার প্রাঙ্গন। এমনি করে আপনাকে প্রতিদিন বাইরে মেলে দিতে পারলেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত গ্রন্থিগুলো খুলে আসতে থাকে আর আপনার মধ্যে মধ্যে সমস্ত জড়িয়ে জড়িয়ে রাখতে গেলেই কেবল জটার উপরে জট পড়ে যেতে থাকে—মনে হয় মৃত্যু এসে তার খাঁড়া দিয়ে ছিন্ন করে না দিলে শেষ পর্য্যন্ত গ্রন্থি যেন কিছুতেই সরল হবে না। কিন্তু সহজ রাস্তা সহজ উপায়ে একেবারেই হাতের কাছে পড়ে রয়েছে। ইতি ১৮ই কার্ত্তিক ১৩২৮।

শান্তি-নিকেতন,

কবীরের প্রেমসাধনা

(শ্রীক্ষিতিমোহন সেন)

প্রেমের যে সাধক তার খেলা যেমন সুন্দর তেমনই কঠিন। সতী যে আগুনে পুড়ে মরে, বীর যে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাও এই প্রেম সাধনার কাছে কিছুই নয়।

সাধকা খেলতো বিকট বেঁড়া সতী
সতী ঔর সূরকা চাল আগে।
সূর ঘমসান হৈ পলক দো চরকা
সতী ঘমসান পল এক লাগে।
সাধ সংগ্রাম হৈ রৈন দিন জূঝনা
দেহ পর্য্যন্তকা কাম ভাঈ॥

সাধকের খেলা তো ভীষণ রমণীয়, সতী আর সূরের খেলা এর কাছে কি? বীরের লড়াই তো দুইচার পলকের, সতীর প্রচণ্ড সাধনা তো একটি পলের মাত্র। হয় জয় হবে তাদের, নয় জয় হবে মৃত্যুর। কিন্তু সাধকের? রাত্রি দিন তার যুদ্ধ। সতীর মত আগুনের মধ্যে একবার ঝাঁপিয়ে পড়লেই এক পলে তার খেলা শেষ হয়ে যায় না। কামনা তৃষ্ণা যা কত রমণীয়, যা একেবারে আপনার সঙ্গে এক হয়ে গেছে তাও তাকে ক্ষয় করতে হয়। প্রতিদিন আপনাকে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত করবার এ বেদনা। এ যে সব আপনার অঙ্গের সামিল হয়ে গেছে। যতদিন একটি পরমাণুও থাকবে ততদিনই যুদ্ধ চলবে। বড় কঠিন এই লড়াই।

আপনাকে ক্ষয় করতে হবে অথচ সম্পূর্ণ ক্ষয় করলে চলবে না। তাহলে আর সাধনা হবে কাকে নিয়ে? সে তো সাধন নয় সে হলো নিধন।

"অমোয়া কোইলি ঘীসন রহনী
ঘীসত ঘীসত লাগা সুর"

শিশুরা আমের আঁটি যে বাজায় তারা ঘসে, আর বাজায়। ঘসতে ঘসতে যখন সুরটি বেরে উঠে তখন আর ঘসে না, আর ঘসলে বাজবে কি? সাধকও আপনার অসার কামনা প্রকৃতি ক্ষয় করে যখন প্রেমের সুরে বিশ্বের রাগিণীতে বেজে ওঠেন তখন তাঁর আর আত্মহত্যা করার দরকার হয় না।

এই কামকে ক্ষয় করে সেই প্রেমকে পেতে হবে বিশ্বের সুর যাতে বাজচে।

কামকে ক্ষয় করে প্রেমকে লাভ করা বড় কঠিন সাধনা। তা হোক পৃথিবীতে এসে যদি সেই প্রেম না পেলাম তবে হোল কি? আনন্দের সাগরে এসে যদি পিপাসায় মরবো এমন হয়, তবে পেলে কি? প্রেমরস যে ভরে আছে প্রতি শ্বাসে শ্বাসে পান কর।

"সুখ সাগরমে আনেক মত ভারে প্যালা।
নির্মল নীর ভরের হেরে আগে পীলে স্বাঁসো স্বাঁসা॥
মৃগতৃষ্ণা জল ছাড় বাহরে করো সুধারস আশা।
ধ্রু প্রহ্লাদ শুকদেব পিয়া ঔর পিয়া রৈদাসা॥
প্রেম কি মাত সদা মতবালা এক প্রেমকী আসা।
কহৈ কবীর সুনো ভাই সাধো মিট গঈ ভরকী বাসা॥

"অমৃতের সাগরে এসে পিপাসিত ফিরে যাস্‌নে। নির্মল সুধায় ভরে আছে এই সাগর। খানে খানে সেই পরমানন্দ রস পান কর্। পাগল হয়ে যে কামনার মৃগতৃষ্ণার পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছিস্, তা ছাড়্। অমৃতরসের তৃষ্ণা তোর জীবনে জেগে উঠুক্। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুকদেব, রবিদাস সবাই এই প্রেমরসই তো পান করেছেন। সাধকেরা এক এই প্রেমরসেই পিয়াসী, এতেই তাঁরা সদা মত্ত হয়ে আছেন।

কবীর বল্‌ছেন এই প্রেম-রস-সাগরের সন্ধান পেয়েছি বলে আমার সব ভয়ের বাসা ভেঙে গেছে! এই প্রেমকে জেনে আমি এখন নির্ভয় হয়েছি।"

এই প্রেম না পেলে মানব জীবনের মূল্যই বা কি! ভর্তৃহরি লিখেছেন "যে মানব-জন্ম পেয়ে তা শুধু খেয়ে দেয়েই শেষ করে তাকে কি বোল্‌বো? সে সোণার লাঙ্গল দিয়ে আকন্দফুলের চাষ করে গেল। সে বৈদূর্য্যরত্নভাণ্ডে চন্দনের কাঠ জ্বালিয়ে তিল সিদ্ধ কর্‌লে। কর্পূর খণ্ড করে কুয়ানোর ক্ষেতের বেড়া দিলে। মানবজন্ম পেয়ে শুধু এই ক্ষণস্থায়ী সুখ মাত্র আদায় কর্‌লে আর কিছুই না।"

এত বড় আত্মা যে পেলে তাতে করে কি? পরমাত্মাকে লাভ কর্‌বে না? যদি না লাভ করে থাক তবে বৃথা জন্ম তোমার। উপনিষদ বলেন "যে তাঁকে জেনে এই পৃথিবী থেকে চলে গেল সে ধন্য হয়ে গেল। যে তাঁকে না জেনেই চলে গেল, সে কৃপার পাত্র হয়ে গেল।"

সামান্য যশ, সামান্য মান, ধন, গৌরব, এই সবের জন্য এমন অমূল্য জীবন দুঁকে দিলাম! সেই পরম সত্যকে জানবার জন্য কিছুই করলাম না?

"যহ জীবরা অনমোল হৈ
ভরো কৌড়ীকা কেরা রে॥"

"হায়, অমূল্য এই জীবন, এক কড়ার দামের জন্য ইহা বাজি রেখেছি।"

আমি তোমার সঙ্গে প্রেমের খেলায় দান খেলতে বসেছি। আমি যদি হারি, আমি তোমার; তুমি যদি হার, তুমি আমার; কোনও দিকে হার নেই। আমি অন্তরের মধ্যে যে প্রেম এনেছি, সেই বরণ মালা যদি তাঁকে না দিই, তবে যে আমার সকল পবিত্রতাই ছাই হয়ে গেল। মনে কর দময়ন্তীর কথা। সে পরমাত্মার গলে মালা দিল, তার জীবাত্মা পবিত্র হল। তার মান রইল। যদি পরমাত্মাকে না চিনতে পেরে সংসারের গলে মালা দেয় তবে জীবাত্মার পবিত্রতা সতীত্ব সবই গেল। এই যে জীবনস্বামী বিশ্বনাথের ঘরে এলাম, তাঁকে না দেখেই যদি গেলাম তবে যে সবই বৃথা হয়। যুগ যুগ তোমারই রাজত্ব; বিশ্ব তোমারই অধিকারে, কেন না জগতের যে স্বামী তোমার। এই প্রেম জাগলে সব সার্থক হয়ে যাবে। তাঁর জন্যে যে বরণমালা তা তাঁকে দিলে সংসার ধর্ম্ম সবই সার্থক হবে। তা নৈলে ত সব বৃথা।

"সাঈঁ সব কুছ দিনূ মেঁ কুছ না রাখো।
হমহী অভাগিন নার সুকৃত তজি দুখ লখো॥
গঈ পিয়াকে মহল পিয়া সঙ্গ না রচী।
কহৈ কবীর সমঝায় সমঝ হিয়রে ধরো।
ঝুরন ঝুরন করো রাত ঐসী দুর্মতি পরিহরো।"

"স্বামী সবই দিয়েছেন কিছুই বাকী রাখেন নি। আমি যে অভাগিনী নারী সুখ ছেড়ে দুঃখই বেছে নিয়েছি। প্রিয়ের ঘরে এলেও তাঁর সঙ্গে মিলন হলো না। কবীর বলেন, হৃদয়ে সমস্ত দেখ যুগ যুগ তোমারই তো রাজত্ব, এমন দুর্বুদ্ধি ছেড়ে

দাও।" স্বামীকে এড়িয়ে আর সব পাবার চেষ্টাই তো যথার্থ দুর্ভাগ্য!

প্রেমে জাগ্রত আমার যৌবন আজ আমাকে তাঁর খবর দিয়েছে। তাঁকেই বরণ মালা দিতে হবে, জ্ঞান আমাকে সে খবর দিয়েছে। তাই ত তাঁর পত্র পেয়েছি। আজ আমি ব্যাকুল; হে অবিনাশী, হে প্রিয়তম, তোমার ত কালেতে কিছু আসে যায় না। হে অনাদি, অনন্ত, তুমি ত অপেক্ষা করতে পার, আমি ত পারি না।

"সখিংধো হমহু তঈ বলমাসী।
আয়ো জোহন পিয়হ সন্তাপো
অবমৈঁ জান গলী অঠিলাহি?
জান গলীমেঁ খবর মিল গয়ে
হমেঁ মিলী পিয়াকী পাতী॥
বা পাতীমেঁ অজব সংদেসা
অব হম মরনেকো ন ডরাতী॥
কহত কবীর সুনো ভাঈ সাধো
বর পায়ো অবিনাসী॥

"হে সখীগণ, আমিও বরচলিয়াসিনী হয়েছি। যৌবন যে এসেছে। যৌবন যে দুঃখ দিচ্ছে, এখন কি না আমি জ্ঞানগলি ঘুরে ঘুরে মরবো। তবে জ্ঞানও ধন্য, সেখানেই তো খবর পেলাম, প্রিয়তমের পত্র মিলে গেল। সেই পত্রে অপরূপ সংদেশ। কেমন করে তা বুঝিয়ে বলি? তবে এটা ঠিক যে এখন আমি মরতেও ভয় করি নে। কবীর বলেন, এখন যে অবিনাশীকে বর পেয়েছি।"

হে অবিনাশী, তোমার হয়ত কালের অন্ত নাই, তাই তোমার কোন তাগিদ নাই। কিন্তু আমার যে কাল পরিমিত। এই জীবনটী আজ কমলের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে! এই যে অপরূপ সৌন্দর্য্য এ জীবনটিকে ঘিরে ফুটে উঠেছে, তাকে তুমি যদি ধন্য না কর, তবে তোমার কোন ক্ষতি না থাকতে পারে কিন্তু আমার তো আর উপায় নাই।

চল চলরে ভঁবরা কমল পাশ।
তেরা কমল গাবৈ অতি উদাস॥
খোজ করত বহ বার বার।
তন বন ফুলো ভার ডার॥
দিবস চারকা সুরংগ রূপ।
রহিলগ মনমেঁ লাগস ধূপ॥
পুহুপ পুরানে হৈবে সুখ।
তব তেরা কহা সরাবে দুখ॥

"চল চল হে ভ্রমর, তোমার কমলের পাশে চল। তোমার কমল বড় উদাস সুরে গান করছে! বার বার সে তোমার খোঁজ করছে, তার তনুবনে ডালে ডালে পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু হায় সে সুন্দর মনোহর ফুল যে দিন চারেকের জন্য, সেই জন্যই তো মনের মধ্যে বেদনা লেগেই আছে: এই ফুল পুরোনো হলেই শুকিয়ে যাবে। তখন হে ভ্রমর, এই দুঃখ মিটবে কিসে! কোথায় এই দুঃখ রাখবার জায়গা হবে!"

এই জীবনটী যে শাখায় শাখায় পুষ্পিত হয়েছে, কিন্তু জীবনের ভ্রমর কোথায়? এই জন্যেই তার মনের মধ্যে ব্যথা। এই যে সে আজ বিকশিত হয়েছে, কালই ত সে পুরাতন হয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে, তখন হে ভ্রমর, আমি এ দুঃখ কোথায় রাখব? এই তো অসীমের জন্য সীমার কান্না। তিনি যদি বৈরাগী অনাশক্ত হয়ে থাকতেন তবে তো আশাই ছিল না। আমি সীমা, তিনি অসীম। কিন্তু এখানে তো ছোট বড়র কথা নয়, এযে প্রেম। আমি ছাড়া ও তো তাঁর চলে না।

তিনি তাঁর বিশ্ব প্রকৃতিতে রাজা হলেও আমি না হলে তাঁর প্রেমস্বরূপ অসম্পূর্ণ, এই যে আমাকে ছাড়া তাঁর চলে না এই তত্ত্বটি মধ্যযুগের কবি জ্ঞানদাস বৈষ্ণবি চমৎকার কবিত্বে প্রকাশ করেছেন।

এই লোকলোকান্তরের অধীশ্বর মহোৎসব-রত। এই প্রকৃতি তাঁর দূত। আমি তাঁর একবার অতিথি। অথচ দূত এত আড়ম্বরে আসছে যে

আমি তার ঐশ্বর্যই দেখ্‌চি। যে হিরণ্ময় পাত্রটি সত্যকে ঢেকে রেখেছে তাই দেখ্‌চি।

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্"

এই পাত্রখানি না সরালে দেখি কেমন করে? দূতের আড়ম্বরই যে বাধা হোলো।

"ফজরমে জব আয়া রলচি
পুষাক সুনহলী তেরী।
গমক ওর জব শাঁস লগায়া
চিত্ত জগায়া মেরী॥
ধূপমেঁ হমকো কিয়া উদাসা
ক্যা পীড় দূর সমায়া।
গায়া গেরুয়া সুর মধুরী
মনমনা হৈন আয়া॥
কাগদ কালা হরফ উজালা
ক্যা ভারী খত পায়া।
ইস্তী রৌনক কোঁয়ারে রলচী
তুহি যদি ভুলায়া॥
ভারী জলদা আয়ম দারত
তূ্ী ইক মেহমান।
খুক খয়মে খত হৈ ফৈলী
মগফুর হম ফরমান॥"

প্রভাতে যখন এলে হে দূত, তখন তোমার সোনালী পোষাক। পুষ্পগন্ধে ভরা পবনের সুরভি নিশ্বাস লাগাইয়া আমার চিত্তকে জাগাইলে। মধ্যাহ্ন রৌদ্রে আমাকে উদাস করিলে। আকাশের দিগন্তের চক্রবালে কি এক ব্যথা যেন তুমি ভরে রেখেছ। (প্রভাতে তোমার সোনার পোষাকে সুরভিগন্ধে মুগ্ধ হলাম, তোমার বার্ত্তা শুনবার অবসর আর হোল না। মধ্যাহ্নে তোমার উদাস আকাশই দেখতে লাগলাম। তাই আমার মন বৈরাগ্যে ভরে গেল)। সন্ধ্যার সময় গেরুয়া সান্ধ্য সুর পশ্চিমাকাশে গাইলে, মরণের মত রাত্রি এলো। তার পর একখানি পত্র দিলে—তার কাগজখানা কালো তার উপর আগুনের মত জ্যোতিষ্কের অক্ষরগুলো জ্বলছে। কি বিরাট পত্রখানি পেলাম। হে দূত! এত আড়ম্বর কেন তোমার? তোমাকে দেখেই তো আমার মন ভুলে গেলো। তুমি যাঁর দূত তাঁর বার্ত্তাটি আর বুঝতেই পেলাম না।

দূত (বিশ্ব প্রকৃতি) বল্লেন "বিরাট তাঁর সত্তা, মহামহোৎসব তিনি করছেন, তুমি তাতে একমাত্র অতিথি। তাই লোকে লোকান্তরে পত্রখানি আমি ছড়িয়ে ধরেছি। যেন তোমার নজরে পড়ে। আর একমাত্র অতিথির দূত আমি গর্ব্বিত। তাই আমার এই আড়ম্বর। তোমার কাছে কি আমি দীন বেশে আসতে পারি।

তাই বুঝতে পারি আমি ছাড়াও তাঁর বিশ্ব মহোৎসব অচল হয়ে রয়েছে। আমার জন্যও তিনি ব্যগ্র। আমাকে পাবেন বলেই তিনি ভিখারী হয়ে বেরিয়েছেন।

"তোহি মোহি লগন লাগায়ে রে ফকীরবা।
সোয়তহি মৈঁ আপনে মন্দিরমেঁ
সবদমে জগায়ে রে ফকীরবা॥
বুড়তহী মৈঁ ভবকে সাগরমেঁ
বহিয়া পকড় সমঝায়ে রে ফকীরবা॥
এইক বচন দুইজ বচন নহী
তুম মোসে বন্ধ ছুড়ায়ে রে ফকীরবা"
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
আপন প্রাণ লগায়ে রে ফকীরবা॥

হে ফকীর, তোমাতে ও আমাতে যে প্রেমের বাঁধন বেঁধেছ! আপন মন্দিরে শুয়েছিলাম, সুরের আঘাতে জেগে উঠেছি। ভবসাগরে ডুবে যাচ্ছিলাম, হাতখানি ধরে আমাকে বাচিয়ে দিলে, হে একটি মাত্র কথা কইলে আর দ্বিতীয় কোনো কথাই নেই, আমার সব বাঁধন অমনি ছুটে গেল, হে ফকীর! কবীর বলেন, হে ফকীর, আমার প্রাণে তোমার প্রাণ লাগালে।"

হয় তো তাঁকে দেখিনি, তবু তাঁর সুর শুনেই প্রাণ উদাসী। আমার ফকীর যিনি আমার জন্য

ভিক্ষুক হয়ে বেরিয়েছেন তাঁকে কি আমি ফেলতে পারি? তাঁকে আমার অদেয় কি হতে পারে?

"মোর ফকীরয়া মাংগিয়ার
মৈঁ তো দেখন্ গৌলোঁ।
মঙ্গনবে ক্যা মাংগিয়ে
বিন মাহগে জো দেয়।
কহৈ কবীর মৈঁ হৌ বাহী কো
যোনী হোয় তো হোয়॥"

আমার ফকীর ভিক্ষা করে চলেছেন, আমি তো দেখতেও পেলাম না। ভিক্ষুকের কাছে আবার কিসের ভিক্ষা, না চাহিতেই যে দেয়? কবীর বলেন, আমি তাঁরি, যা হবার হয় হোক না কেন।

তুমি আমার সব কেড়ে নিয়ে ভিখারী করে আমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছ। আজ আর আমার তো কিছু নেই, আজ আমাকেই দিতে হবে। তিনি কত যুগ ধরে জীবন দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছেন। আজ এখন গোলমাল করবার সময় নয়।

"জীব মহলমেঁ শিব পহুনরা
বহাঁ করত উদমাদরে।
পহুঁছা দেরা করিলে সেরা
বৈঠ চলী আরতরে॥
ঝুনন ঝুনন করৈ পতীয়ন
সাহবকা দিল লাগারে।
সুফল নাহী পরম সুখ সাগর
বিনা প্রেম বৈরাগ রে॥
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো
পায়া অচল সোহাগ রে॥"

"জীবন-মন্দিরে শিব আজ অতিথি। আজ কোথায় গোলমাল কচ্ছিস্? দেবতা আজ পৌঁছেছেন, আজ সেবা করে নে, রাত যে ঘরে চলে এলো। যুগ যুগ তিনি যে প্রতীক্ষা করেছেন। তাঁর চিত্ত আমাকে চেয়েছে বলেই তো। বিনা প্রেম-বৈরাগ্যে সেই পরম সুখ সাগরকে দেখাই যায় না। কবীর বলেন অচল সৌভাগ্য আজ মিলেছে।"

আজকে গোলমাল করবার সময় নয়। আজ তাঁকে সেবা কর। প্রেম-বৈরাগ্য বিনা সে পরমানন্দ সাগর দেখতে পাবে না আজ তাঁকে সব দিয়ে ধন্য হও। প্রদীপ, শিখাতে আত্মদান করে ধন্য। নদী, সমুদ্রে আপনাকে ডুবিয়ে ধন্য, ফুল বিকশিত হয়ে সৌরভ লুটিয়ে দিয়ে ধন্য, সূর্য্য জগতে জগতে জ্যোতি দান করে ধন্য। এই দান বিনা, এই আত্মা বিনা জীবন ব্যর্থ। আজ সর্ব্বস্ব দিয়ে ধন্য হও।

"আজকে বিন মৈঁ জাঁউ বলিহারী।
পীতম সাহব আয়ে মেরে পহুনা।
ঘর আংগন লগৈ সুহোনা॥
সব প্যাস লগৈ মাংগন পায়না।
তবে মগন ভঈ তুবি মন ভায়ন॥
চরন পখারুঁ বদন নিহারুঁ।
তন মন ধন সব সাঈঁ পর বারুঁ॥
সুফল ভঈ সব নামকী আসা।
কহৈ কবীর দাসনকে দাসা॥

"বলিহারী যাই আমি আজকের দিনের। আজ প্রিয়তম আমার ঘরে অতিথি এসেছেন। (ঘর বাহির অঙ্গন) আজ কি শোভাই পাচ্ছে! সব তৃষ্ণা আজ তৃপ্ত হয়ে মঙ্গল গাইতে লেগেছে। মনোহর তাঁর রূপ দেখে মন কোথায় ডুবে গেছে! তাঁর চরণ ধোয়াবো, বদনখানি দেখবো, তনুমনধন সব তাঁকে উৎসর্গ করবো। প্রেম যে লেগেছে, সত্য নামের তৃষ্ণা জেগেছে। দাসের দাস কবীর এই কথা আজ বলছেন।"

এই তো সাধনা। আমার প্রেম তাঁর প্রেমে পূর্ণ। তাঁর প্রেম ও আমার প্রেম ছাড়া অপূর্ণ। তাই তিনি অসীম ধৈর্য্যে আমার জীবন মন্দিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। একবার সেই ভিখারীর করুণ নয়ন দুটি যদি চেয়ে দেখ তবে সব ছেড়ে দিয়ে ভিখারী হতে হবে। কত যুগ আর তাঁকে দাঁড় করিয়ে রাখবে? দেখ, আমার ফকির আজ আমার ফকির আজ আমাকেই ভিক্ষা করে উদাস গান গাইতে গাইতে চলেছেন। আমার অন্তরের অন্তরে সে সুর গিয়ে বেজেছে।

নব্য ভারত

মোহমুদ্গর পাঠান্তে

(শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি, এ)

'কে বা তব কান্তা, বল, পুত্র কে তোমার ?'
বিফল শাস্ত্রের বাণী, বৃথা অনুযোগ ;
ভুলিয়াছিলাম যারা, পুনঃ সেই শোক
উথলিল—বিয়োগের অশ্রু অনিবার !
হে মাতঃ প্রথম-বন্ধু ! স্নেহ-করুণার
উৎস চিরন্তন ! তুমি পর ! তাই হোক্,
পর বলে' তাই আরো অন্তরের যোগ —
তাই তব স্নেহ-ঋণ নহে শোধিবার।
তুমিও ক্ষুধার লক্ষ্মি, নহ আপনার,
আত্মেতন সেবা তব শুধু কর্ম্মভোগ !
তাই ওই মুখে চেয়ে (দুরাযোগ্য যোগ)
কেঁদে ফেলি – মর্ম্মন্তুদ শুষ্ক হাহাকার !
মরণে বিয়োগ যদি বিধির নিয়োগ,
আলিঙ্গন দৃঢ় কর হে প্রিয় আমার !

প্রতীক্ষা

চিত্র

(শ্রীমতী মনোলেখা দাসী)

সে ছিল অন্ধ। বিচিত্র প্রকৃতির অপরূপ লীলা-মাধুরী তাহার নিকট চিরজন্মের মতন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। চির-শ্যামল বসুন্ধরা তাহার নিকট ছিল তুচ্ছ। তাই সে তাহার ছোট মনটিকে বিশ্বের অফুরন্ত সৌন্দর্য্য দিয়া পরিপূর্ণ করিয়া কাহার আকুল প্রতীক্ষায় দিন যামিনী যাপন করিত। কে বলিবে—কে সে !

হঠাৎ একদিন সে তার ছোট বোনকে ডাকিয়া বলিল,—আমায় একবার নিয়ে চল্‌তো সেইখানে ক'সে যেখানে আকাশের সবটা দেখা যায় ?

দিদির মুখ হইতে অদ্ভুত রকমের কথা শুনিয়া সে অবাক হইয়া গেল। দিদি বলে কি—সে আকাশের কি দেখ্‌বে—তার যে দু'টী চোখ নেই।

কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া তাহার ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ দুলিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ সে তাহার দিদির নিকটে গিয়া বলিল, দিদি চল, কোথায় তুমি যাবে ?—এই বলিয়া সে তাহার ছোট হাতটি দিদির দিকে বাড়াইয়া দিল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল্ তবুও ছোট বোনের কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া সে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল ; এবং এদিক সেদিক হাতড়াইতে লাগিল।

দিদিকে এইরূপ চঞ্চল হতে দেখিয়া তাহার ছোট বোন তখনি বলিয়া উঠিল, দিদি, এই যে আমি তোমার পাশে রয়েছি ! এত কাছে আছি তবুও তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না—তবে কি কোরে তুমি আকাশ দেখ্‌বে ?

কথাটি বলিয়া সে ঘন অন্তরের মধ্যে একটা তীব্র বেদনা অনুভব করিল। দিদির বেদনা-কাতর মুখখানি তাহার কমনীয় অন্তঃকরণের মধ্যে অল্ অল্

করিয়া ফুটিয়া উঠিল। সে তাহার আকর্ষণ কি এক রকম হইয়া পড়িল।

• • •

কতদিন এমনি করিয়াই কাটিয়া গেল। কত বসন্তের সুস্নিগ্ধ মলয়-পরশ তাহার গায়ের উপর প্রলেপ দিয়া বহিয়া গেল, কত বিচিত্র প্রকৃতির অফুরন্ত লীলা-মাধুরী-তাহাও একে একে কালের কোলে অবসান হইয়া গেল। কিন্তু সে একদিনের জন্যও কিছু জানিতে পারিল না—কি রকমে কোথা হইতে তাহার অজ্ঞাতে কি সব ঘটিয়া গেল।

একদিন বসন্তের অতি স্নিগ্ধ প্রভাতে হঠাৎ কোথা হইতে এক মূকবালক অন্ধবালিকার পাশে আসিয়া বসিল। অন্ধবালিকার কতকালের অবরুদ্ধ রোমাঞ্চরাশি সহসা মুকুলিত হইয়া উঠিল, সে প্রাণে একটা বিপুল পুলকের মৃদু স্পন্দন অনুভব করিল। তখন সে মনে মনে ভাবিল, আমার মন আজ কাহার পরশে বিকশিত হইয়া উঠিল,—কোন্ অতিথি হঠাৎ আসিয়া আমার হৃদয়-রাজ্যে আসন পাতিল।

কতকাল কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন মূকবালক তাহার প্রাণের গভীর ভাষণ দিয়া অন্ধ বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কে, আমার প্রাণের রাজ্যে কতদিনের রুদ্ধ আনন্দের তুফান বহাইয়া দিলে—প্রাণ যে আমার আনন্দ-রসে পরিপ্লাবিত।

অন্ধ বালিকাও তাহার নীরব ভাষায় মনের আকুলতা জানাইয়া বলিল, মন যে আমার কতদিন ধরে কার আশায় চেয়ে ছিল—আজ তা কার মোহন তুলিকা স্পর্শে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল, তা'ত আমি জান্‌তে পার্‌ছি না। তুমি কে, আমার হৃদয়-রাজ্যের গোপন মনোচোর, এতদিন তুমি কোন্ সাগরের অতল-গর্ভে বিরাট স্বপন-পুরীর মধ্যে অপরূপ সুন্দরী সাগরিকার প্রেমে বদ্ধ ছিলে, পথ ভুলে কি আজ এলে?

বালিকার আকুল নিবেদনে বালকের মন হর্ষে দোদুল হইয়া উঠিল। কতকালের বিস্মৃত কথা একে একে তাহার প্রাণের গোপন তারে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

বালিকা ভয়বিজড়িত কণ্ঠে কহিল,—তুমি কে?

মূক-বালক অন্তরের দিয়া জানাইল, নীরবভাষে আমি এক দোলরহারা অচিন্ অতিথি—তুমি আমায় চিন্‌তে পার্‌বে না—

বালিকার অধরের কোণে মৃদু হাসিয়া ফুটিয়া উঠিল; সে কহিল,—তুমি ত অচিন্ নও—তুমি যে আমার কতকালের পরিচিত—আপনার জন।

বালক হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

• • •

ওকি—ওকি—তোমার মুখ ও রকম হোল কেন?—বলিয়া মূক বালক বালিকাকে নিবিড় ভাবে বুকের নিকট টানিয়া লইয়া তাহার মলিন কপোল চুম্বন রেখায় অঙ্কিত করিয়া দিল। বালিকার শিথিল দেহলতা বালকের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িল।

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য-প্রতিভা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল)

তারপর নীলমাধব ও কাদম্বিনী উভয়ে অকপটে উভয়ের অবস্থা বর্ণন করিল। নীলমাধব তখন বলিল, 'ভাল, যার জন্ত তুমি সর্ব্বত্যাগী হয়েছিলে, সেই যদি তোমায় তাড়িয়ে দিয়ে থাকে, তা হ'লে মৃত্যুতে কি প্রতিশোধ দিবে?'

কাদম্বিনী নীলমাধবের বক্রোক্তিটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। ঘোর অন্ধকার রজনীতে পথিক যেমন দামিনীর অট্টহাসি দেখিয়া গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লয়, 'প্রতিশোধ' কথাটা শুনিয়াও সে জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া লইল। তখন বলিল,—'প্রতিশোধ? প্রতিশোধ! নূতন কথা, নূতন ভাব! আমায় ছেড়ে দাও, আমি জলে ঝাঁপ দেব না।'

নীল। মা, তুমি আমার সঙ্গে এস।

এই 'মা' কথাটা শুনিয়া অভাগিনী জীবনে নূতন বল পাইল—এমন মধুর স্বর সে ত কখনও শুনে নাই। সমাজের পরিত্যক্তা ঘৃণিতা রূপজীবিনীকে ভদ্রঘরের ছেলে যে এমন প্রাণগলা মধুর কণ্ঠে 'মা' বলিয়া ডাকিতে পারে, তাহা তাহার ধারণার বাহিরে ছিল। এই 'মা' কথাটা শুনিয়া তাহার বাঁচিবার সাধ বাড়িয়া গেল; নীলমাধবদের পরিবারের যদি কোনরূপ উপকার করিতে পারে তাহার জন্ত সে কৃতসংকল্প হইল।

কাদম্বিনী তখন বলিয়া উঠিল,—'তোমার সঙ্গে যাব না, তুমি বালক; তোমার মাথায় বিস্তর ভার রয়েছে, আর ভার দেব না।' এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল।

নীলমাধবের চরিত্রের মাধুর্য্য আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করি তখনই, যখন তাহাকে মোহিনী-মোহনকে ক্ষমা করিতে দেখি। তাহার বিস্তারিত বিবরণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। আর ভগবানও তাহার সদনুষ্ঠানের পুরস্কারস্বরূপ হেমাঙ্গিনীও তৎসহ বহুল ঐশ্বর্য্য দান করিলেন।

এইবার আমরা হরিশের ভ্রাতৃস্নেহ নবীন সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। না, হরিশের দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা। মার পেটের ভাইও তার মত ভাইয়ের জন্ত সর্ব্বস্ব পণ করিতে পারে না। তাহার কৃপায় হরিশ আমাদের অঘোরকে 'হারানিধি' রূপে পাইয়াছিলেন।

এক্ষণে আমরা গুণনিধির চরিত্র সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। তাহার গুণের সবিশেষ পরিচয় দিতে আমরা চাহি না। নামে যার সে মোহিনী-মোহনের কর্ম্মচারী ছিল; কিন্তু কাযে ছিল তাহার মোহিনীমোহনের লালসায়িতে ইন্ধন যোগান। এই গুণনিধির সাহায্যেই মোহিনী-মোহন আপনার ভ্রাতৃবধূকে এলাহাবাদে পাঠাইয়া ছিলেন—এই গুণনিধির সাহায্যে হরিশ বাবুর বাটী ক্রোক করিতে গিয়া অমানুষিক ব্যবহার করিয়াছিলেন। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে যখন মোহিনীমোহন গুণধর গুণনিধির স্ত্রীকে অপমানিনী করিতে চাহিয়াছিল, তখন উভয়ের মধ্যে যে ইতর মনোচিত কথোপকথন হইয়াছিল তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতে চাই না। আশ্চর্য্য হইয়া যাই গিরিশচন্দ্রের লেখনী হইতে কি করিয়া এরূপ অযথা রসিকতা বাহির হইয়াছিল। বাস্তবতার দোহাই দিয়াও কোন ক্রমে ইহা সমর্থন করা যায় না।

বাঙ্গালাদেশে এমন ভদ্র সন্তান আছে কি না জানি না যে, আপনার শিশুকন্যাকে লইয়া বিক্রয় করিতে পারে! তারপর তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে গুণ-নিধির বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ পাই ও তাহার মুখে শুনি; 'দেখি শালা মাগ নেবে? থাকো শালা তোমার চল্লিশ হাজারে ঘা দিচ্ছি। স্বরূপ বাবুকে মর্টগেজ ফিরিয়ে দিচ্ছি, ও মর্টগেজ ফিরে পেলে আমার ঘরে তারা সড়বে, তুমি আমার কচু কর্‌বে' তখন পাতকাড়ি গুটাইয়া মোটঘাট বাঁধিয়া ক্যাশ বাক্সটি হাতে করিয়া সে পলায়ন করিতেছিল কিন্তু একাধ্য নির্দ্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখান হয় না, তাই কবিবর প্রথমে নরকে উপস্থিত করিলেন। নব কৌশলে তাহার নিকট হইতে ৪০৲ টাকা আদায় করিয়া লইল। তৎপরে অন্ধবেশে অঘোর আসিয়া তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিল। গুণনিধি তাহাকে মোটটা ঘাড়ে দিয়ে আস্‌তে পারে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া বেশ জানিতে পারিল, সে পারিবে, তখন কতকটা সুস্থ হইল ও বলিল,—'নে নে, শীগ্‌গির নে, ক্যাশ-বাক্সটা এর সঙ্গেই দিই আমি সুস্থ হাতে পায়ে তফাতে হকাতে যাই; দাদা, এর বাক্সয় কিছু নাই—আহিরী টোলার ঘাটে, আমি এগিয়ে যাচ্ছি; না,—ক্যাশ বাক্সটা হাতে করেই নিই।

অঘোর। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

গুণ। আবার বেটা চেঁচায়, মোট তোল। আর না বাটা শীগ্‌গির চলে আয় না, তুইত আর সহিস কানা ন'স?

অঘোর। উঃ বড্ড ভারী!

গুণ। আঃ নে নে, এইটুকু ঘাড়ে তোলে সেও যে না, দাঁড়া আমি তুলে দিচ্ছি।

অঘোর। শালা, বেওয়ারিস পেয়েছে।

গুণ। আয় আয়, শীগ্‌গির চ'লে আয়।

অঘোর। আমি নারবো।

গুণ। আরে যে-ঘাটা সে—আমার যে।

অঘোর। এই নাও, তবে নাও।

(গুণ-নিধির ঘাড়ে মোট ফেলিয়া দিয়া অঘোরের ক্যাশবাক্স লইয়া পলায়ন)

গুণ। ওরে বাপরে, বাপরে! (পতন)

আঘাতটা খুব জরুতরই হইয়াছিল। যখন আহত হইয়া গুণ-নিধি রাস্তায় পড়িয়া, তখন নীলমাধব সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া গুণনিধির ভয় হইল। মনে হইল যাহাদের সর্ব্বনাশের সে মূল কারণ, তাহাকে আজ এরূপ অবস্থায় পাইয়া নীলমাধব কিছুতেই ক্ষমা করিবে না। তাই নীলমাধব যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'কে গুণনিধি!' উত্তরে সে বলিল, —'না বাবা, আমি নিধি টিধি নই, আমি পথিক।'

তখন উভয়ের যেরূপ কথাবার্ত্তা হইল তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

নীল। কেন গুণনিধি বাবু, ভাঁড়াচ্ছ কেন, তোমার ভয় কি? উঠ্‌তে পার্‌বে? ওঠ, আমার ধরে ওঠ!

গুণ। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে,—আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার ক্যাশবাক্স গিয়েছে, আমায় ধর্‌তে পার্‌লে জেলে দেবে,—আমায় ধর্‌তে পার্‌লে জেলে দেবে।

নীল। ভয় নাই, ভয় নাই, তুমি এস।

আঘাতের যোরে সব ভাবার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল। নীলমাধবের কথা আন্তরিকতায় পূর্ণ দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া উঠিল। অত্যাচারী সর্ব্বনাশের মূল কারণকে এরূপ অবস্থায় অত্যাচার পীড়িত লোক যেরূপ ব্যবহার করে, তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। নীলমাধবের চরিত্রের অনন্যসাধারণ এই ক্ষমাগুণ তাহাকে বরণীয় করিয়া তুলিল; এবং সে প্রাণের আবেগে বলিল, —'কে ও নীলমাধব বাবু? তুমি আমাকে দয়া

কর্‌ছ, আমি রাস্তায় একলা পড়ে আছি আমায় গলা টিপে মার নি।'

নীল। না, না, তোমার ভয় নাই, তোমার উপর আমার রাগ নাই ; তুমি ওঠ, ওঠ।

গুণ। নীলমাধব বাবু! আমি চিন্‌তে পারি নি, তুমি দেবতা, আমি চিন্‌তে পারি নি—আমি, তোমাদের সর্ব্বনাশ করেছি। আমার উপর তোমার এত দয়া? আমায় মাপ কর, আমায় মাপ কর।

নীলমাধব ও অনুতাপানলে দগ্ধ-হৃদয় গুণনিধিকে বলিলেন,—'গুণনিধি বাবু! আমি সত্যি বল্‌ছি, তোমার উপর আমার কিছু রাগ নাই, ওঠ, ওঠ।'

গুণ। পা ভেঙ্গে গিয়েছে, মাথায় লেগেছে, আমি যেতে পার্‌বো না। ধীরে ধীরে আমি সব প্রকাশ কর্‌বো, জেলে যাই যাব শালাকে জব্দ কর্‌বো, শালার চাক পিটে দেবো।

নীল। কাকে গালাগালি দিচ্ছ? ছি!

গুণ। সেই শালাকে,—মোহিনীশালাকে, শালার সর্ব্বনাশ কর্‌তে পার্‌লুম না।

নীল। গুণনিধি বাবু! অনেক হয়েছে, আর কেন পরমেশ্বরের কাছে অপরাধী হও? আর কেন লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌তে ইচ্ছা কর?

গুণ। মোহিনী ব্যাটার সর্ব্বনাশ হ'ল না? মোহিনী ব্যাটার সর্ব্বনাশ কর্‌বো, মোহিনী ব্যাটার সর্ব্বনাশ কর্‌বো, তাতে পাপ নাই, তাতে পাপ নাই।

আপনার ধারণাবশে গুণনিধি এই কথা কয়টী বলিয়া ফেলিল। পাপ-পুণ্যের ধারণা যে তাহার বড় ছিল তাহা বোধ হয় না ; তবে মনে হয় নীল মাধবের ব্যবহারে মোহিনী যে তাহার উপর অত্যাচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল তাহা ভুলিয়া গিয়া, নীলমাধবের কৃত উপকারের কথঞ্চিৎ পরিশোধ দিবার জন্য তাহার মন ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং সে স্থির করিয়াছিল, যে মোহিনী নীলমাধবদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহার গুণের কথা সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিবে। সে মনে করিল ইহাতে নীলমাধবদের কিছু উপকার হইতে পারে ; তাই সে বড় গলায় বলিল, মোহিনীর পাপের কাহিনী, কলঙ্কের কথা প্রচার করিলে পাপ হইতেই পারে না। উত্তরে নীলমাধব বলিল,—"পাপ নাই, একথা মুখে এনো না। একবার লোভের বশীভূত হ'য়ে আমাদের সর্ব্বনাশ করেছ, এবার রাগের বশীভূত হ'য়ে আর একজনের সর্ব্বনাশ কর্‌তে চাচ্ছ। ছিঃ ছিঃ বয়েস হয়েছে, এখনও শেখ ; এস তোমায় কোলে ক'রে নিয়ে যাই, এ গলির রাস্তায় ত গাড়ী পাওয়া যাবে না।"

এই অযাচিত প্রেম, ক্ষমা ও হৃদয়ের মহানুভবতা দেখিয়া গুণনিধির চরিত্র একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বাস্তবিকই সে শিক্ষালাভ করিল।

ইহার পর গুণনিধিকে উকীলের আফিসে একবার দেখিতে পাই। অঘোর কর্ত্তৃক অপহৃত ক্যাস বাক্সটী ফেরৎ দিবার জন্য কথানুপসী গিরিশ-চন্দ্র পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে তাহাকে উপস্থিত করাইয়াছেন। সংশোধিত চরিত্রের একটা পুরস্কার ত পাওয়া চাই, তাই এই দৃশ্যের অবতারণা। অবশ্য গুণনিধির জন্য এ দৃশ্যের অবতারণা হয় নাই—সংশোধিত চরিত্র অঘোরের জন্য এই দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার কৃতকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত সে করিতে কৃতসঙ্কল্প। এই স্থলে আমরা এই উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত করিয়া গুণনিধি চরিত্রের আলোচনা শেষ করিলাম :—

অঘোর। গুণনিধি বাবু। সেই অন্ধ নাচার আমার কাছে এই বাক্সটী দিয়ে গিয়েছে, আপনি হাঁসপাতালে ছিলেন, খুঁজে পাই নি, তাই দিতে পারি নি। দেখুন, যেমন বাক্স, তেমনি আছে, আর এই টাকাকটি আপনার ঠ্যাঙ্গের দাম নিয়ে যান, "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে"—ভাই। দেখ, যা ক'রে ফেলেছি মাপ কর, তোমার কিছু ভয়

নেই, লুকিয়ে বেড়াতে হবে না, মোহিনী বাবু তোমায় মাপ করেছেন।

গুণ। বাবু! আপনি যা আমায় সাজা দিয়েছেন, তাতে আমার যথেষ্ট উপকার হয়েছে. আমার দুর্গতি ঘুচেছে। মশাই, আমি মনিবের টাকা আর দলিল চুরি ক'রে পালাচ্ছিলুম; অনুগ্রহ করে আপনারা মোহিনী বাবুকে দেবেন, আমি আর লোকালয়ে মুখ দেখাবো না।

অঘোর। মুখ দেখাও, আর না দেখাও, বাবা! টাকা নাও; নইলে ফের ঘোট পাকে ফেলে দেবো; গুণনিধি বাবু! যদি তুমি টাকা না নাও, জান্‌বো আমার উপর রাগ পড়ে নি।

অগত্যা গুণনিধি বাবুকে উহা গ্রহণ করিতে হইল, এবং টাকাটা পাইয়া শীঘ্রই তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

স্ত্রী-চরিত্রের ভিতর আমরা কেবলমাত্র সুশীলা ও কাদম্বিনীর চরিত্র সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিব। অবশ্য অন্যান্য স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই না। সাধারণ ভাবে নাটকীয় চরিত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাই তাহাদিগের প্রতি প্রযোজ্য।

সুশীলা আদর্শ হিন্দু রমণী। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত কন্যা। স্বামীর সহিত সহবাস সে কখনও করে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্বামী দুশ্চরিত্র; তবু যখন সে শুনিল যে, তার স্বামী বোধ হয় মারা গিয়াছে, তখন হইতেই সে বিধবার বেশ ধারণ করিল। ভূমিই তার শয্যা হইল। দিনান্তে একবার দুটাক খানেক যব হোক্, চাল হোক, চোনা দিয়ে ও একটু ঘির ছিটে দিয়ে, একটু দুধ দিয়ে ফুটিয়ে, হাত না দিয়ে, উপুড় হয়ে যে ক গ্রাস খেতে পারে, তাই খেয়ে প্রাণ ধারণ করে আছে। গোপনে একখানি স্বামীর ফটো লইয়া শ্বশুরবাড়ী হইতে পিত্রালয়ে আসিয়াছিল। তাহাই তার আরাধ্য দেবতার পট-মূর্ত্তি। তাঁকেই কোলে ভরিয়া প্রত্যহ পূজা করিত। একদিনের ঘটনা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। স্বামী যে তার জীবিত আছে, এ কথা কে যেন তাকে বলিয়া দিয়াছিল—আবার স্বামীর সহিত মিলিত হইতে পারিবে, একথা তার মন তাকে বলিয়া দিয়াছিল। তাই একাদশীর দিন হিন্দু বিধবা হইয়াও মাছের একটু আন মুখে দিত। যদি প্রকৃতই তার স্বামী মারা গিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই দুষ্কৃতের জন্য অন্ততঃ নরক-ভোগ করিতেও সে প্রস্তুত; কিন্তু যদি স্বামী বর্ত্তমান থাকেন, তাহা হইলে তাঁর অকল্যাণ হইবে ভাবিয়া সে পূর্ব্বোক্ত রূপ কার্য্য করিত। তার স্বামীও যখন তাকে দেখেন, তখন তাকে দেবীরূপেই স্থির করেন। স্বর্গেই তার বাস। পৃথিবীকেই তিনি স্বর্গ করিয়া লইয়াছেন। এ হেন আদর্শ-রমণীর অদৃষ্টে দুঃখ থাকিতে পারে না। স্বামীর সহিত মিলিত হইবার সৌভাগ্য তাহার ঘটিল। মিলনের দৃশ্য আমরা প্রত্যেক পাঠক পাঠিকাকে ভাল করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তারপর নাটকের শেষ দৃশ্যে সুশীলা যে কথা কয়টী বলিয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিয়া তাহার সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিব:—

'বাবা, আমি অপবিত্রা ব'লে আত্মহত্যা কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলেন, আপনার সন্দেহ আমরা মোহিনী-বাবুর বাড়ী যাই; কিন্তু বাবা, জিজ্ঞাসা করি, সে কার শিক্ষায়? কে আমার কথা ফুটতে ফুটতে শিখিয়েছে, পরোপকার পরম ধর্ম্ম। কে আমায় শিখিয়েছিল—শত্রুকে স্নেহ কর্‌বে? কে আমায় শিখিয়েছিল অনাথাকে আশ্রয় দেবে? কে আমায় শিখিয়েছিল পরোপকারে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে? শুধু কথায় নয়, কার্য্যে কৈ দেখিয়েছিল, পরোপকার মহাব্রত। যদি মোহিনীবাবুর বাড়ী গিয়ে থাকি, সে আপনার শিক্ষামত। এতে মাকে কেন দোষী করেন? কাকাকে কেন দোষী করেন? দাদাকে কেন দোষী করেন? নির্দ্দোষী বালিকা যদি আমায় দেখ্‌লে বাঁচে, আপনি কি সেখানে যেতে আমায় বারণ করেন? আমি ভেবেছিলুম, যদি

না যাই, আপনি ঘৃণা ক'রবেন, কথা বল্‌বেন না, আমি সেই ভয়ে গিয়েছিলুম; বালিকার প্রাণরক্ষা কর্‌তে গিয়েছিলুম,—বাবা, আমি কি কলঙ্কিনী! আমার পানে চেয়ে দেখুন, আমার মুখে কি কলঙ্কের চিহ্ন!'

এইবার আমরা কাদম্বিনীর চরিত্র সম্বন্ধে দু এক কথা বলিব। কাদম্বিনী চরিত্র পূর্ব্বেই কতকটা আলোচিত হইয়াছে। মোহিনীমোহনের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য সে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল; কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। তারপর চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নীলমাধবের সহিত কথা-বার্ত্তায় সে বুঝিল, প্রতিশোধটা কি? কথোপকথনটা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কা। গঙ্গা তীরের প্রতিশোধ! গঙ্গাতীরের প্রতিশোধ তোমার মনে আছে?

নী। তোমায় আর আমি মা বল্‌বো না।

কা। কেন বাবা! তুমিই তো আমাকে গঙ্গাতীরে প্রতিশোধের কথা বলেছ।

নী। হুঁ,—আমার স্মরণ হলো বটে-আমি বলেছিলুম, তা কি এই প্রতিশোধ! হাঁ, আমি বলেছিলুম, কিন্তু কেমন জান? যেমন মহারোগে একটু বিষ দিলে ঔষধের কাজ করে, তেমনি তোমার প্রাণরক্ষার জন্য এই বিষময় কথা বলেছিলুম; দেখ্‌ছি সে বিষ তুমি অল্প পরিমাণে পান কর নি—আকণ্ঠ পান করেছ; তুমি কি কাজ করেছ, বুঝ্‌তে পারছ কি? তোমায় ঠেঁয়ে শুনেছি যে, একদিন তুমি কুলমহিলার মর্য্যাদা জান্‌তে, কিন্তু কুলমহিলাকে মাতালের মধ্যে এনেছিলে। তুমিও একদিন বালিকা ছিলে, আজ তোমার কৌশলে বালিকার প্রাণ-সংশয়, যদি বাবাকে খুঁজতে আমি না উপস্থিত হতেম, লোক করি মাতালদের পীড়নে তখনি তার মৃত্যু হতো, আরও কি সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা ছিল, তা তুমি বুঝতে পাচ্ছো? এই কি প্রতিশোধ? যদি প্রতিশোধের ইচ্ছা ছিল, অন্য প্রতিশোধ নাই? তোমায় ঘৃণা করে ত্যাগ করেছিল, তার তুমি হিত করে দেখাতে পার্‌তে যে, তুমি মহতের অপেক্ষা মহৎ। শত্রুর অনিষ্টের জন্য যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করেছ, যদি ঈশ্বর-উপাসনায় সেই উদ্যোগ, সেই উৎসাহ থাকতো, যদি পরোপকারে সেই উদ্যোগ থাকতো, সেই উৎসাহ থাকতো, তুমি দেবী হতে। কিন্তু এখন তুমি কি? যে তোমার অনিষ্ট করেছিল, তাতে ও তোমাতে প্রভেদ কি? অগ্রপশ্চাৎ! তবে সর্পকে খল বলে কেন? সর্প তার ঘাড়ে পা না দিলে দংশন করে না, আঘাত কর্‌লে দংশন করা সর্পের রীতি। মানুষের উচ্চ রীতি হওয়া আবশ্যক।"

এই উচ্চ আদর্শের কথায় কাদম্বিনীর চরিত্র একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল!

নাটকখানিতে যতগুলি চরিত্র-সংশোধনের চিত্র আছে, অন্য কোন নাটকে তেমন নাই। এমন উচ্চ আদর্শ ও ফলশ্রুতি কোন নাটকে এতটা নাই।

এবার আমরা দু একস্থলে যেটুকু অসঙ্গতি দেখিয়াছি, তাহার উল্লেখ করিব। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কলিকাতার রাস্তায় অঘোর নবর কথোপকথন হওয়াটা ভাল হয় নাই; কারণ কেহ শুনিলে অঘোরের সম্পূর্ণ বিপদ। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেও পথে উহাদের মধ্যে মোহিনী-মোহনকে হত্যা করিবার পরামর্শ ঠিক করাটাও যুক্তিসঙ্গত নয়। তারপর তৃতীয় অঙ্কের শেষ গর্ভাঙ্কে যে অবস্থায় কমলা ও হেমাঙ্গিনীকে রাস্তায় বাহির করান হইয়াছে, সে অবস্থায় পড়িলে যে কোমল প্রকৃতি রমণীরাও রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িতে পারেন না, তাহা বলিতেছি না, তবে রাস্তায় বাহির না করিয়া কলাকুশলী গিরিশচন্দ্র অন্যভাবে কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিতেন। আমাদেরও মাতালদের ইতরামীপূর্ণ কথা শুনিতে হইত না—হেমাঙ্গিনীর রোগের সূত্রপাত এ ভাবে না হইলেও ভাল হইত।

(ক্রমশঃ)

দেবতত্ত্ব

(অধ্যাপক শ্রীঅমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ)

অগ্নি (ক)

বেদে যে সকল দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের স্থান সমধিক উচ্চ। অগ্নির স্থান পৃথিবী, বায়ুর স্থান মধ্যগগন এবং সূর্য্যের স্থান আকাশের সমুচ্চভাগ। অগ্নি বায়ুর সহিত মিলিত হইলে প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করেন—তখন তিনি রুদ্র। বায়ু জগৎ পালন করেন। বেদে কখন কখন তিনি ইন্দ্র এবং কখন কখন বিষ্ণু উপাধি পাইয়াছেন। সূর্য্য হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা বেদ-প্রতিপাদিত। বেদে সূর্য্য প্রজাপতি উপাধিও পাইয়াছেন। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, এই তিন দেবতার দ্বারাই হইয়া থাকে। অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য ব্যতীত আরও অনেক দেবতা আছেন। কিন্তু সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারক যে ত্রিদেবের উপাসনা, তাহা সম্ভবতঃ গোড়ায় অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য হইতেই হইয়াছে। প্রথমে ইঁহারা তিনটী পৃথক্ দেবতা ছিলেন, পরে ক্রমশঃ ইঁহারা এক দেবতার তিন অংশ বা মূর্ত্তিতে পরিণত হন। পৌরাণিক যুগে ইঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বা শিব হইয়া যান। ইঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নাম আমরা বেদে পাই, মহেশ্বর বা শিবের নাম বেদে নাই। শিবের স্থানে রুদ্রের নাম পাওয়া যায়, রুদ্র ও শিবে অনেক প্রভেদ আছে। বেদ ও পুরাণে যে সকল দেবতার নামোল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে বিষ্ণুর কাহিনীটী খুব জাঁকাল রকমের। বিষ্ণু নিজের অধ্যবসায় ও প্রাণভাণ্ডে যেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেরূপ প্রতিষ্ঠা অন্য কোন দেবতার ভাগ্যে ঘটে নাই। বিষ্ণুর পরিচয়টীও কিছু রহস্যময়। ইন্দ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা—ইঁহাদের মধ্যে কে কোন্‌টী, সময়ে সময়ে চিনিয়া লওয়া দায় হইয়া পড়ে।

আমরা হিন্দু। আমরা প্রথমে নিসর্গশক্তির উপাসক ছিলাম; সুতরাং অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যে দেবত্ব আরোপ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয় নাই। উপাসনা-প্রবৃত্তি এইভাবেই আরম্ভ হয় এবং হওয়াও উচিত। মানব উপাসনা করিতে বাধ্য, কাজেই তাহার উপাস্য থাকাও চাই। জীবাত্মা পরিস্ফুট হইলেই তাহাকে উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনা করিবার এই যে সহজ ও স্বাভাবিক প্রবণতা মানব-মনে রহিয়াছে, তাহার মূল কারণ এই যে, মানব নিজশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে না। মানবাতিরিক্ত শক্তি স্বভাবে আছে, আর যে শক্তিতে মানব মানব, সে শক্তিও স্বভাব হইতে সংগৃহীত। জীব শক্তি সঞ্চয় করিতে করিতে যতদূর শক্তি সঞ্চয় করিয়া সে মানব হইল, ততদূর সঞ্চয় করিয়া সে বুঝিল—সে বাহিরের শক্তির উপর নির্ভর করে। অমনই সে বাহিরের শক্তির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু শক্তি শক্তিমান্‌কে ছাড়িয়া থাকিতে পারে, মানবমন এরূপ ভাব ধারণায়ই আনিতে পারে না। সুতরাং যেখানেই শক্তি, সেইখানেই শক্তিমানের অস্তিত্ব স্থির করিয়া দেবত্ব আরোপ করিয়া ফেলে। এই জগৎ নিশ্চয়ই শক্তির কার্য্য। ইহার প্রত্যেক অবয়বে শক্তি। এই বিরাট্‌শক্তিকে প্রথমে আমরা খণ্ডাকারে দেখিয়া থাকি; সুতরাং বহুদেবোপাসনা মানবের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়াই পড়ে। মানব instinct বা সহজ জ্ঞানে যাহা বোঝে, তাহা মিথ্যা নয়। শক্তি-

মানুষকে ছাড়িয়া শুধু শক্তি থাকিতে পারে না। শক্তি শক্তিমানেরই অংশ। কিন্তু জ্ঞান একভাবে চিরকাল থাকে না। ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াই জ্ঞানের স্বভাব। সুতরাং জাগতিক সকল শক্তির মধ্যে এক সম্বন্ধ আছে, ইহা মানব-জ্ঞানের গোচর হইল। কাজেই বুঝিতে বাকি রহিল না—এই সকল শক্তি একই শক্তিমানের শক্তির বিকাশ। উপনিষদ্‌যুগে তাই পরমাত্মা বা ব্রহ্মের আবির্ভাব হইল। সে যাহা হউক, বিকাশ হইতেছে একেরই শক্তির। কিন্তু শক্তিসকল বিভিন্ন আকারে প্রতীয়মান হইতেছে। মনে হইতেছে, এক একটী পৃথক্ পৃথক্ শক্তি। সুতরাং এক একটী পৃথক্ পৃথক্ শক্তিমান্ আমাকে বুঝিতে হইল। তাই এতগুলি দেবতা হইয়া গেল। অগ্নি এক দেবতা। পৃথিবীর উপরেই ইঁহার আধিপত্য, পৃথিবীতেই ইঁহার স্থান। কিন্তু সকল দেবতার স্থান পৃথিবীতে নয়। সকল দেবতাকে মানুষ আঁকড়াইয়া পায় না। একমাত্র অগ্নির সহিত মানুষ বিশেষ পরিচিত। অগ্নিকে মানুষ সহজে আহ্বান করিতে পারে, তুষ্ট করিতে পারে, অগ্নি দ্বারা তাহার আবশ্যক কার্য্য সকল সমাধা করাইয়া লইতে পারে। এমন কি, অন্তরীক্ষপথে অগ্নিকে পাঠাইয়া অন্য দেবতার তত্ত্বও লইতে পারে। সুতরাং অগ্নি হইল হব্যবাহন। অগ্নি দেবতাদের মধ্যে দূত। অগ্নির পর মানুষের বায়ুর সহিত পরিচয়। বায়ু সকলের প্রাণ, বায়ুতে যে মেঘ ভাসে, তাহার বর্ষণে মানুষের শস্য হয়, বায়ুর বক্ষ হইতেই বিদ্যুজ্জ্যোতির বিলাস-বিভ্রম, তাহা হইতেই আবার বজ্রের নিনাদ ও সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ কাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়। বায়ু ইন্দ্র হইলেন। ইন্দ্র পৃথিবীতে বর্ষণ করিলে তবে শস্য হইবে। ইন্দ্রের অস্ত্র বজ্র; কিন্তু ইন্দ্র রুষ্ট হইলে মনে করিলে মানুষের শত্রু হননে তাহা প্রয়োগ করিতে পারেন। ইন্দ্রের বজ্রে মানুষের আবার ভয়ও আছে; সুতরাং ইন্দ্র বড় সোজা দেবতা ন'ন। ইন্দ্রের একদিকে যেরূপ কোমলতা, অন্যদিকে আবার সেইরূপ কঠোরতাও আছে। ইন্দ্রের প্রধান দেবতা হইবার পক্ষে অসুবিধা হইল না। তারপর সূর্য্য। ইনিও যে-সে ন'ন। ইনি শূন্যপথে পৃথিবীকে পরিক্রমণ করেন। পরিক্রমণ করেন বলিয়াই তাই দিনরাত হয়। তার উপর সূর্য্যের উত্তাপ। ইহা বড় কম নয়। উত্তাপ ব্যতীত কিছুই থাকিত না, থাকিতে পারিত নয়। বৈদিক ঋষিরা উত্তাপ বা temperature-এর মর্ম্ম যেন বুঝিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। উত্তাপ না থাকিলে কোন কিছুর গঠন বা আকৃতি অসম্ভব হইত। পৃথিবীতে প্রাণ বা প্রাণী কিছুই থাকিত না। পরমাণুর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অসম্ভব হইত। সুতরাং তাঁহারা বুঝিলেন, সৃষ্টি সূর্য্য হইতেই হইয়াছে। সূর্য্য প্রজাপতি হইয়া গেলেন।

এদিকে অগ্নি হব্যবাহন মাত্র থাকিলেন না। কারণ বায়ু যাহাদ্বারা অগ্নির ভ্রূকুটি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তখন অগ্নি প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করেন। তখন কাহার সাধ্য যে অগ্নিকে হব্যবাহন পদে বরণ করিয়া স্বর্গে দেবতাদের নিকট হবি প্রেরণ করিতে প্রয়াস পায়। অগ্নি তখন রুদ্র। এখন মোটের উপর দাঁড়াইল—সূর্য্য প্রজাপতি, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা; বায়ু ইন্দ্র, তিনি জগতের পালনকর্ত্তা; আর অগ্নি রুদ্র, তিনি জগতের প্রলয়কর্ত্তা। প্রজাপতি ব্রহ্মায় পরিণত হইলেন, ইন্দ্র বিষ্ণুতে এবং রুদ্র শিবে পরিণত হইলেন। এই কার্য্য পৌরাণিক যুগে ঘটে। কিন্তু ইহা যে ভাবে ঘটে, তাহার বিস্তৃত ইতিহাস দেবতাদিগের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিপূর্ণ।

বায়ু, বরুণের মর্য্যাদা অগ্নিরই সমতুল্য; কিন্তু অগ্নি প্রায় সর্ব্বত্রই পূজিত। অগ্নি-পূজার প্রসার এতটা হইবার কারণ আছে। বায়ু, জল ও অগ্নি, এই তিনটীই মানুষের না হইলে চলে না। নিতান্ত বৈজ্ঞানিক ভাবে কথা না বলিতে হইলে, বরং অগ্নি অপেক্ষা বায়ু ও জলের প্রয়োজনীয়তা অধিক। কিন্তু বায়ু ও জল মানুষের এতটা গা-সহা হইয়া পড়িয়াছে ও ইহারা এতই অনায়াসে লভ্য যে ইহা

দিগের তুলনায় আহার ও আরাধনা সাপেক্ষ, অতি নব ও স্বল্প বিশেষে ভাবের অগ্নিই সর্ব্বোপরি মানবের চিত্তক্ষেত্রে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। বায়ু ও বরুণ সময়বিশেষে প্রচণ্ডাকার ধারণ করেন বটে, কিন্তু ইঁহারা মানুষের চির পরিচিত, অগ্নির সহিত মানুষের যখন প্রথম পরিচয়, তখন মানুষের বৃত্তিসকল সতেজ ও পুরিপুষ্ট, মানুষ হঠাৎ এই অভিনব দেবের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। অগ্নির মানব সাধারণের দেবতা হইবার এইরূপ অনেক কারণ আছে।

অগ্নি দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, ইনি দ্যোতা, স্বর্গ ও পৃথিবীর সাক্ষী।

বেদে অগ্নি স্বর্গ ও পৃথিবীর সন্তানরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বেদ অনুসারে অগ্নি মানব জাতির রক্ষক ও বন্ধু; সোম যেমন পৃথিবীও স্বর্গ উভয় লোকেই পূজিত, অগ্নিও সেইরূপ। এই অগ্নিদেবের তিন ভাবে তিন স্থানে উদ্ভব ও লীলা প্রকটিত হয়। ইনি পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইয়া একভাবে মানবের দৈনিক কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত থাকেন, আর একভাবে ইনি বায়ুমণ্ডলের জলরাশি-ভূত হইয়া আর এক লীলা প্রকটিত করেন, অন্য আর এক ভাবে ইনি ব্যোমজাত বিদ্যুৎ। ইনিই আকাশ বিদ্যুৎ রূপ ধারণ করিয়া যাহারা ইহাকে বাধা দেয় বা অমান্য করে তাহাদিগকে দণ্ডীভূত করেন, ইনিই মানুষের চুল্লী মধ্যে আবির্ভূত হইয়া মানুষেরই সেবায় নিযুক্ত থাকেন, এবং স্বর্গের দেবতাদিগের নিকট মনুষ্যকৃত যজ্ঞের হবি বহন করেন। এই অগ্নিই উত্তাপ বিকীরণ পূর্ব্বক শস্যের উদ্ভব ও বৃদ্ধির সহায়তা করেন।

জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান অবস্থা

(শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী)

* * *

জার্ম্মাণীর গ্রাম ও নগরের অবস্থা, বাজার দর, দ্রব্যাদির মূল্য প্রভৃতি বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্বতঃই বুঝা যায় যে, জার্ম্মাণীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। প্রকৃত কথাও তাহাই—জার্ম্মাণীর আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। Exchangeএ মার্ক মুদ্রার দাম অত্যন্তরূপে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু টাকার বাজার যাহাই হউক না কেন, আমি দেখিলাম, অন্যান্য বিষয়ে জার্ম্মাণীর অবস্থা খুবই ভাল। কোনও বিষয়েই জার্ম্মাণী পরমুখাপেক্ষী নহে। সমগ্র জার্ম্মাণজাতির প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যই জার্ম্মাণীতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্বাবলম্বনের এমন অপূর্ব্ব নিদর্শন অন্যত্র দুর্ল্লভ বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সকল প্রকার শাক-সব্জী, তরিতরকারীও জার্ম্মাণ দেশে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে প্রতি বিঘায় যত শস্য জন্মে, জার্ম্মাণীতে তাহার চতুর্গুণ উৎপন্ন হয়। এমন কোনও জিনিষ আমি দেখিলাম না, যাহা জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত না হয়। আশ্চর্য্য এই উদ্ভাবনশীল, পরিশ্রমী জার্ম্মাণ জাতি!

বিভীষণ মহাযুদ্ধের অবসানে ইউরোপের সর্ব্বত্রই ব্যবসায়-বাণিজ্যের বহুল ক্ষতি হইয়াছে। সর্ব্বত্রই অধিকাংশ শ্রমজীবী বেকার বসিয়া আছে, এরূপ কথা সংবাদপত্রেও পাঠ করা যায়, প্রত্যক্ষও করি-

যাচ্ছি। ইংলণ্ডে এরূপ বেকার লোকের সংখ্যা পঞ্চদশ লক্ষ। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষতি এবং মার্ক মুদ্রার মূল্যের হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র জার্ম্মাণীতে বেকার সংখ্যা মাত্র এগার হাজার! অনেকেই এখন অনুমান করিতে পারেন যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর ব্যবসায়-বাণিজ্য যেমন জোরে চলিয়াছিল, এখন তেমন নাই, কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। অধ্যবসায়শীল, পরিশ্রমী জার্ম্মাণজাতি নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই—এত বড় বিশাল সাম্রাজ্যে কয়েক হাজার মাত্র বেকার লোকই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

জার্ম্মাণীতে কারখানার সংখ্যা অল্প নহে। প্রায় প্রত্যেক কারখানার কায পূর্ণ তেজে চলিতেছে; একটিও পরিচিত কারখানা বন্ধ হয় নাই। শ্রমজীবী কোথাও অলসভাবে বসিয়া নাই, প্রত্যেকেই কার্য্য নিরত। নিয়মিত হারে প্রত্যেক শ্রমজীবীই পারিশ্রমিক পাইতেছে। শ্রমজীবীসংক্রান্ত সমস্যা জার্ম্মাণীতে নাই। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিবাসীদিগের অবস্থাই শোচনীয়। চিকিৎসক, অধ্যাপক প্রভৃতি সম্প্রদায় জীবন-সংগ্রামে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কায়ক্লেশে তাঁহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া অল্পে অল্পে যাহারা সামান্য কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, মার্ক মুদ্রার মূল্য হ্রাস হওয়ায় তাঁহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তথাপি দেখিলাম, এত কষ্ট সত্ত্বেও তাঁহারা অটল অটল ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিয়াছেন।

জার্ম্মাণীর রেলওয়ে ও ট্রেণের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে অনেক কথাই পাঠ করা গিয়াছিল। এবার জার্ম্মাণীতে যাইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। রেলের ভাড়া আমাদের দেশে বর্ত্তমানে অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার তুলনায় জার্ম্মাণীর রেল ভাড়া অনেক কম। মার্ক মুদ্রার মূল্যহ্রাস হেতু বর্ত্তমানে রেলের ভাড়া বিস্ময়জনকরূপে অল্প বলিয়া মনে হইবে। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রেলযোগে ভ্রমণ করিতে ৩ শিলিং বা ২৷৷০ আনা মাত্র ব্যয় পড়ে! যুদ্ধের অবসানে ট্রেণের সংখ্যা কমিলেও যথেষ্ট ট্রেণ যাতায়াত করিতেছে। ট্রাম সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা। দূরত্ব হিসাবে ৬ মার্ক হইতে ৩০ মার্ক পর্য্যন্ত ট্রামের ভাড়া। ৩০ মার্ক বর্ত্তমানে আমাদের এক পয়সারও কম।

* * * *

এত বড় মহাযুদ্ধের পরও জার্ম্মাণীর কলেজ ও শিক্ষাকেন্দ্র (Institutions) গুলি সমভাবেই আছে। আর্থিক দুরবস্থাসত্ত্বেও বিদ্যাচর্চ্চা, বিদ্যাদানের ব্যবস্থা কুত্রাপি ক্ষুণ্ণ হয় নাই বলিয়া মনে হইল। সাধারণ অথবা বৈজ্ঞানিক শিক্ষা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। অধ্যাপকগণ বুভুক্ষু হইলেও কায়মনোবাক্যে শিক্ষাকার্য্যে পূর্ণ উৎসাহে রত আছেন। এক বেলা আহার—তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে, তথাপি প্রসন্নচিত্তে তাঁহারা বিদ্যাদান করিতেছেন, গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এ যেন ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীতযুগের স্বল্পাহারী ব্রহ্মচর্য্যব্রত ঋষিদিগের পুরুকাহিনী। সামান্য শাকান্ন ভোজন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী অধ্যাপকগণ তপস্যা করিতেছেন! সে আদর্শের কি বর্ণনা করিব—সে অতি সাধারণ খাদ্য! মাংসের মুখ তাঁহারা কদাপি দেখিতে পাইবেন—যদি কালে-ভদ্রে কখনও জুটে। অন্নবস্ত্রের দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়াও এই ঋষিপ্রতিম জ্ঞানিগণ অক্লান্ত শ্রমে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কারে, দেশের জনসাধারণকে শিক্ষাদানকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, বৈজ্ঞানিক জগত জার্ম্মাণীই দীর্ঘকাল অধিকার করিয়াছিলেন, এখনও তাঁহারা সে স্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন। সমগ্র জগতে বিজ্ঞানের অদ্ভুততর বিকাশ তাঁহারাই দেখাইবেন। সেই দৃঢ় ধারণা লইয়া তাঁহারা সাধনা করিতেছেন।

ক্রুপের কারখানায় সোলাবাক্স, নানাবিধ

মারণাস্ত্রই প্রস্তুত হইত বলিয়া অনেকে জানেন। কিন্তু শুনিলে বিস্মিত হইবার কথা যে, ঐ সকল দ্রব্য ব্যতীত কৃষিসংক্রান্ত নানাবিধ উন্নতির কার্য্যও ক্রুপের কারখানায় হইতেছে। তথায় গড়ে ৩ শত খানা রেল এঞ্জিন (Locomotive) প্রতি বৎসর প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমান অবস্থাতেও জার্ম্মাণী প্রায় ৫০ খানা Locomotive বোম্বাই বরোদা রেল কোম্পানীকে সরবরাহ করিয়াছে। প্রায় প্রতিদিনই উক্ত কারখানায় ১ খানা Locomotive তৈয়ার হইয়া থাকে। এই ক্রুপের কারখানা একটা বিরাট ব্যাপার। শুধু কারখানাটাই সাড়ে চার বর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়া আছে। যেন একটা প্রকাণ্ড নগর। Factory বা কারখানা ছাড়া উহার অধিকারভুক্ত সমগ্র স্থানটীর পরিমাণ প্রায় ৬ বর্গ মাইল হইবে। কারখানার হাতার মধ্যে শ্রমজীবীদিগের বসবাসের জন্য সুপরিষ্কৃত আবাসগৃহ সমূহ আছে। তাহাদের জন্য ভোজনাগার, হাসপাতাল, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়, ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ কিছুরই অভাব নাই। অবসরপ্রাপ্ত, বৃত্তিভোগী বৃদ্ধদের জন্য বাড়ী ঘরও সেই স্থানের মধ্যে—কারখানার মালিকগণ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেকের জন্য তিনটি করিয়া ঘর—ঘরগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত, পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য, কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন।

ক্রুপের কারখানার অপেক্ষাও অনেক বড় বড় কারখানা জার্ম্মাণীতে আছে। প্রত্যেকটিতে এখনও তিন চারি শত বড় বড় এঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিক কার্য্য করিয়া থাকেন। জার্ম্মাণীতে অপচয় বলিয়া কোন কথা নাই। সকল বস্তুই জার্ম্মাণরা কাযে লাগাইয়া থাকেন। তরকারীর খোসা হইতে শুকর লেজ পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যায় না। খড় হইতে পুষ্টিকর খাদ্য পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়। সর্ব্বদেশের অব্যবহৃত, উপেক্ষিত টিন লইয়া জার্ম্মাণীর বড় বড় কারখানায় নানা প্রকার মূল্যবান্ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

* * *

জার্ম্মাণরাজ্যে Insitutions প্রতিষ্ঠান এত অধিকসংখ্যক যে, গণনা করা যায় না। প্রত্যেক নগরেই অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, বহু সময় ব্যয় না করিলে এক একটা নগরের উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিয়া শেষ করা সম্ভবপর নহে। তন্মধ্যে বার্লিন নগরের Marine Museum ও Geographical Museum বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। Marine Museumএ নানাবিধ যুগের ক্ষুদ্রতম নৌকা হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগের বৃহত্তম যুদ্ধ-জাহাজ সমূহের Model (আদর্শ) আছে। কোনও দেশের নৌকা অথবা অর্ণবপোত অথবা যুদ্ধ-জাহাজের নমুনার অভাব এখানে নাই। তাড়িত শক্তির সাহায্যে তাহাদের গতির পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে। যাবতীয় সমুদ্র-উপকূলভাগের মানচিত্র জার্ম্মাণগণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। সমুদ্রতটবর্ত্তী পাহাড়, নদনদী, মালভূমি, প্রকৃতির পরিচয় সেই Raised Maps বা উচ্চাবচ মানচিত্র হইতে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবীর কোন্ দেশে কি প্রকারের জাল ব্যবহৃত হয়, এই যাদুঘরে তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। শুধু সংগ্রহ করিয়াই জার্ম্মাণগণ নিশ্চিন্ত নহেন। উহাদের ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হইয়া থাকে। আবার কোন্ দেশের কোন্ শ্রেণীর জাল ব্যবহারে সুবিধা অধিক, বক্তা তাহাও শিক্ষার্থিগণকে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন।

Geographical Museumএ পৃথিবীর যাবতীয় রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক শ্রেণীবিভাগ আছে। বিরাট প্রতিষ্ঠান কত বৃহৎ তাহা না দেখিলে শুধু কল্পনা করা যায় না। বিষয়গুলির জন্য বিভিন্ন তালিকা-পুস্তক আছে। সে তালিকা-পুস্তকের (Catalogue) সংখ্যাও সামান্য নহে। এই মিউজিয়মে শিক্ষালাভ করিয়া যে কেহ ভূগোলে ডাক্তার উপাধি পাইতে পারেন।

পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে জার্ম্মাণীর অসাধারণ অধ্যবসায় ও উৎসাহ আছে। লাইপ্‌সিক্ নগরই গ্রন্থ প্রকাশের প্রধান কেন্দ্র। পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য দেশের গ্রন্থরাজি এখানে মুদ্রিত হয়। সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষার গ্রন্থাদিও জার্ম্মাণগণ মুদ্রিত করিতেছেন। মুদ্রাযন্ত্র জার্ম্মাণীতে অত্যন্ত সুলভ। এত স্বল্পমূল্যে আর কোথাও উহা কিনিতে পাওয়া যায় না। জার্ম্মাণীতে Orbispictus সংস্করণের গ্রন্থরাজি মুদ্রিত হইতেছে। ভারতীয় শিল্প, ধর্ম্ম, বেদান্ত প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থগুলির এই সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত। উহার কাগজ, ছবি, ছাপা—সবই অতি চমৎকার। বইগুলি বাঁধান। প্রতিখণ্ডের মূল্য ১২০ মার্ক, বর্ত্তমান হিসাবে এক পেনী বা আমাদের দেশের এক আনা মাত্র। এরূপ স্বল্প মূল্যে এমন সুদৃশ্য ও চমৎকার ভাবে মুদ্রিত গ্রন্থ ছাপাইয়া বিক্রয় করিবার প্রকাশকের লাভ থাকে। অন্যত্র এরূপ শ্রেণীর একখানি পুস্তকের মূল্য অন্যূন পাঁচশিলিং বা প্রায় চারি টাকা।

জার্ম্মাণীর শিক্ষা-বিস্তার-ব্যবস্থা চমৎকার। তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। আমাদের দেশের ছাত্রগণ ২১ বৎসর বয়সে পাঠ শেষ করিতে পারিলেই আমরা বলিয়া থাকি, ইহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছে, এখন উহারা সংসারে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে; কিন্তু কোনও জার্ম্মাণ-ছাত্র ২৬।২৭ বৎসরেও যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। তখনও সে শিক্ষার্থী ছাত্র মাত্র।

স্ত্রীশিক্ষাও জার্ম্মাণীতে বাধ্যতামূলক। তবে ১৫ বৎসর বয়সের পর কোনও ছাত্রী ইচ্ছানুসারে বিদ্যাধ্যয়ন না-ও করিতে পারে। জার্ম্মাণীতে সাধারণতঃ বালিকারা ১৪ বৎসরেই যৌবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে তাহাদিগকে সামান্য পরিমাণে জার্ম্মাণ, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থালীর কাজ, সূচীশিল্প, সেলাই, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি সকল প্রকার কলাবিদ্যের শিক্ষাও প্রদত্ত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৫ বৎসরের পর শিক্ষা আর বাধ্যতামূলক নহে। তখন ছাত্রীরা সাধারণ বিদ্যাচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে সন্তান পালন, ঔষধ ব্যবহার করা, শুশ্রূষার কায প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া থাকেন। এরূপ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান শুধু নগরে নহে, প্রত্যেক গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত। জার্ম্মাণ-নারী শুধু কলাবিদ্যায় নহে, সুগৃহিণী হইবার উপযুক্ত যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা পাইয়া থাকেন।

মাসিক সুমতী

ভাগের পূজা

(১০)

[শ্রীইন্দুলতা মুখোপাধ্যায়]

পূর্ব্ব পূজারীগণ :—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া। (২) শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার। (৩) শ্রীমতী সরসীবালা বসু। (৪) শ্রীযুক্ত বিমলপতি চৌধুরী। (৫) শ্রীমতী চারু লীলা দেবী। (৬) শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। (৭) শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।

প্রসাদের কণা।

যে কথাটা আজ কয়েকদিন ধরিয়াই ভাবিতে ছিলাম, তাহা যে এমন ভাবে ঘটিয়া যাইবে, তাহা তো জানিতাম না! কমলকে আমি কোন দিনই বিশ্বাস করিতে পারি নাই। সে যে তাহার ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করিয়া আমাদের মত ছন্ন ছাড়া

দেশ সৈনিকের দাবে যোগদান দিবার জন্য হঠাৎ এমন করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিবে, ইহা যে একবারে অপ্রত্যাশিত। নিশ্চয় সে অমলের অনুপস্থিতির দেশে ফিরিয়াছে; এটা হয় তো তাহার খেয়াল! আবার দু'দিন পরে সব ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে। তাহার দ্বারা যে কোন কাজ হইতে পারে, এ বিশ্বাস আমার আজিও নাই! কিন্তু·· ···আমার নিজের শক্তির উপরেও তো আজ আমার খুব আস্থা নাই! আমি কলিকাতা চাই,—কেন? কিসের জন্য? আমি নিজেই তো মাকে বলিয়াছিলাম, যাইতে হয় তুমিই যাও মা, আমি দেশে থাকিব। আজ আবার সেখানে যাইবার এ চঞ্চলতার ইঙ্গিত আমাকে কেন পাইয়া বসিল? মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না বলিয়া? ..কখনো না···ছি! ছি! সে কথা ভাবিতেও যে নিজের উপরেই ঘৃণা হয়! প্রাণের সত্য গোপন না করিয়া যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে, এ খেয়াল নিশ্চয় গয়লা বৌকে একবার দেখিবার জন্য! এ দীনতার সঙ্কোচ লইয়া আমি মায়ের কাছে কেমন করিয়া দাঁড়াইব?···তা হোক, তবু যাইতে হইবে।

মামা কলেজ ছাড়িয়া দেশে যাইবার পর, আমাদের শ্যামবাজারের বাড়ীটা ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল। মায়ের চিঠিতে শুনিয়াছিলাম, যাঁহাদিগকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা নাকি এত শীঘ্র কলিকাতায় অন্য বাড়ীর সন্ধান করিয়া লইতে পারেন নাই এবং সেই জন্য তাঁহারা এখন নীচের ঘরগুলা ব্যবহার করেন, উপরের ঘরগুলা আমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

সন্ধ্যার কিছু পরেই কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে নামিয়াই শুনিলাম, সহরে ট্রাম চলিতেছে না, ধর্ম্মঘট 'ষ্ট্রাইক্' করিয়াছে! ট্রাম থাকুক্ কার নাই থাকুক্, তাহাতে আমার বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। খেজুর গুড়ের একটা কলসি সঙ্গে আনিতে ছিলাম। একহাতে লাঠি এবং অন্য হাতে কলসিটা তুলিয়া লইয়া হন্ হন্ করিয়া পনরজনেই বাড়ীর দরজায় আসিয়া কড়া নাড়িতেই আমার মনে হইতেছিল, হয় তো শ্যামা বৌ আসিয়া দরজা খুলিয়া দিবে, কিন্তু যে আসিল, সে একেবারে অপরিচিত। ভাবিলাম, নীচের ঘরের ভাড়াটেদের কেহ হইবে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, নির্ম্মলবাবু কোথা?

কবাটের আড়ালে অন্ধকারের দিকে সরিয়া গিয়া লোকটা আমার মুখের পানে ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। আর একবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—নির্ম্মল বাবু কোন্ ঘরে আছেন বলতে পার?

তথাপি সে নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়া। ভারী বিপদ। কে এ? উপরের দিকে তাকাইয়া ডাকিলাম, মা!··· ···মামা!

মামা বারান্দার বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে রাস্তার গ্যাসের আলো আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, চিনিতে দেরী হইল না। বিস্ময়াবেশের মত জিজ্ঞাসা করিলেন, কে রে? প্রণাম! আয়—আয়।

বলিলাম, তুমিয়েছেন নাকি মামা?· ····এই লোকটাকে এতক্ষণ ধরে' জিজ্ঞাসা করছি, কিন্তু বলতে পারে না।

মামা হাসিয়া বলিল,—ওকে জিজ্ঞেস্ করছি'ল বুঝি?—লোকটা যে বোবা,—কথা বলতে পারে না।

ততক্ষণে আমি উপরে উঠিয়া আসিয়াছিলাম। বলিলাম, মা কোথায় মামা?

—তোর হাতে ওটা কি রে?

—খেজুর গুড়।···সরসে খেড়ার গাছগুলো সন্ধ্যা পানীকে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, তারা দিয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে এলুম।

মা আমার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া

ছিলেন। আমার সহিত কথা কহিতে কহিতে আমার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। তাকাইতেই দেখি, সম্মুখে মা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, পশ্চাতে গয়না বৌ!

মা আমার মুখের পানে তন্ময় দৃষ্টিতে কি দেখিতেছিলেন জানি না,—হঠাৎ কহিয়া উঠিলেন, তাখ্ দেখি প্রসাদ, তোকে কেমন মানিয়েছে আজ। তোর কি আর 'আর্টিষ্টের' মত ছবি আঁকা সাজে যে!.....হঠাৎ চলে' আস্‌বার কারণ কি, বল্ দেখি?

জানি না কেন, মায়ের কথাটা শুনিয়াই গয়না বৌ হেঁটমুখে সেখান হইতে সরিয়া গেল। আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। ভাবিলাম, ছি, ছি, এ অন্যায় কেন করিলাম?

আমার হাত হইতে খেজুর গুড়ের কলসি লইয়া মা ডাকিলেন,—গয়না-বৌ,.....আচ্ছা থাক্, আমিই রাখ্‌ছি।

মা চলিয়া গেলে, মামা আমাকে তাহার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। বলিল, গাঁয়ের নতুন খবর কি যে?

মায়ের কথাটা তখনও আমার কানে বাজিতেছিল। কাহারও কোন প্রশ্নের উত্তর দিবার ইচ্ছা তখন আমার ছিল না। বলিলাম, খবর ছাই আর পাঁশ। কমল দেশে ফিরে গেছে গ্রামের উন্নতি কর্‌বার জন্যে।

মামা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সে কি রকম শুনি?

—অত শত কিছু জানি না, মামা, কমল আর এক ছোক্‌রাকে কল্‌কাতা থেকে' ধরে' নিয়ে গেছে। বলে, পল্লী সংস্কার কর্‌বার মতলব।..... তাও ভালো!.....তবে এটা সত্যি মামা, তার সাহায্য পেলে আমরা অনেক কাজই কর্‌তে পারি। যদিও সেটা পাওয়া দুরাশা। হঠাৎ তার এমন পরিবর্ত্তন কেন হলো বল্‌তে পারি না।

মামা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, কমল যে সেদিন এখানে এসেছিল।.....আমিই ডেকে এনেছিলুম তাকে।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—কেন?

—দিদি বলেছিল।

—তারপর, মা কি বল্‌লেন?

—তা তো আমি জানি নি প্রসাদ, জানি না, ওঁদের মধ্যে কি কথা হয়েছে।

বুঝিলাম, মা-ই নিশ্চয় তাহাকে এ কাজে ব্রতী করিয়াছেন।

—আচ্ছা মামা, তাহ'লে সে আমার কাছে কথাটা গোপন কর্‌লে কেন?...কিছু তো বল্‌লে না!

—কি জানি। বলিয়া মামা আরও কি বলিতে যাইতেছিল, মা জল খাবারের থালা লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কমলের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল মা? তাকে কি বল্‌লে?

মা একটু আশ্চর্য্য-হইয়া কহিলেন, তোকে সে কথা কে বল্‌লে প্রসাদ?—হাঁ, হয়েছিল, কেন বল্ দেখি?

সে গাঁয়ে গেছে তার বন্ধু অমলকে নিয়ে। বল্লে,—কাজ কর্‌বে।

মা একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আনন্দের সহিত বলিলেন, গেছে? গেছে? কখন গেছে সেখানে? আঃ বাঁচলুম।...যে, খেয়ে নে আগে। অনেকখানি পথ এসেছিস্ নিশ্চয়ই।

মা আর কিছু বলিলেন না। আমি জল খাইতেছি, মা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। যতবারই চোখ তুলিয়াছি সে দুটি দৃষ্টির সহিত আমার চোখ মিলিয়াছে। মায়ের দৃষ্টি জননীর স্নেহভরা, আশীর্ব্বাদভরা, মমতা ঘোরা দৃষ্টিতে সন্তানের চক্ষে লজ্জা মাখিবার কথা নয় কিন্তু একি নিদারুণ দৌর্ব্বল্য, প্রতি বারই চক্ষু নামাইয়া লইতে পথ পাইতেছিলাম না। থাকিয়া থাকিয়া মা'র সেই একটা প্রশ্নই খোঁচার মত হৃদয় কন্দরে জাগিয়া উঠিয়া লণ্ডভণ্ড করিতেছিল। মনে হয় কয়দিনের অদর্শনের পর সন্তানকে কাছে পাইয়া মাতার স্নেহ আনন্দে। উরেক হয়, মা'র ভাবে ভাষায় তাহা জানিতে পারি নাই। মায়ের কাছে পুত্রের আগমনের কারণ জানিতে চাহিয়া মা আমাকে যথেষ্ট বিব্রত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যত ভাবি, সে একটা কথার কথা ছাড়া আর কিছু নয়, মনের সে খোঁচা দূর হয় না; যত ভাবি, মা বাস্তবিক প্রশ্নটার কোন কারণ প্রত্যাশা করেন নাই কিন্তু মন যে সায় দেয় না। সে যে ক্ষণে ক্ষণে সেই দুর্ব্বলতাটুকুকেই জাগাইয়া তুলিয়া দেয় মা, সর্ব্বান্তর্যামী মা-আমার মনের কথা জানিয়া ফেলিয়াছেন। মার কাছে সত্য গোপন করিয়া অন্যায় করিতেছি, পাপ সঞ্চয় করিতেছি, দেশসেবাব্রতধারী সন্তানের ইহাপেক্ষা অন্যায় আর যে হইতে পারে না, তাহাও জানি তবু কেন যে এই

গোপনতাকে আশ্রয় দিয়া এই জ্বালা সহিয়া যদি তাহারও ত কোন কৈফিয়ত আপনাকেই দিতে পারি না! বিদ্রোহী অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করিয়া বলিয়া দিতে চায় সে ভালবাসিয়াছে, গোপনতার প্রাচীর ভাঙিয়া দিয়া এই সত্যই যে প্রচার করিতে চায় যে অন্তর্নিহিত ভালবাসাতে আকর্ষণই তাহাকে এতদূরে এইখানে টানিয়া আনিয়াছে। নৈতিক অন্যায়, নৈতিক পাপ—আমি পারি নাই; আর ভালবাসার যদি পাপ থাকে আমি পাপী! তবু অস্বীকার করিব না যে ভালবাসিয়াছি!

কিন্তু হৈম, সে কথাও বলিতে পারি না। কণ্ঠ যে তাহার সহস্র শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে! আমি যে তার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে চাই কিন্তু কোথায় মুক্তি? সব উৎসাহ কল্পনা—সবই যে লেজ গুটাইয়া বিবরে প্রবেশ করিয়াছে, আমি যে কিছুতেই পারি না।

রাত্রে আহারাদির পর, বিছানায় পড়িয়া ঘুম কিছুতেই আসিতেছিল না। এমন প্রাণ পোড়ানো অনুশোচনার জ্বালায় জ্বলিতে হইবে জানিলে আমি কখনই মালতীর ছবি আঁকিতাম না। ছি! ছি! গয়লা-বৌ কি মনে করিবে, মা যে তাহার মুখেই আমায় বলিয়া ফেলিলেন, 'আর্টিষ্টের মত ছবি আঁকা আমার সাজে না।' সত্যই তাই! ছবি আঁকিতে গিয়াছিলাম কবে,—সে কোন্ কালে। ভাল লাগিত না বলিয়াই হোক্ বা অন্য কোন দিকের কোন প্রবল আকর্ষণেই হোক্, আমি সে বিদ্যা সমাপ্ত করিতে পারি নাই। তবে সেদিন সেই নিস্তব্ধ পল্লীর অলস মধ্যাহ্নে হাতে কোন কাজ ছিল না বলিয়াই আমার সে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। না জাগিলেই ভালো হইত! মালতীর যৌবন শ্রীমণ্ডিত সদ্য রূপ-মাধুরী দেখিয়াই হয় তো আমার ভিতরের সুপ্ত শিল্পী মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, তাই সে সুন্দরের সন্ধানে আমার মন ছুটিয়াছিল,। কিন্তু—না, ভালো কাজ করি নাই! .....সুন্দর চাই না আমি। আমি চাই যা বীভৎস,—যা অসুন্দর। আমি ভুলিয়া গেলাম কেন,—আমি যে কায়ের এসাদ! রমণীজন-সুলভ কমনীয়তা আমার মধ্যে থাকিবে না,—আমি শিল্পী নই আমি লাঙ্গুতা, উৎপীড়িতা লাঞ্ছনাদলিতা মাতার একমাত্র সন্তান,—আমি দেশ-সৈনিক!.....

ধীরে ধীরে বিছানা হইতে উঠিলাম। আমারই ঘরের এক কোনে আমার আঁকা মালতীর ছবিখানা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি ছবিটা তুলিয়া আনিয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যেই প্রথমে হাত দিয়া বেশ করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিলাম। দেয়ালের উপর দিয়াশলাই জ্বালাইয়া তাহাতে আগুন লাগাইতেই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অন্ধকারে প্রথমে দেখিতে পাই নাই—আলোকের শিখায় দেখিলাম, মালতীর স্নিগ্ধ শান্ত চোখ দুইটি তখনও যেন মিনতি কাতর ভাবে আমার পানে তাকাইয়া আছে। ধীরে ধীরে সেটুকুও পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। ছাই গুলা অঞ্জলি ভরিয়া তুলিয়া লইয়া জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিলাম। অন্ধকার ঘরের মধ্যে কি যে হইয়া গেল বুঝিলাম না। মনে হইতে লাগিল, কাহার সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া যেন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম।.....বিছানায় শুইয়া কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম জানিতেও পারি নাই!

রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির পর নিদ্রা বেশ গাঢ় হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। হঠাৎ কাহার চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গেল।

নিদ্রাভঙ্গের পর যে সংবাদটা কাণে আসিয়া পৌঁছিল, তাহা শুনিয়া আমার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। শুনিলাম,—মা বলিতেছেন, গয়লা-বৌ গতরাত্রে দরজা খুলিয়া কোথায় চলিয়া গেছে,—কেহ তাহার সংবাদ জানে না।

কমলেশের কথা

অনলের মত হাজারটা বন্ধু যদি আমার চোখের সুমুখে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিত, যদি দিবারাত্র আমাকে তাহাদের দলে টানিবার জন্য উপদেশ দিত, তথাপি আমি আমার পথ ছাড়িতাম কি না জানি না। যে কলিকাতার আকর্ষণ আমাকে একদিন এই পল্লীটির স্নেহ-শীতল কোল হইতে টানিয়া লইয়া গিয়া নরকের আগুনে পুড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল, আমাকে সে আত্মহত্যা হইতে বিরত করিবার শক্তি এক 'মা' ছাড়া আর কারও ছিল কি না বলিতে পারি না।

আমার মত সর্ব্বস্বহারা স্নেহ কাঙ্গাল শিক্ষানীর দল পলে পলে নিজেকে ধ্বংস করিতেই চায়;—আমার সেই আত্মঘাতী বিদ্রোহ-মূর্ত্তিটাই প্রসাদের চোখে পড়িয়াছিল, তাই সে আমাকে ভুল বুঝিয়াছে। মায়ের কোলের ছেলে, স্নেহ যত্নে প্রতি

পালিত প্রসাদ, সে তো জানে না,—বাহিরে যাহাই হই না কেন, ভিতরে আমার কত বুক ভাঙা দেদনা —কত দৈন্যের হাহুতাশ! এই ক্ষুধিত পাষাণের জঠরাগ্নির ক্ষুধা মিটাইতে পারে একমাত্র স্নেহ ভালো বাসা! আমাদের দুনিয়ার ইচ্ছাশক্তি রোধ করিবার ক্ষমতা শুধু তাহাদেরই আছে, যাহারা হতভাগা বলিয়া করুণা করিয়াও কোলে মাথা দিবার একটু খানি ঠাঁই। তাই আমাদের একটু খানিতেই পরাজয় শুধু স্নেহ আর ভালোবাসার কাছে। বাহিরের ঐশ্বর্য্য সম্পদ দেখিয়া অনেকেই অনেক মিথ্যা দিয়া আমায় ভুলাইতে আসিয়াছিল কিন্তু আমাদের কাছে মিথ্যা সত্যের প্রভেদ ধরা পড়িতে বেশী দেরী হয় না। এতদিন পরে যাহা পাইলাম,—আঃ! কি অনাস্বাদিত সুখ!.....মা গো!

সেদিন মা ডাকিয়া পাঠাইলেন। নির্ম্মল ডাকিতে আসিয়াছিল।

মা বলিলেন,—কমল, এসো বাবা! একটি কথা বল্‌বার তরে আজ তোমাকে এখানে ডেকেছি ...আমি দেশ থেকে ছুটে এসেছি শুধু এই জন্যে!

বলিলাম,—কি কথা, মা?

তিনি আমাকে কাছে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, কথা বেশী কিছু নয় কমল; ..'মা' বলে' যখন ডেকেছিস্ তখন আজ শুধু আমি জান্‌তে চাই —তুই আমার মত মায়ের ছেলে হতে পারবি কি না!

চুপ করিয়াছিলাম, তিনি আবার বলিলেন, বল্ কমল, হাঁ বল্,—বল্ পারবি কি না! আমার পায়ে হাত দিয়ে শপথ কর্।

মায়ের মুখের পানে একবার তাকাইলাম। এমন কখনও দেখি নাই, এমনটি যে হইতে পারে, জানিতাম না, আঃ! সে কি মহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তি! আমার মাথার চুল হইতে পা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। কোলে লুটাইয়া পড়িয়া পায়ে হাত দিয়া শপথ করিয়া বলিলাম,শপথ করছি মা, যা বল্‌বে তাই কর্‌ব।

মা আমাকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, আমরা যে তোদের অনাথিনী মা, কমল। আমাদের চোখের জল আর কতকাল দেখ্‌বি বাবা!... দেশে যাও। স্বদেশের কাজে,—মায়ের কাজে কোমর বেঁধে লেগে পড়। অনাচার অত্যাচারে দেশ ভরে গেছে, এ জ্বালা যে আর সইছে না বাবা। মায়ের বুকে মুখে পিঠে কশাইএর মত এ চাবুকের আঘাত, ছেলে হয়ে কতকাল দেখ্‌বি বল।—সিংহী শাবক তোরা—আশীর্ব্বাদ করি, পুরুষের মত পুরুষ হও!

আমি ঘাড় হেঁট্ করিয়া বলিয়াছিলাম মা আমার মাথাটা তুলিয়া বলিলেন, থাক্ কমল, আজ যদি আমি তোর নিজের মা হতুম,...তাই মনে কর্ বাবা কমল, তাই মনে কর্—আমিই তোর গর্ভ ধারিনী!

দেখিলাম মায়ের চোখে অশ্রুর ধারা গড়াইয়া আসিতেছে!

আমি মায়ের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিলাম,—তাই চল্লুম মা, মায়ের কাজেই চল্লুম।...কিন্তু প্রসাদকে এখন একথা জানাইলেন না।

মা গম্ভীর ভাবে সজল চোখে বলিলেন,—যাও, আর কিছু বল্‌বার নাই!

...অদ্রিও আমার চোখের সুমুখে অপরাহ্নের চোখের অশ্রু টল টল করিতেছে! সম্মুখে মায়ের কঠোর আদেশ,—মা ভৈঃ!

...দেশে ফিরিয়া আজ দুদিনে বেশী কিছু করিতে পারি নাই। তবে কার্য্য প্রারম্ভেই যে আত্ম প্রসাদ লাভ করিতেছি, তাহাতেই আশা ও আনন্দে আমার বুকখানা ভরিয়া উঠিতেছে!.. মাগো, এ পরশমণির সন্ধান তো এতদিন পাই নি মা! এতদিন মায়ের সন্ধানে ঘুরিতেছিলাম। দেখিতে পাই নাই, সম্মুখে আমার অনাগত বিপুলতা —চারিদিকে জীবনের ডাক!

...আমার বন্দিনী মায়ের কাতর ক্রন্দন অনুরনিত আহ্বান, শৃঙ্খলের ঝঞ্ঝনায় মিলাইয়া যাইতেছে,—আর সেই সিংহী মায়ের তেত্রিশ কোটি শাবক কোন্ মৃত্যুগহ্বরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

অমল প্রথমেই চায় গ্রামে একটা আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে। সে বলে, দেশের জননীদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, ছত্র উৎপীড়িত ভারত তাহাদের নিকটে চায় বলবীর্য্যশালী সিংহ শাবক। আরও কত কি করিতে হইবে, অমল একটা কাগজে পরের পর লিখিয়া যাইতেছিল, আর আপন মনে গাহিতেছিল,—

দিন আগত ঐ—
ভারত তবু কই?

সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে,
শত শত বিঘ্ন কণ্টকে মিলি সবার সাথে,
প্রেরন কর ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে,

জাগো ভগবান,
হে, চিরন্তন ভগবান!'

হেন কালে দেখি, সম্মুখে পুলকিত মহাশয় একটা খেলো হুঁকা হাতে লইয়া ধূম গমনে আমারই দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আঃ কি বিপদ। এই লোকটার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কি কোন উপায় নাই। বুড়া মহাশয়কে কলিকাতায় রাখিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম,—আবার কি জন্য এখানে ফিরিয়া আসিলেন ভগবান জানেন।

তিনি আসিয়া বলিলেন, আমার দ্বারা কলকাতায় থাকা হলো না বাবাজী! একটা বিশেষ সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে, তাই ছুটে এলুম তোমার কাছে। মেয়েটাকে এমন করে ফস্‌কে যাবে, কে জানে বাবা! বিন্দি আর হরেকেষ্ট এখানে না পেয়ে কলকাতা পর্য্যন্ত খানতাঁর পিছু তোড় করেছিল, বুঝলে? তারপর ছুঁড়ি কাল রাত্রে নিজে থেকেই কোথা পালিয়েছে শুনছি। তা যাক্ কতদিন বাধা কতদিন,—আমার এলো বলে'।

কথাগুলা আমার মোটেই ভালো লাগিল না। কিন্তু এই লোকটির সঙ্গে জীবনের এমন এক জরুরী মুক্তির ভার দিয়া পরিত্রাণ হইয়াছিল, যে তাহাকে দূর করিয়া দিবার মত কর্কশতাও আসিল না। অত্যন্ত দুর্ব্বলস্থলের যে সঙ্গী তাহাকে কাছে রেখে দেখানো অসম্ভব!

আজ মনে প্রাণে তাহার বিদায় কামনা করিতেছিলাম কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবারও সাহস হইল না। অন্তরের সত্য আমার ইহার আহ্বানে পাছে জাগিয়া উঠে, আমি বসিয়া কাঁপিতেছিলাম—

দরজার নিকট মিলিত কণ্ঠে চীৎকার উঠিল,—বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্।

চাহিয়া দেখিলাম, কয়েকজন স্বরাজকামী স্বেচ্ছা সৈনিক! সকলাগ্রে প্রসাদ দাঁড়াইয়া আছে!—অঙ্গে খদ্দরের উত্তরীয়, মস্তকে বাবরি চুলের উপর খাদ্দরী রঙের কেটি বাঁধা, হাতে এক মস্ত বাঁশের লাঠি। তাহার সৌম্য সুন্দর দিব্য মুখের বেশ দেখিয়া আমার দু'চোখ পুরিয়া জল আসিল। ডাকিলাম, ভাই!.....আমার সিক্ত কণ্ঠে কাঁপিয়া উঠিল!

তাহারা সমস্বরে ডাকিল—এসো ভাই!

যেন কতদিনের পরিচয়, যেন কত আপনার, হাত ধরিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিয়া বলিল আও বন্দেমাতরম্! চলল, বল বন্দেমাতরম্!

ক্ষীণ কম্পিতকণ্ঠে বলিলাম বন্দেমাতরম্!

একজন বলিল জোরে, আরও জোরে, কণ্ঠে যত শক্তি আছে—তোরে বল বন্দেমাতরম্!

আলঙ্কারিক কথা

লেখাপড়া জানি না, কাজেই ভালোমন্দ কোনদিকে গেলে কি হয় কিছুই বুঝি না। সমাজের অনুশাসন মানিয়া তাহাদের রক্ত চক্ষুর ভয়ে অনেক সময় অনেক কঠোর মিথ্যার মাথা পাতিয়া লইতে হয় বই কি! তবে এটা খুব জানি, মিথ্যার আবরণে প্রাণের সত্য যতদিন না ঢাকিয়া ফেলিব, ততদিন কোন অন্যায় অবিচার, আমার মনোবেদনার সৃষ্টি করিতে পারিবে না!

নারী যে আমাদের সমাজে কত বড় অবহেলার তাহা আজ আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আমার ঘরে আশ্রয় দিয়াছেন বলিয়া পিসিমার নামে ঘরে বাইরে কলঙ্ক রটিয়াছে। আর প্রসাদ?.....থাক্ ভালো করিয়া বুঝিতে পারি না তাহার কি হইয়াছে না হইয়াছে! আমার জন্য যদি তাঁহারা কষ্ট পান, তাহা হইলে সাধ করিয়া তাহাদের গলগ্রহ হইয়া বাঁচিয়া থাকায় তো কোন লাভ নাই! আমি যাহাদিগকে প্রাণের বিনা ভালোবাসি, তাঁহাদের ক্ষতি হইতে দিব কেমন করিয়া?

পিসি—মা তো কাল প্রসাদের মুখেই বলিলেন,—তাহার নাকি আমার ছবিখানা আঁকা উচিত হয় নাই।.....তিনিই বা কেন এ দুর্ভাগিনীর ছবি আঁকিতে গেলেন?

.....না, না, আমাকে এ স্থান পরিত্যাগ করিতেই হইবে। বিন্দি দাসির সাথেই তো চলিয়া আসিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু পিসি মাই আসিতে দেন নাই, বরং নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া আমাকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। প্রসাদ যে বলিয়াছিল, পিসি মা আসিলেও, সে কখনও কলিকাতায় আসিবে না। আবার আসিল কেন?.....থাক্, আত্মীবন আপন পর নির্ব্বিশেষে সকলের বেদনা দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করিবার জন্য যাহার জন্ম, সে তো সুখের প্রত্যাশী হইতে পারে না।

আমি ভাবিতেছি,—আজ আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়া দাঁড়াইব কোথা? সমাজ

আমাকে ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া, ভগবানও কি এ অভাগীর উপরে এত বড় ঠুনিচোর মাথা রাখিবার মত একটুখানি ঠাঁই করিয়া দিবেন না? ..... এক দিকে সমাজের অত্যাচার, অন্যদিকে আমাদের উপর নৃশংস পুরুষের অত্যাচারও তো কম নয়! একটু রূপ আছে বলিয়া সে দেশের সহায় শক্তি হীনা দুর্বলা রমণী, পুরুষের অত্যাচারের ভয়ে পথে বাহির হইতে পারে না; সে দেশের পুরুষেরা আবার পৌরুষের বড়াই করে কোন লজ্জায়? আমি যদি শিক্ষিতা হইতাম, আজ যদি স্বজন পরিত্যক্তা বিতাড়িতা গহনা বৌ না হইয়া অন্যকেহ হইতাম, তাহা হইলে মনে হয়, আমাদের দেশের সমস্ত মেয়েগুলাকে আজ বিদ্রোহী করিয়া তুলিতাম, সমাজের কাঠার শাসনের নামে অত্যাচারের মুখে লাথি মারিয়া ঘর ছাড়িয়া দলে দলে বাহির হইয়া আসিয়া এই খোজা গোলামের জাতিটাকে দেখাইয়া দিতাম, আমাদের শক্তি কিছু আছে কি না!... যাক্ কতদূর করিতাম, না করিতাম, সে ভাবিয়া আমার কোন লাভ নাই!

প্রায় সমস্ত রাত্রিই বিনিদ্র কাটাইলাম। তখন রাত্রি কত ছিল, জানি না। চারিদিকে ঘনঘোর অন্ধকার, আর আকাশ ভরা অগণিত নক্ষত্র! ধীরে ধীরে ঘরে বাহির হইয়া আসিলাম। ভগবানকে জানাইলাম, এ অভাগীর দোষ লইও না প্রভু।

সদর দরজা খুলিয়া বাহিরে রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম,—গ্রামরাস্তার পথে তখন জন প্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। রাস্তার পাশে আলোকের শ্রেণী নীরবে নিশা যাপিতেছিল।... কোন্‌দিকে চলিতেছি জানি না,—তবু চলিতে আরম্ভ করিলাম।

ক্রমে প্রভাত হইল, তখন বোধহয় অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছি। ভাবিলাম, পথে কোন বড় গৃহস্থের বাড়ীতে ঢুকিয়া একটা ঝিয়ের কাজ যোগাড় করিয়া লইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। রাত্রির অন্ধকারে

একা একা রাস্তাটা বেশ চলিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু এই স্পষ্ট দিবালোকে পথযাত্রী অসংখ্য পুরুষের উদ্গ্রীব এবং ক্ষুধিত দৃষ্টির মধ্য দিয়া সলজ্জ সঙ্কোচে পথ চলিতে চলিতে কেবলই পা দুইটা জড়াইয়া যাইতেছিল।

পথের পাশেই একটা বড় বাড়ী দেখিয়া ভাবিলাম, হয়ত' কোন ভদ্রলোকের বাড়ী। ঢুকিয়া পড়িলাম। নীচে একটি ছোকরার সহিত দেখা হইতেই আমাকে উপরে যাইবার ইঙ্গিত করিল। উপরে উঠিয়া দেখি,—ও মা, চারিদিকেই স্কুল কলেজের ছেলে। আমাকে দেখিয়াই, হয়ত বা নিঃসহায়া নারীর একটুখানি উপকার করিবার সদিচ্ছা মনে ভাবিতেই সকলে হাঁ হাঁ করিয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আমায় ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া নানারূপ প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। সাদর সম্ভাষণ বড় কম পাইলাম না।—লজ্জায় মরিয়া গেলাম।

ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিয়া তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পুনরায় পথ চলিতে লাগিলাম! আর কোন বাড়ীতেই প্রবেশ করিতে সাহস হইতেছিল না। পুরুষ গুলাকে দেখিয়া আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিতেছিল!...কিন্তু পুরুষ-হীন বাড়ী কোথায় পাইব?

মধ্যাহ্ন অতীত হইতে চলিল,—তবু আমার পথ চলার বিরাম নাই। ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং পথ চলার ক্লান্তি বেশ বুঝিতে পারিতেছিলাম। কিন্তু—কোথায় যাইব? চারিদিকে রুক্ষ উষর আর জ্বালাময় সূর্যের দৃষ্টি!...মাগো! পথের পাশে একটা কালী-মন্দিরের পাশে বসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, মন্দিরে নারায়ণ সংখ্যাই অধিক। ভাবিলাম, উহাদেরই মধ্যে কাহাকেও ধরি,—যদি কেহ দয়া করিয়া একটু স্থান দিতে পারে।

এক বর্ষিয়সী রমণী প্রণামান্তে বাড়ী ফিরিতে ছিলেন। তাঁহাকেই বলিলাম।

তিনি আমার হাতে ধরিয়া আদর করিয়া একটু দূরে লইয়া গিয়া বলিলেন, পাড়াগাঁ থেকে এসেছ? এসো বাছা এস, আমার সঙ্গে এসো! ভাগ্যে আমার সঙ্গে দেখা, নইলে ও বড় বিপদেই পড়তে বাছা! এসো, এসো।

কি বলিয়া যে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিব বুঝিলাম না। তিনি তখনও আমার হাতখানা ধরিয়াছিলেন, সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম, আমরা নেতে গয়লা।

তিনি একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, তাতে কি হয়েছে বাছা গয়লা হ'লে বলেই কি ছুঁতেও দোষ। সে সব আচার বিচার তোমাদের পাড়াগাঁয়ে আছে। কলকাতা সহরে ও-সব কিছু নেই-এসো।

অনেক গলি ঘুরিয়া তিনি যেখানে লইয়া গেলেন, দেখিলাম, একটা সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর

কয়েকটা খোলার ঘর। ছোট ছোট এক একটা ঘর, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজানো। অপরিসর স্টেশনের পাশেই একটা ঘরের ভেতর ঘাটে একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক একটা মাটির কলসীতে জল ভরিতেছিল। মুক্তাদের বাড়ী কোথায় পাইলাম না। ভাবিলাম,—তাও ভালো!

সন্ধ্যা প্রায় ঘনাইয়া আসিতেছিল। কয়েক জন কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া আমাকে ঘিরিয়া নানা প্রশ্নে আমাকে বাতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল।

একজন বলিল,—তা ভাই, যেমন সোনার বরণ রূপ, তাতে অল্পদিনেই ও পথসা হবে। নিস্তারিণী দিদির ঘরেই থাক, ভালোই হবে।...

কথা শুনিয়া আমার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল! এ কি! এ আমি কোথায় আসিয়াছি এরা রূপ-ব্যবসায়ী বার বনিতা নয় তো?

আমি ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া, আমাকে ঘিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারই উদ্দেশে বলিলাম, আমি যেতে চাই!

এক প্রৌঢ়া আমার অঞ্চল ধরিয়া সজোরে এক হেঁচকা টান মারিয়া কহিয়া উঠিল—যাবি কোথা পোড়ার মুখী?

তাড়াতাড়ি আমাকে টানিতে টানিতে ঘর ঢুকাইয়া তড়াৎ করিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল। দরজায় আঘাত লাগিয়া কপালের কতকটা অংশ কাটিয়া গেল। উঃ বলিয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অন্ধকার ঘরের ভিতরে অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় বসিয়া পড়িলাম।

সারাদিন কাটিয়া গেল, কেহ একবার খোঁজও করিতে আসিল না। বাঁচিয়াছি কি মরিয়া গেছি—মরিলেই ভাল হইত—দেখিতেও আসিল না। সন্ধ্যার পরেই নিস্তারিণী দুটি বাবু গোছের লোককে সঙ্গে লইয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া সামনে দাঁড়াইলেন। তাঁহার হাতে একটা তীব্র আলো ছিল, সেই আলোয় সারাদিনের অন্ধকার বাসের পর আমার চোখ জ্বালা করিতে লাগিল, আমি চোখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া আছি, কে বলিল উঠিল মাসী, আজ থেকে এই গুলাম বেটা তোমার শ্রীচরণের ছুঁচো। এসে মাসী! দাও মাসী দাও একটু পায়ের ধুলো দাও! বলিয়া লোকটা সত্যি সত্যিই নিস্তারিণীর চরণ ছুঁইয়া মাথায় হাত দিল।

নিস্তারিণী আনন্দ গদগদকণ্ঠে কহিলেন—কেমন বাবা গুলাম, মনের মত যোগাড় করে দিতে পেরেছি কি-না বল?

মাসী! সাধে আর তোমায় সোনামী করি বাবা! কিন্তু এ যে একেবারে বন-বেড়াল মাসী, চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে।

বন বেরালই ঘরে থাকলে ঘর বেরাল হয় বাছা তার কি গুলাম, সাতটা দিন বাবা, তারপর...

আর বলো মাসী, আর বলো না। এখন থেকে অত আশা করা কিছু নয়! লোকটা বোধ হয় আমাকেই গিলিয়া খাইতেছিল, বলিল—চুড়ী বটে মাসী! সাধে কি আর বলি, মাসী, তোমা বই আর কারো নই।

আর একটা লোক ছিল, সে বলিল চল, চল ওঘরে নতুন মেয়ে মানুষের ছেলুখ পান করা যাক্‌গে। সাতদিন পরেই যখন—এঁা হাঁা।

চলিয়া গেল! বসিয়া পড়িয়া ভগবানকে কায় মনে ডাকিতে লাগিলাম—প্রভু! এই সাতদিনের মধ্যে এই ঘরের চালে বজ্র ভাঙ্গিয়া দাও, মাটীর ভিত ভেদিয়া সর্প উঠুক, অভাগিনী বাঁচুক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী চৈত্রমাসে গিরিবায় ভার লইয়াছেন।

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and Published by P. N. Pal. 26-3 Scott Lane, Calcutta.

যমুনা—

বাপীতটে।

শিল্পী শ্রীসরেশচন্দ্র বসু

"বাসন্তী"র সৌজন্যে)

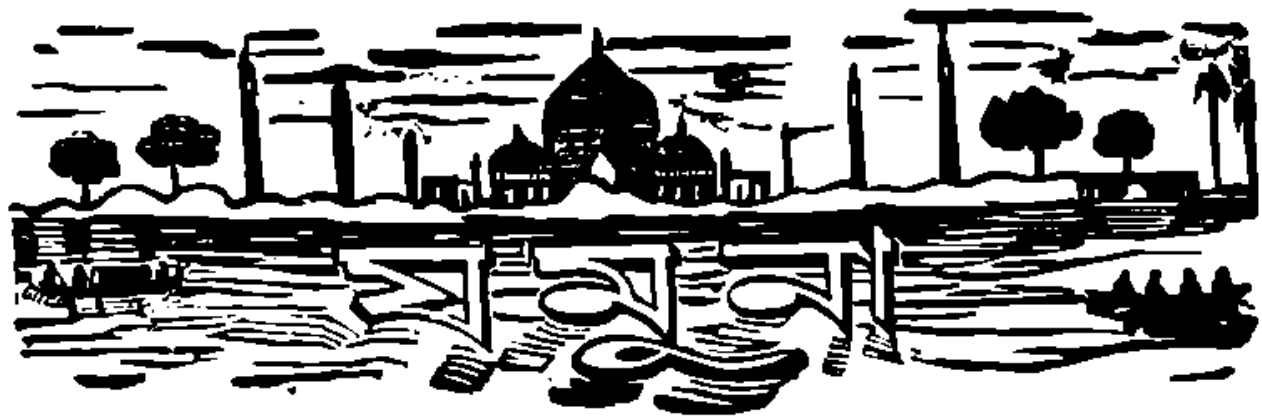

১২শ বর্ষ | চৈত্র ১৩২৯ | ১২শ সংখ্যা

নারী

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

নারী! কেমন,—শুনবে তুমি ?
—মন্ত্র-পড়া কুহক-মায়া !
নন্দনেরি পুষ্প-সোহাগ !
মূর্ত্ত যেন নরক-ছায়া !
নেইকো এমন মধুর আশীষ,
নেইকো এমন অভিশাপও,—
নেইকো এমন পুণ্য-জ্যোতি,
নেইকো এমন ঘৃণ্য পাপও।

এক হাতে তার কমল-কলি,
আর এক হাতে মাকাল রাঙা,
একদিকে তার সৃষ্টি তরুণ,
আর-একদিকে কেবল ভাঙা।
পুলকে তার কবির স্বপন,
কোপেতে কি বজ্র ছোটে,
দোহাগে তার স্বর্গে ওঠায়,
ঘৃণাতে সব পরে লোটে।

ঘাসে নরম মাটির মতন,
বিদ্রোহেতে বন্যা-ফেন,
কারুণ্যে সে ভরা নদী,
নিষ্ঠুরতায় পাথর যেন।
আঁখিতে তার ভোরের আলো,
অলকে তার রাতের কায়া,
হাস্যেতে তার জ্যোৎস্না জাগে,
অশ্রুতে তার বাদল-ধারা।

নিশ্বাসে বয় ঝুলেন বাতাস,
চিত্ত হা-হা মরুভূমি,
শিরে তার অসীম আকাশ,
চরণ আছে পাতাল চুমি।
ঘরেতে মন করেন যখন,
নয়ন তখন বাইরে আসে।
মুখে যখন আশার বাণী,
বুক যে কাটে দীর্ঘশ্বাসে।

পঙ্ক খানিক্, গঙ্গ খানিক্,—
কি বিচিত্র তুমি নারী!
সংসারেতে ধরাও আগুন,
ফিরেই চালো স্নিগ্ধ বারি।

মিষ্টি-তেঁতো, পাষাণ-মাখন,
রৌদ্র-ছায়া একসা ক'রে,
বিশ্ব-কাকে গড়্‌লে তোমায়,
পাঠিয়ে দিলে নরের ঘরে।

রূপ-সায়রে ভাসিয়ে তরী,
পাচ্ছিনাকো হালে পানী,
সারা-জীবন দেখেও তোমায়,
গোলকধাঁধাই ব'লে জানি।
হও মানবী, হও দানবী,
হও সরলা, হও হেঁয়ালি,—
তবু তোমায় বাস্‌ব ভালো,
আমরা পুরুষ প্রেম-খেয়ালি!

আমরা তোমায় প্রেম-খেয়ালি,
বাস্‌তে ভালো এসেচি গো,
বাস্‌তে ভালো ভালোবাসি,
তাইতো ভালো বেসেচি গো!
আনো তুমি চিতার দাহ,
আনো শান্তিজলের ধারা,
কান্না-হাসির দোদুল দোলায়
দাও দুলিয়ে নিখিল ধরা।

প্রায়শ্চিত্ত

(গল্প)

[শ্রীঅজিতকুমার সেন, বি, এ]

(১)

আমি রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সময়ের লোক। তাঁরই এক সেনাদলে আমি লেফ্‌টেনাণ্টের কাজ কর্‌তুম। সেই যে ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাতে আমি যোগ দিয়েছিলুম। তারপর সন্ধি হলে, সেনাদল থেকে নাম কাটিয়ে দেশে এসে বিবাহ করে সংসার পাত্‌লুম। বিবাহে যৌতুক হিসাবে শ্বশুরের কাছ থেকে জমিজমা যা পেয়েছিলুম—তাতেই সংসার বেশ চলে যেত।

আজিকার এই রাতটাই আমার জীবনের শেষ রাত। কাল আবার পাখীর গানে সকাল হবে—সবাই সেটা বেশ উপভোগ করবে, কিন্তু আমি তা পারব না। তাই আজ আমি যা বল্‌ব, তার ভিতর সত্য ভিন্ন মিথ্যা মোটেই স্থান পাবে না।

তোমরা মনে ক'রো, আজ আমি যা বলছি তা যেন মৃত্যুর ওপার থেকেই বলছি—কেন না, আমি এখানে বসে আমার হতভাগা জীবনের কথা লিখছি, আর ওদিকে আমাকে চিরজন্মের মত সংসার থেকে বিদায় দেবার জন্ত আয়োজন হ'চ্ছে।

দেশে ফিরে আসবার দিন কতক পরেই আমার সহোদরের ভয়ানক অসুখ হ'ল। ডাক্তার শেষ জবাব দিয়ে গেল। সেই সময়ে আমার মনে খুবই কষ্ট হয়েছিল। হাজার হোক—আমার সহোদর ভাই তো—থাকলুমই বা 'ঠাঁই ঠাঁই'।

আমরা দুই ভাই দুই বোনকে বিবাহ করেছিলুম। দাদার ওপর যত রাগই থাক্ না, আমি তা বৌদিদির কাছে কখনও প্রকাশ কর্তুম না। কিন্তু কেন জানি না, বৌদিদির সামনে গেলেই তিনি সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে চেয়ে থাকতেন। শেষে এমন হল, তিনি অন্তদিকে চেয়ে থাকলেও আমার মনে হত যেন তাঁর চক্ষুদুটি আমার ওপর ন্যস্ত রয়েছে। সাংসারিক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে আমার মন বেশ প্রফুল্ল হ'ত। আর সত্য কথা বলতে কি, বিদেশ থেকে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ শুনে আমার মনে একটু আনন্দও হয়েছিল। কেন এ আনন্দ হয়েছিল, তা জানি না। আমি তাঁকে বাস্তবিকই ভয় করতুম। রাত্রে তাঁর সেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি স্বপ্নে দেখে কতবার আমি চমকে উঠেছি—আজও সে কথা মনে হলে আমার গায়ে রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে।

বৌদিদি একটি পুত্র সন্তান প্রসব ক'রে মারা যান। আমার দাদা যখন দেখলেন যে, তাঁর আর বাঁচবার আশা নেই, তখন তাঁর সেই চারি বৎসর বয়স্ক শিশুর লালনপালনের ভার আমার স্ত্রীর ওপর দিয়ে গেলেন। তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে সেই শিশু—আমার স্ত্রী তার তত্ত্বাবধান করবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও লিখে দিয়ে গেলেন যে, বালকের মৃত্যু হলে আমার স্ত্রীই সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হবে। আমার স্ত্রীকে দাদা ছোট বোনের মতই ভালবাসতেন। মরবার কয়েক মুহূর্ত আগেও আমি পৃথক হয়েছিলুম বলে, তিনি অনেক দুঃখ করলেন। তারপর কথা বলতে বলতে শ্রান্ত হয়ে ঘুমের ঘোরে ঢুলে পড়লেন—সে ঘুম তাঁর আর ভাঙল না!

আমার নিজের ছেলেমেয়ে ছিল না। আমার স্ত্রী তার দিদিকে খুবই ভালবাসত—তাই বালকের মায়ের অভাব সে সব রকমেই পূর্ণ করেছিল। ছেলেটিও তাকে অতিরিক্ত ভালবাসত; কিন্তু কেন জানি না, তার মায়ের মত সে আমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করত না। আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তার চক্ষু দুটিও ছিল—ঠিক তার মায়ের মত। সে কথা ভাবলেই আমার যেন কেমন বোধ উপস্থিত হ'ত।

কখন যে আমার মনে এ ভাব এসেছিল, তা বলতে পারি না—তবে শীঘ্রই আমি বুঝতে পারলুম যে, ছেলেটি আমার কাছে থাকলেই আমার যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হত। সে যেন আমার দিকে কেমন ভাবে চেয়ে থাকত—বিস্ময়ে নয়—তার চাহনির ভেতরে যেন একটা প্রচ্ছন্ন অর্থ ছিল। সে আমাকে দেখে যেন ভয় পেত—অথচ কোনদিন ত আমি তাকে কিছু বলতুম না!

আগেই বলেছি, কোন কথা গোপন করব না। মাঝে মাঝে আমার মনে হত, তার সমস্ত সম্পত্তি আমাদের হ'লে কেমন হত। আমি হয়ত নিজের অজ্ঞাতসারে মনে মনে আশা কর্তুম—সে যাক। তবে এ কথা আজ হলফ্ করে বলতে পারি, প্রথমে কখনও ভাবিনি যে, আমিই তার প্রাণ হরণ করব। আমার মনে এ কথাটা যে হঠাৎ এসেছিল তাও নয়। জগতের শেষ দিনের ভূমিকম্পের সম্বন্ধে মানুষের মনে যে রকম একটা অস্পষ্ট ছবি আঁকা আছে, ঠিক সেই রকম অস্পষ্ট একটা ভাব আমার

মনের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দিত। তারপর সেই ভাবটা যেন ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগ্‌ল। কিছুদিন পরে এই ভাবটিই আমার সারাদিনের চিন্তার কতক অংশ অধিকার কর্‌ল—শেষে এমন হ'ল, দিনের সবটাই আমি এই চিন্তায় মগ্ন থাক্‌তুম। কেবলই ভাবতুম—কেমন করে তাদের ভালর কাজটা শেষ কর্‌ব—কাজটা যে কর্‌ব না—একথা তখন কখনই মনে হত না।

রাত্রে মাঝে মাঝে দোতালায় উঠে দেখ্‌তুম—কি নিবিড়ভাবে সে ঘুমুচ্ছে, বুকের ওপর হাত রেখে। আবার কখনও কখনও তার পড়ার ঘরের জানালার ধারে লুকিয়ে দেখ্‌তুম—সে আমার স্ত্রীর কাছে বসে এক মনে পড়াশোনা কর্‌ছে। গাছের পাতার শব্দে, পাখীর গানে আমি চম্‌কে চারিদিকে চাইতুম—কেউ নেই। আবার দেখ্‌তুম। কেন?

আমাদের বাড়ী থেকে একটু দূরে নিবিড় জঙ্গলে ঘেরা একটা মস্ত পুকুর ছিল। ছেলেটা সেখানে প্রায়ই বেড়াতে যেত। আমি সেখানে একটা ছোট নৌকা তৈরী কর্‌লুম, আর সেটা এমন জায়গায় রেখে দিলুম—যাতে ছেলেটির চক্ষু সহজেই তার ওপরই পড়ে যায়। নিজে দূরে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাক্‌তুম—তার আসার আশায়। সেদিন গেল, আর পরের দিনও কেটে গেল—সে এল না। একটু যেন নিরাশ হলুম। কিন্তু দ্বিতীয় দিন রাত্রে বুঝ্‌লুম যে, সে আমার ফেঁদে ভালে জড়িয়ে পড়েছে। আমার স্ত্রী বল্লে—"দেখ, সে অনবরত নৌকো ভাসাবার কথা বল্‌ছে। নৌকো আবার কোথা থেকে এল?" কথাটা শুনে আমার মনে আশা হল। তৃতীয় দিন আবার লুকিয়ে আছি—দেখি, সে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ছুটে আস্‌ছে, তার মাথার চুল বাতাসে উড়ে উড়ে চলেছে।

মুখের দিকে চেয়ে দেখি—কিসের একটা উন্মাদনায় সে পুকুরের দিকে ছুটে আস্‌ছে। যখন আমার কাছ দিয়ে চলে গেল, তখন শুন্‌লুম সেই আধ আধ ভাষায় গান গাইছে। পা টিপে টিপে ঝোপের আড়াল দিয়ে তার অনুসরণ কর্‌লুম। কেন এ সাবধানতা? আমি এত বড় জোয়ান—সে ত একটা শিশুমাত্র! সে জলের ধারে এল, তার পাশেই আমি! হাত তুলেছি—তাকে ঠেলে জলে ফেলে দেবার জন্যে—জলের ভেতর আমার ছায়া দেখে সে চম্‌কে ফিরে দাঁড়াল।

হঠাৎ চেয়ে দেখি, তার চক্ষুর ভেতর দিয়ে যেন বৌদিদি আমার দিকে চেয়ে আছেন। একি! মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের আলোকচ্ছটা দেখা দিল—তার কিরণ আকাশে, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। একি, চারিদিকে চক্ষু! পাতার আগায়, জলে, স্থলে, আকাশ, ভুবনে! জগতের সবাই যেন সহস্র নয়ন মেলে আমার কাজ দেখ্‌ছে।

সে কি বল্‌ল, বুঝ্‌তে পারিনি—আমি বজ্রাহতের মত হয়ে গিয়েছিলুম। শেষে যখন হুঁস হল, তখন শুন্‌লুম সে বলছে,—"কাকা! কাকা! আমি তোমায় আরো ভালবাস্‌ব।" সে ছুটে বাড়ীর দিকে যেতে গেল।

কয়েক মুহূর্ত্ত কি যে হল, কিছু জানি না—চেয়ে দেখি—আমার হাতে ছোরা—আর!—আর আমার পায়ের কাছে আধফোটা গোলাপের মত ধূলায় মলিন হ'য়ে সে লুটিয়ে পড়ে আছে। গায়ের এখানে ওখানে রক্তের দাগ,—কিন্তু তা হলেও যেন ঠিক বুকে হাত রেখে শান্তির কোলে ঘুমিয়ে রয়েছে!—মুখে কোন চিন্তা, কোন কষ্টের চিহ্নও নেই—সে যেন মরণের কোমল শয্যায় ঢলে পড়েছে!

তখন আমি তাকে অতি সাবধানে কোলে তুলে নিয়ে একটু এগিয়ে এসে একটা ঘন ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রাখ্‌লুম। সেদিকে আমার শোবার ঘর;—মাটি থেকে চার পাঁচ হাত উঁচুতে তার জানালা। রাত্রে এই জানালা দিয়ে নেমে তাকে

সমাধি দেব ভাবলুম। আমার স্ত্রী সেদিন বাড়ী ছিল না—পরদিন সে আসবে।

কাজ শেষ হবার ঘণ্টাখানেক পরে সবাই যখন এসে আমাকে বললে 'ছেলে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না', তখন আমার মনের যে অবস্থা হয়েছিল তা তোমরা কল্পনা করতেও পারো না। যা হোক্, আমি মনের দুর্বলতা দমন করে ব্যস্ত হয়ে চারিদিকে লোক পাঠালুম—তার খোঁজে! কোন লোকের পায়ের শব্দ হ'লেই ভয় হচ্ছিল—ঐ বোধ হয় তার খোঁজ পেয়েছে!

সেই রাত্রেই গভীর অন্ধকারে—তারাখচিত আকাশের নীচে আমি তাকে কবর দিলুম। বোপটা সরিয়ে চাইতেই দেখলুম—একটা জোনাকী পোকা তার বুকের ওপর জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে! তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবার পরও চেয়ে দেখি—মাটির নীচে ঠিক যেখানে তার বুক রয়েছে, তার ওপরে তখনও জোনাকী বসে—যেন তারার দিকে চেয়ে অবাক ভাষায় কিছু জানাচ্ছে! আকাশের দিকে চেয়ে কি জানি কেন ভয় হল—ছুটে পালিয়ে এলুম।

আমার স্ত্রী বাড়ী এসে ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে যেন পাগলের মত হয়ে গেল। আমি নিজের মনে সাহস সঞ্চয় করে তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললুম, "ভয় কি—কোথায় যাবে? এই সে এল ব'লে।" আমার এই রকম মনের কাছে চুরী এক ভগবান ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারেনি। এখন মনে হচ্ছে ভগবান জানতে পেরেছিলেন—তখন ভাবতুম বুঝি ত্রিসংসারে কেউই জানতে পারেনি।

সাবধান হবার জন্যে আমি সমস্ত দিন বই নিয়ে সেই জানালার ধারে বসে থাকতুম—কিন্তু আমার লক্ষ্য থাকত সেই জায়গাটির ওপর।

যেখানে তাকে সমাধি দিয়েছিলুম, সে জমিটা সেদিন নূতন করে ঘাস বসাবার জন্যে খোঁড়া হয়েছিল। আমার কোনদিনের দাগ ধরা যাবে না বলেই আমি ঐ জায়গাটিই সকলের আগে পছন্দ করেছিলুম। পরদিন যারা সেখানে কাজ করছিল আমি তাদের সঙ্গে মিশে, মাটি দুমদাম দিয়ে পিটে দিচ্ছিলুম, ঘাস বসাচ্ছিলুম, যেন আমিও তাদের মত একটা দিন-মজুর। তারা ভাবছিল, বাবু কি পাগল হলেন! কিন্তু তাদের ভাবাভাবির কথা ভাবলে তো আমার চলবে না! যাহোক্, সেদিন সন্ধ্যার ভেতরই তারা কাজ শেষ করে ফেলল। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম।

আমি ঘুমতুম—কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে যেমন সবার মাথা পরিষ্কার থাকে ও মন প্রফুল্ল হয়, আমার তা হ'ত না। রাত্রে চক্ষু বুজলেও দেখতুম—সেই জমী, মাঝে মাঝে দেখতুম—কখনও একটা পা, একটা হাত, কখনও বা মাথাটা আমার দিকে তাদের মত ছুটে আসছে। কতবার মনে হ'ত, ছেলেটা হয়ত বেঁচে আছে। আমি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতুম! ঘুম ভেঙ্গে যেত—গা বেয়ে দরদর ধারে ঘাম পড়ত। রাত্রে আবার কতবার উঠে যে স্থানটি দেখতুম, তার ঠিক নেই। ভগবান! এত কষ্ট!—এ জগতেই নরকভোগ! আগে যদি জানতুম যে এত কষ্ট, তা হলে—! থাক্—

আগেই বলেছি, জানালার ধারে বসে আমার প্রায় সারা দিনটাই কেটে যেত; হঠাৎ কখনও একটা চাকর সেখান দিয়ে গেলে ভয় হ'ত—ওর পা যদি ঐ জমীর ভেতর বসে যায়! কিন্তু কিছু হ'ত না। সেখানে পাখী বসলেও ভয় হ'ত—যদি তার গান শুনতে বা তাকে ধরতে গিয়ে কেউ ওখানে গিয়ে পড়ে। সেখানকার বাতাস আমার কাছে ভেসে আসত—মাঝে মাঝে মনে হত তারা ফিস্‌ফিস্ করে বলছে—হত্যা! নরহত্যা!!

চতুর্থ দিন আমার এক বন্ধু তার একজন বন্ধুকে নিয়ে আমার কাছে বেড়াতে এল। আমার

কেমন ভয় হল। তখন গ্রীষ্মকাল। আমি আমার চাকরকে বাগানে চেয়ার টেবিল আর খাবার দিতে বল্লুম। আমি চেয়ারটি টেনে নিয়ে সেই জায়গাটির ওপর বসলুম। ভাবলুম, আমার অজ্ঞাতে আর কেউ জান্‌তে পার্‌বে না। মনে একটু আনন্দ বল—খুব মদ খেতে লাগ্‌লুম। গল্প মেতে গেলুম।

তারা অনেক কথা বল্‌তে লাগল। আমার স্ত্রীর কথা হল—সে ভাল আছে কি না? তার মন বেশ প্রফুল্ল হয়েছে কি না? হঠাৎ গল্প কর্‌তে কর্‌তে চেয়ে দেখি, সেই অপরিচিতটি কথা বল্‌ছেন আর মাটির দিকে চেয়ে দেখ্‌ছেন। আমার ভয় হল, মনে হল বুঝি সে সব জানে! হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলুম—"আপনি কি মনে করেন তাকে—"আমার কথা থেমে গেল।

"বালকটিকে হত্যা করা হয়েছে? না, না, তা কেন করব। একটা শিশুকে মেরে আর লাভ কি?"—আমিই বোধ হয় তাঁকে সব থেকে ভাল বলতে পারতুম—কি লাভ! যাক্ সে কথা। আমি একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লুম।

বন্ধুরা ভাবলেন—ঐ দুঃখের কথা ওঠাতে আমার মনে বুঝি কষ্ট হল। তাঁরা বলতে লাগলেন, "দুঃখ কি? পাওয়া যাবে।"—যারা বন্ধু। কাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ!

হঠাৎ যেন কিসের চীৎকার শুন্‌লুম। চেয়ে দেখি প্রকাণ্ড দুটো কুকুর পাঁচিল টপকিয়ে বাগানে এসে পড়্‌ল। বন্ধুরা এক সঙ্গে বলে উঠ্‌ল, "কুক্‌রাউণ্ড।"

আমার মাথায় যেন বজ্রপাত হ'ল। এরা যে সর্ব্বনেশে কুকুর! জোরে চেয়ার চেপে ধরলুম—কোন কথাই বল্‌লুম না, নড়লুমও না। তখন কি আমার সে শক্তি ছিল।

কুকুরদুটি চারদিকে ঘোরাঘুরি কর্ত্তে লাগ্‌ল। আমাদের দিকে ফিরেও চাইল না, অনবরত মাটি শুঁক্‌তে শুঁক্‌তে বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল—আমি সেই বৃত্তের মধ্যস্থল। ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশঃ বৃত্ত ছোট হয়ে এল—দেখি তারা আমার পাশে এসে পড়েছে। চেয়ারের কাছে এসে দুটোতে ভীষণ চীৎকার করে উঠল!

বন্ধুরা বলে উঠল—"সর্ব্বনাশ! এখানে ওরা শীকারের গন্ধ পেয়েছে।" আমি বলে উঠলুম—"না, পাইনি।"

আমার বন্ধুটি বলে উঠ্‌লো—"ভগবানের দোহাই, সর। নইলে তোমায় এখনি টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল্‌বে।"

"তাহলেও আমি নড়ব না। ওদের মেরে ফেল, কেটে ফেল।"

হঠাৎ সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটি ওভারকোট খুলে বলে উঠলেন, "এখানে নিশ্চয়ই কিছু অঘটন ঘটেছে। রাজা চার্লসের নামে বল্‌ছি—আপনি সরে যান।"

তারপর তারা আমাকে ধরে সরিয়ে নিয়ে গেল। আমি পাগলের মত তাদের আঁচড়াতে ও কামড়াতে লাগলুম। কিন্তু পরিশ্রান্ত হয়ে পড়াতে তারা আমাকে কাবু করে ফেল্‌লে।—চেয়ে দেখলুম—কুকুর দুটি মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে আকাশে ছুঁড়ে ফেল্‌ছে। আর কিছুক্ষণ পরেই—।

আর বেশী কি লিখ্‌ব। আমি সব স্বীকার করে ক্ষমা চাইলুম। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে চরম শাস্তি পেলুম। মরবার সাহস আমার আছে—আমি হত্যাকারী, আমার কোন বন্ধু, কোন আশা, কোন সান্ত্বনা নেই। না, না, একটু সান্ত্বনা আছে বৈকি! যে সব মানসিক বৃত্তি থাকলে মানুষ কষ্ট অনুভব করতে পারে—সে বৃত্তি আমার স্ত্রী হারিয়েছে—সে এখন উন্মাদিনী!

আজ এই পাথরের ঘরে বসে আছি। জ্যোৎ-

ক্ষীণ অস্পষ্ট আলো ক্ষুদ্র জানালার ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে। দূরে বাগানের গাছে গাছে পাখীর কলরব আমার কাণে যেন কোন্ এক অজানা রাজ্যের গোপন সংবাদ বয়ে আন্‌ছে। এই আমার শেষ রাত্রি—প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই আমি পৃথিবীর কাছে চির-বিদায় নিয়ে চলে যাব।*

* চার্লস ডিকেন্সের 'Murderer's Confessions' গল্পের ছায়াবলম্বনে।

শেষ বোঝা

(গাথা)

(শ্রীআশুতোষ সান্যাল)

(১)

সন্ধ্যার আগে আকাশ জুড়িয়া
কাল মেঘ দেখা দিল,
বৃষ্টি নামিবে এখনি,—ছুটিয়া
যে যাহার গৃহে গেল।
উঠিল বাতাস শন্ শন্ বেগে,
মড়্ মড়্ ঘর কাঁপে;
শিশুরা জড়ায়ে মায়ের গলাটি
মুখখানি বুকে চাপে।
কড়্ কড়্ রবে গর্জ্জিল বাজ,
তড়্ তড়্ বারিধারা,
শঙ্কিত বুকে কম্পিত দীন
দৈন্য-দুঃখে সারা।
কি ক'রে কাটাবে তারা সারারাত,
ভিজে গেল ছেঁড়া কাঁথা,
ঘরের মেঝের এক হাঁটু জল—
উড়েছে চালের বাতা।
দৈন্য তাদের দাঁড়ায়েছে ঘিরে
শতেক সৈন্য নিয়ে,
গ্রাম্য বরষা, শীতের কষ্ট
গেছে হাড়ে হাড়ে সয়ে।

(২)

গ্রামের প্রান্তে করিমের ঘর,
তারও—প্রায় একই দশা,
গরু দুটি তার ভিজিছে বাহিরে
কি করিবে ভাবে চাষা।
নিজেদের প্রাণ লয়ে টানাটানি
কেমনে দেখিবে গরু—।
বলে—"গরু দেখা যাবে বৃষ্টি ছাড়িলে
বাঁচে যদি ছেলে মরু।
বৃষ্টির তোড় কমে এল ক্রমে
কমিল ঝড়ের বেগ,
টিপ্ টিপ্ করে তবুও ঝরিছে—
আকাশ জুড়িয়া মেঘ।
করিমের দ্বারে হেন কালে দিল
কে আসি সজোরে ঘা—
চমকি করিম হাঁকিল সঘনে
"কে তুমি ডাকিছ গা?"
"আমি রামধন,—বড় দরকার"
জবাব আসিল জোরে,
আগড় সরায়ে করিম দেখিল,
রামু দাঁড়াইয়া দোরে।

"কি খবর ভাই এসনা দাওয়ায়,
এখনও ছাড়েনি জ্বর,
এত রাতে দাদা—ছেড়ে জল-কাদা
কি কাজে এসেছ বল ?"
রামুঘোষ কয় "পরাণ মোড়ল
গাড়ী চায় খান চার,
টিসন যাইতে হইবে এখনি
বড় জোর দরকার ;
দুই টাকা করে ভাড়া দিবে তারা
শুনো ভাড়া ইহা ভাই—
কেন যাচি দাদা এমন লাভটা
ডাকিতেছে তোমা তাই।"

(৩)

লাভের কথাটা করিমের প্রাণে
বাজিল মধুর সুরে,
দু' দুটো টাকা ছেড়ে দেবে সে
ষষ্ঠা দুয়ের তরে ?
অনেক ভাবিয়া কহিল করিম
"কি করে যাইব টিসন'
গরু দুটো মোর ভিজে হ'ল খুন
খায়নিক সারাদিন।"
"নিয়ে চল দাদা কিছু হবে নাক'
শক্ত গরুর জানে,
নগদ দু'টাকা কেন ছেড়ে দাও—
এই অকালের দিনে।"
"আচ্ছা চল তুমি, আসিতেছি পিছে
দুটো কিছু মুখে দিয়ে
এখনি সেথায় যাব নিয়ে গাড়ী
মোড়লে কওগে গিয়ে।"

(৪)

তাড়াতাড়ি দুটো পান্তা খাইয়া
চলিল গরুর পানে,
খড় খুলে দিয়ে পাচনী মারিয়া
করিম তাদের টানে।
গরু দুটো কহে নীরব ভাষায়
সিং দুটি নেড়ে নেড়ে,
এতদিন কোন কহি নাই কথা,
ছাড় আজিকার তরে।
অনাহারে প্রাণ ধুঁকিছে দোঁহার
ওঠেনাক কারো পা—
একটি দিনের দাওগো খালাস
হে মনিব বাপ মা।
কে শোনে তাদের ব্যথার রোদন
কে বোঝে বেদনা বল,
হিড় হিড় করে লয়ে গিয়ে টেনে
গাড়ীতে জুড়িয়া দিল।
চরণ তাদের চলেনাক—তবু
টানে প্রাণপণে গাড়ী,
তবু কেন ওগো মারিছ পাচনী
পারে না যে তাড়াতাড়ি।
তাদের যখন ছিল গো সময়
করে নি কোনও ওজর,
টানিয়াছে গাড়ী টেনেছে লাঙ্গল
সারাদিন রাতভোর।

(৫)

মোড়লের বাড়ী আসিয়া করিম
লইল সোয়ারী তুলে,
সারি সারি সারি চারখানা গাড়ী
ষ্টেশনের দিকে চলে।
করিমের গাড়ী পিছায়ে পড়িল
সোয়ারী লাগায় তাড়া—
বলে, "ট্রেন না পাইলে দেখিবে তখন
পাবেনাক মোটে ভাড়া।"
উঠিল করিম গরম হইয়া
মারিল পাচনি জোরে,
তবু তার গরু শোনে না ক কথা
তবু চলে ধীরে ধীরে,

কঠোর মাসের চল শেষ ঘরে
[redacted] ষ্টেশন দূরে—
করিম তখন হাঁপ ছেড়ে বলে
"বাঁচা গেল এইবারে।"
সোয়ারী তাহারে বলে "পাড়োয়ান
তুমি ত' বাঁচিলে ভাই,
মারা যাবো মোরা ভিজিয়া ষ্টেশনে
নাহি যদি গাড়ী পাই।"
"ভেবনা ক' বাবু ঠিক পাবে গাড়ী
এখনো পড়েনি 'পাখা'—
গাড়ী ধরাইয়া খুসি করে তোমা
তবে আমি লব টাকা।"
ষ্টেশনের প্রায় নিকটে আসিয়া
পুনঃ গরু ধীরে হাঁটে,
পারেনাক তারা—করিম সরোষে
সজোরে পাঁচনি পেটে।
ভাবলা গরুটা হঠাৎ কিসের
ছোঁচট্ খাইয়া জোরে,
অবশ হইল হাঁটু ছুটো তার—
উপুড় হইয়া পোড়ে।
ধলাটাও পড়ে সেই ঝাঁকুনিতে
গাড়ীও পড়িল নাথ্,
করিম পড়িল ছট্‌কিয়ে দূরে—
সোয়ারী হইল কাত্।
ভুঁই হতে উঠে করিম দাঁড়াল
কাদা-মাটি গায় মেখে—
গাড়ীর ভেতর চেঁচায় সোয়ারী
মাথায় মাথায় ঠুকে।
গরুর ব্যাভারে রাগিয়া করিম
টানে জোরে দড়ী ধ'রে,
গেল ছিঁড়ে দড়ি—ভাঙ্গিল পাঁচনি
তবু নাহি তারা নড়ে।
আলো লয়ে কাছে শিহরিয়া ওঠে—
দেখে স্থির চোখে চেয়ে,
শেষ কথা রেখে গেছে তারা চলে—
শেষের বোঝাটি বয়ে॥

বংশের কলঙ্ক

(শ্রীসন্তোষ কুমার বসু)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রামসদয়ের বিস্ময়

কালীশঙ্কর বাবু প্রাণাধিক পুত্রকে আসামে পাঠাইয়া যে মনের শান্তিতে ছিলেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালী পিতা—বিশেষতঃ ধনবান পিতা—পুত্রকে—বিশেষতঃ একমাত্র বংশধরকে—ঘরের বাহিরে পাঠাইতে হইলে যে একেবারে জগৎ-সংসার আঁধার দেখেন, এ কথা কে না জানে? ঘরে ভাত বাঁধা আছে, বাহিরের হাঙ্গামায় মাথা গলাইবার আবশ্যক কি। পুত্র দিব্য পায়ের উপর পা দিয়া খাইবে, ঘরসংসার করিবে, তাহা হইলেই নরজন্ম সার্থক হইল, ইহার অধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা করা বাঙ্গালী পিতার আর কি হইতে পারে?

এ সম্বন্ধে কেনেডি সাহেবের সঙ্গে একদিন কালীশঙ্কর বাবুর বাড়ীতে কালীশঙ্কর ও রামসদয় বাবুর কিছু কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

কেনেডি সাহেব অনেক কথার পর বলিলেন,

"যাক্, তর্ক চের হয়েছে, এখন যার কথা নিয়ে এত কথা উঠ্‌লো, তার কথা কিছু বলি শোন। কাল সিবাং স মিল থেকে চিঠি পেয়েছি; চিঠিখানা লিখেছে কোঠারে—"

সাহেবের কথা শেষ হইতে না হইতে হাসির রোল তুলিয়া সরোজ, অনিলা ও অমিয় সেই স্থানে উপস্থিত হইল। অনিলাকে দেখিয়াই কালীশঙ্করের পুত্র-বিরহ-কাতর হৃদয় স্নেহরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল, গম্ভীর মুখখানা হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি স্নেহভরে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে মা লক্ষ্মী এসেছেন। আমি বুঝি বুড়ো জেঠামণিকে ভুলে গেলেন।"

"হাঁ, ভুলে গেছি বৈকি? তুমিই ত' ভুলে গেছ! কৈ, আমায় যে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাবে বলেছিলে, গেলে না দুষ্টু!"—বলিতে বলিতে অনিলাবালা তাড়াতাড়ি আসিয়া জেঠামণির পাকা চুলের উপর হাত দিয়া দাঁড়াইল এবং তৎক্ষণাৎ সাহেবের উপর দৃষ্টি পড়াতে লজ্জায় মুখখানি অবনত করিল।

বুদ্ধিমান সাহেব কালীশঙ্করকে জবাব দিবার অবসর না দিয়াই বলিলেন, "তা হলে আমি এখন যাই, এর পর দেখা হবে।" সাহেব যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন, কালীশঙ্কর বাবু কিন্তু বাধা দিয়া বলিলেন, "না, না, যাবেন কেন, বসুন না, চিঠিখানা কি লিখেছে বলুন না।"

সাহেব বলিলেন, "আজ একটা এন্‌গেজমেণ্ট আছে, এখনই যেতে হবে। এই চিঠিখানা দিয়ে যাচ্ছি, পড়ে দেখ।" তাহার পর হাসি মুখে বলিলেন, "পড়লেই জানতে পারবে আমি যথার্থ ভবিষ্যদ্বক্তা কি না। দেখবে কালী, অরুণের সম্বন্ধে যা বলেছিলুম তাই ফোল্‌লো কি না। আমি এখনও বলে যাচ্ছি, অরুণ তোমার মুখোজ্জ্বল করবে, যথার্থ মানুষের মত মানুষ—যা তোমাদের বাঙ্গালীর ছেলের ভিতর বড় কম—তাই হবে।"

কালীশঙ্করের চোখে জল দেখা দিল, সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল, তিনি সাহেবের হাত ধরিয়া দুই দুই নেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন, সাহেবও তাঁহাদের করমর্দ্দন করিয়া প্রফুল্ল মনে বিদায় লইলেন। সেই সময়ে যদি সাহেব লুকাইয়া দেখিতেন, অনিলাবালার মুখে চোখে কি ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহার আনন্দের মাত্রা শতগুণে বর্দ্ধিত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সাহেব চলিয়া গেলে কালীশঙ্কর বাবু চিঠিখানা সরোজকে পাঠ করিতে দিলেন। সরোজ পড়িতে লাগিল। চিঠিখানা ইংরাজীতে লিখিত। তাহার মর্ম্ম এই :—

সিবাং স মিল।
সাভিয়া—আসাম।

প্রিয় মহাশয়;

আপনার আদেশ অনুসারে আমি হেড আফিস হইতে প্রেরিত নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু অরুণ কুমার দত্তের সমস্ত কার্য্যাবলী ও গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছি। প্রায় দুইমাস হইল, এই নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এখানে আসিয়াছেন, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এখানে যে অদ্ভুত শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আপনি স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। এক কথায় বলি, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, বহু স্থানে ঘুরিয়াছি, বহু লোকের সহিত মিশামিশি করিয়াছি, কিন্তু এত অল্প বয়সে এমন অদ্ভুত দৈহিক ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ আমি দেখি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

প্রথমে অরুণের (আমাকে মাফ করবেন, ইনি হেড আফিস থেকে নিযুক্ত হলেও এবং আমার উপর-ওয়ালা হলেও একে আমি পুত্রের অধিক ভালবেসেছি এবং ইনিও আমাকে যথেষ্ট সম্মান করেন ও ভালবাসেন) দেহের শক্তির কথা বলি।

প্রথমে বিনায়কের (আমার ভাবী জামাতা ও কারখানার অফিসের হেড ক্লার্কের) মুখে অরুণের পরিচয় পেয়ে এবং পরে স্বচক্ষে দেখেও আমার বিশ্বাস হয় নাই যে এই বালকের দেহে এত শক্তি থাকিতে পারে। তার মুখখানি এত কোমল, এত ভদ্রতামাখা, এত সরলতা মাখান, যে প্রথম দৃষ্টিতেই তাকে ভাল না বেসে থাকা যায় না ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণাও হয় যে, তার দেহটাও অমনই কোমল, ওতে যে অসুরের দুর্জ্জয় শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তা কিছুতেই মনে হয় না। কিন্তু প্রথম দিন এখানে পদার্পণ করিয়াই অরুণ যে শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, সে সাধারণ মানুষের শ্রেণীতে গণ্য হইবার নহে।

বলিয়াছি, কুলীরা সন্তুষ্ট চিত্তে বেশী কাজ করিতেছে। কেন করিতেছে ? ভাবিবেন না যে, অরুণ তাহাদিগকে কেবল মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া এইরূপ করিতেছে। সে কুলীদের সুখ-দুঃখ দেখে, তাহাদের সঙ্গে মিলে মিশে, তাহাদের অভাব-অভিযোগ শুনে, তাহাদের খেলাধূলার, আমোদ-প্রমোদের, দেহের উন্নতির ও মনের উন্নতির ব্যবস্থা করে। তাই কুলীরা এত বশ। সে এখানে কুলীদের বাস করিবার ঘর কত ভাল করিয়া দিয়াছে, বিবাহিত কুলী পুত্র-পরিবার লইয়া যাহাতে সুবিধাজনক বাসা পায়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে, কারখানার পার্শ্বস্থ জঙ্গল সাফ করাইয়া এবং সেখানকার ভূমি চৌরস করিয়া দিয়া তাহাদের ব্যায়াম করিবার ও খেলিবার সুন্দর জায়গা করিয়া দিয়াছে, সন্ধ্যার পর পাছে পচাই খাইয়া তাহারা পশুতে পরিণত হয় এইজন্য একটা নৈশ-বিদ্যালয় করিয়া দিয়াছে এবং বিনায়ককে ও আর একজন শুভরাটী ক্লার্ককে সেখানকার মাষ্টার করিয়া দিয়াছে। এমন ছেলেকে কে ভাল না বেসে থাকতে পারে!

হুজুর এই সুন্দর ছেলেটীকে এখানে পাঠিয়ে কেবল যে কারখানার ভাল করেছেন তা নয়, আমারও প্রভূত মঙ্গল সাধন করেছেন। এখানে পরিবার নিয়ে বাস করে যে দুটো অন্ন করে খাব, এ ভরসা আমার ছিল না। মোটে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে যে ভাবনায় ফেলেছিল, তা আর কি বলবো ! এখন অরুণের কল্যাণে সকল দুর্ভাবনা দূর হয়েছে। বিশেষতঃ আমার অবিবাহিতা বয়স্থা কন্যা মৈথিলীকে কোথায় রাখিব, এই ভাবনায় আমি পাগলের মত হইয়াছিলাম। এখন আর কোন ভয় নাই। অরুণ এখানে থাকিতে আর কোনও ভয় নাই, তাই আমি আমার স্ত্রী-কন্যাকে এখানে আনাইয়াছি। আমার স্ত্রী প্রথম দর্শনেই অরুণকে পুত্রবৎ ভালবাসিয়াছে। আর মৈথিলী তাহাকে যা ভালবাসে, তাহা আপনাকে কি বলিব ! বোধ হয় মার পেটের ভাই হইলেও সে অরুণকে এত ভালবাসিত না। সে নিজের হাতে নানা খাবার প্রস্তুত করিয়া তাহাকে খাওয়ায়, বিনায়কও তাহাতে মহাসন্তুষ্ট। ফল কথা, আমার কন্যা, বিনায়ক ও গঙ্গার জন্য অরুণের কোনও অযত্ন হইতেছে না। আপনি তাহার যত্ন লইতে বলিয়াছিলেন বলিয়া নহে, আমরা তাহাকে সকলে আপনার জনের মত ভালবাসি বলিয়াই তাহাকে যত্ন করিতে ইচ্ছা করে।

আর বেশী লিখিবার কিছু নাই, ভবিষ্যতে যেমন যেমন ঘটে, তেমনই হুজুরে লিখিয়া পাঠাইব। অরুণের কথা লিখিয়া ফুরাইবার নহে। তাহার সব ভাল, কেবল একটী দোষ আছে। বেশ হেসে খেলে আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়ায়, কিন্তু তার ভিতরেও দেখেছি ওর হাসি-হাসি মুখখানা হঠাৎ বিমর্ষ হয়, মুখে ঘোর যাতনা ফুটিয়া উঠে, কাজ করিতে করিতে অন্যমনস্ক হয়। আমার মনে হয়, আমার মেয়েও আমাকে বলিয়াছে, ও নিশ্চয়ই মনে মনে কোনও একটা

ব্যাকুল ভাবনা পুষিয়া রাখে। বোধ হয়, ও কারও জন্ত অভাব অনুভব করে, কারও কথা ভাবে। যখ এই ভাব হয়, তখন ওকে কেহই শান্ত করিতে পারে না, ও তখন সব কাজ ফেলিয়া রাখিয়া আপনার মনে নদীর তীরে চলিয়া যায়, অথবা মাছ ধরিতে বসে, কিম্বা জঙ্গলের মধ্যে বন্দুক লইয়া শিকার করিতে যায়। যদি পরে আমরা ঐ সব স্থানের ভয় বা বিপদের কথা বলিয়া অনুযোগ করি, তাহা হইলে হো হো রবে হাসিয়া উঠে।

এই পত্রের সঙ্গে একটা হিসাব পাঠাইলাম। হিসাবটা দেখিবেন এবং বাবু মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য আগে করিবেন। বাবু মহাশয়কে আর স্বতন্ত্র পত্র লিখিলাম না। আমার মনে হয়, গবর্ণমেণ্টকে ধরিয়া বর্ষার দিক হইতে কাঠ আনাইতে পারিলে আমাদের কারবারের সুবিধা হয়। নদীর জলে ভাসান দিয়া আনাইলে চলিবে। এ বিষয়ে মহাজন ও দালাল ঠিক করিয়াছি।

আপনারা অধীনের যথাযোগ্য অভিবাদন জানিবেন। ইতি

অনুগত

পুরুষোত্তম কোঠারে।

সরোজ যখন পত্রপাঠ করিতেছিল, তখন রামসদয় বাবুর দৃষ্টি তাহার দিকেই নিবদ্ধ ছিল; কিন্তু বৃদ্ধ কালীশঙ্করের তাহা ছিল না, অন্ততঃ তাঁহার অপাঙ্গে দৃষ্টিটা যে অন্যত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না। কালীশঙ্কর তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা নবযৌবনসমুদ্ভা অনিলার মুখ চক্ষুর নানা ভাব ভঙ্গি তাহার অলক্ষ্যে লক্ষ্য করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। কখনও আনন্দ, কখনও গর্ব্ব, কখনও লজ্জা, কখনও ভয়,—চিঠি শুনিতে শুনিতে অনিলার মুখে চোখে এমনই কত ভাবের অভিব্যক্তি হইতেছিল। বিশেষতঃ কোঠারের বয়স্থা কন্যা মৈথিলী অরুণকে ভালবাসে শুনিয়া অনিলার মুখ যখন বিবর্ণ হইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ মৈথিলী ভগিনীর ন্যায় ভালবাসে শুনিয়া তাহার স্বস্তির নিশ্বাস প্রবাহিত হইল ও মুখখানি মেঘমুক্ত চাঁদের মত হাসিয়া উঠিল, তখন কালীশঙ্করের আর আনন্দের সীমা রহিল না। আবার যখন অনিলা শুনিল, অরুণকে যে দেখে, যে তাহার সহিত ব্যবহার করে, সেই তাহাকে ভালবাসে, তাহার মন হয়, তখন তাহার মুখে চোখে স্পষ্টই গর্ব্বের চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিল, এবং সেই চিহ্ন দেখিয়া কালীশঙ্করও গর্ব্ব অনুভব করিলেন। অরুণ কুলীদের সহিত মিশে, তাহাদের সুখ-দুঃখ দেখে, তাহাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে,—এ সকল কথা শুনিয়া অনিলার মুখে যেমন একটা ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসার ভাব ফুটিয়া উঠিল, অরুণ একাকী বিপদের মুখে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তমনে অগ্রসর হয় শুনিয়া তেমনই তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু কালীশঙ্কর বাবু দেখিলেন, অনিলার ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা তৃপ্তির ভাব যেন প্রচ্ছন্ন ভাবে মিশাইয়া রহিয়াছে। অরুণ তাহার অভাব অনুভব করে বা তাহার কথা ভাবে, সেই জন্ত নির্জ্জনে চিন্তা করিতে যায়, কোন বিপদের ভয় করে না,—এই ভাবিয়াই কি অনিলার এই তৃপ্তি?

পত্র শেষ হইলে রামসদয় বাবু যেন বিস্ময়াবিষ্টের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বাঃ শুনতে বেশ! তবে, পরিবর্ত্তনটা একটুকু নাটুকে ধরণের ব'লে বোধ হচ্ছে না?"

সরোজ এই কথায় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিয়া উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে দেখিল তাহার গুরুজনদিগের মধ্যে কথা হইতেছে, তাই সে নীরবে রহিল। কিন্তু তাহার দুঃখ করিবার কারণ /দুখে চোখে এমনই কত ভাবের অভিব্যক্তি রহিল না, কেন না, কালীশঙ্কর বাবু একটু

কণ্ঠস্বরে জবাব দিলেন, "তোমার কাছে আশ্চর্য্য বা ভাল ব'লে দেখাতে পারে, কিন্তু যারা আমার অন্তরকে জানে, তারা কখনও তা বলবে না। সাহেব কি বলে গেলেন? এই সরোজকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না। কি আশ্চর্য্য, তুমি ত' আগে ওকে আমার চেয়েও ভালবাসতে, প্রশংসা করতে!"

"হাঁ, তা করতুম, স্বীকার করছি। যতদিন প্রশংসার যোগ্য ছিল, ততদিন করেছি। এখন যদি নিজের কাজ করে, তা হলেও তার গুণ গাইবো, এমন অন্ধ আমি নই।"

"কি নিজের কাজ করেছে? তা হলে তুমি কি বলতে চাও, এই পুরুষোত্তম কোঠারে বানিয়ে বানিয়ে তার গুণ গেয়েছে? এতগুলো লোককে সে যে বশ করেছে, সেটা নিজের গুণে, না কোনও ভেল্‌কী-বাজীতে?" কালীশঙ্করের মুখে বিদ্রূপের হাসি খেলিয়া গেল।

বন্ধুর এই বিদ্রূপের হাসিটা রামসদয় বাবুকে অস্ত্রের অধিক আঘাত করিল। তিনি যেন মিথ্যা করিয়া বন্ধুপুত্রের নামে নিন্দা রটাইতেছেন, এই ভাবের অভিব্যঞ্জনা ঐ বিদ্রূপের হাসিতে তিনি স্পষ্ট লক্ষ্য করিলেন। ইহাতে তিনি অপমানিত মনে করিয়া ক্রোধভরে বলিলেন, "নিজের কাজ করেছে, তোমার পাড়াতেই খোঁজ করলেই জানতে পারবে। চাপা ত' কিছুই নেই।"

কালীশঙ্কর বাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন "পাড়াতে? তার মানে?"

রাম সদয় বাবু আরও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "মানে আবার কি? তোমার ভয়ে কেউ কিছু তোমার সামনে বলে না; না হলে মুড়ীওয়ালীর—"

সরোজ এই সময়ে হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাধা দিয়া বলিল, "কি যে তুচ্ছ কথা নিয়ে গোল পাকাচ্ছেন! চলুন কাকাবাবু, বেলা হ'ল বাড়ী যাই।

রাম সদয় বলিলেন, "হাঁ, এই যাই—চল নিলা।"

অনিলা উঠিল না, সে ধীরগম্ভীরভাবে তাহার জেঠামণির হাতখানি ধরিয়া বসিয়া রহিল। রাম সদয় পুনরায় ডাকিলে সে গম্ভীরভাবেই বলিল, "তোমরা যাও বাবা। আজ আমি অমিকে নিয়ে জেঠামণির সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যাব।"

রামসদয় একেই পূর্ব্ব হইতে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, এখন অনিলার এই কথা শুনিয়া একবারে তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গেল। তাই তিনি যে অনিলাকে কখনও একটী কড়া কথা বলেন নাই, সেই অনিলাকেই বলিলেন, "বেশ, তাই হ'ক। যত হয়েছে স্বেচ্ছাচারীর দল! কালী, আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়েছে, এখন দেখছি এই মেয়েটারও খাবে। এস সরোজ" বলিয়া রাগে গর গর করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন। সরোজ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। কালীশঙ্কর আশ্চর্য্য হইয়া ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "কেন গেলিনে মা, সহ্য বড় রেগেছে।" অনিলা হাসিয়া বলিল, "ও রাগ পড়ে যাবে' খন। চল না জেঠামণি যাই এখনই। অমি কি বলিস, এখনই যাবি না ওবেলা যাবি!" অমিয় হর্ষধ্বনি করিয়া বলিল, "এখনই দিদি।"

গাড়ীতে রামসদয় বাবু গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন, সরোজও কোন কথা কহিল না। বালিগঞ্জের বাড়ীতে পৌঁছিয়া বেশাদি পরিবর্ত্তন করিয়া রাম সদয় বাবু লাইব্রেরী ঘরে গিয়া বসিলেন এবং সরোজনাথকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সরোজ তাঁহার ধর্য্যার বারিভরা মেঘের মত শুরু গম্ভীর বদন দেখিয়া মাত্র বুঝিল, আজ একটা কিছু কাণ্ড ঘটিবে, অধিকক্ষণ তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল না। রাম সদয় বাবু কোনও রূপ ভূমিকা না করিয়া সরাসর বলিলেন, "বস, সরোজ। আজ তোমার কাছে আমি একটা কথার স্পষ্ট জবাব চাই। মনে রেখ, এটা ছেলেখেলা হচ্ছে না। আমি খুব ভেবে চিন্তে

জিজ্ঞাসা করছি। সেদিন যে প্রস্তাব করেছিলুম, তাতে তোমার প্রকৃত মতামত কি?"

প্রস্তাব কি, তাহা সরোজ তখনই বুঝিয়াছিল, হতাশি জবাবের সময় লইবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিল, "প্রস্তাব? কি প্রস্তাব?"

রামসদয় বাবু বলিলেন, "এর মধ্যে তোমার কাছে একটার বেশী দুটো প্রস্তাব করিনি, কাজেই প্রস্তাবটা মনে না পড়াই আশ্চর্য্য। যাক্, খোয়াড়ের দরকার নেই, স্পষ্ট করেই বলছি, আমি আগামী মাসেই একটা দিন দেখিয়ে তোমার সঙ্গে নিলার বিয়ে দিতে চাই, সে জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে থাক।"

সরোজের মুখমণ্ডল গম্ভীর আকার ধারণ করিল। সে কণকাল নীরবে থাকিয়া বলিল, "এ বিষয়ে আমি ত' সেদিনই আমার মত প্রকাশ করেছি, কাজেই ঐ প্রস্তাবটা আবার তোলাই উচিত হয় নি।"

আজ রামসদয় বাবুর মেজাজ পূর্ব্ব হইতেই ভাল ছিল না, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কাজেই সরোজের জবাব শুনিবামাত্র তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "আমার কি করা উচিত অনুচিত, সে বিষয়ে পরামর্শ দেবার এখনও তোমার বয়স হয় নি বলেই মনে করি। এখন আমি যা বলছি, তার জবাব দেও। এ বিবাহে তোমার আপত্তি আছে কি না।

সরোজ বিনীতভাবে বলিল, "আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি, এটা অসম্ভব, ভাই-বোনে কখনও বিয়ে হতে পারে না।"

"ভাই বোন তোমরা যখন নও, তখন ত আপত্তি থাকতে পারে না।"

"প্রকৃত ভাই বোন না হ'লেও আজন্ম ব্যবহার ভাই। কাজেই অসম্ভব।"

"এই কি তোমার শেষ কথা?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

রামসদয় এইবারে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া বলিলেন, "বেশ, তা হ'লে আমারও শেষ কথা শোন। আমি নিলাকে কোন সুপাত্রের হাতে দিতে চাই। তোমাকেই আমি সকলের চেয়ে সুপাত্র বলে মনে করি। তুমি যদি নিলাকে নিতে চাও ভালই। এত সব দিকে বজায় থাকে—তুমি যদি অসম্মত হও, তা'হলে জোর নেই এটা সত্য; কিন্তু আমাকে নিলার জন্য সুপাত্র দেখতে হবে। সুপাত্র জুটলে তার হাতে শুধু নিলাকে দিয়ে ক্ষান্ত হব না, আমার যা কিছু আছে সব তাকে আর তোমাকে দিয়ে যাব!"

সরোজ সব শুনিল। তাহার মুখে চোখে কোন রূপ চিত্তচাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকটিত হইল না, কেবল একটা অব্যক্ত ক্ষীণ হাসির রেখা ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিল। মানুষ কি অন্ধ! হায় রামসদয় বাবু! এত বিজ্ঞ, সংসারী, এত মেধাবী হইয়াও, সরোজের সহিত ব্যবহার এতদিন করিয়াও, সরোজকে চিনিতে পারিলেন না!

সরোজ ধীরস্বরে বলিল, "সে ত' ভাল কথা, কাকাবাবু। আমিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমার ছোট বোনটির জন্যে সুপাত্র খুঁজবো। তবে আমার মতে সুপাত্র হাতেই রয়েছে-অনর্থক ঘুরে ফল কি?

রামসদয় বাবু সক্রোধে টেবিলের উপরে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, "কখন না। তুমি যা ভাবছ, আমি থাকতে তা কখনই হবে না। অকূলের হাতে মেয়ে দিতে যে পারে সে পারে, আমি পারি নে। আর খোঁজবারই বা দরকার? তুমি সম্মত না থাক, রমেশ ত' রয়েছে।"

সরোজ একবারে চমকাইয়া উঠিল। সে তখনও তাহার শ্রবণশক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, তাই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে রয়েছে?"

রামসদয় বাবু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "রমেশ, রমেশ। কেন, শুনতে পাচ্ছ না? আমাদের

গ্রাইভেট টিউটার রমেশ। সে কি মন্দ ছেলে? দেখতে শুনতে ভত ভাল নয়, এই যা। আর অবস্থা? তা সে যা যৌতুক পাচ্ছে, তাতেই সে বেশ সুখে থাকতে পারবে, কি বল?"

সরোজের মন আর বাধা মানিল না, সে ব্যগ্র ভাবে বলিল, "কি বলছেন আপনি, রমেশ? অনিলার যোগ্য পাত্র রমেশ? আপনি কি পাগল হয়েছেন?"

রামদয় বাবু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কেন, রমেশের কি দোষ দেখলে? রমেশের মত লেখাপড়ায় কটা ছেলে আছে? তবে তার কথায় আপত্তি করছ কেন? এটা কি হিংসে নয়?"

সরোজ কাতরস্বরে বলিল, "আপনি ভুল বুঝছেন কাকাবাবু। কারুর প্রতি আমার কোনও হিংসে নেই। তবে আপত্তি করছি কেন, না অনিলাকে আমি যথার্থ ভালবাসি ব'লে, তার মঙ্গল অমঙ্গল দেখবো ব'লে। যাকে সুখী দেখতে আমি এই তুচ্ছ প্রাণ দিতে পারি, তার জীবনসর্বস্বের ভার কার হাতে দিতে যাচ্ছেন, তা দেখবো না? আপনি কি মনে ভাবছেন, যার তার হাতে দিলে অনিলা সুখী হবে? তা হ'লে আপনি এখনও তাকে চেনেন নি। সে এই বয়সে যা শিক্ষালাভ করেছে—কেবল পুঁথিগত নয়—যাকে বলে সামাজিক শিক্ষা—তা এদেশের অনেক নারী চিরজীবনেও শিখতে পারে না। সে বুঝতে শিখেছে, ভালমন্দ বিচার করতে শিখেছে, সে নিতান্ত বালিকা নয়। সে কি রমেশকে চেনেনি বোঝেনি ভাবেন? রমেশের প্রাণটা কতটুকু, হৃদয়টা কত সঙ্কীর্ণ, তা কি সে এতদিনের ব্যবহারেও জানতে পারে নি। কেবল বিদ্যা বা রূপে মানুষ সুন্দর হয় না। অন্ততঃ শিক্ষিতা সুন্দরী বালিকার মনে দাগ বসাতে হ'লে কেবল বিদ্যায় বা রূপে কুলায় না। এটা আমার একটা মন-গড়া কথা নয়, জগতের বড় বড় লেখক একথা বলে গেছেন।"

রামদয় বাবু সরোজের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "বটে? তা হলে তোমাদের বড় বড় লেখকদের মতে নারীর মনে দাগ বসাবার উপযোগী উপাদানগুলো কি? কোন বড় লেখকই বা সে কথা বলে গেছেন?"

সরোজ বলিল, "ডেসডিমনা ওথেলোকে ভালবেসেছিল কেন, দময়ন্তী নলকে ভালবেসেছিলেন কেন, রুক্মিণী কৃষ্ণকে ভালবেসেছিলেন কেন? এ ত' চোখে দেখে ভালবাসা নয়, এ কেবল গুণ শুনে। আর যদি চোখের সামনে নারী অপেক্ষাকৃত কারো রূপ গুণ দেখে আকৃষ্টই হয়, তাহলে সেই আকর্ষণ কত গাঢ় হয়? আমি বেশী কথা বোলবো না। কেবল এইটুকু বলতে চাই, রমেশের হৃদয়ের এমন কিছু গুণ নেই যার জন্যে তার দিকে অনিলার মন টানবে। আমি রমেশের নিন্দে কোরবো—বিশেষতঃ তার অসাক্ষাতে এমন ধারা আমার মনে ছিল না। কেবল অনিলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাধ্য হয়ে আমার মনের ভাব প্রকাশ করতে হ'ল।"

"কিন্তু দেখ, দুদিন একত্র বসবাসে মনের মিল হতে পারে।"

"যার পায়ে তার পায়ে, অনিলার যে হবে না তা আমি শপথ করে বলতে পারি।"

"কেন?"

"কেন? তা হলে আমায় সব কথাই বলতে হবে। দেখুন, আমি অরুণকে যেমন জানি, বোধ হয় আপনারা তেমন কেউ জানেন না। তাই বলছি অরুণের এমন কতকগুলো যোগ্যতা আছে যাতে ও সকলের মন আকর্ষণ করতে পারে। সে যে অনিলারও মন আকর্ষণ করেছে, তার প্রমাণ আমি অনেক পেয়েছি। তাই বলছিলুম অরুণই অনিলার একমাত্র যোগ্য পাত্র।"

সরোজ আরও কি বলিতে যাইতেছিল। রামদয় বাবু বাধা দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া পুনরায় টেবিলে

প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "নরেশ! তোমাদের এসব কথার মাথা-মুণ্ডু নেই। তোমাদের যে মতই থাক, আমি ঠিক করলুম রমেশের হাতেই নিলাকে দিতে এবং বিষয়ের অর্দ্ধেক রমেশকে যৌতুক দিতে। এতে তুমি চক্ষু কোরো না, তুমি নিজের দারিদ্র্য নিজেই ডেকে আনছ।"

সরোজ ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "আপনার পুত্র-কন্যার সম্বন্ধে আপনি যা ব্যবস্থা করবেন, তার উপর কথা কইবে এমন সাধ্য কারও নেই। তবে বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে যা বল্লেন, তাতে আমার একটা কথা বলবার আছে। আমি চির-দরিদ্র। পথের কাঙ্গালকে ধূলো হ'তে কুড়িয়ে নিয়ে আপনি কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছেন। বাপ মায় যা করেছে আপনারা তার বেশী করেছেন —লোকে বাপ মার ঋণ কখনও শুধতে পারে না, আমি আপনার ঋণ শুধবো কি করে? যে ঋণ ইহ-জন্মে শুধতে পারবো না, সেই ঋণের উপর আবার এই বিষয়দানের ঋণ চাপিয়ে আমায় যে একবার ধূলো হতেও ধূলো ক'রে ফেলেন নি, এই আমার পরম সৌভাগ্য। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার মহত্বের কথা ভাবতে ভাবতে তাতে অণুপ্রাণিত হয়ে আপনার দেখান পথ ধরে চলে যেতে পারি।" সরোজের মুখে চোখে এক অপরূপ দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সরোজ ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিল।

রামসদয় বাবু সেই জ্যোতি লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি জানিলেন, সরোজ যাহা বলিয়া গেল, তাহার কোথাও একটুকুও মিথ্যা নাই সে যে ধন-লোভকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু সে ইজিতের মঙ্গলের জন্য ধন লোভ হইতেও উচ্চে তীব্র আত্মসম লোভ ত্যাগ করিতে পারে তাহা জানিতেন না। তাই বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া সরোজের চলন্ত মূর্ত্তির প্রতি তাকাইয়া রহিলেন।

[ক্রমশঃ]

"আমি কি হ'য়েছি সই?"

(শ্রীলীলা দেবী)

আমি কি হ'য়েছি সই?
এক পল যারে না হেরে পাগল
সেই তায় ছেড়ে রই?
নিজেই নিজেরে না পারি চিনিতে
মুকুরেতে শতবার
বিশ্বাস না আসে আঁখি জলে ভাসে
সখি, মণিময় হার!

তবে কি পিয়াছি ম'রে?
শুনেছি সজনি মরণ-শরণে
কল বেদনা হরে?
হৃদয়ে গোপনে মরণ অধিক
বিষম কটাক্ষ-বাণ
হানে সে আজিও শরে অনুক্ষণ
তাই বলি আছে প্রাণ;

তবে কি পাষাণময়?
মানুষ হইলে মরিয়া যেতো যে
এ কথা কি ঠিক নয়?
পাথর হইলে ফাটিয়া যেতো যে
এ বুক ফাটিল কই?
হায় তবে আমি কি হ'য়েছি আজ
বল্‌নাকো তোরা সই?

পরাজয়

(গল্প)

[শ্রীঅভয়কুমার সেন]

(ক)

সখী মুরলাকে নির্জ্জনে পাইয়া রাজকুমারী তরলিকা বেদনাসিক্ত কণ্ঠে কহিল, "মুরলা, আজ যুদ্ধের সংবাদ কি ?"

সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে মুরলা উত্তর দিল, "যুদ্ধের খবর শুনে তোমার লাভ কি রাজকুমারী ?"

"না, আমায় বোল্‌তেই হবে আজ যুদ্ধের খবর কি—"

রাজকুমারীর প্রশ্নে মুরলা কহিল, "এইমাত্র দূত এসে সংবাদ দিল যে মহারাজের জয়ের আশা খুবই বেশী।"

শুনিয়া রাজকুমারী কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা মুরলা, তুই বোল্‌তে পারিস্, যুদ্ধ কোরে কি লাভ হয় ?"

রাজকুমারীর কথা শুনিয়া মুরলা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "যুদ্ধ কোরে লাভ আছে বৈকি রাজকুমারী —নইলে রাজাতে রাজাতে যুদ্ধ করে কেন ?"

কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন চিত্তে রাজকুমারী কহিল, "লাভ ত ভারী, কেবল প্রাণনাশ আর রক্তের স্রোত ; এই ত লাভ, না আর কিছু আছে মুরলা ?"

রাজকুমারী মুরলার দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

রাজকুমারীর উত্তরে মুরলা কহিল, "যুদ্ধ কোরতে গেলেই মানুষ মরে আর রক্তেরও স্রোত বয়—এটা স্বাভাবিক। রাজারা যুদ্ধ করে কেন, না, তাঁদের মান প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য্য ও রাজ্য বিস্তার হবে বোলে।"

কিছুকাল নীরব থাকিয়া তরলিকা কহিল, "এর জন্যই কি যুদ্ধ ! আচ্ছা মুরলা, পরের রাজ্য মেরে ধরে কেড়ে নিলে তাতে আত্ম-সম্মান বাড়ে না কমে ? আমাদের রাজ্য বিস্তার করবার কি প্রয়োজন ?" এই কথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ ভারি এবং চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল।

রাজকুমারীর আর্দ্র চক্ষু দেখিয়া মুরলা কহিল, —"তুমি এত দুঃখ কর কেন ? এটা রাজধর্ম্ম— এতে ত কোন অন্যায় নাই। তুমি চেষ্টা কোর্‌লেই কি যুদ্ধ একেবারে বন্ধ হোয়ে যাবে—তা' হবে না। এই যুদ্ধ যুগ-যুগ ধরে চলে আস্‌ছে। এ কেউ বন্ধ কোর্‌তে পারেনি—এবং কোনদিন যে বন্ধ হবে এ আশাও কম।"

মুরলার কথা শুনিয়া কম্পিত কণ্ঠে রাজকুমারী কহিল, "তবে কি এই যুদ্ধ সমান ভাবেই চিরকাল চল্‌বে ?"

শান্ত-কণ্ঠে মুরলা কহিল, "যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের মধ্যে পশুশক্তি বজায় থাক্‌বে, ততদিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না।"

"না মুরলা, যুদ্ধ করা ভাল নয়। আমি মহারাজকে অনুরোধ কোর্‌ব—তিনি যেন আর যুদ্ধ না করেন। এতে লাভ কি—লোক-ক্ষয় ও রাজ্যনাশ ছাড়া অন্য কিছু লাভ আছে কি ?" বলিয়া রাজকুমারী বিষণ্ণ চিত্তে বাতায়নে দাঁড়াইয়া সুদূর প্রসারিত-গিরি-মালার দিকে নিমেষহারা দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

রাজকুমারীর অকারণ চিন্ত-চাঞ্চল্য দেখিয়া মুরলাও নীরবে রাজকুমারীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

(খ)

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া প্রভাতের স্নিগ্ধ-

শীতল বাতাসের পেলব পরশে রাজকুমারীর আঁখি-যুগল ঘুমের ঘোরে মুদিয়া আসিল। কিছুকাল স্তব্ধতানিত তোরণ শয্যায় শয়ন করিয়া হঠাৎ রাজ-প্রাসাদের তোরণ হইতে নহবতের রাগিণী কাণে আসিয়া প্রবেশ করিবামাত্র, রাজকুমারী চকিতে উঠিয়া মুরলাকে ডাক দিয়া কহিল, "মুরলা, একবার উঠ্‌ত—"

রাজকুমারীর আহ্বানে মুরলা উঠিয়া কহিল, "ডাক্‌ছ কেন রাজকুমারী?"

"এখনি গিয়ে একবার শুনে আয় ত যুদ্ধের সংবাদ কি?"

চক্ষুর মার্জ্জনা করিতে করিতে মুরলা কহিল, "আচ্ছা রাজকুমারী, তুমি এত উতলা হোয়ে পড়্‌ছ কেন? যুদ্ধ জয় হোক বা নাই হোক, তার জন্যে তুমি এত ব্যস্ত কেন!"

মুরলার কথায় রাজকুমারী ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, "আমি উতলা হব না, তবে হবে কে?" বলিয়া সে মুরলার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

মুরলা রাজকুমারীর প্রাণের গোপন বেদনা বুঝিতে পারিল; সে ত্বরিত গতিতে বাহির হইয়া গেল।

মুরলা দৃষ্টির অন্তরাল হইলে, রাজকুমারী তরলিকা তাহার কারু-কার্য্যখচিত মূল্যবান অঙ্গরাখার মধ্য হইতে একখানি চিত্র বাহির করিয়া এক দৃষ্টিতে তাহাই দেখিতে লাগিল।

দর্শনে যখন তৃষ্ণা মিটিল না, তখন অতি সন্তর্পণে উহা বুকের অতি নিকটে লইয়া, কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর অতি গোপনে সেই চিত্রখানির উপর একটি মৃদু চুম্বন আঁকিয়া দিল। লজ্জায় তাহার বদনকমল রক্তিম হইয়া উঠিল।

(৭)

সেদিনকার যুদ্ধের সংবাদ ভাল ছিল না। এই সংবাদ শ্রবণে রাজপ্রাসাদের সজীবতা এক নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া গেল—নগরবাসীর মন আতঙ্কে বারংবার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

হঠাৎ দূত আসিয়া আশু জয়ের সংবাদ দিবা মাত্র রাজপুরীর বিরাট নীরবতা চকিতে হর্ষের কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। রাজপথ জনস্রোতে প্লাবিত হইয়া উঠিল। রাজপ্রাসাদ আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল।

তারপর অন্য এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল—শত্রুপক্ষ নবোদ্যমে বলীয়ান হইয়া অদম্য উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের অপ্রতিহত বিক্রম প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্য।

এই দুঃসংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, রাজপ্রাসাদের আলোকমালা নিবিয়া গেল। প্রাসাদ তোরণের নহবৎ নীরব হইয়া গেল—ফুলের রাশি ধূলায় ঝরিয়া পড়িল। পৌর ও জানপদবাসিদিগের প্রফুল্ল মুখ অচিরে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। হর্ষের পরিবর্ত্তে বিষাদের চিহ্ন চারিদিকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

মহারাজের আদেশে গোপন সভা আহূত হইল। তাহাতে স্থির হইল যে, তিনি নিজে যুদ্ধস্থলে যাইবেন।

* * * *

মহারাজের আগমন সংবাদে সৈনিকবৃন্দ বিপুল উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া শত্রুদিগের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদিগকে মথিত করিয়া ফেলিল। সৈনিকদিগের অতুল বীর্য্যের সম্মুখে শত্রুসৈন্য অধিকক্ষণ যুঝিতে পারিল না, বন্যার জলের মত দেখিতে দেখিতে তাহারা ভাসিয়া গেল।

যখন শত্রুপক্ষের আর কেহই যুদ্ধস্থলে দেখা দিল না, তখন মহারাজ যুদ্ধস্থল পরিদর্শনে বাহির হইলেন। অদূরে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি বিস্মিত হইয়া দেখিলেন—একটি রমণীমূর্ত্তি ধূলায় মলিন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! ত্বরিত গতিতে নিকটে গিয়া মুখের দিকে চাহিয়াই তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন। মৃত্তার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া আকুল কণ্ঠে রাজা কাঁদিয়া উঠিলেন—"মন্ত্রী, আজ যে আমার পরাজয়!"

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য-প্রতিভা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম্-এ, বি-এল)

'গৃহলক্ষ্মী' বা 'আদর্শ গৃহিণী'র বর্ণিতব্য বিষয় ভারতের সনাতন হিন্দু-যৌথ-পরিবার প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ। যে সকল কারণে এই প্রাচীন প্রথাটা আর বাঙ্গালা দেশে চলিতে পারে না তাহার কতকটা আভাষ ইহাতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার যৌথ-সংসার কি কারণে ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাই ইহাতে দেখান হইয়াছে। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা না থাকিলে, আপনার স্বার্থকে বলি না দিলে, এরূপ সংসার রক্ষা করা যায় না। উপেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃবধূ বিরজা এই প্রাচীন প্রথাটার স্বাস্থ্যকল্পে বর্ত্তমান—বংশের ধারাটা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা সচেষ্ট। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র নীরদ ইহাকে ভাঙ্গিতে বদ্ধপরিকর। নাটকীয় সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ ইহাতে ততটা দেখিতে পাওয়া যায় না। আর আমাদের বোধ হয় এই কারণেই গিরিশ-চন্দ্র চতুর্থ অঙ্ক পর্য্যন্ত লিখিয়া রচনা স্থগিত রাখেন। আসৎ চরিত্রের লোক ইহাতে অনেকগুলি অবশ্য দেখিতে পাওয়া যায়; এটর্নী শিবুর চরিত্র রমেশের চরিত্রের অনুরূপ। নকুলানন্দ অবধূতের চরিত্রের আবশ্যকতা কিছুমাত্র নাই। উপেন্দ্রের চরিত্র অন্য লোকে অঙ্কিত করিলে বলিতাম, ইহা প্রফুল্লের যোগেশ চরিত্রের হুবহু নকল। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৈলেন্দ্রনাথ ও সুরেশচন্দ্রের চরিত্রের সাদৃশ্য খুবই বেশী। উচ্ছৃঙ্খল যুবক শরতের বন্ধুগণকে লইয়া অতটা বাড়াবাড়ি করাও যুক্তিসঙ্গত হয় নাই বলিয়া আমাদের ধারণা। বারাঙ্গনা কুমুদিনীর মাতা ও ফুলীর মাতা মণি কীর্ত্তনওয়ালিকে না আনিলেও নাটকের কোনরূপ অঙ্গহানি হইত না।

এইবার আমরা সংক্ষেপে অন্যান্য চরিত্র সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। উপেন্দ্রনাথের পুত্র নীরদ, তাহার মাতা তরঙ্গিনীর সহায়তায় তাহার খুল্লতাত শৈলেন্দ্রনাথের সহিত বিরোধ বাধাইতে সর্ব্বদাই ব্যগ্র। অর্থলোভে তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে সে কিছুমাত্র পশ্চাদ্‌পদ নয়। তাহারই চক্রান্তে শৈলেন্দ্রনাথ পথের ভিখারী। তাহার পাপের শাস্তি সমুচিত হইয়াছিল। তাহার চরিত্রে বিশেষত্ব কিছুমাত্র নাই।

হীরু ঘোষালের অবশ্য চরিত্র আলোচনা করিব না। এরূপ মানুষ প্রত্যেক সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বার্থসাধনই ইহাদের মূলমন্ত্র।

উপেন্দ্রনাথের বন্ধু বৈদ্যনাথ ও হাইকোর্টের উকীল নিতাইবাবু তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের প্রকৃত বন্ধু। সংসারটা বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারা যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার সমুচিত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে উপেন্দ্রনাথের শ্যালিকাপুত্র মন্মথের চরিত্র সুন্দর। আমরা তাহার একটু বিস্তারিত আলোচনা করিব। পিতৃষ্বাতৃহীন শরীর মন্মথ অল্পবয়সেই তাহার মাসিমা তরঙ্গিনীর বাড়ীতে আনীত হয়। উপেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও তদীয় পত্নী বিরজা দেবী তাহাকে পুত্ররূপে পালন করেন। মন্মথ সুশিক্ষিত, ডাক্তার, হৃদয়বান্ যুবক। সে এখনও অকৃতদার। অবসর সময়ে বাগানে ফুল গাছ পুতিয়া একটী ছোটখাট নার্শরী করিয়াছিল। পরোপকার করিতে তাহার প্রাণ সর্ব্বদাই ব্যগ্র। সংসারের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহার জন্য সে সর্ব্বদাই

সচেষ্ট। তাহার বাল্যসুহৃদ ভাই নীরদ তাহার হিংসা করিত। হিংসার কারণ অনেকগুলি ছিল। প্রথম নীরদ মনে করিয়াছিল তাহার জেঠাইমা তাহাকে তাহার বিষয়ের অংশ দান করিবেন; দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধিতে সে তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। পড়াশুনায় তাহার মত মনোযোগী সে কখনও ছিল ছিল না। হিংসার অপর একটী কারণ ছিল, সেটা হইতেছে ফুলীকে পাইবার আশা। নীরদের ধারণা ছিল, অনঙ্গসুন্দরী ফুলীর সহিত মন্মথের অবৈধ সম্বন্ধ আছে। সে তাহাকে পাইবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল, ফুলীও মন্মথের দিকে ততটা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল—এমন কি সে তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে প্রত্যাখ্যান পর্য্যন্ত করিয়াছিল; কিন্তু যুবক নীরদ উহাদের সম্বন্ধটা ঠিক ধরিতে পারে নাই। উহাদের সম্বন্ধ ছিল—গুরু শিষ্যের। দরিদ্রনারায়ণের সেবাব্রতে উৎসর্গীকৃতজীবন মন্মথের সে শিষ্যা ও সহচরী ছিল। প্রথম অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে গঙ্গাতীরে মন্মথ—বিরচিত 'হে দীনশরণ, বন্ধনমোচন' গীতি গাহিতে তাহাকে প্রথমে আমরা শুনিতে পাই। তাহার মাতার নিকট হইতে তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব কতকটা শুনিতে পাওয়া যায়—সে কাহাকেও ঘরে আসিতে দেয় না। মল্লিকদের ছেলে তাকে এক কালীন ৫০০০৲ ও দুশো টাকা করে মাসহারা দিতে চায়; কিন্তু তাও সে অবলীলাক্রমে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সে তার দার কীর্ত্তনের গানের ভিতর দিয়া শিখিয়াছে, ব্যভিচারিণীর উদ্ধার নাই; তাই সে পতিতা রূপজীবিনীদের চিত্তাকর্ষক চরিত্র পথে চলিতে চায় না; কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে বুঝিতে পারে নাই; তাই বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়াছিল, 'রাজপুত্র এসে যে করে নিয়ে যাবে নয়! ওঃ সাবিত্রী এসে জন্মেছে কি না, চার কাল গেছে থাকবেন!' কথাটা শুনিয়া তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গিয়াছিল। সে যখন 'ঘোরে ঘোরে সারা সেরে ভিক্ষে করে খাবো', তখন মাতার পরামর্শ মত কার্য্য করিবে না বলিয়াছিল, তখন তাহার মাতা আরও একটু গুরুমে চড়িয়া বলিল, 'সোনা বাবুর পীরিতে পুঁড়েছ, সোনাবাবুকে বিয়ে কর্‌বে নয়?' মুন্নী এ কথার উত্তর দিয়াছিল, 'সে যে বড় ভাগ্যিমানী, যে মাথা কেটে তপিণ্ডে ক'রেছে, সে তার গলায় মালা দেবে। আমার যা জন্ম, আমি তার পা ধোয়াতেও পারি না।'

বাঙ্গালা দেশের এটা এখন একটা সমস্যার মধ্যে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে; পতিতাদের ভিতর যাহারা ভাল ভাবে জীবন যাপন করিতে চায়, তাহাদের জন্য সমাজের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? এক্ষেত্রে ফুলীকে পতিতা বলা চলে কি না তাহাও বিবেচ্য। পতিতার গর্ভে সে জন্মিয়াছে। বংশানুগত প্রভাবকে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকর আবেষ্টনীর ভিতর পরিবর্দ্ধিত জীবন কতটা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে তাহাও বিচার্য্য বিষয় নয় কি? পঙ্কে কি সুগন্ধ পদ্মের জন্ম হয় না? জগতের অন্যান্য জাতীয়দের ভিতর এইরূপ রমণী লইয়া অনেকে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার অল্প বিস্তর পরিচয় অনেকেই জানেন। আমাদের দেশে এরূপ প্রকৃতির রমণীকে লইয়া কি করিতে পারা যায়, তাহাও সমাজ-সংস্কারকদের ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। স্বদেশের মঙ্গলার্থে যে সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান হইতেছে, তাহাদের কার্য্যভার কতকটা ইহাদের উপর দিলে ভাল হয় না কি—আর সেবাব্রতে রমণীর ন্যায় অটল সুদৃঢ় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই সুসভ্য জগতে নার্স অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। রমণীর মঙ্গল হস্ত পরদুঃখমোচনে সর্ব্বদাই ব্যগ্র। তাহাদিগকে এ কার্য্যের ভার অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে। তাই মহাকবি গিরিশচন্দ্র তাহাদিগকে সেবাব্রতে অধিকার দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব একদিন রমণীকে সংঘের ভিতর প্রবেশাধিকার দেন নাই; কিন্তু পরে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আমাদের মনে হয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশন এই কার্য্যে অগ্রসর হউন—পরমহংসদেবের পরম ভক্ত গিরিশচন্দ্রের ইঙ্গিতমত তাঁহারা কার্য্য করুন। কিন্তু এ-কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল, রক্ত-মাংসের শরীরী নারীদের ভিতর প্রেম ও ভালবাসার একটা স্থান আছে, সেদিকেও সমাজ-সংস্কারকদের অবহিত হওয়া উচিৎ। যাক্ সে কথা।

কুলীর উত্তর হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাই তেছে মন্মথের উপর তাহার শ্রদ্ধা অত্যধিক ছিল। ঠিক এই সময়ে অনেক মুদ্ধাকে লইয়া মন্মথ আসিয়া বলিল, 'দেখ কুলী, এই বুড়ীটা গাড়ীচাপা পড়েছে, তার হাতটা একেবারে গেছে। একে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তুই একে নিয়ে ঐ গাছতলাটায় ব'স্, আমি ততক্ষণ একখানা গাড়ী নিয়ে আসি।' দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে কুলী মোনাথাবুর নিকট আত্মপরিচয় দিয়া বলিতেছে—'কি করে নূতন নূতন ফুল তৈরি করো, আজ যে শেখাবে ব'লেছিলে?'

মন্মথ। সে আমি একখানা বই দেবো—পড়িস —এখন যা। আর শিখ্‌তে চাস্, আমি শেমোকে অনেক শিখিয়েছি, আমি ব'লে দেবো, তার কাছে শিখিস্।

কুলী। আজ একখানা নূতন গান বেঁধে দেবে ব'লেছিলে?

মন্মথ। এখন আমি বড় ব্যস্ত আছি।

কুলী। আমি আর একটী কথা এসেছি।

'সে বলিস্ এখন' বলিয়া ব্যস্তভরে মন্মথ চলিয়া গেল।

যে ভাব মন্মথের মনে ঘুরিতেছিল, তাহা কুলী আপনার প্রাণের অনুভূতি সাহায্যে জানিতে পারিয়াছে, তাই তাহার মুখে পরক্ষণেই শুনি, 'আমি তোমার মনের কথা টের পাই। পাজী হীরে ঘোষালটা, সৃষ্টির এলোকের সর্ব্বনাশ করে বেড়ায়, এখন তোমাদের সংসার ভাঙবার জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছে। তুমি তারে জব্দ করতে চাও; আমি ওরে এ বাড়ী থেকে ছল করে তাড়াব।'

বাস্তবিক সে করিয়াছিল ও তাই, হীরু ঘোষালের নামে বদ্‌নাম দিবামাত্র জমাদার তাহার গলাটা এরূপ ভাবে টিপিয়া ধরিয়াছিল যে, তাহার বাঁচিবার আশা খুব কমই ছিল। হঠাৎ দারবানেরা সেখানে আসিয়া সে যাত্রা তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। তারপর যখন কুলীর ব্যবহারে এইরূপ ঘটিয়াছে জানিতে পারিয়া মন্মথ তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে, উহাদের মধ্যে যেরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা আমরা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

কুলী। মোনাবাবু, আমায় ডেকেছ?

ম। হ্যাঁ, তুই হীরু ঘোষালকে দারোয়ান দিয়ে মার খাইয়েছিস্?

কু। হ্যাঁ।

ম। দেখ্, তোরে আমি ভাল মানুষ জান্‌তুম, তুই তো ভারি বজ্জাত। হীরু ঘোষালের সঙ্গে লাগ্‌তে গেলি কেন?

কু। তুমি যে হীরু ঘোষালকে বাড়ী থেকে তাড়াতে চাও?

ম। তোরে কে বলেছে?—মেসো বুঝি?

কু। না।

ম। মিছে কথা কচ্ছিস্?

কু। গলা কাটলেও তোমার কাছে মিছা কথা কইবো না।

প্রত্যক্ষ দেবতা—গুরুদেবের নিকট মিথ্যা কথা সে কহিতে পারে না। প্রাণ তাহাকে যে কথা বলিয়া দিয়াছে—যে সত্যের উদ্ঘাটন সে মন্মথের মুখ দেখিয়া করিয়াছে, সে কথা সে না বলিয়া থাকিতে পারিবে না। গোপন করিবার ক্ষমতা এ স্থলে থাকে না?

সত্যসন্ধ নির্ভীক মন্মথ কথাটার প্রতিবাদ

করিল না। উত্তরে কেবলমাত্র বলিল,—আমি তাড়াতে চাই, তা তোর কি ?'

ফুলী। তুমি যা চাও, তা আমি কর্‌বো, তা বারণই করো আর যাই করো।

চিরদিন, যাহা ভালবাসে পূজারিণী তাহাই করিতে ব্যগ্র হয়। কে তাহাকে সে কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবে? এই এক ছত্র হইতেই বুঝিতে পারা যায়, ফুলীর হৃদয়ে যে প্রেমের বীজ গোপনে উপ্ত হইয়াছিল, তাহা মহান্ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। অনন্যকর্ম্মা মন্মথের চক্ষে তাহা ধরা পড়িল না। সে কেবল উত্তরে বলিল 'তোর পেটে পেটে এত তা আমি জান্‌তুম না; তার মানুষটীর মতন থাকিস্!'

ফুলী। জান্‌বে কোত্থেকে—তুমি তো আমাদের ঘরে জন্মাও নি! আমি সাপের ছানা, বিষদাঁতও উঠেছে—টের পেয়েছি। কিন্তু আমি কামড়াবো না। পারি যদি কেউ কামড়ালে বিষ তুলে নেবো।

মন্মথ। আ মর্ ছুঁড়ি,তোর সব দুর্ব্বুদ্ধি জন্মেছে!

ফু। ম'র্‌বো!—তা দেখ্‌বে—কেমন ক'রে ম'রি।

ম। তুই যে বড় মার পায়ে ধ'রে আমার সাম্‌নে ধর্ম্ম সাক্ষী করে বলেছিস্ যে, কুপথগামী হবি নি?

ফু। তা তো হবোই না। হবে সাপের স্বভাব ফণা ধরে—ফোঁস করে—না কামড়ালেই তো হলো।

ম। তুই অমন বুদ্ধি করিস্ তো আমার কাছে আসিস্ নি।

ফু। অমন বুদ্ধিও ক'র্‌বো, তোমার কাজ ক'রেও বেড়াবো।

ম। আর তোকে আমার কাজ ক'র্‌তে হবে না, দূর হ,—

ফুলী। দূর ব'লেই কি দূর হব? তা হব না। তা হব না।

কথাটা বলিয়া সে চলিয়া গেল। কৃপণের রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ফুলী এইরূপে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন।

ফুলীর কথাগুলা শুনিয়া মন্মথের মনটা একটু সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিল, সে আপনি আপনি বলিয়া উঠিল :—'ওর মা ঠিক বলে, ও পাগল বটে। দুই কি ব'লে! ওর কি মন টন খারাপ হয়েছে? এ দিকে ত চমৎকার যোগে চমৎকার শেখে! বড় মা বলেন—ও ছোট ঘরের মেয়ে বটে, কিন্তু ও নির্ম্মল, ও ছেলে বেলা থেকে পাশ্‌লোট, যা মুখে এলো বলে গেল? তারপর পঞ্চম গর্ভাঙ্কে তরঙ্গিনী যখন বিরজাকে বুঝাইতে চাহিল যে, আমাদের সোণার ঘর মন্মথই ভাঙ্গিতে চায়, তখন বিরজা উত্তরে বলিয়াছিল, যোগাল বামুনই ঘর ভাঙ্গাইতে নীরদ সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছিল। মন্মথ ঘর ভাঙ্গাইবার চেষ্টা আদৌ করে নাই। যখন তরঙ্গিনী দেখিলেন কথাটা বিরজার কাছে খাটিল না তখন তিনি বলিলেন,—'নীরে বলেছে, 'ও বাড়ীতে থাক্‌লে আমি বাড়ীতে থাক্‌বো না। উত্তরে বিরজা বলিলেন, –'সে নীরে বুঝুক! ওকে যে তেতুড়ে বল্‌কেন—তাড়াবেন, সে আমি থাক্‌তে হবে না। বড় কর্ত্তা ওকে এনেছেন, ও বড় কর্ত্তার খায়—বড় কর্ত্তার বাড়ীতে থাকে। ও নীরের তেতুড়ে নয়।' কথাটা শুনিয়া তরঙ্গিনী জ্বলিয়া বলিল—'ও! তোমার যে মার চেয়ে দরদ। আমার বোন্‌পো, আমি এনেছিলুম, আমি যদি এমন না রাখি, তা বড় কর্ত্তারই কি, আর তোমারই কি?'

বিরজা। বোন্‌পো তোমার বটে, কিন্তু ছেলে বেলা থেকে তুমি ওকে নষ্ট মাগো। নীরে পড়া পার্‌তো না, স্কুল পালাতো, ও সব বল্‌তো বলে সেই ইস্তক তোমাদের রাগ। এই যে মেয় ঠাকুরপোর অসুখে প্রাণপণ উৎসর্গ করে সমস্ত রাত জাগ্‌লে, সেটা হ'লো না—আর ও হলো ঘর-ভাঙ্গা।' ঝগড়াটা মিটিয়া যাইবার পর মন্মথ বিরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। অভিমানী,মন্মথ সে বাড়ীতে আর থাকিবে না একরূপ স্থির করিয়াছিল। বিরজা

তাহার নির্ম্মল মনের ভিতরটা বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'হ্যারা মোনা' নীরে না কি তোকে তেড়ুড়ে ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে ব'লেছিল ?'

মন্মথ। কে বল্লে বড়মা ? নীরোদা রাগ্‌লে অমন কত কি বলে, আমিও কত কি বলি !

কথাটা চাপা দিবার জন্ত তখনই আবার বলিল 'বড়মা, আমার এই টাকা ক'টা রাখো।' চাপা দিতে কিন্তু সে পারিল না। নিস্তব্ধ প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় তাহার হৃদয়ে আজ ঊর্ম্মি উঠিয়াছে, তাহার শব্দ বহু দূর হইতে শোনা যায়। তাহার মুখ চোখের ভাব তাহার প্রাণের কথাটা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া দিতেছে ; সে বলিল—'আমি চাকুরী লইয়া বিদেশে যাইব স্থির করিয়াছি।'

বিরজা। বিদেশে—কোথা যাবি ? বুঝেছি—বুঝেছি, নীরের কথায় অভিমান করেছিস্ বুঝি ?

ম। না বড়মা !

বিরজা। দেখ্ মোনা—আমার সঙ্গে মিছা কথা ক'স নি ? খবরদার, যেতে পাবি নি, তুই কেন অভিমান করেছিস ? তুই কি ওদের খাস্ না ওদের বাড়ীতে থাকিস্ ? আমি তোর মা ! তুই আমার কাছে থাকিস্। আর রাগ করে যে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিস্, আমি বুড়ো মানুষ, যদি ব্যামো-স্যামো হয়, কে দেখ্‌বে ? ওদের তো সব ভাগ বখ্‌রা হ'তে চল্লো। আমায় দেখ্‌বে শুন্‌বে কে ? নে নে তুই রাগ করিস্ নি।

ম। বড়মা, তুমি যে আমার মা, তা কি আমি আজ জানি ! আমার মা বেঁচে থাক্‌লে এত স্নেহ কর্‌তেন কি না জানি নে। যেখায় থাকি এক দণ্ড কি তোমার খোঁজ না নিয়ে থাক্‌বো আমি ? আমার মনে হয়, মা ভগবতীর মূর্ত্তি তোমার মূর্ত্তি ; তোমায় প্রণাম ক'রে যে কাজে যাই, সেই কাজ আমার পূর্ণ হয়।

বড় মা, এদের সংসার ভাঙ্গবে। তুমি আমায় রেখে কেন লোকের কাছে দোষী হবে ? তোমার নামে যদি কোন কথা শুন্‌তে হয়, আমার বুকে বজ্রাঘাত হবে। তুমি আমায় মানা ক'রো না। তুমি আজই বুঝ্‌তে পার্‌বে, কতদূর কি হয়েছে। তুমি পায় ধূলা দাও, তুমি ভেবো না আমি যেখানে থাক্‌বো,তোমার পায় ধূলোতে আমি রাজরাজেশ্বর হব। (পদধূলি গ্রহণ)

মন্মথের হৃদয়ের দৃঢ়তা দেখিয়া তিনি বলিলেন, '—আচ্ছা, তুই যাস্ যাবি। আজ কিছু করিস্ নে, আমি কাঁদ্‌ব না হয় তোকে বল্‌বো। দেখিস্ আমার দিব্যি—কোথাও যাস্ নি।'

মন্মথ কথাটা শিরোধার্য্য করিয়া চলিয়া গেল। এ দিকে নীরদ শৈলেন্দ্রের সর্ব্বনাশ করিবার যে উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছিল তুলী তাহা জানিতে পারিয়া মোনা বাবুকে জানাইল। উভয়ে যখন কুমুদিনীর বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিল (তৃতীয় অঙ্ক সপ্তম গর্ভাঙ্ক) তখন শৈলেন্দ্র আহত অবস্থায় পতিত। মন্মথ তাহার ক্ষতস্থানে চাদরা বিধা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া কুমুদিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে মার্‌লে ?'

কুমু। ওগো আমি কিছু জানি না ! মারা-মারি হয়েছে, আমার ঘরে মানুষ ছিল দেখে, বাবু পিস্তল ছুড়েছিল, সে লাঠি মেরে পালিয়েছে। এই দেখ দালে গুলির দাগ দেখ।

তুলী। দেখ্‌বে কি—কাকে দেখাচ্ছ ? চুপ করো, তোমার যে ঘরে জন্ম, আমারও সেই ঘরে জন্ম। চুপ ক'রে থাক, সব শুনিছি। শরৎ বাবু জিজ্ঞেসা করেছিল—"দোরের পাশে কে ?" তুমি বলেছিলে—"মা বুঝি।" সে তোমার মা নয়—আমি।

গোপন-রহস্য বুদ্ধিমতি তুলীর জন্ত বাহির হইয়া পড়িল। নীরদ যে শরৎকে রিভল্‌বার ও পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছিল তাহা বেশ বুঝা গেল। কাজেই নীরদ উচ্চবাচ্য না করিয়া মকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিল।

ইহার পর চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে উপেন্দ্রের বহির্বাটীতে মন্মথ ও উপেন্দ্রের বন্ধু বৈদ্যনাথ বাবুর সাক্ষাৎ পাই। মন্মথ তাহাকে সকল কথা অবগত করাইয়া শৈলেন্দ্রকে নীরোদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিল,—'আপনি ছোট বাবুর সঙ্গে দেখা করুন, ক'রে ওঁর চোখ ফুটিয়ে দেন।' তিনিও স্বীকৃত হইলেন। তারপর প্রাণের আবেগে মন্মথ বলিল,—'মশায় একটা কথা বলি, আমাকেও বিশ্বাস ক'রবেন না।'

বৈদ্য। কেন রে মূর্খ?

ম। আপনি যে সোনা দেখে গিয়েছিলেন, আমি আর সে সোনা নাই—আমি আর সত্যবাদী নই, আমি জালিয়াৎ—জোচ্চর।

বৈদ্যনাথ বাবু কথাটায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সে কি রে—কি বল্‌ছিস্! তোর কথা শুনেও আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পাচ্ছিনা।

ম। বিশ্বাস করুন।

বৈদ্য। এ দুর্ম্মতি তোমার কেন হ'লো?

ম। কেন হ'লো? বড়বাবু আমার অনাথ অবস্থায় কুড়িয়ে এনেছিলেন। বড়মার স্নেহে আমি রাজপুত্রের ন্যায় কাটিয়েছি—লেখাপড়া শিখেছি। আপনারা সকলে আমায় স্নেহ করেন—প্রশংসা করেন। আমি বড় বাবুর মৃত্যুশয্যার কাছে ছিলুম। যদিচ আমি তখনও বালক, তথাচ আমি তাঁর আন্তরিক মনোভাব বুঝ্‌তে পেরেছিলুম। তাঁর কায়মনোবাক্যে ইচ্ছা ছিল—যেন পিতৃপুরুষের গৌরব বজায় থাকে। তিনি সেইজন্য বড়মাকে তাঁর অংশ দিয়ে গেছেন। তাঁর মনে আশা ছিল যে, পাছে ভায়ে ভায়ে কলহ হয়ে সমস্ত নষ্ট হয়, বড়মার অংশ থাকলে ঠাকুরের সেবা চলবে। বড় মাও স্বামীর আজ্ঞা পালনের জন্য, সংসার বজায় রাখ্‌বার জন্য আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করে আস্‌ছিলেন। সেই সংসার নীরোদবাবু ছুচ্ছুরি করে ভাঙ্গছেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, দেখ্‌বো ওঁর কতদূর ছুচ্ছুরি!

বৈদ্য। তুই খেপেছিস্—খেপেছিস্। দৌড়া ঠাণ্ডা হ।

ম। আজ্ঞে না, আমি খেপি নি। অনেক রাত্রি জেগে চিন্তা করেছি। আপনি জানেন, অসৎ-মতি হৃদয়ে স্থান দেওয়া কি যন্ত্রণা—সেই দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছি। সত্যে জলাঞ্জলি দিয়েছি। সদিচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়েছি। আমার এখন চিন্তা কিসে নীরোদবাবুর সর্ব্বনাশ কর্ব্বো।

বৈদ্য। তুমি কি মনে করেছ, কোন কুকার্য্যের দ্বারা সৎকার্য্য হয়? আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝ্‌তে পেরেছি। আমারও তোমার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে ইচ্ছা হয়েছিল, নীরোর মাথা কেটে ফেলি। তুমি স্থির হও, অধর্ম্ম পথে চলো না।

ম। অধর্ম্ম পথে চল্লে কি হবে? হয় তো আমার দুর্নাম হবে, হয় তো আমি বিপদগ্রস্ত হবো, হয় তো আমার এ জীবন বৃথা হবে! কিন্তু মশায়, বড়মা আমার গলা ধরে কেঁদেছেন, চক্ষের জল ফেলেছেন,—বলেছেন—মোনা, কি হ'বে! আমি দেখ্‌বো—কি হয়, আমায় বারণ কর্‌বেন না।

বৈদ্য। ওরে শোন্ শোন্—

ম। না, আমি আর শুন্‌বো না। আপনি ছোট বাবুকে শিবু উকীলের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেন।

কথাটা বলিয়া দ্রুত সে চলিয়া গেল। তাহার মনের ভিতর যে ঝড় বহিতেছিল, তাহাতে সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। মীন-নীর ব্যক্তির নিকট রাগের মাথায় কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেলিবে, এই ভয়ে সে পলায়ন করিল। এরূপ অবস্থায় পড়িলে কোন কথার ছাপ হৃদয়ে পড়ে না।

চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে নীরোদ, শিবু উকীল ও নীচ ঘোষালের সহিত মন্মথ প্রকৃত সাংসারিক

লোকের মত কথা কহিতেছে, দেখিতে পাই। ছোট বাবুর Blank endorse করা ৫০০০৲ টাকার দুইখানা হাণ্ডনোট ৫০০০৲ টাকা লইয়া ফেরৎ দিতে মন্মথ স্বীকার করিল। ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে উপেন্দ্রের অতিথিশালার পশ্চাদ্‌ভাগে মন্মথ ও শরতের কথা-বার্ত্তা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, পাপের পথে সে, কতদূর অগ্রসর হইয়াছে—নীরোদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য সে যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে তাহার হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করা সুকঠিন। বিষয়টা একটু খুলিয়া বলিবার জন্য উভয়ের কথোপকথন একটু উদ্ধৃত করিতে চাই।

মন্মথ। তোমার নামে শীগ্‌গির হাণ্ডনোটের নালিশ হবে। তুমি জবাব দেবে, তুমি হাণ্ডনোট দাও নাই—ও জাল।

শরৎ। তা আমি সই করে কি ক'রে বল্‌বো যে জাল?

মন্মথ। আরে তাতে তোমার কোন ভয় নেই; এ জাল মকদ্দমার বিচার কেবল সই নিয়ে হ'বে না। এর ভিতর একটা মজা আছে; যে কাগজে হাণ্ডনোট দু'খানা লেখা, সে কাগজ স্বদেশী মিলের, মোটে মাস আষ্টেক হ'ল ঐ মিল খোলা হয়েছে। আর তোমার হাণ্ডনোটের তারিখ হচ্ছে আড়াই বছরের আগেকার। যখন হাণ্ডনোট সই ক'রেছ, তখন সে কাগজ জন্মায় নি, ঐ কাগজই জাল ধরিয়ে দেবে।

জাল ধরাইবার নূতন পদ্ধতি দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। কবিবর গিরিশচন্দ্রের স্বকপোলকল্পিত উপায়টী বড় বড় গোয়েন্দার মাথা হইতেই বড় শীঘ্র বাহির হয় না। গত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার স্বর্গগত বন্ধু চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত আলিপুরের আদালতে বিখ্যাত ধনী কালী অহরীর উইল খানি যে জাল তাহা কতকটা এই উপায়েই ধরিতে পারিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। উইলখানি ডেমি কাগজে লিখিত ছিল। ডেমির ভিতর যে জলের একটী ছাপ করিয়া অক্ষর থাকে তাহা দেখিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কোম্পানি বাহাদুরের নিকট হইতে কেবল ইহা হইতে কোন্ সময় ইহা প্রচার হইয়াছিল তাহা জানিতে পারা যাইবে। ফলে জানা গেল, উইল লিখিবার বহু বৎসর পরে ঐ ডেমি সাধারণে প্রচারিত হইয়াছে। যাক্ সে কথা। এখানে গিরিশ বাবুর বুদ্ধির অজস্র প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

এই সময়ে মন্মথের মনের ভাবটা তাহার স্বগতোক্তি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। কথাটা হইতেছে এই:—(স্বগত), আগে ছোট বাবু হাণ্ডনোটের দায় থেকে বাঁচুক, তার পর জাল মাম্‌লায় ফেলে নীরদাকে একবার বেড়াজালে ধের্‌বো। বাছাধন কত কূটবুদ্ধি করে কেটে বেরোন, একবার দেখ্‌বো।

মানবচরিত্রাভিজ্ঞ গিরিশচন্দ্র মন্মথকে দেবতা করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। মানুষের দুর্ব্বলতা তাহার চরিত্রে আছে বলিয়া আমাদের নিকট চরিত্রটী অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে। মন্মথের মত অবস্থায় পড়িলে প্রতিহিংসাবৃত্তি আপনিই হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলে। চিত্তের উত্তেজনাবশে নীরদকে ধ্বংস করিবার পরামর্শ একেবারে মন্মথ স্থির করিয়া ফেলিল।

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে যখন দুলী বিরজাকে কল্য দ্বিপ্রহরে দর্ভতীর্থ দেখাইয়া আনিবে বলিয়া ঠিক করিল, তখন হঠাৎ তাহার মনে নির্ব্বেদ আসিয়া উপস্থিত হইল। জীবনের গতি কোন্ ধারে প্রবাহিত হইতেছে তাহা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে চেষ্টা করিল। তার প্রাণটা অনন্ত অতীতের দিকে উধাও হইয়া ছুটিল। যে জ্ঞানরাশি সে মোনাবাবুর নিকট অর্জ্জন করিয়াছিল, তা থেকে সে জীবনের লক্ষ্যটা এখনও ঠিক করিতে পারিতেছিল না। অনির্দ্দেশ্য বিরাট্ কোন-কিছুতে

আত্মবিসর্জন করিবার বাসনা তাহার মনের ভিতর জাগিয়া উঠিয়াছিল। এ অবস্থায় পথ নির্দ্ধারণ করিতে সে পারিতেছিল না। এই দ্বিধা ও সংশয়ের অবস্থা কুণীর স্বগতোক্তিতে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। সে মনে মনে বলিতেছে 'মনে হচ্ছে যেন কোথায় যাই—কোথায় যাই,—বড়মা যদি তীর্থে যায়, সঙ্গে যাব। মোনাবাবু পাতকোর যাত আর সাগরের কথা ব'লেছিল; আমার মনে হচ্ছে, যেন ছোট্ট পাতকোয়াটীতে আমার আর পোষাচ্ছে না, প্রাণটা যেন সাগরে গে' মিশ্‌তে চায়!'

এই মানসিক অবস্থায় যখন সে আলোকের সাহায্য চাহিতেছিল—সন্তবা পথের সন্ধানে প্রাণ যখন তার ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, তখন মন্মথ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মেঘ না চাহিতে জল আসিয়া পড়িল। ইষ্টদেবকে সম্মুখে দেখিলে শিষ্যের যেরূপ আনন্দ হয়, তাহারও সেইরূপ আনন্দ হইল। বুদ্ধিমতি কুণী মোনাবাবুকে একেবারে প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিল,—'মোনাবাবু, বড়মা বলে, তোর এখন ধর্ম্মকর্ম্মের বয়স হয় নাই, কোন্ বয়সে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করতে হয় মোনাবাবু?'

মন্মথ। কেন তুই ত এই সব ধর্ম্ম কর্ম্ম কচ্ছিস্? পরের উপকার ক'রে বেড়াচ্ছিস্—সকলকে তোর কত সুখ্যাতি করে। তুই ত মনের সুখে আছিস্।

হায় ভ্রমান্ধ মন্মথ! তুমি কি বুঝিবে তার প্রাণের জ্বালা! তাহার হৃদয়ে যে প্রেমের দাবাগ্নি জ্বলিতেছে তোমার শত উপদেশ তাহা নির্ব্বাপিত করিতে পারে না। সে তোমাকে দেখিবার জন্য, তোমার কথা শুনিবার জন্য, তোমার প্রিয়-অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য, তোমার প্রিয় কার্য্য করিয়া আনন্দ পাইবার জন্য, পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। তোমার চিত্তবিনোদনের জন্য তাহার এই চেষ্টা, তুমি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। এই সকল কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া তাহার প্রাণে শান্তি আসিতেছে না, তাহার প্রাণ যাহা চায়, তাহা সে ও পাইতে পারে না। তাই সে বড় মা বিরজার সহিত তীর্থভ্রমণ বাসনেশে তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে চায়। অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করিবার চেষ্টায় সে এখন ব্যস্ত। মন্মথের মুখে 'সুখে আছিস্' কথাটা শুনিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। এত বড় মিথ্যাটাকে সে কি করিয়া প্রশ্রয় দেয়। তাই সে বলিল,—'আছি, কিন্তু—'

মন্মথ। আবার কিন্তু কি?

কুণী। তোমার কাছে মিছে কথা কবুব না মোনা বাবু! পরের কাজ করতে করতে খুব সুখ হয়। কিন্তু—আমার কখন কখন মনে হয়, বুঝি ঐ সুখটুকু পাবার জন্যে পরের কাছে ঘুরি। মনে হয়—পরের হিত ক'রে বেড়াই—আমার ধর্ম্ম হবে ব'লে, সুখ হবে—ধর্ম্ম হবে—এ সব ত বাজে কথা, মোনাবাবু! যার কাছে থাকলে কুৎসিত বাজে কথা শিখ্‌তুম, তোমার কাছে একটা গৌরবের ব্যবসা শিখ্‌ছি। মোনা বাবু, এর চেয়ে কি উঁচু কাজ নেই? থাকে যদি আমায় শেখাও।

মনে করিয়াছিলাম কুণী আপনার হৃদয়ের কথাটি খুলিয়া দিবে, কিন্তু কলাকুশলী গিরিশচন্দ্র তাহা করান চাই। স্ত্রীলোকের বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না' কথাটা খুব সত্য। কুণীর মুখ দিয়া দেবেন্দ্রবাবুর এমন ভাবে কথাটা বাহির করিলেন যাহা শুনিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়া যাই। কুণী গুরুর নিকট 'গুহ্য বিষয়' জানিতে চাহিল। রায় রামানন্দ যেমন আগ্রহ ভরে মহাপ্রভুর নিকট পারমার্থিক গুহ্য বিষয় শুনিতে চাহিয়াছিলেন, কুণীও সেইরূপ শুনিতে চাহিল! এ ক্ষেত্রে গুরু একটু বিপদে পড়িলেন। উত্তরটা তাহার ধারণার অতীত হইবে কি না; আর জীবনে সে কথাটাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে কি না তাহাই কিঞ্চিৎ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—'আছে, তুই কি তা পার্‌বি?'

ফুলী। তুমি বলে দাও, পারি না পারি চেষ্টা কর্‌ব।

এখন গুরু স্বয়ংই একটু বিপদে পড়িলেন—যে কথা শিষ্যাকে বলিতে চান, তাহা ত তিনি জীবনে নিজে কখনও উপলব্ধি করেন নাই; তবু শিষ্যার ব্যগ্র ভাব দেখিয়া বলিতে বাধ্য হইলেন।

মন্মথ। আচ্ছা, তুই কি তা পার্‌বি?

ফুলী। তুমি বলে দাও, পারি না পারি চেষ্টা কর্‌ব।

মন্মথ। তোকে শেখাব কি করে? আমি শুনেছি, বইয়ে পড়েছি—কিন্তু এখনও বুঝ্‌তে পারিনি। কেমন জানিস্? তুই না বল্লি পরের হিত করিস্ শুধু চয় ব'লে—ধর্ম্মলাভ হবে ব'লে? যখন এই সুখের প্রত্যাশাটুকু তোর মনে থেকে যাবে, ধর্ম্মলাভের আশা বিসর্জ্জন দিতে পার্‌বি, তখন আর তোর মনে ঐ 'কিন্তু' টুকু থাক্‌বে না।

ফুলী এই কথা কয়টীতে সান্ত্বনা পাইল না—সে আরও শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল এবং বলিল,—বল্‌ছ মোনা বাবু, বল—বল—

মন্মথ। বল্‌লুম ত, তুই এখন বুঝ্‌তে পার্‌বি নি। শোন্, তুই হীনকুলে বেশ্যার ঘরে জন্মেছিস্; শুনেছিস্—ব্যভিচারিণীর উদ্ধার নাই। তাই কুপথ ছেড়ে সুপথে এসেছিস্। লোকের হিত কর্‌লে, ধর্ম্ম হয়, স্বর্গ হয়, এমনি আরো কত কি করিস্। কিন্তু সহস্র বার বেশ্যা জন্ম হোক্, বিষ্ঠার কীট হই, নরকের কৃমি হ'য়ে থাকি, তবু লোকহিত কর্‌ব, এই ভেবে যখন লোকহিত কর্‌তে পার্‌বি, তখন আর 'কিন্তু' থাক্‌বে না; এর নাম আত্মবিসর্জ্জন—পরের জন্য আপনাকে বলি দেওয়া—এর চেয়ে উঁচু কাজ আর নাই বুঝ্‌লি!

ফুলী। আত্মবিসর্জ্জন! আপনাকে বলি দেওয়া! বুঝ্‌তে পারি কি না, পরে বল্‌ব মোনা বাবু! অবশ্য পূর্ব্বেও বলিয়াছি আবার বলি, এই উচ্চাদর্শের ত্রুটি সুলাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অঙ্কিত —এই ত্যাগ—এই আত্মবিসর্জ্জন আমাদের সমাজের আদর্শ। এই আদর্শ উপস্থাপনের জন্য বসু মহাশয়ের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্কে মন্মথর গঙ্গাতীরস্থ নারীরিতে মন্মথ চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া যখন অধ্যয়নরত ছিল, তখন অপমানিত নীরদ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে 'ঠক! জুয়াচোর! আলিয়াৎ!' প্রভৃতি নানাবিধ শ্লেষকর বাক্য বলিয়া যন্ত্রণা দিতে লাগিল। অন্যায় কার্য্য করিয়া অনুশোচনায় মন্মথের হৃদয় তখন জ্বলিতেছিল। মন্মথ নীরোদকে বলিল,—'নীরোদা! আমি জাল করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সে আমার স্বার্থের জন্য নয়, তুমি অর্থ লোভে সংসারটাকে উচ্ছন্ন দিচ্ছিলে, বড় মা আমার গলা ধরে কেঁদে ব'লেছিলেন—"কি হ'বে।" তার সে ব্যাকুলতা আমাকে জ্ঞানশূন্য ক'রেছিল। আমি মতলব করেছিলুম, কোন রকমে বিপদে ফেলে, সর্ব্বগ্রাসী মকদ্দমার মুখ থেকে তোমাদের সংসারটা রক্ষা কর্‌বো; তাই জাল হাণ্ডনোট সৃষ্টি করেছিলুম। কুৎসিত চিন্তা হৃদয়ে স্থান দেওয়া, কুপথে বেড়ান যে কি যন্ত্রণাদায়ক, তা তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না। যখনি কষ্ট হ'ত, বড়' মা'র চোখের জল মনে পড়্‌ত, আর আমি সব ভুলে যেতুম।' মন্মথ তার পর বলিল, 'আমি কোর্টে গিয়া বলিব, তোমার জন্য করিবার জন্য জাল নোট তোমায় বেচেছি। আমার কথায় বিশ্বাস কর। বল তোমায় আর কি করে বিশ্বাস করাব?'

ক্রোধান্ধ নীরদ উত্তরে বলিল,—'বিশ্বাস কর্‌ব না তোর কথা, সত্য হ'লেও বিশ্বাস কর্‌ব না। শোন্ তোর সঙ্গে আমার অনেক দিনের দেনা-পাওনা, আজ তারই হিসাব নিকাশ কর্‌তে এসেছি। জানিস্ নি, বার বার আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে'ছিস? ছোট কাকাকে যখন খুনি মামলায় ফেলি, তুই তার উদ্ধারকর্ত্তা। কের যখন নাম

টাকার দায়ে বেচলুম, তুলীকে দিয়ে নোট পুড়িয়ে তুই তাকে বাঁচালি, তুলীকে পাছে আমি তোর কাছ থেকে নি, এই ভয় চক্রান্ত করে আমায় দ্বীপান্তরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছিস্, ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রের মুখ থেকে আহার কেড়ে নিয়ে ভেবেছিলি, তাকে পিঞ্জরে পুরবি। আজ আমার হাতে তোর নিস্তার নেই। মনে ক'রেছিস্, তুই তুলীকে নিয়ে রাসলীলা করবি, আর দ্বীপান্তরে বসে আমি সেই ছবি ধ্যান করব। তার আগে তোকে খুন করব।

মন্মথ। খুন করবে? তা' হ'লে ত তুমি পরম বন্ধুর কাজ করবে। আমি তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছি, কিন্তু এখনও বলছি, আমি নিজের স্বার্থের জন্য করি নি। মকদ্দমা উঠবার আগে তুমি যদি আমার কথা শুনতে, পাটিসন স্যুট রদ্দ করতে, তা হ'লে তোমাকে হাজতে যেতে হ'ত না,—আমাকেও অনুতাপে দগ্ধ হ'তে হ'ত না। নীরোদা, আমি অপরাধ করেছি, আমায় মার্জ্জনা কর। যে দণ্ড দিবে দাও, আমি বুক পেতে নেব। মৃত্যু এখন আমার শান্তি।

নীরদ। তুলি। তুলি। এখানে থাকতিস্ ত দেখতিস্ তোর পেয়ারের মোনা বাবুকে কি ক'রে খুন করি।

এই বলিয়া যখন নীরদ মন্মথকে খুন করিতে উদ্যত হইল, পশ্চাৎ হইতে তুলী অতর্কিত ভাবে আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিয়া ফেলিল, তখন সে বলিয়া উঠিল,—'তুলী—তুলী, এই যে তুলী! তুলী বেঁচে থাকতে তুমি মোনাবাবুর গায়ে একটী আঁচড় দিতে পারবে না।' নীরদ তখন তাহাকে সরিয়া যাইতে বলিল, উত্তরে তুলী বলিল, —'আজ দুদিন তোমার পেছু-পেছু ঘুরছি। তোমার চোখে তোমার অন্তরের অভিসন্ধি দেখছি। আমি থাকতে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে না, মোনা বাবুকে মারতে পারবে না।

নীরদ। তবে তুই-ই মর, মর মর। (তুলীকে অস্ত্রাঘাত ও তুলীর পতন।)

মন্মথ। নীরোদা, কি করলে—কি করলে? নীরোদা যে দণ্ড তুমি আমায় দিলে, ওর কাছে প্রাণদণ্ড অতি তুচ্ছ। তুলি, আমার প্রাণরক্ষা করবার জন্য, তোর অমূল্য জীবন তুই বিসর্জ্জন দিলি? আহা, 'নির্ম্মল কুসুমকলি!' নীরোদা, তুমি দাঁড়িয়ে কেন, আমাকেও মার! এখন আমার প্রাণ বধ করা কর্ত্তব্য। আত্মঘাতী হওয়া মহাপাপ! নীরোদা, আমায় মারো, জীবনে একটা ভাল কাজ করো। আমায় খুন করলে—তোমার অশেষ পুণ্য হ'বে! মারো—মারো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

এতদিনে মন্মথের অন্ধ আঁখি প্রকৃত দৃষ্টিশক্তি পাইল। বুঝিল তুলীর ভালবাসা কতদূর গভীর। তুলির সহিত একত্রে অজানা রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য সে কাতরে নীরোদের কাছে প্রার্থনা করিল। হাসিতে হাসিতে পরের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন কিরূপে করিতে হয়, কাজে তাহা দেখাইয়া তুলী অনন্তধামের পথ-যাত্রী হইল। মন্মথ এতদিনে বুঝিল প্রাণের আন্তরিক টান না থাকিলে নিজের প্রাণকে এত সহজে বলি দিতে পারা যায় না।

নীরদ মন্মথের কথা শুনিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিল; পূর্ব্বে তাহার ধারণা ছিল যে মন্মথর সহিত তুলীর অবৈধ প্রণয় আছে, এখন সে ধারণা দূর হইল। উভয়ে যে উভয়কে প্রকৃতই ভাল বাসে তাহা জানিতে পারিয়া ক্রূরমতি নীরদ মন্মথের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল,—'না, আর তোকে মারব না, তোকে কি দণ্ড দিয়েছি, আমি বুঝেছি, তুই বেঁচে থেকে জলে মর।'

মন্মথের তখন ভাবনা হইল কি করিয়া নীরদকে বাঁচাইবে—নিজ কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত ফল ভোগ হইল ভাবিয়া, সে কতকটা শান্তি পাইল।

যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ফুলীর চিন্তাই তার সার হইবে। মনে হইল 'নির্ম্মল কুসুমকলি' তাহার জন্মেই অকালে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িল, ভাবিল যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে, এখন চেষ্টা করিয়া দেখা উচিৎ ফুলীকে বাঁচাইতে পারা যায় কি না? আর একটা জীবন অযথা আহুতি দিবার প্রয়োজন নাই, ভাবিয়া বলিয়া উঠিল,—'নীরোদা, শোনো তুমি পালাও শীগ্‌গির পালাও। ঐ ঘরে কাপড় আছে এই রক্তমাখা কাপড় জামা ছেড়ে তুমি পালাও।'

নীরোদ আত্মরক্ষার্থ তাহার মতলব মত কার্য্য করিল।

তাহার পর মন্মথ যখন ব্রাণ্ডী লইয়া ফুলীর মুখে দিতে গেলেন, তখন সে বলিয়া উঠিল, 'মোনাবাবু, ওষুধ আর খাব না, গঙ্গাজল দাও'। মৃত্যুর যবনিকা আসিয়া যখন পড়িবার আর বিলম্ব নাই, তখনও ফুলী হৃদয়ের গোপন কথাটী মুখে খুলিয়া বলিল না। তার শেষ কথা—'আত্মবিসর্জ্জন। মোনাবাবু বুঝতে পেরেছ কি?'

হায়! বুঝিতে পারিলেই বা হইবে কি?

তাহার পর মন্মথ বিরজার নিকট ফুলীর মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিল,—'মা আমায় বিদায় দাও! আমি নর সমাজে থাকবার যোগ্য নই—আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! শুনেছি, ভগবান্ করুণাময়, তাঁর চরণ অবলম্বন ক'র্‌ব—যদি শান্তি হয়।'

উত্তরে বিরজা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত—'মোনা শোন্। তোর হৃদয় নিঃস্বার্থ হৃদয়। তুই ভুল ক'রেছিলি, অসৎ উপায় অবলম্বন ক'রেছিলি। অসদুপায়ে সদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ভগবান মন দেখেন, তোকে ক্ষমা কর্‌বেন। তুই যেমন তাঁর কাজ কর্‌ছিস্, তেমনি কর—শান্তি পাবি।'

বাস্তবিক সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিলেই সর্ব্বথা সফলতার হওয়া যায় না, উপায়ও সৎ হওয়া আবশ্যক।

ফুলীর চরিত্র পৃথকভাবে সমালোচনা করিবার আর আবশ্যকতা নাই। মন্মথের চরিত্রালোচনার সঙ্গেই তাহার চরিত্র আলোচিত হইয়া গিয়াছে।

কেবলমাত্র তাহার চরিত্রের একাংশ এস্থলে আলোচনা করিব। ফুলী সতীত্বের মহিমা হৃদয়ের পরতে পরতে উপলব্ধি করিয়াছিল। শৈলেন্দ্রের পত্নী সরোজিনীর চরিত্রের মাধুরী দেখিয়া ভক্তি ভারাবনত মস্তকে তাহাকে বন্দনার প্রণাম করিয়াছে। একদিন সে বিরজাকে বলিয়াছিল—'মা তুমি কোল্‌কাতার ভিতর যত তীর্থ আছে সব দেখতে পাও; কিন্তু একটী তীর্থ তুমি দেখ নাই—সতীতীর্থ তুমি দেখ নাই। কথাটা শুনিয়া বিরজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার সহিত তথায় যাইতে রাজী হইলেন। ফুলী যেখানে লইয়া গেল, সেটা শৈলেন্দ্রের তালতলার ভাড়াটিয়া বাটী। সেখানে পাওনাদারেরা আসিয়া তখন শৈলেন্দ্রকে অপমানিত করিতেছিল শিবু উকীল সরোজিনীকে বেইজ্জত করিতে যাইতেছিল সেই সময় ফুলী ও বিরজা সেইখানে উপস্থিত হইয়া নিতাই উকীলের সাহায্যে তাহাদের পাওনা গণ্ডা চুকাইয়া দিলেন।

বাস্তবিক সতীর যেখানে বাস সেইখানেইত প্রকৃত সতীতীর্থ। সতী শিরোমণি সরোজিনীকে অব্যবস্থিত চিত্ত আমোদপ্রিয় ব্যভিচারী স্বামীকে বলিতে শুনি;—'তুমি তো কখনও অধর্ম্ম কর নি! আমিও অধর্ম্ম করি নি—আমি কখনো মিথ্যা কথা কই নি, আমরা দুঃখ পাবো না, তুমি ভেবো না।'

সরোজিনীর চরিত্রের বিশেষত্ব তাহার সরলতা তাহার ভগবানে—স্বামী-রূপ ভগবানের উপরে—অটল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বলে সে তাহার স্বামীর সৌভাগ্য ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছিল।

বড় বৌ বিরজা আদর্শ হিন্দু গৃহিণী—গৃহলক্ষ্মী। শ্বশুরের সংসারটাকে বজায় রাখিতে তাহার কম

ও চেষ্টা খুবই ছিল। তিনি সংসারের সকলকে সমান ভাবে দেখিতেন। কোমল হৃদয়ের বিরজা পুত্রাধিক স্নেহে মন্মথকে মানুষ করিয়াছিল; কিন্তু তাহার ভ্রম দেখাইয়া দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই, তাই তাহার মুখে শুনিতে পাই, 'অনুপায়ে মনুষ্যেন্দ্র সিদ্ধ হয় না।' ছোট দেবর শৈলেন্দ্রের উপর ও তাহার অত্যধিক স্নেহ ছিল। তাহার ধারণা ছিল বাল্যসুলভ চপলতা বশে সে, যে সকল অন্যায় কার্য্য করিত, উত্তরকালে বয়সগুণে তাহার সে সকল দোষ অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। নীরদ ও তাহার মাতার প্রত্যেক কার্য্য তিনি ভাল করিয়াই বুঝিতেন এবং আবশ্যক মত তাহাদিগকে সত্য কথা বলিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার হৃদয়ের দৃঢ়তা ও যেমন ছিল, কোমলতা ও তেমনি ছিল। উপেন্দ্রর আকস্মিক মৃত্যুতে ও তিনি বিহ্বল হন নাই, কারণ তখনও তাঁর কর্ত্তব্যের শেষ হয় নাই। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন ফুলীকে হত্যা করার অভিযোগে নিরদের ফাঁসি অনিবার্য্য, তাই তাহার মুখে শুনিতে পাই—'শৈলেন ওঠ, এবংশের মান-মর্য্যাদা এখন তোর হাতে। মেজ-বৌ ওঠ, যা হ'বেছে, আর ত উপায় নাই দিদি। নিতাই ঠাকুরপো, নীরদ বংশের একমাত্র সন্তান, যাতে ফাঁসীটা র'দ হয়, প্রাণপণ চেষ্টা কর, পিতৃপুরুষের জল গণ্ডুষ বজায় থাকবে।' বংশের ধারাটা অক্ষুন্নভাবে রক্ষা করিবার জন্য তিনি শৈলেন্দ্রকে মনযোগ দিতে অনুরোধ করিলেন; আর বংশের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য ও নীরদ যাহাতে ফাঁসীটা র'দ হয় তাহার জন্য নিতাই বাবুকে উপরোধ করিলেন। নিতাই বাবু বিরজাকে যে কথা বলিয়া ছিলেন, তাহাই বলিয়া আমরা তাঁহার চরিত্রালোচনা শেষ করিলাম—'বউ দিদি ধন্য তুমি, ধন্য তোমার ধৈর্য্য! সংসারে কেমন করে থাকতে হয়, তুমি শেখালে তোমার মত বধূই কুললক্ষ্মী—আদর্শ গৃহিণী। সমাজের কল্যাণের জন্য বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তুমি বিরাজ করো।'

(ক্রমশঃ।

চোর

(শ্রীযামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন)

চুরি করি চুপে, আপনার ঘরে, ফিরিয়া আসিল চোর,
যা কিছু পেয়েছে, গিন্নীরে দিল, রাত্র না হতে ভোর।
ঘরণী হাঁকিয়া, কহিল গৃহিণী, "তোমার কেমন ধারা
মানুষ হইবে, হও অমানুষ, ভাবটি লক্ষ্মীছাড়া।"
চোর কহে হাসি, "ধর্ম্মকাহিনী কহিও না মোরে আর,
তুমি কেও নাই, আহার যোগাব, কি উপায় আছে তার!"
কহিলা গিন্নী, "চুরি ছেড়ে দাও, ভিক্ষা করিয়া খাব,
তোমার আমার খোকার যোগাড়ে, দুয়ারে দুয়ারে যাব।"
ভেসে গেল কথা, দিবস রাত্রি, যাহা পায় চুরি করে,
পরের দ্রব্য দেখিতে দেখিতে উঠে নিজ ঘর ভরে,

মিলিল দেশের যত ছিল চোর, তারে গুরু বলি মানে,
গ্রামবাসী যত, ভয়ে হল ভীত, কি উপায় নাহি জানে,
অর্থের বশ, প্রহরীর যশ, সবাই হাতটি ধরা।
নাহি রাখে ভয়, সবা সুখে রয়, ধরাখানি যেন সরা।
কোথা হতে আসি, গৃহমাঝে পশি, দারুণ বিসূচি রোগ,
গিন্নী থোকার শেষ করে দিল, পরমায়ু সুখভোগ,
পল্লী তনয়ে, চিতায়ে সাথে মনে মনে ভাবে চোর,
রাজের সেরা, কে কঠিন চুরি, চোরের শ্রেষ্ঠ ঘোর,
চোরের উপরে যিনি হন চোর, তাঁরে খুঁজে নিব আমি,
তাঁহার চরণে, লইনু শরণ, তিনি গুরু তিনি স্বামী।

মায়া মুগ্ধ

[গল্প]

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)

অনেকদিন—অনেকদিন—সে আজ অনেক কাল আগের কথা। এই পৃথিবীর তখন সবেমাত্র জন্ম হয়েছে। পৃথিবীতে তখন বাস করবার আর কেউ ছিল না, শুধু ছিল এক খোকা, নাম ছিল তার মুগ্ধ। মুগ্ধের বাপ, মা, ভাই বোন কেউ ছিল না। পৃথিবীর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তারও জন্ম হয়েছিল। বড় একা একা থাকতে হয়, সঙ্গী সাথী কেউ নেই, মুগ্ধের তাই অনেকদূর এক রাজ্য থেকে তার এক সঙ্গিনী এল তার সঙ্গে থাকবার জন্য। সঙ্গিনীর নাম মায়া।

মুগ্ধ যে গুহায় বাস করত, সেখায় ঢুকেই মায়া দেখলে একটা মস্ত বড় বড় বাক্স। গুহার দোরে ঢুকেই মায়া মুগ্ধকে প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে :—

'মুগ্ধ—এ বাক্সে তোমার কি আছে ?'

মুগ্ধ বললে 'মায়া, ও বাক্সে যে কি আছে সে আমি নিজেও জানিনা, বাক্সটা ভাল ভাবে থাকবে বলেই এখানে রয়েছে।'

মায়া বললে 'কিন্তু কে তোমায় এটা দিলে, কোত্থেকেই বা এল ?'

মায়ার কথার উত্তরে মুগ্ধ বললে 'তোমার আসবার ঠিক আগেই একটি লোক এসে বাক্সটা এখানে নামিয়ে রাখলে। লোকটাকে দেখে খুব বুদ্ধিমান বোধ হচ্ছিল, আর কেবলই হাসছিল।'

মায়া ভাবতে ভাবতে বললে 'হাঁ, আমি তাকে চিনি। সে আমায়ও হেথায় এনেছে। নিশ্চয়ই আমার জন্যে বাক্সটা সে এনেছে, বোধ হয় এতে আমার পরবার ভাল ভাল পোষাক আছে, না হয় আমাদের দু'জনার খেলবার খেলনা কিম্বা খুব মিষ্টি মিষ্টি খাবার আছে!

মুগ্ধ বললে 'তা হবে। তবে বাক্সটি যে রেখে গেছে সে যে পর্য্যন্ত না আসছে সে পর্য্যন্ত আমাদের এটা খুলে দেখা ঠিক হবে না।'

এই বলে মুগ্ধ গুহা ছেড়ে বাইরে যেতে মায়া বললে 'কি অদ্ভুত ভীতু ছোকরা এ, প্রাণে একটুও

এর সখ নেই। নূতন জিনিস দিবিা চট্‌পট্ খুলে দেখবে তা নয় গেলেন বাইরে বেরিয়ে।'

মুগু বাইরে গেলে মায়া একদৃষ্টে বাক্সটির পানে চেয়ে রইল।

বাক্সটি বড় সুন্দর, চারদিকে নিপুণ হাতের খোদাই কাজ করা। তাতে নব সুন্দর সুন্দর নর-নারী ও পরম সুন্দর ছেলে মেয়েদের চিত্র আঁকা। মাঝখানে শুধু একটি পরম সুন্দর চিত্র, গলায় তার বনফুলের মালা।

বাক্সটি তালা চাবি দিয়ে বন্ধ নয়, সেটি বন্ধ রয়েছে এক গাছি সরু সোণার তারে, সেই সোণার তারটি দিয়ে এমন করে বাক্সটিকে জড়িয়ে বাঁধা হয়েছে যে সহজ কৌশলে সে গেরো খোলবার যো নেই। মায়া যতই সেই সোণার তারের গেরো দেখতে লাগল ততই তার সেটি খুলে ফেলবার লোভ হচ্ছিল। মায়া নিজের মনে মনে বলতে লাগল :—

'হাইত, এ গেরোটি খুলে ফেলে এমনি করে আবার আটকিয়ে রাখলেই তো হয়—সে কি আমি পারবো না, খুব পারবো, নিশ্চয়ই পারবো। এতে আর কি দোষ হবে!

সোনার তারের জড়ানো গেরো খুলবার জন্য বাক্সটি ধরে তুলে আবার মাটিতে নামিয়ে রাখতেই বাক্সের ভেতর কেমন যেন একটা শব্দ হোল। মায়া কিসের শব্দ শোনবার জন্য বাক্সের উপর কান পেতে রইল। মায়া শুনলে বাক্সের ভেতর কিসের যেন গুণ্‌গুণ্ শব্দ হচ্ছে। চোখ উঠাতেই আবার তার দৃষ্টি সেই সোণার তারের বাঁধনের উপর পড়ল। গেরোটি দেখতে দেখতে মায়া বলতে লাগল :—

'খুব কৌশল করে গেরোটি দিয়েছে বটে, তবে চেষ্টা করলে একি আর আমি খুলতে পারবো না—নিশ্চয়ই পারবো।'

গুহার খোলা দোর দিয়ে সূর্য্য-কিরণ এসে ঘরে ছড়িয়ে পড়লো, সোণার সুতোটি নাড়তে নাড়তে মায়ার হাতে হঠাৎ তার বাঁধনটি খুলে গেল—বাক্সের আর কোন কৌশলের বাঁধন রইল না।

মায়া ভাবতে লাগল :—'যা, কিছু করলুম না হঠাৎ বাঁধনটা খুলে গেল—এখন আবার কি করে বাঁধি, মুগু এসে কি বলবে, কি করি আমি এখন!'

দু'বার, তিনবার, চারবার কতবার মায়া বাঁধনটি আবার তেমনি করে দেবার চেষ্টা করলে কিন্তু কোন রকমেই আর সে সোণার তারে তেমনি করে বাঁধন দিতে পারলে না। এখন আর উপায় কি, যে পর্য্যন্ত না মুগু আসে সে পর্য্যন্ত বাক্স এমনি আবাঁধা অবস্থায়ই পড়ে থাকবে।'

মায়ার তখন মনে হোল, মুগু ফিরে এলে সে বাক্স খোলা দেখে মনে করবে যে মায়া বাক্সের ভেতরটা দেখেছে, না দেখে এ অপবাদ দেওয়ার চেয়ে দেখেই অপবাদ নেওয়া ভাল। মিছে মিছি নাম কিনে কি লাভ! এর মধ্যে মায়ার মনে হোল বাক্সের ভেতর থেকে কে যেন বলছে?—

মায়া—মায়া, একবার, একটিবার আমাদের দাও না, দেখবে আমরা তোমায় কেমন খেলার সাথী হব। একটিবার দাও না খুলে মায়া।

মায়া ভাবলে "এ কি এ,—বাক্সের ভেতর এমন ক'রে কথা কইছে কে—কি আছে এর ভেতর, না একবার আমায় এ দেখতে হচ্ছেই। যা থাকে ভাগ্যে, একবার এ আমি দেখবই,—তারপর যেমন বাক্স তেমনিই আবার বন্ধ করে রেখে দেব।

এই মনে করে মায়া যেই বাক্সের ডালাটি উঠাতে গিয়েছে, এমন সময় মুগু মায়ার জন্য নানারকম বনফল নিয়ে এসে গুহার দোরে দাঁড়াল। মুগু তখনো বুঝতে পারে নি যে মায়া কি কচ্ছে—মুগু গুহায় ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় মায়া বাক্সের ডালাটি তুলতে লাগল। সহসা গুহা যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। বাক্সের শব্দের মত কেমন যেন একটা

ভীষণ শব্দ হোল, মায়ার সে দিকে দৃষ্টি নেই, সে বাক্সের ভেতরে কি আছে সেই রহস্য জানবার জন্য ডালাটা একেবারে তুলে ধরলে। বাক্সের ভেতর থেকে কতকগুলো কি পোকা বেরিয়ে পড়ল। তারপর ভেতর মুগ্ধের বেদনা-পুরিত কণ্ঠ শোনা গেল :—

ও খেয়ে ফেললে—খেয়ে ফেললে।—কি যেন গুল ফুটিয়ে দিয়েছে, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, বিষ, বিষ! মায়া দুষ্টু, মায়া, কেন তুমি এ যাদু বাক্স খুললে!

মায়া তাড়াতাড়ি বাক্সের ডালা বন্ধ করে হঠাৎ মুগ্ধ এমন বেদনার ধ্বনি করে উঠলে কেন তাই দেখতে মুখ ফেরালে, ঘর তখনও এমন অন্ধকার যে মায়া মুগ্ধকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু বড় বড় ডাঁস মশার বিশ্রী গুণ গুণ ধ্বনির মত কি যেন তার কানে বড়ই বাজছিল। এর মধ্যে মায়া ও মুগ্ধের মতই করুণ চীৎকার করে উঠল, তার কপোলেও যে একটা ডাঁস বসে গুল ফুটিয়ে দিচ্ছে, মুগ্ধ নিজের যন্ত্রণা ভুলে তাড়াতাড়ি এসে মায়ার কোমল কপোল থেকে ডাঁসটাকে ঝেড়ে ফেলে দিলে।

পৃথিবীতে যত সব আপদ বিপদ জঞ্জাল সে গুলিই সব ডাঁসরূপে ওই রহস্যময় বাক্সের ভেতর আটক পড়ে ছিল, কত দুঃখ, শোক, যাতনা, বিষাদ এই সব।

মায়া ও মুগ্ধের বিষে এসে প্রথম বেদনা বোধ, তাই এ ব্যথা তাদের বড় বেশী বাজল। ব্যথা তো দু'জনারই লাগল, তার উপর মুগ্ধ মনে করতে লাগল, এ কাজের জন্য মায়া দোষী, মায়াও তেমনি মুগ্ধের উপরেই রেগে গেল। মুগ্ধ মায়ার পানে পেছন-ফিরে গালে হাত দিয়ে চুপটি করে বসে রইল। মায়াও ব্যথায় মনের দুঃখে মেজেয় পড়ে রইল। মায়ার দু'চোখ দিয়ে ঝর ঝর ধারে জল পড়ছিল, তার মনে হচ্ছিল তার হৃদয় যেন কেটে ভেঙে দু'খানা হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে বাক্সের ভেতর থেকে আবার কে যেন মৃদু মৃদু আঘাত করছিল। মুগ্ধ আপন মনে বসে কি যেন ভাবছে, সে সে আঘাত শুনতে পেল না, মায়া কিন্তু শুনিল। মায়া মুখ তুলে মুগ্ধকে ও ভাবে বসে থাকতে দেখে কেঁদে বলল :—

'তুমি এমন নিষ্ঠুর—আমার সঙ্গে একটিও কথা কইছ না?' আবার বাক্সের ভেতর মৃদু মধুর শব্দ, এ শব্দ যেন একটা সঙ্গীতের মত, যেমন মিষ্টি তেমনি মধুর।

মায়ার মনে আবার কৌতূহল জেগে উঠল, সে বললে 'কে তুমি আবার এই যাদু বাক্সের ভেতর থেকে কথা কইছ হে!'

বাক্সের ভেতর থেকে মধুর স্বরে কে বললে—'ডালাটা একটু তোল না, দেখবে আমি কে!'

মায়া রেগে বললে :—'না না, আর আমি ডালা তুলছি না, একবার তুলেই যা ভোগ হয়েছে আরও —যেমন আছ তেমনি থাক বাক্সের ভেতর!

এই কথা বলে মায়া একবার মুগ্ধের পানে চাইল। মায়া ভেবেছিল মুগ্ধ এমন কথা বলায় জন্য মায়ার বুদ্ধির খুব প্রশংসাই করবে, কিন্তু মুগ্ধ তা কিছু না করে শুধু বললে এই বুদ্ধিটুকু একটু আগে হলেই যে ছিল অনেক ভাল।'

আবার বাক্সের ভেতরে সেই মধুর স্বর—'মায়া মায়া—দোরটা খোল না, দেখবে আমি আগের ওদের মত দুষ্টু জানোয়ার নই। খোল, বাইরে আসতে দাও আমায়!

এ মধুর স্বরে তাদের দুঃখ যাতনা যেন ক্রমেই ভুলিয়ে দিচ্ছিল। মায়া বললে :—

'মুগ্ধ—বাক্সের ভেতর কে কথা কইছে—শুনছ! মুগ্ধ গম্ভীর ভাবে বললে—হাঁ শুনেছি বটে—কি হয়েছে তার!'

মায়া বলে—"তালা খুলতে বলছে, খুলবো না কি আবার!"

মুগু বলে—"সে তোমার ইচ্ছা—এতই করেছ—না হয় আর একটু করলেই বা"

মায়া চোখের জল মুছে বললে:—'একটু ভাল করেও কি কথা কইতে পার না আমার উপর—ব্যথা আমিও ত পেয়েছি।"

বাক্সের ভেতরকার স্বর বললে:—

'মায়া তুমি তালা খুলে যাওনা, মুগুও আমায় ধরবার জন্য পাগল হয়েছে, তুমি তালা খুলে দাও। তোমাদের শান্তি দিতেই আমি আসছি।'

মায়া বললে—"মুগু যাই হোক ভাগ্যে, আমি বাক্সের তালা খুলে দিচ্ছি।"

মুগু বললে "খোল।"

তালা খুলতেই ছোট্ট একটি ছেলে হাসিভরা মুখে বের হয়ে কক্ষের এ ধার ওধার ছুটোছুটি করতে লাগল।

তার মধুর হাসিতে যেন শান্তিধারা বর্ষিত হচ্ছিল। সে এক একবার গিয়ে মুগুর গায়ে হাত দিতে লাগল, মুগুর আলা বেদনা সে স্নেহের কোমল স্পর্শে একেবারে দূর হয়ে গেল, আবার তার সেই পূর্ব্বের হাসি ফিরে এল। বালকটি মায়ার কপোলে স্নেহে একটি চুমো দিলে, মায়ার সব ব্যথা বেদনা দূর হয়ে গেল।"

মায়া ছেলেটিকে বললে "বল বল খোকামণি, কে তুমি?"

ছোট্ট চঞ্চল ছেলেটি বললে "আশা আমার নাম, তাই বলেই ডাক।"

মায়া বললে "তোমার ডানা দু'খানার দেখছি রামধনুর মত বর্ণ—কি সুন্দর!"

আশা বললে "হা—রামধনুর মতই বটে, কারণ আমার প্রকৃতিই হচ্ছে হাসি আর আনন্দে ভরা, আমি অর্দ্ধেক অশ্রু আর অর্দ্ধেক হাসি দিয়েই গড়া!"

মায়া বললে "তবে বল লক্ষ্মীমণি বল, তুমি চিরদিন আমাদের সঙ্গে থাকবে।"

আশা হেসে বললে "হাঁ যতদিন তোমাদের আমার প্রয়োজন তা থাকবো। যতদিন তোমরা পৃথিবীতে থাকবে ততদিন তোমাদের ছেড়ে যাব না। এর পরে তোমাদের আমি আরও অনেক ভাল ভাল জিনিষ দেব।"

মায়া ও মুগু দু'জনাই বললে "বল না কি দেবে আমাদের।"

আশা তার ঠোঁটে চাঁপার কলির মত তার আঙ্গুলটি রেখে বললে "সে কথা আমায় এখন জিজ্ঞাস কোরো না কিছু। কিন্তু তোমরা নিরাশ হোয়ো না, জীবনে না পাও তার পরেও পাবে কিছু, এ আমি সত্যি বলছি।

মায়া, মুগু দু'জনাই বললে "না তুমি যখন বলছ তখন আমরা বিশ্বাস করেছি।"

শুধু মায়া মুগু নয়—তার পর থেকে জগতে যত নরনারী আসছে সকলেই আশার উপর বিশ্বাস করে আছে। এবং বরাবর বিশ্বাস করবেও।

ভাগের পূজা

(১১)

লেখিকা—শ্রীগিরিবালা দেবী

পূর্ব্ব পূজারিগণ :—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, (২) শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার (৩) শ্রীমতী সরযীবালা বসু (৪) শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী (৫) শ্রীমতী চারুবালা বসু (৬) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন (৭) শ্রীমতী লীলা দেবী (৮) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (৯) শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী (১০) শ্রীযুক্ত শৈলজা মুখোপাধ্যায়।

[১৩০০ সালের বৈশাখ মাসের ভাগের পূজার ভার লইয়াছেন—নবীন সাহিত্য সেবীদের গুরুস্থানীয় রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর।]

প্রসাদের কথা

গয়লা বৌ চলিয়া গিয়াছে। কথাটা বিশ্বাস করিতে হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতেছিল। আমার বিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণ অবাক্ অসীম যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল। আশা কুহকিনী কানে কানে কহিল 'সে যাইবে কোথায়? আশ্রয়হীনা গৃহহারার স্থান কোথাও যে নাই! সে আসিবে, আবার ফিরিয়া আসিবে।)

বারান্দায় দাঁড়াইয়া আগ্রহ উৎকণ্ঠা মনের মধ্যে লুকাইয়া পথের পানে চাহিয়া রহিলাম। ক্রমে প্রভাতের চির পরিচিত হাস্যময় রৌদ্র সুউচ্চ তাল বৃক্ষের শীর্ষ হইতে হাতের আলিসার উপর লুটাইয়া পড়িল। রাস্তার বিরল পল্লব গাছের ডালে ডালে কাকের মেলা বসিল। নিস্তব্ধ রাস্তায় লোক চলা আরম্ভ হইল। বিচিত্র সকরুণ স্বরে ফিরিওয়ালা 'গরমাগরম' কি যেন হাঁকিতে লাগিল। কত কিশোরী, যুবতী, বৃদ্ধা গঙ্গাস্নানে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া বাম হস্তে গঙ্গা জল পূর্ণ ঘটী ও ডান হাতে সিক্ত বস্ত্র, গামছা লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু সে আসিল না; আয়ত বিশাল নেত্রে মিনতি মাখিয়া, অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে বদনমণ্ডলের কিয়দংশ ঢাকিয়া রবির স্বর্ণ পুষ্পাঞ্জলির মত হৃদয় হরণ করিতে সে আসিল না। আমার অনিমেষ পথ চাওয়া বৃথা হইল। আমার আকুল প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইয়া গেল। আমি হতাশ হৃদয়ে বারান্দার কোণে বসিয়া পড়িলাম। কিয়ৎক্ষণ পর মা আসিয়া বলিলেন "তুই এখানে এমন করে বসে রইলি কেন প্রসাদ, নির্ম্মল গঙ্গার ঘাটে তাকে খুঁজতে গেছে; তুই অন্যদিকে যা। আমি পাড়ার ভিতর ঝিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু কোথাও গয়লা বৌকে পাওয়া গেল না। 'কোথাও গয়লা বৌকে পাওয়া গেল না'; মার এই সাধারণ সহজ কথাটার মধ্যে কি যেন নিহিত ছিল। এ ক্ষুদ্র কথাটি তীরের ফলার মত আমার মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইল, আমি আহত হইয়া বলিলাম "কোথায় আর তাকে খুঁজব মা? আর যদি তাকে না পাওয়া যায়?"

পাওয়া যাবে বৈকি! সে তো বেশিদূর যেতে পারে না; এখানকার পথ ঘাট ত তার চেনা নয় প্রসাদ।"

মার আশ্বাসে ক্ষীণ আশার প্রদীপটি আবার অন্ধকার হৃদয়ে মিট মিট জ্বলিতে লাগিল। মরু তুল্য হৃদয় জোয়ারের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইল। আমি শয়ন কক্ষে ঢুকিয়া মোটা চাপখোনি গায়ে জড়ানো লাঠিগাছা হাতে লইয়া বাহির হইতে গিয়া দেখিলাম আমার বিছানার পাশে কতকগুলি ছাই পড়িয়া রহিয়াছে। অকস্মাৎ রজনীর ঘটনাবলী

স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। আমি যশের সেবক, আমি সৈনিক এই গৌরবে উদ্দীপ্ত হইয়া কাল আপনার হস্তে তাহার ছবিখানি ভস্মীভূত করিয়াছিলাম। হায় তখন কে জানিত ইহা আমার মিথ্যা বিড়ম্বনা! অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস! যাহার চিত্র পোড়াইয়াছি—সে যে আমার অন্তরের সিংহাসনে রাণীর গৌরবে বসিয়া রহিয়াছে। হৃদয় না পুড়িলে হৃদয়ের চিত্র তো মুছিবে না; লুপ্ত হইবে না। যাহার চিত্র পোড়াইয়াছিলাম—আমার হৃদয় সে যে কতখানি অধিকার করিয়াছে আজিকার মত কালও বুঝি এ সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই; তখন ভাবিয়াছিলাম একটি বার দেখিলেই আমার অশান্ত অন্তঃকরণ শান্ত হইবে। তার ম্লান অধরের মৃদু হাসি স্মৃতি বক্ষে পুরিয়া নবীন উৎসাহে নব উদ্যমে আবার আমি দেশের কাজে আপনার শক্তি সামর্থ নিয়োজিত করিব! হায় কল্পনা,—হায়, আমার পরিণাম! আমার বিনয় দেখিয়া মা দ্বারের নিকট হইতে বলিলেন "বেলা হ'য়ে গেল একটু জল খেয়ে, খাবার খেয়ে যা প্রসাদ, ফিরতে ফিরতে হয় তো দেরী হ'য়ে যাবে।" "না, মা এখন কিছু খাব না, ফিরে এসে খাব।" বলিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম কোথায় তাহাকে খুঁজিব? এ জনস্রোতের মধ্যে কোথায় তাহার দেখা পাইব? কিন্তু খুঁজিতে যে হইবে—ভিখারীর একটিমাত্র হারানো রত্নের মত, অন্ধের নয়নতারার মত, দুঃখীর সুখের প্রভাতের মত, চির আঁধার রাতীর আলোক দর্শনের আশার মত তাহাকে খুঁজিতে হইবে। পথে পথে বস্তিতে, মন্দিরে, গঙ্গার তীরে তীরে তাহাকে খুঁজিতে হইবে।

আপনার মনে চিন্তা করিতে করিতে ভবানীপুরের পথে অগ্রসর হইলাম। কে যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া আমাকে টানিয়া লইতেছিল। কত লোক, কত রকমের পোষাক-পরিচ্ছদ, কত গাড়ী ঘোড়ার, বিরাম ছুটাছুটি, কিন্তু ইহার মধ্যে তো সে নাই, প্রতি স্ত্রীলোকের আপাদ নিরীক্ষণ করিয়া, বহু গাড়ীর ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া দ্বিপ্রহরে আমি কালী বাড়ী উপনীত হইলাম। তখন মায়ের পূজা-ভোগ সমাধা হইয়াছে। মন্দিরে দ্বার পড়িয়াছে। দোকানীরা দ্বার বন্ধ করিয়া আহার করিতে গিয়াছে। দুই একটি নিষ্কর্মা লোক কেবল মন্দিরের আশে পাশে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুখাইয়া গিয়াছিল, আমি গঙ্গার ঘাটে গিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিলাম। চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়া মন্দিরের চাতালে আসিয়া বসিয়া রহিলাম। অবসাদে আমার শরীর যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। ক্লান্তিতে চক্ষু মুদিয়া আসিল। আমি মন্দিরের দেয়ালে দেহভার রক্ষা করিয়া বন্যবিড়ের মত বসিয়া মানসীর স্মৃতির ধ্যান তন্ময় হইয়া রহিলাম। কিয়ৎকাল পর কাহাদের হাসির শব্দে আমার দিবাস্বপ্ন অন্তর্হিত হইল। সম্মুখে দোকানের কয়েকটি স্ত্রীলোক অদূরে খোলার ঘরে বসিয়া হাস্যালাপ করিতেছে। তাহাদের দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইতেই চমকিয়া উঠিলাম। আনন্দাতিশয্যে আমার হৃদয়টি নাচিয়া উঠিল। ভাবাবেগে অন্তর পুলকোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইল। ভক্তি বিবশে আমি চাতালের উপর লুটাইয়া মাকে প্রণাম করিলাম। আমার পশ্চাৎ হইতে পুনরায় হাসির শব্দ উঠিল। সম্মুখে রমণীদের পানে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিলাম দুইটি বর্ষিয়সী রমণীর নিকটে একটি অবগুণ্ঠনবতী তরুণী দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া রহিয়াছে। এ যে মানসী ছাড়া অন্য কেহ একথা আমার মনে আসিল না। তেমনি অবয়ব, তেমনি অঙ্গ মলিন সরু সেড়ে কাপড়ে আপাদ মস্তক আবৃত, তেমনি ক্ষীণ দেহ লক্ষ্য সৌন্দর্যহারা, সবই তাহার, কেবল মুখখানি দেখিতে পাইলাম না।

যাহা দেখিলাম তাহাতেই মনোমুখে আমার অন্তঃকরণ উন্মুখ হইয়া উঠিল। আমি আস্তে আস্তে খোলার ঘরের দ্বারের কাছে গিয়া কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলাম "মালতী, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।"

"আচ্ছা, তা আসবে বৈ-কি! তুমি হলে মোদের বড় কুটুম্বি! বলি চাঁদ! তুমি হাঁট ডালে ডালে আমি চলি পাতায় পাতায়। এসনা চাঁদ, সেখানে সেখানে কোলাকুলি করা যাক্।" সবিস্ময়ে ঘাড় ফিরাইতেই একটা যমদূতের মত কদাকার লোকের সঙ্গে চোখোচোখী হইল। আমি অপ্রতিভ হইয়া বিনীত স্বরে বলিলাম "আপনি কি বলছেন বুঝতে পারছি না; তবে যে খোকাটা দিয়ে বলে আছে, তাকে খুঁজতেই আমি এখানে এসেছি। ও আমাদের মালতী।"

"হাঃ হাঃ ও তোমার মালতী—মল্লিকা নয় চাঁদ এ আমার বড় সাধের টগর ফুল।" বলিতে বলিতে সেই বিশ্রী লোকটা তরুণীর ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া জোর করিয়া তাহার মুখখানা আমার দিকে তুলিয়া ধরিল। আমি পলকের জন্য চাহিয়া দেখিলাম—যাহাকে মালতী ভাবিয়াছিলাম সে মালতী নহে। কিন্তু যেই হোক্ ইহারও চক্ষু অশ্রুসিক্ত; মুখখানি বড় মলিন। বড় বিষণ্ণ। সেও যে উৎপীড়িতা বিতাড়িতা দুঃখিনী এটা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। তরুণীর অপমানিত ব্যথায় আমার হৃদয় আকুল হইল। আমি ধীরে ধীরে সেই যমরূপী মানুষটির পানে চাহিয়া বলিলাম "আমার অন্যায় হয়েছে বিনতে পারি নাই, মাপ করবেন মশাই!" লোকটি অঙ্গভঙ্গী করিয়া উপহাসের স্বরে উত্তর দিল "এবারের মত মাপ করেছি বৈ কি,—নইলে এতক্ষণ মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল হত আর কি? আজকের মত বেঁচে গেলে সোনা, ভাল মুখে বিদেয় দিচ্ছি—ফের যা কর, ফের মেয়ের ঘরে দিদ কেউ না।" আমি বিনা বাক্যব্যয়ে বাহির হইলাম। একটা বীভৎস হাসির ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমার ভারাক্রান্ত মনটাকে আরো একটু ভারী করিয়া তুলিল। পথহারা পথিকের মত লক্ষ্যহীন ভাবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে সমস্ত দিনের কোলাহলের পর নগর ঘুমে নিস্তব্ধ হইয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার আকাশে নক্ষত্রগুলি মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে। প্রভাহীন মলিন চন্দ্রমা ধীরে ধীরে গগনে আরোহণ করিতেছেন। টবের সদ্যঃ প্রস্ফুটিত বেল ফুলের গন্ধে অমল সমীরণ উতলা হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ী ঢুকিয়া দেখি, বারান্দায় মাদুরে বসিয়া মা চরকা কাটিতেছিলেন। শিরস্থলের উপরের উজ্জ্বল আলোটি মার মুখের উপর পড়িয়া সেই স্নেহভরা সুকোমল মুখখানি স্বর্গীয় শোভায় মণ্ডিত হইয়াছিল। আমার সাড়া পাইয়া মা আশাপূর্ণ নেত্রে আমার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিছু খবর করতে পেরেছিস প্রসাদ?"

আমি মার পায়ের কাছে বসিয়া বলিলাম "কিছু খবর হল না মা। অনেক খুঁজেছি—কালীঘাট, ভবানীপুর পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না।" মার গম্ভীর মুখ আরো একটু গম্ভীর হইল। মামা বাহিরে আসিয়া অনুযোগের স্বরে বলিল "খুঁজতে গিয়েছিস বলে এম্নি করেই কি খোঁজে প্রসাদ? সেই সকালে বেরিয়েছিলি এতক্ষণে ফিরে আসছিস—কি খেয়েছিস?" বলিলাম "কিছু খাইনি মামা।" "সমস্তটা দিনের ভিতর খাওয়া হয়নি; খুব করিছিস! যাদার চট্ করে দুটো খেয়ে নিয়ে আয়ার কি খোঁজা-খেজি না!" বলিতে বলিতে মা রান্না ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

আহারাদির পর বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম—"মালতী কি অপরাধে এমন করিয়া গেল। আমি আসিয়াছি এই অপরাধেই কি সে আমাকে চির অপরাধী করিয়া নিরুদ্দেশের

উদ্দেশে তাহার জীবন তরণীটি ভাসাইয়া দিয়াছে? আমার হৃদয়ের গোপন কাহিনী সে কি জানিতে পারিয়াই এমনি করিয়া চলিয়া গিয়াছে! আমার অপরাধ, আমি তাকে ভাল বাসিয়াছি কিন্তু সে ভালবাসা তো কখনো তাহাকে জানাইনি। তাহার নিকট হইতে প্রতিদানের প্রত্যাশা করি নাই, চোখের ভাষায় আমার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ হইয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু মুখের ভাষায় আমার অব্যক্ত মর্ম্মোচ্ছ্বাস কখনো তো তাহাকে জানিতে দেই নাই তবু—তবু সে কেন আমার হৃদয় বীণার তার গুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্তর্দ্ধান হইল! অপরাধ, কেবল এইটুকু অপরাধ—ইহারই কি এত জ্বালা—এত বিষ! আর কোনদিন তো ইহার আস্বাদ বুঝি নাই। এযে আমার নূতন অভিধান, নব উদ্দীপনা! শুইয়া থাকিতে পারিলাম না। বাহিরে আসিয়া গ্যাসের আলোকে পথটির পানে চাহিয়া চাহিয়া মনে পড়িল কাল এমনি গভীর রজনীর নিস্তব্ধ নীরবতার মধ্যে সহায় সম্বল বিহীনা অভাগিনী এই পথেই প্রথম পা দুটি বাড়াইয়া দিয়াছিল। এ সেই পথ—তেম্‌নি আঁকিয়া বাঁকিয়া বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। রাস্তার দুই পাশে ছোট বড় বাড়ীগুলি সদর্পে মাথা তুলিয়া তেম্‌নি রৌদ্র বৃষ্টি সমানে উপভোগ করিতেছে। কিছুরই কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, পরিবর্ত্তন হইয়াছে কেবল আমারই ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে! এ পরিবর্ত্তন আমি আশা করি নাই, আমার স্বপ্নের অগোচর—অভাবিত, অপ্রত্যাশিত। আমি লেখক, আমি সন্ধ্যা, সব কাজ ফেলাজলি দিয়া অবহেলা করিয়া আমার কি রমণীর চিন্তা করা সাজে? আমি যে কঠোর, কঠিন, নির্ব্বিকার। সব হইতে স্বতন্ত্র, সুদূর। কিন্তু মন যে কোন যুক্তিই মানিতে চায় না, সে আমার শাসনের বহির্ভূত যুক্তি নাই, তর্ক নাই, শাসন নাই তাড়না নাই, সে আপনার মানে আপনি ধ্যানী। তাহাকে কেমন করিয়া শান্ত করিব? সংযত করিব? কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাল লাগিল না। ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিলাম। পাশের বাড়ীর ঘড়িতে চং করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল। রাস্তার মোড়ে কোথাকার কেরতা একটি যুবক পথ চলিতে চলিতে আপন মনে গাহিতেছিল

"প্রাণের পথ ব'য়ে গিয়েছে সে গো,
চরণ চিহ্নরেখা আঁকিয়ে যে গো।"

গলার স্বরটি তেমন মিষ্ট না হইলেও গানটি আমার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল। বিনিদ্র অবস্থায় বন্ধগৃহে গিয়া বাকী রাত্রিটুকু অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা হইল না। আমি বাহির হইতে দরজাটা টানিয়া দিয়া মালতীর উদ্দেশে অগ্রসর হইলাম। আমার মাথার উপর চন্দ্রতারা খচিত নীলাকাশ, সম্মুখে বাধাহীন প্রশস্ত রাস্তা; আমি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত চলিতে লাগিলাম। কোথায় থামিব তাহা জানি না, কিন্তু চলার আমার বিরাম নাই। অনেক দুঃখ অপমান সহিয়া দীর্ঘ দিবা, বিনিদ্র রজনী কলিকাতার পথে পথে উল্কার মত ঘুরিয়া আমার আশার ক্ষীণ আলোক শিখাটি হঠাৎ নিবিয়া গেল। হৃদয়ের তের উত্তপ্ত আতপ বারির মত পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল। রহিল দুঃসহ দারুণ জ্বালা, আর অবর্ণনীয় বিপুল ব্যথার ভার। কিন্তু মালতীর সন্ধান মিলিল না। ভাবিলাম কোথায়ো চলিয়া যাই, —কোন দূর সুদূরান্তরে ঘনগুল্মসঙ্কুল বনের ছায়ায় বসিয়া তাহার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলি, কিন্তু যাইব কোথায়। পল্লীর শান্ত শীতল কোল বীণবনের মর্ম্মর ধ্বনি গোয়ারের বিস্তৃত মাঠ—ঘুঘুর উদাস ডাক—ইহারা আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল, যাহারা বা আমার হৃদয় টানিতেছিল তাহাদের নিকটে ফিরিতেই মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

মার কাছে গিয়া বলিলাম, আমি আজ দেশে যাব মা, রাতের গাড়ীটাই ধরতে চাচ্ছি।"

মা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ তোমা-

তাড়ি কেন প্রসাদ? আজই যাবি, কৈ আগে তো বলিস নাই?"

"এখনই ঠিক করলাম যাবার কথা মা, আর কিছু বলিলাম না,—বলিতে পারিলাম না। মা স্নেহভরা চক্ষে আমার পানে চাহিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। আমি আস্তে আস্তে বলিলাম "তুমি আমার সব কথা জান মা। আমি দেশের কাজে অবহেলা ক'রে কেন এখানে এসেছিলাম। এ আমার পাপেরই শাস্তি মা।" মা আমার মস্তকটি কোলের উপর টানিয়া লইয়া কহিলেন, কিছু বলতে হবে না প্রসাদ, আমি সব জানি বাবা, আমি আশীর্ব্বাদ করছি দেশের কাজই যেন তোর সব চেয়ে বড় কাজ হয়। সব চিন্তার ওপর দেশের চিন্তাই যেন প্রধান হয়। তোকে যে দেশ মায়ের কোলেই আমি সঁপে দিয়েছি প্রসাদ; তুই দেশের দেশ তোর।"

কি উদার, কি মুক্তি! মস্তকস্থিতে স্নেহপ্রস্রবণ! মুহূর্ত্তে অমৃত রসে আমার ক্ষুব্ধ মন পরিপূর্ণ হইল। অন্ধকার মনোমন্দিরে জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ প্রজ্বলিত হইল। হৃদয় বীণার তারে তারে ঝঙ্কারিয়া উঠিল "বন্দে মাতরম্"। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া মার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইলাম। আমি প্রেমিক, আমি ভালবাসিয়াছি, ভুলিয়া গেলাম। মনে হইল আমি আর কারো নহি, কেহ আমারো নহে, আমি জননী জন্মভূমির একনিষ্ঠ সেবক। উৎপীড়িতা অপমানিতা জননীর আমি সন্তান, আর কিছু নহে।

কমলের কথা

কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া শুষ্ক মলিন মুখে প্রসাদের কলিকাতায় ছুটিয়া যাওয়া দেখিয়া সেদিন আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমার মন একটু ক্ষুব্ধও হইয়া ছিল। কিন্তু তার মুখখানি স্মরণ হওয়াতে তখনই আমার মনের সমস্ত ক্ষোভ কাটিয়া গেল। এ সে নাস্বাদিত অমৃতের সন্ধান পূর্ব্বে আমি জানিতাম না। এ স্বর্গীয় মধুর আস্বাদ যে পাইয়াছে তাহার জীবন সফল, ধন্য। মাতৃভক্ত প্রসাদ যে মাকে দেখিবার জন্যই কলিকাতা গিয়াছিল ইহাতে আমার বিন্দুমাত্রও সংশয় রহিল না। আশা করিয়াছিলাম প্রসাদ মাকে লইয়াই নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু অভিনব বেশে কয়েকটি সাথীর সহিত জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে প্রসাদকে ফিরিতে দেখিয়া তখন আর তাহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হইল না। প্রসাদ বাষ্পভরা কণ্ঠে ডাকিল "ভাই, বল বন্দে মাতরম্।" আমি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বন্দী করিয়া প্রতিধ্বনির মত বলিলাম "ভাই, বন্দে মাতরম্।" আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। চক্ষে অশ্রুর ধারা ছুটিল। আমি বর্ত্তমান ভুলিয়া, ভবিষ্যৎ ভুলিয়া গাহিলাম "বন্দে মাতরম্!" একি মন্ত্র! একি উদ্বোধন সঙ্গীত, ইহার প্রভাবে মৃত জাগ্রত হয়, প্রাণহীন প্রাণ পায়। আমার মধ্যেও যেন নবীন শক্তির সঞ্চার হইল।

আনন্দ দুর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত আম্রকাননের ছায়া-নির্জ্জন পল্লীর পথে মায়ের গান গাহিয়া সন্ধ্যাবেলা গৃহে ফিরিলাম। প্রান্তরে শরৎ অবশ হইয়া আসিতেছিল। যাহার কৈশোর, যৌবনের প্রারম্ভ বিলাসের স্রোতে আনন্দের প্রণয় ক্রীড়ার মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে সেকি কর্ম্ম সাগরে ডুবিয়া একদিনেই কর্ম্মবীর হইতে পারে? তাহার জীবনের গ্রন্থি ধীরে ধীরে খুলিতে হইবে। অবসন্নের মত বিছানায় শুইয়া চাকরকে "চা" আনিতে বলিলাম। অমল হাসিয়া বলিল "কিহে নবীন যুতুল, নগর ভ্রমণ করেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে নাকি? এখনো তো দেশের কোন কাজেই হাত দেওয়া হয়নি ভাই, সবে আরম্ভ, এখনই কাহিল হ'লে চল্‌বে কেন!" অমলকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম "তোমাদের হতাশ হলেত চল্‌বে না ভাই; ধীরে ধীরে আমায় গড়ে নিতে হ'বে; আমি যে একেবারেই নিষ্কর্ম্মা।" "নিষ্কর্ম্মাই কদিন পর আবার বড় কর্ম্মা হ'য়ে উঠ্‌বে

কমল। প্রসাদের কাছে কলকাতায় কিছু নতুন খবর পেলে?" বলিলাম "একটু চা খেয়ে প্রসাদের বাড়ী যাব ভাই, তাকে তো কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি।" "এইতো মস্ত কাজের লোক হয়েছ কমল; এখুনি আবার বেরুতে চাচ্ছ!" বলিয়া বালিকা-বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের নক্সা আঁকিতে অমল পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর প্রসাদের কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিলাম, প্রসাদ! কেহ সাড়া দিল না। প্রসাদ বাহিরে গিয়াছে মনে করিয়া ফিরিয়া আসিব ভাবিতেছিলাম, চাকর বলিল "বাবু ঘরেই আছেন।" ঘরে ঢুকিয়া বিস্মিত হইলাম—দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া ধরাসনে বসিয়া প্রসাদ যেন কি করিতেছিল। তাহার মুদ্রিত নয়ন, জোড়হস্ত, আমার আগমন সে বুঝি জানিতেই পারিল না। যেমন বসিয়াছিল তেমনিই বসিয়া রহিল। আমি প্রসাদের আরো একটু নিকটে সরিয়া গিয়া আলোটি বাড়াইয়া দিয়া কি দেখিলাম! একখানি ছবির সম্মুখে প্রসাদ তন্ময় হইয়া কিসের ধ্যান করিতেছে। প্রসাদ যে চিত্রকর একথা আমার নিকটে অপ্রকাশ ছিল না। কলিকাতায় মার পরিত দেখা করিতে গিয়া প্রসাদের গৃহেই তাহার চিত্র বিদ্যার পরিচয় পাইয়াছিল কিন্তু একি চিত্র—নির্জ্জনে বসিয়া প্রসাদ কি নারী সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতেছে? হৃদয়ের প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি নারীর পায়ে অর্পণ করিতেছে? ইহারাই দেশের একনিষ্ঠ সেবক, দেশভক্ত! কিন্তু লুকাইয়া লুকাইয়া সবই চলে। মুখে সাধুতার ভাণ। গরলা বৌকে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে প্রসাদের হাত আছে কিনা তাহাই বা কে বলিবে?

আমি যন্ত্রচালিতের মত ডাকিলাম "প্রসাদ কাকে পূজা করা হচ্ছে ভাই?"

যন্ত্রোত্থিতের মত চমকিয়া প্রসাদ আমার পানে চাহিল। তাহার বিশাল চক্ষুতে অশ্রুজল ছল ছল করিতেছিল। সে কাতরস্বরে কহিল "আমি দুর্ব্বল, তাই দেবী প্রার্থনা করছিলাম কমল। মন আবার বিক্ষিপ্ত হয়েছে, শান্ত হবার বর চাচ্ছিলাম ভাই।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলাম "কোন দেবীর কাছে কামনা করছ প্রসাদ, গরলা বৌ কবে থেকে দেবীত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?" দুইহাতে বক্ষ চাপিয়া বেদনা পুরিত ক্লিষ্টস্বরে প্রসাদ বলিল "সে দুঃখিনী বিতাড়িতা, সে তোমার উপহাসের যোগ্য নয় কমল। আমি যাঁর কাছে বর চাচ্ছিলাম তাঁকে দেখলেই তুমি চিনতে পারবে," বলিতে বলিতে প্রসাদ প্রদীপটা আরো একটু উজ্জ্বল করিয়া ছবিখানির মুখের কাছে ধরিল।

সেদিকে চক্ষু তুলিয়াই আমি বজ্রাহতের মত চমকিয়া উঠিলাম। গরলা বৌর চিত্র আঁকিয়া কাহাকে উপাসনা করিয়াছিলাম? এই সাধক শ্রেষ্ঠ প্রসাদ; ইহাকেই সন্দেহ! ইহাকে অবিশ্বাস। লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া আবার ছবিখানির পানে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম। এতো স্বজন পরিত্যক্তা আশ্রয়হীনা, দীনা মানতা নহে। এ আমাদেরই সদয়লিতা অপমানিতা জননী জন্মভূমির প্রতিচ্ছবি। সুনীল সমুদ্রের বক্ষ হইতে প্রদীপ্ত বদনে জননী উঠিয়াছেন। দুইখানি পদ্ম পায়ে বৌত করিয়া উষার তরঙ্গ নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া বহিয়া যাইতেছে। মাথার উপরে মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশে অস্তগামী রবির সোণালী আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, বিস্মিত জগৎ মুগ্ধ হইয়া মাতৃমূর্ত্তির পানে অনিমেষে চাহিয়া রহিয়াছে। সমুদ্রের তীরে তীরে তাপস অরণ্যানীর ছায়া শীতল তলে দাঁড়াইয়া কোটী কোটী নর-নারী মায়ের বন্দনা গাহিতেছে, নাম করিতেছে। মা দক্ষিণ হস্ত মেলিয়া সন্তানদের আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। মায়ের হরিদ্বর্ণের অঞ্চলে রাশি রাশি হিরণ্ময় কুসুম বিকীর্ণ করিতেছে। শুভ্রবেশ বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে। এই আমাদের মা, জননী জন্মভূমি—সকল দেশের রাণী, অথচ সর্ব

পড়িতা ছবিখানি জননী অন্নপূর্ণা—আমরা ইহারই পূজা করিয়াছি! হা লজ্জা!

আমি মায়ের চিত্রখানি প্রণাম করিয়া প্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ছবিটা কোথায় পেলি প্রসাদ! এমন সুন্দর জীবন্ত ছবিতো দেখিনি।" "দেখবে কোথা থেকে ভাই, কেবল নতুন বেরিয়েছে, আমি কলকাতা থেকে কিনে আনলাম।" "মাকে আনলি না কেন প্রসাদ? মা ভাল আছেন? তোর মন খারাপ হয়েছে বলি কেন?" প্রসাদ কথা কহিল না, খানিকক্ষণ চিন্তার পর বলিল "আমি একটা পাপ করেছি কমল—তা তোমরা জান না, কিন্তু তাতেই আমার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে, আমি শক্তিহীন হয়েছি। দেশের কাজে আর আমার উৎসাহ নাই ভাই।" বলিলাম "কি পাপ প্রসাদ? যার জন্য এত কুণ্ঠিত হচ্ছ। আমায় বলবে না ভাই?"

প্রসাদ আমার হাতখানা হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া সজল নয়নে করুণকণ্ঠে, গয়লাবৌর কাহিনীটি বলিতে লাগিল। কেমন করিয়া উৎপীড়িতাকে উদ্ধার করিয়া আশ্রয় দেওয়া, কেমন করিয়া তাহার চিত্র অঙ্কিত করা। অবশেষে উদ্বেলিত হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাসে তাহাকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় ছুটিয়া যাওয়া শেষকালে গয়লাবৌর প্রস্থানে তাহার মুহূর্মুহু আশাপূর্ণ অন্তরের হতাশ আক্ষেপ বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। আমি আশ্চর্য্য হইলাম "মানুষের অন্তঃকরণের সংবাদ আমি রাখিতাম না। আমার দৃষ্টি বিশ্বাস ছিল কিশোর কিশোরীর প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা সবই বুঝি চক্ষের মোহ, মনের একটা ক্ষণিক নেশা! রমণী প্রীতি আমারো কম ছিল না, এখনো যে হৃদয়ের কোন্ হইতে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছি তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু প্রসাদের এই মনোভাবের আদি তো কখনো পাই নাই, এযে আমার অচিন্তিত অভাবিত নূতন কথা শোনা! থিয়েটারে অনেক অভিনয় দেখিয়াছি, উপন্যাসও কম পড়ি নাই, কিন্তু সে সব চিত্র সে কল্পনা কখনই বিশ্বের ভাবের স্বরূপে ছায়াপাত করিতে পারে নাই। ভালবাসার স্বরূপ কি জানি না, মানিবার শক্তিও ছিল না। অকস্মাৎ প্রসাদের ভাবান্তরে আমাকে ভাবাইয়া তুলিল। ভাবিলাম প্রসাদ গয়লা বৌকে পায়, ওটা উহার দুদিনের ভোগের জিনিষ। সেখানে যৌবনের প্রাণ নাই। পয়সা দেখিয়া দিয়াছে বলিয়া এ পিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছে, কাছে পাইলে উহার অতিরিক্ত প্রসাদ অনুভব করিতে পারিবে না।

বলিলাম "গয়লা বৌ দুর্লভ হবে না প্রসাদ, কলকাতায় এমন সব জায়গা আছে যা তুমি জান না; আমি চিনি আমি চেষ্টা করলেই তাকে আনতে পারি। তাকে পাওয়া গেলে দুই দিনেই তোমার নেশা ছুটে যাবে ভাই, নেশা চলে গেলে তখন তাকে কোথায় পাঠাবে?"

সহসা প্রসাদের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। মুখ বদন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অগ্নিময় দৃষ্টিটা আমার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে প্রসাদ বলিল "কমল, নিজের মত সবাইকে ভেব না ভাই। এতে ভালবাসার মর্য্যাদা হয়। তুমি চিরকাল স্ত্রীজাতিকে ভোগের দ্রব্য ভেবেছ, তাই তাদের প্রতি অনাচার অত্যাচারও কম করনি, কিন্তু ভাল বাসনি,—ভালবাসা জানবে কেমন করে? আমি মালতীকে চাই না, তার সুখে আর শান্তিতে সুখী হতে চাই শান্তি পেতে চাই। জগতের সম্মুখে তাকে গৌরবের আসনে বসিয়ে বিপদ মুক্ত অবস্থায় দেখতে চাই। আমার ভালবাসা তার দেহকে নয়, প্রাণকে। সে তুমি জান না কমল!"

"প্রসাদ বলে কি, ভালবাসা স্নেহের ধন, প্রাণে প্রাণে বিনিময়।" বড় সুন্দর কথাটি তো বড় মধুর উপমা প্রাণকে ভালবাসা, আর কি মিষ্টি ইহারই নাম প্রেম। জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি যে

দূর থেকে তাকে ভালবাসবে প্রসাদ সে যদি তোমায় চায়—তখন ?"

এ সাহেরস্থানে অবশ্য প্রসন্ন হাসিতে সমুজ্জ্বল হইল, সে একটু ভাবিয়া বলিল "সে যদি আমাকে চায়, তাকে যদি পাওয়াই যায়, তাহলে সকলের সাম্নে তাকে আমি পেতেই চাইব, কমল! পাবার জিনিষ পাওয়া যাওয়াইত আনন্দের ভাই!

"কি করবে—তাকে নিয়ে প্রসাদ ? সে বিধবা, ভিন্ন জগতের মেয়ে, সকলের সম্মুখে প্রকাশ্যে তো তোমাদের মিলন হওয়া সম্ভব হ'বে না, তোমাকে অন্ধকারের আশ্রয়ই নিতে হবে।" উত্তেজিত হইয়া সরোষে প্রসাদ বলিল "প্রাণান্তে তা করব না কমল! যাকে ভালবেসেছি তার মাথায় কলঙ্কের ডালি দেব না, যদি মিলন হয়, পরিণয়ের মধ্যে দিয়ে হবে, নইলে এজীবনেও তাকে আমি স্পর্শ করে মলিন করব না। আমার ভালবাসার শিরায় শিরায় আত্মবিসর্জ্জন, পদে পদে আত্মাহুতি। এ ভীষণ প্রণয়ীর মর্ম্ম তোমার বুঝবার ক্ষমতা নেই।" সত্যই এত দিন ক্ষমতা ছিল না। যাহা যুবকের রূপক মোহ বলিয়া, খেয়ালীর খেয়াল ভাবিয়া অবহেলা করিয়াছি, অবজ্ঞা করিয়াছি তাহা এই—এমন অনন্ত! এমন অসীম! এমন অবাধ, পরশ পাথর হৃদয়ের মূল্য কি সাধকের সাধনায়, তাপসের আত্মত্যাগে? ইহাই কি স্থান বিশেষে মায়ের বুকে, ভাইয়ের স্নেহে, সন্তানের প্রভায়, বন্ধুর প্রীতিতে? ইহা চির সুন্দর। এই প্রেম—ইহারই নাম ভালবাসা? দুই বাহু বাড়াইয়া প্রসাদকে বুকের কাছে টানিয়া লইলাম, অশ্রুসিক্ত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া বলিলাম "না বুঝে তোকে আঘাত দিয়েছি- প্রসাদ, তুই আমাকে মাপ কর ভাই। আমি অন্ধ ছিলাম আজ তুই আলোর খবর দিয়ে দিলি! আমাকে বিশ্বাস কর—আমার উপর নির্ভর রাখ আমি মালতীকে খুঁজে আন্‌ব। কাল ভোরেই আমি তাকে খুঁজতে কলকাতা যাব।"

প্রসাদ কথা বলিল না। স্নিগ্ধোজ্জ্বল চোখে অপার নির্ভর জানাইয়া দুই হাতে আমাকে জড়াইয়া ধরিল।

তখন ও এখন

(শ্রীকালিদাস রায় বি. এ.)

প্রথম যখন বালক স্বপনে
চুম্বন তব লভিনু ঠোঁটে,
তীব্র দ্রাক্ষা মদিরার জ্বালা —
যেন মত তাহে ছিল না মোটে।
মহুয়া ফুলের সুরার মতন,
লাগেনি তোমার প্রেমের মতন ;
ঢালে করবীর মধু যেন তাহা
পিইতাম যাহা কাননে গোঠে।
লভিনু যখন তোমার পরশ
শিহরণহীন জাগিল হরষ
পোষা পারাবতে গণ্ডে বুলালে
যে শীত হরষ অঙ্গে ছোটে।
পারাবত-প্রীতি করবীর মধু
তখনো জড়ায়ে রেখে তব বধূ
চপলা বালার দীঘিদল-কোলে
তখনো তোমার চিকুরে লোটে।
তাই দীঘিনীরে গাহনের সম
লভিনু আজি সুশীতলতম
আজি ও পরশে বুক দুরুদুরু
উষায় শুধু জাগিয়া ওঠে।

মীরাবাঈ'র কবিতা

(শ্রীরমেশ বসু এম, এ)

মীরাবাইর কবিতা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই দেখা যায় যে তাঁর জীবনের সঙ্গে কবিতার সুরের মিল আছে। সারা জীবনের সাধনার বাণী-টিকেই তিনি তাঁহার কবিতায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। জীবনের সুখদুঃখের বিচিত্রতায় এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া তাঁহার গান মনের গোপন উৎস হইতে আপনি ছুটিয়া বাহির হইয়াছে। তাঁহার জীবনের বিশিষ্টতাই তাঁহার বাণীকে গানের রূপ দিয়াছে। ভারতবর্ষে বহু রমণী ধর্ম্মের জন্যই জীবনের সফলতা কামনা করিয়াছেন, কিন্তু কে এমন গৃহ ও প্রিয় ছাড়িয়া প্রিয়তমের আরতির জন্য জীবনকে দীপের মত জ্বালাইয়াছে ও ধূপের মত পোড়াইয়াছে? এই আন্তরিকতার জন্যই মীরার কবিতা মানুষের মনে উপযুক্ত আসন পাইয়াছে। সারা ভারতবর্ষের মহিলা-কবিদের মধ্যে তাঁহার সমান বোধ হয় আর কেউ নাই।

অনেক বড় বড় কবির জীবনের বেশী ঘটনা আমরা জানিতে পাই না, কিন্তু তাঁহাদের জীবন ও কাব্য জাতির মনে যে ছাপ রাখিয়া যায়, তাহা হইতে সাধারণ লোক গল্প তৈরী করে। এই সব গল্প ঠিক ইতিহাস না হইলেও সত্য, কারণ, উহাতেই কবিদের অন্তরের ইতিহাস জানা যায়। মীরা সম্বন্ধেও এইরূপ গল্প আছে। ছোটবেলায় এক পাড়াপড়শী মেয়ের বর দেখিয়া মীরা তাঁহার মাকে নিজের বরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তার মা হাসিয়া বাড়ীর 'গিরধর লালের' মূর্ত্তি দেখাইয়া দিয়াছিলেন। এই গল্পটির মধ্যে তাঁহার সমস্ত জীবনের ও কবিতার মূল সুরটি খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

মীরাবাইর কবিতার জড়তা কি জটিলতা মোটেই নাই, ভাষা আর ভাব খুব ঝরঝরে। প্রাণের ভিতরের কথাগুলি বিনা আড়ম্বরে অতি সহজেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বাপের ও শ্বশুরের বাড়ী ছিল রাজপুতানায়, তিনি রাজপুতানার সুরের ভাষাতেই গান রচনা করিয়াছেন। তবে শেষে, নানা জায়গায় ঘুরিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কবিতায় অন্য প্রদেশের শব্দও দেখা যায়। রাজপুতনার উচ্চারণের বিশেষ কায়দাটি ধরিতে পারিলে, আর সেখানকার চলিত ভাষার বিশেষ কতকগুলি নিয়ম জানিলে মীরার কবিতা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তাঁহার কবিতার ছন্দ ও অলঙ্কার আপন পথ কাটিয়া লইয়াছে, কোন নিয়মের ধোরাই ধারেন নাই।

আমাদের দেশে সাধনা ও সঙ্গীত একে অন্যের সাহায্য করিয়াছে। অনেক জায়গায় কবি আর সাধক একই ব্যক্তি। মীরার কবিতায় যোগীর জ্ঞান সাধনা আর প্রেমীর ভাব সাধনা এই দুই ধারা একত্র মিলিয়া গিয়াছে দেখা যায়। তবে তাঁহার জ্ঞান ও প্রেমে কিছু বিশেষত্ব আছে। তিনি একদিকে কবীর, দাদূ প্রভৃতির মত সুফীদের প্রভাবে বিশেষ করিয়া জ্ঞান লইয়াই থাকেন নাই, আর এক দিকে তাঁহার বৈষ্ণবতার রাধা-ভাবও তেমন বিচিত্র ভঙ্গি পায় নাই। তাঁহার কবিতায় নিজের অনুভবের কথাই আছে, তিনি জ্ঞানীদের মত তত্ত্বোপায় লইয়া বাহির হন নাই, আর বৈষ্ণবদের মত হৃদয়কে রাধা কল্পনা করিয়া লইয়া মনোবিজ্ঞানের ছায়াবাজী দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই।

মীরার সমস্ত কবিতার মধ্যে বিরহ আর প্রেমের কবিতাগুলিই খুব সুন্দর, এ গুলির ভাব আমাদের মনকে স্পর্শ করে। যে আবেগ ও আকুলতার সঙ্গে তিনি গান গাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস বর্ণে বর্ণে ভরা

ইহা রহিয়াছে বেশ বোঝা যায়। চিরবিরহের অনন্ত বেদনার অন্তরে তাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রী ঝঙ্কারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে—সে সুর যতই বন্ধ করিবার মনের মধ্যে ঘুমিয়া বেড়ায়।

প্রেম ও দুঃখকেই বরণ করা। তাই মীরাকে অন্তরে বাহিরে, ঘরে পরে কত দুঃখই না সহিতে হইয়াছে। এ দুঃখ ত যাইবারও নয়, জীবনের সবটাই যে প্রেম দিয়া ভরপুর। মিলনের আশাতেই মীরা জন্ম জন্ম এই বিরহের বেদনা বহন করিয়া আসিয়াছেন। দুঃখের কিংশুকেই তাঁহার হৃদয়ের সহজধর্ম অপূর্ব মাধুর্যে মাতিয়া উঠিয়াছে।

বিরহের অশ্রুজলে যে মুক্তা পুষ্ট হইয়াছে তাহার মূল রহিয়াছে মিলনে। যখন দুঃখের অবসান হইয়াছে, প্রেম হৃদয়ের কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে, চিরমিলনের আশায় সকল ইচ্ছাস থামিয়া গিয়াছে। কিন্তু মীরার ত মিলনেও শান্তি নাই! প্রিয়ের দৃষ্টি তাঁহাকে "হেরোল" করিয়া তোলে, সমস্ত শরীর ও মনে কি এক মাদকতা আনিয়া দেয়, তার উপর আবার হারাইবার ভয় ত আছেই।

মীরা যখন আপনাকে নিঃশেষে প্রিয়ের হাতে বিলাইয়া দিয়াও তাঁহাকে পান নাই, তখন তাঁহার মনে অভিমান আসিয়াছে। কিন্তু অভিমান লইয়াও ত থাকা যায় না, প্রিয়কে না হইলে জীবনই ব্যর্থ হইয়া যায়। তাই আবার তাঁহাকে সাধিতে হইয়াছে। মিনতির সুরগুলা জমাটে মীরার মন আরও বেশী উতলা হইয়া পড়িয়াছে, তাহার আত্ম-নিবেদনের সুর আরও বেশী করুণ হইয়া বাজিয়াছে।

প্রিয়ের ডাক শুনিয়া মীরার মন মাতিয়া উঠিয়াছে, লজ্জা, ভয় কিছুই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। সমাজের নীতি আর চার-কুলের মর্যাদা মনের বিদ্রোহের কাছে কোথায় পিছাইয়া পড়িয়াছে তার ঠিক নাই। মীরা 'দিবানী' হইয়া ছুটিয়াছে, তার মর্ম প্রিয়ের 'রঙে' রঙিল হইয়া গিয়াছে, সে আর 'অপর' নহে। প্রিয়তমকে কিছুতেই ভুলিতে পারে না, তাই পিতা মাতা, ভাই বন্ধু, সখী ও স্বামীকে ছাড়িয়া পরের মত বাধা বিপদের কথা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে ছুটিয়া চলিতেই হইয়াছে।

ভূমার সন্ধানে ও আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ ব্যাকুল হইলে মন আর ছোট ছোট জিনিষে তৃপ্ত হয় না। সংসার বন্ধনের পাক হইতে মনকে খুলিয়া তাহার বৈরাগ্যকে 'সহজ' করিবার চেষ্টা আসিয়া পড়ে। তখন যে প্রিয়ের আগমন হইবে তাহা ত জানা নাই, সেই জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়, আতিথির ডালা সাজাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া মীরা যেখানে 'ফাগুন' খেলার জন্য মাতিয়াছেন, তাহা তাঁহার কবিতার মধ্যে সব চেয়ে উঁচু স্থান পাইবার যোগ্য। এই খেলা চিরকালের বিশ্ব-রাসলীলা। এই খেলায় মানুষ বাহিরের আবরণ ফেলিয়া দিয়া বিশ্বের সমস্ত জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য-লীলায় যোগ দেয়। ক্রমে ক্রমে বিশ্বের সব জিনিষ সরিয়া যায়, চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, আকাশ, জল, বায়ু, কিছুই আর থাকে না। কেবল 'অটল রহে অবিনাশী,' আর মানুষের আত্মার সঙ্গে তাঁহার রাসলীলা চলিতে থাকে।

মীরা প্রেমের আকর্ষণে স্থির থাকিতে পারেন না, আবার প্রিয়ের সম্মুখে তাঁহার ইন্দ্রিয় বিবশ হইয়া পড়ে, মন বিচিত্ত হইয়া যায়। প্রিয়ের রূপ দেখিয়া, অঙ্গ স্পর্শ করিলে, অথবা শব্দ শুনিলে তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠে। লোক-পরলোকের কথা মন হইতে ভুলিয়া যায়, প্রিয়ের প্রত্যেক অঙ্গের তুলিতে নিজেকে বলি দিয়া তবে সে রক্ষা পায়। যখন সে প্রিয়কে পায় নাই তখন তাঁহার নামটিকেই সম্বল করিয়া সে বাঁচিয়া থাকে। এই 'অমৃতলাক' বস্তুটি তাহার সকল সুখ-দুঃখের বস্তু। প্রিয়ের সান্নিধ্যে নিষ্ঠুর ও অনাকাঙ্ক্ষিতে 'সমীহন' তাহার চোখকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে।

প্রিয়কে না পাওয়ার দুঃখ, আর প্রিয়ের মিলনের দুঃখ দুরে সরিয়া যায়, কিন্তু তাহাকে পাইতে পাইতেই হারাইয়া ফেলিলে সে দুঃখ ও আর সয় না। প্রিয়ের এই লুকোচুরি মীরাকে যে পাগল করিয়া তোলে। প্রভু যে ঘুমে থাকে তখন প্রিয় আসিয়া খাটিয়া দেখা দেই, কিন্তু চোখ মেলিয়া চাহিতে না চাহিতেই তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রকৃতির নানা সময়কার নানা রকম রূপ মীরার মনে প্রিয়ের কথাই জাগাইয়া রাখে। বরষার শ্যামলতা ও বসন্তের সজীবতা যেন তাঁহারই প্রাণের সুরে গাঁথা। প্রিয়কে না পাইলে প্রকৃতির হোলী-খেলায় মীরার মন মাতিয়া ওঠে না, আর বাদলের ঘটা ত কেবল তাহার চোখের জলেরই বান ডাকায়। প্রিয়ের আগমনে বসন্তের সমস্ত সৌরভ ও সৌন্দর্য্য মীরার মনে সাড়া দেয়, আর বরষার ঘনঘোরের অশ্রান্ত বর্ষণে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া ওঠে। প্রিয়ের সঙ্গে তাঁহার মিলন হইলেই তাঁহার সমস্ত দেহ মন প্রকৃতির লীলায় যোগ দিতে পারে।

মীরা সমাজ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার পূজা পদ্ধতিও ছাড়িয়াছেন। বহু দেবতার পূজা ছাড়িয়া তিনি 'আদি' 'অনাদি'কে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। যে দেবতা শুধু পূজা চায় আর বাহিরের আয়োজন চায় তাঁহাকে তিনি স্বীকার করেন নাই। তিনি হৃদয়ের দেবতাকে অন্তরের ও ইন্দ্রিয়ের উপচারে ভক্তির অর্ঘ্য দিয়াছেন।

বৈষ্ণবদের সাধনায় কয়েকটি ভাবের স্তর আছে। কোন বিশেষ কবির রচনায় ইহার কোন বিশেষ স্তরের ভাব বেশী মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলা দেশের বৈষ্ণবদের 'মধুর ভাব' মীরার কবিতায় পাওয়া যায় না। মীরার মধ্যে রাধার আত্মভোলা 'ভাব' এবং নিজের প্রেমের জোরে প্রিয়কে সমান বা হীন মনে করার লক্ষণ দেখা যায় না। তিনি নিজেকে সাধারণতঃ 'দাসী' এবং কোন সময় 'সাথী' বলিয়াছেন, কদাচিৎ ঈশ্বরকে পতি কল্পনা করিয়াছেন। তিনি গোপীভাবের বিষয়কে পূজা ও স্তুতি করিয়াছেন। তাই নাভাদাস তাঁহার প্রেমকে 'সদ্ রস গোপিন প্রেম' বলিয়াছেন। বাংলার বৈষ্ণবদের কাছে রাধা ভাব এবং গোপী ভাবের মধ্যে অনেকটা তফাৎ আছে। মীরাবাই গোপীদের মত সংসারের সব কিছু তুলিতে পারিয়াছেন, কিন্তু রাধার মত নিজেকে ভুলিয়া যাইতে পারেন নাই।

এ পর্য্যন্ত মীরার কবিতার প্রেমের দিকের কথাই বলা হইল। জ্ঞানের দিকে তাঁহার কবিতা ভারতবর্ষের চিরকালের কথাই বলিয়াছে। বেদান্তের মায়া, গীতার আত্মবাদ, জীবনের ও পৃথিবীর নশ্বরতা দুঃখবাদ কর্ম্মবাদ ও চমাস্তরবাদ কোন কথাই বাদ যায় নাই। এই সকল বিষয়ের জন্য মীরার কবিতার মাধুর্য্য অনেক সময় ততটা উপভোগ করা যায় না। প্রেমিকের মুখে জ্ঞানীর এই বাণী হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে অনেকটা দমাইয়া দিয়াছে।

মধ্যযুগের সাধকদের মত গুরুবাদের কথাও মীরার কবিতায় খুব প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে। গুরুর প্রতাপ ও প্রভাবের কথা বলিতে মীরা কখনও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার গুরু রৈদাস জাতিতে চামার ছিলেন, তাঁহার প্রশংসা তিনি যথেষ্ট করিয়াছেন। মীরা যে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার এক প্রমাণ এই যে, তিনি চামার জাতীয় গুরুর জ্ঞানকে আপনার কাছে লাগাইয়াছিলেন। রৈদাস কিন্তু ছিলেন রামভক্ত, মীরা কৃষ্ণকে পূজা করিতে যাইয়া তাঁহাকে গুরুর পদে কেন বসাইলেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

মীরার গান ও কবিতা লোকের মুখে মুখে নানা আকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাই তাঁহার রচনার সঙ্গে অন্যের রচনাও জড়াইয়া গিয়াছে। কোন কোন রচনার ভাব মীরাবাইয়ের কবিতার মূল সুরটির সঙ্গে যেন ঠিক মেলে না। মীরার প্রেমের মাহাত্ম্য না বুঝিয়া হয়ত কোন লোক তাঁহার নামে এমন

সব গান ও কবিতা চেনা করিয়াছে যাহাতে মীরার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করে। নানা অনে চেষ্টা করিয়া নানা ভাষা হইতে তাঁহার কবিতা সংগ্রহ করিয়া মিলাইয়া লইলে কোনগুলি তাঁহার আসল কবিতা তাহা ঠিক করা খুব সহজ হয়।

—বাসন্তী।

ভুলের ব্যথা

(গল্প)

(শ্রীঅমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী)

(১)

"আজ তোমার কাছে শেষ ভিক্ষে চাইতে এসেছি, দেবে?"

"একেবারে মহাজনের কাছেই যে চেয়ে বসলে এমন জিনিষটা কি?"

"আমি তোমাকে চাই,"

স্বামী বল্লে—"কেন পাওনি নাকি?" স্ত্রী উত্তর দিল—"পাওয়ার মত তোমাকে ত পাইনি, বল তুমিই বল।"

"তুমি কি চাও?"

"ওগো কি কর্লে তোমাকে পাব! রূপ, যৌবন, ঐশ্বর্য্য এসব কি কিছুই তোমার ভাল লাগে না?" স্বামী মুখ ফিরিয়ে বল্লে—"যদি বলি—না—"

"তা যে বল্‌বে, তা জানি, কিন্তু তোমার অন্তরের কি এই শেষ উত্তর?" স্বামী বল্লে—"পাগলামী কেন কর—এস, শোবে। রাত অনেক হোয়েছে।" স্ত্রী দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—"আমার মিথ্যে দিয়ে সত্যকে ঢাকছ—তবে দেবে না?" স্বামী বিছানার উপর উঠে বসে উত্তর দিল—"দেবার আছে,—কাকে দেব? আমি যা চাই, তা ত ঠিক পাইনে, আমার মন যা চায় তা ত তোমার রূপ, যৌবন দিয়ে পাওয়া যায় না!" স্ত্রী লীলা বাধা দিয়ে বল্লে—"তাই করে পাওয়া কেন?"

"তা কি হয় বল"—উত্তর দিয়ে প্রকাশ চোখ চাইল। চেয়ে দেখে—লীলা ঘরে নেই।—এত রাত্রে সে কোথায় গেল,—সেত আমার অন্তরের কথা জান্‌তে পেরেছে, না আর পারি,—এ ছলনা করে কদ্দিন আর লুকোচুরি খেলা যায়।—যাই লীলাকে ফিরিয়ে আনি। নৈলে অকালে এই শুন্তর-বাড়ীতে একটা কেলেঙ্কারী লেগে পড়বে—বলে প্রকাশ ঘর হতে বাইরে আস্‌তেই চাঁদের আলো তাকে আমের বাগানের খোলা দরজা দেখিয়ে দিল। তবে কি লীলা বাগানে! প্রকাশ বাগানের মধ্যে গিয়ে দেখে—পুকুরের শেষ বৈঠের দাঁড়িয়ে ওপারে, জলের দিকে সে তাকিয়ে আছে। আর ত সে ভাব্‌তে পারে না—কেবল লাফ দিয়ে ছুটলো "লীলা" .....ঝুপ, ঝুপ, শব্দ হল।—নিঝুম, স্থির, শান্ত জলকে এলোমেলো করে তার শান্তি ভেঙ্গে দিল।

রাত্রি তখন বেড়টা। লীলা চোখ বুঁজে বিছানায় পড়ে আছে। তবে সে যে ঘুমায় নি, একথা ঠিক। প্রকাশ ধীর কণ্ঠে বল্লে—"লীলা এখন কেমন আছ? খাওঁপাচ্ছে কি?" কোন উত্তর না পেয়ে আবার নম্রকণ্ঠে বল্লে—"একটু গরম দুধ খেলে হত না—আমি এনে দিচ্ছি, এইতো, এই ঘরে দুধ আছে।" লীলা আর চুপ্ করে থাকতে পারলে না—চোখ চেয়ে বল্লে—"তুমি কেবল যে নির্দ্দয় তাই জান্‌তেম, কিন্তু এত বড় পাষাণ তা জানতেম না—এত দুঃখ দিয়েও বুঝি সুখ মিটে নি, আমার মৃত্যুর তীর থেকে ফিরে এসে নূতন করে বিষের জ্বালা দেবার জন্য ব্যস্ত

[illegible]।" প্রকাশ স্তম্ভিত, তার ছলছল চোখ দুটী তখন খোলা জানলার পথ দিয়ে বাইরের নিবিড় রাত্রের আলোর দিকে। অন্তরের ভেতর থেকে কে যেন গুমরে গুমরে উঠে বল্‌ছে "একি পরিহাস, একি নির্দ্দয় আঘাত! পরীরের সঙ্গে সঙ্গদোষের যে কোনমতে পাপ খায় না—এ যে হ'তে পারে না।" সে চোখের জল মুছে মুখ ফিরিয়ে বল্লে—"লীলা ঘুমুচ্ছে?"

"ঘুমুতে দেবে না"—চোখ বুঁজেই সে উত্তর দিল। সে তার স্বামীর মুখের দিকে একবার ফিরিয়াও চাইল না—কেবলই নিজের অন্তরালেই তাকে লাগ্‌ছে। এমন মানুষও কি হয়? চিরকাল নির্দ্দয় আঘাত দেবার জন্য আমায় বাঁচিয়ে আবার বলেন,—আবার বাইরের মিথ্যা দরদ দিয়ে জানান হচ্ছে, দুঃখ পাবে—তা হলেই আমি শান্ত হব আর কি? তা হবে না—লীলা আজ দু বছর ঠেকে ঠেকে তোমার মিথ্যায় আবরিত সত্যকে, তোমার স্বরূপকে চিন্‌তে পেরেছে, এবার না হয় বাঁচালে তারপর……। যে বিদ্রোহী, অন্তর যার ছিন্ন ভিন্ন, সে ত মরণকে আলিঙ্গন করেই চলেছে।"

"আর লীলা তোদের দোর খোলা কেন?" বলে তার পুটুদিদি ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল। লীলা তার দিদির ডাকে চম্‌কিয়ে একেবারে বিছানার উপর উঠে বস্‌লো, দেখলে প্রকাশ ঘরে নেই।

"কিরে কথা কচ্ছিস্ না যে?" বলে পুটু ঘরের মধ্যে এসে নীচু হো—লীলার দিকে তাকিয়ে "মুখ্‌খানা শুকিয়েছে?" লীলার তখন সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল,—সে উত্তর দিল না,—কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

কাঁপচিস্ কেন, গা দেখি, জ্বর একি? জ্বর হোয়েছে, চুল ভিজে রে—মাথায় বোধ হয় জল দিয়েছিস্, প্রকাশকেও দেখতে পাচ্ছিনা—তোদের কিছু হয়েছে নাকি?"

—"জানি না" বলে লীলা পাশ ফিরে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লো।" "তুইও কিছু বলছিস না, আমিও কিছু বুঝতে পাচ্ছি না; দাঁড়া মাকে ডেকে আনি—"।

লীলা তার কম্পিত হস্ত দুটী দিয়ে তার দিদির হাত ধরে বল্লে "তার চেয়ে দোর দিয়ে আমাকে জড়িয়ে শুয়ে পড়,—আমার বুক শীত কচ্ছে, কাল সকালে সব শুন্‌তে পাবে।"

রেমিটান্ট ফিভারে পঁয়ত্রিশ দিনের মধ্যে লীলা একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছে। জ্বর ৯৯॥ আর সকালে ১০১ ডিগ্রি এ আর যেতে চায় না। দুজন এম্ বি, ডাক্তার পরামর্শ করে দেখ্‌ছেন,—আশা মাসের ৪২ দিনে,—না আমি ঐ দিনের মধ্যে কি হয়ে যায়, লীলা কিন্তু স্থির। প্রথমে তার মর্‌তে বড় সাধ গেয়েছিল, কিন্তু মাঝে তার বাঁচতে সাধ হচ্ছে। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিতা, এবার তার ভুলের ব্যথা বুঝতে পেরেছে, সে বুঝেছে রূপ, যৌবন, ঐশ্বর্য্য দিয়ে যা নিতে গিয়েছিলেম তার এসব দিয়ে পাওয়া যায় না। থাকা চাই হৃদয়ের অনুভূতি, আর কিছু থাক্ বা না থাক্ ঐটী থাক্‌লে ত আমার প্রার্থিতকে পেতাম! তাই বুঝি সে বাঁচতে চায়, এতদিনে যে সে তার অনুসন্ধান পেয়েছে, কিন্তু এখন ফিরে কেমন করে—ওগো কেমন করে তাকে দেবে!—তার যে শেষ দিন ঘনিয়ে আস্‌ছে।—

তার দিদি বল্লে—"লীলা এমন কেন কচ্ছিস বোন? খুব কি কষ্ট হচ্ছে?" ক্ষীণস্বরে সে উত্তর দিল—"আর পারিনে দিদি,—এ জীবনটা যে অপূর্ণ আশা নিয়ে শেষ হতে চল্লো দিদি"—আরোও কিছু সে বল্‌তে যাচ্ছিল। পুটু বাধা দিয়ে বল্লে "চুপ্ কর মণি আমার—ভয় কি? বেশী কথা বলোনা।"

"না-দিদি—তুমি ঠিক্ জেন—আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে,—একটী কথা বল্‌তে দাও—উঃ কি যাতনা।"

"থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না।" "না দিদি, না বল্লে যে স্বস্তি পাচ্ছি না। তোমাদের যা বলে-

দিলেম সব মিথ্যে। ওঁকে আমি চিনতে পারিনি, দিদি, আমি হারিনি—আমিই ওঁকে তাড়িয়েছি। আমি এই অভাগী!"

"অবেলাতে লীলা বলে ডাক দিয়ে আসতেন, আমি নিজের মিথ্যা অহঙ্কারেই তাঁর বাড়িত কণ্ঠকে ছিঁড়ে দিতেম, আমি জেগে থেকে উত্তর দিতেম না!"

"লক্ষ্মীটী আমার একটু চুপ কর" পুটু এই বলে নিজের অঞ্চল দিয়ে চোখ মুছল।

"আমি কি করেছি দিদি,—উঃ তাঁকে একটী বার খবর দাও, আমি আমার নূতন পাওয়া চোখ দিয়ে তাঁকে দেখবো—কেবল ক্ষমা চাইব।"

"তাঁকে খবর দিয়েছি,—সে আসছে" বলে তখন তাকে সেবা দিয়ে ঘুমের ওষুধ দিল। লীলা—"আঃ" বলে ঘুমিয়ে পড়ল। পুটুর চোখে জল আর নাই, সে কেবল ভাবতে লাগলো—"লীলা এমন স্বামী পেয়েও সুখী হোলনি, যাক্ তবু এতদিনে ভুল বুঝতে পেরেছিল। ভগবান—লীলাকে এবার বাঁচিয়ে দাও—সে এবার তার নূতন জীবনের স্বাদ পাক।"

এমন সময় তাদের মামাতো জাইবুড়ো বোন, অনুরা, চুল শুকি এলিয়ে দিয়ে এসে বল্লে—"পুপুদিদি, জামাইবাবু এসেছেন,—কি তাঁর বিশ্রী চেহারা হোয়েছে দেখলে চেনা যায় না।"

"তুই একটু চুপ করে বস, আমি আসছি,"—বলে পুটু প্রকাশের কাছে যেতেই, প্রকাশ বলে "দিদি, সে এখন কেমন আছে, চলুন একবার দেখিগে? পুটু বলে সে এখন ঘুমুচ্ছে, তোমার কি কোন অসুখ হয়েছিল?"

"না"

"তবে এমন হোয়ে গিয়েছ কেন? চোখে যে একেবারে কালি পড়ে গিয়েছে। তুমি ততক্ষণ হাত মুখ ধুয়ে নাও একটু কিছু নিয়ে আসি।"

"না দিদি,—কিছু এখন পাইনি—তুমি একবার তাকে দেখিগে—প্রকাশ পুটুর সঙ্গে লীলার ঘরে ঢুকিল;—লীলা তখনও ঘুমুচ্ছিল। তার মা তার কাছে নিষন্ন মুখে বসে আছেন। প্রকাশ ঘরে যেতেই তিনি "এস বাবা প্রকাশ,—লীলা এর মধ্যে কি হোয়ে গিয়েছে, কি জানি ভগবান আমার অদৃষ্টে কি লিখেছেন," বলে তিনি চোখ মুছলেন। প্রকাশ বিছানার কাছে গিয়ে বসতেই লীলার ঘুম ভেঙ্গে গেল—সে বল্লে "এখনও আসেনি দিদি?" মা উত্তর দিলেন—"লীলা এই যে প্রকাশ।" লীলা প্রকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো—আজ তার কি করুণ দৃষ্টি, এখনও যেন সে কিছু চাচ্ছে। তার দিদি বল্লে—"কি লীলা—" লীলা ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল,—"ওঁকে বল দিদি আমায় ক্ষমা করতে।" এবার প্রকাশের চোখ দিয়ে শ্রাবণের বারিধারার মত ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়ল।

আজ বিবাহের দিনের রাত্রি। লীলার জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ।

প্রকাশ লীলার মাথার কাছে—তার পায়ের কাছে বসে আছে, পুটু তার মাকে নিয়ে খেতে গিয়েছে। এইমাত্র ডাক্তার এসেছিলেন, বলে, আজ ঝড় হবে বলে আশা দিয়েছেন, কিন্তু খুব সাবধানে থাকতে হবে, কারণ রোগিনী খুব দুর্বল। লীলা হেসে বল্লে "তারা উনি ভাল কইরে?"—প্রকাশ উত্তর দিল "এই যে আমি লীলা।"

"এখনও যাওনি?"

"খেয়ে এসেছি, মাকে পাঠিয়ে দিলেম। কেমন আছ লীলা?"

লীলা একটু হেসে বল্লে "সেই থেকে ভাল লাগছে বোধ হচ্ছে। তারা, আমার কাছে সবে, আমার বোন। বেশ আজ ভারী খুসি হচ্ছে। কতকথা কইতে ইচ্ছা কচ্ছে। বেশ আজি সব ঠিক করেছি তাইতে এত আনন্দ হচ্ছে।" প্রকাশ জিজ্ঞাসা করে "কি লীলা?"

"ওগো আমি তোমার প্রার্থিত জিনিষ পেয়েছি, দিয়ে যাব, নিতে হবে কিন্তু।"

"প্রকাশ বিস্মিত হ'য়ে বল্লে, "কি বলছ লীলা ?" লীলার চোখ দুটো তখন ছল্ ছল্ করছে—সে বল্লে "কৈ তোমার হাত।"

লীলা অতিকষ্টে স্বামীর হাতখানি এক হাতে ধল্লে, আরেক হাতে তাহার হাত ধরে বল্লে—"ওগো আমার জীবন-মরণের প্রভু, যদি ক্ষমা করে থাক, তা হ'লে তোমার তৃষিত জীবনের—তোমার প্রার্থিতকে নিয়ে যাবার বেলায় আমাকে তৃপ্ত কর।"

সে আর কিছু বল্‌তে পাল্লে না—কেবল চোখ-দুটী প্রকাশের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার দুটী চোখ জলে ভরে গেল।

প্রকাশ ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে, "লীলা! লীলা! একি কর্ছে তুমি—অমন কচ্ছ কেন?" বলেই সে গায়ে হাত দিয়ে দেখ্‌লে—সমস্ত গা হিম হ'য়ে গিয়েছে। সে চীৎকার করে উঠ্‌লো, "লীলা কোথায় গেলে?" মা ছুটে এসে আছড়ে পড়ে বল্লে "কৈ প্রকাশ, কৈ লীলা—কোনদিক্ দিয়ে সে পালাল,—আমি তোমার কাছে তাকে রেখে গেলাম।"

কেবল তাহার চোখে জল নেই, তার দুটী কানের মধ্যে তখন ঝিম্ ঝিম্ কর্ত্তে লাগলো।

অধ্যাসের ইঙ্গিত

(অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ)

অধ্যাসের অর্থ মিথ্যা আরোপ, জড়ের ধর্ম্ম চৈতন্যের উপর ও চৈতন্যের ধর্ম্ম জড়ের উপর আরোপিত হইয়া ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম হইয়া থাকে। জগৎ বলিয়া স্বতন্ত্র কিছুই নাই। ব্রহ্মই আছেন। ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম হয়। এই ভ্রম জড়ের ধর্ম্ম চৈতন্যের উপর ও চৈতন্যের ধর্ম্ম জড়ের উপর অধ্যস্ত হইয়াই হয়। কিন্তু চৈতন্য ও জড় কোথা হইতে আসিল? চৈতন্য আত্মার ধর্ম্ম। যাহা চেতনের বিপরীত, তাহাই জড়ত্ব। জড়ত্ব জড়ের ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী পৃথক্ পদার্থ নয়। আত্মাই ব্রহ্ম। ইহা শ্রুতিরই তাৎপর্য্য।

শ্রুতি বলেন, কেবলমাত্র ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই, এবং আত্মাই ব্রহ্ম। শ্রুতি ব্রহ্মকে সৎ, চিৎ, আনন্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম সৎ, চৈতন্যময় ও ব্রহ্মে আনন্দ আছে। কিন্তু ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সৎ এবং চৈতন্য ও আনন্দময়। ব্রহ্মকে বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে সৎ, চিৎ ও আনন্দের স্বরূপ বুঝিতে হইবে। সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহাতেই জগদ্‌ভ্রম হইয়া থাকে। জগদ্‌ভ্রম অধ্যাসবশতঃ হয়। অধ্যাসের কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা ও অজ্ঞান একার্থক। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইবার কারণ যেমন অজ্ঞান, তেমনই ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম হইবার কারণও অজ্ঞান। অজ্ঞান কেমন করিয়া হয়, আমরা বলিতে পারি না, অজ্ঞানবশতঃই যে ভ্রম হয় ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

দর্শন শাস্ত্র সকলের মূলে কারণ অনুসন্ধান করে। কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে সর্ব্ব কারণের কারণটী অনুসন্ধান করিবার দিকেই দর্শনের প্রবৃত্তি। আমরা যতক্ষণ না সর্ব্বকারণের কারণটী পাই, ততক্ষণ আমাদের সংশয় থাকে। আমাদের অনুভূতি বা জ্ঞানে যাহা আসে, দার্শনিক তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। দার্শনিক তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে যতক্ষণ না সর্ব্বকারণের কারণ পর্য্যন্ত উপনীত হন, ততক্ষণ কিছুতেই সন্তোষলাভ করিতে পারেন না। একমাত্র কারণই সৎ,

কার্য্য অসৎ। আমরা যদি বলি, অজ্ঞানই জগতের কারণ, আমাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন হয়, অজ্ঞানের কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর না পাইলে অজ্ঞানের স্বরূপ আমাদের বোধগম্য হইতে পারে না। কোন্ ভিত্তির উপর অজ্ঞান দাঁড়াইয়া আছে, তাহা আমরা বুঝিতে না পারিলে, অজ্ঞান যে জগতের কারণ, তাহা আমরা বুঝিতে পারিব না। রজ্জুতে আমাদের সর্প-ভ্রম হয়, তাহা যে অজ্ঞান বশতঃ হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সর্প আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, রজ্জু আকৃতিতে সর্পসদৃশ। সর্পে আমাদের আতঙ্কের কারণ আছে। অন্ধকারে রজ্জুর অপরাপর বিশেষত্ব প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কেবল ইহার সর্পসদৃশ ভাবটী যখন আমাদের বোধগম্য হয়, তখন পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ মনোমধ্যে ভীতির উদয় হয়, ও সেই ভীতিজনিত মোহ বশতঃ আমাদের রজ্জুতেই সর্পভ্রম হইতে পারে। এই প্রকার যত ভ্রম, তন্মূলে এই ভাবের বিশিষ্ট কারণ থাকে। ব্রহ্মে জগদ্ভ্রমের মূলে এই ভাবের বিশিষ্ট কারণ আছে কি না, তাহা দেখিতে হইবে। যদি এই ভাবের কারণ থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে, জগদ্ভ্রম অজ্ঞান-বশতঃ হইয়া থাকে। যদি স্বীকার করা যায় যে, ব্রহ্মে জগদ্ভ্রমের মূলে এই ভাবের বিশিষ্ট কারণ আছে, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ব্রহ্ম ছাড়া এমন কোন কিছু আছে, যাহা জগৎসদৃশ ও যাহার ব্রহ্মের সহিতও সাদৃশ্য আছে। আমার ব্রহ্ম সম্বন্ধে ও তৎসম্বন্ধে জ্ঞান আছে, আমরা ভ্রমবশতঃ ব্রহ্মের উপর সেই বস্তুর ধর্ম্মের অধ্যাস করিয়া থাকি। তাহা হইলে জগৎ ও ব্রহ্ম উভয়ই সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মও আছে, জগৎও আছে এবং ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়েরই সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আছে; ভ্রমবশতঃ আমরা ব্রহ্মকেই জগৎ মনে করিতেছি। কিন্তু ব্রহ্ম ও জগৎ এক নহে, আমাদের ভ্রমবশতঃ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সুতরাং জগদাকারে আমরা ব্রহ্মকেই দেখিতেছি। ভ্রম বিদূরিত হইলে ও তৎফলে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ পাইলে, আমরা স্বরূপতঃ ব্রহ্মকেই দেখিব, এবং ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম আর সম্ভব হইবে না। কিন্তু শঙ্করের উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের এইরূপ তাৎপর্য্য নহে, শঙ্করও স্বয়ং একথা স্বীকার করেন না, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায় এই যে, জগৎ বা জগদাকারের কিছুই নাই। আছেন কেবল ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ছাড়া অপর কোন আধারেও অস্তিত্ব নাই। শঙ্করাচার্য্যের মতটীই এখন আলোচ্য।

ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করা হইয়াছে, জগতের সত্তা স্বীকার করা হয় নাই। অৎ-জ্ঞানেরও আধারও পারমার্থিক সত্তা অস্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ, এই শ্রুতিবাক্যের সহিত কাহারও বিরোধ নাই। ব্রহ্ম সৎ, কেন না, ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন। তিনি চৈতন্যস্বরূপ, কারণ, একমাত্র চৈতন্যেরই সত্তা আছে। আনন্দের সহিত চৈতন্যের নিত্য সম্বন্ধ। আনন্দ বাদ দিলে চেতন সত্তার কিছুই থাকে না। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, অর্থাৎ সকল বৈদান্তিকই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, তৎসম্বন্ধে তর্ক নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু জগৎ বা অবিদ্যা আসিল কোথা হইতে? যাহার বিদ্যমানতা আছে, তাহা সৎ, যাহার বিদ্যমানতা নাই, তাহা অসৎ। সৎএর আর একটী বিশেষণ এই যে, তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। একমাত্র ব্রহ্মই অপরিণামী, সুতরাং একমাত্র ব্রহ্মই সৎ। জগৎ পরিণামী, সুতরাং জগৎ সৎ নহে। জগতের অস্তিত্ব প্রতীয়মান, বস্তুতঃ জগতের অস্তিত্ব নাই, সেই হিসাবে জগৎ অসৎ। কিন্তু জগৎ প্রতীয়মান হইবার পক্ষে কারণস্বরূপ অবিদ্যা, সুতরাং অবিদ্যা অসৎ নহে। কিন্তু অবিদ্যা নিত্যপরিণামী এবং বিদ্যার আবির্ভাবে, অবিদ্যা অদৃশ্য হয়, সুতরাং অবিদ্যা সৎ নহে। যাহা সৎও নহে, অসৎও নহে, তাহা অনির্ব্বাচ্য। অতএব, অবিদ্যা অনির্ব্বাচ্য।

অবিদ্যাকে মায়াও বলা হয়। এই মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্মেরই অংশবিশেষ। অবিদ্যার ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। বিদ্যা ও অবিদ্যা ব্রহ্মেরই অংশভূত। আলোকের সহিত অন্ধকারের যে সম্বন্ধ, বিদ্যার সহিত অবিদ্যারও সেই সম্বন্ধ। যেমন অন্ধকারের বিনাশে আলোকের উদয় ও আলোকের বিনাশে অন্ধকারের উদয় হয়, তদ্রূপ অবিদ্যার তিরোধানে বিদ্যার আবির্ভাব ও বিদ্যার তিরোধানে অবিদ্যার আবির্ভাব হয়। বিদ্যার আবির্ভাবে তত্ত্বের প্রকাশ হয় ও অবিদ্যার আবির্ভাবে মিথ্যাভূত জগতের প্রকাশ হয়। যখন তত্ত্বের প্রকাশ হয়, তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই সত্তা উপলব্ধি হয় না। সুতরাং তখন কোনরূপ ভেদজ্ঞান থাকে না। কিন্তু যখন মিথ্যাভূত জগতের প্রকাশ হয় অর্থাৎ যখন বিদ্যার তিরোধানে অবিদ্যা আত্মাকে আশ্রয় করে, তখনই অভেদাত্মক জ্ঞান বিষয় ও বিষয়ি-ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। অর্থাৎ তখন আত্মা বিষয়িরূপে পরিণত হইয়া, বিষয়রূপ জগৎকে সম্মুখে অনুভব করে।

শ্রুতি 'বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ' বাক্য দ্বারা দুই প্রকার পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বিজ্ঞানের দ্বারা চেতন ও অবিজ্ঞানের দ্বারা জড় পদার্থ বুঝায়। বাস্তবিক জড় ও চেতন-ভেদে স্বতন্ত্র-ভাবে বিবিধ পদার্থ নাই। আত্মারই জড়বুদ্ধি ও চৈতন্য বুদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এই বিবিধ বুদ্ধি পারমার্থিক নহে। অবিদ্যা-প্রভাবে আত্মার পারমার্থিক জ্ঞান বিবর্তিত হইয়া, বিবিধ ভাবে প্রকাশ পায়। অবিদ্যা তিরোহিত হইলে জ্ঞানের বিবিধ ভাব বিলুপ্ত হয়, অর্থাৎ ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়। জ্ঞানের একটী ধর্ম্ম এই যে, ইহা আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে সংযোগ সাধন করে। কিন্তু আত্মার ও অনাত্মার আলোক অন্ধকার প্রভেদ। এই পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী আত্মা ও অনাত্মার সম্বন্ধ সূচনা, আপাততঃ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। শঙ্করাচার্য্য প্রথমে এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপিত করিয়া, পরিশেষে বলেন যে, আত্মা ও অনাত্মার সম্বন্ধ সূচনা পারমার্থিক ভাবে অসম্ভব বটে, কিন্তু ব্যবহারিক ভাবে সম্ভব হইয়াছে। আত্মা ও অনাত্মার পারমার্থিক সম্বন্ধ না থাকিলেও, ব্যবহারিক ভাবে ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ অনাদিসিদ্ধ। যাহা অনাদিসিদ্ধ, তাহার অন্ততঃ ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিতে হইবে।

যদি একটীর পারমার্থিক সত্তা ও আর একটীর ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে? পারমার্থিক সত্তাই যথার্থ সত্তা, ব্যবহারিক সত্তার কোন যাথার্থ্য নাই। যাহার পারমার্থিক সত্তা আছে, ব্যবহারিক সত্তা তাহারই প্রয়োজনার্থ বুঝিতে হইবে। এছাড়া আমরা ব্যাবহারিক সত্তার অন্য কোনরূপ সার্থকতা দেখি না।

কিন্তু যদি অনুমান করা যায় যে, পারমার্থিক সত্তার অজ্ঞান বা ভ্রমবশতঃ ব্যাবহারিক সত্তার সৃষ্টি হইয়াছে অর্থাৎ আত্মাকে অবিদ্যা আশ্রয় করিয়া অনাত্মার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইলে আত্মার উপর পরিণাম দোষ বর্ত্তে। কিন্তু শ্রুতি আত্মাকে অপরিণামী বলিয়াছেন। আত্মা যদি অপরিণামী হয়, তাহা হইলে আত্মা কেমন করিয়া অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইতে পারে? বিশেষতঃ অজ্ঞানের অপূর্ণকে আশ্রয় করাই সম্ভব, পূর্ণকে অজ্ঞান আশ্রয় করিতে পারে না। আত্মা যে অপূর্ণ নহে, তাহার কারণ এই যে, আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। অপূর্ণ কাহাকে বলে? যাহা অংশ, তাহাই অপূর্ণ, অথবা যাহাকে আত্মরক্ষার জন্য অপর কিছুর উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহাই অপূর্ণ। আত্মা কোন কিছুর অংশও নহে এবং তাঁহাকে আত্মরক্ষার জন্য অপর কিছুর উপর নির্ভর করিতেও হয় না। সুতরাং আত্মাকে অজ্ঞান আশ্রয় করিতে পারে না। বিবরণাচার্য্য প্রভৃতি যে ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয়

বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। যদি অজ্ঞান বা অবিদ্যাই জগতের কারণ হয়,তাহা হইলে ভাষতিকার যে জীবকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু জীব যদি অজ্ঞানের আশ্রয় হয়, তাহা হইলে জীবেরও পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য জীবের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না। তিনি বিবরণাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্মকে ও অজ্ঞানের আশ্রয় বলেন না, আবার ভাষতিকারের ন্যায় জীবকেও অজ্ঞানের আশ্রয় বলেন না। তিনি এসম্বন্ধে এক সুন্দর কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম বিষয়ও হইতে পারেন না, বিষয়ীও হইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার মতে অহংজ্ঞানস্তের আত্মা বিষয়। 'আমি' জ্ঞানের দ্বারা যাহাকে বুঝা যায়, তাহাই অহংজ্ঞানস্তের আত্মা এবং তাহা 'আমি'-জ্ঞানের বিষয়। এইরূপ কৌশল দ্বারা, ব্রহ্মকে বিষয়-বিষয়ীর ধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইল এবং জীবের পারমার্থিক সত্তাও স্বীকার করা হইল না।

অহংজ্ঞানস্তের আত্মা বিষয়। কাহার বিষয়? আমি জ্ঞানের বিষয়। 'আমি'—জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? অবিদ্যা হইতে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অহংজ্ঞানস্তের আত্মা ব্রহ্মের বিষয় নহে। অবিদ্যা ব্রহ্মকে আশ্রয় করিতে পারে না, সুতরাং অবিদ্যাসম্ভূত যাহা, তাহা ব্রহ্মের বিষয় হইতে পারে না। 'অহংজ্ঞান' ব্রহ্মও নহে, ব্রহ্মসম্ভূতও নহে। অহংজ্ঞান অবিদ্যাসম্ভূত। অবিদ্যা বা মায়া ব্রহ্মের অংশ বটে, কিন্তু ব্রহ্ম তাহাতে লিপ্ত নহেন, অর্থাৎ তিনি অবিদ্যাতে আসক্তিশূন্য। গীতারও এইরূপ ভাবের কথা আছে। গীতায় আছে,—'অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।'

সাংখ্যের মতে অহংকারের উদ্ভব প্রকৃতি হইতে। সেইরূপ বেদান্তের মতে অহংজ্ঞানের উদ্ভব অবিদ্যা হইতে। যেমন প্রকৃতি একাকী অহংকারের সৃষ্টি করিতে পারে না, পুরুষের সংসর্গে অহংকারের সৃষ্টি করে, সেইরূপ অবিদ্যা ব্রহ্মের সান্নিধ্যে 'অহংজ্ঞানের' সৃষ্টি করে। ব্রহ্ম তাহাতে কোনরূপ লিপ্ত বা আসক্ত থাকেন না বা ব্রহ্মের স্বরূপের কোন ব্যতিক্রমও হয় না।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অধ্যাস ভাষ্যে অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সকল দিক্ বজায় রাখিয়া, অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক, পূর্ণভাবে কেমন তাঁহার অদ্বৈতবাদটী সমর্থন করিয়াছেন! তাঁহার এই ভাষ্য উত্তমরূপে না বুঝিলে তাঁহার অদ্বৈতবাদটী অনভিজ্ঞ-লোকে দ্বৈত বলিয়া বোধসম্ভব হইবার সম্ভাবনা।

শঙ্করাচার্য্যের মতটী এক শ্রেণীর বৌদ্ধমতের সদৃশ বলিয়া মনে হইতে পারে। এক শ্রেণীর বৌদ্ধেরা অনাত্মবাদী। শঙ্করাচার্য্যও প্রকারান্তরে অনাত্মবাদী ইহা মনে হইতে পারে। অনাত্মবাদী বৌদ্ধদিগের মতে নির্ব্বাণ সাধিত হইলে কিছুই থাকে না। মনে হইতে পারে, শঙ্করাচার্য্যের মতে নির্ব্বাণ বা মুক্তিতে তাহাই হয়। বিবরণাচার্য্য প্রভৃতির মতে জীব ও ব্রহ্মে কোন প্রভেদ নাই। ব্রহ্মই অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া জীবাকারিত হন। অবিদ্যা তিরোহিত হইলেই ব্রহ্মের জীবভাব বিদূরিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম অজ্ঞানমুক্ত হন। অজ্ঞানমুক্ত হওয়া যে বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ভাষতীকারের মতে জীবই অবিদ্যার আশ্রয়। অবিদ্যা অন্তর্হিত হইলে সে স্থলে জীবের নিকট ব্রহ্ম স্বরূপে প্রতীত হন। ভাষতীকার শঙ্কর ভাষ্যেরই টীকাকার, সুতরাং তিনিও অদ্বৈতবাদী। জীবভাবে ব্রহ্মেরই অংশবিশেষ, তাহা তাঁহার অভিপ্রায়। তবে জীব ব্রহ্মের [অংশরূপে অনাদিকালাবধি অবস্থিত। যাহা অনাদি] কালাবধি অবস্থিত, তাহার স্থিতি সুতরাং অনন্তকালব্যাপী। রামানুজাচার্য্যের মতে ঈশ্বর [illegible] ঈশ্বরের প্রতি

ভক্তিতে। ঈশ্বরের প্রতি দাসভাবে জীবের চরিতার্থতা। কিন্তু এইরূপ মনে হইতে পারে যে, শঙ্করাচার্য্যের মতে জীব ব্রহ্মও নহে, এবং জীবের পারমার্থিক অস্তিত্বও নাই। জীব অবিদ্যাসম্ভূত; সুতরাং জীবত্ব মিথ্যা বা অলীক। যাহা অবিদ্যা বা অজ্ঞানসম্ভূত এবং সুতরাং অলীক, তাহার জ্ঞানের উপর নির্ভর করা চলে না। ব্রহ্ম নির্ব্বিকার ও অনাসক্ত, সুতরাং ব্রহ্মের সহিত জীব ভাবের কোনই সম্পর্ক নাই, সুতরাং জীব ব্রহ্মকে জানিতেও পারে না, এবং ব্রহ্মে জীবের চরিতার্থতাও হইতে পারে না। ইহা একপ্রকার শূন্যবাদ। জীবন ও সংসার যদি দুঃখেরই মূল হয়, তাহা হইলে এই মতের সার্থকতা থাকে। এই মতে নির্ব্বাণ বা মুক্তি লাভিত হইলে সবই শূন্য হইয়া যায়। আমি যদি না থাকিলাম, ব্রহ্ম থাকিলেন, কি না থাকিলেন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আমি থাকিলে তবে জগৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বা মঙ্গলে আমার সার্থকতা হইতে পারে, নচেৎ এ সকল থাকিল বা গেল, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। যদি স্বীকার করা যায় যে, আমি পারমার্থিক ভাবে জীব নহি, যদি স্বীকার করা যায় যে, আমি অবিদ্যা-কল্পিত মিথ্যা অধ্যাস, তাহা হইলে প্রকারান্তরে শূন্যবাদই স্বীকার করা হয়। যাঁহারা শাঙ্কর ভাষ্যের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝেন, তাঁহারা শঙ্করাচার্য্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত করেন। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে মধ্যে রাখিয়া তাঁহার বৌদ্ধত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন।

কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করিতে পারেন যে, তিনি বাস্তবিক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ নহেন, তবে তিনি পূর্ণাদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিতে গিয়া বিশেষ গোলযোগে পড়িয়া উক্ত কৌশলের অবতারণা করেন ও তাহাতে তাঁহাকে একটু গোঁজ দিতে বাধ্য হইতে হয়। তিনি কৌশল অবলম্বন করিয়াও সকল দিক্ বজায় রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য শূন্যবাদ প্রচার করা নহে, পূর্ণাদ্বৈতবাদ প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

বাস্তবিক পূর্ণাদ্বৈতবাদই যে সম্পূর্ণরূপ সমীচীন ও সঙ্গত, তাহা বিশিষ্ট দার্শনিকদিগের মত। আমরা পূর্ণাদ্বৈত-বাদ ছাড়া অন্য কোনও মতকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বুঝাইতে পারি না। জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের পারমার্থিক ভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমরা বুঝিতে পারি না। যদি বলা যায়, জীবসকল পরস্পর স্বতন্ত্র, তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরস্পর স্বতন্ত্র জীবসকলের পরস্পর সম্বন্ধ সূচনা কেমন করিয়া হইতে পারে? অর্থাৎ পরস্পর স্বতন্ত্র জীব সকল পরস্পরের সম্বন্ধে আসে কেমন করিয়া? এক জন আর এক জনের সহিত আলাপ করিতে পারে, তাহার কথা শুনিতে পায়, তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারে কেমন করিয়া? কি এমন সংযোগসূত্র আছে, যাহা আমাদের সকলের সহিত সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে? কোন সংযোগসূত্র ব্যতীত যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ সূচনা হইতে পারে, তাহা আমাদের ধারণাতীত। সুতরাং আমরা অনুমান করিতে বাধ্য হই যে, এমন কোন বস্তু নিশ্চয়ই আছে, যাহা সাধারণ তন্তুরূপে আমাদের সকলেরই মধ্যে অনুস্যূত আছে। কেবল জীবসকলই যে পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে আসে, তাহা নহে; এই পরিদৃশ্যমান জগৎও আমাদের সম্বন্ধে আসে, এবং আমরা ও এই পরিদৃশ্যমান জগতের সম্বন্ধে আসি। বৃক্ষ লতা, পাহাড় পর্ব্বত, নদী সমুদ্র, সকলেরই সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ব্যোমমার্গে বিচরণশীল নক্ষত্র-পুঞ্জও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, আমরা তাহাদের গতি নির্দ্ধারণেও সমর্থ হই, সমুদ্রপথে অর্ণবযানে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদের সাহায্যে দিঙ্‌নির্ণয় করিতে পারি। সুতরাং নক্ষত্রাবলীর সহিতও আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই সম্বন্ধ সূচনাকার্য্যে আমরা কোন্ সূত্রের সাহায্য পাই? আমরা কি

অনুমান করিতে বাধ্য হই না, এমন কোন সাধারণ সূত্র সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া অনুস্যূত আছে, যাহা এই বিশ্বের প্রত্যেক অংশের সহিত অপর অংশের সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে? যদি এমন কোন সাধারণ সূত্র থাকে, তবে তাহার বিশ্বের কোন অংশের সহিত পার্থক্য থাকিতে পারে না। যেহেতু, সকল অংশেরই সহিত আমার তাহার সম্বন্ধ আছে। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে কখনই তাহা সকল অংশের মধ্যে অনুস্যূত থাকিয়া, বিশ্বের সকল অংশের পরস্পর সম্বন্ধ সূচনা করিতে পারিত না। আমি যে তোমার কথা শুনিতে পাই, বায়ুতরঙ্গ তোমার ও আমার মধ্যের ব্যবধানটীকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে তাই। সূর্য্য পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি যে ব্যোমমার্গে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া আবর্ত্তিত ও বিঘূর্ণিত হইতেছে, ঈথর নামক সূক্ষ্ম পদার্থ বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে তাই। যদি সংযোগসূত্র না থাকিত, এক সাধারণ সম্বন্ধসূত্র বিশ্ব ব্যাপিয়া, বিশ্বের সকল অংশের মধ্য দিয়া অনুস্যূত না থাকিত তবে কখনই বিশ্বের অংশসকল নিয়মবদ্ধ থাকিয়া ও পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিতে পারিত না। এই সংযোগী সূত্রটী গীতায় সুন্দর ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গীতা শ্রুতিরই প্রতিধ্বনিস্বরূপ বলিতেছেন,—

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥

পুনশ্চ—

'যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥'

সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে একেরই সত্তা সূচনা করিতেছে, এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তা যে সমগ্র বিশ্বময়ে অনুস্যূত তাহা প্রাচীন হিন্দুঋষিগণ কত পূর্ব্বে অনুভব করিয়া গিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব গ্রন্থে, তারকাসুর প্রপীড়িত দেবতাগণের ব্রহ্মার স্তুতি মধ্যে লিখিত আছে:—

নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে॥

ইহাপেক্ষা অদ্বৈতভাবের সুস্পষ্ট নিদর্শন আর কি হইতে পারে? শ্লোকটীর 'প্রাক্সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে' (শুধু এই কথাটীর উপর যদি লক্ষ্য রাখা যায়, তাহা হইলে বুঝা যায় যে কালিদাস শ্রুতিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

প্রেম ও মুক্তি

(শ্রীমোহিতলাল মজুমদার)

যে নিষেছে হরিনাম মৃত্যু তারে নাকি
নাহি ধরে, যে করেছে সন্ন্যাস গ্রহণ
কর্ম্মনাশ লাগি', সে যে সমাজ শাসন
নাহি মানে, বিধি নিষেধেরে দূরে রাখি'
সংসারে স্বাধীন সে তো, নিঃসঙ্গ একাকী!
ভক্ত যেই হায় তরে নিত্য নারায়ণ
খুলেছেন একে একে সকল বাঁধন,
জ্ঞানী আত্মবলে যেন নিয়তিরে ফাঁকি।
প্রেমেরি প্রব্রজ্যা শুধু এক মিথ্যাচার!
সে যে সত্য-শক্তি-মুক্তি-সাধনায়,
সারাবক্ষ কেঁদে-হাসা—হো হো হাহাকার,
জ্ঞানন্দ-মন্থন সে যে মহাবেদনায়!
প্রেমে কর্ম্মফল ত্যাগ, নাশ ভবতরী,
সৃষ্টি প্রেমে—ফলভোগ স্রষ্টার কোথায়?

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and Published by P. N. Pal. 26-3 Scott Lane, Calcutta.